[মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরারাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত]

ভাষা প্রবেশ

- ব্যাকরণভাগ
- রচনাভাগ

॥ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পাঠ্য ॥

গোপাল হালদার এম. এ.

মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকার প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পরীক্ষক

এবং

সুবোধ চৌধুরী এম. এ.

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

নবারুণ প্রকাশনী

সি ৫১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুবোধ রায়
নবারুণ প্রকাশনী
সি ৫১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—মার্চ, ১৯৬০

॥ সাত টাকা মাত্র ॥

ঃ মুদ্রাকর ঃ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
বাণীরেখা প্রেস
২৭৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য
শ্রীশিবদুর্গা প্রেস
১৩সি, বেচুচ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা-৯

শ্রীসনৎকুমার বন্দোপাধ্যায়
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭৷১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

নিবেদন

যে ভাষা মাতৃভাষা তাহা কাহারও শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, আপনা-আপনি তাহা শেখা হইয়া যায়,—নিশ্চয়ই এই ধারণা এখন আর কাহারও নাই। কারণ কোন "ভাষা জানার" অর্থ তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারা, তাহা শুনিয়া বুঝিতে পারা; তারপর বিশুদ্ধভাবে তাহা লিখিতে পারা, এবং বিশুদ্ধভাবে বলিতে পারা। বাঙলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা প্রথম দুইটি অর্থে বাঙলা জানে, কিন্তু যত্ন করিয়া শিক্ষা না করিলে শেষ দুই অর্থে বাঙলা তাহাদের জানা হয় কিনা সন্দেহ। কথাটা হয়ত ইংরেজের পক্ষে ইংরেজি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কারণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান নিতান্ত শোচনীয়, ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা সম্প্রতি অতি দুঃখে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। আসল কথা, মাতৃভাষার যথার্থ অধিকারও অর্জন করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা সাপেক্ষ।

আমাদের প্রয়াসের ইহাই মূল কারণ। বাঙালী সন্তান তাহার মাতৃভাষা সযত্নে শিখিবে এবং উহা বিশুদ্ধরূপে শিখিতে আগ্রহ বোধ করিবে, ইহাই আমাদের আশা।

"ভাষা প্রবেশ" বিশেষ করিয়া ভাই তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত। বর্তমান উচ্চতর মধ্য শিক্ষা, স্কুল ফাইন্যাল ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়েরপরীক্ষাদির জন্য তাহাদের যে পাঠক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসরণেই ইহার ব্যাকরণভাগ ও রচনা-ভাগ প্রণীত হইয়াছে। অবশ্য এই বয়সের ও এই পর্বের ইংরেজ ছাত্র যতটুকু তাহার মাতৃভাষা অনুশীলন করিতে সক্ষম, আমাদের ধারণা বাঙালী ছাত্রও ততটুকু তাহার মাতৃভাষার অধিকার লাভ করিতে সমর্থ। বিদ্যার গুরুভার অন্যক্ষেত্র হইতে না চাপাইয়া দিলে তাহার পক্ষে এই অধিকার অর্জনে আগ্রহ জন্মাই স্বাভাবিক—খর্বিত অধিকার লইয়া তৃপ্ত হইবার কথা নয়। বাঙালী ছাত্রদের বুদ্ধি ও দায়িত্বে আমাদের আস্থা আছে।

কিন্তু শিক্ষার্থী মাত্রেই পরীক্ষার্থী, এই কথাটাও এই দেশে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহকে অনেক সময়েই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে খর্ব করে পরীক্ষার প্রয়োজন ও কৌশলকলা। কারণ পরীক্ষা অনেক সময়েই শিক্ষার পরিমাপ নয়। শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার্থীরূপে গণ্য করিলেও আমরা তাহার শিক্ষার দাবিকে তুচ্ছ করিতে চাহি নাই, পরীক্ষার দাবির মতই তাহার বিকাশোন্মুখ মনের দাবিও পূরণ করিতে চাহিয়াছি।

ব্যাকরণ জিনিসটি পরিণত মনের সৃষ্টি। তাহার নিয়মনীতি নাতিকিশোর শিক্ষার্থীকেও বিভ্রান্ত না করিয়া ছাড়ে না। আর, ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর নিকট বিভীষিকা হইয়া উঠিলে ভাষার প্রতি তার প্রীতিও ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। অথচ, ব্যাকরণের রীতিনিয়ম আয়ত্ত না থাকিলে ভাষায় অধিকার জন্মার প্রশ্নই

উঠে না। এই সংকটে আমরা ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়সমূহকে এই তরুণ শিক্ষার্থীদের নিকট যথাসম্ভব দৃষ্টান্ত সহকারে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত করিতে চাহিয়াছি। যাঁহারা বাঙলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাঁহারা জানেন,—বাঙলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের বঙ্গীয় সংস্করণ মাত্র নহে, উহার নিজস্ব রূপ আছে। এবং উহার কোন কোন বিষয়ে এখনো বৈয়াকরণেরাও একমত নহেন। শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই সব বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য নয়। স্বচ্ছন্দরূপে চলিবার ও শিখিবার নিয়ম সমূহ আয়ত্ত করাই তাহার প্রথম প্রয়োজন—ব্যাকরণের তর্ক নয়। এই দিকে আমরা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেই গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছি—আশা করি আমাদের অপরাধ তিনি মার্জনা করিবেন।

রচনাভাগে আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে ভাবিতে শিখানো ও লিখিতে শিখানো। বারে বারেই আমরা এই উদ্দেশ্যে তাহার মনকে নাড়া দিতে চাহিয়াছি। প্রথম দিককার রচনাশিক্ষা প্রস্তাবটি প্রধানতঃ শিক্ষক মহাশয়দের আলোচ্য, কিন্তু ছাত্ররাই মূলতঃ উহার উদ্দিষ্ট। এইরূপ প্রায় প্রতিটি রচনার সহিতই যে 'মন্তব্য' উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা শুধু পদ্ধতির দিক হইতেই অভিনব নয়,—'রচনার' প্রয়োজনেই তাহা সন্নিবিষ্ট। উহা একই কালে রচনার বিষয় ব্যাখ্যা, লিখিত রচনার সমালোচনা, এবং ভাবনা ও প্রকাশকলা আয়ত্ত করিবার পক্ষে আবশ্যক ইঙ্গিত। এইরূপে এক একটি রচনার সূত্রে বহু বিষয়ে রচনার বনিয়াদ স্থাপিত হইয়াছে ও শিক্ষার্থীর পক্ষে রচনাশিক্ষার সুদৃঢ় বনিয়াদ নির্মিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই প্রয়াস ব্যর্থ হইবে না; সত্যই ছাত্ররা পরের লেখা মুখস্থ না করিয়া নিজেরা লিখিতে শিখিবেন।

নিশ্চয়ই এই গ্রন্থে বহু ভ্রম প্রমাদ, ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়াছে; উহার জন্য লেখকরাই দায়ী। আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শৈলেশ সেনগুপ্ত ও সুবোধ রায় মহাশয়ের নিকট—ইঁহাদের উদ্যোগে উৎসাহেই এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ও আমরা বিশেষরূপে প্রার্থনা করি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহৃদয় সহযোগিতা। প্রধানতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যোগাযোগেই শিক্ষার বিকাশ—সেই যোগাযোগের পক্ষে এই গ্রন্থ সহায়ক হইলেই ইহার প্রকাশ সার্থক। আর, ইহার ফলে যদি বাঙলা ভাষা শিক্ষায় ও বাঙলা রচনায় একটি শিক্ষার্থীও আগ্রহান্বিত হয়, তাহা হইলে জানিব—আমরা সার্থক, বাঙলা ভাষার প্রতি ও ভাষাশিক্ষার্থী তরুণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমাদের ভালবাসা মিথ্যা হয় নাই।

গোপাল হালদার
সুবোধ চৌধুরী

সূচীপত্র

ব্যাকরণভাগ

রচনাভাগ

বিষয় | পৃষ্ঠা

ব্যাকরণ ভাগ

ভুমিকা প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

১। ভাষা, বাংলা ভাষা

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ দ্বারা গঠিত শব্দাদি মনের ভাব প্রকাশের জন্য কোনো লোকসমাজে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে সেই সমাজের ভাষা বলে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সামান্য সংক্ষেপ করিয়া উপরের সংজ্ঞা লিখিত হইল। ভাষার উপরিলিখিত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করিলে যে তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইল :

(১) ভাষা বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হইবে ;

(২) সেই ধ্বনি মনের ভাব প্রকাশক শব্দ গঠন করিবে ; এবং

(৩) সেই শব্দাদি কোনো লোকসমাজ ব্যবহার করিবে।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে উপরের সংজ্ঞা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—বাংলা ভাষায় অ, আ, ক, খ ইত্যাদি প্রায় ৫০টি মৌলিক ধ্বনি রহিয়াছে ; ঐ ধ্বনিগুলির সাহায্যে বাংলা ভাষায় প্রায় ৭৫ হাজার শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে ;—বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষাগুলিকে ধরিলে শব্দসংখ্যা এক লক্ষের উপরেও কয়েক হাজার হইবে। কয়েকটি মাত্র মৌলিক ধ্বনি দ্বারা সৃষ্ট এই বিশাল শব্দভাণ্ডার তো আছেই, তাহার সঙ্গে শব্দগুলিকে উপযুক্ত অর্থবাচক করিবার জন্য বহুতর শব্দাংশ বা বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদিও রহিয়াছে। এই সমস্ত শব্দ, বিভক্তি, উপসর্গগুলিকে তাহাদের বিশিষ্ট যোজনাভঙ্গি ও প্রয়োগ-ভঙ্গি সহ বাংলার অধিবাসীরা তাহাদের ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করিতেছে। এই ভাবে এই একটি বিশেষ লোকসমাজে বাংলা ভাষা নামক একটি ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে।

২। ভাষা, উপভাষা

বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বহুসংখ্যক লোক যখন একই ভাষায় কথা বলে, তখন লোকমুখে ভিন্ন ভাবে কথিত হইবার ফলে সেই ভাষা ধীরে ধীরে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই ভাবে এক এক অঞ্চলে মূল ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ পরস্পর একটু পৃথক আঞ্চলিক ভাষা গড়িয়া উঠে। বৈয়াকরণেরা এই

সব আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাকে মূল ভাষার উপভাষা (dialect) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বাংলা ভাষার উপভাষাগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়—*

(১) **পূর্ববঙ্গের উপভাষা** (বাঙ্গালদেশের ভাষা) : পদ্মার পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলের অর্থাৎ বাঙ্গাল দেশের কথ্যভাষাগুলি এই গুচ্ছের অন্তর্গত। অর্থাৎ বিশেষ করিয়া ঢাকা, ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা অঞ্চলের ভাষা ; এবং উচ্চারণের দিক হইতে অনেকটা পৃথক নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের ভাষা। অবশ্য পদ্মার পশ্চিম পারের বরিশাল, যশোহর, খুলনা অঞ্চলের ভাষাও পূর্ববঙ্গের উপভাষার মধ্যেই ধরিতে হয়।

(২) **পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা** (রাঢ় অঞ্চলের ভাষা) : ভাগীরথার দুই পারের অর্থাৎ মধ্য পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষাই এই গুচ্ছের অন্তর্গত। উত্তরে মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে হাওড়া, হুগলী, কলিকাতা, ২৪পরগণার ভাষাই খাঁটি পশ্চিমবঙ্গের ভাষা।

(৩) **দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা** (ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ভাষা) : বাঁকুড়া হইতে বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর পর্যন্ত যে কথ্য ভাষাগুলি প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা বলা যায়।

(৪) **উত্তরবঙ্গের উপভাষা** (বরেন্দ্রভূমের ভাষা) : পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষাগুলি এই গুচ্ছের অন্তর্গত। যেমন পাবনা, রাজসাহীর কথ্য ভাষা, মালদহ অঞ্চলের কথ্যভাষা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের কথ্যভাষা ইত্যাদি।

এই উপভাষাগুলির পার্থক্য ও মিল কতটুকু নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে—

আমি আইজ বা'ত খাইছি (কুমিল্লা)
আঁই আজুআ ভা'ত খাঈ (চট্টগ্রাম)
আমি আজ ভাত খাইছি (যশোহর)
মুই আইজ ভাত খাইছং (কোচবিহার)

* যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক গ্রন্থে নদীসীমা সাহায্যে বাংলার উপভাষাগুলির পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর এই চারিটি অঞ্চল বিভাগ করিয়াছিলেন। উপভাষাগুলির মূলে এই ভৌগোলিক বিভাগ হয়ত বা অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে উপভাষাগুলির অঞ্চল নির্দেশের কালে এই বিভাগ খুব যথাযথ হয় না। এখন শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের উপভাষাগুলিই তাহাদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ আছে।

আমি অ্যাজ ভাত খাছি (পাবনা)
আমি আজ ভাত খাঞেছি (বাঁকুড়া)
মু আইজ ভাত খাইচি (মেদিনীপুর)
আমি আজ ভাত খেযেছি (কলিকাতা)

৩। উপভাষা ও বিভাষা

বাংলার আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূলতঃ বাংলাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিয়াছেন, কোন কোন অঞ্চলের উপভাষা অপর ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিকতর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল উপভাষাকে তাঁহারা উপভাষা না বলিয়া বিভাষা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বাংলাভাষার উল্লেখযোগ্য বিভাষা চারিটি ঃ

(১) মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের ভাষা,
(২) মালদহ ও পূর্ণিযার পশ্চিমাংশের ভাষা,
(৩) কোচবিহারের ভাষা,

এবং বিশেষ করিয়া,

(৪) চট্টগ্রামের ও নোয়াখালির ভাষা।*

মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের ভাষা ওড়িয়া মিশ্রিত; মালদহ ও পূর্ণিয়ার পশ্চিমাংশের ভাষা বিহারী-হিন্দী মিশ্রিত, এবং কোচবিহারের ভাষার সহিত পশ্চিম আসামের ভাষার সুস্পষ্ট মিশ্রণ হইযাছে। এইভাবে এই তিন অঞ্চলেই ভাষার এত বিকৃতি ঘটিয়াছে যে তাহাকে তাঁহাদের মতে বাংলার উপভাষা না বলিয়া বিভাষা বলাই সঙ্গত। কিন্তু চট্টগ্রামের (ও নোয়াখালির) ভাষার উচ্চারণরীতিতে বিকৃতি ঘটিলেও অপর ভাষার মিশ্রণ তাহাতে নাই ;—ঐ দিক হইতে ইহারা শতকরা একশত ভাগই বাংলা। এই দৃষ্টান্তে চট্টগ্রামের (ও নোযাখালির) ভাষাকে বিভাষা বলা হযত তেমন সঙ্গত হইবেনা।

৪। কথ্য ও লেখ্যভাষা—সাধু ও চলিত

প্রত্যেক সভ্য জাতিরই ভাষার দুইটি রূপ আছে—একটি কথ্য ও অপরটি লেখ্য। কথ্যভাষা তাহাদের নিত্যকার কথাবার্তার ভাষা, আর লেখ্যভাষা

* (১) "বঙ্গালীর (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার) প্রধান বিভাষা চাটিগ্রামী।",—ভাষার ইতিবৃত্ত—ডাঃ সুকুমার সেন।
(২) 'ভাষা-বিষয়ে নোআখালী ও চাটিগাঁ ঠিক পূর্ববঙ্গ নহে।"—বাঙ্গালা ভাষা (১ম ভাগ) যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

লিখিবার বা সাহিত্যরচনার ভাষা। কথ্যভাষা অঞ্চলবিশেষে প্রায়ই ভিন্নরূপ হয়, এমনকি এক অঞ্চলের কথ্যভাষা অন্য অঞ্চলে বোধগম্য হয় না। বাংলা ভাষার যে সব উপভাষা আছে তাহা সমস্তই হইল কথ্যভাষার নিদর্শন।

এই কথ্যভাষাগুলি হইতে স্বতন্ত্র বাংলা গদ্যের একটি প্রাচীন লেখ্যরূপ রহিয়াছে। এই ভাষা সংস্কৃত অনুসারী এবং অল্পবিস্তর কৃত্রিম; তবে বাংলা গদ্যের আদর্শভাষা বলিয়া ইহা সকলেরই বোধগম্য। বৈয়াকরণেরা এই ভাষার নাম দিয়াছেন **সাধুভাষা**।* ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ লেখকগণ ইহার স্রষ্টা; এবং মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত এই ভাষারাতির প্রসার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালেও বাংলাগদ্যের সাধুরীতিটি অপ্রতিহত মর্যাদায় আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

সাধুভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যে আরও একটি লেখ্যরীতি ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। এই রীতি কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত ভাগীরথীর দুই পারের কথ্যভাষাকে অবলম্বন করিয়া গঠিত। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এবং প্রাচান নাটক প্রহসনাদিতে এই ভাষার নিদর্শন আছে। তবে সাধুভাষার পাশে এই ভাষা পূর্বে ঠিক সাহিত্যিক কৌলীন্য লাভ করিতে পারে নাই। বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ গদ্যরচয়িতারা নবোদ্যমে এই কথ্য ভাষারীতি অবলম্বন করেন। তাঁহাদের হাতে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষাই যথেষ্ট মার্জিত হইয়া বাংলার একটি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক এবং আধুনিক গদ্যরীতি সৃষ্টি করিল। বর্তমানে এই ভাষার নামই হইয়াছে **চলিত ভাষা**।†

* 'সাধুভাষা' কথাটি বাংলা ব্যাকরণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতেই ব্যবহার হইতেছে। মূলে সাধুভাষার অর্থ ছিল "তদ্ (সংস্কৃত) ভাষানুযায়ী" ভাষা—অর্থাৎ সংস্কৃত-রীতির ভাষা। তৎকালীন ব্যাকরণে এই 'সাধুভাষা', 'বঙ্গদেশীয় সভ্য সাধুসমাজে' প্রচলিত বলিয়া বলা হইয়াছে, এবং যাহারা 'তত্তদ্ভাষানভিজ্ঞ' অর্থাৎ যাহারা সংস্কৃত বা সাধুভাষা জানে না, তাহাদের ভাষাকে (অর্থাৎ মৌখিক বাংলা ভাষাকে) 'অপর ভাষা' বলা হইয়াছে। পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রও এই মৌখিক ভাষাকে 'অপর ভাষা' বলিয়াছেন।

† শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকেই 'চলিত ভাষা' ("Current Language or Colloquial Speech *par excellence*") বলিয়াছেন। বাংলা উপভাষাগুলির মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষার নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই অঞ্চলের শিক্ষিত লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে তাহা গোটা বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের কথাবার্তার ভাষা। কিন্তু 'চলিত ভাষা' কথাটি সাধারণতঃ সাধুভাষার সহিত তুলনাত্মক ভাবে বলা হয়—সেই ক্ষেত্রে সাধুভাষাকে সংস্কৃতানুসারী সাহিত্যিক ভাষা, অপরটিকে কলিকাতার মৌখিক ভাষার অবলম্বনে সাহিত্যিক ভাষা বলিতে হইবে।

৫। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য

বাংলা গদ্যে ব্যবহৃত সাধুভাষার রূপটি অনেকাংশে সংস্কৃত প্রভাবিত। প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ, সংস্কৃতের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ এবং সংস্কৃত বাক্যগঠন প্রণালীর প্রভাব এই ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি তাহাদের পূর্ণতর রূপ লইয়া বর্তমান আছে—কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার হ্রস্বীকৃত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদের ব্যবহার এই ভাষায় নাই। এবং খাঁটি বাংলা idiom বা বাক্‌রীতির প্রয়োগও এই ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম।

অপরপক্ষে চলিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা তদ্ভব এবং দেশী শব্দ-প্রযোগের দিকে ঝোঁক বেশী। সংস্কৃতের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ বা সংস্কৃতের মত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ ইত্যাদি এই ভাষায় তেমন নাই। সাধু বাংলায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদের ব্যবহার বর্জন করিয়া ক্রিয়া ও সর্বনামের কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত হ্রস্ব রূপকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভাষারীতিতে খাঁটি বাংলা idiom বা বাক্‌রাতিকে যথাসম্ভব গ্রহণ করিবার প্রয়াস লক্ষণীয়।

সাধু ভাষার উদাহরণ : ('সীতার বনবাস'—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) "একদিন মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া, এতদিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম, এ পর্য্যন্ত অভিপ্রেত সাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শন পথে পাতিত করি? উহাদের দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় যাই, অথবা রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া, এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়া সতীর পরিগ্রহ প্রার্থনা করি।"

চলিত ভাষার উদাহরণ : ('হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা',—কালীপ্রসন্ন সিংহ) "ক্রমে হঠাৎ-বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ৷ দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল। দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গেলেন। ঢক বাজারেরা নাবলেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেধে দু-থাক হল। মধ্যস্থেরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—একদলে মিস্তির খুড়ো আর একদলে দাদাঠাকুর বাঁদন্দার।"

৬। চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা বাংলা গদ্যরীতির দুইটি ভিন্ন আদর্শ বলিয়া ইহাদের মিশ্রণ স্বভাবতঃই সঙ্গত নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাধু ও কথ্যবাংলার মিশ্রিত ভাষাভঙ্গিকে 'শবপোড়া মরাদাহ' বলিয়া উপহাস করা হইত। পরবর্তী বাংলা ব্যাকরণে এই ভাষারীতির নিন্দা করিয়া ইহাকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলার মত সচল ভাষার স্বচ্ছন্দ গদ্যরীতিকে কোনো উপহাসাত্মক শব্দ দিয়া বাঁধিয়া রাখা যায়না। বাংলা গদ্যের রীতিকারেরা এই সকল ব্যাকরণগত নিন্দাবাক্যকে প্রায়ই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন; উনিশ শতক হইতেই বাংলা সাধুগদ্যে অজস্র দেশী শব্দ ও লৌকিক ইডিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়; অপর পক্ষে চলিত রীতিতেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ, এবং সংস্কৃতের মতই সমাস ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। বস্তুতঃ এই দুই রীতির স্বাভাবিক মিশ্রণ না ঘটিলে সংস্কৃতানুসারী সাধু ভাষা আজ এমন সহজ ও সাবলীল হইয়া উঠিতে পারিতনা; এবং চলিত রীতির গদ্যও ভাগীরথীপারের উপভাষার গ্রাম্যতা ও শহুরেপনা বর্জন করিয়া এমন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতনা।

নিম্নে দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

সাধুগদ্যে চলিত রীতির প্রভাব: ('সাম্য'—বঙ্কিমচন্দ্র)

"......এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম সেখ, আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতাহাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিযা যাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দমজল পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবেনা, এই চাষের সময়, সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গাপাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড়বড় ভাত লুণ-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, ইহাদের কি মঙ্গল সাধিযাছ?......"

চলিত ভাষায় সাধুরীতির প্রভাব: ('য়ুরোপযাত্রী'—রবীন্দ্রনাথ)

"ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম দু'ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বন-ঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক

তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকারাশির মধ্য দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই ক'রে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগ্‌ড়ি দেখা যাচ্ছে। কেউবা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউবা নামাজ পড়ছে, কেউবা নাসারজ্জু ধ'রে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি ক'রছে। সমস্তটা মিলে খর-রৌদ্রে আরব মরুভূমির একখণ্ড ছবির মতো মনে হোলো।..."

সাধুভাষা ও চলতি ভাষার মিশ্রণের ব্যাপারে স্থূলভাবে দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়—

(১) সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অসংস্কৃত শব্দের সন্ধি সমাস প্রভৃতি বর্জন করিতে হইবে; যেমন, শবদাহ, মরাপোড়া, তুঙ্গশৈল, উঁচু পাহাড় হইবে, মরাদাহ, শবপোড়া, তুঙ্গপাহাড়, উঁচুশৈল প্রভৃতি হইবেনা। এবং,

(২) একই রচনায় হ্রস্বীকৃত ক্রিয়াপদ, খাচ্ছি, করেছি প্রভৃতির সঙ্গে খাইতেছি, করিয়াছি প্রভৃতি পূর্ণরূপের মিশ্রণ ঘটিবেনা এবং তাঁকে, তাঁদের প্রভৃতি হ্রস্ব সর্বনামের সঙ্গে তাঁহাকে, তাঁহাদের প্রভৃতি দীর্ঘ সর্বনাম ব্যবহার হইবেনা।

অবশ্য এই দুইটি সূত্রের প্রথমটিরও মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যায়, শুধু দ্বিতীয় সূত্রটিকেই আজকাল সতর্কভাবে পালন করা হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

১। ভাষা কাহাকে বলে?

২। উপভাষা কি? বিভাষা কি?

৩। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।'—এই বাক্যটিকে বাংলাদেশের অন্ততঃ তিন চারিটি উপভাষায় বলিতে চেষ্টা কর।

৪। বাংলা গদ্যে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বরিতে কি বোঝায় স্পষ্ট করিয়া বল। চলিত ভাষা ও সাধুভাষার মিশ্রণ সঙ্গত কি না আলোচনা কর।

৫। নিম্নের অনুচ্ছেদটির গদ্যরীতি আলোচনা কর:

"একটু একটু মেঘ হইতেছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। গোরু দুটা হম্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছনে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন।—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষীরাজের বংশ—টংয়শ টংয়শ ডংযশ ডংযশ করিয়া চলিতেছে—পটাপট্‌ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায়না।" (আলালের ঘরের দুলাল)

উত্তরের আদর্শ: উদ্ধৃত গদ্যাংশে ক্রিয়াপদগুলিতে পূর্ণরূপ বজায় রাখা হইয়াছে। অতএব রীতির দিক হইতে ইহা সাধুভাষায় রচিত বলিতে হইবে। কিন্তু সাধুভাষায় রচিত হইলেও ইহাতে কথ্য ভাষায় প্রভাব প্রচুর। ইঁহাতে হন্ হন্ করিয়া, টংয়শ টংযশ, ডয়ংশ ডয়ংশ, পটাপট্ ইত্যাদি বহু অনুকার শব্দ আছে। ছকড়া,' চাবুক ইত্যাদি দেশী শব্দও কয়েকটা আছে। চাল বেগড়ানো, চাবুক পড়া, ইত্যাদি idiomও রহিযাছে। এইজন্য এই অনুচ্ছেদটিকে চলিত-প্রভাবিত সাধুরীতির নিদর্শন বলা চলে।

(এই উত্তরের আদর্শে সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি, সহজ সাধুরীতি, কথ্যবহুল চলিত রীতি, সংস্কৃত প্রভাবিত চলিত রীতি ইত্যাদির আলোচনা করিবে।)

৬। নিম্নের অনুচ্ছেদটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

"অনন্তর তাহারা দুই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশের অনুবর্তী হইয়া বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল। যে শুনিল সেই মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল পরেই অনেকে রামের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুই ঋষিকুমার বীণাযন্ত্র সহযোগে আপনকার চরিত্র গান করিতেছে; যে শুনিতেছে সেই মোহিত হইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই।" (সীতার বনবাস)

উত্তরের আদর্শ: তারপর তারা দু'ভাই তাঁর আদেশ মত বীণা বাজিয়ে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করতে আরম্ভ করল। যে শুনল সেই মুগ্ধ হযে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরধারে চোখের জল ফেলতে লাগল। একটু পরে অনেকেই রামের কাছে গিযে বলতে লাগলেন, মহারাজ, দুটি সুন্দর ঋষি কুমার বীণা বাজিয়ে আপনার চরিত্র গান করছে, যে শুনছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা কোন জন্মে এমন মধুর গান শুনিনি।

(সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির হ্রস্বরূপ হইবে; সমাসবদ্ধ পদগুলি প্রয়োজন মত ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে; এবং সংস্কৃতের স্থানে যথাসম্ভব তদ্ভব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। অনেক স্থানে সংস্কৃতের বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করিলে ভাবটি লঘু হইয়া যাইতে পারে,—যেমন কোন পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় বা অনুরূপ কোন স্থানে সে সব স্থলে সংস্কৃত শব্দ বর্জন করা চলিবে না।)

৭। নিম্নের অনুচ্ছেদটিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো; তারমধ্যে

ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেড়িয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটাঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলছে—তার পেছনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেধে সঙ্গতে 'ভোলা বম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারি' ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। (আলালের ঘরের দুলাল)

উত্তরের আদর্শ : চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ করিলেই কাদা হয়—একেবারে ধুলোয় ধুলাময় ; তাহার মধ্যে ঢাকের গটরার (বাদ্যের) সঙ্গে গাজন বাহির হইয়াছে। প্রথমে দুইটি মুটে একটা বড় পিতলের পেটাঘড়ি বাঁশ বাঁধিয়া কাঁধে করিয়াছে—কতকগুলি ছেলে মুগুরের ঘা দিয়া তাহা বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে—তাহাদের পিছনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বাঁধিয়া ঢাকের সঙ্গতে 'ভোলা বম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারি' ভজন গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

(চলিত ভাষাকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করিতে হইলে প্রথমেই সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ দিতে হইবে। ইহার পর যদি বিশেষ অমার্জিত বা গ্রাম্য কোন শব্দ থাকে তাহাকেই মাত্র বর্জন করিবে। কারণ বর্তমানে সাধু-ভাষায় চলিত ভাষার প্রয়োজ্য প্রায় সকল শব্দই চলে, তাই সাধুভাষায় পরিবর্তনের সময় প্রাচীন রীতির আদর্শে যথাসম্ভব বেশি শব্দকে সংস্কৃতে পরিণত করা নিষ্প্রয়োজন।)

মন্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী চলিত ভাষাকে সাধুভাষায় এবং সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের প্রশ্ন থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার লেখনরীতি বা style শুধু ক্রিয়া বা সর্বনামের পূর্ণ বা হ্রস্বরূপের উপর কিংবা সংস্কৃত শব্দাদি ব্যবহার করা না করার উপর নির্ভর করে না। এই দুই লেখনরীতিকে সত্য সত্য আয়ত্ত করিতে হইলে বিশিষ্ট বাংলা গদ্যরচয়িতাদের গ্রন্থাদি পাঠ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লেখার অভ্যাস না করিলে চলিবে না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সাধু ও চলিত উভয় ভাষারই এমন নিদর্শন সর্বদাই মিলিবে যাহাকে অন্যরীতিতে পরিবর্তিত করা প্রায় অসম্ভব, এবং করিলেও তাহা style-এর দিক হইতে নিতান্তই নিম্নস্তরের হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষার শব্দ

বাংলা ভাষার শব্দগুলিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আর্যমূল— তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম

(২) অনার্যমূল— দেশী

(৩) বিদেশী

(৪) মিশ্র বা সঙ্কর

১। আর্যমূল শব্দ

তৎসম—যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে তৎসম শব্দ বলে। তৎসম অর্থ হইতেছে, তৎ = তাহা (অর্থাৎ সংস্কৃত), সম = সমান, মত; অর্থাৎ যাহা সংস্কৃতের মত তাহা তৎসম।

বাংলায় তৎসম শব্দের উদাহরণ—

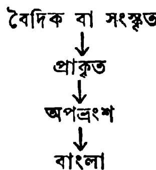
রবি, শশী, ফল, জল, নদী, পিতা, মাতা, গৃহ, অরণ্য, আকাশ, পর্বত, ঔষধ, জগৎ, ঈশ্বর, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি।

তদ্ভব—যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতাদি স্তরের স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে তাহাদিগকে তদ্ভব শব্দ বলে।* তদ্ভব অর্থ হইতেছে, তৎ = তাহা (অর্থাৎ সংস্কৃত,) ভব = উদ্ভুত, জাত; অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে যাহার জন্ম তাহা তদ্ভব। বাংলা ভাষায় এই তদ্ভব শব্দগুলিকেই **খাঁটি** বাংলা শব্দ বলিয়া অভিহিত করা যায়। তদ্ভব শব্দগুলি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিযাছে বলিয়া ইহাদিগকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয়।

---

* তদ্ভব শব্দের সংজ্ঞা বুঝিবার জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্ম-ইতিহাস বোঝা দরকার।

বৈদিক বা সংস্কৃত হইতে অপেক্ষাকৃত সরলভাষা প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। (মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মাহারাষ্ট্রী, মথুরা বা শূরসেন অঞ্চলে শৌরসেনী, মগধ অঞ্চলে মাগধী ইত্যাদি।) পরে প্রাকৃতভাষা আরও সরল হইয়া অপভ্রংশে পরিণত হইল। (যেমন, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাগধী অপভ্রংশ ইত্যাদি।) মাগধী অপভ্রংশ হইতেই বাংলার উদ্ভব। এইভাবে সংস্কৃত হইতে বাংলা পর্যন্ত স্তরগুলি হইল—



নিম্নে সংস্কৃত হইতে কয়েকটি তদ্ভব শব্দের পরিবর্তন দেখানো হইল—

(প্রাচীনযুগ)	(মধ্যযুগ)	(আধুনিকযুগ)
সংস্কৃত	**প্রাকৃত, অপভ্রংশ**	**বাংলা**
ব্যাঘ্র	বগ্‌ঘ	বাঘ
হস্ত	হত্থ	হাত
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
অদ্য	অজ্জ	আজ
সত্য	সচ্চ	সাঁচা
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কান, কানু, কানাই

অর্ধতৎসম—যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া না আসিয়া প্রাকৃত যুগের পরে ঈষৎ বিকৃতরূপে বাংলায় গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। অর্ধতৎসম অর্থ হইল, আধা সংস্কৃত, অর্থাৎ হুবহু সংস্কৃতের মত নয়, কিছুটা বিকৃত সংস্কৃত, বা ভাঙ্গা সংস্কৃত।

কতকগুলি অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল—

সংস্কৃত বা তৎসম	অর্ধতৎসম
কৃষ্ণ	কেষ্ট
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
বৈষ্ণব	বোষ্টম
গৃহিণী	গিন্নী
উৎসর্গ	উচ্ছুগ্‌গু
লৌকিকতা	নকুতো
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন

২। অনার্যমূল শব্দ (দেশী শব্দ)

আর্য আগমনের পূর্বে এদেশে কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিরা বাস করিত। তাহাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই সকল অনার্যমূল শব্দকে ব্যাকরণে দেশী শব্দ বলা হয়।

কয়েকটি দেশী শব্দের উদাহরণ—

খোকা, ঘোড়া, ঘেঁচি, ঝাউ, ঝাঁটা, ঝিঙ্গা, ডাব, ডাঁহা, ডাঁসা, ডিঙ্গি, ঢিল, ঢোল, ঢেঁকি ইত্যাদি।

৩। বিদেশী শব্দ

বিদেশীদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের ভাষার বহু শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে। ব্যাকরণে এই সকল অভারতীয় শব্দের নাম দেওয়া হইয়াছে বিদেশী শব্দ।

বিদেশী শব্দগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) **তুর্কী শব্দ**—বাবা, বাবু, বিবি, চাকু, কাঁচি, কুলি, ঠাকুর, বোঁচকা, আলখাল্লা ইত্যাদি।

(২) **ফারসী শব্দ**—কম, বেশি, খুব, জোর, নগদ, খরচ, শহর, কামান, জাহাজ, তোপ, বস্তা, দূরবীণ, রেশম, পেয়ালা, সিন্দুক, ইত্যাদি।

(৩) **আরবী শব্দ**—হুঁকা, খাসী, কেচ্ছা, আয়েশ, আতর, আইন, আক্কেল, কেতাব, কলম, কোরান, নমাজ, তাজ্জব, বিদায় ইত্যাদি।

(৪) **পোর্তুগীজ শব্দ**—আতা, আনারস, পেঁপে, আলকাৎরা, আলমারী, কেদারা, কামরা, জানালা, চাবি, তামাক, তোয়ালে, পাঁউ (রুটি), পেরেক, ফিতা, বালতি, বিস্কুট, বোতল, বেহালা, সাবান, সায়া ইত্যাদি।

(৫) **ওলন্দাজ শব্দ**—ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, টেক্কা, তুরুপ ইত্যাদি।

(৬) **ফরাসী শব্দ**—কুপন, কার্তুজ, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

(৭) **ইংরেজি শব্দ**—টেবিল, চেয়ার, পেন্সিল, ইস্কুল, কলেজ, স্টেশন, আপিস, ক্লাব লাইব্রেরী, গভর্ণমেণ্ট, থিয়েটার, সিনেমা, ট্রাম, বাস, কাপ, প্লেট, সার্ট, কোট, কলেরা, ম্যালেরিয়া, হাসপাতাল, নার্স, ডাক্তার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি।

(৮) **জাপানী শব্দ**—রিকশা, সাম্পান, হাসনুহানা ইত্যাদি।

(৯) **চীনা শব্দ**—চা, চিনি, সিন্দুর ইত্যাদি।

(১০) **মালয়ী শব্দ**—সাগু, গুদাম ইত্যাদি।

(১১) **বর্মী শব্দ**—লুঙ্গি, ফুঙ্গি ইত্যাদি।

৪। ভারতীয় প্রাদেশিক শব্দ

বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শব্দও কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে বিদেশী শব্দের অন্তর্গত করিয়া আলোচনা

করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশী শব্দ বলিতে সাধারণতঃ বিদেশাগত অভারতীয় শব্দগুলিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের শব্দকে বিদেশী না বলিয়া প্রাদেশিক শব্দই বলা অধিকতর সঙ্গত হইবে। নিম্নে এই প্রকার কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল—

(ক) হিন্দী ভাষা হইতে আগত—পুরি, কচুরি, সিধা, সাঁচ্চা, ঝুটা, চিজ, লোটা, ভাগা (=পলানো), প্যারী, কাঁহাকার, কম-সে-কম ইত্যাদি।

(খ) গুজরাতী ভাষা হইতে আগত—হরতাল, খদ্দর, জয়ন্তী ইত্যাদি।

৫। মিশ্র শব্দ

একজাতীয় শব্দের সহিত অপরজাতীয় শব্দ বা শব্দাংশের মিশ্রণজাত শব্দের নাম মিশ্র শব্দ বা সঙ্কর শব্দ।

কয়েকটি বাংলা সঙ্কর শব্দের উদাহরণ—

হাটবাজার = হাট (তদ্ভব) + বাজার (ফরাসী)

রাজাউজীর = রাজা (তৎসম) + উজীর (ফরাসী)

মাস্টারমশায় = মাস্টার (ইংরেজি) + মশায় (অর্ধতৎসম)

ডাক্তারি = ডাক্তার (ইংরেজি) + ই (বাংলা প্রত্যয়)

ডেপুটিগিরি = ডেপুটি (ইংরেজি) + গিরি (ফারসী প্রত্যয়)

বে-টাইম = বে (ফারসী উপসর্গ) + টাইম (ইংরেজি)

অনুশীলনী

১। তদ্ভব শব্দ কাহাকে বলে ? ইহাদের নাম প্রাকৃতজ শব্দ কেন ?

২। (ক) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের পার্থক্য কি।

(খ) অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য কি ?

৩। নীচের শব্দ তিনটির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ শব্দ বল :

কৃষ্ণ, কেষ্ট, কানু।

৪। দেশী শব্দ বলিতে কি বোঝায় স্পষ্ট করিয়া বল এবং পাঁচটি দেশী শব্দের দৃষ্টান্ত দাও।

৫। বাংলায় বিদেশী শব্দ কাহাকে বলে ? সংক্ষেপে নানাপ্রকার বিদেশী শব্দের দৃষ্টান্ত দাও।

৬। বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের যে সব শব্দ প্রচলিত আছে তাহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলা চলে কি ? বাংলায় বহুলপ্রচলিত কয়েকটি হিন্দী শব্দ এবং কয়েকটি গুজরাতী শব্দের নাম করিতে পার কি ?

৭। মিশ্র শব্দ কি ? উদাহরণসহ বল।

৮। ইংরেজি শব্দের পরিবর্তে যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নের অনুচ্ছেদটিকে পুনরায় লেখ :

আমাদের হিস্ট্রীর মাস্টারমশায় আজ এক উইকের উপর ইস্কুলে অ্যাব্‌সেণ্ট। নিশ্চয়ই মিস্‌হ্যাপ কিছু ঘটেছে, না হলে এগ্‌জামিনের টাইম—এমন ইর্‌রেগুলার তিনি হতেন না। এখন দেখছি কোর্স ফিনিস করাই ডিফিকাল্ট হবে। ফর্টনাইট পরেই টেস্ট, অথচ ব্রিটিশ পিরিয়ড্‌ এখনো টাচ্‌ করা হয়নি। হেডমাস্টারের কাছে বলে দেখি, যদি অন্য কোনো টিচার ক্লাস নেন।

৯। নিম্নের অনুচ্ছেদে বিদেশী শব্দগুলিকে পরিবর্তন করা কতটুকু সম্ভব বিচার কর :

আজ বিকালে ভারী সুন্দর হাওয়া (ফারসী) দিচ্ছে। গঙ্গার ওপারে আকাশের গায়ে কে যেন এক ছোপ্‌ লাল (আবীর) রং মাখিয়ে দিয়েছে। এপারে আমার বাগানে (তুর্কী) নারকেল গাছগুলির মাথায় সে আলো পড়ে ঝলমল করে উঠেছে। আমি বারান্দায় (পোর্তুগীজ) ইজিচেয়ারে (ইংরেজি বসে আছি—সামনে টেবিলের (ইংরেজি) উপর কাগজের (ফারসী) তাড়া, দোয়াত (ফারসী) কলম (ফারসী), কিন্তু লিখতে মন সরছেনা।

নির্দেশ :—বাংলা ভাষায় এখন অনেক বিদেশী শব্দ আছে, যাহার পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহার করা অসম্ভব। সেখানে জোর করিয়া অন্য শব্দ ব্যবহার করিলে ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। যেমন, টেবিল, কাগজ প্রভৃতি শব্দ পরিবর্তন করা যায় না, কারণ বাংলায় ইহাদের প্রতিশব্দ নাই। দোয়াত, কলম এর জন্য যথাক্রমে মস্যাধার, লেখনী প্রভৃতি সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে, কিন্তু সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষা ছাড়া এগুলির ব্যবহার চলেনা। এখানে ইজিচেয়ারকে আরামকেদারা করা চলে, কিন্তু বারান্দাকে অলিন্দ করা সঙ্গত হইবেনা। লাল রং, বাগান এই দুইটি স্থানে রক্তিমা, বা উদ্যান বসানোও এখানে অনুচিত হইবে। কারণ, অনুচ্ছেদটি বার বার পড়িয়া দেখ, ইহাতে গদ্যভঙ্গীর সহজ সাবলীল চলিত রূপটি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বর্ণ ও ধ্বনিপ্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

১। বর্ণ ও লিপি

প্রত্যেক ভাষায় কতকগুলি মূল ধ্বনি আছে। যেমন বাঙলা ভাষায় অ আ ক্ খ্ প্রভৃতি। ভাষার এই মূল ধ্বনিগুলিকে ব্যাকরণে বর্ণ বলে।

ভাষার মূল ধ্বনি বা বর্ণকে লেখায় প্রকাশ করার যে চিহ্ন তাহার নাম অক্ষর। *

২। বর্ণের শ্রেণী বিভাগ

বর্ণ দুই প্রকার—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ—যে বর্ণ অন্যবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসবায়ু মুখ দিয়া বিনা বাধায় বাহির হইয়া আসে।

বাংলায় স্বরবর্ণ ১৩টি—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, (ৠ) (ঌ), এ, ঐ, ও, ঔ।

স্বরবর্ণগুলিকে উচ্চারণের দিক হইতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—**হ্রস্ব-স্বর** ও **দীর্ঘ স্বর**। যে সকল স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাহারা হ্রস্বস্বর। হ্রস্বস্বর পাঁচটি—অ, ই, উ, ঋ, ঌ। যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণে বেশী সময় লাগে তাহারা দীর্ঘস্বর। দীর্ঘস্বর আটটি—আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ৠ, ঔ।

স্বরের উচ্চারণ সময়কে ব্যাকরণে **মাত্রা** বলে। বাংলায় হ্রস্বস্বরগুলি এক মাত্রার এবং দীর্ঘস্বরগুলি দুই মাত্রার।

ব্যঞ্জনবর্ণ—যে বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং উচ্চারিত হয়না, তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসবায়ু মুখবিবরে

---

* যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার ব্যাকরণে এই ভাবেই বর্ণ ও অক্ষরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও চেষ্টা দ্বারা উর্ধ্বে প্রেরিত বায়ু কণ্ঠাদিতে আঘাত করিলে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাহাকে বর্ণ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ধ্বনিই যে বর্ণ এবং লিপি বা অক্ষর যে বর্ণের চিত্ররূপ এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বর্ণ পরিচয় লিখিলেন, তখন বর্ণ অর্থে ভাষার অ আ ক খ প্রভৃতি ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাহাদিগকে লেখায় প্রকাশ করার চিহ্ন অক্ষরসমূহ—উভয়কেই বুঝাইয়াছেন। এই বিষয়ে হিন্দীভাষীরা আমাদের তুলনায় অনেক স্পষ্টবক্তা, তাহাদের ভাষায় alphabet বইএর নাম 'বর্ণলিপি' (বর্ণ এবং লিপি)।

অবশ্য অক্ষর শব্দ সম্পর্কেও একটু সতর্কতার প্রয়োজন আছে: কারণ ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর letter নহে, syllable.

কোথাও না কোথাও বাধা পায়, পরে স্বরবর্ণের সাহায্যে সেই বাধা অতিক্রম করে।

বাঙলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি—

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ ষ স হ
ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ँ

ক হইতে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে, কারণ এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা বা দন্ত স্পর্শ করে, বা ওষ্ঠে ও অধরে স্পর্শ হয়।

স্পর্শবর্ণগুলিকে আবার পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন—

ক খ গ ঘ ঙ	—	**ক বর্গ**	**(কণ্ঠ্য বর্ণ)**
চ ছ জ ঝ ঞ	—	**চ বর্গ**	**(তালব্য বর্ণ)**
ট ঠ ড ঢ ণ	—	**ট বর্গ**	**(মূর্ধন্য বর্ণ)**
ত থ দ ধ ন	—	**ত বর্গ**	**(দন্ত্য বর্ণ)**
প ফ ব ভ ম	—	**প বর্গ**	**(ওষ্ঠ্য বর্ণ)**

ঙ ঞ ণ ন ম অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য লাগে বলিয়া ইহারা **নাসিক্য** বা **অনুনাসিক বর্ণ**।

শ ষ স হ এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণে উষ্ম বা শ্বাসবায়ু প্রলম্বিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম **উষ্মবর্ণ**। শিস্ দেওয়ার ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাদিগকে **শিস্‌ধ্বনি**ও বলা হয়।

য র ল ব এই চারিটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে আছে বলিয়া ইহাদের নাম **অন্তঃস্থ বর্ণ**। ইহাদের মধ্যে য ব বর্ণ দুইটি **অর্দ্ধস্বর**, কারণ ইহাদের মূল উচ্চারণ ছিল য = ই + অ, ব = উ + অ।

ব্যঞ্জনবর্ণের আর দুইটি সাধারণ বিভাগও লক্ষ্যণীয়—

(১) বর্গের প্রথম, তৃতীয়, ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাস অল্প লাগে বলিয়া ইহাদের নাম অল্পপ্রাণ বর্ণ, যেমন—ক চ ট ত প, গ জ ড দ ব।

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণে উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাস বেশি লাগে বলিয়া ইহাদের নাম **মহাপ্রাণবর্ণ**। যেমন—খ ছ ঠ থ ফ ঘ ঝ ঢ ধ ভ।

(২) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং স এর উচ্চারণ গম্ভীর নয় বলিয়া ইহাদিগকে **অঘোষবর্ণ** বলে। যেমন—কখ, চছ, টঠ, তথ, পফ এবং **স**।

বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ এর উচ্চারণ গম্ভীর বলিয়া ইহাদিগকে **ঘোষবর্ণ বা নাদবর্ণ** বলে।

৩। বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্ণয়*

স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থানানুযায়ী বর্ণের নাম
অ, আ	ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ই, ঈ,	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	তালু	তালব্য
ঋ	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্দ্ধা	মূর্দ্ধণ্য
ঌ	ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য
উ, ঊ	প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য
	ব (অন্তঃস্থ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য
এ, ঐ		কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য
ও, ঔ		কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

৪। স্বরবর্ণের উচ্চারণরীতি

অ—অ-কারের উচ্চারণ দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও বিকৃত।

(১) সহজ বা স্বাভাবিক উচ্চারণ ইংরেজি ball, law, প্রভৃতির a-র মত। যেমন—জল, ফল, তনয়, অনন্ত, অপকার, অবিনাশ ইত্যাদি।

*এই আপাতঃনীরস তালিকাটি মনে রাখিবার একটা সহজ উপায় আছে। প্রথমে কণ্ঠ তালু মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ এই নাম পাঁচটি মনে রাখ। তারপর কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্থানগুলি যে পরপর সম্মুখ দিকে তাহা বুঝিয়া লও। এইবার দেখ, স্পর্শবর্ণের পাঁচটি বর্গ সেই ক্রম অনুযায়ী সাজানো আছে।

এখন দেখ, শিস্ ধ্বনিগুলি অর্থাৎ শ ষ স এর নাম হইতেই উচ্চারণ স্থান বোঝা যাইতেছে। অর্থাৎ ইহারা যথাক্রমে তালব্য বর্ণ, মূর্ধন্যবর্ণ এবং দন্ত্যবর্ণ, তারপর য র ল ব (অন্তঃস্থ w), হ এর প্রথম তিনটি বর্ণও যথাক্রমে তালব্য বর্ণ, মূর্ধন্যবর্ণ এবং দন্ত্যবর্ণ; এবং বাকি দুইটির মধ্যে ব (অন্তঃস্থ, w) দন্তৌষ্ঠ বর্ণ, এবং হ কণ্ঠ্য বর্ণ।

এখন স্বরবর্ণগুলির জোড়ায় জোড়ায় (অ আ), (ই ঈ), (উ ঊ), (এ ঐ), (ও ঔ) পাঁচটি উচ্চারণ স্থান তালিকা দেখিয়া মনে রাখ। বাকি স্বরবর্ণ ঋ ৠ উচ্চারণে র আছে, এবং ঌ উচ্চারণে ল আছে, তাই ঋ র-এর উচ্চারণ স্থান হইতে এবং ঌ ল-এর উচ্চারণ স্থান হইতে উচ্চারিত হইবে।

(২) অ-এর বিকৃত উচ্চারণ ও-এর মত। যেমন—মন (মোন), বন (বোন), অতুল (ওতুল, যখন মানুষের নাম তখন), সত্য (সোত্তো), নব্য (নোব্বো), শ্রম (শ্রোম), প্রিয় (প্রিয়ো) ইত্যাদি।

য-ফলার সহিত উচ্চারণকালে অ-এর আরো দুইপ্রকার বিকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় যেমন :

(১) য্যা-এর মত উচ্চারণ—ব্যয় (ব্যায়), ব্যথা (ব্যাথা) ;

(২) এ-এর মত উচ্চারণ—ব্যথী (ব্যেথী), ব্যক্তি (ব্যেক্তি)।

আ—দীর্ঘস্বর হইলেও বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণ হ্রস্ব। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী আ সামান্য দীর্ঘ হয়। কোনো কোনো সংস্কৃত শব্দে দীর্ঘ উচ্চারণ হয়।

আপন, কাপড়, শাসন (হ্রস্ব উচ্চারণ)

আজ্, কাল্, ভাত্ (সামান্য দীর্ঘ উচ্চারণ)

মহাভারত, অনুশাসন, (দীর্ঘ উচ্চারণ)

ই ঈ—বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ পার্থক্য নাই। তবে কোন কথায় জোর দিবার জন্য ই-র দীর্ঘ উচ্চারণ হয়।

সে কি পড়ে ? (সাধারণ প্রশ্ন)

সে কী পড়ে ? (বিষয়ের উপর জোর) কী যে আনন্দ হল ! (আনন্দের আতিশয্য)

উ, ঊ—বাংলা উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ নাই।

ঋ—বাংলায় রি-এর মত উচ্চারণ হয়। যেমন—ঋণ (রীণ), ঋষি (রিশি), অমৃতি (অম্রিতি)

ৠ ঌ—বাংলায় ব্যবহার নাই।

এ—বাংলায় দুই প্রকার উচ্চারণ—সহজ ও বিকৃত।

(১) সহজ উচ্চারণ—কেশ, বেশ, আসে, বলে, দেশী ইত্যাদি।

(২) বিকৃত উচ্চারণ—ইংরেজি cat, man প্রভৃতির a-র মতন। যেমন—এক (অ্যাক), দেখা (দ্যাখা), খেলা (খ্যালা), পেঁচা (প্যাঁচা) ইত্যাদি।

ঐ ঔ—এই দুইটি বাংলায় যৌগিক স্বর। ইহাদিগকে সন্ধ্যক্ষরও (dipthong) বলে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে দুইটি স্বরধ্বনি আছে। ঐ = অ + ই, ঔ = অ + উ। উচ্চারণ কালে ঐ এবং ঔর মধ্যস্থিত অ ওএর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—সৈনিক (সোইনিক), বৈধ (বোইধ), কৌরব, (কোউরব), গৌরব (গোউরব)

ও—বাংলায় দীর্ঘ উচ্চারণ নাই।

৫। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ রীতি

ঙ—ইহা কণ্ঠ্য-নাসিক্য ধ্বনি ; উচ্চারণ অনেকটা ং বা ng র মত। যেমন—রঙ্, বেঙ্, ঝিঙা।

ঞ—ইহা তালব্য-নাসিক্য ধ্বনি ; উচ্চারণ অনেকটা ইঁঅএর মত। যেমন—মিঞা।

চ ছ—বর্ণের পূর্বে যুক্ত হইলে ন এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—অঞ্চল, অঞ্জন, উঞ্ছ, ঝঞ্ঝা।

বর্গীয় **জ**-এর পরে সংযুক্ত হইলে গ্‌গঁ, গ্যঁ-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—বিজ্ঞ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান।

ণ ন—এই দুইটি যথাক্রমে মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য নাসিক্য ধ্বনি। কিন্তু বাংলায় দুইটিরই দন্ত্য উচ্চারণ হয়।

য (য়)—সংস্কৃতে য = ই + অ (দ্রুত উচ্চারিত) ; এইজন্য ইহাকে অর্দ্ধস্বরও বলা হয়। বাংলায় এই উচ্চারণ বজায় নাই ; বাংলায় য জ-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—যাদু, যখন, যদি ইত্যাদি।

বাংলায় জ উচ্চারণ হইতে ব এর উচ্চারণের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য য বর্ণ ব্যবহৃত হয়। এই বর্ণ সংস্কৃতে নাই, ইহা বাংলায় নূতন সৃষ্টি। যেমন—নয়ন, বয়ন, ভয়, জয় ইত্যাদি।

য য-ফলা রূপে ব্যবহৃত হইলে য-ফলাযুক্ত বর্ণটি দ্বিত্বের মত উচ্চারিত হয়। যেমন—সত্য (সোত্ত), গদ্য (গোদ্দ)। এই য-ফলা শব্দের আদি অক্ষরে হইলে য এর উচ্চারণ কিছুটা ইঅ-বৎ থাকে। যেমন—ন্যায়, ত্যাগ, ব্যসন।

র—জিহ্বাগ্র কম্পিত করিয়া দন্তমূলে আঘাত করিয়া ইহার উচ্চারণ হয়। এইজন্য ইহাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়।

র ব্যঞ্জন বর্ণের পরে যুক্ত হইলে র-ফলা হয় ; এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে যুক্ত হইলে রেফ হয়। র-ফলার উচ্চারণ কঠিন এবং রেফের উচ্চারণ শিথিল।

ল—জিহ্বাগ্র দন্তমূলে লাগাইয়া দুইপাশ দিয়া বায়ু বাহির করিয়া ইহার উচ্চারণ হয়। এইজন্য ইহাকে পার্শ্বিক বর্ণ বলা হয়।

ব (বর্গীয়), ব (অন্তঃস্থ)—বাংলা উচ্চারণে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ নাই।

সংস্কৃতে বর্গীয় ব এর উচ্চারণ ব এর মত, এবং অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ উঅ (w) এর মত ছিল।

ব-ফলার উচ্চারণ বাংলায় নাই। ইহা ব্যঞ্জনের উচ্চারণকে দ্বিত্ব করে। যেমন—পক্ক (পক্‌ক), বিশ্ব (বিশ্‌শ) ইত্যাদি। তবে আজকাল সাধু উচ্চারণে কোনো কোনো শব্দে ব-ফলার ওঅ (w) উচ্চারণ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। যেমন—আহ্বান, জিহ্বা, বিহ্বল ইত্যাদি।

শ ষ স—উষ্মবর্ণের এই তিনটি শিস্‌ধ্বনি যথাক্রমে তালু, মূর্ধা ও দন্ত হইতে উচ্চারিত। কিন্তু বাংলায় এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণে কোনো প্রভেদ নাই। এখানে সব কয়টি শিস্‌ধ্বনিই তালব্য শ এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—সাধু, শেষ, ইত্যাদি।

তবে, সংযুক্ত বর্ণে শ স দুই স্থানেই স-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন—শৃগাল, শ্রীপতি, ব্যস্ত, সৃষ্টি ইত্যাদি।

হ—কণ্ঠজাত মহাপ্রাণ উষ্ম ঘোষবর্ণ। য-ফলার সহিত যুক্ত হইলে জ্‌ঝ-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—বাহ্য, সহ্য, ঐতিহ্য ইত্যাদি।

ড ঢ ড় ঢ়—ড় ঢ় বর্ণ দুইটি সংস্কৃতে নাই। সংস্কৃতে শুধু ড ঢ আছে। বাংলায় ড ঢ শব্দের মধ্যে বা অন্তে থাকিলে ড় ঢ় রূপে উচ্চারিত হয়। এবং এই উচ্চারণ দেখাইবার জন্য বাংলায় এই অতিরিক্ত বর্ণ দুইটি সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন—শব্দের প্রথমে ডিম, ঢাক, ঢাল, ডমরু ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে ও অন্তে ঢেঁড়স, দাড়িম্ব, আষাঢ়, অড়হর ইত্যাদি।

ং—উচ্চারণ ঙ-এর ন্যায়।

ঃ—ইহা হ-এর শিথিল বা অঘোষ ধ্বনি। সর্বত্রই অন্য বর্ণের পরে থাকে। বাংলায় শব্দের অন্তে ইহার স্পষ্ট উচ্চারণ বড় একটা হয় না। যেমন—মনঃ, পুনঃ, ক্রমশঃ ইত্যাদি।

কিন্তু অব্যয়গুলিতে ইহার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট হয়। যেমন—উঃ, আঃ ইত্যাদি।

পদের মধ্যে থাকিলে ইহা পরবর্তী বর্ণকে দ্বিত্ব করে। যেমন—দুঃখ (দুক্‌খ), নিঃশ্বাস (নিশ্‌শ্বাস) ইত্যাদি।

ঁ—বর্ণের উচ্চারণ অনুনাসিক করিয়া দেয়। যেমন—চাঁদ, কাঁদা, ইঁদুর, হাঁ।

৬। সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণরীতি

সংস্কৃতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি বর্ণই পরপর স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাংলায় কোনো কোনো সংযুক্তবর্ণের সকল বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। ইহা বাংলা উচ্চারণ রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেমন—'লক্ষ্মী' শব্দটি সংস্কৃতে বা হিন্দীতে 'লক্‌ষ্‌মী' রূপে উচ্চারিত হইবে, কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ হইবে লক্‌খী (লোক্‌খী)। এইরূপ 'আত্মা' 'পদ্ম' সংস্কৃতে বা হিন্দীতে উচ্চারিত হইবে 'আত্‌মা', 'পদ্‌ম', কিন্তু বাংলায় ইহাদের উচ্চারণ 'আত্‌তাঁ', 'পদ্‌দঁ'।

নীচে বাংলায় কয়েকটি সংযুক্তবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য দেখানো হইল—

(১) **য-ফলা, ব-ফলা**—শব্দের প্রথমে য ব ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসিলে ইহাদের ইঅ, ওয উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন—ব্যয়, ত্যাগ, স্বামী ইত্যাদি।

কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে য-ফলা ব-ফলা পূর্ব ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে। যেমন—ভাগ্য = ভাগ্‌গ, সত্য = সত্‌ত, পথ্য = পথ্‌থ', গণ্য = গন্‌ন, ইত্যাদি। এবং পক্ব = পক্‌ক, অশ্ব = অশ্‌শ, হ্রস্ব = হ্রস্‌স, বিল্ব = বিল্‌ল ইত্যাদি।

(২) **ক্ষ (ক্‌ষ)—যুক্ত** ক্‌ষ বা ক্ষ শব্দের আদিতে প্রায় খ এর মত উচ্চারিত হয়; কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে ইহার উচ্চারণ ক্‌খ এর মত হয়। যেমন—শব্দের প্রথমে ক্ষুধা = খুধা, ক্ষুর = খুর, ক্ষীর = খীর ইত্যাদি। কিন্তু অন্যত্র বক্ষ···বক্‌খ, রক্ষা = রক্‌খা, পক্ষী = পক্‌খী, সক্ষম = সক্‌খম ইত্যাদি।

(৩) **ম-ফলা**—ম ফলা পূর্ব ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিয়া তাহাকে অনুনাসিক করে। যেমন—আত্মা = আত্‌তাঁ, (অনুনাসিক আছে); পদ্ম = পদ্‌দঁ (অনুনাসিক প্রায় নাই); ছদ্ম = ছদ্‌দ (অনুনাসিক নাই)।

ক্ষ-এর পর ম ফলা থাকিলে অনুনাসিক হয় না। যেমন—লক্ষ্মী·· লক্‌খী।

(৪) **জ্ঞ (জ্‌ঞ্‌)**—শব্দের মধ্যে জ্‌ ঞ্‌ এর উচ্চারণ গ্‌ গঁ্‌ এর মত হয়। যেমন—বিজ্ঞ = বিগগঁ্‌, যজ্ঞ = যগ্‌গঁ, প্রজ্ঞা = প্রগ্‌গঁ, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের প্রথমে হইলে জ্‌ ঞ্‌ এর উচ্চারণ গ্য এর মত হয়। যেমন—জ্ঞান = গ্যাঁন, জ্ঞাতি = গ্যাঁতি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

(ক)

১। বর্ণ কাহাকে বলে?

২। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল।

৩। মাত্রা কাহাকে বলে? হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর কি?

৪। স্পর্শবর্ণ কাহাকে বলে? উহাদের নাম স্পর্শবর্ণ কেন? স্পর্শ-বর্ণের বর্গীয় বিভাগ দেখাও; এবং বর্গানুসারে উহাদের উচ্চারণ স্থান বল।

৫। সংজ্ঞা বল ও উদাহরণ দাও—অন্তঃস্থ বর্ণ, উষ্মবর্ণ।

৬। কোন বর্ণগুলি শিস্‌ধ্বনি? উহাদিগকে শিস্‌ধ্বনি বলে কেন?

৭। অনুনাসিক বর্ণ কি? ঁ কে কি বর্ণ বলিবে? উহার উচ্চারণ কিরূপ?

৮। ঘোষ বর্ণ ও অঘোষ বর্ণ, অল্পপ্রাণ বর্ণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ কোন্‌গুলি?

৯। অর্ধস্বর কাহাকে বলে? উহাদের ঐ নাম কেন?

১০। উচ্চারণ স্থান অনুসারে ক্রমবদ্ধ করিয়া বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

১৭পৃষ্ঠায় দেওয়া তালিকাটি এবং তাহার পাদটীকাটি দেখ। প্রথমে স্পর্শবর্ণগুলির বর্গ অনুযায়ী উচ্চারণ স্থান লেখ। ইহার পর য র ল ব (অন্তঃস্থ বর্ণগুলি) বসাও। তারপর শ ষ স হ (উষ্মবর্ণগুলি) সাজাইয়া যাও। তারপর বাকী রহিল মাত্র স্বরবর্ণগুলি,—এখন স্বরবর্ণগুলি জোড়ায় জোড়ায় বসাইয়া যাও।

(খ)

১১। উচ্চারণ স্থান বল—থ, ঙ, দ, চ, ট, শ, ম, ঢ, হ, ঋ, ঌ, ঐ।

১২। নিম্নের বর্ণগুলির বাংলা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর:

অ, এ

১৩। বাংলায় যুগ্মস্বর কোন্‌গুলি? ইহাদের উচ্চারণ কিরূপ?

১৪। নিম্নলিখিত বর্ণগুলির বাংলা উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে মন্তব্য কর:

ঙ, ঞ, ং,

১৫। বাংলায় ড ঢ ড় ঢ় বর্ণের উচ্চারণ কিরূপ?

১৬। বাংলায় য বর্ণ এবং ব বর্ণের উচ্চারণ আলোচনা কর।

১৭। বাংলায় সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছ বল। এই প্রসঙ্গে য-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ রীতির আলোচনা কর।

১৮। নিম্নোক্ত শব্দগুলির বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে মন্তব্য লেখ—

যক্ষ, লক্ষ্য, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম।

১৯। নীচের শব্দগুলির বাংলা উচ্চারণ কিরূপ হইবে বল—

আত্মা, পদ্ম, ছদ্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উচ্চারণে ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি

(১) **প্রস্বর বা স্বরাঘাত** (**Stress**)—উচ্চারণের সময় শব্দের কোনো একটি বিশেষ অক্ষরের উপর নিঃশ্বাস বায়ু জোরে পতিত হইলে তাহাকে প্রস্বর বা স্বরাঘাত বলে। বাংলা উচ্চারণে শব্দের প্রথম অক্ষরের (**syllable**) উপর ঝোঁক পড়া একটি বিশেষত্ব। যেমন—র্জল্, র্ফল, র্পাগল, ইত্যাদি।

(২) **দ্বিমাত্রিকতা**। স্বরাঘাতের ফলে শব্দের অন্য অংশটুকু স্বভাবতঃই একটু সংকুচিত হইয়া পড়ে। এইভাবে তিন চার মাত্রার শব্দগুলি ছোট হইয়া দুই মাত্রায় উচ্চারিত হয়। বাংলা উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্যটির নাম দ্বিমাত্রিকতা। যেমন—পাগল (র্পা-গল্), পাগলী (র্পাগ্-লী), চলিত (র্চ-লিত্), চলতি (র্চল্তি)।

(৩) **বর্ণলোপ**—স্বরাঘাতের ফলে শব্দে একটি অক্ষর উচ্চারণে প্রাধান্য লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য অক্ষরগুলি দুর্বল হইয়া যায় ; কখনও কখনও দুর্বল অক্ষরগুলি লোপও হয়। বাংলা উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্যটির নাম বর্ণলোপ। যেমন—

অ-ধ্বনির লোপ—ফল্, জল্, টল্মল্, দশরথ্।

আ-ধ্বনির লোপ—কাঁচাকলা > কাঁচ্কলা ; বোকাচন্দ্র > বোক্চন্দ্র।

ই-ধ্বনির লোপ—মিশিকালো > মিশ্কালো, নাতিনী > নাত্নী, নারিকেল > নার্কেল।

ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ—স্ফটিক > ফটিক, লৌকিকতা > নকুতো, পরিষ্কার > পোস্কের, মজদুর > মজুর।

(৪) **অক্ষর (Syllable) লোপ**—বর্ণলোপে যেমন স্বরাঘাতের ফলে একটি বর্ণের লোপ হয় অক্ষর লোপে তেমনি কয়েকটি বর্ণের একটা গোটা অক্ষর বা syllable লোপ হইয়া যায়। যেমন—পিসিশাশুড়ী > পিসিশাশ্ > পিস্শাস্ > পিসাশ্ ; আটমাসিয়া > আটাসিয়া > আটাসে ;

(৫) **আগম, বর্ণাগম**—অর্থের কোনো পরিবর্তন না ঘটাইয়া শব্দ মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো বর্ণের আবির্ভাবকে আগম বলে।

শব্দের আদিতে যুক্তবর্ণের উচ্চারণকে সহজ করিবার জন্য স্বরবর্ণের আগমকে **পূর্বাগম** বলে। যেমন—স্টিমার>ইস্টিমার, স্কুল>ইস্কুল, স্পর্ধা>আস্পর্ধা।

উচ্চারণের সুবিধার জন্যই শব্দের মধ্যে বর্ণ বিশেষের আগমকে **মধ্যাগম** বলে। যেমন—অম্ল>অম্বল (ব আগম), general>জাঁদরেল (দ আগম)।

শব্দের শেষে যুক্তবর্ণের উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য স্বরবর্ণের আগমকে **অন্ত্যাগম** বলে। যেমন—ইঞ্চ (inch) ইঞ্চি, বেঞ্চ (bench)>বেঞ্চি, ফিস্ট (feast)>ফিস্টি।

(৬) **স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ**—উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি ঢুকাইয়া যুক্ত ব্যঞ্জনকে পৃথক করিয়া লওয়ার নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। যেমন—স্নান>সিনান, গ্লাস>গেলাস, ভ্রু>ভুরু, গর্ব>গরব ইত্যাদি।

(৭) **বর্ণ বিপর্যয়**—উচ্চারণের দোষে অনেক সময় দুইটি পাশপাশি বর্ণের স্থান বিনিময় ঘটে। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের নাম বর্ণ বিপর্যয়। যেমন—বাক্স>বাস্ক ; পিশাচ>পিচাশ ; রিক্শ>রিস্ক ; tax>টেস্ক ইত্যাদি।

(৮) **সমীভবন, সমীকরণ, সমবর্ণতা**—ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকিলে অনেক সময উচ্চারণে তাহাদিগকে একরূপ করিয়া লওয়া হয়। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে সমীভবন বা সমীকরণ বলে। যেমন—ডাক+ঘর= ডাগ্ঘর, পাঁচ+জন=পাঁজ্জন, গল্প=গপ্প, ধরতে=ধত্তে, কর্ম=কম্ম।

(৯) **অসমীভবন, অসমীকরণ, অসমবর্ণতা**—শব্দের একরূপ ব্যঞ্জন বার বার থাকিলে অনেক সময় তাহাকে অন্যরূপ ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত করা হয়। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে অসমীভবন বা অসমীকরণ বলে। যেমন—শরীর= শরীল, যমজ=যমক।

(১০) **স্বরসঙ্গতি**—স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিভ যেমন সামনে পিছনে চলাচল করে তেমনি উপরে নীচেও উঠানামা করে। একই শব্দে ভিন্ন প্রকৃতির স্বরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া জিভ তাহার শ্রমলাঘবের চেষ্টা করিলে স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন—পূজা>পূজো, এখানে উ উচ্চারণ করিতে জিভ মুখের উপরের দিকে থাকে ; আ উচ্চারণ করিতে জিভ একেবারে নীচে নামিয়া আসে ; কিন্তু ও উচ্চারণ করিতে জিভ উপরেও না, নীচেও না, মাঝামাঝি থাকে। তাই 'পূজা' উচ্চারণ করিতে জিভের যে উঠানামা করিতে হয় 'পূজো' উচ্চারণ করিতে ততটা হয় না। এই জন্য 'পূজা' শব্দটিকে জিভ

সহজ ভাবেই 'পুজো' করিয়া নিল। এইরূপ আরো উদাহরণ যেমন—হুঁকা> হুঁকো, দেশী>দিশী, ছিলাম>ছিলেম, ইচ্ছা>ইচ্ছে, ইত্যাদি।

(১১) **অপিনিহিতি**—শব্দের ই বা উ ধ্বনি নির্দিষ্ট স্থানের পূর্বে উচ্চারণ হইয়া যাওয়ার নাম অপিনিহিতি। যেমন—করিয়া>কইরা, আজি> আইজ, সত্য>সইত্ত, কাব্য>কাইব্ব ইত্যাদি। পূর্বে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের ভাষায়ই অপিনিহিতি ছিল, এখন বিশেষ করিয়া তাহা পূর্ববঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(১২) **অভিশ্রুতি**—অপিনিহিতির ই বা উ অন্য বর্ণের সহিত স্বরসঙ্গতি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন—করিয়া>কইরা>কোরে; গাছুয়া>গাউছা>গেছো; শহরিয়া>শহইরা>শহুরে ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। স্বরাঘাত কাহাকে বলে? উদাহরণ সহ বুঝাও।

২। দ্বিমাত্রিকতা ও বর্ণলোপের উদাহরণ দাও। ইহারা উভয়ই যে স্বরাঘাতের ফল তাহা বুঝাইতে পার কি?

৩। বর্ণলোপ ও অক্ষরলোপে পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও।

৪। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও—সমীভবন, অসমীভবন।

৫। বর্ণাগম কি? পূর্বাগম, মধ্যাগম ও অন্ত্যাগমের দৃষ্টান্ত দাও।

৬। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর:—

বিপ্রকর্ষ, বর্ণপরিচয়।

৭। (ক) অপিনিহিত কাহাকে বলে? অপিনিহিতি কোন অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য?

(খ) স্বরসঙ্গতি কাহাকে বলে? স্বরসঙ্গতি কোন অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য?

৮। স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতিতে পার্থক্য কি?

তৃতীয় অধ্যায়

সন্ধি

কোনো শব্দের শেষে বর্ণের সহিত পরবর্তী পদের প্রথম বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধিতে কখনো দুইটি বর্ণ মিলিয়া এক হইয়া যায়, আবার কখনো একটির ধ্বনি অপরটিকে বদলাইয়া দেয়। যথা—মহা+আশয়=মহাশয় (দুইটি বর্ণ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে); নদী+অম্বু=নদ্যম্বু (একটির প্রভাবে অপরটি বদলাইয়া গিয়াছে)।

সন্ধি তিন প্রকার—

স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি তাহা **স্বরসন্ধি**, স্বরে ব্যঞ্জনে বা ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যে সন্ধি তাহা **ব্যঞ্জনসন্ধি** এবং বিসর্গের সহিত স্বর বা ব্যঞ্জনের যে সন্ধি তাহা **বিসর্গসন্ধি**। যেমন—বিবেক+আনন্দ=বিবেকানন্দ (স্বরসন্ধি), শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র (ব্যঞ্জনসন্ধি), মনঃ+তাপ=মনস্তাপ (বিসর্গসন্ধি)।

বাংলা সন্ধি

বাংলা ভাষায় যে সন্ধি আছে তাহা প্রায়ই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের। সংস্কৃত শব্দের সহিত বাংলা অর্থাৎ তদ্ভবাদি শব্দের সন্ধি হয় না। যেমন—মিষ্ট এবং অন্ন দুইটি সংস্কৃত শব্দ—ইহাদের সন্ধি করিয়া বাংলায় মিষ্টান্ন হইতে পারে, কিন্তু তদ্ভব মিঠা শব্দের সহিত সংস্কৃত অন্ন যোগ করিয়া 'মিঠান্ন' হইবে না।

এইরূপ বিদেশী শব্দগুলির সহিতও বাংলায় সন্ধি বড় একটা হয় না। যেমন—ভাল+উকিল=ভালোকিল, জজ+আদালত=জজাদালত, এই সব সন্ধি বাংলায় হয় না। কিন্তু পোষ্টাফিস, ইংলণ্ডেশ্বরী এই সব শব্দের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অনেকে বলিতে চান, বাংলা ভাষায় আসলে কোন সন্ধিই নাই। কারণ খাঁটি বাংলা শব্দের মধ্যে সংস্কৃত নিয়মে সন্ধি প্রায়ই হয় না। গোল+আলু=গোলালু বা তুমি+এখানে=তুম্যেখানে এই সব সন্ধি বাংলায় অচল।

তবে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী বাংলায়ও সন্ধি আছে বলা চলে। এইসব সন্ধি এখন পর্যন্ত লেখায় বড় একটা দেখানো হয় না। লিখিবার কালে মোটামুটি সংস্কৃত সন্ধিগুলিই বাংলায় দেখানো হইয়া থাকে। খাঁটি বাংলা সন্ধির প্রধান নিয়ম মাত্র তিনটি বা চারিটি।

(১) পাশাপাশি ব্যঞ্জনবর্ণের আগেকার ব্যঞ্জনটি পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়। যেমন—বদ্ + জাত = বজ্জাত, যত + দিন = যদ্দিন, ডাক + ঘর ডাগ্ঘর (ক ঘোষবর্ণ গয়ে রূপান্তরিত হইয়া ঘ এর সহিত সমবর্ণতা লাভ করিল), বট + গাছ = বড্গাছ, পাঁচ + সিকে = পাঁস্সিকে।

(২) **লোপের দৃষ্টান্ত ঃ** (ক) দুইটি সন্নিহিত শব্দের প্রথমটির অন্ত্যস্বর লোপ হয়। বোকা + চন্দ্র = বোক্চন্দ্র, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়্দৌড়, মিশি + কালো = মিশ্কালো।

(খ) সন্নিহিত দুইটি শব্দের পরেরটির আদ্যস্বর লোপ হয়। যেমন—ছেলে + আমি = ছেলেমি, ভাল + এর = ভালর, যা + ইচ্ছে তাই = যাচ্ছেতাই।

(গ) কখনো কখনো সন্নিহিত ব্যঞ্জন বর্ণও লোপ হয়। যেমন—মুখ্ + খানি = মুখানি, জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু

(৩) পাশাপাশি হসন্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণটি হসন্তবর্ণের সঙ্গে মিশিয়া যায়। যেমন—তিল (ল্) + এক = তিলেক, বার (র্) + এক = বারেক, জন (ন্) + এক = জনেক ইত্যাদি।

(৪) সংস্কৃত বিসর্গান্ত শব্দকে বাংলায় অকারান্ত ধরিয়া ঐ নিয়মেই সন্ধি হয়। যেমন—মন + আগুন = মনাগুন, বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি, যশ + আকাঙ্ক্ষা = যশাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

সংস্কৃতধরণের সন্ধি

[স্বরসন্ধি]

১। সবর্ণে সবর্ণে দীর্ঘ।

নর + অধম = নরাধম। হিম + আলয় = হিমালয়।
আশা + অতীত = আশাতীত। মহা + আশয় = মহাশয়।
মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র। প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা।
কটু + উক্তি = কটূক্তি। লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি।

২। অ বর্ণে ই বর্ণে এ।

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র। মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র।
দেব + ঈশ = দেবেশ। মহা + ঈশ = মহেশ।

৩। অ বর্ণে উ বর্ণে ও।

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়। যথা + উচিত = যথোচিত।
মহা + উৎসব = মহোৎসব। নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া।

৪। অ বর্ণে ঋ কারে অর্।

দেব + ঋষি = দেবর্ষি উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ

অধম + ঋণ = অধমর্ণ মহা + ঋষি = মহর্ষি

অ বর্ণের পর ঋত শব্দ থাকিলে ঋ স্থানে অর্ না হইয়া আর্ হয়। যেমন—

শীত + ঋত = শীতার্ত। হিম + ঋত = হিমার্ত।

ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

৫। (ক) অ বর্ণ পরে এ ঐ = ঐ (খ) অ বর্ণ পরে ও ঔ = ঔ

জন + এক = জনৈক জল + ওকা = জলৌকা

তথা + এব = তথৈব মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

হিত + ঐষী = হিতৈষী চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য

মহা + ঐশ্বর্য্য = মহৈশ্বর্য মহা + ওষধি = মহৌষধি

৬। ই বর্ণ পরে অন্য বর্ণে ই য্ :

অতি + অন্ত = অত্যন্ত পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত উপরি + উপরি = উপর্যুপরি

অতি + আচার = অত্যাচার অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ

প্রতি + উষ = প্রত্যুষ।

৭। উ বর্ণ পরে অন্য বর্ণে উ ব্।

মনু + অন্তর = মন্বন্তর সু + অল্প = স্বল্প

সু + আগত = স্বাগত অনু + অয় = অন্বয়

অনু + এষণ = অন্বেষণ। পশু + অধম = পশ্বধম

পশু + আদি = পশ্বাদি

৮। ঋ বর্ণ পরে অন্য বর্ণে ঋ র্।

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয় মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ।

৯। (ক) এ কারের পর স্বরবর্ণে এ অয়্। (খ) ঐ কারের পর স্বরবর্ণে ঐ আয়্।

(গ) ও কারের পর স্বরবর্ণে ও অব্। (ঘ) ঔ কারের পর স্বরবর্ণে ঔ আব্।

শে + অন = শয়ন নে + অন = নয়ন

নৈ + অক = নায়ক গৈ + অক = গায়ক

পো + অন = পবন ভো + অন = ভবন

পৌ + অক = পাবক নৌ + ইক = নাবিক

[ব্যঞ্জনসন্ধি]

ক। প্রথম বর্ণের তৃতীয় বর্ণে পরিবর্তন

১। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ বা য, র, ল, ব, হ পরে থাকে তবে বর্গের **প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।**

ক্ স্থানে গ্

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, বাক্ + ঈশ = বাগীশ,
দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ, বাক্ + জাল = বাগ্‌জাল,
বাক্ + দান = বাগ্দান, বাক্ + লোপ = বাগ্‌লোপ

চ্ স্থানে জ্

অচ্ + অন্ত = অজন্ত ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত

ট্ স্থানে ড

ষট্ + আনন = ষডানন ষট্ + বর্গ = ষড়্‌বর্গ ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

ত্ স্থানে দ্

জগৎ + ঈশ = জগদীশ সৎ + উপায় = সদুপায়
উৎ + যম = উদ্যম বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত

প্ স্থানে ব্

অপ্ + জ = অব্জ অপ্ + দ = অব্দ অপ্ + ধি = অব্ধি

(অবশ্য ত্ এর সন্ধি হইবার সময় এই নিয়ম সব জায়গায় খাটে না। যেমন— জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি (জগদ্‌জ্যোতি নয়); উৎ + ডয়ন = উড্ডয়ন (উদ্‌ডয়ন নয়) উৎ + লাস = উল্লাস (উদ্‌লাস নয়); উৎ + হার = উদ্ধার (উদ্‌হার নয়)। ত্ দ্ বর্ণের অন্য বর্ণে পরিবর্তনের সূত্রে এই সন্ধিগুলির ব্যাখ্যা আছে।)

খ। ত্ দ্ বর্ণের অন্য বর্ণে পরিবর্তন

২। চ্ ছ্ পরে থাকিলে ত্ দ্ স্থানে চ্ হয়, জ্ ঝ্ পরে থাকিলে ত্ দ্ স্থানে জ্ হয়, ট্ ঠ্ পরে থাকিলে ত্ দ্ স্থানে ট্ হয়, ড্ ঢ্ পরে থাকিলে ত্ দ্ স্থানে ড্ হয়।

ত্ দ্ স্থানে চ্

শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র
বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয় **প্রতিপদ্ + চন্দ্র = প্রতিপচ্চন্দ্র**
উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন **বিদ্যুৎ + ছবি = বিদ্যুচ্ছবি**
তদ্ + ছবি = তচ্ছবি **তদ্ + ছায়া = তচ্ছায়া**

ত্, দ্ স্থানে জ্

উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল　　　　সৎ + জন = সজ্জন

বিপদ + জাল = বিপজ্জাল　　　　তৎ + জন্য = তজ্জন্য

কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা　　　　বৃহৎ + ঝঙ্কার = বৃহঝঙ্কার

ত্, দ্ স্থানে ট্

বৃহৎ + টঙ্কার = বৃহট্টঙ্কার　　　　তদ্ + টীকা = তট্টীকা

মহৎ + ঠকুর = মহট্ ঠকুর

ত্, দ্ স্থানে ড্

উৎ + ডীন = উড্ডীন　　　　বৃহৎ + ঢাল = বৃহড্ ঢাল

বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ ঢক্কা

৩। ত্, দ্ এর পরে ল থাকিলে উভয়ে মিলিযা ল্ল হয়, ত্, দ্ এর পরে শ থাকিলে উভয়ে মিলিযা চ্ছ হয়, ত্, দ্ এর পরে হ্ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়।

ত্, দ্ + ল = ল্ল

উৎ + লসিত = উল্লসিত,　　　　বিদ্যুৎ + লেখা = বিদ্যুল্লেখা

সম্পদ + লাভ = সম্পল্লাভ

ত্, দ্ + শ = চ্ছ

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল　　　　উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি　　　　তদ্ + শ্রবণ = তচ্ছ্রবণ

ত্, দ্ + হ = দ্ধ

উৎ + হত = উদ্ধত　　　　ঈষৎ + হাস্য = ঈষদ্ধাস্য

জগৎ + হিতায় = জগদ্ধিতায়　　　　উৎ + হৃৎ = উদ্ধৃত

গ। অনুনাসিক বর্ণযোগে পরিবর্তন

৪। ন্ বা ম্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়।

ক্ স্থানে ঙ্, ট্ স্থানে ণ, ত্ স্থানে ন্

দিক্ + নাগ = দিঙ্ নাগ　　　　দিক্ + মণ্ডল = দিঙমণ্ডল

ষট্ + নবতি = ষন্নবতি　　　　ষট্ + মাস = ষন্মাস

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ　　　　তৎ + মধ্য = তন্মধ্য

(ন্ বা ম্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণও হইতে পারে। এইরূপে দিগ্ নাগ, ষড়্ মাস, তদ্‌মধ্য প্রভৃতিও শুদ্ধ।)

কিন্তু, ময় বা মাত্র পরে থাকিলে প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয় না। সেইজন্য বাগ্‌ময় হইবে না, শুধু বাঙময় হইবে, কিঞ্চিদ্‌মাত্র হইবে না, শুধু কিঞ্চিন্মাত্র হইবে।)

৫। স্পর্শ, অন্তঃস্থ বা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে অনুস্বার হয়।

সম্‌+কীর্ণ=সংকীর্ণ সম্‌+গীত=সংগীত

সম্‌+বাদ=সংবাদ সম্‌+শয়=সংশয়

সর্বম্‌+সহা=সর্বংসহা

(স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে স্পর্শবর্ণ যে বর্গের সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণও হয়। যেমন—সম্‌+কীর্ণ=সংকীর্ণ অথবা সঙ্কীর্ণ, সম্‌+গীত= সংগীত অথবা সঙ্গীত।

কিন্তু, সম্ শব্দের পর রাজ্ শব্দ থাকিলে ম্ স্থানে অনুস্বার হয় না। যেমন—সম+রাজ=সম্রাজ্ হইবে, সংরাজ হইবে না।)

৬। চ্ বা জ্-এর পর ন্ থাকিলে ন্ স্থানে ঞ হয়।

যাচ্‌+না=যাচ্ঞা যজ্‌+ন=যজ্ঞ

রাজ+নী=রাজ্ঞী

ঘ। ছ্ ও ষ্ বর্ণযোগে পরিবর্তন

৭। স্বরবর্ণের পর ছ্ থাকিলে ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়।

বট+ছায়া=বটচ্ছায়া তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া

বি+ছেদ=বিচ্ছেদ পরি+ছদ=পরিচ্ছদ

৮। মূর্ধন্য ষ্-এর পরের ত্ স্থানে ট, থ্ স্থানে ঠ্ হয়।

আকৃষ+ত=আকৃষ্ট, — ষষ্‌+থ=ষষ্ঠ

[বিসর্গসন্ধি]

ক। বিসর্গস্থানে শ্ ষ্ স্

১। চ ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ্, ট্ ঠ্ পরে থাকিলে ষ্ এবং ত থ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্ হয়।

নিঃ+চয়=নিশ্চয় শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ

ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার নিঃ+ঠুর=নিষ্ঠুর

ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ মনঃ+তাপ=মনস্তাপ

খ। বিসর্গ স্থানে র্, র্ লোপ

২। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণে যুক্ত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ থাকিলে বা বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

নিঃ+অবধি=নিরবধি নিঃ+আকার=নিরাকার

দুঃ+আত্মা=দুরাত্মা চক্ষুঃ+উন্মীলন=চক্ষুরুন্মীলন

নিঃ + গত = নির্গত　　　　নিঃ + ঝর = নির্ঝর

নিঃ + মল = নির্মল　　　　দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

৩। র্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র্ হয় তাহা লোপ পায়, এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়।

নিঃ + রস = নির্রস = নীরস,

চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুর্রোগ = চক্ষূরোগ

৪। অকারের পর র্ জাত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

পুনঃ + অপি = পুনরপি　　　　অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ　　　　অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম　　　　প্রাতঃ + ভোজন = প্রাতর্ভোজন

অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী　　　　অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত

গ। বিসর্গস্থানে ও, অকার লোপ, বিসর্গলোপ

৫। অ-কারের পরে স্ জাত বিসর্গের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ থাকিলে বিসর্গস্থানে ও কার হয়।

অধঃ + গতি = অধোগতি　　　　সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত

অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়　　　　মনঃ + যোগ = মনোযোগ

মনঃ + রম = মনোরম　　　　যশঃ + লাভ = যশোলাভ

৬। অ পরে থাকিলে বিসর্গস্থানে ও হয় এবং পরের অ লোপ পাইয়া যায়।*

ততঃ + অধিক = ততোধিক　　　　বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক

৭। অ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বিসর্গ লোপ পাইয়া যায়।‡

অতঃ + এব = অতএব,　　　　শিরঃ + উপরি = শিরউপরি

ঘ। ক্ খ্ প্ ফ্ সহ সন্ধি

৮। অ-কার বা আ-কারের পরে স্ জাত বিসর্গের পর যদি ক্ খ্ প্ ফ্ থাকে তবে বিসর্গস্থানে স্ হয়।

নমঃ + কার = নমস্কার　　　　পুরঃ + কার = পুরস্কার

ভাঃ + কর = ভাস্কর　　　　বাচঃ + পতি = বাচস্পতি

* সংস্কৃতে লিখিবার কালে লুপ্ত অ-কার দেখানো হয়, বাংলায় দেখানো হয় না।

‡ বিসর্গ লোপের পর সন্নিহিত বর্ণের মধ্যে সন্ধি হয় না। যেমন—শিরঃ + উপরি = শিরউপরি; শিরোপরি হইবে না।

(কোন কোন স্থানে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সন্ধি হয় না, যেমন—প্রাতঃকাল, অতঃপর, অন্তঃপাতী, শিরঃপীড়া ইত্যাদি।)

৬। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে স্ জাত বিসর্গের পর ক্ খ্ প্ ফ্ থাকিলে বিসর্গস্থানে ষ্ হয়।

আবিঃ + কার = আবিষ্কার   নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি
নিঃ + ফল = নিষ্ফল   চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

[নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি]

সূত্রের অধীন নয় এরূপ সন্ধিকে সংস্কৃতে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে। যেমন—

কুল + অটা = কুলটা   অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী
বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ   প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়
সীম(ন্) + অন্ত = সীমন্ত   পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি   আ + পদ = আস্পদ
তৎ + কর = তস্কর   হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
ষট্ + দশ = ষোড়শ   দিব্ + লোক = দ্যুলোক

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে?

২। খাঁটি বাংলা সন্ধি বলিতে কি বোঝ? খাঁটি বাংলা সন্ধির নিয়মগুলি কি?

৩। (ক) সন্ধি কর:

তথা + অপি, প্রতি + ইতি, সাধু + উত্তম, স্ব + ইচ্ছা, সূর্য + উদয়, সদা + এব, বন + ওষধি, উপরি + উপরি, পরি + আলোচনা, মধু + অভাব।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

অন্বেষণ, মস্যাধার, মহৌষধ, মহৌষধি, তথৈবচ, অধমর্ণ, নবোঢ়া, ঢাকেশ্বরী, ভানূদয়, বীক্ষণ, মহার্ঘ।

৪। ব্যঞ্জন সন্ধিতে বর্গের প্রথম বর্ণ কখন তৃতীয় বর্ণ হইয়া যায়?

৫। সন্ধি কর:

বাক্ + লোপ, ণিচ্ + অন্ত, ষট্ + বর্গ, উৎ + যম, অপ্ + ধি।

৬। বই খুলিয়া প্রত্যেক দৃষ্টান্তের তিনটি করিয়া সন্ধি লেখ:—

(ক) ত্ দ্ স্থানে চ্ হয়; (খ) ত্ দ্ স্থানে জ্ হয়; (গ) ত্ দ্ স্থানে ট হয়; (ঘ) ত্ দ্ স্থানে ড্ হয়।

৭। সূত্র বল ও সন্ধি কর :

উৎ+হত ; ঈষৎ+হাস্য ; জগৎ+হিত।

৮। নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি কত ভাবে হইতে পারে দেখাও—

(ক) দিক্+নাগ, (খ) ষট্+মাস, (গ) তৎ+মধ্য।

৯। 'সংগীত' ও 'সঙ্গীত' দুইটিই শুদ্ধ কেন? 'সংকীর্ণ ও 'সঙ্কীর্ণ' দুইটিই শুদ্ধ কেন?

১০। সন্ধি কর :

সম্+বাদ, সম্+রাজ।

১১। বটচ্ছায়া, তরুচ্ছায়া প্রভৃতি সন্ধি কোন্ সূত্র অনুসারে হইয়াছে? এই সূত্রের আরো কয়েকটি সন্ধির দৃষ্টান্ত দাও।

১২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

যাচ্ঞা, যজ্ঞ, রাজ্ঞী, বৃষ্টি, ষষ্ঠ।

১৩। বিসর্গ কি? বিসর্গ কয় প্রকার? বিসর্গসন্ধি কি ব্যঞ্জনসন্ধি?

১৪। বই দেখিয়া নীচের প্রত্যেকটি সন্ধির দুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত লেখ :

(ক) চ্ ছ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ্,

(খ) ট্ ঠ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে ষ,

(গ) ত্ থ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্।

১৫। নীচের সন্ধিগুলিতে বিসর্গ কোন স্থানে কি হইল বল :

নিঃ+অবধি, নিঃ+রস, নিঃ+গত।

১৬। সূত্র উল্লেখ করিয়া সন্ধি কর :

মনঃ+যোগ, যশঃ+লাভ, ততঃ+অধিক, বয়ঃ+অধিক, অতঃ+এব, শিরঃ+উপরি।

১৭। বিসর্গ কি হইবে বল :

নমঃ+কার, প্রাতঃ+কাল, আবিঃ+কার, ভাঃ+কর, শিরঃ+পীড়া, চতুঃ+পদ।

১৮। নিম্নের সন্ধিঘটিত বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর :

(ক) মরুস্থান, কটুক্তি, রসনীন্দ্রিয়, প্রাণৈধিক, পরমশ্বৈর্য, মহোৎসব, অত্যান্ত, অনুমত্যানুসারে।

(খ) দিগাম্বর, পশ্বাধম, উশৃঙ্খল, উচ্ছসিত, নিরোগ, নিরস, শিরচ্ছেদ, কিম্বা।

১৯। নিম্নের সন্ধিগুলিতে কোথায় স এবং কোথায় ষ হইবে সূত্র উল্লেখ পূর্ব্বক বল :

পুরঃ+কার, পরিঃ+কার, বহিঃ+কার, চতুঃ+কোণ, বাচঃ+পতি, চতুঃ+পদ।

২০। **দশটি** সন্ধিযুক্ত পদ ব্যবহার করিয়া তোমার বিদ্যালয়ে কোনো উৎসব উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

[**নির্দেশ** :—এই প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। প্রথমেই চিঠিটির রচনানীতি (form) যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটি যেন স্বাভাবিক হয় অর্থাৎ যেখানে সেখানে সন্ধিযুক্ত পদ ব্যবহারের চেষ্টায় চিঠিটি যেন হাস্যকর না হইয়া পড়ে।

চিঠিটি লিখিতে গিয়া দেখিবে অনেকগুলি সন্ধিবদ্ধ পদ আপনিই আসিয়া পড়িতেছে। সেইগুলিকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইবে, এবং বাকি কয়টি চিন্তা করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাইবে।]

[আদর্শ]

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আগামী ৭ই জুলাই **বৃহস্পতি**বার **অপরাহ্ণ** ৫ ঘটিকায় আমাদের **বিদ্যালয়ে** বার্ষিক **পুরস্কার** বিতরণী সভার **অনুষ্ঠান** হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত **নির্মল**কুমার **ভট্টাচার্য** এম্. এল. সি. **মহোদয়** উক্ত সভায় সভাপতির আসন **অলঙ্কৃত** করিবেন।

পুরস্কার বিতরণের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক **রবীন্দ্র**নাথের **অচলায়তন** নাটিকাটি অভিনীত হইবে।

আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই **আনন্দানুষ্ঠানে** যোগদান করিয়া আমাদিগকে **কৃতার্থ** করিবেন।

ভবদীয়
শ্রী**শশাঙ্ক**শেখর **বন্দ্যোপাধ্যায়**
বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়।

(উপরের আদর্শে অনুষ্ঠান শব্দের সন্ধিটি একটু জটিল। অধি, প্রতি, অনু ইত্যাদি উপসর্গের পর স্থা ধাতুর স্ সন্ধিতে ষ্ হইয়া যায় এবং থ ঠ-তে পরিণত হয়। যেমন—অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি।)

চতুর্থ অধ্যায়

ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান

সংস্কৃতে দন্ত্য ন স্থলে মূর্ধন্য ণ ব্যবহারের নিয়মগুলিকেই ণত্ববিধা বলে। বাংলায় সংস্কৃত ণত্ববিধান সম্পূর্ণ পালিত হয় না—তবে তৎস শব্দের বেলায় এই নিয়ম মানিতে হয়।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ সম্পর্কে ণত্ববিধান নিম্নরূপ—

(১) ঋ, র্, ষ্, এই তিন বর্ণের পর দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যথা—ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, বর্ণ, পূর্ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, উষ্ণ, পাষাণ।

(২) ঋ, র্, ষ্ এর পর স্বরবর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, কিংবা য ব থাকিলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যথা—হরণ, হরিণ, কৃপাণ, বৃংহণ, দর্পণ রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ, অর্পণ, লক্ষণ, লক্ষ্মণ, রুগ্‌ণ।

(৩) ঋ, র, ষ এর পর উল্লিখিত বর্ণ ভিন্ন অন্যবর্ণ ব্যবধান থাকিলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয় না। যথা—নর্তন, প্রার্থনা, বিসর্জন, জনার্দন।

(৪) সমাসে পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকিলে পরপদের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয় না। যথা—দুর্নাম; সর্বনাম, হরিনাম, বিষপান।

কতকগুলি সমাসবদ্ধ শব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে—

রামায়ণ, সূর্পণখা, অগ্রণী, অগ্রহায়ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

(৫) ট বর্গের সহিত যুক্ত দন্ত্য ন সর্বদা মূর্ধন্য ণ হয়।

যথা—কণ্টক, কুণ্ঠা, লুণ্ঠন, ভাণ্ডার, ব্রহ্মাণ্ড, চণ্ডী, ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ)।

(৬) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য ণ হয়।

যেমন— স্থাণু অণু বীণা বেণু বিপণি নিক্কণ।
কণিকা কণাদ মণি কল্যাণ চিক্কণ॥
শোণিত গণনা শোণ বেণী ফণী বাণী।
আপণ মাণিক্য পণ্য বাণ তূণ পাণি॥
লবণ নিপুণ পণ কঙ্কণ কফোণি।
গৌণ কোণ পুণ্য কাণ আপণ বিপণি॥ ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দে ণত্ববিধান

বাংলা তদ্ভব শব্দে বা বিদেশী শব্দে ণত্ববিধানের কোনো সূত্র পালন করা হয় না। কারণ বাংলা উচ্চারণে শুধু দন্ত্য ন আছে, মূর্ধন্য ণ এর উচ্চারণ বাংলাতে নাই।

অনেক তদ্ভব শব্দে সংস্কৃতের প্রভাবে মূর্ধন্য ণ রাখা হয়। যেমন—রাণী (সংস্কৃত রাজ্ঞী), সোণা (সংস্কৃত স্বর্ণ), কাণ (সংস্কৃত কর্ণ)। তবে এইসব স্থলে মূর্ধন্য ণ রাখার কোন প্রয়োজন নাই। বাংলায় রানী, সোনা, কান প্রভৃতি বানানই অধিকতর প্রচলিত।

সংস্কৃত হইতে আসে নাই এমন খাঁটি বাংলা শব্দেও সংস্কৃতের নিয়ম পালন করার প্রযোজন হয় না। যেমন—ঝরনা, হারানো ইত্যাদি।

অনেকে সংস্কৃত নিয়মে বিদেশী শব্দেও মূর্ধন্য ণ লিখিয়া থাকেন। যেমন—কোরাণ, রিপণ, ইরাণ, ট্রেণ ইত্যাদি। কিন্তু এই শব্দগুলিও দন্ত্য ন দিয়াই লেখা উচিত।

ষত্ববিধান

দন্ত্য স স্থলে মূর্ধন্য ষ ব্যবহারের নিয়মগুলিকে সংস্কৃতে ষত্ব-বিধান বলে।

ণত্ববিধানের মত ষত্ববিধানেও বাংলায় প্রধানতঃ তৎসম শব্দগুলিতেই প্রযুক্ত হয়।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে ষত্ববিধানের নিয়মগুলি নিম্নরূপ :

(১) ঋ কারের পরবর্তী দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।

যথা—বৃষ, ঋষি, ঋষভ।

(২) অ আ ভিন্ন স্বর এবং ক্ র্ এর পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।

যথা—ভবিষ্যৎ, শুশ্রূষা, মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, জিগীষা, চিকীর্ষা, শ্রীচরণেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

(৩) ট ঠ ইত্যাদি মূর্ধন্য বর্ণের সহিত যুক্ত দন্ত্য স সর্বদা মূর্ধন্য ষ হয়।

যথা—কষ্ট, নষ্ট, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা।

(৪) মাতৃ ও পিতৃ শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগে প্রথম দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।

যথা—মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

(৫) সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় না। যথা—ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ।

(৬) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য ষ হয়। যথা—

ওষধি আষাঢ় শেষ মেষ বিষ রোষ।
বৃষ পৌষ ভীষ্ম শোষ, পোষণ প্রদোষ॥
ঔষধ ভাষণ ভূষা কষায় বিষাণ।
প্রত্যূষ ঈষৎ শেষ মূষিক পাষাণ॥
ষড়ানন বিশেষণ ভাষা মাষা ষণ্ড।
বাষ্প পুষ্প শষ্প ষট্ সর্ষপ পাষণ্ড॥ ইত্যাদি

খাঁটি বাংলা শব্দে ষত্ববিধান

মূর্ধন্য ণ এর মত মূর্ধন্য ষ এর উচ্চারণও বাংলায় নাই। কিন্তু লিখিবার বেলায় বাংলা তদ্ভব শব্দে সংস্কৃতের ষ প্রায়ই রাখা হয়। যেমন—ষাঁড়, (সংস্কৃত ষণ্ড), ষোল (সংস্কৃত ষোড়শ), আঁষ (সংস্কৃত আমিষ)। তবে, এই নিয়মও সর্বত্র মানা হয় না। যেমন—মিন্‌সে (সংস্কৃত মনুষ্য), নিশুতি (সংস্কৃত নিষুপ্তিক) ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ এর প্রচলন থাকিলেও তাহা ব্যবহার না করাই ভাল। যেমন—জিনিষ (জিনিস লেখা উচিত), আপশোষ (আপশোস লেখা উচিত), ষ্টেশন (স্টেশন লেখা উচিত), খ্রীষ্টাব্দ (মূর্ধন্য ষ চলিতে পারে)।

অনুশীলনী

১। ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান বলিতে কি বোঝায় বল।

২। (ক) ণত্ববিধানের প্রধান সূত্র কি কি?
(খ) ষত্ববিধানের প্রধান সূত্র কি কি?

৩। বাংলা তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে ণত্ব ও ষত্ববিধানের নিয়মগুলি কতটুকু খাটে তাহা আলোচনা কর।

৪। কল্যাণীয়েষু, কল্যাণীয়াসু; স্নেহাস্পদেষু স্নেহাস্পদাসু, শব্দগুলিতে দন্ত্য স এবং মূর্ধণ্য ষ প্রয়োগের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কর।
(ষত্ববিধানের ২নং সূত্রটি দেখ। বিভক্তিও একপ্রকার প্রত্যয়।)

৫। নিম্নলিখিত বানানগুলির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কর:
মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন।

পঞ্চম অধ্যায়

১। প্রতিবর্ণীকরণ

ABCD ইত্যাদি রোমান হরফ আজকাল পৃথিবীর প্রায়'সকল স্থানেই পরিচিত। কোনো ভাষার ধ্বনিকে অন্য ভাষাভাষীর নিকটউপস্থিত করিতে হইলে এই হরফই আজকাল সর্বাধিক উপযুক্ত। কারণ তাহাতে অন্য ভাষাভাষীকে কোনো ভাষা পড়িবার জন্য সেই ভাষার লিপি শিক্ষা করিতে হয় না। পণ্ডিতেরা মনে করেন যদি সকল ভাষাই রোমান লিপিতে লিখিতে হয়, তবে প্রত্যেকের পক্ষেই অন্যের আয়ত্ত করা সহজ হইবে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা নানা ভাষার ধ্বনির পরিচয় দিবার জন্য মাধ্যম রূপে রোমান লিপিকেই ব্যবহার করেন। এইসব কারণে বর্তমানে রোমান লিপিকে International Script বা আন্তর্জাতিক লিপি বলা হইয়া থাকে।

২। বাংলা শব্দকে রোমান লিপিতে লিখিবার রীতি :

কোন বাংলা শব্দকে রোমান লিপিতে লিখিতে হইলে প্রত্যেকটি বাংলা বর্ণের জন্য যে রোমান হরফ ব্যবহৃত হইবে, সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাংলা বর্ণের রোমান লিপ্যন্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

স্বরবর্ণ

অ—a   আ—ā   ই—i   ঈ—i
উ—u   ঊ—ū   ঋ—ṛ   এ—e
ঐ—a͜i   ও—o   ঔ—a͜u

স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন

ক—ka   কা—kā   কি—ki   কী—kī
কু—ku   কূ—kū   কৃ—kṛ   কে—ke
কৈ—ka͜i   কো—ko   কৌ—ka͜u   কঁ—kã
কাঁ—kā̃   কিঁ—kĩ   কীঁ—kī̃   কুঁ—kũ
কোঁ—kõ   কৌঁ—ka͜ũ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক্—k   খ্—kh   গ্—g   ঘ্—gh   ঙ্—ṅ
চ্—c   ছ্—ch   জ্—j   ঝ্—jh   ঞ্—ñ
ট্—ṭ   ঠ্—ṭh   ড্—ḍ   ঢ্—ḍh   ণ্—ṇ
ত্—t   থ্—th   দ্—d   ধ্—dh   ন্—n

প্‌—p ফ্‌—ph ব্‌—b ভ্‌—bh ম্‌—m
য্‌—y j́ র্‌—r ল্‌—l ব্‌—b, w, (v)
শ্‌—s′ ষ—ṣ স্‌—s হ্‌—h
ড়্‌—ṛ ঢ়্‌—ṛh য়্‌—y ং—ṁ
ঃ—ḥ ঁ— ~

সংযুক্ত ব্যঞ্জন

বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে রোমান লিপিতে প্রতিবর্ণীকরণের সময় যে যে বর্ণ লইয়া সংযুক্ত ব্যঞ্জনটি গঠিত তাহার সকলগুলিকেই যথাক্রমে দেখাইতে হইবে।

(১)

ক্য—kya ক্যা—kyā র্ক—rka ক্র—kra
ক্রী—krī ক্ল—kla ক্ক—kka ক্ব—kwa
ক্ষ—kṣa

(২)

ং ঃ ঁ ইত্যাদি ধ্বনি বর্ণের শেষে যে স্বরধ্বনি থাকে তাহার সহিত উচ্চারিত হয়।

কং—kaṁ কঃ—kaḥ কিঃ—kiḥ কোঁ—kõ

(৩)

ঐক্য—aikya, বিজ্ঞ—vijña, খঞ্জ—khañja,
কণ্ঠ—kaṇṭh, যক্ষ—yakṣa, মন্ত্র—mantra,
পশ্চিম—pāścim (a), শ্মশান—śmaśān(a) বন্ধ্যা—bandhyā
ব্রহ্ম—brahma, ঊর্দ্ধ—ūrddhwa, তীক্ষ্ন—tīkṣṇa
উচ্ছ্বাস—ucchwās (a), আহ্বান—āhwān (a)

(৪)

বিবেকানন্দ—Vivekānanda, জবাহরলাল—Jawāharlāl,
বন্দ্যোপাধ্যায়—Bandyopādhyāy(a), রায়চৌধুরী—Rāychaudhurī,
চক্রবর্তী—Chakravartī, সেনশর্ম্মা—Sen(a)śarmā.

(৫)

ছোট্ট আমার মেয়ে সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে
হাতে ছিল প্রদীপখানি, আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী—

Chotta āmār(a) meye sanginīder(a) dāk(a) sunte peye,
Siri diye nīcer (a) talāy(a) jacchila se neme,
andhakāre bhaye bhaye theme,
hāte cila pradīp(a) khāni,
ā̃cal(a) diye āṛāl(a) kare calchila sāb(a)dhānī.

৩। ইংরেজি শব্দাবল বাংলায় লিপ্যন্তরের রীতি

ইংরেজি ইত্যাদি ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দকে বাংলার লিপ্যন্তরের সময় মূল শব্দের উচ্চারণটি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী বাংলা বর্ণযোজনা করিলেই চলে। এইক্ষেত্রে কোনো সূত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রচলিত রীতির দিকে একটু দৃষ্টি রাখিলেই হয়। নীচে ইংরেজি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির লিপ্যন্তর দেখানো হইল :

A—(অ, আ, এ, এ্যা)—Ball বল, Mark—মার্ক, Lane—লেন, Man—ম্যান।

AI, AE, AY (এ)—Gate—গেট, Fail—ফেল; Aeroplane—এরোপ্লেন; May—মে।

C (ক,স) Car—কার, Cell—সেল, Cigar—সিগার।

Ch (চ, ক, খ, শ,)—Cheque—চেক, Cholera—কলেরা, Christmas—খ্রীষ্টমাস, Chemise—শেমিজ।

E (ই,এ,আ)—Engine—ইঞ্জিন, এঞ্জিন, Set—সেট, Poster—পোস্টার, Seat, Theatre—থিয়েটার।

EA,EE,EI,EY (ই, এ, ঈ,)—Meeting—মিটীং(, Money bag—মনিব্যাগ।

Eu (ইয়ো)—Europe—ইয়োরোপ, ইউরোপ।

G (জ, গ,)—George—জর্জ, Gram—গ্রাম।

N (ন,ঞ,ঙ,ং)—Pin—পিন, Bench—বেঞ্চ, Bank—ব্যাঙ্ক, ব্যাংক, Singer—সিংগার, সিঙ্গার।

O (ও,উ,অ,আ)—Post office—পোস্ট অফিস, পোস্ট আফিস, Police—পুলিশ, Cholera—কলেরা, Doctor—ডক্টর, ডাক্তার।

OA (ও, ওয়া ওয়ে)—Road—রোড্, Oasis—ওয়েসিস, Doab—দোয়াব।

Oo (উ,ও,আ,)—Food—ফুড, Floor—ফ্লোর, Blood—ব্লাড।

Ou (আউ,উ,আ)—Fountain pen—ফাউনটেন পেন, Route—রুট, Journal—জার্ণাল।

U (উ,আ,ইউ,)—June—জুন, Run—রান, University—ইউনিভার্সিটি।

W (ওয়,উ)—War—ওয়ার, Will—উইল।

X (ক্স্, গ্, জ্, ক্ষ)—Box—বাক্স, Alexander—আলেকজাণ্ডার, Maxmuller—মোক্ষমূলর।

Y (আই,ই)—Cycle—সাইকেল, Lymph—লিম্প।

Z (জ)—Zoo—জু, Zebra—জেব্রা।

কয়েকটি ইংরেজি নামের লিপ্যন্তর

Victoria—ভিক্টোরিয়া, Elizabeth—এলিজাবেথ, George V—পঞ্চম জর্জ, Edward VII—সপ্তম এডওয়ার্ড, Bernard Shaw—বার্ণার্ড শ', Bertrand Russell—বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল, Percy Bysshe Shelley—পার্সি বিশ্ শেলী, Lord Byron—লর্ড বায়রন, William Wordsworth—উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, John Keats—জন কীট্‌স্, Thompson—টমসন, Thomas Henry Huxley—টমাস হেনরি হাক্সলি, Thomas Moore—টমাস মুর, Norman Mckinnel—নরম্যান ম্যাকিনেল, William Shakespeare—উইলিয়ম সেক্সপীয়র, Lord Tennyson—লর্ড টেনিসন, Robert Browning—রবার্ট ব্রাউনিং, Robert Bridges—রবার্ট ব্রিজেস্, Robert Louis Stevenson—রবার্ট লুই স্টিভেনসন, Coleridge—কোলরিজ, Macmillan—ম্যাকমিলান, Mcmahon—ম্যাকমোহন, Simon—সাইমন, Drinkwater Bethune—ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (বর্তমানে বাংলায় বেথুন চলিতেছে, যেমন—বেথুন কলেজ), Sinclair Lewis—সিনক্লেয়ার ল্যুইস, Louis Fisher—লুই ফিসার, Lewis Carroll—ল্যুইস ক্যারল, Weber—ওয়েবার।

৪। ইংরেজি ব্যতীত কয়েকটি বিদেশী নাম, পদবী ইত্যাদির লিপ্যন্তর

ইংরেজি ব্যতীত যে সব ইয়োরোপীয় নাম বাংলায় লিপ্যন্তরিতভাবে ব্যবহার হইতেছে তাহার মধ্যে ফরাসীই প্রধান। এই ফরাসী নামগুলি লইয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে একটু বিশৃঙ্খলাও যে সৃষ্টি হয় নাই এমন নয়। ইহার কারণ কোনো ফরাসী নাম একবার আমরা ইংরেজির মধ্য দিয়া

গ্রহণ করিয়াছি, আবার তাহাই আর একবার সরাসরি ফরাসী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। যেমন Paris লিখিতে বা বলিতে আমরা ইংরেজি উচ্চারণ বজায় রাখিয়া প্যারিস ব্যবহার করি, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী পারী উচ্চারণএর প্রতিও পক্ষপাতিত্ব দেখাই। Restaurant কথাটি বাংলায় বলিতে বা লিখিতে আমরা ইংরেজি ধরনে রেস্টুরেণ্ট যেমন ব্যবহার করি আবার ফরাসী ধরনে রেস্তোরাঁও কম ব্যবহার করি না। ইহাতে অবশ্য আপত্তি করিবার তেমন বিশেষ কিছু নাই, তবে ইংরেজি ফরাসী মিশিয়া যাহাতে খিচুড়ি পাকাইয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও বাংলায় Renaissanceকে রেনেসাঁ লিখিতে দেখা যায়—কিন্তু রেনেসাঁ একেবারে ভুল, ইহা ইংরেজি উচ্চারণও নয়, ফরাসীও নয়। হয় শুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণ রেনেসাঁস লিখিতে হইবে, নতুবা ইংরেজি উচ্চারণ রিনাইসেন্সই বজায় রাখিতে হইবে। এইরূপ Manson শব্দটির ইংরেজি উচ্চারণ বজায় রাখিয়া মেনসন বা ম্যানসন লেখা চলিবে, নতুবা খাঁটি ফরাসী উচ্চারণ মেঁইসঁ করিতে হইবে, আধুনিক কালের ভুল ফরাসীয়ানা মেনসঁ চলিবে না।

Romain Rolland—রোমাঁ রোলাঁ, Maupassant—মোপাসাঁ, Flaubert—ফ্লবের, Monsieur—মসিয়ে, Madamoiselle—মাদমোয়াজেল, Louis—লুই, Joliot Curie—জোলিও কুরী।

৫। বাংলা দেশের কয়েকটি রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠানের নাম

Amherst Street—আমহার্স্ট স্ট্রীট (ষ্ট দরকার নাই, শব্দের শেষে হসন্ত দরকার নাই); Bethune Row—বেথুন রো (শুদ্ধ উচ্চারণ বীটন দরকার নাই, চলিত উচ্চারণই ভাল), Cornwallis Street—কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (হিন্দী ধরনে কর্ণবালিস্ হইবে না, কারণ বাংলায় অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ নাই, আবার অতি আধুনিক কর্ণোআলিস্‌ও বর্জনীয়, কারণ Corn & wallis সন্ধি কুৎসিৎ); Southern Avenue—সাদার্ণ এভেন্যু (দুইটি বানানেই ইংরেজি উচ্চারণের খরতা বজায় আছে; কিন্তু উত্তর কলিকাতার বি, কে, পাল এভেনিউতে তাহা নাই); St. Xavier's College—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (St. এর পূর্ণ উচ্চারণই দিতে হইবে, X = জ)।

অনুশীলনী

১। আন্তর্জাতিক লিপি বলিতে কি বুঝায়? এই লিপি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি?

২। রোমান লিপিতে প্রকাশ কর :

কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দুঃখ, অশ্ব, চাঁদ, ঝঞ্ঝা, চক্ষু, ঊর্ধ্ব, ঐক্য।

৩। নিম্নের নামগুলি রোমান লিপিতে লেখ :

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, জবাহরলাল নেহরু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ বটব্যাল, বটকৃষ্ণ দাঁ, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, কামাখ্যা প্রসাদ চৌধুরী, হিরণ্ময়ী দেবী, সৌদামিনী দেবী, দেবীচৌধুরানী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(Thakur ; কিন্তু কবি নিজে Tagore লিখিতেন বলিয়া ঐরূপই লিখিতে হইবে।)

৪। আন্তর্জাতিক লিপিতে রূপান্তরিত কর :

(ক) বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

(খ) জনগণমন অধিনায়ক জয়হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।

৫। বাংলায় লিপ্যন্তর কর :

Edward Thompson, William Shakespeare, Romain Rolland, Thomas Moore, John Keats, Simons, Drinkwater Bethune,

৬। ইংরেজি Cornwallis Street শব্দ যুগলের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণবালিস স্ট্রীট, কর্ণোআলিস স্ট্রীট এই তিন প্রকার রূপের প্রত্যেকটির ঔচিত্য বিচার কর।

(প্রথমটি একেবারে পুরাতন ধরনের বানান। এখানে র্ণ, ষ্ট্র প্রভৃতিতে ণত্ববিধান ষত্ববিধান মানা হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে ইহার প্রয়োজন নাই। এমন কি স্-ট্, ইত্যাদিতে হসন্তেরও প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়টি হিন্দী ধরনের বানান। সেখানে wa—বা করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ নাই বলিয়া wa—ওয়া করাই সঙ্গত। তৃতীয়টি বিকৃত অতি আধুনিক বানান। কিন্তু ইহাতে Corn+wa=কর্ণোআ সন্ধি করা হইয়াছে। ইহাও অসঙ্গত। Cornwallis Street এর বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইলেই ভাল।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বাংলা বানান রীতি

বাংলা ভাষায় যে চার প্রকার শব্দ আছে তাহার মধ্যে একমাত্র তৎসম শব্দের বানানই সংস্কৃতানুসারী বলিয়া সুনির্দিষ্ট আছে। কিন্তু তদ্ভব, অর্ধতৎসম এবং দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে তেমন কোনো নিয়ম কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল না। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের বানান রীতির সঙ্গে লোকচলিত রীতির সমন্বয় করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা অভিধানগুলিতে এই বানানই অনুসৃত হইতেছে এবং বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বানান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে সংকলিত হইল—

(১) রেফ সম্পর্কে

সংস্কৃত শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনীয়। যেমন—ধর্ম, কর্ম, সূর্য, অর্ধ, মূর্ধা ইত্যাদি।

অসংস্কৃত শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যেমন—কর্জ, মর্জি, পর্দা, সর্দার, জার্মানী ইত্যাদি।

(২) অনুস্বার সম্পর্কে

(ক) ক, খ, গ, ঘ, ঙ, পরে থাকিলে সংস্কৃত শব্দে ম্ স্থানে ং (বিকল্পে ঙ) হইবে। যেমন—অহংকার, (অহঙ্কার), সংখ্যা (সঙ্খ্যা), জংগম (জঙ্গম), সংঘ (সঙ্ঘ), আকাংক্ষা (আকাঙ্ক্ষা), ইত্যাদি।

(৩) বিসর্গ সম্পর্কে

সংস্কৃত শব্দের অন্ত্যে বিসর্গ বর্জন করা যাইবে। যেমন—মন, যশ, শ্রেয়, বক্ষ, চক্ষু ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যস্থিত বিসর্গ বজায় থাকিবে, এবং

যথানিয়মে বিসর্গ সন্ধি হইবে। যেমন—মনঃ+যোগ=মনোযোগ, যশঃ+লাভ=যশোলাভ ইত্যাদি।

(৪) ই ঈ উ ঊ সম্পর্কে

(ক) মূল সংস্কৃত শব্দের ঈ ঊ বাংলায় বিকল্পে ই ঈ উ ঊ হইবে। যেমন—পক্ষী> পাখী, পাখি ; কুম্ভীর> কুমীর, কুমির, চূর্ণ>চূণ, চুন ; কূপ>কূয়া, কুয়া ; ঊনবিংশ> ঊনিশ, উনিশ ইত্যাদি।

কিন্তু কতকগুলি শব্দে বাংলায় প্রচলন অনুযায়ী ই ঈ হইবে। যেমন—হীরা (হিরা নহে) <সং—হীরক, খিল (খীল নহে) <সং খীল ইত্যাদি।

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা, কোনো পেশা বা পদে নিযুক্ত ব্যক্তি ও বিশেষণবাচক শব্দের শেষে ঈ হইবে। যেমন—বাঘিনী, ধোপানী, বিহারী, বাঙ্গালী, ইংরেজী, হিন্দী, চাষী, ঢাকী, কেরানী, সোণালী, পশমী ইত্যাদি।

কিন্তু কতকগুলি শব্দে বাংলায় প্রচলন অনুযায়ী ই ঈ হইবে। যেমন—দিদি, বিবি, ঝি, কচি, মিহি ইত্যাদি। আবার, পিসী, মাসী শব্দে পিসি ও মাসি শব্দ চলিবে।

(গ) উপরের ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অসংস্কৃত শব্দে ই ব্যবহার করাই বিধেয়। যেমন—একটি, দুইটি, ধুনচি, বেঙ্গাচি, দুষ্টামি, ডাক্তারি ইত্যাদি।

কি সর্বনাম হইলে বিকল্পে **কি কী** উভয়ই হইবে, কিন্তু অব্যয় হইলে কি ব্যবহার বিধেয়।

(৫) শ ষ স সম্পর্কে

মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব **শ ষ স** হইবে। যেমন—বংশ>বাঁশ, শস্য>শাঁস, হংস>হাঁস, হাস্য>হাসি ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দে ষ হইবে না, মূল উচ্চারণ অনুযায়ী স শ হইবে, যেমন—শহর, পোশাক, শরবৎ শার্ট, সেমিজ, সায়া, আসল, জিনিস, মসলা ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দে st ধরনের জন্য স্ট ব্যবহার হইবে। যেমন—স্টেশন, স্টীমার, স্টিম, স্টেডিয়াম ইত্যাদি।

(৬) ন ণ সম্পর্কে

অসংস্কৃত শব্দে সকল স্থানেই ন হইবে। যেমন—কান, সোনা, নুন, বামুন, কোরান, কর্নেল ইত্যাদি।

কিন্তু রানী শব্দে বিকল্পে রাণী হইতে পারিবে।

(৭) **হসন্ত সম্পর্কে**

অসংস্কৃত শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন বর্জনীয়। যেমন—কংগ্রেস, পলটন, সাবান, কামান, সবুজ, ডিসমিস ইত্যাদি।

কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়। . .

৩। বানান ভুল

বাংলায় বানান ভুলের কারণগুলি নানারূপ। এইগুলিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে পারি—

(১) শব্দের বর্ণগত ভুল (বা বর্ণাশুদ্ধি)

এবং, (২) শব্দের গঠনগত অশুদ্ধি।

বর্ণগত ভুলের মধ্যে যুক্তাক্ষর না চেনার জন্য ভুল, প্রাদেশিক উচ্চারণ হেতু ভুল, হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের ভুল, ণত্ববিধি ষত্ববিধির ভুল, য-ফলা ব-ফলার ভুল, র ড ঢ় বর্ণের ভুল, খ ক্ষ বর্ণদ্বয়ের ভুল এবং সন্ধির ভুলগুলি প্রধান। এবং শব্দের গঠন সম্পর্কে ধারণার অভাবে যে বানান ভুল হয় তাহার মধ্যে ইন্ ভাগান্ত শব্দের ভুল, ইনী স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ভুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের ভুল ধারণাজনিত ভুল প্রধান।

যুক্তাক্ষর না চেনার জন্য ভুল

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
প্রিথিবী	পৃথিবী	বিঞ্জান	বিজ্ঞান
হ্রিদয়	হৃদয়	মধ্যান্হ	মধ্যাহ্ন
ক্রুটি	ত্রুটি	চিহ্ন	চিহ্ন
ব্রাম্মণ	ব্রাহ্মণ	পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
ক্রোধ	ক্রোধ	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ

প্রাদেশিক উচ্চারণ প্রভাবে ভুল

(উ ও)

পূর্ববঙ্গে ও উচ্চারণে উকার প্রবণতার জন্য চুর (চোর), মুট (মোট), তুমার (তোমার), তুমরা (তোমরা), ইত্যাদি ভুল হয়।

আবার এই ভুল সম্পর্কে সতর্কতার জন্য তোমি (তুমি), শোনি (শুনি), আলো (আলু), ইত্যাদি হাস্যকর ভুল দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে অ উচ্চারণে ওকার প্রবণতার জন্য প্রায়ই প্রোত্যহ (প্রত্যহ), প্রোত্যেক (প্রত্যেক), প্রোয়োজন (প্রয়োজন), বোক্ষ (বক্ষ), মোনযোগ (মনোযোগ), সব্যোসাচী (সব্যসাচী) ইত্যাদি ধরনের ভুল দেখা যায়।

(ং ঁ)

পশ্চিমবঙ্গের নাসিক্য উচ্চারণের প্রভাবে ফোঁড়া (ফোড়া); হাঁসি (হাসি), হাঁসপাতাল (হাসপাতাল), ইত্যাদি বর্ণাশুদ্ধি দেখা যাইতেছে।

আবার পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে নাসিক্যবর্জনের প্রয়াস হেতু বাশ (বাঁশ), হাস (হাঁস), ফাদ (ফাঁদ), পোছান (পোঁছান) ইত্যাদি বানান ভুল দেখা যায়।

(ব্য ব্যা)

পশ্চিমবঙ্গে য-ফলার এ্যা-বৎ উচ্চারণের জন্য ব্যাথা (ব্যথা), ব্যাবসা (ব্যবসা), অপব্যায় (অপব্যয়), ব্যাগ্র (ব্যগ্র), ব্যাবস্থা (ব্যবস্থা) প্রভৃতি বানান ভুল দেখা যাইতেছে।

আবার এই জাতীয় ভুল সম্পর্কে সতর্কতা হেতু ব্যকরণ (ব্যাকরণ), ব্যয়াম (ব্যায়াম), ব্যঘাত (ব্যাঘাত) ইত্যাদি ভুল দেখা যায়।

(র ড়)

পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে র ড এর উচ্চারণে ভেদ প্রায় নাই। এই জন্য ভারা (ভাড়া), জোরা (জোড়া), কাপর (কাপড়), আছার (আছাড়) ইত্যাদি ভুল প্রায়ই চোখে পড়ে।

আবার এই ভুলের সতর্কতার জন্য ঘড় (ঘর), ছুড়ি (ছুরি), পড়া (পরা), কাঁকড় (কাঁকর), জাতীয় ভুল দেখা যায়।*

হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরের ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইষৎ	ঈষৎ	দধিচি	দধীচি
ইর্ষা	ঈর্ষা	দীলিপ	দিলীপ
ইপ্সিত	ঈপ্সিত	কালীদাস	কালিদাস
ভাগিরথী	ভাগীরথী	সারথী	সারথি
পৃথিবি	পৃথিবী	আশীস্	আশিস্
পিপিলিকা	পিপীলিকা	আশির্বাদ	আশীর্বাদ
শারিরীক	শারীরিক	বাল্মীকী	বাল্মীকি
সমীচিন	সমীচীন	বিকীরণ	বিকিরণ

(ইন্ ভাগান্ত শব্দ)

শব্দের গঠন সম্পর্কে ধারণার অভাবজনিত দুইপ্রকার বানান ভুলের এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। গুণিন্, ধনিন্, মনীষিন্, প্রভৃতি

*'প্রাদেশিক উচ্চারণ প্রভাবে ভুল' এই আলোচনায় ভুল শব্দগুলির পাশে বন্ধনীর ভিতর শুদ্ধ শব্দগুলিও দেওয়া হইয়াছে।

ইন্‌ভাগান্ত শব্দের প্রথমার রূপ গুণী, ধনী, মনীষী, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ন্ লোপ হয় এবং পূর্ব ই দীর্ঘ হয়।

কিন্তু সমাসকালে বা প্রত্যয়যোগে ইন্ ভাগান্ত শব্দের শুধু ন্ লোপ পায়, পূর্ব ই দীর্ঘ হয় না। যেমন (সমাসে) গুণিগণ, জ্ঞানিজন, করিযূথ ইত্যাদি; (প্রত্যয় যোগে) কৃতিত্ব, একাকিত্ব, মনোহারিতা ইত্যাদি। কিন্তু ইন্ ভাগান্ত শব্দের সহিত অসংস্কৃত বিভক্তি ইত্যাদি যোগে এই সংস্কৃত নিয়ম প্রয়োজ্য হইবে না। যেমন—গুণীরা, ধনীরা সাক্ষীরা, বাগ্মীদের, রোগীদিগকে ইত্যাদি।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনীষি	মনীষী
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
গুণীগণ	গুণিগণ
জ্ঞানীজন	জ্ঞানিজন
করীযূথ	করিযূথ
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
রোগীসেবা	রোগিসেবা
বিদ্যার্থীমণ্ডল	বিদ্যার্থিমণ্ডল
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
স্বামীত্ব	স্বামিত্ব
একাকীত্ব	একাকিত্ব
চমৎকারীত্ব	চমৎকারিত্ব
মনোহারীত্ব (তা)	মনোহারিত্ব (তা)
উপযোগীতা	উপযোগিতা
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
পারদর্শীতা	পারদর্শিতা
বাগ্মীতা	বাগ্মিতা
বিরোধীতা	বিরোধিতা
সহমর্মীতা	সহমর্মিতা
চিত্রধর্মীতা	চিত্রধর্মিতা

স্ত্রী প্রত্যয় যোগ

ইন্ ভাগান্ত শব্দের ন্ এর সহিত স্ত্রী প্রত্যয় ঈ যোগ হয়, পূর্বের ই দীর্ঘ হয় না। যেমন—(গুণিন্), গুণী, গুণিনী; (মেধাবিন্), মেধাবী, মেধাবিনী;

(কর্মিন্), কর্মী, কর্মিনী ; (রোগিন্), রোগী, রোগিনী ; (বাগ্মিন্), বাগ্মী, বাগ্মিনী ; (মনোহারিন্) মনোহারী, মনোহারিনী।

সংস্কৃত স্ত্রালিঙ্গ শব্দকে বাংলায় দ্বিতীয়বার স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত করার কালে প্রথমটি ই এবং পরেরটি ঈ হইবে। যেমন—মাতঙ্গী, মাতঙ্গিনী ; কুরঙ্গী, কুরঙ্গিনী ; রজকী, রজকিনী ; ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গিনী।

উভয়বিধ বানান

কতকগুলি শব্দে ই ঈ দুইই হইতে পারে। তবে ঈ যুক্ত বানানই অধিক প্রচলিত। যেমন—তরি, তরী ; শ্রেণি, শ্রেণী ; স্থচি, স্থচী ; অবনি, অবনী ; অটবি, অটবী ; আবলি, আবলী ; কুটির, কুটীর ; তরণি, তরণী ; যুবতি, যুবতী ইত্যাদি।

উ ঊ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূল	ভুল	কৌতুহল	কৌতূহল
অদ্ভূত	অদ্ভুত	উদ্ভূত	উদ্ভূত
বিদূষী	বিদুষী	জাগরুক	জাগরূক
কৌতূক	কৌতুক	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
চ্যূত	চ্যুত	মূমূর্ষূ	মুমূর্ষু
পূণ্য	পুণ্য	মুহুর্ত	মুহূর্ত
মধুসুদন	মধুসূদন	অনুকুল	অনুকূল
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব	মুষিক	মূষিক
উষা	ঊষা	স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
দুষিত	দূষিত	দূর্গা	দুর্গা
সিন্দুর	সিন্দূর	দশভূজা	দশভুজা

ন ণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গননা	গণনা	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
দক্ষিন	দক্ষিণ	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
রামায়ন	রামায়ণ	মূর্ধণ্য	মূর্ধন্য
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	দর্শণ	দর্শন
প্রনাশ	প্রণাশ	দুর্ণাম	দুর্নাম
প্রমান	প্রমাণ	দুর্ণীতি	দুর্নীতি
সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ	রসায়ণ	রসায়ন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনু	অণু	আহ্নিক	আহ্নিক
কনিকা	কণিকা	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
হিরন্ময়	হিরণ্ময়	ফাল্গুণ	ফাল্গুন
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	ভাণ	ভান
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ

এই ভুলগুলি সমস্তই ণত্ববিধানের ভুল। ইহাদিগকে ণত্ব বিধানের সূত্রের সহিত মিলাইয়া বুঝিবে।

শ, ষ, স

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শষ্য	শস্য	গোস্পদ	গোষ্পদ
ধ্বংশ	ধ্বংস	পরিস্কার	পরিষ্কার
ভষ্ম	ভস্ম	দুস্কর	দুষ্কর
সুসমা	সুষমা	নিষ্পন্দ	নিস্পন্দ
বৈসম্য	বৈষম্য	নিষ্পৃহ	নিস্পৃহ
সংষ্কৃত	সংস্কৃত	কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু
পুরষ্কার	পুরস্কার	কল্যাণীয়েসু	কল্যাণীয়েষু
তিরষ্কার	তিরস্কার	পিতৃস্বসা	পিতৃষ্বসা
বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি	সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
পরিষ্ফুট	পরিস্ফুট	অভিসেক	অভিষেক
প্রসংশা	প্রশংসা	আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক

এই দৃষ্টান্তগুলিতে শ স এর প্রয়োগজনিত ভুল দেখানো হইয়াছে। এবং বাকীগুলি ষ প্রয়োগের ভুল অর্থাৎ ষত্ববিধানের ভুল। এইগুলিকে ষত্ববিধানের সূত্রের সহিত মিলাইয়া বুঝিবে।

খ ক্ষ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
খোদিত	ক্ষোদিত	কামাক্ষ্যা	কামাখ্যা

র ড় ঢ়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কাপর	কাপড়	শতকড়া	শতকরা
মাকর (সা)	মাকড় (সা)	কাঁকড়	কাঁকর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরসী	পড়সী	গাড়	গাঢ়
গুর	গুড়	মূড়	মূঢ়
ভারা	ভাড়া	রূড়	রূঢ়
করাকিয়া	কড়াকিয়া	প্রৌড	প্রৌঢ়
কাঁকরা	কাঁকড়া	গূড়	গূঢ়

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শব্দের বানান ও অর্থ মনে রাখিতে হইবে। যেমন—পরা (পরিধান ধরা), পড়া (পাঠ করা, পতিত হওয়া) ; মরা (মৃত্যু হওয়া), মড়া (মৃতদেহ) ; অসার (সারশূন্য), অসাড় (অচেতন) ; পারা (সমর্থ হওয়া, পারদ), পাড়া (পল্লী, ডিম পাড়া), হার (অলঙ্কার বিশেষ, পরাজয়), হাড় (অস্থি) ইত্যাদি।

ট ঠ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হটাৎ	হঠাৎ	হরিরলুঠ	হরিরলুট
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	কোঠর	কোটর
প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
কোষ্টী	কোষ্ঠী	অদৃষ্ঠ	অদৃষ্ট
লুটতরাজ	লুঠতরাজ	আষ্ঠেপৃষ্ঠে	আষ্টেপৃষ্ঠে

বফলা, যফলা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উর্ধ	ঊর্ধ্ব	সত্ত	স্বত্ব
উজ্জল	উজ্জ্বল	সত্ত্বা	সত্তা
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	কজ্জ্বল	কজ্জল
সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ	স্বচ্ছল	সচ্ছল
পার্শ	পার্শ্ব	স্বরস্বতী	সরস্বতী
সত্ব	স্বত্ব	আয়ত্ত্ব	আয়ত্ত
পক্ক	পক্ব	ইয়ত্ত্বা	ইয়ত্তা

বাংলা বানানে য ফলার ভুল খুব বেশী হয় না। শুধু কয়েকটি বানান সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হয়। যেমন—স্বাস্থ্য, সৌহার্দ্য, সামর্থ্য, যাথার্থ্য ইত্যাদি য প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্যের, এবং লক্ষ্য, ভক্ষ্য, বন্দ্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি য প্রত্যয় যোগে 'করার যোগ্য বা করা উচিত' অর্থবাচক বিশেষণ সমূহের।

সন্ধির ভুল

(ক)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মরুত্থান	মরূদ্যান	অত্যান্ত	অত্যন্ত
রবিন্দ্র	রবীন্দ্র	অত্যাধিক	অত্যধিক
রসনীন্দ্রিয়	রসনেন্দ্রিয়	জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
প্রমোদুত্থান	প্রমোদোদ্যান	পর্যাটন	পর্যটন
যত্থাপি	যদ্যপি	পশ্বাধম	পশ্বধম

(খ)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন	সন্মুখ	সম্মুখ
জাগ্রতাবস্থা	জাগ্রদবস্থা	সন্মত	সম্মত
বিদ্যুতালোক	বিদ্যুদালোক	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
সুহৃদাগ্রগণ্য	সুহৃদগ্রগণ্য	মনমোহন	মনোমোহন
পরান্মুখ	পরাঙ্মুখ	জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
কিম্বা	কিংবা	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
স্বয়ম্বরা	স্বয়ংবরা	নিরোগ	নীরোগ
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	শিরোশোভা	শিরঃশোভা

তরুছায়া (শুদ্ধ তরুচ্ছায়া), চক্ষুদ্বয় (শুদ্ধ চক্ষুর্দ্বয়), চক্ষুরোগ (শুদ্ধ চক্ষুরোগ), প্রভৃতি শব্দ বাংলায় চলিয়া গিয়াছে—এই জন্য ইহাদিগকে অশুদ্ধ মনে করা এখন আর সম্ভব নহে।

উচ্চারণগত অন্যান্য ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাটন	অনটন	মুখস্ত	মুখস্থ
সাহার্য্য	সাহায্য	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
গর্ধব	গর্দভ	শরত	শরৎ
পিচাশ	পিশাচ	তড়িত	তড়িৎ
অপগণ্ড	অপোগণ্ড	উচিৎ	উচিত
পরক্ষ	পরোক্ষ	ভাগবৎ	ভাগবত
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	লক্ষী	লক্ষ্মী
সান্তনা	সান্ত্বনা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
কিত্রিম	কৃত্রিম	বিশ্চিক	বৃশ্চিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের ভুল ধারণা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের ভুল ধারণার জন্যও অনেক সময় বানান ভুল হয়। এই ধরনের যে সব ভুল সচরাচর দেখা যায় তাহাদের আলোচনা করা হইল।

(ক) সূর্য, আর্য, চৌর্য, ইত্যাদি বানানে রেফের পর য ফলা নাই। এইজন্য ছাত্রেরা সামর্থ, যাথার্থ ইত্যাদি বানানেও য ফলা বাদ দিতেছে। কিন্তু ইহা মারাত্মক ভুল। সূর্য বানানে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন করা হইয়াছে। দৈর্ঘ্য, দার্ঢ্য, সামর্থ্য, যাথার্থ্য ইত্যাদিতে ভাববাচক বিশেষ্যে য প্রত্যয়। এই য ফলা বাদ দিলে চলিবে না। অতএব শুদ্ধ বানান হইবে যাথার্থ্য, সামর্থ্য, সৌহার্দ্য, ইত্যাদি।

(খ) ছাত্রদের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী যত্রতত্র দ্বিত্ব বর্জন চলে। এই ধারণা হেতু মহত্ব, সত্ব ইত্যাদি বানান লেখা হইতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে শুধু রেফের পরই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন করা চলে। অন্যত্র চলেনা। অতএব শুদ্ধ বানান মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, সৎ + ত্ব = সত্ত্ব ইত্যাদি।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান মতে কঙ্কণ, জঙ্গম ইত্যাদি স্থলে কংকণ জংগম প্রভৃতি রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রেরা মনে করে ং এর পর এই ভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন সর্বত্রই সরল হইবে। এই ধারণায় আকাঙ্ক্ষা বানান প্রায়ই আকাংখা লেখা হইতেছে। কিন্তু **আকাংখা** অশুদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা অথবা আকাংক্ষা শুদ্ধ।

অনুশীলনী

১। সংযুক্ত অক্ষর দ্বারা প্রকাশ কর :

(ক) হ্ + ম = ম?	ক্ + ষ = ?
(খ) ঙ্ + ক্ + ষ = ?	ক্ + ষ + ম = ?
(গ) ত্ + র্ + উ = ?	ক্ + র্ + অ = ?
(ঘ) ঞ্ + জ = ?	জ্ + ঞ = ?
(ঙ) হ্ + ন = ?	হ্ + ণ — ?

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ কর :—
আকাংখা, উর্ধ, সৌহার্দ, সামর্থ, দার্ঢ, দৈর্ঘ।

৩। নিম্নের বানানগুলি পরীক্ষা কর : —

(ক) কৌতূক, কৌতূহল ;	(খ) উজ্জ্বল, কজ্জ্বল ;
(গ) সচ্ছন্দ, সচ্ছ্বল ;	(ঘ) পারিষ্কার, পরিস্ফুট ;
(ঙ) কল্যানীয়াষু, কল্যানীয়েষু ;	(চ) আকাঙ্ক্ষা, পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ,
(ছ) কড়াকিয়া, শতকড়া ;	(জ) মুখস্ত, ঋণগ্রস্ত ;
(ঝ) মৃণ্ময়, হিরণ্ময় ;	(ঞ) হাঁসি, হাঁস।

৪। নাম ও পদবী গুলি সংশোধন কর :—

• কালীদাস, কালীপদ, বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, শশীশেখর, গায়েত্রী, ঋষিকেশ, রুহিনিকুমার, মধুসুধন, শরতচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, দিপালি, দিলিপ, জনাদর্ণ, যুথীকা, সুসমা, আরতী, ভারতি, স্বরস্বতী, কিরন্ময়ী (সন্ধি হইবে না)

(প্রায় পঁচিশটি ভুল আছে)

স্নেহাষ্পদাষু,

দূর্গাপুর
২৭শে অগ্রহায়ন

মা কনিকা, তোমার পত্র পাইয়াছি। এখানে আসিয়া আমার সাস্থের কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু গিরিনের শারিরিক তেমন ভাল যাইতেছে না। মনিকারা বৃহস্পতিবার গিয়া দীল্লি পৌঁছিয়াছে। এইমাত্র তাহার শ্বাশুরীর চিঠি পাইলাম। টুলটুলকে খুভ সাবধানে রাখিও। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দিকাসি না হয়। বিষেশ কি? তুমি ও অনিমেশ আমার আশীষ নিও এবং বৈভাহিকা মহাশয়কে নমষ্কার দিও। ইতি—

আশির্বাদিকা মা।

পুনশ্চ। মনিকারা এলাহাবাদে অহীভুষনের বাসায় এক দিন দেড়ি করিয়াছিল। অহী নাকি মান্দ্রাজ বদলি হইয়াছে। ইতি মা।

পদপ্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

১। শব্দ, ধাতু, বিভক্তি পদ*

নামবোধক বর্ণসমষ্টিকে নাম বা শব্দ বলা হয়। যেমন—গাছ, ফুল, রাম, দয়া ইত্যাদি।

ক্রিয়াবোধক বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বা ধাতু বলা হয়। যেমন—ফুট্, চল্, হাস্, ইত্যাদি।

এই নাম এবং ধাতু হইল পদের মূল বা প্রকৃতি বা root। বাক্যে ব্যবহৃত হইবার সময় নাম বা ধাতুর সহিত কতকগুলি বর্ণ যুক্ত হয়। বাক্যে ধাতু বা শব্দের উত্তর ব্যবহৃত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে বিভক্তি বলে। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত নাম ও ধাতুকে পদ বলা হয়।

ধাতুর উত্তর যে বিভক্তি হয় তাহাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে, এবং ধাতু ও ক্রিয়া বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন পদকে বলে ক্রিয়াপদ। এইরূপ শব্দের বা নামের সহিত যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে বলে নাম বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তি, এবং এইভাবে নিষ্পন্ন পদের নাম নামপদ।

যেমন—গাছে ফুল ফুটিয়াছে—এই বাক্যে শব্দমূল হইল গাছ ও ফুল, এবং ধাতুমূল হইল ফুট্। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া শুধু 'গাছ' 'ফুল' 'ফুট্' এই শব্দমূল ও ধাতুমূল দ্বারা কোন স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না; তাই 'গাছ' শব্দের সঙ্গে নাম-বিভক্তি 'এ' যোগ করিয়া 'গাছে' নামপদ এবং 'ফুট্' ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি 'ইয়াছে' যোগ করিয়া 'ফুটিয়াছে' ক্রিয়াপদ গঠিত হইল।

২। বাক্য ও পদ

প্রত্যেক বাক্যেই কাহারও সম্পর্কে কিছু বলা হয়। নামপদের সাহায্যে বাক্যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের উল্লেখ হয়; এবং ক্রিয়াপদ সাহায্যে সেই বস্তু

* ইংরেজি ব্যাকরণে শব্দ ও পদে পার্থক্য নাই—ইংরেজিতে শব্দও word, পদও word। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দ ও পদ পৃথক। পদগঠন বিষয়ে বাংলা সংস্কৃতেরই অনুসারী—অর্থাৎ ইহারই মত সংশ্লেষণমূলক (Synthetic)। সেখানে মূল (root) এর সঙ্গে বিভক্তি (inflexion) সংশ্লিষ্ট হইয়া পদ হয়, ইংরেজিতে এইরূপ সংশ্লেষণমূলক পদসাধন প্রণালী নাই এবং এইজন্য শব্দে পদে পার্থক্যও নাই। Prepositionই সেখানে কারক বিভক্তির কাজ করে, এবং-ed,-t প্রভৃতি অতিরিক্ত দু' একটা বর্ণ সাহায্যে ক্রিয়ার সকল অবস্থা বোঝানো যায়।

বা বিষয় সম্পর্কে যাহা বলার তাহা বলা হইয়া থাকে। এই ভাবে বাক্যে মুখ্য পদ হইল মাত্র দুইটি—

(১) নামপদ (বিশেষ্য বা সর্বনাম = Noun বা Pronoun),
এবং, (২) ক্রিয়াপদ (Verb)।

এই দুইটি মুখ্যপদের অর্থ অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য অথবা বাক্যমধ্যে বিভিন্ন পদে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আরো দুই প্রকার পদের ব্যবহার হয়—

(৩) বিশেষণ (নাম বিশেষণ = adjective)
(ক্রিয়া বিশেষণ = adverb)
(ভাব বিশেষণ = adverb)

(৪) অব্যয় (পদান্বয়ী অব্যয় = preposition)
(সমুচ্চয়ী অব্যয় = conjunction)
(অনন্বয়ী অব্যয় = interjection)

৩। পদবিভাগ

ক। বিশেষ্য

যে পদে কোন কিছুর নাম বুঝায় তাহাকে বিশেষ্যপদ বলে। বাংলায় বিশেষ্যপদের ছয়টি বিভাগ স্বীকার করা যায়।*

(১) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun)**—কোন নাম যখন সেই জাতীয় ব্যক্তি বস্তু ইত্যাদির মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট বা বিশেষ করিয়া বুঝায় তখন সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য হয়। যেমন :—

ব্যক্তি বিশেষের নাম—রাম, শ্যাম, জন, হেনরি ইত্যাদি।

---

* ইংরেজি ব্যাকরণের সাদৃশ্যেই বাংলায় বিশেষ্যের বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে, তবু ইংরেজি ও বাংলায় বিশেষ্যের বিভাগ পদ্ধতি এক নহে। বাংলা ব্যাকরণে ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, কাল, গুণ,,ভাব, অবস্থা, ক্রিয়া প্রভৃতি বহু ভাগে বিশেষ্যকে ভাগ করা হয়। এইজন্য বাংলায় 'রাম' ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য, 'অযোধ্যা' স্থানবাচক বিশেষ্য, 'তাজমহল' বস্তুবাচক বিশেষ্য—কিন্তু ইংরেজিতে সবগুলিই name **proper** বলিয়া Proper noun। আবার ইংরেজীতে 'তাজমহল' Proper noun, 'বই' Common noun, 'জল' Material noun, কিন্তু বাংলায় সবগুলিই কোন না কোন বস্তু বুঝাইতেছে বলিয়া বস্তুবাচক বিশেষ্য।

যদি ইংরেজি বিভাগকে কার্যতঃ গ্রহণ করা যায়, (আমরা তাহাই করিয়াছি) তবে Concrete Noun এর শ্রেণী বিভাগে বাংলায় যে পরস্পরান্তর্বর্তিত্ব (Cross division) ঘটিয়াছে, তাহা অনেকটা খণ্ডন হয়। ইংরেজি Abstract Nounকে এখন বাংলায় গুণ, ভাব, অবস্থা এই তিন এবং কার্য লইয়া মোট চার ভাগে ভাগ করা হইতেছে ; ইহারই বা প্রয়োজন কি ? শুধু ভাব বলিলেই ত প্রথম তিনটির কাজ মিটিয়া যায়। তবে ইংরেজি Abstract Noun হইতে ক্রিয়া বা কার্যবাচক পদগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া ভাল ; কেননা ভাব ও কার্য এক নহে, কার্য যে অর্থে ভাব, সেই অর্থে শব্দ মাত্রেই ভাব (concept)।

বস্তু বিশেষের নাম—(শাস্ত্র, গ্রন্থ, স্থাপত্য, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত হইবে)—সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, বাইবেল, কোরান, রামায়ণ, তাজ-মহল, পিরামিড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রেড ক্রশ, রামকৃষ্ণ মিশন, ব্যাঙ্কশাল. কোর্ট ইত্যাদি।

স্থান বিশেষের নাম—(দেশ, নদী, পর্বত, বন্দর ইত্যাদির ভৌগোলিক নাম ইহার অন্তর্গত হইবে)—এশিয়া, আফ্রিকা, সাহারা, বিন্ধ্য, হিমালয়, সিংহল, ম্যাকমোহন লাইন, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ডায়মণ্ড হারবার ইত্যাদি।

কাল বিশেষের নাম—রবি, সোম, অগ্রহায়ণ, গ্রীষ্ম, শরৎ, ঊনবিংশ শতাব্দী, মোগল আমল, ১৯৪৭ ইত্যাদি।

বিষয় বিশেষের নাম—(ঘটনা, অবস্থা ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত হইবে) —সিপাহী বিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লব, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বঙ্গভঙ্গ, পুরস্কার বিতরণী কালাজ্বর, ওলাউঠা ইত্যাদি।

(২) **জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)**—কোন নাম যখন সাধারণভাবে এক জাতীয় সকল বস্তুকেই বুঝায়, বিশেষভাবে কোন একটিকে বুঝায় না তখন জাতিবাচক বিশেষ্য হয়। যেমন—বালক, বই, পাখি, নদী, পথ, গ্রাম, স্কুল, কলেজ, কলা, আম, লেবু, কাপড়, জামা, বালিশ, বাসন, ঘটি, বাটি, মা, দাদা, হিন্দু, মুসলমান, মজুর, চাষী ইত্যাদি।

(৩) **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)**—কোন নাম দ্বারা সমগ্রভাবে কোন এক জাতীয় বস্তুর সমষ্টি বুঝাইলে তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলা হয়। যেমন—সভা, সমিতি, সমাজ, শ্রেণী, সম্প্রদায়, পঞ্চায়েৎ, কমিটি, বোর্ড, জুরি, সংঘ, দল, জনতা, পল্টন, নৌবহর, বিমানবাহিনী, লোকারণ্য, করিযূথ ইত্যাদি।

(৪) **উপাদানবাচক বিশেষ্য (Material Noun)**—যে সকল গণনা করা যায় না, শুধু পরিমাপমাত্র করা যায় তাহাদের নামকে উপাদানবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—জল, বায়ু, মাটি, আটা, তেল, চিনি, ময়দা, পাথর কয়লা ইত্যাদি।

(৫) **ভাববাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)**—ভাববাচক বিশেষ্য দ্বারা কোন কিছুর গুণ, ধর্ম, ভাব, অবস্থা ইত্যাদি অভিহিত হয়। যেমন—দয়া, ক্ষমা, বিদ্যা, প্রতিভা, মনীষা, বিনয়, ক্রোধ, শৈত্য, উত্তাপ, দুঃখ, সুখ, স্বাস্থ্য শান্তি, তৃপ্তি, তুষ্টি ইত্যাদি।

(৬) **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Noun, Gerund)**—কোন নাম কোন ক্রিয়া বা কার্যের নাম বুঝাইলে তাহাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে।

যেমন—দর্শন, গমন, ভোজন, পঠন, পাঠন, হওয়া, দেখা, বলা, চলা, ধরা ইত্যাদি।

খ। সর্ব্বনাম

যে পদসকল নামের স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাকে সর্বনাম বলে। যেমন—আমি, তুমি, সে, উহা ইত্যাদি। 'আমি' কথাটি যে কোনো বক্তাই নিজেকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করিতে পারে; এইরূপ 'তুমি', কথাটি যাহাকে বলা হইতেছে এইরূপ যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার আমিও নয়, তুমিও নয় এইরূপ যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে 'সে' এবং যে কোনো বস্তু সম্পর্কে 'ইহা' ব্যবহৃত হইতে পারে। এইভাবে এই কথাগুলি সকলেই নাম বলিয়া ইহাদের নাম সর্বনাম।

ইংরেজি ব্যাকরণে বলা হয়, সর্বনাম বিশেষ্যের পুনরুক্তি নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্বনাম সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নহে। যেমন—রাম ভাত খাইয়াছে। রাম এখন স্কুলে যাইবে। রামের সঙ্গে শ্যাম যাইবে। এই বাক্যত্রয়ে শ্রুতিকটুতা নিবারণের জন্য আমরা বলি, রাম ভাত খাইয়াছে। সে এখন স্কুলে যাইবে। তাহার সঙ্গে শ্যাম যাইবে। কিন্তু বিশেষ্যের পুনরুক্তি নিবারণ ছাড়াও সর্বনাম ব্যবহার হয়। এবং সেই ধরনের প্রয়োজনই বেশী। যেমন—**আমি** কোথাও যাইব না। **তুমি** কোন দিন আসিয়াছ? **তারা** হাট্টিমা টিম টিম, **তারা** মাঠে পাড়ে ডিম। **সব** ভাল **যার** শেষ ভাল। এই সব বাক্যে সর্বনাম বিশেষ্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্বনাম পদকে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) **পুরুষবাচক** (Personal)—**আমি, তুমি, সে**। এবং ইহাদের সমার্থক মুই, তুই, তোমরা, আপনি, তিনি ইত্যাদি পুরুষবাচক সর্বনাম।†

(২) **নির্দেশক বা নিশ্চয়সূচক** (Demonstrative)—এ, ইহা, উহা ইনি, উনি, এটা, সেটা প্রভৃতি নিকটে বা দূরে অবস্থিত কোনো কিছু নির্দেশ করে বলিয়া ইহারা নির্দেশক সর্বনাম।

এ, এটা, ইহা, ইনি প্রভৃতি নিকটের কিছু বুঝাইতেছে বলিয়া ইহারা নিকট বা সামীপ্যসূচক নির্দেশক সর্বনাম।

বাংলা নির্দেশক সর্বনামগুলির সঙ্গে নির্দেশক প্রত্যয় (articles) টা, টি, খানা, খানি প্রভৃতি ব্যবহার হইতে পারে। যেমন—এটা, ওটা, ঐটি, ওখানা, ওখানি, সেখানি ইত্যাদি।

---

†এক অর্থে সকল সর্বনামই পুরুষবাচক। এবং সকল বিশেষ্যও পুরুষবাচক।

(৩) **অনির্দেশক বা অনিশ্চয়সূচক (Indefinite)**—কেহ, কেউ, কিছু ইত্যাদি সর্বনাম অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদিগকে অনির্দেশক বা অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম বলে।

যেমন—বইটি নিশ্চয়ই **কেহ** নিয়াছে। **কিছু** বলিবে কি? **কাহাকেও** একথা বলিও না।

(৪) **প্রশ্নবাচক সর্বনাম (Interrogative)**—কি, কোন, কাহারা ইত্যাদি সর্বনাম প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা প্রশ্নবাচক সর্বনাম।

(৫) **সাকল্যবাচক (Inclusive)**—সব, সকল, উভয়, সমুদয় প্রভৃতি সর্বনাম একত্রে একাধিক বা অনেক বুঝায় এইজন্য ইহাদিগকে সাকল্যবাচক সবনাম বলে।

(৬) **আত্মবাচক (Reflexive)**—নিজে, আপনি, স্বয়ং প্রভৃতি সর্বনাম অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া আত্ম বা নিজকে বুঝায়। এইজন্য ইহারা আত্মবাচক সর্বনাম।*॥

(৭) **সাপেক্ষ বা সংযোগবাচক (Relative)**—যে, যিনি, যাহা ইত্যাদি সর্বনাম দুই বাক্যকে সংযুক্ত করে বলিয়া ইহারা সাপেক্ষ বা সংযোগ-বাচক সর্বনাম। যেমন:

যে কথা শুনিবেনা, **সে** মার খাইবে। **যাহা** হজম হইবে না **তাহা** খাইবেনা। **যিনি** দেশের জনসাধারণকে ভালবাসেন **তিনিই** প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

(৮) **ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক (Reciprocal)** এতে-ওতে ওরা-ওরা, এইসব সর্বনামের দ্বিত্ব ব্যবহারে পরস্পরে এই অর্থ প্রকাশ করে। ইহারা ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম। যেমন:

এতে-ওতে খাপ-খায় না; ওরা-ওরাই কাজটা সেরে ফেলেছে।

গ। ক্রিয়া

যে পদ দ্বারা কোনো কিছু কার্য বা ঘটনার সংঘটন বুঝায় তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন—যাই, খাই, খায়, হয় হইতেছিল, ঘটিবে, ঘটিত ইত্যাদি। ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

---

*'আমি' বলিতে বক্তা নিজেকে বুঝাইলেও ইহা আত্মবাচক সর্বনাম নহে। আত্মবাচক সর্বনাম স্বকীয়ত্ব বা স্বকর্তৃত্বের উপর জোর পড়িবে। ইহা সাধারণ পুরুষবাচক সর্বনাম। ইংরেজি 'I' এবং 'myself' এর অর্থগত পার্থক্য মনে রাখিবে

§ বইটি নিজে নিজে পড়। আপনা আপনি বলিল। এই সব ক্ষেত্রে দ্বিত্ব সর্বনামগুলিকে ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম না বলাই ভাল। পারস্পরিক হইতে হইলে বস্তু বা ব্যক্তি একাধিক হইতে হইবে, কিন্তু এখানে নিজে নিজে ও আপনা আপনি অর্থ যথাক্রমে yourself ও himself—অর্থাৎ reflexive pronoun বা আত্মবাচক সর্বনাম।

ক্রিয়াপদ বাক্যমধ্যে বিশেষ্যাদি পদ সম্পর্কে কিছু বলে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াপদ দ্বারাই বাক্যের ভাবটি সম্পূর্ণ হয়। অন্য কথায় বলা যায় ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যই হয় না। তবে বাংলা assertive বাক্যে ক্রিয়াপদ প্রায়ই উহ্য থাকে।

যেমন—রাম ভাল ছেলে। এখানে **হয়** ক্রিয়া উহ্য আছে। ইংরেজিতে Ram is a good boy, হিন্দীতে "রাম অচ্ছা লড়কা হৈ।" এ সব স্থলে is বা **হৈ** ক্রিয়া বাদ দিলে বাক্য অশুদ্ধ হইবে, কিন্তু বাংলায় রাম হয় ভাল ছেলে বা রাম ভাল ছেলে হয় এই ধরনের বাক্য রীতিবিরুদ্ধ হইবে। অবাঙ্গালীরা বাংলা বলিবার সময় ক্রিয়াপদে প্রায়ই এই ভুল করে, যেমন—রাম বড়ো ভালো ছেলে আছে, রাম এখানে না আছে।

বাংলাতেও verb 'to be' সব সময় উহ্য থাকে না। যেমন—এখন কটা বেজেছে? পাঁচটা **হবে**। অবশ্য এখানে অনুমানের ভাবটা স্পষ্ট। এই অনুমানের ভাব থাকিলেই বাংলায় verb 'to be' উহ্য হয় না। যেমন—সভায় কত লোক হয়েছে? হাজার খানেক **হবে**।

ঘ। বিশেষণ

যে পদ অন্য পদের গুণ, ধর্ম বা অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষণ বলে।

বিশেষণ চার প্রকার :—

(১) নামবিশেষণ (বিশেষ্য ও সর্বনামের বিশেষণ)।

(২) ক্রিয়াবিশেষণ
(৩) বিশেষণীয় বিশেষণ
(৪) অব্যয়ের বিশেষণ } Adverb

(১) **নামবিশেষণ** নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণটি প্রকাশ করে। যেমন :

বিশেষ্যের বিশেষণ—**লাল** ফুল, **ছোট** পাতা, **গহীন** জল, **নিবিড়** অরণ্য, **দুস্তর** সমুদ্র, **দুর্দান্ত** পরাক্রম, **নাম-না-জানা** পাখি, **দুগ্ধফেননিভ** শয্যা, **বীণাবিনিন্দিত** কণ্ঠ ইত্যাদি।

সর্বনামের বিশেষণ—**ছোট** আমিটা সব সময়ই ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর **বড়** আমি সেই স্বার্থের গণ্ডি ভেঙ্গে নিজেকে জগতে ব্যাপ্ত করে দিতে চায়।

(২) **ক্রিয়াবিশেষণ** ক্রিয়া কিরূপে কখন, কোথায় ঘটে, তাহা প্রকাশ করে। যেমন—**ধীরে** চল। **সাবধানে** থাকিবে। **প্রণামপূর্বক** নিবেদন। **সত্বর** উত্তর দিও। **মুহুর্মুহু** বজ্রপাত হইতেছে। **ক্রমশঃ** জানিতে পারিবে। **সম্প্রতি** কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। **হন্‌হন্** করিয়া ছুটিতেছে। **হো হো** করিয়া হাসিয়া উঠিল।

(৩) **বিশেষণীয় বিশেষণ** বিশেষণের গুণ, অবস্থা, পরিমাণাদি প্রকাশ করে। যেমন—**খুব** ভাল ছেলে। **অতি** উত্তম কথা। **কী** সুন্দর দৃশ্য। **কত** বড় মাছ। **বেশ** জোরে হাঁটে। **বড়** ধীরে চলে।

বিশেষণীয় বিশেষণকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

নামবিশেষণীয় বিশেষণ—**অতি** সুন্দর ছবি। **বড়** ভাল প্রস্তাব। **মহা** পরাক্রম সেনাপতি।

ক্রিয়াবিশেষণীয় বিশেষণ—**খুব** ধীরে চল। **অতি** সাবধানে থাকিবে। বড় ভাল বলিয়াছ। **কী** চমৎকার মানাইয়াছে।

(৪) **অব্যয়ের বিশেষণ**—যে বিশেষণ অব্যয়ের অর্থ বিশেষ করিয়া দেয় তাহা অব্যয়ের বিশেষণ। যেমন—**ঠিক** যেন একটা বাঁদর। (**ঠিক** পদটি 'যেন' অব্যয়পদকে বিশেষিত করিতেছে)। **প্রায়** তারই মত দেখতে (**প্রায়** পদটি 'মত' অব্যয়পদকে বিশেষিত করিতেছে)।

কতকগুলি সর্বনাম বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া উহাদিগকে বিশেষিত করে। ব্যাকরণে এইগুলিকে **সর্বনামীয় বিশেষণ** বলা হয়। যে, সে, এ, ও, অই, অত, কয়, কতক, কোন্, কিছু, সব, যেমন, উভয়, অন্য, অন্যতম, অমুক, যত, তত ইত্যাদি সর্বনামীয় বিশেষণ।

সর্বনামীয় বিশেষণগুলি নামবিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ এবং ক্রিয়াবিশেষণ রূপেই ব্যবহার হয়। যেমন—**যেমন** কর্ম **তেমন** ফল। এখানে 'যেমন' 'তেমন' নামবিশেষণ। **যেমন** দয়ালু **তেমন** সৎ। এখানে 'যেমন' 'তেমন' বিশেষণীয় বিশেষণ। **যেমন** চেয়েছ **তেমন** পেয়েছ। এখানে, 'যেমন' 'তেমন' ক্রিয়াবিশেষণ।

সর্বনামপদের মত **অব্যয়পদও বিশেষণ রূপে ব্যবহার হয়।** অব্যয়পদ প্রধানতঃ ক্রিয়াবিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় নামবিশেষণ রূপেও অব্যয়ের ব্যবহার আছে।

হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। চারিদিক **খাঁ খাঁ** করিতেছে। **ঢং ঢং** করিয়া ঘণ্টা পড়িল। এই সব বাক্যে অব্যয়পদ ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হঠাৎ বাবু। **ধিক্** জীবন। (এমন ধিক্ জীবনে প্রয়োজন কী?) এই সব বাক্যে অব্যয়পদ নামবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

• **বিভক্তিযুক্ত সম্বন্ধপদ** বিশেষ্যের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন মনের মানুষ, সোনার হার, হরিণের শিং, সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ, যখের ধন, সুখের পায়রা, টাকার কুমীর।

সংখ্যাবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

(ক) সংখ্যা বা পরিমাণবাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া সংখ্যা বা পরিমাণ বুঝাইলে তাহাকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বলে।

যেমন, বার মাস। সাত বার। নবগ্রহ। পঞ্চাশটি আম। একহাজার সৈন্য। সহস্র যোজন। পাঁচ সের দুধ। দুইহাত লাঠি।

(খ) ক্রমবাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া পর পর থাকা বা ধারাবাহিকতা বুঝাইলে তাহাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে।

যেমন, পয়লা তারিখ। তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চম শ্রেণী। বিংশ শতাব্দী। অশীতিতম বৎসর। তের নম্বর বাড়ি। সাতুই ফাল্গুন। ১৪৪ ধারা।

৬। অব্যয়

লিঙ্গ বচন কারকে যে পদের কোন ব্যয় বা বিকার হয় না তাহাকে অব্যয় পদ বলে।*

বাক্যে ব্যবহৃত হইবার সময় অন্যান্য পদ বিভক্তিযুক্ত হইয়া বা লিঙ্গ বচন অনুযায়ী প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া কমবেশি পরিবর্তিত হয়। অব্যয়পদে এইরূপ পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি বসে না, পুং স্ত্রী ক্লীবলিঙ্গে আকার এক থাকে। যেমন, **আঃ**, কি মুস্কিল! **হঠাৎ** দেখা হইয়া গেল। **বরং** আমিই যাইব। এখানে আঃ, হঠাৎ, বরং প্রভৃতি পদ বাক্যের ভাবপ্রকাশে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু কোনরূপ বাক্যেই ইহাদের রূপের কোন পরিবর্তন হইবে না।

* বলা বাহুল্য ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা। বাংলায় এই সংজ্ঞা পুরোপুরি খাটে না। রায় বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র বিতর্ক করিয়াছিলেন, এই সংজ্ঞাতে বিশেষণকেও ত অব্যয় বলিতে হয়। কেন না, বাংলায় ছেলেটিও ভাল, মেয়েটিও ভাল অর্থাৎ বিশেষণের লিঙ্গ বচন কারকে বিকার নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, কোনো সুবুদ্ধি বালক যদি প্রশ্ন করে 'কেশব আম খায়' এই বাক্যে 'কেশব' ও 'আম' অব্যয় কেন হইবে না, তবে ব্যাকরণকারেরা অবাক্।

ইহা ছাড়াও এই সংজ্ঞার অন্যতর ত্রুটি আছে। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া প্রভৃতি পদের অর্থগত ভাগ, কিন্তু অব্যয় আকৃতিগত ভাগ। অর্থের দিকে চাহিয়া অব্যয়ের বিভাগ করিতে গেলে ইংরেজি Preposition, Conjunction, Interjectionএর বাংলা নাম দিলেই অনেকটা কাজ চুকিয়া যায়—তারপর যেগুলি থাকে তাহা প্রায়ই ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, অর্থাৎ ইংরেজি ব্যাকরণের খাঁটি adverb।

অব্যয়ের আলোচনায় আমরা সংস্কৃত ও ইংরেজি মতের একটা সমন্বয় করিবারই চেষ্টা করিয়াছি।

অর্থের দিক হইতে ধরিলে অব্যয়পদ **চারিভাগে** বিভক্ত। ইহারা

(১) বিশেষণ ও ক্রিয়াকে বিশেষিত করে (adverb)

(২) বাক্য বা পদ সংযোজনা ও বিযোজনা করে (conjunction)

(৩) বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বুঝায় (preposition and post-position):

(৪) মনের হঠাৎ-আবেগ প্রকাশ করে (interjection)।*

(১) বিশেষক অব্যয়

যে অব্যয় বিশেষণ ও ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করে তাহাকে বিশেষক অব্যয় বলা যায়। এইগুলিকে ক্রিয়াবিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণও বলা চলে।†

অতি, অতীব, যৎপরোনাস্তি, অতিশয়, খুব প্রভৃতি বিশেষণ বিশেষক। হঠাৎ, পুনরায়, প্রায়, প্রায়ই, কদাচ, কবে ইত্যাদি ক্রিয়াবিশেষক।

(২) সংযোজক অব্যয়

যে অব্যয় দুই পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে তাহাকে সংযোজক অব্যয় বলে। ও, এবং, আরও, বরং, তবু, পরন্তু, নতুবা, যেহেতু, কেননা, ফলতঃ, স্নুতরাং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়।

* এই বিভাগ মূলতঃ যোগেশ বিদ্যানিধি কৃত।

† বিশেষণের আলোচনায় এই জাতীয় পদকে বিশেষণীয় বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ বলা হইয়াছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণকারেরা সকলেই ইহাদিগকে যুগপৎ অব্যয় এবং বিশেষণ বলিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই সঙ্কট অনুমান করিয়াছিলেন। "সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা ঠিক রাখিলে বিশেষণকে অব্যয়মধ্যে ধরা কর্তব্য।" কিন্তু বলা বাহুল্য তিনি স্বয়ং এই "কর্তব্য" পালন করেন নাই।

বিশেষণপদ (adjective) নামপদের গুণ (quality) প্রকাশ করে; কিন্তু বিশেষণীয় বিশেষণ গুণ প্রকাশ করে না, গুণের তারতম্যাদি প্রকাশ করে মাত্র; সেইরূপ ক্রিয়াবিশেষণও ক্রিয়া ঘটিবার ধরন (mode) ইত্যাদি প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশেষণ qualify করে এবং ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ modify করে। এই দিক হইতে Adjectiveএর সহিত Adverbএর পার্থক্য আছে।

এইবার বাংলায় খাঁটি Adverb কোন্ গুলি চিনিয়া লইতে হইবে। অনেক সময় বিশেষণপদ (যাহা আসলে নামপদের বিশেষক) বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ এর মত ব্যবহার হয় যেমন, **ভাল** নাচে, **প্রবল** কম্প দিয়া জ্বর উঠিল, ইত্যাদি। কিন্তু **হঠাৎ** জ্বর আসিল, **খুব** ভাল নাচে ইত্যাদিতে হঠাৎ, খুব প্রভৃতি পদ খাঁটি adverb, ইহারা নাম বিশেষকরূপে ব্যবহৃত হয় না। এই খাঁটি adverbগুলির প্রত্যয়, বিভক্তি যোগেও কোন বিকার হয় না।

বাংলা ভাষায় বিশেষণেরও বিকার হয় না, আবার হয়ও—'সুন্দরী বালিকা' বাংলায় অচল নহে। এইজন্য বাংলায় খাঁটি adverbকে (বিশেষণীয় বিশেষণ ও সর্বনামজাত বা অসমাপিকা ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ ছাড়া সকল ক্রিয়াবিশেষণ) অব্যয় বলাই সঙ্গত।

(৩) পদান্বয়ী অব্যয়

বাক্যে নাম বা সর্বনাম পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বুঝাইতে যে অব্যয় ব্যবহার হয় তাহাদিগকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। দ্বারা, করিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ঠাঁই, নিকটে, বিনা, হেন, মতন, যেন ইত্যাদি।*

(8) আবেগ প্রকাশ

পদের কিংবা বাক্যের সহিত আবেগ প্রকাশক অব্যয়ের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সম্বোধনে, পাদপূরণে ও আকস্মিক আবেগাদি প্রকাশ করিতে এই অব্যয়ের ব্যবহার হয়।

আঃ, উঃ, আ মোলো, ইস্, কী ভয়ানক, মাগো, ওরে বাবা, ওহে, ওগো ইত্যাদি।

অনুশীলনী

(ক)

১। শব্দ ও ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগে কিভাবে পদ গঠিত হয় তাহা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

২। ইংরেজি ব্যাকরণে পদ আছে কি ?

৩। বাক্যে নামপদ ও ক্রিয়াপদের কার্য কি ব্যাখ্যা কর। বাংলায় ক্রিয়াপদ ছাড়াও যে বাক্য হইতে পারে তাহা দেখাও।

(খ)

8। বিশেষ্য কয় প্রকার ? কি কি ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

নিম্নের কোন্‌টি কোন প্রকার বিশেষ্য বল—

বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লেংড়া আম, চড়ুই পাখি, কুতুবমিনার, হিন্দুমহাসভা, বিমানবাহিনী, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, স্বাদেশিকতা, চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়, পুরস্কার-বিতরণী, মরুভূমি, সাহারা, মনীষা, মনীষী, পেনিসিলিন, কুইনিন।

---

*বাংলায় কারক বোধক বা অন্য অর্থবোধক অনুসর্গগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। ইংরেজি preposition এর সঙ্গে ইহাদের ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। Preposition শব্দেব পূর্বে বসে, কিন্তু ইহারা পরে বসে—এই জন্য ইহারা prepositiou নয়, post-position. Preposiion এর মত শব্দেব পূর্বে ইহাদের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল।

নির্দেশ :—বিশ্ববিদ্যালয় জাতিবাচক বিশেষ্য, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। লেংড়া আম, চড়ুই পাখি ইত্যাদি সংজ্ঞা-বাচক নহে, জাতিবাচক বিশেষ্য। হিন্দুমহাসভা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যও হইতে পারে, তবে প্রতিষ্ঠানের নাম বলিয়া সংজ্ঞাবাচক বলাই ভাল। পেনিসিলিন, কুইনিন ইত্যাদি দ্রব্যবাচক বিশেষ্য, ঔষধের নাম ধরিলে সংজ্ঞাবাচকও বলা চলিবে।

(গ)

৫। সর্বনাম কি সর্বদাই বিশেষ্যের পুনরুক্তি নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়? না হইলে তোমার বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৬। সর্বনামের শ্রেণী বিভাগ কর।

৭। (ক) আত্মবাচক সর্বনাম বলিতে কি বোঝায়? 'আমি' আত্মবাচক সর্বনাম কি না বল।

(খ) ব্যতিহারিক সর্বনাম কাহাকে বলে? 'নিজে নিজে' 'আপনা আপনি' ইত্যাদি কি ব্যতিহারিক সর্বনাম?

৮। নিম্নের সর্বনামগুলি কোন্‌টি কি প্রকার সর্বনাম বল :—

কাহাকেও কটুবাক্য বলিও না। **ওই** ছেলেটি বড় ঝগড়াটে। **যে** সহে **সে** রহে। **কোন্‌** মূর্খ ইহা বলিয়াছে? **তিনি স্বয়ং** উপস্থিত ছিলেন। **সবটা** দুধ খাইয়া ফেল। **এটা কোন** কাজের কথা নয়। **কেউ** বাড়ি নাই।

(ঘ)

৯। বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ কর।

১০। দৃষ্টান্ত দাও :

(ক) সর্বনামের বিশেষণ, (খ) বিশেষণীয় বিশেষণ, (গ) অব্যয়ের বিশেষণ।

১১। (ক) বিশেষণীয় বিশেষণ কি? নাম বিশেষণীয় বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণীয় বিশেষণের উদাহরণ দাও।

(খ) সংখ্যাবাচক ও ক্রমবাচক বিশেষণ কাহাকে বলে? '১০০ টাকা' ও '১৪৪ ধারা'—এখানে ১০০ ও ১৪৪ কিরূপ বিশেষণ?

১২। নিম্নলিখিত পদগুলিকে বাক্যে বিশেষণরূপে ব্যবহার কর :—

(ক) সর্বনাম, (খ) অব্যয়, (গ) বিশেষ্য।

(ঙ)

১৩। অব্যয় কাহাকে বলে ?

১৪। অর্থের দিক হইতে অব্যয়ের কয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব ? প্রত্যেক শ্রেণীর অব্যয়ের কয়েকটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১৫। ইংরেজি parts of speech এর কোন কোন গুলি বাংলা অব্যয়ের মধ্যে পড়িবে বল। এবং তাহাদের বাংলা নাম কি হইবে তাহার উল্লেখ কর।

১৬। নিম্নের অব্যয়গুলি কোন শ্রেণীর অব্যয় বল এবং ইহাদের দ্বারা পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর ঃ—

নচেৎ, নতুবা, হঠাৎ, যৎপরোনাস্তি, যুগপৎ, শনৈঃ শনৈঃ, হইতে, থেকে, যেন, মতন, ঠাঁই, প্রায়ই, ইস্, কী, হ্যাঁগা, ভো, হারে রে রে রে রে, সাঁই সাঁই, গজ্ গজ্, ফলতঃ, সুতরাং, সাবাস্।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বচন (Numbers)

বাক্যে নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য পদ ও সর্বনাম পদ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। নামপদে ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা অর্থাৎ এক বা অনেক বোঝানোকে ব্যাকরণে বচন বলে।

বাংলাভাষায় বচন দুইটি—একবচন ও বহুবচন। একবচন এক সংখ্যা নির্দেশ করে, এবং বহুবচন একাধিক সংখ্যা নির্দেশ করে। যেমন, রাম, বই, সূর্য, আমি, সে ইত্যাদি একবচন পদ। ছেলেরা, তাহারা, আমগুলি, পণ্ডিতগণ, পাখীসব ইত্যাদি বহুবচন পদ।

ইংরেজিতে বিশেষ্য, সর্বনামপদের যেমন বচন আছে, ক্রিয়াপদেরও বচন আছে; হিন্দী ও সংস্কৃতে বিশেষ্য, সর্বনামপদের আছে, ক্রিয়াপদেরও আছে এবং বিশেষণপদেরও আছে—কিন্তু বাংলায় শুধু বিশেষ্য ও সর্বনামেরই বচন আছে, অন্য পদের বচন নাই।

যেখানে বহুবচন হয় না

বিশেষ্য বা সর্বনামপদ ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী না বুঝাইলে তাহার বহু-বচন হয় না।

(১) সাধুতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি গুণবাচক বিশেষ্য, (Abstract Noun), সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অবস্থাবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun), ইহাদের এক দুই ইত্যাদি হয় না বলিয়া ইহাদের বহুবচন নাই।

বহুত্ববাচী শব্দ যোগ করিয়া এখানে বহুর ধারণা দিতে হয়। এসব **চালাকি** এখানে চলবে না। সাংখ্যমতে দুঃখ তিন প্রকার বলা হইয়াছে।

(২) দর্শন, গমন, ভোজন ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও (Verbal Noun, Gerunds) সাধারণতঃ সংখ্যা বুঝায় না। এই জন্য ইহাদেরও বচন নাই।

কিন্তু সংখ্যার ভাব থাকিলে ইহাদেরও বহুবচন হয়। যেমন আগামী সপ্তাহে বধূটির **দ্বিরাগমন** হইবে। যাত্রীদের ইতিমধ্যেই পাঁচবার **দেবতা দর্শন** হইয়াছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা দিবসে **দ্বিভোজন** করেন না।

(৩) মাটি, জল, সোনা ইত্যাদি পদার্থবাচক নাম সংখ্যা বুঝায় না বলিয়া ইহাদেরও বচন নাই।

কিন্তু সংখ্যা বুঝাইলে ইহাদেরও বহুবচন হইবে। যেমন, **জমিগুলি** সস্তায় কিনিতে পারিবে না (একাধিক জমিখণ্ড অর্থে)। **সোনাগুলি** বিক্রয় করিয়া দাও (একাধিক স্বর্ণখণ্ড অর্থাৎ গহনা অর্থে)।

(৪) কলিকাতা, ঢাকা, রাম, শ্যাম ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) একটি মাত্র বিষয়কে বুঝায় বলিয়া ইহাদের বহুবচন হয় না।

কিন্তু, আমাদের ক্লাসে তিনজন **রাম** আছে। ভারতবর্ষে দুইটি **বহরমপুর** আছে। এইসব বাক্যে বিষয় একাধিক বলিয়া সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যেরও বহুবচন হইবে।

একবচন প্রকাশের উপায়

(১) বাংলায় একবচন প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন প্রত্যয় নাই। নামপদ স্বতঃই একবচন প্রকাশ করে। যেমন গাছ, ফল, রাম ইত্যাদি।

(২) কখনো কখনো নামপদের সঙ্গে 'এক' এই সংখ্যা-বিশেষণ ব্যবহার করিয়া একের ধারণা দেওয়া হয়। যেমন, এক টাকা, এক দিন।

(৩) নির্দেশক বিভক্তি টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি. ইত্যাদি যোগেও একবচনের অর্থ প্রকাশ হয়। যেমন, ছেলেটা, কাপড়খানা, ছড়িগাছা, ইত্যাদি।

বহুবচন প্রকাশের উপায়

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের নানাবিধ উপায় আছে।

(১) বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া :

রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো, দিগ, দের ইত্যাদি যোগে—

যেমন—শিশুরা, ছেলেরা, ফুলগুলি, মানুষগুলো, বাঁদরগুলো, আমাদের, তাহাদিগকে।

(২) সমষ্টিবাচক শব্দ বিভক্তিরূপে যোগ করিয়া :

সব, সমূহ, গণ, বৃন্দ, কুল, চয়, সভা মণ্ডলী ইত্যাদি যোগে—

যেমন, পাখীসব, বৃক্ষসমূহ, নরগণ, বালকবৃন্দ, নৃপকুল, পুষ্পচয়, কুসুমনিকর বুধমণ্ডলী, ব্রাহ্মণসভা ইত্যাদি।

(৩) অনেকবোধক বিশেষণ যোগ করিয়া :

অনেক, অসংখ্য, বিস্তর, সকলে, পাঁচ, সাত, হাজার, সহস্র, ইত্যাদি যোগে—

যেমন, অনেক লোক, অসংখ্য মানুষ, বিস্তর ফুল, সব ছেলে, সকল ছাত্র, পাঁচজন, সাতবার, হাজার টাকা, সহস্র সৈন্য।

বাংলায় শব্দদ্বিত্ব দ্বারা বহুবচন প্রকাশের আর কয়েকটি অদ্ভুত উপায় আছে—

(১) একবচন পদের বিশেষণটিকে দ্বিত্ব করিয়া।

যেমন, **ভাল ভাল** আম, **বড় বড়** বাড়ী, **লাল লাল** ফুল, **ছোট ছোট** ছেলে, **পাকা পাকা** আতা ইত্যাদি।

(২) একবচন বিশেষ্য পদটিকেই দ্বিত্ব করিয়া—

ফুলে ফুলে মধু, **ঘরে ঘরে** হাহাকার, **গ্রামে গ্রামে** দুর্ভিক্ষ, **ডুবে ডুবে** শালুক ইত্যাদি।

(৩) অনুকার শব্দ দ্বারা—

কাপড় চোপড় আনিনি। **জলটল** খাও। **পুঁথিপত্র** কোথায়? **ছেলেপুলে** কটি?

একবচন দ্বারা বহুবচন

কখনো কখনো একবচন পদই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে।

(১) সাধারণতঃ জাতি বা শ্রেণী বুঝাইলেই একবচনের বিভক্তি যোগে বহুবচন হয়। যেমন, মাছ জলে থাকে। গোরুতে ঘাস খায়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

(২) কখনো কখনো প্রসঙ্গ হইতেই বহুত্বের ধারণা জন্মে। যেমন, এখানে মশা নাই। আকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে। গাছের পাতা নড়িতেছে না। মেয়েটি ফুল তুলিতেছে।

দুইবার বহুবচন করা নিষেধ

বাংলায় বহুবচন করিবার জন্য পদান্তে বহুবচনের বিভক্তি ইত্যাদি যুক্ত হয়। অনেক সময় বহুত্ববাচক বিশেষণাদি যোগেও বহুবচন করা হয়। ইংরেজি বা সংস্কৃতেও মোটামুটি ইহাই নিয়ম; তবে সংস্কৃত ও ইংরেজিতে বহুত্ববাচী বিশেষণের পরেও বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়, বাংলায় এরূপ হয় না।

ইংরেজিতে 'many persons', সংস্কৃতে 'অনেকাঃ লোকাঃ' ইত্যাদিই শুদ্ধ, কিন্তু বাংলায় 'অনেক লোকগুলি' অশুদ্ধ, এখানে 'লোকগুলি' বা 'অনেক লোক' শুদ্ধ। ইংরেজিতে 'five day' লিখিলে ভুল হইবে, কিন্তু বাংলায় 'পাঁচ দিনগুলি' লিখিলেই ভুল হয়।

বিশেষণ দ্বিত্ব দ্বারা বহুবচন হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন—ছোট ছোট গ্রাম, ছোট ছোট গ্রামগুলি; বড় বড মেয়ে, বড় বড় মেয়েরা, ইত্যাদি।

বহুত্ববাচী বাংলা প্রত্যয়ের প্রয়োগ

বহুত্ববাচী সকল বিভক্তিই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না;

(১) রা, এরা, সাধারণত মনুষ্যাদি বাচক শব্দের সহিত যুক্ত হয়। যেমন, দেবতারা, মানুষেরা, ছেলেরা ইত্যাদি।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে রা, এরা ব্যবহার সীমাবদ্ধ। যেমন, গাছেরা

মাছেরা, এইরূপ প্রয়োগ সাধারণত হয় না। তবে আধুনিক কাব্যিক ভাষায় এইরূপ ব্যবহার হইতেছে।

কবিতায় অপ্রাণিবাচককেও প্রাণিবৎ কল্পনা করিলে রা, এরা, প্রয়োগ চলে। যেমন, 'টুপ টাপ ঝরে শিশিরেরা'। 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে?'

(২) গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রাণী অপ্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। এই বিভক্তিগুলি ঈষৎ তুচ্ছার্থক এবং অনেকটা নির্দেশার্থক। ছেলেরা, মেয়েরা এবং ছেলেগুলি, মেয়েগুলি পদের মধ্যে পরের গুলি তুচ্ছার্থক।

দিগ, দিগের, দের, এদের ইত্যাদি প্রত্যয়ও প্রাণিবাচক, এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহার বিশেষ নাই। তবে প্রাণিবৎ কল্পনা করিলে ইহাদের প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহার হইতে পারে।

একবোধক নির্দেশক প্রত্যয়ের প্রয়োগ

বাংলায় নাম ও সংখ্যাবোধক শব্দকে নির্দেশিত করিবার জন্য যে-সব শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে নির্দেশক প্রত্যয় বলে। যথা—টা, টি, টুকু, টুকুন, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি। ইহারা এক বচনের অর্থ প্রকাশ করে। শুধু সংখ্যা শব্দের সঙ্গে বহুবচনেরও অর্থ প্রকাশ করে। যেমন একটা আম, দশটা আম, চারটে ছেলে, পাঁচটি ফুল ইত্যাদি। ইহারা অর্থের দিক হইতে ইংরেজি article এর সমতুল্য, ইংরেজি article শব্দের পূর্বে বসে, বাংলায় নির্দেশকগুলি সাধারণতঃ পরে বসে। যেমন, The cat, An owl, A stick, The book। বাংলায় বিড়ালটা, একটা পেঁচা বা পেঁচাটা, ছড়িগাছা, বইখানি।

বাংলা নির্দেশক প্রত্যয়গুলি পদার্থ বা বস্তুর গুণ, আকৃতি ইত্যাদি প্রকাশ করে—

(১) টা, টি—একবোধক নির্দেশক প্রত্যয় সকল বিশেষ্যের সহিতই ব্যবহৃত হয়। টা অনাদরসূচক, টি আদরসূচক। যেমন ছেলেটা (অনাদরে), ছেলেটি (আদরে), মেয়েটি, বইটা, গোরুটা ইত্যাদি।

(২) টুক, টুকু, টুকুন—অল্প পরিমাণসূচক এবং আদরার্থক। টুকু, টুকুন অধিকতর আদরজ্ঞাপক। দুধটুকু খেয়ে ফেল। এই দুধটুকুনও খাবে না? এই পথটুকু ইত্যাদি।

(৩) খান, খানা, খানি—একবোধক নির্দেশক প্রত্যয়। সামান্য আদরার্থকও। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য। কাপড়খানা বইখানি। অল্প সরু, অনতিদীর্ঘ বস্তু সম্পর্কেও ব্যবহার হয়; যেমন বাঁশখানি, লাঠিখানা। অন্যত্র প্রয়োগ মুখখানি, পা দু'খানি, দেহখানি, গ্রামখানি, বাগানখানা।

(৪) গাছ, গাছা, গাছি—একবোধক নির্দেশক প্রত্যয়। একটু আদরার্থক। সাধারণতঃ লম্বা বা সরু বস্তু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। লাঠিগাছা, ছড়িগাছি, সোনার চুড়ি ক'গাছি ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক ও সর্বনাম শব্দের সহিতও নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে ইহারা একবোধক না-ও হইতে পারে। যেমন, দশটা, পাঁচখানা ইত্যাদি।

সর্বনাম শব্দের সঙ্গে ইহারা একবোধক বা সমষ্টিবোধক হইতে পারে। যেমন সেইটা, সবটা, ওইটি, সকলখানি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণে বচন বলিতে কি বুঝায়? সংস্কৃতে বচন কয়টি? ইংরেজি ভাষায় কয়টি? বাংলা ভাষায় কয়টি? উদাহরণ দাও।

২। বাংলায় একবচন প্রকাশের উপায় কি? একবচনের কি কোন পৃথক বিভক্তি চিহ্ন আছে?

৩। কোন্‌খানে বহুবচন হয় না, উদাহরণ দ্বারা বুঝাও।

৪ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, পদার্থবাচক বিশেষ্য ও সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচনের দুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

৫। বাংলায় বহুবচন প্রকাশের বিভিন্ন উপায়গুলি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬। উদাহরণ দাও:—

বিশেষ্যদ্বিত্বে বহুবচন, বিশেষণদ্বিত্বে বহুবচন, অনুকার শব্দে বহুবচন।

৭। বাংলায় বিশেষ্যপদকে দুইবার বহুবচন করার দৃষ্টান্ত দেখাও। এই বিষয়ে ইংরেজি ও সংস্কৃতের রীতি কি বল?

(৭০ পৃষ্ঠায় 'দুইবার বহুবচন করা নিষেধ' শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি পড়িয়া দেখ)।

৮। নিম্নলিখিত বহুত্ববাচী প্রত্যয়গুলি কোথায় ব্যবহৃত হয়, উদাহারণ-সহ বল—

(ক) রা, এরা ; (খ) গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন ; (গ) দিগ, দিগের, দের, এদের।

৯। নির্দেশক প্রত্যয় বলিতে কি বুঝায়? বাংলায় নির্দেশক প্রত্যয় কোনগুলি?

১০। নিম্নের নির্দেশক প্রত্যয়গুলি কি অর্থে কোথায় ব্যবহৃত হয় বল—

(ক) টা, টি ; (খ) টুক, টুকু, টুকুন ; (গ) খান, খানা, খানি ; (ঘ) গাছ, গাছা, গাছি।

তৃতীয় অধ্যায়

লিঙ্গ (Gender)

বিশেষ্যাদি পদের স্ত্রী পুরুষ ধারণাকে ব্যাকরণে লিঙ্গ বলে। বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।

(১) যে সকল শব্দে পুরুষ বুঝায় সেগুলি পুংলিঙ্গ। যথা পিতা, ভ্রাতা, রাজা, সিংহ ইত্যাদি।

(২) যে সকল শব্দে স্ত্রী বুঝায় সেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। যথা মাতা, ভগিনী, রানী, সিংহী ইত্যাদি।

(৩) যে সকল শব্দে স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝায় না সেই গুলি ক্লীবলিঙ্গ। যথা গাছ, ফল, জল, পাথর ইত্যাদি।

অর্থবাচক লিঙ্গ

বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ প্রধানতঃ অর্থের উপর নির্ভরশীল (Rational Gender)। অর্থাৎ পুরুষবাচক শব্দ এখানে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং অলিঙ্গক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

কিন্তু সংস্কৃতে লিঙ্গ অর্থানুসারে নির্ণীত হয় না। সেখানে শব্দের লিঙ্গ প্রধানতঃ প্রত্যয়াদির উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতে স্ত্রীবাচক 'দার' পুংলিঙ্গ, 'স্ত্রী' স্ত্রীলিঙ্গ, 'কলত্র' ক্লীবলিঙ্গ। হিন্দীতে তাহা প্রত্যয়াদির উপর নির্ভর করে না। Usage বা দীর্ঘ দিনের ব্যবহার অনুসারে সেখানে শব্দের লিঙ্গ নির্ণীত হয়। হিন্দুতে 'মকান' (House) পুংলিঙ্গ, 'দুকান' (Shop) স্ত্রীলিঙ্গ ; 'কুর্তা' (Shirt) পুংলিঙ্গ, 'ধোতী' (Dhoti) স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ অর্থবাচক বলিয়া এখানে শুধু বিশেষ্য শব্দেরই লিঙ্গ আছে, অন্যান্য শব্দের নাই। সর্বনাম শব্দেরও নাই। ইংরেজিতে He, She ; সংস্কৃতে সঃ, সা—কিন্তু বাংলায় সে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বোঝায়।*

সংস্কৃতে বিশেষণের লিঙ্গ আছে। সংস্কৃত রীতির বাংলায়ও এই নিয়ম রক্ষা করা হয়, যেমন মহতী সভা, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় নিজস্ব ভাষারীতিতে বিশেষণের লিঙ্গ নাই। যেমন সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে, সুন্দর ফুল ইত্যাদি।

*প্রাদেশিক ভাষায় সর্বনামের লিঙ্গ অছে। যেমন, চট্টগ্রামে হিতে (He), হিতাই (She) ; শ্রীহট্টে তা (He), তাই (She)।

হিন্দীতে সর্বনামের লিঙ্গ নাই, কিন্তু বিশেষণের আছে, ততোধিক ক্রিয়াপদেরও আছে।

বাংলায় লিঙ্গ পরিবর্তন

বাংলায় তৎসম ব্যতীত শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয় প্রধানতঃ তিন প্রকারে ঃ—

(১) পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর প্রত্যয়যোগে। যেমন—মামা, মামী ; পাগলা, পাগলী ; কলু, কলুনী ; ডাক্তার, ডাক্তারনী ইত্যাদি।

(২) স্ত্রীবাচক ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে। যেমন সাহেব, বিবি ; বাদশা, বেগম ; বর, বধূ ; ইত্যাদি।

(৩) পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ সংযোগে। যেমন, মদ্দা হাঁস, মাদী হাঁস ; এড়ে বাছুর, বকনা বাছুর ; পুরুষ মানুষ, মেয়েমানুষ।

(১) বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় যোগে

খাঁটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় মাত্র দুইটি ঃ—**নী এবং ঈ**।

(ক) নী (আনী, ইনী, নী, ন্,)—নী প্রত্যয়ের দিকেই কথ্য বাংলার ঝোঁক বেশী,—ইহা খাঁটি বাংলা ও বিদেশী শব্দের উত্তর জাতি বা পত্নী অর্থে প্রযুক্ত হয়। বেহাই—বেহাইন, বেহান ; প্রেত—প্রেতিনী, পেত্নী ; চোর—চোরনী ; চৌধুরী—চৌধুরানী। সাপ—সাপিনী ; গয়লা—গয়লানী ; গোয়ালা—গোয়ালিনী (গোয়ালী) কাঙ্গাল—কাঙ্গালিনী।

ভিখারী—ভিখারিনী ; পসারী—পসারিনী ; কলু—কলুনি, কলুনী ; তেলী—তেলিনি, তেলিনী ; নাতি—নাত্নী, নাতিন ; মিতা—মিতানী, মিতিন ; চাকর—চাকরানী ; খোট্টা—খোট্টানি, খোট্টানী ; উড়ে—উড়েনি, উড়েনী ; জেলে—জেলেনী ; পুরুৎ—পুরুৎনি, পুরুতনী ; ডাক্তার—ডাক্তারনী ; মাস্টার—মাস্টারনী ; ওঝা—ওঝানী।

(খ) ঈ, (ই)—এইটিও খাঁটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়। সাধারণতঃ সম্পর্ক বাচক শব্দে এবং জাতিবাচক শব্দের উত্তর ব্যবহৃত হয়।

খুড়া—খুড়ী, জেঠা—জেঠাই (রাঢ় অঞ্চলে), জেঠী ; মামা—মামী ; ঘোড়া—ঘুড়ী ; বামুন—বামনী ; ভেড়া—ভেড়ী ; মুসলমান—মুসমলানী ;

মোরগ—মুরগী ; পাঁঠা—পাঁঠী ; বুড়া—বুড়ী ; শালা—শালী ; খোকা—খুকী ; নেড়া—নেড়ী ; বেঙ্গমা—বেঙ্গমী ; বোষ্টম—বোষ্টমী ; কুঁদুলে—কুঁদুলী ; আহ্লাদে—আহ্লাদী ; কুঁজো—কুঁজী ; বেটা—বেটি ; ছোঁড়া—ছুঁড়ী ; দাদা—দিদি (দাদী পূর্ববঙ্গে ঠাকুরমা অর্থে)।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় (Double Suffix)—নী প্রত্যয়ের উপর কথ্যবাংলার ঝোঁক এত বেশি যে অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পরেও ইহার ব্যবহার হয়।

রজক—(রজকী) রজকিনী ; চণ্ডাল—(চণ্ডালী) চণ্ডালিনী। আহ্লাদে—(আহ্লাদী) আহ্লাদিনী ; শিষ্য—(শিষ্যা), শিষ্যানী ; গোপ—(গোপী) গোপিনী ; নট—(নটি) নটিনী ;গাঙ্ (স্ত্রীলিঙ্গ গঙ্গা শব্দজাত) গাঙিনী ; সিংহ –(সিংহী) সিংহিনী ; মাতঙ্গ—(মাতঙ্গী), মাতঙ্গিনী। ননদ, ননদী, ননদিনী।

স্ত্রীবাচক ভিন্ন শব্দ দ্বারা

(ক)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সাহেব	বিবি, মেম	তাউই, তাঐ	মাউই, মাঐ
বাদশা	বেগম	জামাই	মেয়ে
কর্তা	গিন্নী	বর	কনে
এঁড়ে	বকনা	বলদ, ষাঁড়	গাই
ছেলে	মেয়ে	মদ্দ	মেয়ে
ভাই	বোন, ভাজ	চাকর	ঝি
বাবা, বাপ	মা	শুক	সারী
দেওর	ননদ	গুরু ঠাকুর	গুরু মা

সমাসবদ্ধ পদের উত্তর পদ স্ত্রীবাচক

(খ)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাকাবাবু	কাকীমা	ঠাকুরদাদা	ঠাকুরমা
ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি	দেওরপো	দেওরঝি
খুড়োমশাই	খুড়িমা	খুড়শ্বশুর	খুড়শাশুড়ী, খুড়শাস
রাধুনী বামন	রাধুনী বামনী	পিসশ্বশুড়	পিস্‌শাশুড়ী, পিসশাস্‌, পিসেস

পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দযোগে

অধিকাংশ প্রাণিবাচক নাম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বোধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী বুঝাইতে হইলে পূর্বে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বিশেষণ যোগ করিতে হয়ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নরপাখী	মেয়েপাখী	পুরুষমানুষ	মেয়েমানুষ
মদ্দা হাঁস	মাদী হাঁস	কবি	মহিলা কবি বা স্ত্রী কবি
মদ্দা চিল	মাদী চিল	ঔপন্যাসিক	মহিলা ঔপন্যাসিক
মদ্দা ঘোড়া	মাদী ঘোড়া	পুলিশ	মেয়ে পুলিশ
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	ডাক্তার	লেডী ডাক্তার
এঁড়ে গরু	গাইগরু	সাহেব	সাহেব
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	হুলো বেড়াল	মেনি বেড়াল
এঁড়ে মোষ	গাই মোষ	বীর বাঁদর	মেনি বাঁদর

নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

(ক) কতকগুলি শব্দের পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ নাই। এই শব্দগুলিকে ব্যাকরণে নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলে।*

তদ্ভব শব্দে—বড়কী, ছোটকী, সোহাগী, ডাইনি (ডান), শাকচুন্নী, সতা, সতাই, সতীন, সৎমা, ধাই, আয়ী, আই, এয়ো, ঝিয়ারী, নার্স, সিস্টার (যেমন Sister Nivedita), রাড়ী, বউ, বউরী, ঘুটে কুড়ুনি ইত্যাদি বাংলায় নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।

তৎসম শব্দে—বিধবা, সধবা, অরক্ষণীয়া, অর্দ্ধাঙ্গিনী, সতী, কুলটা, অসূর্যম্পশ্যা, কপিলা, সজনী, রূপসী (মধুসূদন পুংলিঙ্গ করিয়াছেন, রূপস) ইত্যাদি।

(খ) এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা মূলে স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ নহে। এই শব্দগুলিকে পতিবাচক পুংলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন—

*নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মত কতকগুলি শব্দকে নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দও বলা হয়। কারণ ইহাদের কোন স্ত্রীলিঙ্গ প্রতিশব্দ গঠন করা যায় না। তবে এই বিভাগটি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিপত্নীক, সেনাপতি, সভাপতি ইত্যাদি শব্দকে নিত্য পুংলিঙ্গ বলা হইয়াছে। বিপত্নীক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বিধবা (অন্য শব্দ দ্বারা)। সেনাপতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নারী সেনাপতি (স্ত্রীবোধক বিশেষণ যোগে) করা যায়। সভাপতির স্ত্রীলিঙ্গ রূপে সভাপত্নী না বলিলেও সভানেত্রী প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

ননদ—ননদাই
বোন—বোনাই
জামী (কন্যা)—জামাই
ভগ্নী—ভগ্নীপতি, ভগিনপোৎ
পিসী—পিসা, পিসে।

লিঙ্গ বিপর্যয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(১) মেয়েদের মধ্যে সম্বোধনে পুংলিঙ্গ ভাই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়
তুমি কে ভাই ?
আমি সাগর ভাই। (বঙ্কিমচন্দ্র)

পুরুষ যখন নারীকে সম্বোধন করে তখনও ভাই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়।

ভাই ছোট বউ (রবীন্দ্রনাথের পত্র, স্ত্রীর নিকট)।

লক্ষ্মী শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু লক্ষ্মীছেলে, লক্ষ্মীভাই এসব বাংলা প্রয়োগের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

(২) অনেকক্ষেত্রে শব্দের আকারান্ত বা ঈকারান্ত রূপ দেখিয়াই সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দ বাংলায় মেয়েদের নামে ব্যবহার হইতেছে। যেমন, সবিতা (সংস্কৃতে 'সবিতৃ' শব্দ পুংলিঙ্গ) অনিমা, তনিমা নীলিমা। এইগুলি ইমন্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া পুংলিঙ্গ।

(২) সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

বাংলা তৎসম শব্দগুলিকে সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে রূপায়িত করিতে হয়। সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় কয়েকটি—**আ, ঈ, ইকা, আনী, ইনী**।

আ প্রত্যয়—

গত, গতা ; মৃত, মৃতা ; ভীত, ভীতা ; মধুর, মধুরা ; চতুর, চতুরা ; প্রাচীন, প্রাচীনা ; কোপন, কোপনা ; শিষ্য, শিষ্যা ; পূজ্য, পূজ্যা ; নমস্য, নমস্যা ; বিপুল, বিপুলা : জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠা ; কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠা ; প্রথম, প্রথমা ; দ্বিতীয়, দ্বিতীয়া ; তনয়, তনয়া ; উত্তম, উত্তমা ; বয়স্য, বয়স্যা ; সুশীল, সুশীলা ; পণ্ডিত, পণ্ডিতা ; মূষিক, মূষিকা ; বৎস, বৎসা।

ঈ প্রত্যয়—

(ক) অধিকাংশ জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয়। মানুষ, মানুষী ; শূকর, শূকরী ; বিড়াল, বিড়ালী ; রাক্ষস, রাক্ষসী ; পিশাচ,

পিশাচী ; হরিণ, হরিণী ; মৃগ, মৃগী ; সিংহ, সিংহী ; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী ; কাক, কাকী ; ঘোটক, ঘোটকী।

জাঁতিবাচক শব্দেও কোন কোন স্থলে ঈ হয় না।

অজ, অজা ; কোকিল, কোকিলা ; বৈশ্য, বৈশ্যা ; মূষিক, মূষিকা ; বৎস, বৎসা।

(খ) উকারান্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয়।

সাধু, সাধ্বী ; গুরু, গুর্বী ; বহু, বহ্বী।

(গ) ঋ -কারান্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয।

মূলশব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কর্তৃ	কর্তা	কর্ত্রী
দাতৃ	দাতা	দাত্রী
নেতৃ	নেতা	নেত্রী
বিধাতৃ	বিধাতা	বিধাত্রী
শিক্ষয়িতৃ	শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী
অভিনেতৃ	অভিনেতা	অভিনেত্রী

(ঘ) ইন্, অৎ, বৎ, মৎ, ময় ও ঈয়স্-ভাগান্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয়।

(ইন্)

মূলশব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গুণিন্	গুণী	গুণিনী
ধনিন্	ধনী	ধনিনী
মানিন্	মানী	মানিনী
স্বামিন্	স্বামী	স্বামিনী
তপস্বিন্	তপস্বী	তপস্বিনী
যশস্বিন্	যশস্বী	যশস্বিনী
মায়াবিন্	মাযাবী	মায়াবিনী
সত্যবাদিন্	সত্যবাদী	সত্যবাদিনী

(অৎ, বৎ, মৎ, ময়, ঈয়স্)

অৎ—সৎ, সতী ; মহৎ, মহতী ; বৃহৎ, বৃহতী।

বৎ—গুণবৎ (গুণবান্), গুণবতী ; রূপবৎ (রূপবান্) রূপবতী ; পুত্রবৎ

(পুত্রবান্), পুত্রবতী ; জ্ঞানবৎ (জ্ঞানবান্) জ্ঞানবতী ; হিমবৎ (হিমবান্), হিমবতী।

মৎ—শ্রীমৎ (শ্রীমান্), শ্রীমতী ; ধীমৎ (ধীমান্), ধীমতী ; মতিমৎ (মতিমান), মতিমতী ; বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্), বুদ্ধিমতী ; আয়ুষ্মৎ (আয়ুষ্মান্), আয়ুষ্মতী ; জ্যোতিষ্মৎ (জ্যোতিষ্মান্), জ্যোতিষ্মতী।

ময়—মৃন্ময়, মৃন্ময়ী ; চিন্ময়, চিন্ময়ী ; হিরণ্ময়, হিরণ্ময়ী ; দয়াময় দয়াময়ী।

ঈয়স্—মহীয়স্ (মহীয়ান্), মহীয়সী ; গরীয়স্ (গরীয়ান্), গরীয়সী ; বর্ষীয়স্ (বর্ষীয়ান্), বর্ষীয়সী ; প্রেয়স্, প্রেয়সী ; পাপীয়স্, পাপীয়সী।

(ঙ) অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈ হইলে ন্-কারের পূর্ববর্তী অকার লোপ পাইয়া ন্ যুক্তব্যঞ্জন হইয়া যায়।

মূলশব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
রাজন্	রাজা	রাজ্ঞী
নামন্	নামা	নাম্নী

রাজন্ (রাজা) শব্দের অনুকরণে বাংলায় সম্রাজ্ (সম্রাট্) শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গরূপ সম্রাজ্ঞী, সাম্রাজ্ঞী হইয়াছে।

এইরূপ মহারাজ, যুবরাজ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ মহারাজ্ঞী, যুবরাজ্ঞী হয় আবার মহারাজী, যুবরাজী প্রয়োগও আছে।

(চ) বস্ ও অচ্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর-ঈ প্রত্যয় হয়। বিদ্বস্ (বিদ্বান্) বিদুষী, প্রাচ্, প্রাচী।

আ প্রত্যয় অথবা ঈ প্রত্যয় বিকল্পে

(১) সমাসযুক্ত পদের পরপদ অঙ্গবাচক হইলে স্ত্রীলিঙ্গ আ, ঈ উভয়ই হয়।

চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা ; সুকেশী সুকেশা ; মৃগনয়নী, মৃগনয়না ; চন্দ্রবদনী, চন্দ্র-বদনা ; হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গা ; সুকণ্ঠী, সুকণ্ঠা ; বিম্বাধরী, বিম্বাধরা ; কৃশোদরী, কৃশোদরা ; কুন্দদন্তী, কুন্দদন্তা ; তাম্রনখী তাম্রনখা ; (কিন্তু সূর্পনখা, দশভুজা, মৃগনেত্রা, লোলজিহ্বা প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে ঈ হয় না।)

(২) অন্যত্রও বিকল্পে আ, ঈ হয়—চণ্ডা, চণ্ডী ; কমলা, কমলী ; বিশালা বিশালী ; সাধারণা, সাধারণী ; কৃপণা, কৃপণী।

আনী প্রত্যয়—পত্নী অর্থে দেবীগণের নামের উত্তর আনী হয়। ভব, ভবানী ; শিব, শিবানী* ; ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণী, † ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ; বরুণ, বরুণাণী ; মাতুল, মাতুলানী, (মাতুল, মাতুলীও হয়)।

অনেক সময় আনী প্রত্যয় শব্দের অর্থে সামান্য পরিবর্তন করে। যেমন—হিম, হিমানী (হিম সংহতি **crystallised snow**)। যবন, যবনানী (যবন লিপি)। অরণ্য, অরণ্যানী (মহারণ্য, **a great forest**), সংস্কৃতে অরণ্যানীর সাদৃশ্যে বাংলায় বনানী (সংস্কৃতে নাই)।

-আ,-আনী,-ঈ প্রত্যয়ে অর্থের ভিন্নতা

কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, এবং প্রত্যেক রূপের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকে—

(ক)

আচার্য—আচার্যা (নিজেই আচার্য, **lady professor**)
আচার্যানী (আচার্যপত্নী)

উপাধ্যায়—উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (নিজেই উপাধ্যায়)
উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়-পত্নী)

বৈশ্য—বৈশ্যা (বৈশ্যজাতীয়-স্ত্রী)
বৈশ্যানী (বৈশ্যপত্নী)

ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী * ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী

ক্ষত্রিয়ী—ক্ষত্রিয় পত্নী

(খ)

চণ্ড—চণ্ডা (অতিকোপণা)
চণ্ডী (অতিকোপণা এবং দেবী বিশেষ)

কিঙ্কর—কিঙ্করা (স্ত্রী কিঙ্কর, maid-servant)
কিঙ্করী (সংস্কৃতে কিঙ্কর-পত্নী, servant's wife ; কিন্তু বাংলায় এ অর্থ রক্ষিত হয় না।)

---

* শিবাও হয়।

† ব্রহ্মণ্ শব্দের ণ্ লোপ পায়।

লক্ষ্য কর, আনী প্রত্যয় সাধারণতঃ পত্নী অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আচার্যানী উপাধ্যায়ানী বৈশ্যানী। কিন্তু ক্ষত্রিয়াণীতে—আনী প্রত্যয় জাতি অর্থে ব্যবহৃত।

ছাত্র—ছাত্রা (সংস্কৃতে নারী ছাত্র, girl student ; কিন্তু বাংলায় ছাত্রা ব্যবহার নাই)

ছাত্রী (সংস্কৃতে ছাত্র-পত্নী ; কিন্তু বাংলায় নারী ছাত্র)

সূর্য—সূর্যা (সূর্যপত্নী, স্ত্রী দেবতা)

সূরী (সূর্যের মানবী পত্নী কুন্তী)

অমর—অমরা (মৃত্যুহীনা নারী, an immortal woman)

অমরী (দেবী, a goddess)

ইকা প্রত্যয় ঃ—

অক-ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইকা হয়।

নায়ক, নায়িকা ; গায়ক, গায়িকা ; পাচক, পাচিকা ; বালক, বালিকা ; পালক, পালিকা ; গ্রাহক, গ্রাহিকা ; লেখক, লেখিকা ; অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ; প্রচারক, প্রচারিকা ; সম্পাদক, সম্পাদিকা ; শিক্ষক, শিক্ষিকা।

কিন্তু রজকী, নর্তকী, গণকী, চটকা (স্ত্রী-চড়ুই) প্রভৃতি শব্দে ইকা প্রত্যয় হয় নাই।

(৩) ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ

(সংস্কৃত)

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়ের মধ্যে ইকা প্রত্যয় অনেক সময় ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—নাটক, নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক) ; পুস্তক, পুস্তিকা (ক্ষুদ্র পুস্তক) ; মালা, মালিকা (ক্ষুদ্র মালা) ; গীত, গীতিকা (ক্ষুদ্র গীত) ইত্যাদি।

(বাংলা)

বাংলায় ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, এবং বৃহদর্থে আ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

বৃহদর্থক	ক্ষুদ্রার্থক
ছোরা	ছুরি
নোড়া	নুড়ি
হাঁড়া	হাঁড়ি
দড়া	দড়ি
কাঁসা	কাঁসি

বৃহদর্থক	**ক্ষুদ্রার্থক**
কোষা (শা)	কুষি (শি)
চালা	চালি (প্রতিমার শীর্ষপট)
ঝোলা	ঝুলি
ছাতা	ছাতি
বোঁচকা	বুঁচকি
পোঁটলা	পুঁটলি

অনুশীলনী

(ক)

১। "বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ প্রধানতঃ অর্থের উপর নির্ভরশীল"—এই কথার অর্থ কি বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলায় সর্বনাম ও বিশেষণের লিঙ্গ আছে কি ?

৩। বাংলা লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রধান নিয়ম তিনটি কি কি, উদাহরণ সহ বল।

৪। খাঁটি বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয়গুলির নাম বল এবং বিভিন্ন শব্দে উহাদের প্রয়োগ দেখাও।

৫। বাংলায় একই শব্দে একাধিকবার স্ত্রী-প্রত্যয় যোগের দৃষ্টান্ত দাও।

অথবা

ননদ, ননদী, ননদিনী—শব্দ তিনটির স্ত্রীলিঙ্গ রূপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। লিঙ্গান্তরিত কর :—

কলু, নট, বাদশা, বকনা বাছুর, মিতা, চৌধুরী, নাতি, ননদ, বোষ্টম, শুক, ভাজ, পুলিশ, পিসশাস, রূপসী, ডাইনী, সভাপতি।

৭। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিতে কি বুঝায়, উদাহরণ সহ আলোচনা কর। নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ বলিয়া কিছু আছে কি ?

৮। এমন কতকগুলি শব্দ বল যাহারা মূলে স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু তাহাদিগকে পতি বাচক পুংলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত করা যায়।

৯। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ এবং পুংলিঙ্গ বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দাও।

১০। বাংলায় পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বারা মেয়েদের নাম রাখার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

(খ)

১১। নিম্নলিখিত সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়গুলির দ্বারা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাও :—

—আ ; —ঈ ;—আনী ;—ইকা।

১২। লিঙ্গান্তর কর :—

প্রথম, পঞ্চম, সিংহ, কাক, নেতা, কর্তা, সাধু, গুরু, বহু, গুণী, সাম্যবাদী, অভিনেতা, বিধাতা, সৎ, পুত্রবান্, শ্রীমান্, জ্যোতিষ্মান্, হিরণ্ময়, বর্ষীয়স্, বর্ষীয়ান্, রাজন্, সম্রাট্, মহারাজ, যুবরাজ, খ্যাতনামা, বিদ্বান্, প্রাচ্।

১৩। চন্দ্রমুখী, তাম্রনখী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ রূপের বিকল্প রূপ কি? এইরূপ বিকল্প রূপ কিরূপ ক্ষেত্রে হয়?

১৪। অর্থপার্থক্য নির্ণয় কর :—

(ক) ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ী, ক্ষত্রিয়াণী ; উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী।

(খ) চণ্ডী, চণ্ডা ; কিঙ্করী, কিঙ্করা ; অমরী, অমরা।

১৫। (ক) পুংলিঙ্গ বল—

শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী।

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ বল—

গায়ক, নর্তক।

১৬। (ক) সংস্কৃত -ইকা প্রত্যয়ের ক্ষুদ্রার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দাও।

(খ) বাংলায় -আ, -ই প্রত্যয়ের ক্ষুদ্রার্থক ও বৃহদর্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

১। পুরুষ (Person)

সর্বনামপদ হইতে ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েক প্রকার ধারণা পাওয়া যায়। যেমন—'আমি যাই' এই বাক্যে বোঝা যায় বাক্যটি যে বলিতেছে সে যাইতেছে। 'তুমি যাও' বলিলে বোঝা যায় যাহাকে বলা হইতেছে সে যাইতেছে। সে যায় বলিলে বোঝা যায 'আমি' 'তুমি' ছাড়া অন্য কেহ যাইতেছে। এইভাবে 'আমি' 'তুমি' 'সে' সর্বনামগুলি ব্যক্তি সম্পর্কে ভিন্নরূপ ধারণা দিতেছে।

পদ হইতে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ধারণা হয় তাহার নাম পুরুষ।

পুরুষ তিন প্রকার—(১) আমিবোধক, (২) তুমিবোধক, (৩) অন্য-বোধক, অথবা (১) উত্তমপুরুষ, (২) মধ্যমপুরুষ, (৩) প্রথমপুরুষ।

উত্তমপুরুষ—আমি বোধক সমস্ত পদ উত্তমপুরুষ। যেমন—আমি, আমরা, আমার, আমাদের, আমাকে, আমাদিগকে ইত্যাদি।

মধ্যমপুরুষ—তুমি বোধক সমস্ত পদ মধ্যম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের সর্বনামগুলি তিনপ্রকার—

সামান্যার্থক—তুমি, তোমরা, তোমার, তোমাদের, তোমাকে, তোমাদিগকে ইত্যাদি।

তুচ্ছার্থক—তুই, তোরা, তোদের, তোকে, তোদিগকে ইত্যাদি।

সম্মানার্থক—আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাকে, আপনাদিগকে ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ—আমি, তুমি, ছাড়া সমস্ত সর্বনাম প্রথম পুরুষ

সামান্যার্থক—সে, উহা, তাহা, যাহা, যাহারা, যাহাকে ইত্যাদি।

সম্মানার্থক—তিনি, উনি, তাঁহারা, উঁহারা, যাঁহাকে ইত্যাদি।

২। বিশেষ্যের পুরুষ

সর্বনাম পদের তিন প্রকার পুরুষ আছে। কিন্তু বিশেষ্যপদও পুরুষের ধারণা দেয়। যেমন—রাম যায় বলিলে বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যাইতেছে ; গাড়ী যায় বলিলে বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি না হইলেও বস্তু যাইতেছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যে বলিতেছে সে যাইতেছে না, বা যাহাকে বলিতেছে সেও যাইতেছে না—অর্থাৎ আমি তুমি ব্যতীত অন্য কেহ বা অন্য কিছু যাইতেছে। অতএব রাম, গাড়ী এই দুইটি পদই অন্যবোধক অর্থাৎ প্রথম পুরুষ। এই ভাবে সমস্ত বিশেষ্যপদই অন্যবোধক এবং প্রথম পুরুষ।

৩। ক্রিয়ার পুরুষ

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের উপর লিঙ্গ বা বচনের কোন প্রভাব নাই। কিন্তু ক্রিয়ার উপর পুরুষের প্রভাব আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন পুরুষে ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। যেমন—আমি যাই, তুমি যাও, আপনি যান, তুই যা, সে যায়, তাঁহারা যান ইত্যাদি।

৪। পুরুষ-বোধক বিশিষ্ট প্রয়োগ

নিম্নে বাংলা বাক্যে বিভিন্ন পুরুষ বুঝাইবার জন্য যে সকল প্রচলিত বিশিষ্ট প্রয়োগাদি রহিয়াছে তাহার সামান্য উল্লেখ করা হইল—

(১) উত্তর পুরুষে আমি বোধক সর্বনামের স্থানে অনেক সময় বিশেষ্য-পদের প্রয়োগ হয়।

দীনতা, বিনয়, ইত্যাদি প্রকাশে—রেখ মা দাসেরে (আমাকে) মনে। অধীন (আমি) হুজুরের চাকর। বান্দা (আমি) সম্মুখে উপস্থিত। অন্ধকে (আমাকে) দুটো পয়সা দাও, বাবা।

দম্ভ, গর্ব ইত্যাদি প্রকাশে—এ শর্মাকে (আমাকে) তেমন পাত্র পাওনি। এ গাঁয়ে গোবিন্দ গাঙ্গুলিকে (আমাকে) সবাই চেনে, বাবা।

স্নেহ, মমতা ইত্যাদি প্রকাশে—শহরে গিয়ে এ বোনকে (আমাকে) মনে থাকবে ত? দুঃখিনী মাকে (আমাকে) ভুলে গেলি বাবা?

(২) অনেক সময় তুমি (মধ্যম পুরুষের সর্বনাম) স্থানে বিশেষ্যাদি পদের প্রয়োগ হয়।

সম্মান প্রকাশে, আশীর্বচনে, নিমন্ত্রণাদিতে—মহাশয়ের (আপনার) কোথায় থাকা হয়? মহারাজের (আপনার) জয় হোক। উক্ত দিবসে মহাশয় আপনি মমালয়ে আগমন করতঃ ইত্যাদি।

বিরক্তিতে, শ্লেষে, কৌতুকে—বাবুর (তোমার) এখন বেরুনো হচ্ছে কোথায়? বাছাধনের (তোমার) রাগ পড়লো? ইত্যাদি।

(৩) সে-বোধক প্রথম পুরুষের সর্বনাম স্থলেও কোন কোন সময় বিশেষ্য পদের প্রয়োগ হয়।

গালি, বিরক্তি, তিরস্কার ইত্যাদিতে—মার শালাকে (আসলে শালা নয়, অর্থ তাহাকে)। বাঁদরটা কোথায়? (আসলে বাঁদর নয়, সে অর্থে প্রয়োগ)।

৫। সম্মানার্থক, তুচ্ছার্থক ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রয়োগ

মধ্যম ও প্রথম পুরুষের সর্বনামের সম্মানার্থক, তুচ্ছার্থক ইত্যাদি প্রয়োগেও কিছু কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(১) 'আপনি' পদ সাধারণতঃ গুরুজনের প্রতি, সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি, অপরদিকে ভদ্রজনের প্রতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সৌজন্যাদি প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়।

কিন্তু দেবতার প্রতি এবং প্রায়শঃ মাতার প্রতি (ও আজকাল পিতার প্রতি) আপনি পদের প্রয়োগ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্বোধনেও আপনি পদের প্রয়োগ নাই। অবশ্য প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে স্বামীকে আপনি সম্বোধন অপ্রচলিত নহে। সংস্কৃত গল্পাদিতে স্বামীকে "আর্যপুত্র, আপনি" এইরূপ সম্বোধন আছে।

শ্লেষোক্তিতে, অভিমানে, অনুপযুক্ত স্থলেও আপনি ব্যবহার হয়। যেমন—থামুন, আপনার আর ডেপোমি কর্তে হবে না। আমার ইচ্ছা, আমি যাব না; আপনাকে আর সাধতে হবে না।

(২) 'তুমি' সাধারণতঃ পরিচিত, সমবয়স্ক অথবা সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হয়।

মাতা, পিতা (এবং জেঠা-জেঠী খুড়া-খুড়ী, প্রভৃতি নিকট আত্মীয় সম্বোধনেও) তুমি ব্যবহার প্রচলিত আছে।

সামাজিক মর্যাদায় ন্যূন, বয়ঃকনিষ্ঠ বা স্নেহভাজনদের প্রতিও তুমি ব্যবহৃত হয়।

ঈশ্বরের প্রতি বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর প্রতি তুমি সম্বোধন প্রচলিত। কবিতায় বা মানপত্রে বন্দনীয় ব্যক্তির প্রতিও তুমি ব্যবহৃত হয়। যেমন—"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব।"

(৩) মর্যাদা প্রদর্শন যেখানে অভিপ্রেত নহে শুধুমাত্র সেইসব স্থানেই এবং প্রায়ই অতি পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সামান্য ভাবে বা তুচ্ছার্থে 'তুই' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

গালাগালি বা তিরস্কারের ভাষায় বা ক্রোধে কাহারও অমর্যাদা করিবার ক্ষেত্রে তুই ব্যবহৃত হয়, এইজন্যই 'তুইতোকারি' অর্থে গালাগালি বা অমর্যাদা করা বুঝায়।

নিকট বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ সমবয়স্কদের প্রতি বা সন্তানবৎ স্নেহের পাত্রপাত্রীর প্রতি তুই ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য প্রয়োগে স্ত্রীর প্রতি বা মাতার প্রতিও তুই ব্যবহার আছে।

শাক্তদের দেবীর প্রতি, গাজনের গানে শিবের প্রতি, সন্তান বা সখা ভাবে কৃষ্ণের প্রতি তুই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—'তুই না জাগিলে শ্যামা, এ ভারত জাগিবে না, তুই না নাচিলে শ্যামা নাচে কি মা ধমনী' (মুকুন্দদাস), 'স্বরাজ যদি পাইরে ভোলা, তোরে খেতে দেব সবরি কলা,—নইলে এঁটে কলা' (গাজনের গান)। 'অবুঝ কানু, কার মায়াতে ভুলে, গোকুল ছেড়ে চলে গেলি ভাই!' (কালিদাস রায়)।

ভিক্ষুকেরা ভিক্ষাদাতার প্রতি বা সাধু-সন্ন্যাসী ভক্তদের প্রতি অপরিচিত হইলেও তুই ব্যবহার করে। রাজরাণী হবি মা, অন্ধকে দুটো পয়সা দে। (ভিক্ষুকের উক্তি) বেটাঃ! তোর বরাত ভালরে; রামজী তোকে দয়া করবেন। (সন্ন্যাসীর উক্তি)

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণে পুরুষ কি ভাবে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয় তাহা বুঝাইয়া বল।

২। উদাহরণ দাও এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ বল—

প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ।

(মনে রাখিবে প্রথম পুরুষ ইংরেজি First person নয়)।

৩। একটুখানি মেয়ের ভয়ে কাব্য লিখবে ফর্মাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।

একটি ছোটে মেয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা উপরের পত্রটিতে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' পদটি কোন পুরুষ হইবে বুঝাইয়া বল।

৪। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ বুঝাইতে বিশেষ্য পদের প্রয়োগ দেখাইয়া কয়েকটি বাক্য রচনা কর।

৫। নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাও :—

(ক) অনুচিত স্থলে শ্লেষোক্তিতে 'আপনি'।

(খ) অভিনন্দন পত্রে বন্দনীয়কে 'তুমি'।

এবং (গ) দেব-দেবীকে 'তুই' সম্বোধন।

পঞ্চম অধ্যায়

কারক-বিভক্তি

কারক কাহাকে বলে?

(বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্যপদ বা সর্বনাম পদের নির্দিষ্ট সম্বন্ধকে কারক বলে।)

কারক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, ক্রিয়া-সম্পাদক অর্থাৎ যে কিছু করে সেই কারক। কিন্তু ব্যাকরণে কারকের অর্থ আরও একটু ব্যাপক। কোন কাজ বা ক্রিয়া যখন সম্পন্ন হয় তখন একজন কর্তা অবশ্যই থাকে। কিন্তু অনেক সময় সেই কাজটি আবার কোন-কিছু সম্পর্কে বা কোন কিছুর উপর ঘটে; আবার কখনও কখনও সেই কাজটিকে কর্তা কোন কিছুর সাহায্যেও করিয়া থাকেন; এবং এই কাজ ঘটিবার জন্য কোন আধার বা উপযুক্ত স্থান কালাদিও চাই। এই ভাবে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে শুধুমাত্র যে কর্তারই প্রয়োজন হয় তাহা নয়,—সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের সহায়ক উপকরণ ও আধারাদিরও প্রয়োজন পড়ে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় বা যোগ আছে তাহাকেই কারক বলা হয়। বাংলায়ও সংস্কৃতের মত ক্রিয়ার সহিত যে-কোনো ভাবে যুক্ত যে-কোন বিষয়কেই কারকের পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

এইভাবে কারকের ছয়টি শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

১। কর্তৃকারক

যে করে বা হয় তাহাকে কর্তৃকারক বা কর্তাকারক বলে।

কর্তৃকারকই ক্রিয়াপদের সহিত প্রধান ভাবে অন্বিত হয়। অর্থাৎ এই পদই প্রধানতঃ বাক্যের ক্রিয়া-সম্পাদক। কেবলমাত্র কর্তৃকারক ও ক্রিয়াপদ থাকিলেই বাক্যের অর্থ পূর্ণ হয়। অন্যান্য কারক ও পদ শুধু বাক্যের অর্থকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্যই প্রয়োজন।

কর্তৃকারক নানা প্রকার হইতে পারে :—

(১) হয় বা আছে (স্বতঃঘটিত বা সত্তাবোধক to be, to become ইত্যাদি) অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা—**ভোর** হইয়াছে। **ভগবান** আছেন। আমার **মা** নাই। তাহার **জ্বর** হইয়াছে। তোমার **নাম** কি? (হয় ক্রিয়া উহ্য)? **সে** বেশ ছেলে। (হয় ক্রিয়া উহ্য)।

(২) সাধারণ অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার কর্তা—

খোকা হাসিতেছে। **আমি** যাইব না। **ছেলেটি** বেশ দৌড়াইতেছে। আর লাফাইওনা (তুমি কর্তা উহ্য আছে)। (অকর্মক ক্রিযার কর্তা)

আমি বই পড়ি। **পাগলে** কিনা বলে ? তাহাকে **সকলে** ভালবাসে। কুকুরটিকে তাড়াইয়া দাও (তুমি কর্তা উহ্য আছে)। **কে** গান গায় ? (সকর্মক ক্রিয়ার কর্তা)।

(৩) সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা—

আমি বাড়ী যাইব। **যদু** বই পড়িতেছে। **পাখিসব** করে রব। আকাশে **চাঁদ** উঠিল। (সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা)

তুমি আসিলে আমি যাইব। **সে** না দিলে কোথায় পাইব ? **আমি** বলিলে কাজটা করিও। (অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা)

(৪) প্রযোজক কর্তা ও প্রযোজ্যকর্তা—

আমি মালীকে দিয়া বাগান করাই। (এখানে মালী এবং আমি দুই জনেরই ক্রিয়া সম্পাদনে কর্তৃত্ব আছে। আমি মালীকে, কাজে প্রযোগ করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়াছি। অতএব **আমি** প্রযোজক কর্তা এবং মালী আমাদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে। অতএব **মালীকে দিয়া** প্রযোজ্যকর্তা)।

এইরূপ, **সে আমা দ্বারা** একখানা চিঠি লেখাইয়াছিল। **আমি সমরকে দিয়া** তাহাকে কথাটা বলাইয়াছিলাম।

(৫) বিভিন্ন বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা—

আমি যাইতেছি। **সে** বই পড়িতেছে। **তুমি** কি খাইতেছ ? (কর্তৃবাচক ক্রিয়ার কর্তা)

রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছিল। **আমা হইতে** এই কাজ হইবে না। কি চাই (**তোমার** কর্তা উহ্য) (কর্মবাচ্যের ক্রিযার কর্তা)

আমার যাওয়া হইবে না। এত হাসা হচ্ছে কেন ? (**তোমার** কর্তা উহ্য) **ছেলেটার** স্থান হয় নাই। (ভাব বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা)

কথাটা ভাল শোনায় না। **ইহাতে** কি হইবে ? **তোমাকে** বেশ দেখাইতেছে। (কর্ম-কর্তৃ বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা)

২। কর্মকারক

যাহা ক্রিয়ার বিষয় বা যাহার উপর ক্রিয়া সম্পাদন হয়, তাহাকে **কর্ম কারক** বলে।

অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, ধরা যায় বা যাহাকে বলা যায়, ধরা যায়, মারা যায়, তাহারা কর্মকারক হয়। সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়ার কোন কর্ম হয় না, তবে বিশেষ ধরনের বাক্যে তাহাও হইতে পারে।

কর্মকারক নানারূপ হইতে পারে :—

(১) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম—

রাম **ভাত** খাইতেছে। শিশু **চাঁদ** দেখিতেছে। সে বেশ **খাইতে পারে** (কর্ম উহ্য)।

(২) অকর্মক নিজন্ত বা প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম—

সাপুড়ে **সাপ** নাচাইতেছে। জোরসে **কোদাল** চালাই। **শিশুটিকে** বিছানায় শোয়াইয়া রাখ।

(৩) অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার সম-ধাতুজ কর্ম—

কী **হাসি** হাসিতেছে। বড় **কান্না** কাঁদলে। খুব **ছুট** ছুটেছে। (অকর্মক ক্রিয়ার সম-ধাতুজ)

খুব **খাওয়া** খাইয়েছে। আচ্ছা **মার** মেরেছে। কী **দেখানই** দেখালে। (সকর্মক ক্রিয়ার সম-ধাতুজ)

(৪) দ্বি-কর্মক ক্রিয়ার দুই কর্ম (মুখ্য ও গৌণ)—

মা **ছেলেকে দুধ** খাওয়াইতেছেন। **তোমাকে** একটা **কথা** বলিব। **দাদাকে** একটা **চিঠি** লিখিতেছি। (এসব স্থানে কোন পাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন বস্তু বা বিষয় আসিয়াছে। ছেলেকে, তোমাকে, দাদাকে ইত্যাদি উদ্দিষ্ট কর্ম বা গৌণ কর্ম ; এবং বস্তু, দুধ, কথা, চিঠি ইত্যাদি বিষয়-কর্ম বা মুখ্য কর্ম)।*

৩। করণ কারক

কর্তা যাহাদ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে করণ কারক বলে।

যেমন—বন্ধন করিতে রজ্জু, প্রহার করিতে যষ্টি, দর্শন করিতে চক্ষু ইত্যাদি ক্রিযা সম্পাদনের যন্ত্র রূপে কাজ করে। বা অনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদনে বুদ্ধি, কৌশল, বিচার, চাতুর্য প্রভৃতি কার্যের উপায়রূপে সহায়ক হইতে পারে। অথবা পূজা, প্রসাধন, রন্ধন ইত্যাদি কাজে ফুল, তৈল ইত্যাদি উপকরণ রূপে ক্রিয়া সম্পাদনে সাহায্য করিতে পারে। অতএব বাক্যে কর্তা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পাদনের সহায়ক এই সকল বস্তু বা বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে ইহারা করণ কারক হইবে।

*কর্তৃকারকের এবং কর্মকারকের বিভিন্ন রূপ প্রধানত: ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের উপর নির্ভরশীল। তাই ক্রিয়াপদের সম্যক আলোচনার পূর্বে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অপেক্ষাকৃত জটিল মনে হইতে পারে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত থাকিয়াও আমরা প্রত্যেক কারকের সমগ্র রূপটি একেবারে প্রথমেই শিক্ষার্থীর সম্মুখে ধরিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি। এই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট পাঠক হইলেন আমাদের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরা এবং তাহাদের ব্যাকরণ-জ্ঞানও সামান্য আছে—তাই ক্রমবর্ণিত আলোচনা রীতির ব্যত্যয় যদি হইয়াও থাকে, ইহাতে তাহাদের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধার সম্ভাবনাই বেশী।

করণকারকের উদাহরণ—**দড়ি দিয়ে** বাঁধলাম। জগতে **চেষ্টার** অসাধ্য কিছুই নাই। **কড়ি দিয়ে** কিনলাম। **মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন। নীল গগনের ললাটখানি **চন্দনে** আজ মাখা। **খড়্গে** ছাগ কাটে লোকহিতে। **তাস** খেলিও না (তাস দ্বারা খেলিও না)। **ঝাঁটা** মার (ঝাঁটা দ্বারা মারা)।

৪। সম্প্রদান কারক*

দানকর্মের যে পাত্র, তাহাকে **সম্প্রদান কারক** বলে। কিন্তু স্বত্ব ত্যাগ করিয়া না দিলে দান হয় না। অন্যরূপ দেওয়ায় কর্মকারক হয়, শুধুমাত্র দান বা স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেওয়াই সম্প্রদান হয়। রজককে বস্ত্র দাও (বস্ত্র আবার ফিরিয়া আসিবে)। চাকরকে বেতন দাও (চাকরকে প্রাপ্য দেওয়া হইতেছে)। দে মা আমায় তবিলদারি (ভার অর্পণ বা নিযুক্ত করণ অর্থে) ইত্যাদি কর্মকারকের উদাহরণ, সম্প্রদান কারকের নহে।

সম্প্রদান কারকের উদাহরণ—**দরিদ্রকে** অন্ন দাও। তিনি **সৎপাত্রে** কন্যা দিয়াছেন। **অন্ধজনে** দেহ আলো। মুখ দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি (সম্প্রদান কারক **জীবকে** উহ্য)।

৫। অপাদান কারক

ক্রিয়া ঘটিবার জন্য যাহা হইতে অপগম বা অপসরণ হয়, তাহাকে **অপাদান কারক** বলে।

অপাদান কারকে এই অপসরণ বা স্থানচ্যুতির ভাবটি কোথাও কোথাও দৃশ্যতঃই স্পষ্ট, আবার কোথাও কোথাও তাহা দৃশ্যতঃ স্পষ্ট নহে, বাক্যমধ্যে শুধু সেই ভাবটি প্রকাশিত হয়।

অপাদান কারক নানা প্রকার হইতে পারে :—

(১) **দৃশ্যতঃ স্পষ্ট অপাদান :—**

ঘর হইতে বাহিরে যাও। **কোথা হতে** এলে তুমি? **কুয়া হইতে** জল তুলিতেছি। **গাছ হইতে** পাতা পড়িতেছে।

---

*বাংলায় সম্প্রদান কারক সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পণ্ডিতেরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিরূপতা প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনাকালে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে প্রায় এই মতই পোষণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন সংস্কৃতে কর্মে এবং সম্প্রদানে ভিন্ন বিভক্তি নির্দিষ্ট ছিল বলিয়াই কর্ম হইতে সম্প্রদান একটা ভিন্ন কারক রূপে খাড়া করা গিয়াছে। নতুবা দানক্রিয়া যত মহৎ কর্মই হোক না কেন, শুধু এই পুণ্যক্রিয়ার ভাগ্যবান পাত্রের জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক সৃষ্টি হইতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, এইভাবে বিভিন্ন কর্মের পাত্রের জন্য এক একটি কারক সৃষ্টি করিলে শেষে ভোজন ক্রিয়ার পাত্রকে 'সম্ভোজন কারক', তাড়ন ক্রিয়ার পাত্রকে 'সন্তাড়ন 'কারক' বলিতে হইবে।

প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই। বাংলায়ও সম্প্রদানের জন্য পৃথক বিভক্তি নাই। এখানে সম্প্রদান কারক আর গৌণ কর্ম এক। কর্মের যে বিভক্তি, সম্প্রদানেরও সেই বিভক্তি। অর্থাৎ শুধু সম্প্রদান নামটি ছাড়া ব্যবহারে কোনো তারতম্য নাই।

মাছটি **জল হইতে** ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িল। আমার **মুখ হইতে** এমন কথা বাহির হইবে না। **চক্ষু দিয়া** জল পড়িতেছে।

(২) **ব্যঞ্জনামূলক অপাদান :—**

ভয় বা ত্রাণের হেতুতে—যেখানে **বাঘের ভয়,** সেখানেই রাত হয়। **বিপদে** মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।

উৎপত্তি বা জন্মের কারণে—**তিল হইতে** তৈল হয়। **ছানায়** সন্দেশ হয়। **মেঘে** বৃষ্টি হয়। **হাসিতে** মুক্তা ঝরে।

নিবৃত্তি, বিরাম, বারণ অর্থে—**হিংসায়** বিরত হও। **কাজ হইতে** অবসর নিয়েছেন। **অন্যায় হইতে** নিবৃত্ত হও।

শিক্ষা, অধ্যয়ন, উপদেশাদি প্রাপ্তিতে—**আপনার নিকট** ব্যাকরণ পড়িতেছি। **তাহার কাছে** অনেক উপদেশ পাইলাম।

৬। অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনে যাহা আধার স্বরূপ অর্থাৎ যে স্থান বা কালের মধ্যে ক্রিয়া ঘটে, তাহাকে **অধিকরণ কারক** বলে।

প্রধানতঃ কর্তা যে আধারে থাকিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে কিংবা কর্তা ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সকর্মক ক্রিয়ার কর্মকে যে আধারে স্থাপন করে তাহাই অধিকরণ কারক হয়। যেমন—ঈশান বাড়ীতে নাই (কর্তা নিজে আধারভূত), আমি বাক্সে টাকাটি রাখিলাম (সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম আধারে স্থাপিত)।

অধিকরণ কারক নানা প্রকার হইতে পারে :—

(১) **আধারাধিকরণ :—**

ঐকদেশিক :—**জলে** মাছ আছে। **বাক্সে** টাকা আছে। **এদেশে** নদী নাই। রাজা **সভায়** বসিয়াছেন।

(ঐকদেশিক অধিকরণে আধারের অংশ বা একদেশ জুড়িয়া অবস্থান বুঝায়। যেমন—বাক্সে টাকাটা সকল বাক্স জুড়িয়া থাকে না, কিছু অংশ জুড়িয়া থাকে মাত্র।)

ব্যাপ্ত্যধিকরণ :—**দুগ্ধে** শর্করা আছে। **ফুলে** সৌরভ আছে। **বায়ুতে** অক্সিজেন আছে। **আগুনে** দাহিকাশক্তি আছে। **নিম্বফলের** স্বাদ তিক্তমধুর।

(ব্যাপ্ত্যধিকরণে আধারের সর্বাঙ্গ বা সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান বুঝায়। যেমন, আগুনের দাহিকাশক্তি আগুনের একদেশ বা অংশমাত্রে নহে সর্বাঙ্গে)।

(২) কালাধিকরণ :—

ঐকদেশিক— **দশটায়** স্কুল বসে। আমি **রাত্রে** রুটি খাই। **পৌনে তিনটায়** ম্যাটিনি শো আরম্ভ হইবে। **রবিবার** কলিকাতায় যাইব। **২৫শে বৈশাখ** রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। (ক্ষণমাত্র বা বিশেষ সময়, যেমন—ঘণ্টা, তারিখ, বার ইত্যাদি বুঝাইতেছে।)

ব্যাপ্তকালাধিকরণ :—**বর্ষাকালে** আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। **মোগল আমলে** স্থাপত্যশিল্পের উন্নতি হইযাছিল। **বিংশ শতাব্দী** সমস্যার যুগ।

(দীর্ঘকাল ব্যাপিযা কোন কিছুর অবস্থান বা সংঘটন বুঝাইতেছে)।

(৩) বিষয়াধিকরণ :—

বিষয়াধিকরণ স্থান-কাল সম্পর্কিত অধিকরণ নহে। ইহাকে অনেকটা ভাবমূলক বা কল্পনাশ্রয়ী বলা চলে। যেমন—**কু-কথায়** পঞ্চমুখ। **সে বিষয়ে** সন্দেহ নাই। **লেখাপড়াতে** ভাল। এখানে কু-কথায় অর্থ কু-কথার বিষয়ে, লেখাপড়াতে অর্থ লেখাপড়ার বিষয়ে।

৭। সম্বন্ধ পদ

বিশেষ্য বা সর্বনাম সম্বন্ধ স্থাপন করিযা অপর বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করিলে সেখানে **সম্বন্ধ** পদ হয়।

যেমন—**আমার** বই নাই। এখানে বই পদের সহিত আমার পদটি সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। কিরূপ সম্বন্ধ ? বলিতে পারি স্বামিত্ব সম্বন্ধ বা মালিকানা সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এই পদটি বিশেষিত হইল। কোন বই ? এই বই বা সেই বই নহে, একটা বিশেষ বই, **আমার** বই। এই ভাবে সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যকে বিশেষিত করিয়া প্রায় বিশেষণের কাজ করিল।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার—এই সম্বন্ধ পদের সহিত ক্রিয়াপদের কোন সংযোগ নাই। **আমার বই নাই** এই বাক্যে **নাই** ক্রিয়াপদ। কি নাই ? না, বই নাই। অর্থাৎ বই কর্তা। আমার পদ শুধু কর্তার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহাকে বিশেষিত করিয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ার সঙ্গে নিজে অন্বিত হয় নাই। ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বা অন্বয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ পদ কারক নহে।

ইংরেজিতে সম্বন্ধ পদের নাম Possessive Case ; অর্থাৎ ইংরেজি মতে সম্বন্ধ পদও কারক। কিন্তু বাংলা কারক আর ইংরেজি case এক নহে বাংলায় ক্রিয়াপদের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে তাহাই কারক। ইংরেজি মতে

কারক একমাত্র ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নহে। ইংরেজিতে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত বাক্যের অন্যপদের যা সম্বন্ধ তাহাই Case। ইংরেজিতে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত Nominative (কর্তা) এবং Objective (কর্ম) Case আছে। আবার ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কহীন Possessive (সম্বন্ধ) বা Vocative (সম্বোধন) Caseও আছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজির অনুকরণে বাংলায় সম্বন্ধ কারক হইবে না।

সম্বন্ধ পদ নানারূপ হইতে পারে :—

১। কর্তা সম্বন্ধ—বিবাহের বর, ব্রাহ্মণের ভোজন।
২। কর্ম সম্বন্ধ—পড়িবার বই, দেবতার পূজা।
৩। করণ সম্বন্ধ—খেলিবার তাস, হাতের পঁ্যাচ।
৪। অপাদান সম্বন্ধ—মহিষের ঘৃত, বাঘের ভয়।
৫। অধিকরণ সম্বন্ধ—জলের মাছ, বসিবার আসন।

সম্বন্ধ পদ আরও নানারূপ হইতে পারে :—

৬। নির্ধার বাচক—ভালর ভাল, গুণীর শ্রেষ্ঠ।
৭। নিমিত্ত বাচক—বলির পাঁঠা, শেষের সম্বল।
৮। অভেদ বাচক—জ্ঞানের দ্বীপ, ধর্মের নৌকা
৯। স্বামিত্ব বাচক—আমার বই, রামের ভাই।
১০। বিশেষণ বাচক—গুণের ভাই, রসের নাগর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৮। সম্বোধন পদ

কোন কিছু বলিবার জন্য কাহাকেও সম্বোধন করিলে **সম্বোধন পদ** হয়। ইংরেজিতে সম্বোধন পদ Vocative Case. কিন্তু ইহার সহিতও ক্রিয়াপদের অন্বয় নাই। এইজন্য বাংলায় সম্বোধন পদ পদমাত্র, কারক নহে।

সম্বোধন পদ নানারূপ হইতে পারে :

১। নাম, সম্পর্ক বা পদ উল্লেখে :—

রমেশ, একটা কথা শোন। **বাবা,** অন্ধকে একটা পয়সা দাও। **চাপরাশি,** ঘণ্টা বাজাও। **মাঝি,** নৌকা ভিড়াও। **ধরিত্রি,** দ্বিধা হও।

২। নামকে গুণান্বিত করিয়া :—

লক্ষ্মীছাড়া কোথায় বেরুচ্ছিস্? **এই দুষ্টু,** চুপ কর। **হে গুণি,** বিশ্বের বিস্ময় তুমি।

(৩) শুধু অব্যয় ব্যবহারে :—

ওহে, এদিকে এসো ত। **এই,** খবরদার যাবিনে। **ওগো,** শুনছ? **কিরে,** দেখাই যে মেলে না?

এই অব্যয়গুলি বিশেষ্যাদি পদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। যেমন,—ওরে ভাই, ওহে ছেলে, কিরে সুবল, ইত্যাদি।

বাংলার কতকগুলি সম্বোধন পদও আবার হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় ইত্যাদি সূচক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মাগো! ওমা! বাবারে! দাদারে, দাদা! বাপ্‌ বাপ্‌! রাধে রাধে! হরি হরি! হা ভগবান! ইত্যাদি।

বাংলায় এই অব্যয় জাতীয় সম্বোধনের কিছুটা লিঙ্গভেদও আছে। যেমন—নারী কর্তৃক নারীর প্রতি প্রযোজ্য সম্বোধন—লো, ওলো, হলা, আলো ইত্যাদি। এইগুলি পুরুষ সম্পর্কে ব্যবহার হয় না, এবং পুরুষের ভাষায়ও ব্যবহার হয় না।

সম্বোধন পদে আদরার্থক, তুচ্ছার্থক ইত্যাদি তারতম্যও আছে। যেমন—

(১) আদরার্থক—**মশায়,** বলতে পারেন, ট্রেণটা কখন ছাড়বে? **স্যর,** অঙ্কটা আমি বুঝতে পারিনি। **হে রাজন্,** ক্ষম এ দাসেরে। শোন্ **বাছা,** শোন্।

(২) তুচ্ছার্থক—**বাছাধন,** বাঁদরামির আর জায়গা পাওনি? এই **বেইমান,** কথা বলতে লজ্জা হয় না? **ওরে নরাধম,** মা চিনলিনে!

সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্যে তৎসম শব্দগুলির সম্বোধন সংস্কৃত নিয়মে হয়। যেমন—

মূল সংস্কৃত শব্দ	সম্বোধন পদ	মূল সংস্কৃত শব্দ	সম্বোধন পদ
লতা	লতে	পিতৃ (পিতা)	পিতঃ
সখা	সখে	মাতৃ (মাতা)	মাতঃ
সীতা	সীতে	বিধাতৃ (বিধাতা)	বিধাতঃ
গঙ্গা	গঙ্গে	রাজন্ (রাজা)	রাজন্
হরি	হরে	শ্রীমৎ (শ্রীমান্)	শ্রীমন্
প্রভু	প্রভো	ভগবৎ (ভগবান্)	ভগবন্
নদী	নদি	আয়ুষ্মতী	আয়ুষ্মতি
জননী	জননি	বিদ্বস্ (বিদ্বান্)	বিদ্বন্
বধূ	বধূ	বিদুষী	বিদুষি
বন্ধু	বন্ধো	ধনিন্ (ধনী)	ধনিন্

৯। কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গ

সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভিন্ন কারক বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি আছে। এই বিভক্তি গুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমা হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত বিভক্তিগুলি যথাক্রমে কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারকের

বিভক্তি। ষষ্ঠী বিভক্তিটি সম্বন্ধ পদের বিভক্তি। সম্বন্ধপদ কারক নহে, এইজন্য ষষ্ঠি বিভক্তি কারক-বিভক্তি নহে। অবশিষ্ট সপ্তমী বিভক্তিটি অধিকরণ কারকের বিভক্তি। সম্বোধন পদের জন্য নূতন কোন বিভক্তি নাই। প্রথমা বিভক্তিই সম্বোধন পদের বিভক্তি ; অবশ্য সম্বোধন পদও কারক নহে।

বাংলায়ও শব্দরূপের বেলায় এই সংস্কৃত কাঠামোটিকেই বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বাংলায় কারক বুঝাইবার জন্য সংস্কৃতের মত সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নাই। আধুনিক বাংলায়, বিভক্তির সংখ্যা, বলিতে গেলে, মাত্র চারিটি। **—এ,—কে,—রে,—তে,** এই চারিটি বিভক্তিই প্রায় সকল কারক এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধনের ভাব প্রকাশ করে।

বিভক্তি ছাড়া কারকাদির অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বাংলায় কতকগুলি অব্যয়শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন—করণে—**দ্বারা, দিয়া** ইত্যাদি ; অপাদানে—**হইতে, থেকে** ; অধিকরণে—**কাছে, ভিতরে** ইত্যাদি। এইগুলি কারকাদি অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দের পরে বসে বলিয়া ইহাদিগকে **অনুসর্গ*** বলে।

নিম্নে বাংলায় বিভক্তি ও অনুসর্গ যোগের সাধারণ রীতিটি প্রদর্শিত হইল—

		বিভক্তি	অনুসর্গ
প্রথমা	(কর্তৃকারক)	এ, তে (এতে)	
দ্বিতীয়া	(কর্মকারক)	এ, কে, রে,	প্রতি, পানে ইত্যাদি
তৃতীয়া	(করণকারক)	এ, তে (এতে)	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি
চতুর্থী	(সম্প্রদান কারক)	এ, কে, রে	
পঞ্চমী	(অপাদান কারক)		হইতে, থেকে ইত্যাদি
ষষ্ঠী	(সম্বন্ধপদ)	র, এর, কার, কের	
সপ্তমী	(অধিকরণ)	এ, তে (এতে)	মধ্যে, ভিতরে, নিকটে ইত্যাদি

১০। শব্দরূপ

বাংলা শব্দরূপে সংস্কৃতের কাঠামো মোটামুটি বজায় থাকিলেও সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার পার্থক্য বড কম নহে। সংস্কৃতে স্বরান্ত ব্যঞ্জনান্ত ভেদে এবং লিঙ্গভেদে শব্দরূপের আদর্শ বহুতর। বাংলায় এই জটিলতা নাই। এখানে বিভক্তি যোগের একটি আদর্শই সর্বত্র অনুসৃত হয়, এমন কি সর্বনাম শব্দের বেলায়ও তাহার বিশেষ তারতম্য ঘটে না।

*অনুসর্গ (Post-position) নামটি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ভাবিত। অনুসর্গের অপর নাম তিনি কর্মপ্রবচনীয় বলিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের কূটতর্ক তুলিয়া কর্মপ্রবচনীয় নামে কোনো কোনো পণ্ডিত আপত্তি করিতেছেন দেখিতেছি। অবশ্য অনুসর্গ কথাটি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরন্তু বাংলা শব্দরূপে দ্বিবচন রূপ নাই। বহুবচন করিবার প্রণালীও অপেক্ষাকৃত সরল। **রা, গুলি, দিগ** ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র প্রত্যয় শব্দান্তে যোগ করিয়াই বাংলার বহুবচন নিষ্পন্ন হয়; এবং স্থলভেদে কারকার্থ প্রকাশের জন্য ইহাদের সঙ্গেই ছেলেদিগকে, ছেলেদের ইত্যাদি পদ সাধিত হয়। নিম্নে একটি বিশেষ্য শব্দের রূপের আদর্শ দেওয়া হইল।

'বালক' শব্দের রূপ

(বাংলায় বালক ব্যঞ্জনান্ত শব্দ, কারণ বাংলা উচ্চারণে অন্ত্য অ ধ্বনি ন

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	প্রথমা	বালক	বালকেরা
কর্মকারক	দ্বিতীয়া	বালককে	বালকদিগকে
করণকারক	তৃতীয়া	বালক দ্বারা	বালকদিগদ্বারা,
		বালকের দ্বারা	বালকদিগের দ্বারা
		বালক দিয়া	বালকদিগ দিয়া
		বালককর্তৃক	বালকদিগকর্তৃক
সম্প্রদান কারক	চতুর্থী	বালককে	বালকদিগকে
অপাদান কারক	পঞ্চমী	বালক হইতে	বালকদিগ হইতে
সম্বন্ধ পদ	ষষ্ঠী	বালকের	বালকদিগের
			বালকদের
অধিকরণ কারক	সপ্তমী	বালকেতে	বালকদিগেতে
		বালকে	
সম্বোধন		বালক	

(ক) ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে এ, এতে হয়। কিন্তু স্বরান্ত শব্দগুলিতে সর্বত্র তাহা হয় না। স্বরান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে একটু রূপভেদ আছে। যেমন—**অকারান্ত** বৃক্ষ—বৃক্ষে, বৃক্ষেতে; **আকারান্ত** রাজা—রাজায়, রাজাতে; **আকারান্ত** মা—মায, মায়ে মায়েতে; **ইকারান্ত** মুনি—মুনিতে; **ঈকারান্ত** নদী—নদীতে; **উকারান্ত** সাধু—সাধুতে; **ঊকারান্ত** বধূ—বধূতে; **একারান্ত** ছেলে—ছেলেয়, ছেলেতে; **ঐকারান্ত** দৈ—দৈয়ে, দৈয়েতে; **ওকারান্ত** মেসো—মেসোয়, মেসোতে; **ঔকারান্ত** বৌ—বৌয়ে, বৌয়েতে।

(খ) স্বরান্ত শব্দ **অ, আ, ঐ** বা **ঔকারান্ত** হইলে ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' কিংবা বহুবচনের 'র', 'দের' যোগের পূর্বে বিকল্পে এ আগম হয়। যেমন—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্তর, শ্রীমন্তের; কালীপদ—কালীপদর, কালীপদের, (কিন্তু শৈলেশ ষষ্ঠীতে শৈলেশের হইবে শৈলেশর হয় না, কারণ শৈলেশ বাংলায় অকারান্ত

শব্দ নয়। তবে চট্টগ্রামের এবং শ্রীহট্টের উপভাষায় শৈলেশর হইবে); মা—মার, মায়ের (মা শব্দ স্বল্পাক্ষর হেতু 'এ' আসিতেছে, কিন্তু কাকায়ের, দাদায়ের হইবে না) দৈ—দৈয়ের (দৈয়ের টাকা, দৈর টাকা হয় না; তবে পূর্ববঙ্গে হয়); বৌ—বৌর, বৌয়ের; বৌ—বৌরা, বৌয়েরা (এখানে র বহুবচনের); (ব্যঞ্জনান্ত শব্দেও) বোস—বোসদের, বোসেদের; ঘোষ—ঘোষদের, ঘোষেদের।'

১১। সর্বনামের রূপ

বাংলায় বিশেষ্য ও সর্বনামের রূপে একটু পার্থক্য আছে। বিশেষ্য শব্দের রূপে আসল শব্দটির সঙ্গেই বিভক্তি যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিভক্তি গ্রহণের জন্য মূল শব্দটির পরিবর্তন হয় না। যেমন—বালক শব্দের রূপে বালক শব্দটির সঙ্গেই বিভক্তি বা অনুসর্গ যোগ হইয়া বালকেরা, বালকদিগকে, বালকদের দ্বারা ইত্যাদি।

কিন্তু সর্বনামে প্রথমা ছাড়া সব বিভক্তিতেই আসল শব্দটির একটু পরিবর্তন হয়। যেমন—**আমি** শব্দ, এখানে প্রথমার একবচনে **আমি,** বহুবচনে **আমরা**; অন্যত্র বিভক্তি গ্রহণের জন্য এই শব্দের পরিবর্তন হইয়া **আমা** হয়; তারপর এই **আমা** রূপে নানা বিভক্তি ও বহুবচনান্ত প্রত্যয়াদি যুক্ত হয়। যেমন—

মূলশব্দ	প্রথমার রূপ	বিভক্তিগ্রাহী রূপ
আমি	আমি, আমরা	আমা
তুমি	তুমি, তোমরা	তোমা
তুই	তুই, তোরা	তো
আপনি	আপনি, আপনারা	আপনা
সে	সে, তাহারা	তাহা
তিনি	তাঁহা, তাঁহারা	তাঁহা
উহা	উহা উহারা	উহা
উনি	উনি, উঁহারা	উঁহা

বাংলা সর্বনাম শব্দে প্রথমার বহুবচনে রূপের একটু তারতম্য ঘটে; উহা শব্দের বিভক্তিগ্রাহী রূপের সঙ্গে বহুবচনান্ত প্রত্যয যোগে সর্বদা গঠিত হয় না। যেমন—উপরের তালিকায় আমি, আমরা (আমারা নহে); তুমি, তোমরা (তোমারা নহে); আবার বিভক্তিগ্রাহী রূপের সঙ্গে বহুবচনান্ত প্রত্যয় যোগেও প্রথমার বহুবচনের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন—তুই, তোরা (তো বিভক্তিগ্রাহী রূপ), আপনি, আপনারা (আপনা বিভক্তিগ্রাহী রূপ)।

নিম্নে একটি সর্বনাম শব্দের পূর্ণ রূপ প্রদর্শিত হইল—

'আমি' শব্দের রূপ

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	প্রথমা	আমি	আমরা
কর্মকারক	দ্বিতীয়া	আমাকে	আমাদিগকে
করণকারক	তৃতীয়া	আমাদ্বারা	আমাদিগ দ্বারা
		আমা দিয়া	আমাদিগ দিয়া
		আমা কর্তৃক	আমাদিগ কর্তৃক
সম্প্রদানকারক	চতুর্থী	আমাকে	আমাদিগকে
অপাদানকারক	পঞ্চমী	আমা হইতে	আমাদিগ হইতে
সম্বন্ধপদ	ষষ্ঠী	আমার	আমাদের
অধিকরণকারক	সপ্তমী	আমাতে	আমাদিগেতে

৯২। বিভিন্ন কারকে বিভক্তির ব্যবহার

বাংলায় সংস্কৃতের মত বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা নিশ্চিত ভাবে কারক নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বাংলা বাক্যে, বলিতে গেলে, সকল কারকেই সকল বিভক্তি হইতে পারে। আবার বাংলায় সকল কারকেরই বিনা বিভক্তিতেও (ব্যাকরণের ভাষায় শূন্য বিভক্তিতে) ব্যবহার আছে। এই জন্য কারক নির্ণয় করিতে এখানে বিভক্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া পদের অর্থের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতে হয়। নিম্নে বাংলায় বিভিন্ন কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গাদির ব্যবহার প্রদর্শিত হইল।

(কর্তৃকারক)

(১) শূন্যবিভক্তি

বাংলায় কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি প্রায়শঃ লোপ হয়। রাম ভাত খায়। আমি বাড়ী যাই। পাখীরা কুলায় ফিরিতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিল।

(২) এ, য়ে, য়, তে, এতে বিভক্তি

লোকে বলে। বাঘে খায়। একথা সকলে জানে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান্। ঘোড়ায় (ঘোড়াতে) গাড়ী টানে। ধোপায় (ধোপাতে) কাপড় কাচে। গরুতে ঘাস খায়। চড়ুইপাখীতে বাসা বেঁধেছে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

বাংলায় **সহযোগিতা, পারস্পরিকতা** ইত্যাদি বুঝাইতে এ (য়ে, য়) বিভক্তি হয়। যেমন—বাপ বেটায় ক্ষেতে কাজ করছে। ও পাড় হইতে আয়

খেয়া দিয়ে, এ পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সকল কথায় ছন্দ, বালকে বালকে কথা সকল কথায় দ্বন্দ্ব। দুজনে (বা দুজনায় বা দুজনাতে) আজ বিষম ঝগড়া হয়েছে। চল, তোমাতে আমাতে (তোমায় আমায়) এ কাজটা করে ফেলি।

(৩) কে (রে) বিভক্তি (বা দ্বিতীয়া বিভক্তি)

কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য (বা কর্মকর্তৃবাচ্যে) কর্তৃকারকে কে (রে) বিভক্তি হয়। যেমন—

তোমাকে ইহা দেখিতে হইবে (কর্মবাচ্য)।
তোমাকে যাইতে হইবে (ভাববাচ্য)।
তোমাকে বেশ দেখাইতেছে (কর্মকর্তৃবাচ্য)।

(৪) দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক (তৃতীয়ার অনুসর্গ) বা হতে, হইতে (পঞ্চমীর অনুসর্গ)

(ক) কর্মবাচ্যে কর্তায় দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ আসে। যেমন—রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছিল। তাহা দ্বারা এমন কাজ হইবে না। আমা হতে এই কার্য হবে না সাধন।

(খ) প্রযোজ্য কর্তাযও কর্মবাচ্যের মত দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ আসে। যেমন—তোমার দ্বারা একটা চিঠি লিখাইব। চাপরাশি দ্বারা নোটটা ভাঙ্গাইয়া আনাইলাম। বাবাকে দিয়া মার খাওয়াইব।

(৫) র (এর) বিভক্তি (ষষ্ঠী বিভক্তি)

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ কখনও কখনও কর্তায় র (এর) বিভক্তি হয়। যেমন—

আমার খাওয়া হয় নাই (কর্মবাচ্য)।
তোমার যাওয়া হইবে না (ভাববাচ্য)।

(কর্মকারক)

(১) শূন্য বিভক্তি

কর্তৃকারকের মত বাংলা কর্মকারকেও অনেক স্থানে বিভক্তি লুপ্ত থাকে (শূন্য বিভক্তি হয়)।

(ক) কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি সর্বদা লোপ হয়। যেমন—শিশু কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে। রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছিল।

(খ) কর্মকারকের কে (রে) ইত্যাদি দ্বিতীয়া বিভক্তি অনেক স্থানেই লোপ হয়।

অপ্রাণী বা ক্ষুদ্র-প্রাণিবাচক শব্দে প্রায়শঃ লোপ হয়। যেমন—ভাত খাও। ছবি দেখ। ছারপোকা মার। কাপড় পরি। মা মাছ কুটিতেছেন। মশা মারিতে কামান দাগিও না। ইত্যাদি।

প্রাণিবাচক, মনুষ্যবাচক শব্দে কখনো লোপ হয়, কখনো হয় না। যেমন—ডাক্তার ডাক (ডাক্তারকে বলিলে বিশেষ কাহাকে বুঝাইবে)। ছেলে ধর (ছেলেকেও হইবে)। গরু চরাও (গরুকে বলিলে বিশেষ গরু বুঝাইবে)। ধৈর্য ধর (ধৈর্যকে ধর হয় না)। বাঘে মানুষ খায় (মানুষ জাতিবাচক অর্থে)। ইত্যাদি।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় মুখ্যকর্মে কে (রে) বিভক্তি লুপ্ত হয়। যেমন—আমাদিগকে একটা গল্প বলুন। মাষ্টার মহাশয়কে একটা চিঠি লিখিতেছি।

(২) কে (রে) (দ্বিতীয়া বিভক্তি)

কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি অনেক ক্ষেত্রেই আবার লোপ হয় না। প্রায়ই ইহা বাগ্‌ভঙ্গীর এবং সুশ্রাব্যতার উপর নির্ভর করে।

কর্মকারকে সর্বনাম পদ, মনুষ্যের নাম বা বিশেষ করিয়া কিছু বুঝাইলে সাধারণতঃ কে বিভক্তি লোপ হয় না। যেমন—

তাহাকে ডাকিয়া আন। রহিমকে কথাটা বলিও না। পাখিকে কিছু খাবার দাও। মানুষ স্বজাতীয়কে ঘৃণা করিবে কেন? টাকাটিকে সিঁদুর মাখিয়ে তুলে রাখ। বউমা, মাছটিকে আগে কুটে দাও। রাই মেঘেরে ডাকিয়া বলে্ হে মুরলীধর (রে বিভক্তি প্রায়শঃ পদ্যে ব্যবহৃত হয়)।

কর্মবাচ্যে ও কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মে কখনো কখনো কে বিভক্তি হয়। যেমন, তোমাকে বেশ দেখাইতেছে (কর্মকর্তৃবাচ্য)। তাহাকে বলা হইয়াছে (কর্মবাচ্য)।

(৩) এ, তে (সপ্তমী বিভক্তি)

পিতামাতা গুরুজনে সেবা কর কায়মনে। শুনেছি রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে, জলধির কল্লোলে। তার মনে আর দুঃখ দিও না। এখন আর বন্ধুতে বিশ্বাস নাই।

(করণকারক)

(১) শূন্য বিভক্তি

ক্রীড়নার্থক ক্রিয়ার করণে সাধারণতঃ বিভক্তি লোপ হয়। যেমন—

তাস খেলা (অর্থাৎ তাস দিয়া খেলা) পাশা খেলা (অর্থাৎ পাশা দিয়া খেলা)। দাবা খেলা (দাবা দিয়া খেলা)। *

*যেখানে খেলার জন্য উপকরণ দরকার নাই সেখানে কি হইবে? যেমন হাডুডু খেলা। এখানে হাডুডুকে খেলা ক্রিয়ার কর্মই বলিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। সেইজন্য তাস খেলা

ক্রীড়নার্থক ক্রিয়ার করণ ব্যতীতও করণের বিভক্তি লোপ হয়। যেমন—লাঠি মারা (লাঠি দ্বারা মারা) ; চড় মারা (চড় দ্বারা মারা)। বেত মারা (বেত দিয়া মারা)।*

(২) এ (য়ে), তে (এতে) দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক (তৃয়া বিভক্তি ও অনুসর্গ)†

আগুনে সেক দাও। স্বহস্তে দান করিলেন। খড়্গে ছাগে কাটে লোক-হিতে। টাকায কি না হয় ? রিতে হাত কেটেছে। কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে। খাজনা দিব কিসে ? ('সে' শুধু প্রশ্নবোধক সর্বনামে হয়।) মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন। ঔষধ দ্বারা রোগীকে বাঁচাইয়া তুলিল। কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে। (কুঠারের দ্বারা, ঔষধের দ্বারা ইত্যাদিও হইবে। করণের 'দ্বারা' অনুসর্গের পূর্বে বিকল্পে ষষ্ঠীর র আগম ঘটে।)

(সম্প্রদান কারক)

(১) কে, রে, (দ্বিতীয়া চতুর্থী বিভক্তি)

দরিদ্রকে ধন দাও। সবারে দিযেছ তুমি ঘর। ('রে' সাধারণতঃ পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।)

(২) এ (য়) তে (সপ্তমী বিভক্তি)

দীনে দান কর। কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। বন্যাত্রাণ সমিতিতে চাঁদা দিতে হবে।

(অপাদান কারক)

(১) শূন্যবিভক্তি

স্কুল পালিযে সবাই জটলা করছে। দিল্লী মেল স্টেশন ছেড়ে গেল।

পাশা খেলায় তাস বা পাশাকে কর্ম বলিতে আপত্তি কি ? তাস বা পাশা, খেলার নাম ত বটে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে খেল্ ধাতুকে সকর্মক বলিতে হইবে।

*এই উদাহরণগুলি সম্পর্কেও প্রশ্ন আছে। লাঠি মারা ত সমস্তপদ, তৃতীয়া তৎপুরুষ। তাই ইহাকে করণেব বিভক্তি লোপেব উদাহবণ বলা সঙ্গত কি ? বেতমাবা, লাঠিমারা না হয় বুঝিলাম বেত দিয়া মাবিলাম, লাঠি দ্বারা মারিলাম, কিন্তু চড় দিয়া মারা, চড়মারা, বা চিমটি দিয়া কাটা, চিমটি কাটা কেমন হয় ?

†কর্তৃক অনুসর্গ দ্বাবা বাংলায় কবণকাবকের দৃষ্টান্ত আছে কি ? রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়। এখানে কর্মবাচ্যেব ভাব খুবই স্পষ্ট তাই আর একটি বাক্য লওয়া যাক—এ সন্তান কর্তৃক দুঃখ দূর হইবে না। এখানে দুঃখ কর্তা ধরিলে দুঃখ স্বয়ং সন্তান সাহায্যে দূর হইতেছে এরূপ অর্থ কবিতে হয়। ইহা নিশ্চয়ই বিসদৃশ। আরও কথা হইল কর্তৃক অনুসর্গটি মনুষ্যেতর প্রাণী সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় না। সেইজন্য কর্তৃক সর্বদা কর্মবাচ্যের কর্তায় নতুবা প্রযোজ্য কর্তায় ব্যবহৃত হয়। ইহাকে তৃতীয়ার করণের অনুসর্গ বলিলেও করণকারকে ইহার প্রয়োগ নাই বলিতে হইবে।

(২) কে, রে, (দ্বিতীয়া বিভক্তি)

দুর্জনকে সকলে ভয় করে। যত লজ্জা শুধু আমাকে ?

(৩) দিয়া (তৃতীয়ার অনুসর্গ)

চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। (দিয়া=হইতে) জ্বালামুখী দিয়া আগুন উঠিতেছে। মুখ দিয়া এমন কথা বাহির করিও না।

(৪) হইতে, থেকে, চেয়ে, (পঞ্চমীর অনুসর্গ)

গাছ হইতে ফল পড়িতেছে। কুয়া হইতে জল তুলিতেছে। কোথা হতে এলে তুমি ? ঘর থেকে চলে যাও। তিল হইতে তৈল হয়। প্রাণের চেয়ে মান বড়।

নিকট কাছ প্রভৃতি শব্দের পর হইতে, থেকে ইত্যাদি অনুসর্গ বিকল্পে উহ্য থাকে। যেমন—তাহার নিকট (হইতে থেকে) শুনিলাম। টাকাটা রামের নিকট পাইলাম।

(৫) র (এর) (ষষ্ঠী বিভক্তি)

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।

দুইদিন ধরিয়া বৃষ্টির বিরাম নাই।

(৬) এ, (য়) তে (সপ্তমী বিভক্তি)

মেঘে বৃষ্টি হয়। দুধে দৈ হয়। ধানেতে খই হয়। হাসিতে মুক্তা ঝরে। ও রসে বঞ্চিত আমি। তুমি ধর্মে পতিত হইবে। আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে ? বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা। ঘানিতে তেল পড়ছে। নয়নে গলয়ে ঘনলোর। অবিরাম বারিধারা ঝরিতেছে গগনে।

(অধিকরণ কারক)

(১) শূন্য বিভক্তি

রমেশ বাড়ি নেই। মামাবাড়ি ভারি মজা। আজ কিছু খাব না। পরশু নীলির বিয়ে। সেদিন কি বলেছিলে ? সারা গাঁ খুঁজে দেখেছি।

(২) কে (দ্বিতীয়া বিভক্তি)

আজকে যাব। কালকে বলব। (অধিকরণে কে শুধু এই দুইটি শব্দেই হয়ত হয়)।

(৩) হইতে, থেকে (পঞ্চমীর অনুসর্গ)

ঘর হইতে দেখিলাম (ঘরে অবস্থান করিয়া)। ছাদ হইতে ঘুড়ি উড়াইতেছে (ছাদে অবস্থান করিয়া)। মাঠ থেকে হাঁক দিয়ে বলল (মাঠে থাকিয়া)।

(৪) এ (য়), তে (এতে) বিভক্তি; মধ্যে, ভিতরে, উপরে ইত্যাদি অনুসর্গ (সপ্তমী বিভক্তি ও সপ্তমীর অনুসর্গ)

বাক্সে টাকা আছে। পুকুরে মাছ আছে। তিলে তৈল আছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। শনিবারে স্কুল বন্ধ হইবে। দিনে ঘুমাইও না।

ঘরের ভিতর কে বসিয়া আছে। বইটা টেবিলের উপর রাখ। পেটের মধ্যে বিছা গিজগিজ করিতেছে। (অধিকরণে মধ্যে, ভিতরে, উপরে ইত্যাদি অনুসর্গের পূর্বে ষষ্ঠীর র এর আগম হয়।)

১৩। কারকভিন্ন স্থলে বিভক্তির ব্যবহার

প্রথমার শূন্য বিভক্তি

(১) বিনা, ভিন্ন, নামে, বলিয়া, অবধি, পর্যন্ত ইত্যাদি অব্যয় যোগে প্রথমা (বা শূন্য বিভক্তি) হয়।

অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম সার। এ কাজ রাম ভিন্ন কেহ করে নাই। সুতানুটি নামে একটি গ্রাম ছিল। মিথ্যাবাদী বলিয়া কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। কাল অনেক রাত অবধি জাগিয়াছিলাম। কাক পক্ষী পর্যন্ত জানতে পারেনি। (কাক পক্ষীতে পর্যন্তও হইবে)।

(২) সম্বোধনে প্রথমা হয়। প্রথমার বিভক্তি লোপ হয় (অর্থাৎ শূন্য বিভক্তি)।

বাপু, ও কথা আর বলিও না। একটা টাকা দাও ত, রমেশ! প্রভু দয়া কর। হে ভগবান, একি করিলে? (প্রভো, ভগবন্, প্রভৃতিও হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও সংস্কৃত প্রথমারই রূপ)। নদি, কোথা হইতে আসিয়াছ?

দ্বিতীয়ার কে, রে বিভক্তি

(১) মনুষ্যাদিবাচক শব্দে বিনা, ব্যতীত, ছাড়া, লইয়া ইত্যাদি অব্যয় যোগে কে, রে বিভক্তি হয়।

তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারিব না। তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকে বলিব? ছেলেটিকে বিনা এ সংসার অচল দেখিতেছি। কেষ্টারে লয়ে থাক (রে প্রায়শঃ কবিতায়)।

(২) গমনার্থক ক্রিয়াযোগে গন্তব্যস্থানের পর কে বিভক্তি যুক্ত হয়।

ঘরকে যাব। মাঠকে যাব। (বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত।) ধনকে নিয়ে বনকে যাব। (ছেলে ভুলানো ছড়া)।

নিমিত্ত, উদ্দেশ্য ইত্যাদি অর্থেও বস্তুর সহিত কে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। জল্‌কে চল। তেল্‌কে লোক পাঠাও। (রাঢ় অঞ্চলে ব্যবহৃত)। বেলা যে পড়ে এল জল্‌কে চল (রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ পদ)।

তৃতীয়ার এ (য়), তে, (এতে) বিভক্তি

(১) সহার্থে তৃতীয়ার এ, তে বিভক্তি হয়।

সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে। সুরদলে সুরপতি গেল সুরপুরে। তোমাতে আমাতে আর দেখা হযনি।

(২) কর্মসমাপনে কালবাচক অর্থে এ, তে, বিভক্তি হয়। (সংস্কৃতে অপবর্গ)।

দুই দিনে ছবিটা শেষ করিযাছি। এক ঘণ্টায় হাওড়া পৌঁছিলাম।

(৩) যে অঙ্গের বিকারে অঙ্গী বিকৃত হয় সেই অঙ্গে এ, তে, বিভক্তি হয়। কানে কালা। চোখে কানা।

(৪) যে চিহ্নে (সংস্কৃতে উপলক্ষণে) চিহ্নধারীকে চেনা যায় তাহাতে এ, তে বিভক্তি হয়।

শিকারী বেড়াল গোঁফে চেনা যায়। গান্ধীটুপিতে বুঝিলাম কংগ্রেসী হইবেন।

(৫) জাতি, প্রকৃতি ইত্যাদি উল্লেখে এ, তে বিভক্তি হয়।

তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। লোকটা স্বভাবে বড় রুক্ষ

চতুর্থীর কে (রে) বিভক্তি

বাংলায় দ্বিতীয়া ও চতুর্থাতে একই বিভক্তি। তবে অর্থের দিক হইতে কারকভিন্ন স্থলে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ বলিতে পূর্ব প্রদর্শিত **জল্‌কে চল, তেল্‌কে পাঠাও** ইত্যাদিকে বলা চলে। কারণ এখানে অর্থ জলের নিমিত্ত, তেলের নিমিত্ত। তাই সংস্কৃত নিয়মে ইহাদিগকে নিমিত্তার্থে চতুর্থাই বলা চলে।

বাংলায় প্রয়োজনার্থক চতুর্থী বিভক্তিরও নিদর্শন আছে। যেমন—লাঠিকে লাঠি, ছাতাকে ছাতা। অর্থাৎ ছাতার প্রয়োজনে ছাতা, লাঠির প্রয়োজনে লাঠি।*

পঞ্চমীর হইতে, থেকে ইত্যাদি অনুসর্গ

(১) কাল ও পথের পরিমাণ বুঝাইতে পঞ্চমীর অনুসর্গ হয়।

আজ থেকে দুদিন পরে এসো। কলিকাতা হইতে দিল্লী ন'শ মাইল। শিশুকাল হইতে আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত।

দিক্ বা কালের নির্দেশ বুঝাইতেও পঞ্চমীর অনুসর্গ হয়।

বেহালা হইতে টালীগঞ্জ পূর্বে। আমাদের স্কুল এখান হইতে ঐ দিকে। আজ হইতে অশোকের কাল দুহাজার বছর আগে।

(২) অপেক্ষার্থে বা তুলনায় পঞ্চমীর অনুসর্গ হয়।

রাম থেকে শ্যাম বড়। বিত্ত থেকে চিত্ত বড়। যদু হইতে মধুর ধৈর্য বেশী।

অপেক্ষার্থক অব্যয় যোগে প্রথমার শূন্য বিভক্তি হয়। চেয়ে অব্যয় যোগে ষষ্ঠীর র বিভক্তি হয়।

ঢাকা কলিকাতা অপেক্ষা ছোট। এই অঙ্কটি অপেক্ষাকৃত জটিল। তোমার চেয়ে আমার শক্তি বেশী। হিংসার চেয়ে অহিংসা ভাল।

ষষ্ঠীর র (এর) বিভক্তি

বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তি র (এর) কোনো কারক বিভক্তি নহে। ইহাদের দ্বারা সম্বন্ধ শুধু প্রকাশ হয় তবে সেই সম্বন্ধ অনেকটা কারকার্থ প্রকাশ করে। এই বিষয়ে সম্বন্ধ পদের প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নে শুধু অকারক ষষ্ঠী বিভক্তির নিদর্শন দেওয়া হইল।

(১) নিমিত্তার্থে র (এর) বিভক্তি:—শোবার ঘর। খেলার মাঠ। (অর্থাৎ শুইবার নিমিত্ত ঘর; খেলিবার নিমিত্ত মাঠ)।

(২) অভেদার্থে র (এর) বিভক্তি:—জ্ঞানের আলো। দয়ার সাগর। (অর্থাৎ জ্ঞানরূপ আলো; সাগর তুল্য দয়া)।

(৩) অপেক্ষার্থে র (এর) বিভক্তি:—বয়সে বাপের বড়। সকলের ছোট। (অর্থাৎ বাপ হইতে বড়; সকলের চেয়ে ছোট।

*উদাহরণটি যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির ব্যাকরণে আছে।

সপ্তমীর এ(য়) তে (এতে) বিভক্তি

(১) হেতু অর্থে সপ্তমীর এ, তে বিভক্তি হয়।

দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে। তিনি লোকহিতে সর্বস্ব দান করিলেন। পরের কারণে মরণেও সুখ। আপনার জ্ঞাতার্থে ইহা নিবেদন করিলাম।

(২) নির্ধারণে সপ্তমীর এ, তে বিভক্তি হয়।

বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি। পক্ষীতে বায়স ধূর্ত।

[সহার্থে, প্রয়োজনার্থে ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ (য়) তে (এতে) বিভক্তির প্রয়োগ তৃতীয়ার অন্তর্গত করিয়া পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।]

অনুশীলনী

(ক)

১। কারক কাহাকে বলে? বাংলায় কারক কয় প্রকার? বিভিন্ন কারকের উদাহরণ দাও।

২। সবগুলি কারক থাকে এমন একটি বাক্য রচনা করিতে পার কি?

৩। আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ এবং বিষয়াধিকরণ কি, উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

৪। ব্যঞ্জনামূলক অপাদান বলিতে কি বুঝায়? কয়েক প্রকার ব্যঞ্জনা-মূলক আপাদানের দৃষ্টান্ত দাও।

৫। কেহ কিছু প্রদান করিলেই কি সম্প্রদান কারক হয়? নিম্নের বাক্যগুলিতে কোথায় সম্প্রদান কারক হইযাছে বল—

দেমা আমায় তবিলদারী। সৎপাত্রে কন্যা দিয়াছেন। চাকরকে বেতন দাও।

নির্দেশ: দান ক্রিয়ার পাত্র সম্প্রদান কারক হয়। স্বত্ব ত্যাগ করিলেই দান ক্রিয়া হয়। দেমা আমায় এখানে কর্মে নিয়োগ করার কথা—দানের কথা নহে। চাকরকে বেতন দেওয়া দান ক্রিয়া নহে, প্রাপ্য মাত্র দেওয়া হইতেছে। এখানে কন্যা দানের ক্ষেত্রে সৎপাত্রে পদটি সম্প্রদান কারক।

৬। করণ কারক কি? নিম্নের বাক্যগুলিতে কোথায় করণ কারক আছে পরীক্ষা কর :—

রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়। বাবাকে দিয়া তোমাকে মার খাওয়াইব। খড়্গো ছাগে কাটে লোকহিতে।

নির্দেশ: কর্তা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা করণ। রাম কর্তৃক করণ নহে, কর্তা; কর্মকারকের কর্তা। বাবাকে দিয়াও করণ নহে,

প্রযোজ্য **কর্তা**। খড়্গো অবশ্য করণ; খড়্গদ্বারা কেহ (**কর্তা উহ্য**) ছাগ কাটিতেছে।

৭। উদাহরণ দাও :—

(ক) প্রযোজক কর্তা, প্রযোজ্য কর্তা, (খ) ভাববাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা; কর্ম-কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা; (গ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম, সমধাতুজ কর্ম।

৮। (ক) সম্বন্ধপদ কারক নহে কেন, আলোচনা কর।

(খ) সম্প্রদান কারক পৃথক কারক কিনা বল।

৯। (ক) নানারূপ সম্বন্ধ পদের দৃষ্টান্ত দাও।

(খ) নানারূপ সম্বোধন পদের দৃষ্টান্ত দাও।

১০। সংস্কৃতানুসারী সাধু গদ্যে নিম্নলিখিত শব্দের সম্বোধন পদ কি হইবে বল :—

রাজা, বন্ধু, পিতা, নদী, ভগবান, বধূ, ধনী, বিদুষী।

(খ)

১১। কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গে পার্থক্য কি দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইয়া বল।

বাংলায় প্রধান কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গগুলি কি?

১২। নিম্নলিখিত শব্দের সপ্তমীর একবচন রূপ লেখ (বিকল্পরূপ সহ) :— মা, ছেলে, দৈ, মেসো।

১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ষষ্ঠির একবচন ও বহুবচন রূপ (বিকল্পরূপ সহ) লেখ—

প্রভাকর, কালীপদ, মা, দৈ, বৌ, বোস, চক্রবর্তী, ঘর, মাঠ।

১৪। শব্দরূপে সর্বনামের বিভক্তিগ্রাহী রূপ বলিতে কি বোঝায়?

১৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্ণ শব্দ রূপ লেখ :—

সে, ঐ, মা, ভাই।

(গ)

১৬। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির দৃষ্টান্ত দাও।

(একমাত্র সম্প্রদান ব্যতীত সকল কারকেই হইবে)

১৭। বিভিন্ন কারকে এ বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।

(সকল কারকেই হইবে)।

১৮। প্রয়োগ দেখাও :—

(ক) কর্তৃকারকে এ, তে, কে, র বিভক্তি।

(খ) কর্তৃকারকে কর্তৃক, দ্বারা, দিয়া অনুসর্গ।

(গ) কর্মকারকে এ, তে, বিভক্তি।

(ঘ) করণ কারকে শূন্য বিভক্তি।

(ঙ) সম্প্রদান কারকে এ, (য়), তে বিভক্তি।

(চ) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি, দিয়া অনুসর্গ।

(ছ) অধিকরণ কারকে শূন্য বিভক্তি, হইতে অনুসর্গ।

১৯। কোন্ কারকে কি বিভক্তি হইয়াছে বল :—

তিলে তৈল আছে। **তিল হতে** তৈল হয়। **ছাদ হইতে** ঘুড়ি উড়াইতেছে। **চক্ষু দিয়া** জল পড়িতেছে। **পরশু** নীলির বিয়ে। **হাসিতে মুক্তা** ঝরে। যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানে **সন্ধ্যা** হয়। **বন্যাত্রাণ সমিতিতে** চাঁদা দিতে হবে। গাড়ী **স্টেশন** ছেড়ে গেল। **মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন। ছেলেরা **তাস** খেলিতেছে। **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে খাজনা দিব **কিসে? তোমাকে** বেশ দেখাইতেছে। **পিতামাতা গুরুজনে** সেবা কর কায়মনে। **ডাক্তার** ডাক। **শিশু কর্তৃক** চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে। **আমার** খাওয়া হয় নাই। **চাপরাশি দ্বারা** নোটটা ভাঙ্গাইলাম।

২০। প্রয়োগ দেখাও :—

(ক) অব্যয় যোগে শূন্য বিভক্তি; (খ) বিনা যোগে শূন্য বিভক্তি, (গ) গমনার্থক ক্রিয়াযোগে কে বিভক্তি; (ঘ) নিমিত্তার্থে কে বিভক্তি; (ঙ) সহার্থে এ, তে বিভক্তি; (চ) উপলক্ষণে এ, তে বিভক্তি। (ছ) প্রয়োজনার্থে কে বিভক্তি; (জ) তুলনায় থেকে অনুসর্গ; (ঝ) হেতু অর্থে এ, তে।

২১। বিভক্তি ও অনুসর্গগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বল :— **সুতানুটি** নামে একটা গ্রাম ছিল। বয়সে **বাপের** বড়। **দয়ার** সাগর বিদ্যাসাগর। **পক্ষীতে** বায়স ধূর্ত। আপনার **জ্ঞাতার্থে** লিখিলাম। **বিত্ত থেকে** চিত্ত বড়। **ছাতিকে** ছাতি **লাঠিকে** লাঠি। বেলা যে পড়ে এল **জলকে** চল। **ঘরকে** যাবিনে? শিকারী বেড়াল **গোঁফে** চেনা যায়। একটা টাকা দাও ত, **রমেশ**!

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশেষণ পদের বিশ্লেষণ

পদ পরিচয় অধ্যায়ে বিশেষণ সম্পর্কে মোটামুটি বলা হইয়াছে এবং অর্থানু-সারে বিশেষণের নানা শ্রেণী বিভাগ দেখানো হইযাছে। নিম্নে ব্যুৎপত্তি বা গঠন অনুযায়ী বিশেষণের শ্রেণী-বিভাগ প্রদর্শিত হইল—

বিশেষ্যের বিশেষণ :—

১। মৌলিক বিশেষণ।
২। প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ।
৩। উপসর্গযুক্ত বিশেষণ।
৪। বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ।
৫। সমাস দ্বারা সাধিত বিশেষণ।

ক্রিয়াবিশেষণ :—

মৌলিক ক্রিয়াবিশেষণ।
প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ।
বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ।
ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ।
সমাস দ্বারা সাধিত ক্রিয়া বিশেষণ।

১। বিশেষ্যের বিশেষণ গঠন

১। মৌলিক বিশেষণ—

বিশেষ্য পদের কতকগুলি বিশেষণ মৌলিক। অর্থাৎ ইহারা শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়াদি বা অন্য শব্দযোগে গঠিত হয় নাই। যেমন—ভালো, মন্দ, বড়, ছোট, কম, বেশী, মোটা, সরু, ইত্যাদি।

২। প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ—

সংস্কৃত ও বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। যেমন—হাঁটা পথ, চেনা লোক, পড়তি বেলা, উঠতি বয়েস, বর্তমান শতাব্দী, ভবিষ্যৎ বংশধর, (কৃৎ প্রত্যয় জাত)।

তেলা মাথা, মেটে কলসী, ঢাকাই পরোটা, দখিণা বাতাস, বেনারসী শাড়ী, জমিদারী চাল, ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় পতাকা (তদ্ধিত প্রত্যয় জাত)। মিটমিটে আলো, চটচটে আঠা, থুরথুরে বুড়ো, খিটখিটে মেজাজ, নড়বড়ে দাঁত, চকচকে জুতা (অনুকার শব্দজাত)।

৩। উপসর্গযুক্ত বিশেষণ—

আলুনি ভাত, আর্‌ধা মাংস, অনামুখো মিন্‌সে, অনাছিষ্টি কাণ্ড, বেহেড ছোকরা, বেকার যুবক, গরহাজির মজুর, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, নির্জলা উপবাস,।.

(উপরে আলুনি, আর্‌ধা, অনামুখো, নির্জলা ইত্যাদি বিশেষণে উপসর্গ এবং প্রত্যয় একই শব্দের আগে-পরে ব্যবহার হইয়াছে।)

৪। বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ—

এই বিশেষণগুলি সাধারণতঃ বিশেষ্যের সঙ্গে সর্বনামের সঙ্গে বা অব্যয়ের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হইয়া গঠিত হয়। যেমন—

সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ, পাড়ার ছেলে, পালের নৌকা, সাতের নম্বর, তিনের পাতা, [বিশেষ্যের উত্তর র (এর) বিভক্তি যোগে।]

নিজের ছেলে, কাদের কুকুর, সবার ভাল, আমার ইচ্ছা, কোথাকার ভূত, কবেকার কথা [সর্বনামের উত্তর র (এর) কার বিভক্তি যোগে]

দৈবাতের হাত, যদির কথা, কিন্তুর বিষয়, কেনর জবাব [অব্যয়ের উত্তর র (এর) বিভক্তি যোগে]।

৫। সমাস দ্বারা সাধিত—

প্রায় সকল সমাসই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন—নীলোৎপল আঁখি, যথাবিধি সৎকার, পিতাপুত্র সম্পর্ক, তাঁতেবোনা শাড়ী, সাতমহলা বাড়ি, বংশীধারী কৃষ্ণ।

একাধিক পদ অনেক সময় সমাসবদ্ধ না হইয়াও একসঙ্গে থাকিয়া বিশেষণের কাজ করে। যেমন—

সব-পেয়েছির দেশ, দাঁত-বের-করা হাসি, বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে, যাই-যাচ্ছি ভাব, যাওয়া-আসার পথ, ত্রাহি-ত্রাহি ডাক, যৎপরোনাস্তি আনন্দ, নাস্তানাবুদ অবস্থা।

২। ক্রিয়াবিশেষণ গঠন

১। মৌলিক ক্রিয়াবিশেষণ—

সাধারণতঃ অব্যয়পদগুলিই মৌলিক ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

বেশ করেছি। খাসা মানিয়েছে। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি আসিল।

২। প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ—

সর্বত্র, সর্বথা, কদাচ, কুত্রাপি, পিতৃবৎ, মাতৃবৎ, ক্রমশঃ, প্রায়শঃ, দ্বিধা, শতধা ইত্যাদি তৎসম শব্দ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩। বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ—

এই শ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ এ (য়) বিভক্তি যোগে গঠিত হয়। যেমন—

ধীরে চল। আস্তে বল। নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। সাবধানে থাকিও। দ্রুতবেগে ছুটিতেছে।

৪। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ—

এই শ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণগুলি করিয়া (করে) ক্রিয়া যোগে গঠিত হয়। যেমন—ভাল করিয়া চল। ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সাঁ-সাঁ করে বাতাস বইছে।

'করিয়া' ব্যতীত বিভক্তিযুক্ত অন্য ক্রিয়াপদ দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষণ হয়। যেমন—আমি হকচকাইয়া গেলাম। তাকে চুটিয়ে বকে দিয়েছি। না হইলে দুঃখ পাইবে।

৫। সমাস দ্বারা সাধিত ক্রিয়াবিশেষণ—

যথেষ্ট হয়েছে। প্রাণপণ দেখিতেছি। যাবজ্জীবন দুঃখ করিলাম। প্রণাম পূর্বক নিবেদন এই। ইত্যাদি বাক্যে সমাস দ্বারা সাধিত ক্রিয়াবিশেষণের নিদর্শন রহিয়াছে।

ঠিক সমাসবদ্ধ না হইয়া একাধিক পদ সমন্বয়েও ক্রিয়াবিশেষণ হয়। যেমন—

দেখামাত্র মুখ ফিরাইলাম। পত্রপাঠ উত্তর দিবে।

অনেক সময় শব্দদ্বৈত ও অনুকার শব্দ দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষণ হয়।

ধীরে ধীরে যাও। মুচকি মুচকি হাসছে। ঝনঝনি ঝনঝনি খঞ্জনি বাজে। টুপটাপ ঝরে শিশিরেরা।

৩। বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণে যে গুণ প্রকাশ করে তাহার আপেক্ষিক আধিক্য প্রকাশের নাম বিশেষণের তারতম্য।

বিশেষণের তারতম্যে এই আধিক্যের আবার দুই প্রকার মাত্রা (degree) আছে। এই তুলনা দুই এর মধ্যে হইয়া একের গুণাধিক্য প্রকাশ করে (Comparative Degree) ; আবার কখনো ইহা বহুর মধ্যে হইয়া একের সর্বাধিক উৎকর্ষ (Superlative Degree) বর্ণনা করে।

সংস্কৃতে **তর, তম** (ক্ষেত্র বিশেষে ইয়সু, ইষ্ঠ) প্রত্যয় যোগে বিশেষণের তারতম্যের মাত্রা বুঝানো হইয়া থাকে। যেমন—প্রত্যয় যোগে প্রিয় বিশেষণটির

তারতম্যে হইবে প্রিয়তর, প্রিয়তম অথবা প্রেয়ান, প্রেষ্ঠ। কিন্তু খাঁটি বাংলায় বিশেষণের তারতম্যের জন্য কোন প্রত্যয় নাই : মোটাতর, মোটাতম কিংবা মোটেয়ান্, মোটেষ্ঠ বাংলায় চলে না।

বাংলায় বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জন্য দুইটি উপায় আছে—

(১) **চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে, অধিক** ইত্যাদি শব্দ **অনুসর্গ রূপে** ব্যবহার করিয়া, যেমন—গুড়ের চেয়ে চিনি ভাল। যদু থেকে মধু ছোট। নিরাকরণ অপেক্ষা নিবারণ শ্রেয়ঃ। (দুইএর মধ্যে গুণাধিক্য)

পক্ষীর মধ্যে কাক ধূর্ত। মায়ের মতন কেউ নাই। ছেলেদের মধ্যে সুধীর বুদ্ধিমান। (বহুর মধ্যে গুণাধিক্য)

(২) অনুসর্গ ছাড়া **ষষ্ঠী বিভক্তি র (এর)** ব্যবহার করিয়া—

দাদা আমার বড়। মণি মনীষার ছোট। (দুই এর মধ্যে গুণাধিক্য)

মিলিদি সকলের বড়। মায়ের বড় কে ? (বহুর মধ্যে গুণাধিক্য)

(৩) অনুসর্গ ছাড়া শুধু বিভক্তি যোগে বিশেষণের তারতম্য খুব কমই হয়। এরূপ স্থলে প্রায়ই **বিভক্তির সঙ্গে অনুসর্গ** আসে। যেমন—সে সকলের চেয়ে সুন্দরী। তোমার থেকে মধুর জোর বেশী। ইত্যাদি।

(৪) আধিক্যের ভাবটিতে কম বেশী তারতম্য করিতে হইলে **খুব, অধিক, অনেক, সামান্য, অল্প, একটু** ইত্যাদি বিশেষণ বসানো হয়। যেমন—

তোমার চেয়ে সে ঢের ভাল। এ মাছটা ওটা থেকে সামান্য বড় হবে। রাঁচির তুলনায় এখানে শীত অনেক কম। ভুতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।

৪। সংস্কৃত শব্দে বিশেষণের তারতম্য

সংস্কৃত তর, তম বা ইয়স্, ইষ্ঠ প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণের রূপ বাংলায় প্রায় বর্জিত হইয়াছে। এমন কি সাধু গদ্যেও ইহার ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। বৃদ্ধ বিশেষণের তারতম্য বাংলায় অধিক বৃদ্ধ, অত্যধিক বৃদ্ধ ইত্যাদি। বৃদ্ধতর, বৃদ্ধতম বা জ্যায়ান, বর্ষিষ্ঠ বাংলায় চলে না। বর্ষীয়ান্ (Comparative) জ্যেষ্ঠ (Superlative) চলে—কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা এইগুলি বর্জনের দিকে। নিম্নে সংস্কৃত বিশেষণ শব্দের তারতম্যের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

(সংস্কৃতে বিশেষণের তারতম্য)

মূল বিশেষণ	তর বা ঈয়স্ যোগে দুই এর মধ্যে গুণাধিক্য (Comparative Degree)	তম বা ইষ্ঠ যোগে বহুর মধ্যে গুণাধিক্য (Superlative Degree)
অল্প	অল্পতর অল্পীয়ান্ কনীয়ান্	অল্পতম অল্পিষ্ঠ কনিষ্ঠ
গুরু	গুরুতর গরীয়ান্	গুরুতম গরিষ্ঠ
বহু	বহুতর ভূয়ান্	বহুতম ভূয়িষ্ঠ
প্রিয়	প্রিয়তর প্রেয়ান্	প্রিযতম প্রেষ্ঠ
বলী	বলীয়ান্	বলিষ্ঠ
লঘু	লঘুতর লঘীয়ান্	লঘুতম লঘিষ্ঠ
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
মহৎ	মহত্তর মহীয়ান্	মহত্তম মহিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বৃদ্ধতর জ্যায়ান্ বর্ষীয়ান্	বৃদ্ধতম জ্যেষ্ঠ বর্ষিষ্ঠ

বিশেষণের তারতম্যমূলক সংস্কৃত (তৎসম) শব্দও বাংলায় তারতম্যের ভাবটি ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে। যেমন—**পাপীয়সী** বলিলে সাধারণ ভাবে পাপকারিণী বুঝায়; কোন তুলনা বুঝায় না। **প্রেয়সী** বলিলে নিশ্চিতই একাধিক **প্রিয়ার** মধ্যে তারতম্য বুঝায় না, সাধারণ ভাবেই প্রিয়াকে বুঝায়। **বর্ষীয়সী** বলিলে সাধারণভাবেই বয়স হইয়াছে এমন নারীকে বুঝায়, তারতম্যের ভাব আসেই না।

অনুশীলনী

১। বই এর সাহায্য লইয়া বিশেষ্যের বিশেষণের নিম্নলিখিত রূপগুলির দৃষ্টান্ত দাও :—

(ক) প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ ; উপসর্গযুক্ত বিশেষণ ; বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ।

(খ) সমাস দ্বারা সাধিত বিশেষণ, পদ সমবায়াত্মক বিশেষণ ; অনুকার শব্দজাত বিশেষণ।

২। বই এর সাহায্য লইয়া ক্রিয়া বিশেষণের নিম্নলিখিত রূপগুলির দৃষ্টান্ত দাও :—

(ক) প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ ; বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ ; ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ।

(খ) সমাস দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ ; শব্দদ্বৈত দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ ; পদ সমবায়ে ক্রিয়াবিশেষণ।

৩। বিশেষণগুলির গঠন সম্পর্কে মন্তব্য কর—

মেটে কলসী। উঠতি বয়েস। নির্জলা একাদশী। আলুনি ভাত। কোথাকার ভূত। সখের প্রাণ। তাঁতে-বোনা শাড়ী ; দাঁত-বের-করা হাসি। সাবধানে থাকিও। ভাল করিয়া বল। ধপাস্ করে বসে পড়লে। ধীরে ধীরে যাও। চুটিয়ে বকে দিলাম।

৪। বিশেষণের তারতম্য বলিতে কি বোঝায় ?

৫। বাংলায় বিশেষণের তারতম্য বুঝাইবার উপায়গুলি বর্ণনা কর।

৬। সংস্কৃতে বিশেষণের তারতম্য প্রকাশের প্রত্যয় কি কি ? বাংলাতে এই সকল প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ কতটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে ?

৭। নিম্নের বিশেষণগুলির সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে তারতম্য প্রকাশ কর—

প্রিয়, পাপী, লঘু, বহু।

সপ্তম অধ্যায়

পদ পরিচয় অধ্যায়ে অর্থের দিক হইতে অব্যয়ের মোটামুটি শ্রেণী বিভাগ দেখান হইয়াছে। এখানে অব্যয়পদগুলির গঠন ও তাহাদের নানা অর্থে প্রয়োগের আলোচনা করা হইবে।

১। অব্যয়পদের গঠন

গঠনের দিক হইতে অব্যয়পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) বিভক্তিপ্রত্যয়হীন অব্যয়—

এই শ্রেণীতে হাঁ, না, ও, ছি, তো, ই, ও, আর, আবার ইত্যাদি খাঁটি বাংলা অব্যয় পড়ে।

বিদেশী অব্যয় বেশ, খুব, ব্যস্‌, সাবাস, খাসা, মাইরি ইত্যাদিও এই শ্রেণীতে পড়ে।

(২) প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত অব্যয়—

যথা, তথা, যদি, যদা, তদা, সর্বদা প্রভৃতি সংস্কৃত প্রত্যযযুক্ত অব্যয় এই শ্রেণীতে পড়ে।

হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, স্বয়ং, এবং, বরং, পুনঃ ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত সংস্কৃত অব্যয় এই শ্রেণীতে পড়ে।

উপরি উক্ত সংস্কৃত অব্যয়গুলির অনুকরণে বাংলায় অগত্যা, পরন্তু, উপরন্তু, তত্রাচ, কুত্রাপি, আদৌ, পুনরায় ইত্যাদি অব্যয় গঠন করা হইয়াছে।

বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত অব্যয়গুলিতে এ বিভক্তি বা কোন অনুসর্গ বা করিয়া যুক্ত হইতে পারে। যেমন—সাবধানে, ধীরে ধীরে, জোরের সঙ্গে, হঠাৎ করে।

(৩) একাধিক শব্দযোগে গঠিত অব্যয়—

[illegible]াধিক অব্যয় যোগে গঠিত কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয় বাংলায় তৎসমর[illegible]ৃহীত হইয়াছে। যেমন—

[illegible]কন্তু (কিম্‌+তু), কিঞ্চিৎ (কিম্‌+চিৎ), কথঞ্চিৎ (কথম্‌+চিৎ), অতএব (অতঃ+এব), যদ্যপি (যদি+অপি), তথাপি (তথা+অপি), নতুবা (ন+তু+বা)।

বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া সর্বনাম ইত্যাদি একাধিক পদযোগে গঠিত কতকগুলি বাংলা অব্যয় রহিয়াছে। যেমন—

সেইজন্য, তা বলে, যদি না, ফল কথা, তাই তো, যাকগে, হা ভগবান্‌, তাই নাকি, বেশ তো, বেমালুম।

অনেক সময় শব্দদ্বৈত বা অনুকার শব্দ দ্বারাও এইরূপ অব্যয় গঠিত হয়। যেমন—

রাম রাম, হরি হরি, বাপরে বাপ, টিম টিম, সাঁ সাঁ, হুস্ হুস্, ড্যাডাং ড্যাডাং।

সম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়া গঠিত অব্যয়গুলিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন—

এই মরেছে! কি মুস্কিল! আহা মরি! আর চাইকি! বলা বাহুল্য! হা হতোঽস্মি! মা ভৈঃ!

২। অব্যয়ের প্রয়োগ

পদ পরিচয় অধ্যায়ে অব্যয়গুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—

(ক) বিশেষক অব্যয়—ক্রিয়াবিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ ইত্যাদি (**Adverbs**)।

(খ) পদান্বয়ী অব্যয়—অনুসর্গ (**Post-position**) ও অন্যান্য পদান্বয়ী অব্যয় (**Prepsosition**)।

(গ) সংযোজক অব্যয়—পদ বা বাক্য সংযোজক অব্যয় (**Conjunctions**)।

(ঘ) কেবল অব্যয়—দুঃখ বিস্ময়াদি ভাব প্রকাশক অব্যয় (**Interjections**)।

এখন এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী অব্যয়ের নানা প্রকার প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে—

(ক) বিশেষক অব্যয়ের (Adverbs) প্রয়োগ

বিশেষক অব্যয় বিশেষণ পদও ক্রিয়াপদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে—বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে খুব, ভারি, অতি, বড় ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—খুব ভাল, ভারি দুষ্টু, বড় সেয়ানা, অতি নচ্ছার, কী ভয়ানক।

(২) বিশেষণের তারতম্যে—বিশেষণের তারতম্যে বা তুলনায় যেন, হেন, মতন, ন্যায়, পানা, পারা, তুল্য, যথা, তথা, ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—লাল যেন জবা ফুল। সোনা হেন ছেলে। ভূতের মতন চেহারা। চাঁদ পানা মুখ। অর্জুনের মত বীর। যথা পূর্বম্ তথা পরম্। যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেঁতুল।

(৩) ক্রিয়াবিশেষণ রূপে—ক্রিয়া বিশেষণ রূপে হঠাৎ, কচিৎ, এত, এযাবৎ, আস্তে, ধীরে, সঙ্গে, সঙ্গেসঙ্গে, অগত্যা, আদবে, আদৌ, যদিনা, তাইতে, করিয়া ইত্যাদি ব্যবহার হয়। যেমন—তাহার সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। সাবধানে চলিও। অগত্যা আর কি করিব। আমার আদৌ ইচ্ছা নাই।

সে বেমালুম কথাটা চাপিয়া গেল। তাইতে আমার রাগ হল। তাড়াতাড়ি করিয়া লাভ কি? কেমন করিয়া হইবে, বল। এত দ্রুত পথ চলিও না।

(৪) **অনুকার শব্দে ক্রিয়া বিশেষণ**—অনুকার শব্দগুলি দ্বারাও ক্রিয়া বিশেষণ হয়। যেমন—ঝনঝন করিয়া বাসনগুলি পড়িয়া গেল। বুকটা আমার টন টন করিতেছে। হুস হুস শব্দে জল ছুটিল।

(খ) পদান্বয়ী অব্যয়ের প্রয়োগ (Post-positions, Prepositions)

(১) **অনুসর্গ অব্যয়**—দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, থেকে, ভিতরে, মধ্যে, ইত্যাদি। পদান্বয়ী অব্যয় কারক বুঝাইবার জন্য শব্দের সঙ্গে অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

রামের দ্বারা, আমা কর্তৃক, গৃহ হইতে, সকাল থেকে, বাক্যের মধ্যে, ঘরের ভিতরে, গর্তের ভিতর থেকে, গাছের উপর হতে ইত্যাদি।

(২) **অকারক পদান্বয়ী অব্যয়**—কারক সূচক পদান্বয়ী অব্যয় ছাড়া আর এক প্রকার পদান্বয়ী অব্যয় আছে। এই অব্যয়গুলি অনেকটা ইংরেজি **Preposition** এর মত কাজ করে। যেমন—বিনা, ছাড়া, বই (without), অপেক্ষা, চেয়ে (than, from), সঙ্গে, সহ, সহিত, সমভিব্যাহারে (with), মতন, ন্যায়, হেন (like), যেন (as if), মারফত, দিয়ে (through), তক, ইস্তক, পর্যন্ত, অবধি (till, until, up to) ইত্যাদি।

(গ) সংযোজক অব্যয়ের প্রয়োগ (Conjunctions)

(১) **সংযোজক (সংযোগ সূচক) অব্যয়**—এবং, ও, আর, আবার ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়গুলি সাধারণ অর্থে পদ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে। যেমন—

[illegible] ও শ্যাম স্কুলে যাইতেছে। তোমার বই আর খাতা কোথায়? সে [illegible] এবং বুদ্ধিমান্।

(২) **ব্যতিক্রমসূচক সংযোজক অব্যয়**—তথাপি, যদি, অথচ, কিন্তু, পরন্তু, বরং, তবু, অধিকন্তু ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যতিক্রমের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

তুমি যাইও না বরং আমিই যাইব। সে দরিদ্র তথাপি উদার। যদি বৃষ্টি হয় আমি যাইতে পারিব না। সবই খেতে পার কিন্তু টক খাবে না। সে আমাকে একশো টাকা ধার দিলে না অথচ আমি তার কি না

করেছি! দয়া কোন দুর্বল প্রবৃত্তি নহে, পরন্তু সবল হৃদয় না হইলে দয়া জন্মিতেই পারে না। বলি, তুমি বেঁচে আছ, না (=অথবা) মরে গেছ? রমেশকে না হয় সুরেশকে আসতে লিখে দাও। সুরেশ অসুস্থ, সুতরাং রমেশকেই আসতে হবে।

(ঘ) কেবল অব্যয়ের প্রয়োগ (Interjections)

এই অব্যয়গুলির সহিত বাক্যের অন্যান্য পদের তেমন সম্পর্ক নাই। তবু এই অব্যয়গুলি বাক্যমধ্যে থাকিয়া নানা উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে।

(১) **ভাবপ্রকাশে**—কেবল অব্যয় প্রধানতঃ মনের হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ঘৃণা (এইগুলি প্রায়ই সহসা জাত বা আকস্মিক) ভাব প্রকাশ করে। যেমন—

হায় ভগবান্! এ কি হল? মরি মরি কী রূপ! ইস্! বল্লেই হল? উঃ, কী শীত! বাপরে বাপ, আর পারিনে। ভারি মজা, কাল ছুটি। ছোঃ ছোঃ, ওটা একটা মানুষ! ইমা, এ কে কল্লে? তোবা তোবা, এ কাজও করে? আ মলো, যমেও দেখেনা? বাঃ বাঃ, সাবাস ছেলে! তোফা হয়েছে, বেঁচে থাক্ ভাই। বালাই বালাই, ও কথা মুখে আনে? ষাট্ ষাট্, বেঁচে থাক বাছা।

(২) **প্রতিজ্ঞা ইত্যাদিতে**—কেবল অব্যয় সম্মতি, অসম্মতি, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় ইচ্ছা, শপথ ইত্যাদি বুঝাইতেও ব্যবহার হয়। যেমন—আমি যাবনা। আমি যাব না, না। আলবৎ যাবে। হাঁ, যেতে হবে। বেশ, কাল যাস্। হাঁ, মাইরি বলছি (Maryর নামে শপথ, পোর্তুগীজ ভাষা হইতে আগত)।

(৩) **প্রশ্নে**—প্রশ্ন বুঝাইতেও কেবল অব্যয় ব্যবহার হয়। যেমন—তুমি যাবে কি? রাম নাকি আসবেনা? ভালো আছ ত? তুমি না [illegible] ড়ী যাবে?

(৪) **ক্রিয়ার অঘটন অর্থে**—ক্রিয়ার অঘটন বুঝাইতে কেবল অব্যয় না, এবং ইহার সহিত ক্রিয়া যুক্ত হইয়া নয় (না+হয়), নহে (না+হয়), নাই (না+হয়), নই (না+হই), নও (না+হও), নহেক (না+হয়+ক) ইত্যাদি ব্যবহার হয়।

(৫) **সম্বোধন**—অনেক সময় সম্বোধন পদের সহিত সম্বোধনার্থক কেবল অব্যয় যুক্ত হয়। যেমন—

ওহে (ও+হে) রাম, দেখাই যে নেই! রে নরাধম, একি করেছিস? অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি! ভো রাজন্যগণ, আমি আমার কন্যাকে বীর্যশুল্কা করেছি। দেহ মাগো সন্তানে বিদায়। ওলো (ও+লো) বিনোদিনী, তোর একি কাণ্ড! হ্যাঁগা (হ্যাঁ+গা) বামুন পিসী, কথাটা শুনলে ত!

(৬) **বাক্যালঙ্কারে**—অনেক সময় অনন্বয়ী অব্যয় শুধু বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলির পৃথক কোন অর্থ না থাকিলেও সমগ্র বাক্যে অর্থ ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি হয়। যেমন—

এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়। এটা ত অবধারিত সত্য। তার যে আর দেখা পাওয়া যায় না। তা আপনিই যদি এমন বলেন, তবে আর উপায় কি?

(৭) **পাদপূরণে**—রে, গো, না ইত্যাদি অনন্বয়ী অব্যয় অনেক সময় বাক্যে পাদপূরণের জন্যও ব্যবহৃত হয়। তবে বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের সহিত ইহার পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন। বাক্যালঙ্কার অব্যয় বাক্যকে একটু অর্থসৌষম্য দান করে—পাদপূরক অব্যয় তাহা করেনা। যেমন—

উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল, এ মোর সুন্দর পুরী। সে দিন তাকে ধরে না আচ্ছা দু ঘা কসিয়েছি। আম্র মানে কী? না আম। এসে অবধি ত আর নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাইনি।

ইয়ে, বোয়েছেন কিনা, মানে কিনা, কি নাম, ইত্যাদি মুদ্রাদোষও অনেকটা পাদপূরক অব্যয়ের মত।

(৮) **অর্থের উপর জোর দিবার জন্য**—অর্থের উপর জোর (emphasis) দিবার জন্য ই, ও প্রভৃতি অনন্বয়ী অব্যয় ব্যবহার হয়।

[illegible]শেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইলে ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়াদির পর ই যুক্ত হয়। যেমন—তুমিই নষ্টের গোড়া। তোমারি চরণে নত। না খেয়েই মরবে।

পর্যন্ত, এতদতিরিক্ত ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতে ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়াদির পর 'ও' যুক্ত হয়। শেষে তুমিও একাজ করলে। রামও আমাদের সঙ্গে যাবে। অভাবে সুজনও দুর্জন হয়। নবীনকেও বলে রেখো।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ দাও—

(ক) বিভক্তি প্রত্যয় হীন অব্যয় ; প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত অব্যয় ; অনুকার শব্দ দ্বারা অব্যয়।

(খ) একাধিক অব্যয় যোগে গঠিত অব্যয় ; বিশেষ্য ক্রিয়া সর্বনামাদি যোগে অব্যয় পদ ; সম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারা অব্যয়।

২। অব্যয়গুলিকে স্পষ্ট ভাবে চারিটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ কর।

৩। পৃথক পৃথক বাক্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অব্যয় প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দাও :—

বিশেষণের তারতম্যে বা তুলনায়। ক্রিয়াবিশেষণে। কারকের অর্থ প্রকাশে। Preposition এর অর্থ প্রকাশে। বাক্য বা পদ সংযোগে।

৪। সংযোজক অব্যয় কাহাকে বলে? ব্যতিক্রমসূচক সংযোজক অব্যয় কি?

৫। পদান্বয়ী অব্যয় কি বল। পদান্বয়ী অব্যয় কয় প্রকার?

৬। কেবল অব্যয়ের (অনন্বয়ী অব্যয়) নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি প্রদর্শন কর :—

(ক) প্রতিজ্ঞা বুঝাইতে ; (খ) প্রশ্নে ও প্রশ্নোত্তরে ; (গ) ক্রিয়ার অঘটন অর্থে।

৭। পাদপূরক অব্যয় ও বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের দৃষ্টান্ত দাও। এই দুই প্রকার অব্যয়ে পার্থক্য কি?

৮। নিম্নে না পদটি কোথায় কি রূপ অব্যয় হইয়াছে বল।

(ক) আম্র মানে কি? না, আম।
(খ) এই বলে না সে উঠে চলে গেল।
(গ) ওরে, একবার ওখানে যা না।
(ঘ) না, আমি ওখানে যাব না।
(ঙ) তুমি কি কোন দিনই যাবে না?
(চ) বলছ কি? তুমি না ভাল ছেলে?
(ছ) তুমি যাবে, না আমি যাব?
(জ) সে শুধু বিদ্বানই না, বুদ্ধিমানও।
(ঝ) আহা, মেয়ে ত না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।
(ঞ) চাকরি হবেই ত, বড় বাবুর শালা কি না।

উত্তরের সঙ্কেত : (ক) পাদপূরণে, না পদের কোন অর্থ নাই। (খ) পাদপূরণে (বা বাক্যালঙ্কারে)। (গ) অনুনয়ে (নির্দেশে)। (ঘ) প্রথমটি অসম্মতিসূচক, দৃঢ়তাসূচক অব্যয় ; দ্বিতীয়টি ক্রিয়া অঘটন সূচক বা অসম্মতি

সূচক। (ঙ) প্রশ্নে। (চ) প্রশ্নে (কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে বা হতাশায়)। (ছ) সংযোজক অব্যয়; এখানে না অর্থ অথবা। (জ) সংযোজক অব্যয়; এখানে না অর্থ তদুপরি এতদতিরিক্ত। (ঝ) এখানে না তুলনাবাচক অব্যয়; না দ্বারা মেয়ে ও লক্ষ্মীতে তুলনা বুঝাইয়াছে। (ঞ) না এখানে নিশ্চয়ে বা অবধারণে—চাকরির কারণটা নিশ্চিত বোঝা গিয়াছে।

৯। নিম্নের অব্যয় পদগুলি দ্বারা বাক্য রচনা কর।

পরন্তু, বরং, সম্প্রতি, ইদানীং, সমভিব্যাহারে, বাহবা, বাজিমাৎ, এই মরেছে, আদৌ, সদা, সর্বথা, পুনরপি, ফলকথা, তত্রাচ, আহামরি, হা হতোঽস্মি, ইস্তক, তক, হেন, পারা, হুস্‌হুস্, লিক্‌লিক্, আলবৎ, ভো, হলা, তবে রে।

নির্দেশ : উপরের অব্যয়গুলির মধ্যে তৎসম, বিদেশী এবং বাংলা, সকল রকমের শব্দই রহিয়াছে। পুনরপি, সদা, সমভিব্যাহারে ইত্যাদি তৎসম শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কালে বাক্য সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু গদ্য হইতে হইবে। এবং বিদেশী শব্দ ইস্তক্, তক এবং বাংলা তবেরে, এই মরেছে, হুস্‌হুস্ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা স্বভাবতঃই একটু লঘু গদ্যে হইতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রিয়াপদ

[ধাতুর শ্রেণী বিভাগ]

ক্রিয়াপদের মূল অংশের নাম হইল ধাতু। ধাতুর সহিত বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন—করি, করে, করিল, করিবে, করিতেছে ইত্যাদি ক্রিয়াপদ। ইহারা √কর্ ধাতুর সহিত—ই,—এ,—ইল,—ইবে,—ইতেছে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।*

তাই বলিয়া বাংলা ভাষায় ধাতুর সংখ্যা কম নহে—একমাত্র অভিধানে প্রাপ্ত ধাতুর সংখ্যাই দেড় হাজার হইবে; তার উপর লোকভাষায় অসংখ্য অজ্ঞাতমূলক ধাতুর ব্যবহার আছে।

বাংলা ধাতুগুলিকে গঠনের দিক হইতে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :—

১। মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু (Primary Roots)

২। সাধিত ধাতু (Derivative Roots)

৩। যৌগিক বা এবং সংযোগমূলক ধাতু (Compound Roots)

১। মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু

যে সকল ধাতুর কোন বিশ্লেষণ হয় না, তাহাদিগকে মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু বলা হয়। যেমন—কর্, দেখ্, চল্, বল্, খা, যা, দে, শো, নে, হ, হয়, ধর্, পড়্ ইত্যাদি।

২। সাধিত ধাতু :

যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভব, তাহাদিগকে সাধিত ধাতু[illegible]

সাধিত ধাতু মোটামুটি পাঁচ প্রকার :—

---

*সংস্কৃত ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগে সৃষ্ট ক্রিয়াপদ বাংলায় খুব কমই আছে। বাংলায় ক্রিয়াপদগুলি সাধারণতঃ খাঁটি বাংলা-ধাতুর উত্তর বাংলা বিভক্তি যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হয়। সংস্কৃত যে কয়টি ধাতুর যে ক্রিয়ারূপ বাংলায় প্রচলিত আছে তাহারও অধিকাংশ পদ্যে। যেমন—সংস্কৃত √ সেব্ ধাতু+ইছে, ইনু—সেবিছে, সেবিনু ইত্যাদি পদ্যে চলে, গদ্যে চলে না। সংস্কৃত √ চুম্ব্ ধাতু+ইছে, ইল=চুম্বিছে, চুম্বিল পদ্যে চলিবে, কিন্তু গদ্যে এইরূপ পদ নাই।

১। নাম ধাতু ; ২। ধ্বন্যাত্মক ধাতু ; ৩। ণিজন্ত বা প্রেরণার্থক ধাতু ; ৪। কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের ধাতু ; ৫। উপসর্গযুক্ত ধাতু।

নামধাতু :—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় পদকে নামপদ বলে। নামপদকে ক্রিয়ামূল বা ধাতুরূপে ব্যবহার করিলে নাম ধাতু হয়। নাম ধাতু সাধারণতঃ নাম পদের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। যেমন—

বিশেষ্য বেত + আ = বেতা (বেতিয়ে লাল করে দিয়েছে)। তাস + আ = তাসা (পুরণো তাস তাসানো যায় না)। বিশেষ্য ঘাম + আ = ঘামা (আর মাথা ঘামাতে পারি না)। বিশেষণ ঘন + আ = ঘনা (সন্ধ্যা ঘনাইতেছে)। বিশেষণ রাঙা + আ রাঙা (ইস্‌, বড় যে চোখ রাঙাচ্ছ?)

আধুনিক বাংলায়, অন্ততঃ কথ্য বাংলায় নামধাতুর প্রয়োগ বাড়িয়াই চলিয়াছে বলা যায়। যেমন—বেতায়, জুতায়, হাতায়, চড়ায়, কিলায়, লাঠায়, পিটায়, আগায়, পিছায় ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন বাংলায় প্রচুর নামধাতুর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নামধাতুগুলি আ প্রত্যয় ছাড়াই নিষ্পন্ন হয়। যেমন—

বৃষ্টিল (বৃষ্টি হইল) : নীরবিল (নীরব হইল) ; নিন্দিনু (নিন্দা করিলাম) বাহিরিল (বাহির হইল) ; ব্যয়িলি (ব্যয় করিলি) ; শাস্তি (শাস্তি দান করি)।

মধ্যযুগে কৃত্তিবাসে, কবিকঙ্কণেও নামধাতুর প্রয়োগ যথেষ্ট ছিল দেখা যায়। যেমন—উত্তরিল, বন্দিল, নমস্কারি, অবতরি, প্রশংসে, প্রবেশিয়া ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষার বহু বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ বাংলায় ধাতুর রূপে চলিয়া গিয়াছে। আর ইহাদের নাম ধাতু বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। সং দণ্ড> দাঁড়ানো ; সং আবর্ত> আওটানো (দুধ) ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক (বা অনুকার শব্দের) ধাতু :—

ধন্যাত্মক শব্দগুলি বাংলায় অব্যয় এবং অব্যয় পদ নামপদের অন্তর্গত। সুতরাং ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দজাত ধাতু মাত্রেই নামধাতু। ইহাদিগকে পৃথকভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। নিম্নে কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক নামধাতুর উদাহরণ দেওয়া হইল :—

[illegible] জল টগবগিয়ে ফুটছে। সারা গাটা শিরশিরিয়ে উঠল। কুড়মুড়িয়ে কড়[illegible]াজা খাই। ঝিকমিকিয়ে জোনাকি জলছে। কচলাইতে কচলাইতে লেবু [illegible]তেতা। ডিমটা ভাল করিয়া ফেটাইয়া লও। বেলুনটা চুপসাইয়া গিয়াছে।*

*টগবগ করিয়া, শিরশির করিয়া ইত্যাদি নামধাতুর উদাহরণ নহে। টগবগ, শিরশির ইত্যাদি করিয়া ক্রিয়াপদের বিশেষণ। অতএব ক্রিয়াবিশেষণ। ক্রিকেট খেলায় বল করছে, ব্যাট করছে নামধাতুর উদাহরণ নহে। কারণ ব্যাট বা বল এখানে √ কর্‌ ধাতুর সাহায্যে ক্রিয়ারূপ পাইয়াছে। এইগুলি সংযোগমূলক ধাতু।

ণিজন্ত (প্রযোজক বা প্রেরণার্থক) ধাতু

ক্রিয়া যখন স্বভাবতঃই ঘটে না তখন প্রেরণ বা প্রয়োগ করিয়া কার্য সম্পাদন হইলে প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া হয়। অধিকাংশ ক্রিয়ারই দুই রূপ হয়—একটি সাধারণ অন্যটি প্রযোজক বা ণিজন্ত। অর্থাৎ একটি রূপ ক্রিয়া স্বভাবতঃ ঘটিবার এবং অপরটি ঘটাইবার। যেমন—

মৌলিক ধাতু	সাধারণ রূপ	প্রযোজক রূপ
বল্	বলে	বলায়
ধর্	ধরে	ধরায়
দেখ্	দেখে	দেখায়
পড়্ (to fall)	পড়ে	পাড়ায়
পড়্ (to read)	পড়ে	পড়ায়
জ্বল্	জ্বলে	জ্বালায়
চল্	চলে	চালায়

(১) ণিজন্ত ক্রিয়া গঠন করিতে মৌলিক ধাতুর উত্তর—আ বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

(২) কিন্তু স্বরান্ত ধাতুতে এই -আ বিভক্তিই -ওয়া হইয়া যায়। যেমন—যা—যায়, যাওয়ায়, খা—খায়, খাওয়ায়; দে—দেয়, দেওয়ায়; ল—লয়, লওয়ায়; নে—নেয়, নেওয়ায়।

(৩) কোনো কোনো ধাতুর প্রযোজক রূপ হয় না। সেখানে ধাতু হইতে বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপ লইয়া কর্ ধাতু যোগে, (কখনো দে ধাতু যোগে) প্রযোজক রূপ করিতে হয়। যেমন—আমি দাঁড়াইয়াছি, তাহাকে দাঁড় করাইয়াছি। কুকুরটা লাফাইতেছে, কুকুরটাকে লাফ দেওয়াইতেছে।

(অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক ধাতুর আলোচনায় প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম সম্পর্কে আলোচনা আছে।)

কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের ধাতু ঃ—

কর্মবাচ্যের ধাতুও মূল ধাতুর উত্তর -আ প্রত্যয় যোগ করিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন—তাহাকে বেশ দেখাইতেছে (দেখ্+আ+ইতেছে)। ঐ গানটা ভাল শুনাইল কি? (শুন্+আ+ইল)।

উপসর্গযুক্ত ধাতু ঃ—

বাংলায় উপসর্গ যুক্ত ধাতুগুলি আসলে সংস্কৃত ধাতু, এবং তাহার সঙ্গে যে উপসর্গ যুক্ত হয়, তাহাও সংস্কৃত উপসর্গ। এই সকল ধাতু সাধারণতঃ পদ্যেই ব্যবহৃত, বাংলা গদ্যে ইহাদের ব্যবহার বিরল। যেমন—

বিরচিল (বি-রচ্+ইল) শ্রীকবিকঙ্কণ। প্রণমি (প্র-ণম্+ই) চরণে তাতঃ। ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বসি (নিঃ+শ্বস্+ই)। অবগাহি (অব+গাহ্+ই) যমুনার জলে।

৩। যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতুঃ—

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের পর ধাতু যোগে অথবা পর পর দুইটি মৌলিক ধাতু যোগে নিষ্পন্ন ধাতুকে যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু বলে। যেমন—**বিশেষ্য+ধাতু**—পালন করা, ভোজন করা, পরিধান করা, সাঁতার কাটা, সাবধ কাটা, ডাক ছাড়া, হাঁক দেওয়া, উঁকি মারা ইত্যাদি।

বিশেষণ+ধাতু—উদিত হওয়া, জাত হওয়া, রুগ্ন হওয়া, ছিন্ন করা, ভিন্ন করা, ভালবাসা, আপন বাসা, পর বাসা।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ+ধাতু—টিকটিক করা, জম জম করা, হুস হুস করা, ঝিকমিক করা, টুপ্‌টুপ্ হওয়া, টসটসে হওয়া ইত্যাদি।

ধাতু+ধাতু—বসিয়া পড়া, খাইয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, শুষিয়া নেওয়া, ধরিয়া রাখা ইত্যাদি।*

আজকাল বহু বিদেশী শব্দের সহিতও বাংলা ধাতু হ, কর্ ইত্যাদি যোগে সংযোগমূলক ধাতু গঠিত হইতেছে। যেমন—হেড্ করা, গোল করা, ফাউল করা, পেনাল্টি করা, বল করা, ব্যাট করা, পিটিশন করা, আপীল করা, (পরীক্ষায়) এলিগাব হওয়া, (কাজে) পোস্টেড্ হওয়া, ট্রান্সফার হওয়া, সারপ্রাইস্‌ড্ হওয়া ইত্যাদি।

(ক্রিয়াপদের শ্রেণী বিভাগ)

১। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া পদ

যে ক্রিয়াপদ বাক্যের সমাপ্তি ঘটায়, তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন—রাম **আসিবে**, আমি **যাইব** ইত্যাদি বাক্যে বক্তব্যটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আসিবে, যাইব এখানে সমাপিকা ক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য সমাপ্ত হইতে পারে না।

যে ক্রিয়াপদ নিজে বাক্যের ভাবটি সমাপ্ত না করিয়া ভাব সমাপ্তির জন্য অন্য কোন ক্রিয়াপদের অপেক্ষা রাখে, তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

*ধাতুর সহিত ধাতু যোগে সংযোগমূলক ধাতু গঠন বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত বা ইংরেজিতে অন্য ধরনের সংযোগমূলক ধাতু কিছু কিছু আছে ; ইংরেজিতে ধাতুতে ধাতুতে সংযোগের দৃষ্টান্ত নাই। বাংলা 'খাইয়া ফেলিল' ইংরেজিতে বা সংস্কৃতে কোন আক্ষরিক তর্জমা হয় না। ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, বাংলা ভাষায় ধাতু নিষ্পাদনের এই অভিনব রীতিটি দ্রাবিড় প্রভাবের ফল।

যেমন—আমি ভাত **খাইয়া** স্কুলে যাইব। এই বাক্যে **খাইয়া** ক্রিয়া পদটি বাক্যের ভাব সমাপ্ত করিতেছে না। খাইবার পর যাহা হইবে সেই ভাবটি অপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে। শেষে **যাইব** এই সমাপিকা ক্রিয়া আসিয়া বাক্যের ভাবটিকে সমাপ্ত করিতেছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ধাতুর উত্তর ইয়া (এ), ইলে (লে), ইতে (তে) ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হয়।

নিম্নে অসমাপিকা ক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

আমি সবটা না **দেখিয়া** যাইব না। রোদে রোদে **ঘুরিয়া** জ্বর হইয়াছে। বিচার **করিয়া** কথা বলিও। কষ্ট না **করিলে** কেষ্ট মিলে না। তুমি **আসিলে** আমি যাইব। ওখানে কি ঘাস **কাটিতে** যাইব? ইত্যাদি।

অনেক রীতিসিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগে শুধু অসমাপিকা ক্রিয়ারই উল্লেখ হয়, সমাপিকা ক্রিয়াটি উহ্য থাকে। যেমন—

আপনি **বাঁচলে** বাপের নাম। বাঘে **ছুঁলে** আঠার ঘা। রাই **কুড়িয়ে** বেল। আঙ্গুল **ফুলে** কলাগাছ। ছাই **ফেলতে** ভাঙ্গা কুলো। গরু মেরে **মেরে** জুতো দান। ইত্যাদি।

কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া **অনুসর্গ রূপে** ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তাকে **দিয়ে** হবে না। বেনারস **হইয়া** এলাহাবাদ যাইব। সুখের **চেয়ে** সোয়াস্তি ভাল।

কতকগুলি অসমাপিকা সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মিশিয়া **যৌগিক ক্রিয়া** গঠন করে। যেমন—

এ-মাসের মাইনে **দেওয়া** হয়নি। দেখতে দেখতে সময়টা **কেটে** গেল। শিকারী বাঘটাকে **মারিয়া** ফেলিল।

আছ্, থাক্ ইত্যাদি ধাতুর সহিত মিশিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া **মিশ্র কালের সমাপিকা ক্রিয়া** গঠন করে। যেমন—

চলিয়াছি (চলিয়া+আছি)। চলিতে থাকিব। চলিতেছিলাম (চলিতে+আছিলাম) ইত্যাদি।

২। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাহা সকর্মক ক্রিয়া, এবং যে ক্রিয়ার কর্ম নাই তাহা অকর্মক ক্রিয়া।

সে হাসিতেছে, আমি বেড়াইতেছি, নৌকা চলিতেছে, পাখি উড়িতেছে ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াপদগুলি অকর্মক ক্রিয়া। কারণ ইহাদের কর্ম নাই অর্থাৎ এই ক্রিয়াগুলি ঘটিবার জন্য ক্রিয়াকে কোন কিছুর আশ্রয় বা অবলম্বন গ্রহণ করিতে হয় নাই।

কিন্তু, আমি ভাত খাইয়াছি, সে বই পড়িয়াছে, যদু রমেশকে মারিয়াছে ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াপদগুলি সকর্মক ক্রিয়া। কারণ ইহাদের কর্ম আছে অর্থাৎ এই ক্রিয়াগুলি কোনো কিছুকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে।

নিম্নোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ অকর্মক—

হাসা, কাসা, উঠা, বসা, চলা, খেলা, নড়া, পড়া (to fall), ডুবা, ভাসা, হারা, জিতা, উড়া, শোয়া, নাচা ইত্যাদি।

(সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ)

অনেক সময় সকর্মক ক্রিয়া বাক্যে কোনো কিছুকে উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণভাবে অকর্মকের মত ব্যবহৃত হয়।

যেমন—আমরা চক্ষু দিয়া **দেখি**। এখানে **দেখি** ক্রিয়াটি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখিবার কোন বিষয়ের (অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্মের) উপর জোর দেওয়া হয় নাই। এইরূপ আরো কয়েকটি উদাহরণ :—

তিনি রাত্রে **খান না**। বাল্যকালই **শিখিবার** সময়। আমি রোজ কয়েক ঘণ্টা **পড়ি** ইত্যাদি।

(অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক রূপ)

(১) কতকগুলি অকর্মক ধাতু নিজের ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে কর্ম রূপে গ্রহণ করে। এইরূপ কর্মপদকে সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক (cognate object) কর্ম বলা হয়। সমধাতুজ কর্মের পূর্বে প্রায়ই একটি বিশেষণ থাকে।

কি **হাসিই** হাসছো! বড় **কান্না** কাঁদলে। যে **দেখা** দেখছি। শেষ **খাওয়া** খাচ্ছ। বেদম **মার** মেরেছে। ইত্যাদি।

(২) কতকগুলি অকর্মক ক্রিয়া দুই রূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন—

(ক)	আমি অন্ধকারে ডরাইনা	(অকর্মক)
	আমি কাউকে ডরাইনা	(সকর্মক)
(খ)	তোমার আবার লজ্জা কি ?	(অকর্মক)
	তাকে তোমার লজ্জা কি	(সকর্মক)

ণিজন্ত ক্রিয়ায় অকর্মক ক্রিয়াও সকর্মক হইয়া যায়। যেমন—

চলে। **তাকে** চালাই। পাখী উড়ে। **ঘুড়ি** উড়াই। মণি হাসে; **মণিকে** হাসাই। ফল পড়ে। **ফল** পাড়ি। সে ঠকিয়াছে। **তাহাকে** ঠকাইয়াছি।

৩। দ্বিকর্মক ক্রিয়া

কোনো কোনো অকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে। এইরূপ ক্রিয়াকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** (verb with double object) বলা হয়।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার একটি কর্ম বস্তুবাচক ও অপরটি ব্যক্তিবাচক হয়। বস্তুবাচক কর্মটিকে **মুখ্যকর্ম** (Direct object) এবং ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে **গৌণকর্ম** (Indirect object) বলে।

মা শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছেন। এখানে খাওয়াইতেছেন দ্বিকর্মক ক্রিয়া এবং দুধ (বস্তুবাচক) মুখ্যকর্ম ও শিশুকে (ব্যক্তিবাচক) গৌণকর্ম।

মুখ্যকর্মটি বাক্যে সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের নিকটে প্রায়ই ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে থাকে।

নিচে আরো কয়েকটি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হইল :—

তাহাকে একটা চিঠি লেখ। আমাকে ওকথা আর বলিওনা। আমি মাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বাবা আমাকে দশটা টাকা পাঠাইয়াছেন। যদু বাবু আমাদের জ্যামিতি পড়ান। এস, তোমাকে একটা গান শোনাই। ইত্যাদি।

৪। ক্রিয়ার ভাব (Mood)

ক্রিয়াপদ বাক্যমধ্যে কোন ভাব (Mood) প্রকাশ করে। এই ভাবগুলিকে মোটামুটি **তিনভাগে** ভাগ করা হয়।

(ক) ক্রিয়াপদ কোনো ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিলে তাহাকে নির্দেশক ভাব (Indicative Mood) বলা চলে।

যেমন—রাম বাড়ী যায়। আমি ভাত খাই। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।

(খ) ক্রিয়াপদ দ্বারা আদেশ, অনুরোধ, অনুমোদন, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝাইলে তাহাকে অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood) বলে। যেমন—

বাড়ী যাও। অধিক রাত্রি জাগরণ করিও না। আমার কাজটা করে দিন। তাকে একথা বলতে পার। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমার মাথায় যত চুল তোমার তত পেরমাই হোক্।

(গ) ক্রিয়ার সংঘটন পূর্বের কোনো ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হইলে তাহাকে অপেক্ষিক ভাব (Subjunctive Mood) বলা চলে।

যেমন—তুমি আসিলে আমি যাইব। না পড়িলে পাশ করিতে পারিবে না। আর একবার সাধিলেই খাইব। ইত্যাদি।

৫। ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া ঘটিবার সময়কে ক্রিয়ার **কাল** বলে। কাল তিন প্রকার : **বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ।**

যে ক্রিয়া ঘটিতেছে তাহার কাল বর্তমান কাল। যেমন—রাম পড়িতেছে আমি যাইতেছি।

যে ক্রিয়া পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কাল অতীত কাল। যেমন—রাম পড়িয়াছিল। আমি গিয়াছিলাম।

যে ক্রিয়া পরে হইবে তাহার কাল ভবিষ্যৎকাল। যেমন—রাম পড়িবে। আমি যাইব।

তিন প্রকার কালের আবার অবান্তর বিভাগ আছে—

	কালের নাম	ক্রিয়ার রূপ
বর্তমান	১। সাধারণ বা নিত্যবর্তমান (Simple present)	করি
	২। ঘটমান বর্তমান (present progressive)	করিতেছি
	৩। পুরাঘটিত বর্তমান (present perfect)	করিয়াছি
অতীত	৪। সাধারণ বা নিত্য অতীত (Simple past)	করিলাম
	৫। নিত্যবৃত্ত বা পুরা নিত্যবৃত্ত (Habitual past)	করিতাম
	৬। ঘটমান অতীত (Past progressive)	করিতেছিলাম
	৭। পুরা ঘটিত অতীত (Past perfect)	করিয়াছিলাম
ভবিষ্যৎ	৮। সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple future)	করিব
	৯। ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future progressive)	করিতে থাকিব
	১০। পুরা ঘটিত ভবিষ্যৎ (Future perfect)	করিয়া থাকিব

উপরের দশ প্রকার কালবিভাগকে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হইল।

(সাধারণ কাল—Simple Tense)

তিন কালের সাধারণ রূপ দ্বারা কোন ঘটনার সাধারণ বিবরণ বোঝায়। অর্থাৎ তাহাতে কাল সম্পর্কে সাধারণ কালের উল্লেখ ব্যতীত আর কোন বিশ্লেষণ থাকেনা। যেমন—

আমি যাই। সে খায়। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। প্রাচীন কালে অশোক নামে এক নৃপতি ছিলেন। সে পরীক্ষায় পাশ করিবে। ইত্যাদি।

(ঘটমান কাল—Progressive Tense)

ঘটমান কাল দ্বারা তিন প্রধান কালের যে কোনো কালে ক্রিয়ার ঘটিতে থাকা বোঝায়। যেমন—আমি পড়িতেছি। সে খেলিতেছে। পথিক পথ চলিতেছিল। মুহুমহু বজ্রপাত হইতেছিল। সকাল হইতে আমি পড়িতে থাকিব। সৈন্যেরা কামান দাগিতে থাকিবে।

(পুরাঘটিত কাল—Perfect Tense)

পুরাঘটিত কালে ক্রিয়ার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত জটিল। পুরাঘটিত বর্তমান দ্বারা কাজটি সবে সম্পন্ন হইযাছে বুঝায়। যেমন—আমি ভাত খাইয়াছি। সে বাড়ী গিয়াছে। ইত্যাদি।

পুরাঘটিত অতীত দ্বারা ক্রিয়া দূর অতীতে সম্পন্ন হইয়াছে বুঝায়। যেমন—আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। আমি ফল খাইয়াছিলাম।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ দ্বারা ক্রিয়া অতীতেই সম্পন্ন হইযাছে কিন্তু ইব বিভক্তি দ্বারা সম্ভাবনার্থে ভবিষ্যতের রূপ দেওয়া হয়। যেমন—তাহাকে কোথাও **দেখিয়া থাকিব**। তুমি হয়ত ইহা **শুনিয়া থাকিবে**। ইত্যাদি।

(নিত্যবৃত্ত অতীত, পুরানিত্যবৃত্ত)

Habitual Past

অতীত কালের নিত্যবৃত্ত রূপ দ্বারা ক্রিয়া অভ্যাস বা নিয়ম-রূপে ঘটিত এইরূপ বুঝায়। যেমন—আমি প্রত্যহ ব্যায়াম করিতাম। আমাদের ঘরের চালে শালিক আসিয়া বসিত।

বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের কোন ক্রিয়া অভ্যাস বা নিয়মরূপে সংঘটিত হইলে সাধারণ (Simple) বর্তমান বা সাধারণ ভবিষ্যতই হয়। তবে অভ্যাস সম্পর্কে জোর (emphasis) দিতে হইলে বর্তমান কালে [illegible] ধাতুর সঙ্গে থাক্ ধাতু যোগ করা হয়। যেমন—বর্তমান কালে—সে প্রত্যহ [illegible]য়াম করে (করিয়া থাকে)। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে (উঠিয়া থাকে)। [illegible]ষ্যৎ কালে—সে প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে। গ্রীষ্মকালে সকালে ইস্কুল বসিবে।

৬। ক্রিয়ার বিভক্তি।

ধাতুর উত্তর যে বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। ক্রিয়া বিভক্তি দ্বারা ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও ভাব বোঝা যায়।

ক্রিয়া বিভক্তির দুইটি অংশ—(১) কালবাচক অংশ ও (২) পুরুষ বাচক অংশ। ধাতুর উত্তর প্রথমে কালবাচক বিভক্তি যোগ করিতে হয় এবং পরে ইহার সহিত পুরুষ বাচক বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন—

√কর্(ধাতু)+ইল (অতীত কাল বাচক বিভক্তি)+আম (উত্তম পুরুষ বাচক বিভক্তি)=করিলাম।

√কর্ (ধাতু)+ইব (ভবিষ্যৎ কাল বাচক বিভক্তি)+এ (প্রথম পুরুষ বাচক বিভক্তি)=করিবে।

√কর্ (ধাতু)+অ (বর্তমান কাল, অনুজ্ঞা, মধ্যম পুরুষ)=কর। ইত্যাদি।

৭। বাংলা ধাতুর গণবিভাগ

বাংলা সাধু ভাষায় সকল ধাতুই এক ভাবে ক্রিয়া রূপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগের ফলে বর্ণগত কোন তারতম্য ঘটে না। যেমন—কর্+ইয়াছি=করিয়াছি; শু+ইয়াছি=শুইয়াছি; এইজন্য অন্ততঃ সাধু ভাষার জন্য বাংলায় গণবিভাগ নিষ্প্রয়োজন।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের হ্রস্বীকরণ প্রবৃত্তি হেতু ধাতুরূপে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে (যেমন—কর্+ইয়াছি=কোরেছি; শু+ইয়াছি=শুয়েছি)। এবং এই পরিবর্তনগুলির সর্বত্র একেবারে একরকম হয় না। এইজন্য চলিত ভাষার বিচারে বাংলা ধাতুর জন্য একটা গণবিভাগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইয়াছে।

এই দিক হইতে বিচার করিয়া বাংলা ধাতুগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি গণে ভাগ করা চলে।*

(১) **কর্-আদিগণ**—কর্, বল্, কাট্, মার্, খেল্ ইত্যাদি ধাতু হসন্ত যুক্ত ধাতু।

(২) **হ-আদি গণ**—হ, ল, র, ক্ষ, এই চারিটি অকারান্ত ধাতু।

(৩) **খা-আদি গণ**—খা, গা, পা ইত্যাদি এক অক্ষর জাত আকারান্ত ধাতু।

(৪) **দি-আদি গণ**—দি, নি, এই দুইটি মাত্র ই কারান্ত ধাতু।

(৫) **শু-আদি গণ**—ছুঁ, ধু, শু ইত্যাদি উকারান্ত এক-অক্ষর জাত ধাতু।

(৬) **প্রযোজক ধাতু**—গালা, করা, চালা ইত্যাদি একাধিক অক্ষর জাত আকারান্ত ধাতু।

(৭) **নাম ধাতু**—অক্ষর সংখ্যা ও অন্ত্যাক্ষর অনুযায়ী নানা রূপ হইতে পারে।

---

*এই গণবিভাগ মূলতঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাঙলা ব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে

৮। ধাতু-বিভক্তি—(সাধু)

তিঙ্			ক প্রথম পুরুষ সামান্য	খ ১ম ও মধ্যম পুরুষ গুরু	গ মধ্যম পুরুষ সামান্য	ঘ মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	ঙ উত্তম পুরুষ
বর্তমান।	সাধারণ	১	এ	এন	অ	ইস্	ই
	ঘটমান	২	ইতেছে	ইতেছেন	ইতেছ	ইতেছিস্	ইতেছি
	পুরাঘটিত	৩	ইয়াছে	ইয়াছেন	ইয়াছ	ইয়াছিস	ইয়াছি
অতীত।	সাধারণ	৪	ইল	ইলেন	ইলে	ইলি	ইলাম
	নিত্যবৃত্ত	৫	ইত	ইতেন	ইতে	ইতিস্	ইতাম
	ঘটমান	৬	ইতেছিল	ইতেছিলেন	ইতেছিলে	ইতেছিলি	ইতেছিলাম
	পুরাঘটিত	৭	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন	ইয়াছিলে	ইয়াছিলি	ইয়াছিলাম
ভবিষ্যৎ।	সাধারণ	৮	ইবে	ইবেন	ইবে	ইবি	ইব
	ঘটমান ভবিষ্যৎ	৯	ইতে + ইবে(যথা—করিতে থাকিবে)		(এই দুই কালের কোন বিশিষ্ট বিভক্তি নাই)		
	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	১০	ইয়া + ইবে(যথা—করিয়া থাকিবে)				
অনুজ্ঞা।	বর্তমান	১১	উক	উন	অ ও	×	০
	ভবিষ্যৎ	[illegible]	ইবে	ইবেন	ইও (ইয়ো)	ইস্	০

৮। ধাতু-বিভক্তি—(চলিত)

তিঙ্			ক প্রথম পুরুষ সামান্য	খ ১ম ও মধ্যম পুরুষ গুরু	গ মধ্যম পুরুষ সামান্য	ঘ মধ্যম পুরুষ তুচ্ছ	ঙ উত্তম পুরুষ
বর্তমান।	সাধারণ	১	এ	এন	অ (ক)	ইস্	ই
	ঘটমান	২	ছে	ছেন	ছ (ছো)	ছিস্	ছি
	পুরাঘটিত	৩	এছে	এছেন	এছ (এছো)	এছিস্	এছি
অতীত।	সাধারণ	৪	ল, লে	লেন	লে	লি	লাম
	নিত্যবৃত্ত	৫	ত, (তা)	তেন	তে	তিস্	তাম
	ঘটমান	৬	ছিল	ছিলেন	ছিলে	ছিলি	ছিলাম
	পুরাঘটিত	৭	এছিল	এছিলেন	এছিলে	এছিলি	এছিলাম
ভবিষ্যৎ।	সাধারণ	৮	বে	বেন	বে	বি	ব, বো
	ঘটমান ভবিষ্যৎ	৯	তে + বে (যথা—করতে থাকবে)		(এই দুই কালের কোন বিশিষ্ট বিভক্তি নাই)		
	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	১০	এ + বে (যথা—করে থাকবে)				
অনুজ্ঞা।	বর্তমান	১১	উক্	উন	ও	ইস্	০
	ভবিষ্যৎ	১২	বে	বেন	ও	×	০

৯। ধাতুর অসম্পূর্ণ রূপ

কতকগুলি ধাতুর সম্পূর্ণ রূপ নাই। যেমন—আছ্, বট্, নহ্।

(ক) আছ্ ধাতুর সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ অতীতের মাত্র রূপ হয়। ইহার ভবিষ্যতের কোন রূপ নাই। আছ্ ধাতুর প্রচলিত রূপগুলি হইল :—

আছ, আছে, আছেন, আছিস্ আছি, (এবং অতীতে আদ্য আ লুপ্ত রূপ) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।

(খ) বট্ ধাতুর শুধু সাধারণ বর্তমানের রূপ আছে, অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। বট্ ধাতুর প্রচলিত রূপ হইতেছে :—

বটে, বটেন, বটিস, বট, বটি।

(গ) নহ্ (না+হ্) ধাতুর শুধু সাধারণ বর্তমানের রূপই আছে। এবং একটি অসমাপিকা রূপ আছে। নহ ধাতুর প্রচলিত রূপ হইল :—

সাধু—নহে, নহেন, নহ, নহিস, নহি, নহিলে (অসমাপিকা)।

চলিত—নয়, নন, ন'ও, নোস, নই, নইলে (অসমাপিকা)।

১০। ক্রিয়ার নঞর্থক রূপ

না—ক্রিয়াপদের পরে **না** অব্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়ার অঘটন বোঝান হয। যেমন—আমি যাইব না। সে আসিবে না। ইত্যাদি।

না সর্বদাই অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে কবিতাদিতেও কখনো কখনো পূর্বে বসে। যেমন—না আসিলে, না গেলে, না বলিলে। (কবিতায়)—না যেয়ো ভাই যমদুয়ার। না হাসে না কাঁদে কন্যা নাহি শোনে বাণী।

নহ—নহ (না+হ্) ধাতুটি প্রকৃত পক্ষে হ ধাতুর না অব্যয় যুক্ত রূপ। নহ একটি পৃথক ধাতু রূপেই বাংলায় গণ্য হয়। ইহার অসমাপিকা রূপ নহিলে, নইলে (না+হইলে)।

নহ ধাতুর ক্রিয়ারূপ বাক্যে নিম্নোক্তরূপে ব্যবহৃত হয়—

তুমি আমার কেহ নহ। এই কাজটি হইবার নহে।

নাই—নাই (না+হয়) বাংলায় নঞর্থক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। **ইহার কয়েক প্রকার অর্থ আছে—**

অভাবার্থে—সে বাড়ী নাই। ঘরে চাল নাই। সেইখানে গিয়া কাজ নাই।

নিষেধার্থে—এমন কাজ করিতে নাই। পরের দ্রব্য লইতে নাই।

ক্রিয়ার অঘটনে—(অতীত কালে) সে করে নাই। এ কথা কেউ বলে নি।

নয়—নয় (না + হয়) বাংলায় নঞর্থক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহারও একাধিক অর্থ আছে—

অভাবার্থে—সে এখানে নয়। অননুমোদনে—একথা বলিবার নয়। এমন কাজ করিবার নয়। নঞর্থক—এটা সোনা নয়, পিতল। অসম্ভব অর্থে—এ হবার নয়।

নার্—নার্ (না + পার্) বাংলায় ধাতু হিসাবে গণ্য হয়।

অপারগতা অর্থে—নারি, নারিব, নারিলাম, ইত্যাদি হয়। যেমন—করতে নারি, বলতে নারনু।

১১। কালবাচক ক্রিয়া বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাংলায় ধাতুর উত্তর এ, অ, ই, দ্বারা বর্তমান, ইল দ্বারা অতীত এবং ইব দ্বারা ভবিষ্যৎ গঠিত হয়। কিন্তু বাক্রীতি সম্মত নানা বিশিষ্ট প্রয়োগে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়।

(১) ঐতিহাসিক ঘটনাদির বর্ণনায় অতীত স্থলে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয়। (Historical present)। যেমন—

কপিলাবস্তু নগরে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য অতীত ঘটনাকেও প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিতে হইলে বর্তমান ব্যবহার হয়। গল্প উপন্যাসাদিতে বা কথোপকথনে সর্বত্রই এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা দার্শনিক সিদ্ধান্তাদির উল্লেখেও অতীত বুঝা[illegible]তে নিত্য বর্তমান হয়। যেমন—

[illegible]র আইজাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। অ্যারিস্টটল বলেন মানুষ পশু, তবে চিন্তাশীল পশু।

(২) যখন, তখন ইত্যাদি শব্দ যোগে অতীত বুঝাইতে অনেক সময় নিত্য বর্তমানের বিভক্তি হয়। যেমন—

গান্ধীজী যখন নোয়াখালি যান, তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। আমি যখন চাকুরী পাই তখন তুমি স্কুলে পড়। যে বছর নাণ্টু হয় সে বছর মন্টির শ্বশুর মারা গেলেন।

(ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি)—ইতেছি, ইতেছে ইত্যাদি।

(১) আসন্ন ভবিষ্যৎ বা নিকট অতীত বুঝাইতে অনেক সময় ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি হয়। যেমন—

আমি কাল কলিকাতা যাইতেছি (=যাইব)। একটু দাঁড়াও এখনি আসছি (=আসিব)। আমি ঢাকা হইতে আসিতেছি (আসিলাম)।

(২) অতীত কালের বর্ণনাকে প্রত্যক্ষবৎ করিতে হইলে ঘটমান বর্তমান ব্যবহার হয়। যেমন—

তখন নবাব সৈন্যেরা ক্লাইভের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ **করিয়া দিতেছে** এমন সময় কুচক্রী মীরজাফরের ঘোষণা হইল, নবাবের আদেশ—রণে ক্ষান্ত দাও।

(নিত্য অতীতের বিভক্তি)

ইল, ইলে, ইত্যাদি।

(১) আসন্ন ভবিষ্যতে ক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনায় বা নিশ্চয়ে কখনো কখনো নিত্য অতীতের বিভক্তি হয়। যেমন—

আরে, আরে, পড়লো, পড়লো (এখনই পড়িবার সম্ভাবনা)! রান্না হলো বলে (এখনই শেষ হইবে)।

(২) বিরক্তি, বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশে বর্তমান কালেও নিত্য অতীতের বিভক্তি হয়।

আ মোলো (মরিতেছে, মর)! জ্বালালে দেখছি (জ্বালাইতেছে)।

(৩) বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে সাধারণভাবেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্য অতীত ব্যবহৃত হয়। যেমন—

আমি ভাই চল্লাম (চলিতেছি, চলিব)। চুপ্, না হয়, মারলাম।

(নিত্যবৃত্ত অতীতের বিভক্তি)

ইত, ইতে, ইত্যাদি।

আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনা ইত্যাদি অর্থে নিত্যবৃত্ত অতীতের বিভক্তি হয়। যেমন,

যদি কুমড়ার মত চালে ধরে রত পানতুয়া শত শত! হায়, আজ যদি কর্তা বাঁচিয়া থাকিতেন! আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে পারিলে বড় সুখের হইত (করিতে পারিলে সুখের হইবে)।

১২। কালসঙ্গতি বা কালের প্রাসঙ্গিকতা (Sequence of tense)

বাংলায় বাক্যে ইংরেজির মত কালের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষিত হয় না। ইংরেজিতে মূল বাক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাক্যের কালসঙ্গতি থাকে। যেমন—

যখন আমি এলাহাবাদে ছিলাম তখন তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়। ইংরেজিতে When I was at Allahabad you were reading in the University.

He said that he was well—ইহার বাংলা হইবে—তিনি বলিলেন যে তিনি ভাল **আছেন**। তিনি বলিলেন যে তিনি ভাল ছিলেন এরূপ বাংলা হইবে না।

বাংলা বাক্যে বর্ণনাকে প্রত্যক্ষবৎ করিবার জন্য মূল বাক্যে অতীত থাকিলেও সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলি প্রায়ই বর্তমান কালের হয়।

১৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Participles)

ধাতুর উত্তর আ, আন, আনো, অন্ত, ইল প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন—

ধোয়া (যাহা ধোয়া হইয়াছে) কাপড়টা পর। শোনা (যাহা শোনা হইয়াছে) কথায় কান দিতে নেই। ভাজা (যাহা ভাজা হইয়াছে) মাছটি উলটে খেতে জানে না। চলন্ত (যাহা চলিতেছে) গাড়ী থেকে নেমো না। গেল (যাহা গিয়াছে) বছর কটা টাকা পেলাম।

ক্ত, তব্য, শানচ্, অনীয় ইত্যাদি যোগে গঠিত সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক বিশেষণও বাংলায় আছে। যেমন—

চলিত বৎসর, দণ্ডায়মান ব্যক্তি, পানীয় জল ইত্যাদি।

১৪। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal nouns)

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় যোগে বাংলা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য প্রস্তুত হয়। যেমন—দেখা, শোনা, চলা, তোলা, খাওয়া ইত্যাদি।

অনট্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে গঠিত সংস্কৃত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যও বাংলায় আছে। যেমন—

গমন, ভোজন, দর্শন ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ধাতু কয় প্রকার? কি কি? উদাহরণ দাও।

২। সাধিত ধাতু কাহাকে বলে? কয়েক প্রকার সাধিত ধাতুর দৃষ্টান্ত দাও।

৩। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর :—

নামধাতু। ধ্বন্যাত্মক ধাতু। প্রযোজক ধাতু। উপসর্গযুক্ত ধাতু।

যৌগিক ধাতু কি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

বল করা, ব্যাট করা, (ক্রিকেট খেলায়) কিরূপ ধাতু?

৫। উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও :—

(ক) সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া। (খ) সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া।

৬। দৃষ্টান্ত দাও :—

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ ; অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক রূপ।

৭। সমধাতুজ কর্ম কাহাকে বলে? ইহার অপর নাম কি?

অকর্মক ও সকর্মক উভয় প্রকার ক্রিয়ার সমধাতুজ কর্মের দৃষ্টান্ত দাও।

৮। দ্বিকর্মক ক্রিয়া কি? মুখ্যকর্ম ও গৌণ কর্ম কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা কর।

৯। ক্রিয়ার ভাব (mood) বলিতে কি বোঝায় বুঝাইয়া দাও।

১০। ক্রিয়ার প্রধান কাল কয়টি? প্রধান কালের অবান্তর বিভাগগুলি কি? (তালিকাকারে প্রকাশ কর)

১১। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর—

পুরাঘটিত-বর্তমান। পুরাঘটিত অতীত। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ।

১২। ঘটমান কাল বলিতে কি বোঝায়? বিভিন্ন ঘটমান কালের উদাহরণ দাও।

১৩। ধাতুরূপ লেখ :—

যা ধাতু—নিত্য অতীত। (যা ধাতুর সংস্কৃত গম্ ধাতুর প্রভাবে গেল হয়, যেল হয় না।) আ ধাতু—নিত্য ভবিষ্যৎ। (আ ধাতু সং বিশ্ ধাতুর প্রভাবে আসিবে ইত্যাদি রূপ হয়, আইবে হয় না।)

১৪। বাংলা ধাতুর গণ বিভাগ কিরূপ বল।

১৫। বট্, নহ্, আছ্ ধাতুর রূপ লেখ।

১৬। ক্রিয়াপদের নঞর্থক রূপ বলিতে কি বোঝায়?

ক্রিয়ার নঞর্থক রূপে নিম্নোক্ত প্রয়োগগুলির দৃষ্টান্ত দাও এবং ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ধাতু ও কোন্‌টি অব্যয় বল।

না। নহ। নাই। নয়। নার্।

১৭। দৃষ্টান্ত দাও—

(ক) অতীত কালে নিত্যবর্তমানের বিভক্তি।

(খ) আসন্ন ভবিষ্যতে ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি।

(গ) আসন্ন ভবিষ্যতে নিত্য অতীতের বিভক্তি।

(ঘ) বর্তমান কালে নিত্য অতীতের বিভক্তি।

(ঙ) ভবিষ্যৎ কালে নিত্য অতীতের বিভক্তি।

১৮। বাংলা বাক্যে কালসঙ্গতি বা Sequence of Tense আছে কি না আলোচনা কর।

১৯। বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal noun) ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Participles) কিরূপে গঠিত হয় দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা কর।

শব্দপ্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

পদপ্রকরণে শব্দ ও পদের পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে ঐ বিষয়ে পুনরুক্তি না করিয়া শুধু শব্দের গঠন ও অর্থদ্যোতনা সম্পর্কে আলোচনা হইল।

১। মৌলিক ও সাধিত শব্দ

গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে শব্দ মোটামুটি দুই প্রকার—মৌলিক শব্দ (simple words, root words) এবং সাধিত শব্দ (derived words, compound words)।

যে সকল শব্দের বিশ্লেষণ হয় না অর্থাৎ যাহা প্রত্যয়াদি যোগে নিষ্পন্ন হয় না সেই সকল সরল শব্দকে **মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ** শব্দ বলে। যেমন—

ফল, জল, আম, জাম, বাবা, মা, হাত, পা, এক, দুই ইত্যাদি।

এই শব্দগুলিই সত্যকার নামপ্রকৃতি বা Noun Roots; অর্থাৎ ইহাদের সহিত বিভক্তি যুক্ত হইয়া নামপদ গঠিত হয়।

যে সকল শব্দ প্রত্যয়াদি যোগে বা শব্দ সমবায়ে গঠিত তাহাদিগকে **সাধিত শব্দ** বলে।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার হইতে পারে—

(১) প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন (Inflected words); (২) যৌগিক বা সমস্ত (compounded words)।

নিম্নে দুই প্রকার সাধিত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল—

প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন শব্দ:

নামপ্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে—লাঠি + আল = লাঠিয়াল; গিন্নী + পনা = গিন্নীপনা; দশরথ + ষ্ণিক = দাশরথি; ধূলি + সাৎ = ধূলিসাৎ ইত্যাদি।

ধাতুপ্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে—পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত, যা + আ = যাওয়া, গম্ + অনট্ = গমন ইত্যাদি।

উপসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয় যোগে—পরা + জি + অনট্ = পরাজয়, উপকার অনুরাগ ইত্যাদি।

যৌগিক বা সমস্ত ঃ

একাধিক শব্দে সমাস করিয়া—দশানন, খানাপিনা, তেলধুতি, বেইমান, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি।

অনুকার শব্দে—কুটকুট, ঝাঁঝাঁ, ঝিন্ ঝিন্ হনহন ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দে বা শব্দ সমন্বয়ে—উঠবস্, নামাউঠা, কাপড়চোপড়, ভাতটাত, যারপরনাই ইত্যাদি।

২। শব্দের অর্থগত শ্রেণীবিভাগ

অর্থের দিক হইতে শব্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—

(১) যৌগিক, (২) রূঢ়, এবং (৩) যোগরূঢ়।

যৌগিক—সাধিত শব্দের অংশ সমূহের অর্থ মিলিয়া যে শব্দের অর্থ নির্ণীত হয় তাহাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন—

(যাওয়া অর্থে ধাতু) গম্ + (উচিত অর্থে প্রত্যয়) তব্য = গন্তব্য। বাড়্ + (ক্রিয়া চলিতেছে অর্থে প্রত্যয়) অন্ত = বাড়ন্ত। ছেলে + (ভাব অর্থে প্রত্যয়) মি = ছেলেমি। গোলাপ + (বর্ণ অর্থে প্রত্যয়) ই = গোলাপি ইত্যাদি।

সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ তাহার অংশ সমূহের অর্থ দ্বারা নির্ণীত হইলে তাহাও যৌগিক শব্দ হইবে। যেমন—

রাজপুত্র (রাজার পুত্র)। স্বর্ণাঙ্গুরী (স্বর্ণ নির্মিত অঙ্গুরী)। নীলাকাশ (নীল যে আকাশ) ইত্যাদি।

(বহুব্রীহি সমাসে সমাসবদ্ধ শব্দগুলির অর্থ প্রাধান্য না থাকায় তাহা যৌগিক শব্দ হইবে না, যোগরূঢ় শব্দ হইবে)

রূঢ়—প্রত্যয় উপসর্গ ইত্যাদি যোগে গঠিত শব্দ তাহার অংশসমূহের অর্থানুগামী না হইয়া বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে রূঢ় শব্দ বলে। যেমন—

হৃ ধাতু + ইণ প্রত্যয় = হরিণ (ইহার সহিত হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করার কোন সম্পর্ক নাই)। এইরূপ, হস্তী (যাহার হস্ত বা হাত আছে এই অর্থের সহিত সম্পর্ক নাই)। প্রবীণ (বীণা বাদনে পটু এই অর্থের সহিত সম্পর্ক নাই)।

যোগরূঢ়—যে সকল শব্দ অংশসমূহের অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহারাই যোগরূঢ় শব্দ।

যোগরূঢ় শব্দে যৌগিক এবং রূঢ় দুই লক্ষণই বর্তমান আছে। যেমন—

পঙ্কজ = পঙ্ক + জন্ + ড, অর্থাৎ যাহা পঙ্কে জন্মে ; কিন্তু পঙ্কে যাহা জন্মে তাহার সব কিছুই পঙ্কজ নহে ; পঙ্কে জন্মে এমন একটি মাত্র বস্তু অর্থাৎ শুধু পদ্মই পঙ্কজ।

এইরূপ, সরোজ = সরঃ + জন্ + ড, অর্থাৎ সরোবরে জাত যে কোন পদার্থ, কিন্তু বিশেষ অর্থ পদ্ম। জলদ = জল + দা + ক অর্থাৎ যে জল দেয় সে, কিন্তু বিশেষ অর্থ মেঘ।

সমাসনিষ্পন্ন শব্দে (বহুব্রীহি সমাসে) পীতাম্বর (পীতাম্বর পরিহিত ব্যক্তি মাত্র নয়, কৃষ্ণ), দশানন (দশমুণ্ডযুক্ত সকলেই নহে, রাবণ), কাকোদর (বক্র উদরসম্পন্ন সরীসৃপ মাত্র নহে, সর্প) ইত্যাদি।

৩। শব্দের অর্থপ্রকাশ শক্তি

শব্দের অর্থপ্রকাশ শক্তি বিস্ময়কর। প্রায় শব্দই ভাষায় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তার **মাথায়** চুল নাই। (অঙ্গবিশেষ)
তিনি গ্রামের **মাথা**। (প্রধান, মোড়ল)
রাগের **মাথায়** বলেছি। (বশে)
গাছের **মাথায়** উঠেছে। (শীর্ষ, আগা)
চৌমাথায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। (সংযোগস্থল)
গাড়ী ছাড়ার **মাথায়** পৌঁছেছে। (মুহূর্তে)
কি তোমার **মাথা** করেছ ? (অবাঞ্ছিত ব্যাপার) ইত্যাদি।

শব্দের মূল অর্থকে ব্যাকরণে **মুখ্যার্থ, শক্যার্থ** বা **বাচ্যার্থ** বলা হয়, এবং আনুষঙ্গিক অর্থকে **গৌণার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ** বলা হয়।

উপরের উদাহরণে প্রথম বাক্যটিতে মাথা শব্দের মুখ্যার্থ পাওয়া যাইতেছে, অন্য সকল বাক্যেই শব্দটি গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যে শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহার গৌণার্থই প্রধান হয়।

৪। শব্দার্থ পরিবর্তন (Semantic Change)

কালক্রমে শব্দের অর্থদ্যোতনা কিঞ্চিদধিক পরিবর্তিত হইতে পারে। এই পরিবর্তনের কারণগুলি নানাবিধ, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়ভূত নহে। নিম্নে শব্দার্থ পরিবর্তনের নানা রূপ মাত্র প্রদর্শিত হইল—

(১) **অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ**—শব্দের অর্থ কখনো কখনো মূল অর্থ হইতে উচ্চ ভাবব্যঞ্জক হইয়া পড়ে। যেমন—

মন্দির (মূল অর্থ গৃহ ; বর্তমান অর্থ দেবগৃহ)।

ধ্যান (মূল অর্থ চিন্তা ; বর্তমান অর্থ ঈশ্বরচিন্তা)।

সাহস (মূল অর্থ হঠকারিতা ; বর্তমান অর্থ ভয়হীনতা)।

সংকীর্তন (মূল অর্থ গুণবর্ণনা ; বর্তমান অর্থ হরিনাম গান) ইত্যাদি।

(২) **অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ**—মূল অর্থ হইতে শব্দের অর্থ অনেক সময় হীনভাব ব্যঞ্জক হইয়া পড়ে। যেমন—

ঠাকুর (মূল অর্থ দেবতা, গুরু ; বর্তমান অর্থ পাচক)।

ঝি (মূল অর্থ দুহিতা, কন্যা ; বর্তমান অর্থ দাসী)।

বিরক্ত (মূল অর্থ সংসারে নিস্পৃহ ; বর্তমান অর্থ উত্যক্ত)।

মহাজন (মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি ; বর্তমান অর্থ ঋণদাতা)।

(৩) **অর্থের বিস্তৃতি বা প্রসার**—অনেক সময় শব্দের অর্থের পরিধি তাহার মূল অর্থ হইতে বড় হয়। যেমন—

ফলাহার (মূল অর্থ ফলভক্ষণ ; বর্তমান অর্থ দধি মিষ্টান্নাদি ভোজন)।

কালি (মূল অর্থ কাল রঙের কালি, এখন লাল কালি, সবুজ কালি সব)।

তৈল (মূল অর্থ তিলজাত স্নেহপদার্থ, এখন যে কোন স্নেহপদার্থ)

গাঙ্ (মূল অর্থ গঙ্গা ; এখন যে কোন নদী)।

(৪) **অর্থের সঙ্কোচ**—অনেক সময় শব্দের অর্থের পরিধি তাহার মূল অর্থ হইতে ছোট হয়। যেমন—

অন্ন (মূল অর্থ খাদ্যবস্তু ; বর্তমান অর্থ ভাত)।

সম্বন্ধী (মূল অর্থ কুটম্বমাত্র ; বর্তমানে জ্যেষ্ঠ শ্যালক)।

মহোৎসব (মূল অর্থ বড় উৎসব ; বর্তমানে বৈষ্ণবদের উৎসব বিশেষ)।

ক্ষীর (মূল অর্থ দুগ্ধ ; বর্তমানে ঘনীকৃত দুগ্ধ)।

(৫) **অর্থের আমূল পরিবর্তন**—অনেক সময় অর্থের সামান্য পরিবর্তন না হইয়া একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেমন—

সন্দেশ (মূল অর্থ সংবাদ ; বর্তমান অর্থ মিষ্টান্ন বিশেষ)।
কৃপণ (মূল অর্থ কৃপার পাত্র ; বর্তমান অর্থ ব্যয় কুণ্ঠ)।
ঘর্ম (মূল অর্থ গরম ; বর্তমান অর্থ স্বেদ, ঘাম)।
এবং (মূল অর্থ এইরূপে ; বর্তমান অর্থ এতদধিক, and)·

অনুশীলনী

১। শব্দ ও পদে পার্থক্য কি ?

(পদপ্রকরণ অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

২। বিভক্তি কাহাকে বলে ? প্রত্যয় কাহাকে বলে ? বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পার্থক্য কি ?

নির্দেশ :

বাক্যে প্রযুক্ত হইবার সময় শব্দ ও ধাতুর অর্থপ্রকাশের জন্য তাহাদের উত্তর বিশেষ বিশেষ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির নাম বিভক্তি।

শব্দের সহিত যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে শব্দ বিভক্তি বলে। শব্দ বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন কারকের অর্থ প্রকাশ করে। (উদাহরণ দাও)

ধাতুর সহিত যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে ধাতু বিভক্তি বলে। ধাতু-বিভক্তি ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, ভাব ইত্যাদি প্রকাশ করে। (উদাহরণ দাও)

বিভক্তির ন্যায় প্রত্যয়ও বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি, এবং তাহাও শব্দ বা ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়। শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহা তদ্ধিতপ্রত্যয় এবং ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহা কৃৎপ্রত্যয়। (উদাহরণ দাও)

বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পার্থক্য এই যে বিভক্তি **পদ গঠন** করে (নামপদ ও ক্রিয়াপদ) এবং প্রত্যয় **শব্দ গঠন** করে (কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত)। বাক্যের ব্যবহারকালে প্রত্যয়নিষ্পন্ন সাধিত শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করিয়া তাহাকে পদে পরিণত করিতে হয়।

৩। মৌলিক শব্দ কি ? সাধিত শব্দ কি ?

৪। নানারূপ সাধিত শব্দের উদাহরণ দাও।

৫। দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা কর :—

যৌগিক শব্দ। রূঢ়শব্দ। যোগরূঢ় শব্দ।

৬। "যোগরূঢ় শব্দে যৌগিক এবং রূঢ় এই দুই লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। কি ভাবে বুঝাইয়া বল।

৭। শব্দের মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ বলিতে কি বোঝায় সংক্ষেপে বল।

৮। দৃষ্টান্ত দাও :—

(ক) শব্দার্থের উৎকর্ষ। (খ) শব্দার্থের অপকর্ষ। (গ) শব্দার্থে প্রসার। (ঘ) শব্দার্থের সঙ্কোচ। (ঙ) শব্দার্থের আমূল পরিবর্তন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দার্থ চর্চা

১। সমার্থক শব্দ (Synonym)

ভাষায় একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ (synonym) বলে। রচনায় কোনো শব্দের বদলে তাহার সমার্থক শব্দ বসাইলে প্রায়শঃ অর্থের হানি হয় না। কিন্তু নির্বিচারে এই সূত্রটি সর্বত্র প্রয়োগ করিলে বাক্যের অর্থ বিপত্তি ঘটিবে। অথবা কখনও কখনও ভাষা-রীতিতে এক হাস্যকর বিপর্যয় ঘটাইয়া যাইবে।

যেমন—**ভাল** শব্দের প্রতিশব্দ হইল উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয় ইত্যাদি। কিন্তু যদি বলি, রাম খুব **উপাদেয় ছাত্র** ; বা শরীরটা **উৎকৃষ্ট** লাগিতেছে না অথবা ভগবান তোমার **উত্তম** করুন—তাহা হইলে বাংলার ভাষারীতি লঙ্ঘিত হয়, এবং শব্দ তাহার উপযুক্ত অর্থদ্যোতনা শক্তি হারাইয়া ফেলে। এই জন্য শব্দের বদলে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা গেলেও অর্থ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হয়। নিম্নে প্রতিশব্দ প্রযোগ ঘটিত বিশেষ দুই প্রকার অনৌচিত্যের আলোচনা হইতেছে—

(১) প্রতিশব্দ ব্যবহারের কালে ভাষারীতি ও বিষযোচিত গাম্ভীর্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। দিনমণি উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এই বাক্য দুইটির মধ্যে প্রথম বাক্যটিতেই ভাষারীতির সঙ্গতি ও সৌষম্য বজায় রহিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে দিনমণি শব্দের দ্বারা অনুচিত কবিত্ব করার প্রয়াস হইয়াছে। তদুপরি 'দিনমণি' ও 'উঠা' শব্দ দুইটি একসঙ্গে ব্যবহার করায় গুরুচণ্ডালী দোষ হইয়াছে।

(২) প্রতিশব্দ ব্যবহারকালে প্রতিশব্দগুলির মধ্যে কোন সূক্ষ্ম অর্থ পার্থক্য থাকিলে তাহা বুঝিয়া বাক্যে প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন—ছেলে খুব **ভাল**, না বলিয়া বলা হয়, ছেলেটি খুব **উপাদেয়**, তবে প্রতিশব্দের দিক হইতে ঠিকই হইল ; কিন্তু ভাল ও উপাদেয় প্রতিশব্দ দুইটির মধ্যে যে সূক্ষ্ম অর্থ পার্থক্য আছে তাহা অবহেলা করা হইল। 'ভাল' ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট, উপাদেয়, সুন্দর, ইত্যাদি প্রায় সকল অর্থেই ব্যবহার হয়, কিন্তু **উপাদেয়** শব্দটি প্রায়শঃ ভোজ্যাদি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে উপাদেয় অর্থ সুস্বাদু, পুষ্টিকর ইত্যাদি।

[কয়েকটি শব্দের সমার্থক শব্দ]

অগ্নি—আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক, বিভাবসু, বৈশ্বানর, জাতবেদাঃ, হবির্বহ, সর্বভুক্‌, সর্বশুচি।

অন্ধকার—আঁধার, তিমির, তমিস্রা, তমঃ।

অমৃত—অমিয়, সুধা, পীযূষ।

অশ্ব—ঘোড়া, ঘোটক, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, হয়, বাজী।

আকাশ—অম্বর, অন্তরীক্ষ, গগন, ব্যোম, শূন্য, নভঃ, নভস্তল, নভোমণ্ডল, বিমান, খ, দ্যুলোক।

আনন্দ—প্রীতি, হর্ষ, সুখ, আহ্লাদ, পুলক, সন্তোষ।

ইচ্ছা—অভিরুচি, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ঈপ্সা, ঈহা, স্পৃহা, সাধ, বাসনা, লিপ্সা, মনোরথ।

ঈশ্বর—ঈশ, জগদীশ, পরমেশ, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, ভগবান, বিধি, বিধাতা, ধাতা, বিভু, স্রষ্টা, জগৎপতি, জগন্মাতা, জগৎপিতা।

কর্ণ—কান, শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রোত্র।

কেশ—চুল, অলক, চিকুর, কুন্তল, শিরোরুহ।

গঙ্গা—ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনী, সুরনদী, পাবনী, ভীষ্মমাতা।

গৃহ—ঘর, আবাস, আগার, আলয়, গেহ, নিলয়, নিকেতন, ভবন, বাটী, বাড়ী, সদন, শালা, মন্দির।

চন্দ্র—চাঁদ, ইন্দু, সুধাকর, সুধাংশু, শীতাংশু, সিতাংশু, হিমাংশু, শুভ্রাংশু, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, সোম, নিশাপতি, নিশাকর, হিমকর, তারাপতি, বিধু, শশী, দ্বিজরাজ, কলানিধি।

জল—বারি, অম্বু, নীর, তোয়, উদক, পানীয়, পয়ঃ, অমৃত, সলিল।

তট—পার, কূল, তীর, সৈকত, পুলিন।

তরঙ্গ—ঢেউ, লহরী, বীচি, ঊর্মি, হিল্লোল।

ধন—অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি, বিভব, বিত্ত, নিধি, টাকাকড়ি।

ধনু—কার্মুক, কোদণ্ড, চাপ, শরাসন।

নদী—তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, সরিৎ।

নারী—অবলা, অঙ্গনা, ললনা কান্তা, কামিনী, রমণী, মহিলা, সুন্দরী, যোষিৎ, স্ত্রী।

পক্ষী—পাখী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, খগ, খেচর, অণ্ডজ, দ্বিজ।

পদ্ম—কমল, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ, অব্জ, পঙ্কজ, সরসিজ, সরোজ, সরোরুহ, নলিনী, তামরস, শতপত্র।

পণ্ডিত—প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিদ্বান্, বুধ, সুধী, মণীষী, ধীমান্, কোবিদ।

পর্ব্বত—পাহাড়, গিরি, শৈল, নগ, অদ্রি, অচল, ভূধর।

পৃথিবী—অবনী, ক্ষিতি, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, ভূ, ভূমি পৃথ্বী, বসুন্ধরা, বসুধা, বসুমতী, মহী, মেদিনী।

পুষ্প—কুসুম, প্রসূন, ফুল, সুমন।

বন—অরণ্য, অটবী, কানন।

বস্ত্র—কাপড়, বাস, বসন, অম্বর, পরিধেয়।

বায়ু—অনিল, বাতাস, পবন, গন্ধবহ, প্রভঞ্জন, মরুৎ, সমীর, সমীরণ।

বিদ্যুৎ—অশনি, বিজলী, তড়িৎ, চপলা, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী।

মেঘ—জলদ, বারিদ, তোয়দ, অম্বুদ, জলধর, বারিধর, অভ্র, ঘন, জীমূৎ, পর্জ্জন্য, বারিবহ।

রজনী—নিশা, রাত্রি, শর্বরী, বিভাবরী, ত্রিযামা, নিশীথিনী, যামিনী, ক্ষমা, ক্ষণদা।

রাজা—নরপতি, নরেন্দ্র, নরেশ, নৃপতি, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল, ক্ষিতীশ, ক্ষিতিপাল, মহীপতি, মহীপাল।

সমুদ্র—সাগর, অর্ণব, অব্ধি, অম্বুধি, উদধি, জলধি, পয়োধি, বারিধি, পারাবার, পাথার, সিন্ধু, রত্নাকর।

সর্প—সাপ, অহি, আশীবিষ, নাগ, উরগ, পন্নগ, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, বিষধর, ফণী।

সূর্য্য—অরুণ, অর্ক, আদিত্য, অংশুমালা, ভানু, রবি, তপন, দিনমণি, দিবাকর, প্রভাকর, ভাস্কর, মার্তণ্ড, মিহির, সুর, সবিতা, মরীচিমালী, বিবস্বান্।

স্বর্ণ—সোনা, কনক, কাঞ্চন, হেম, হিরণ্য, সুবর্ণ, অষ্টাপদ।

হস্তী-হাতী, করী, কুঞ্জর, গজ, মাতঙ্গ, দ্বিপ, দন্তী, দ্বিরদ, নাগ, বারণ।

২। বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)

কোনো শব্দ অপর শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিলে শব্দ দুইটিকে পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms) বলা যায়।

বাংলায় বিপরীতার্থক দুই প্রকার—

(১) নঞর্থক অব্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত বিপরীতার্থক শব্দ। যেমন—

ভাব, অভাব ; শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা ; স্থাবর, অস্থাবর ; লোভী, নির্লোভ ; কায়দা, বেকায়দা ; সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি।

(২) নঞ্ উপসর্গাদি হীন বৈপরীত্যের ভাবপ্রকাশক পৃথক শব্দ। যেমন—আলো, আঁধার ; হ্রাস, বৃদ্ধি ; ভাঁটা, জোয়ার ; পুরুষ, নারী ইত্যাদি।

[বিপরীতার্থক শব্দযুগল]

অগ্র—পশ্চাৎ
অধম—উত্তম
অধমর্ণ—উত্তমর্ণ
অর্বাচীন—প্রাচীন
অর্পণ—গ্রহণ
অলস—পরিশ্রমী
অর্থ—অনর্থ
অপকার—উপকার
অর্থী—প্রত্যর্থী
অনন্ত—সান্ত
অসীম—সসীম
অমৃত—গরল
অন্তর—বাহির
অপকর্ষ—উৎকর্ষ
অবনত—উন্নত
আবৃত—অনাবৃত
আয়—ব্যয়
আকর্ষণ—বিকর্ষণ
আরোহণ—অবরোহণ
আকুঞ্চন—প্রসারণ
আদান—প্রদান
অভিজ্ঞ—অনভিজ্ঞ
আদি—অন্ত
আবির্ভাব—তিরোভাব
অতিবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি
অনুলোম—প্রতিলোম, বিলোম
অল্প—অধিক
অনুকূল—প্রতিকূল
ইতর—ভদ্র
ইষ্ট—অনিষ্ট
ইহকাল—পরকাল
ঈষৎ—অধিক
উন্মীলন—নিমীলন
উপচয়—অপচয়
ঊর্ধ্ব—অধঃ
ঊর্ধ্বগ—নিম্নগ
ঋজু—বক্র
ঐক্য—অনৈক্য
ঐহিক—পারত্রিক
কোমল—কঠিন
কনিষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ
কুটিল—সরল
কৃত্রিম—স্বাভাবিক
কুৎসা—প্রশংসা
কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন
ক্রয়—বিক্রয়
কৃশ—স্থূল
কৃষ্ণ—শুক্ল
ক্ষুদ্র—বৃহৎ
ক্ষয়িষ্ণু—বর্ধিষ্ণু

আবিল—অনাবিল
আস্তিক—নাস্তিক
অনুগ্রহ—নিগ্রহ
অনুরাগ—বিরাগ
ঘন—তরল
চড়াই—উৎরাই
চঞ্চল—স্থির
চেতন—{ জড় / অচেতন }
জন্ম / জীবন —মৃত্যু
জাগরণ— সুপ্তি / নিদ্রা
জয়—পরাজয়
জ্বলন—নির্বাণ
তিরস্কার—পুরস্কার
তিক্ত—মধুর
তাপ—শৈত্য
দক্ষিণ—বাম
দাতা— গ্রহীতা / কৃপণ
দুরন্ত—শান্ত
দীর্ঘ—হ্রস্ব
দুষ্কৃতি—সুকৃতি
দুর্লভ—সুলভ
দুর্বল—সবল
দৃঢ়—শিথিল
দেনা—পাওনা
দূর—নিকট

গরিষ্ঠ—লঘিষ্ঠ
গুরু—লঘু
গুপ্ত—ব্যক্ত
গ্রহণ—বর্জন
নিরাকার—সাকার
নূতন—পুরাতন
নিশ্চেষ্ট—সচেষ্ট
নীরস—সরস
ন্যূন—অধিক
প্রবীণ—নবীন
প্রকৃতি—নিকৃতি
প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ
পূর্ণ—{ শূন্য / অপূর্ণ }
পুরোভাগ—পশ্চাদ্ভাগ
বন্ধন—{ মুক্তি / অবন্ধন }
বিধি— নিষেধ / অবিধি
বন্ধুর—মসৃণ
বাদী—{ বিবাদী / প্রতিবাদী }
ব্যর্থ—সার্থক
মিলন—বিরহ
মুখ্য—গৌণ
যোগ—বিয়োগ
শুভ—অশুভ
শ্রম—বিশ্রাম
সন্ধি—বিগ্রহ

ধনী— দরিদ্র / নির্ধন

সুগম—দুর্গম

সঞ্চয়—অপচয়

প্রশংসা / স্তুতি —নিন্দা

সরল— কপট / বক্র

সমষ্টি—ব্যষ্টি

স্থাবর— অস্থাবর / জঙ্গম

সাম্য— অসাম্য / বৈষম্য

সুশীল—দুঃশীল

সাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য

হরণ—পূরণ

স্বতন্ত্র—পরতন্ত্র

হ্রাস—বৃদ্ধি

স্বাধীন—পরাধীন

হর্ষ—বিষাদ

নিম্নে বিপরীতার্থক শব্দযোগে কয়েক প্রকার বাক্যগঠন প্রণালী প্রদর্শিত হইল—

(১) ব্যাপকতা (extensity) বুঝাইতে :

'দাদারে, দাদা সবাই ভালো, সাদাও ভালো, কালোও ভালো।' (এখানে ভালোর ব্যাপকতা বুঝাইতে বিপরীত শব্দযুগল ব্যবহৃত হইয়াছে।)

(২) জোর (emphasis) দিবার জন্য :

'লোকটা সাধু না, চোর'। 'এ অমৃত নয়, বিষ।' (এখানে চোর এবং বিষ এই দুই বিষয়ের উপর জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।)

(৩) পরস্পরত্ব (reciprocity) বুঝাইতে : নবীনে প্রবীণে মতের মিল হয় না। (এখানে পরস্পরত্ব বুঝাইতে বিপরীত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।)

(৪) দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় (both) বা বিকল্প বুঝাইতে : ভালমন্দ বিচার করিয়া কাজ করিও। তিনি স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান। (এখনে উভয় বা বিকল্প বুঝাইতে বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৫) বাক্যে বিকল্প বা পক্ষান্তর বুঝাইতে : তাহার আয় একটাকা হলে ব্যয় দুইটাকা। (এখানে বিপরীত শব্দ পক্ষান্তর বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।)

৩। সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Paronyms)

বাক্যরচনাকালে ভাষার সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ এই শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ না হইলে রচনায় বানান ভুল এবং অর্থের ভুল দুই প্রকার ভুল হয়।

হাস্যরসাত্মক বা শ্লেষাত্মক বাক্যে সমোচ্চারিত শব্দগুলি একসঙ্গে ব্যবহার করিয়া সুলেখক তাঁহার রচনায় চমৎকারিত্ব আনিতে পারেন। হাস্যরস বা কটুরসের রচনা ছাড়া মাঝে মাঝে গম্ভীর বিষয়েও সমোচ্চারিত শব্দযুগল ব্যবহৃত হয়।

যেমন—করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল **আপন,** এবার তোর ভরা **আপণ** বিলিয়ে দে তুই যারে তারে—অতুলপ্রসাদ। (এখানে **আপন** ও আপণ ভাবগম্ভীর রচনায়ই স্থান পাইয়াছে।)

মনে **করি, করী করি, হয়ও হয় না।**—(এখানে করী, করি এবং হয় হয় ইত্যাদি দ্বারা একটু কৌতুকরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে।)

[কতিপয় সমোচ্চারিত শব্দযুগল]

অর্ঘ—মূল্য।
অর্ঘ্য—পূজার উপচার।
অণু—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বিশেষ।
অনু—পশ্চাৎ (উপসর্গ)
অন্ত—শেষ
অন্ত্য—নিকৃষ্ট, শেষে আগত
অসিত—কৃষ্ণ
অশিত—ভক্ষিত
অসক্ত—অনাসক্ত
অশক্ত—অক্ষম
অবদান—কীর্তি, যশ
অবধান—মনোযোগ
অবিরাম—অনবরত
অভিরাম—সুন্দর
অবিহিত—অন্যায়
অভিহিত—কথিত
আপন—নিজের
আপণ—দোকান

অশ্ব—ঘোড়া
অশ্ম—পাথর
অংশ—ভাগ
অংস—কাঁধ
আবরণ—আচ্ছাদন
আভরণ—অলঙ্কার
ইতি—শেষ
ঈতি—অতিবৃষ্টি ইত্যাদি ষড়্‌বিধ শস্যবিঘ্ন
উপাদান—উপকরণ
উপাধান—বালিশ
করি—কর্‌ধাতুর উত্তম পুরুষের রূপ
করী—হাতী
কুল—বংশসমূহ, ফল বিশেষ
কূল—নদীর তীর
কৃতি—যত্ন, কর্ম
কৃতী—পণ্ডিত, যোগ্য
গিরিশ—মহাদেব
গিরীশ—হিমালয়

আদি—প্রথম
আধি—মনঃপীড়া
আহুতি—হোম
আহুতি—আহ্বান
দ্বিপ—হস্তী
দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূমি
দীপ—প্রদীপ
দূত—চর
দ্যূত—পাশাখেলা
ধরা—পৃথিবী
ধড়া—কটিবাস
ধাতৃ—বিধাতা
ধাত্রী—পৃথিবী, ধাই
নিশীথ—মধ্যরাত্রি
নিশিত—শাণিত
পরশ্ব—পরশু
পরস্ব—পরের ধন
পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ—পিঠ
পক্ষ—পাখির ডানা, অর্ধমাস কাল
পক্ষ্ম—চোখের পাতার লোম
বান—বন্যা
বাণ—শর
বিনা—ব্যতীত
বীণা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
বলি—উপহার
বলী—বলবান্
বাণী—বাক্য
বানি— সেকরার মজুরি
বিষ—গরল
বিস—মৃণাল
বিশ—কুড়ি

চির—দীর্ঘকাল
চীর—ছিন্নবস্ত্র
চ্যুত—ভ্রষ্ট
চূত—আম্র
মণ—চল্লিশ সের
মন—চিত্ত
মেদ—চর্বি
মেধ—যজ্ঞবিশেষ
রিক্ত—শূন্য
রিকৃথ—ধন
লক্ষ—লাখ
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য
লক্ষণ—চিহ্ন
লক্ষ্মণ—রামের ভ্রাতা
শকল—খণ্ড
সকল—সমুদয়
শক্ত—সমর্থ
সক্ত—আসক্ত
শঙ্কর—শিব
সঙ্কর—মিশ্রিত
শারদা—দুর্গা
সারদা—সরস্বতী
শিকড়—গাছের মূল
শীকর—জলকণা
শ্মশ্রু—দাড়ি
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী
শূর—বীর
সুর—দেবতা
সূর—সূর্য্য
শান্ত—ধীর
সান্ত—সসীম

ভাষণ—উক্তি
ভাসন—দীপ্তি
শীত—ঠাণ্ডা
সিত—সাদা
শুক্তি—ঝিনুক
সূক্তি—সুভাষিত
স্বত্ব—অধিকার
সত্ত্ব—গুণবিশেষ

শয্যা—বিছানা
সজ্জা—পোশাক, সাজ
স্বাক্ষর—দস্তখত, সহি
সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট
সুত—পুত্র
সূত—সারথি
স্বর্গ—দেবলোক
সর্গ—কাব্যাদির অধ্যায়

৪। নানার্থক শব্দ (Homonyms)

একই শব্দ ভাষায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেক সময় কোনো প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ছাড়া শুধু শব্দটির একাধিক অর্থ থাকার ফলেই তাহা সম্ভব হয়, আবার কখনো কখনো বিশিষ্ট বা রীতিসিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগের ফলে শব্দের ভিন্নার্থটি প্রধান হইয়া উঠে।

যেমন—নৌকা উত্তর দিকে যাইতেছে। আমার কথার কোন উত্তর পাইলাম না। এই সম্পত্তির কোনো উত্তরাধিকারী নাই। এই সকল বাক্যে **উত্তর** শব্দটি **দিক, জবাব, পরবর্তী** ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে শব্দগুলি কোন বিশেষ বাক্‌রীতি (idiom) অনুসারে ব্যবহৃত হয় নাই।

কিন্তু, তিনি গাঁয়ের মাথা। জামাইকে দইএর মাথাটা দাও। রাগের মাথায় কাজটা করেছি, ইত্যাদি বাক্যে **মাথা** কথাটি বিশিষ্ট প্রয়োগের গুণেই **মোড়ল, উপরিভাগ, বশ** ইত্যাদি বিশিষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বাক্যগুলিতে মাথা শব্দের idiomatic প্রযোগ হইয়াছে। বাগ্‌ধারা (idiom) অধ্যায়ে এইরূপ শব্দাবলীর আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে এইরূপ শব্দের সামান্যই আলোচনা হইল।

[একই শব্দকে বাক্যে ও বাক্যাংশে ভিন্নার্থে ব্যবহার]

অঙ্ক : (১) ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা। (গণিত)
(২) পাঁচহাজার অঙ্কে লিখিয়া দেখাও। (সংখ্যায়)
(৩) শিশুটি মাতৃঅঙ্কে শায়িত রহিয়াছে। (কোল)
(৪) নাটকের তৃতীয় অঙ্কটা আসল। (Act)
(৫) দৈবজ্ঞ অঙ্কপাত করিয়া গুণিয়া দেখাইলেন। (রেখা)

অর্থ : (১) অর্থ অনর্থের মূল। (ধন)
(২) এই শব্দটির অর্থ বুঝিলাম না। (মানে)

(৩) সেখানে যাইবার অর্থ কি ? (উদ্দেশ্য)
(৪) পরার্থে জীবন দান কর। (প্রয়োজন)

উত্তর : (১) নৌকা উত্তর দিকে যাইতেছে। (দিক্ বিশেষ)
(২) আমার কথার উত্তর পাইলাম। (জবাব)
(৩) এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নাই। (পরবর্তী)
(৪) এখানে লোকোত্তর প্রতিভা বিরল। (অসাধারণ)

কথা : (১) রামায়ণের কথা করুণ। (গল্প)
(২) দোহাই আমার কথা রাখ। (অনুরোধ)
(৩) আমি তোমাকে কথা দিয়াছিলাম। (প্রতিশ্রুতি)
(৪) তাহার সঙ্গে কথায় আঁটিয়া ওঠা কঠিন। (তর্ক)
(৫) তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। (পরামর্শ)
(৬) সে কথা আর তুলোনা। (প্রসঙ্গ)
(৭) গুরুজনের কথা অমান্য করিবে না (আদেশ)
(৮) ভায়ে ভায়ে কথা নাই। (বাক্যালাপ)

কলা : (১) সবরি কলাই সব কলার চেয়ে ভাল। (ফলবিশেষ)
(২) পূর্ণিমায় চাঁদের ষোল কলা পূর্ণ হয়। (অংশ বিশেষ)
(৩) প্রাচীন ভারতে বিবিধ ললিত কলার চর্চা হইত। (Art, শিল্প)

কাণ্ড : (১) তার কাণ্ডটা দেখলে একবার। (কর্ম)
(২) লোকটার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই ? (সাধারণ বিবেচনা, Common-Sense)
(৩) এ যে বিষম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছ। (ব্যাপার)
(৪) কাণ্ড মৃত্তিকার উপরিভাগে থাকে। (গাছের গুঁড়ি)
(৫) 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ ?' (কাব্যের অধ্যায়)

গুণ : (১) 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।' (কোন বিষয়ে উৎকর্ষ, —Qualification)
(২) উত্তাপ আলোক ও দহন অগ্নির গুণ। (স্বভাবধর্ম)
(৩) নৌকা গুণ টানিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। (রজ্জু)
(৪) রাশি দুইটির গুণফল কত। (পূরণ)
(৫) প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ)
(৬) তার চিকিৎসার গুণে রোগী বাঁচিয়া উঠিয়াছে। (শক্তি, ক্রিয়া)
(৭) বউ একেবারে গুণ করে রেখেছ। (তুক্, মন্ত্রাদির দ্বারা বশ)

ঘন : (১) তাহারা ক্রমে ঘন বনে প্রবেশ করিল। (গহন)
(২) এত ঘন লাল আমি পছন্দ করি না। (গাঢ়)
(৩) দুধ ঘন হইলে ক্ষীর হয়। (জমাট)

(৪) আকাশে ঘোর ঘন ঘটা। (মেঘ)
(৫) ঘরটির ঘনফল বাহির কর। (Cubic measure)

জোর : (১) জোর যার মুলুক তার। (শক্তি, বল)
(২) এত জোরে হাঁটিওনা। (দ্রুত)
(৩) জোরে বল, শোনা যাচ্ছে না। (উচ্চকণ্ঠে)
(৪) তুমি কি জোর করে এটা করবে ? (জবরদস্তি, হঠকারিতা)

তত্ত্ব : (১) নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। (বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্য, বা মতবাদ (theory)
(২) সময়মত তার একটু তত্ত্বতালাস কোরো। (খোঁজ)
(৩) পূজায় মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। (উপঢৌকন)

তন্ত্র—(১) শক্তি উপাসনা তন্ত্র মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ধর্মশাস্ত্র বিশেষ)
(২) স্নায়ুতন্ত্রের সুস্থতার উপর কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। (দেহযন্ত্রাদির আংশিক বিন্যাস, system)
(৩) ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাই তাহার সর্বনাশের মূল। (অধীন, বশ)
(৪) ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্রী দেশ। (শাসনপদ্ধতি)
(৫) নবতন্ত্রীরা একথা মানিতে চাহিবেন না। (মত, মতাবলম্বী)

ধর্ম—(১) অহিংসা পরম ধর্ম। (পুণ্য কার্য)
(২) জলের ধর্ম সমোচ্চশীলতা। (স্বভাব, গুণ)
(৩) তিনি ধর্ম মানেন না (বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি ও তদনুযায়ী সাম্প্রদায়িক আচার, religion)
(৪) ওঃ, আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এসেছেন ! (যম)।
(৫) যুগধর্ম রোধ করা যায় না। (বিশেষ কালের সামাজিক প্রবণতা

পদ—(১) পদহীন ব্যক্তির পাদুকার প্রয়োজন নাই। (পা)
(২) কবি নৈষধ পদলালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। (শব্দ, বাক্য)
(৩) কলেজের অধ্যক্ষের পদ এখনো খালি আছে। (কর্মস্থল, post)
(৪) আপনার পদের নাম কি জানিতে পারি কি ? (কর্মোপাধি, designation)
(৫) আজ বাড়ীতে পাঁচ পদ হইয়াছে। (item অর্থে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)

পত্র—(১) আপনার ২৭শে তারিখের পত্র পাইলাম (চিঠি)।
(২) অধিকারী দেবীর পায়ে বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিলেন। (পাতা)
(৩) জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে, গ্রামের মানুষ বেচে কেনে। (দ্রব্যাদির সমূহ)
(৪) পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি। (পাপড়ি)

পক্ষ—(১) বিহঙ্গ আকাশে পক্ষ বিস্তার করিল। (ডানা)
(২) দুইপক্ষ শুক্ল পক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষ। (চান্দ্রমাসাদি)
(৩) গ্রামে দুইটি পক্ষ হইয়াছে। (দল)
(৪) ইনি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। (বার, পর্যায়)
(৫) তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন। (শরীরের পার্শ্ব, তাহাতে অসাড়তা)

বর— (১) শিবের বরে বৃত্রাসুর স্বর্গজয় করিয়াছিল। (প্রসাদ, অনুগ্রহ)
(২) লৌকিকতার পরিবর্তে বরকন্যাকে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। (জামাতা, বিবাহকারী)
(৩) নৃপবর, দুঃখ কথা কহি আজ তোমার সদনে। (শ্রেষ্ঠ)

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও—
(ক) সমার্থক শব্দ (Synonyms)
(খ) বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)
(গ) সমচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Paronyms)
(ঘ) নানার্থক শব্দ (Homonyms)

২। যথাসম্ভব সমার্থক শব্দ বল—
অর্জুন, রাম, ধনু, মেঘ, নদী, জল, মাতা, পৃথিবী।

৩। কোন শব্দের পরিবর্তে সর্বত্র সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা চলে কি? না চলিলে তাহাতে রচনাগত সে সকল ত্রুটি হয় বল।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ বল—
সাদৃশ্য, কায়দা, লোভী, আস্তিক, অবনত, উৎকর্ষ, অনন্ত, অনুলোম, আরোহণ, ঐহিক, সুপ্তি, অপচয়, স্থাবর, ন্যূন, হ্রাস স্বতন্ত্র, সন্ধি, মুখ্য, বন্ধুর।

৫। উপযুক্ত বাক্য রচনা করিয়া বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগের নিম্নপ্রকার উদাহরণ দাও—
(ক) পরস্পর (reciprocity) বুঝাইতে;
(খ) কথার জোর (emphasis) দিবার জন্য;
(গ) ব্যাপকতা বুঝাইতে (extensity);
(ঘ) দ্বন্দ্বসমাসে উভয় বা বিকল্প বুঝাইতে;
(ঙ) বাক্যে বিকল্প বা পক্ষান্তর বুঝাইতে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাস

পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট দুই বা বহুপদের একপদী হওয়াকে সমাস বলে।

যেমন—রাজার পুত্র না বলিয়া আমরা বলি রাজপুত্র। এখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুইটি পদ 'রাজার' এবং 'পুত্র'। এই পদদ্বয় মিলিয়া একপদ হইল রাজপুত্র।

সমাসে অন্বয় বাচক কারক বিভক্তির লোপ হয়। যেমন—রাজার পদের র বিভক্তি লোপ হইয়া রাজপুত্র হইয়াছে। যে সমাসে অন্বয় বাচক কারক বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে **অলুক্ সমাস** বলে। যেমন—তেলেভাজা, আলুর চপ, গায়ে হলুদ, গোড়ায় গলদ ইত্যাদি।

যে কয়েক পদে সমাস হয় তাহাদিগকে **সমস্যমান পদ** বলে, এবং সমস্যমান পদের একপদী রূপকে **সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ** বলে। সমাসের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে পদ বা বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে **ব্যাসবাক্য, সমাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য** বলা হয়। সমাসযুক্ত পদের প্রথম পদটিকে **পূর্বপদ** এবং শেষেরটিকে **উত্তরপদ** বলে।

সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে সম্ভবস্থলে সন্ধি করাই সাধারণ রীতি।

কিন্তু সুশ্রাব্যতার হানি ঘটাইলে বাংলায় সেখানে সন্ধি হয় না। যেমন—আর্যানার্য, শিক্ষিতাশিক্ষিত পদ বাংলায় চলিবে না। এখানে সংযোগ বুঝাইবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করিয়া আর্য-অনার্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এইরূপ লেখা চলিবে। তবে ছোট সমাসে হাইফেন দ্বারা সংযোগ দেখাইবারও প্রয়োজন নাই। যেমন—পিতামাতা, ছাগদুগ্ধ, চালচিঁড়া, রথ দেখা ইত্যাদি।

সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার—**দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব**।

১। দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদসমূহের প্রত্যেকের অর্থ প্রাধান্য থাকে তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন—রাম ও লক্ষ্মণ, রামলক্ষ্মণ ; হর ও গৌরী, হরগৌরী ; দোয়াত ও কলম, দোয়াতকলম ইত্যাদি। এই সমাসগুলিতে সমস্যমান সকল পদের অর্থই প্রাধান্য পাইয়াছে, কোনটিরই অর্থ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির মধ্যে ও, বা, এবং, আর ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় যোগ করিয়া ব্যাসবাক্য গঠিত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাস অনেক প্রকারের হইতে পারে। নিম্নে কয়েক রূপ উদাহরণ দেওয়া হইল—

মিলনার্থক শব্দযোগে—হরি ও হর, হরিহর ; শিব ও দুর্গা, শিবদুর্গা ; ভাই ও বোন, ভাইবোন ; মা ও বাপ, মা বাপ ; ছেলে ও মেয়ে, ছেলেমেয়ে ; লয়লা ও মজনু, লয়লা-মজনু ; মাসী ও পিসী, মাসীপিসী ; হাত ও পা, হাত পা ; নাক ও মুখ, নাক মুখ ; জামাই ও মেয়ে, জামাই-মেয়ে ; চাল ও চিঁড়া, চালচিঁড়া ; তিল ও তুলসী, তিল-তুলসী ; জমা ও জমি, জমাজমি ; শ্বশুর ও জামাই, শ্বশুর-জামাই ; পথ ও ঘাট, পথঘাট ; জল ও বায়ু, জলবায়ু; প্রভু ও ভৃত্য, প্রভুভৃত্য ; নাম ও ধাম, নামধাম ; দেখা ও শোনা, দেখাশোনা ; স্বামী ও স্ত্রী, স্বামী স্ত্রী ; জায়া ও পতি, জায়াপতি (জায়াস্থানে বিকল্পে দম্ বা জম্ হইয়া দম্পতি, জম্পতি ; সংস্কৃতে দ্বিবচন বলিয়া জায়াপতী, দম্পতী জম্পতী হয়) ; কুশ ও লব, কুশীলব (নিপাতনে) ; লব ও কুশ, লবকুশ।

বিকল্পার্থক শব্দযোগে—ভালো বা মন্দ, ভালোমন্দ ; কম বা বেশী, কমবেশী ; জয় বা পরাজয়, জয় পরাজয় ; হার বা জিত, হারজিত, পাশ বা ফেল, পাশফেল ; বিশ বা পঁচিশ, বিশপঁচিশ ; নয় বা ছয়, নয়ছয়।

বিরোধার্থক শব্দযোগে—শাদা ও কালো, শাদাকালো ; অহি ও নকুল, অহিনকুল ; সুর ও অসুর, সুরাসুর ; আদায় ও কাঁচকলায়, আদায়কাঁচ-কলায় ; বাঘে ও কুমিরে, বাঘেকুমিরে ; সাপে ও নেউলে, সাপে-নেউলে।

বিপরীতার্থক শব্দযোগে—আয় ও ব্যয়, আয়ব্যয় ; কাঁচা ও পাকা কাঁচাপাকা ; ছেলে ও বুড়ো, ছেলেবুড়ো ; জমা ও খরচ, জমাখরচ, জল ও স্থল, জলস্থল ; যোগ ও বিয়োগ, যোগবিয়োগ ; দেনা ও পাওনা, দেনাপাওনা ; আর্য ও অনার্য, আর্যঅনার্য ; ইতর ও বিশেষ, ইতরবিশেষ ; ডানে ও বাঁয়ে, ডানেবাঁয়ে ; সুখ ও দুঃখ, সুখদুঃখ ; পাপ ও পুণ্য পাপপুণ্য ; জাত ও বেজাত, জাতবেজাত।

সমার্থক শব্দযোগে—হাট ও বাজার, হাটবাজার, পাইক ও

পেয়াদা, পাইকপেয়াদা; চালাক ও চতুর, চালাকচতুর; রাজা ও বাদশা, রাজাবাদশা ; ধন ও দৌলত, ধনদৌলত ; জন্তু ও জানোয়ার, জন্তুজানোয়ার ; খবর ও বার্তা, খবরবার্তা ; বাক্স ও পেঁটেরা, বাক্সপেঁটেরা ; ডাক্তার ও বৈদ্য ডাক্তারবৈদ্য, চিঠি ও পত্র, চিঠিপত্র ; ঠাট্টা ও তামাসা, ঠাট্টাতামাসা ; দুঃখ ও যন্ত্রণা, দুঃখযন্ত্রণা ; সুখ ও শান্তি, সুখশান্তি ; প্রীতি ও প্রণয়, প্রীতিপ্রণয়।

দ্বন্দ্বসমাসের এই রূপকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব** বলা হয়। সমার্থক দ্বন্দ্বে একটি পদ অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ হয়। যেমন—ধনদৌলত = ধন (সংস্কৃত) + দৌলত (ফারসী) ; বাক্সপেঁটেরা = বাক্স (ইংরেজী box) + পেঁটেরা (সংস্কৃত পেটক) ; দুঃখযন্ত্রণা = দুঃখ (সংস্কৃত) + যন্ত্রনা (সংস্কৃত)।

সমার্থক শব্দের মত অনেক সময় শব্দানুগামী অনুকার শব্দের সহিতও দ্বন্দ্ব সমাস হয়। এইরূপ শব্দের সহিত দ্বন্দ্ব সমাস হইলে অনেকটা ইত্যাদি (etcetera) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—কাপড়চোপড় (কাপড় ও চোপড়), চাকরবাকর (চাকর ও বাকর), ছেলেপুলে (ছেলে ও পুলে ইত্যাদি।)

দ্বন্দ্ব সমাস দুইটি বিশেষণ পদের বা ক্রিয়াবিশেষণ পদের কিংবা সর্বনাম পদেরও হইতে পারে.

বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব—কম ও বেশী, কমবেশি ; ভাল ও মন্দ, ভালমন্দ ; ছোট ও বড় ছোটবড় ; আসল ও নকল, আসলনকল।

ক্রিয়া বিশেষণের দ্বন্দ্ব—ধীরে ও সুস্থে, ধীরেসুস্থে ; আগে ও পাছে, আগেপাছে ; পাকে ও চক্রে, পাকেচক্রে।

সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব—যেমন ও তেমন, যেমনতেমন ; যা ও তা, যাতা ; তুমি ও আমি, তুমি আমি ; যথা ও তথা, যথাতথা।

অলুক্ দ্বন্দ্ব—অলুক্ সমাসের উদাহরণ প্রায় সকল সমাসেই আছে। নিম্নে অলুক্ দ্বন্দ্বের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বাংলা অলুক্ দ্বন্দ্বে সাধারণতঃ দুইটি পদেই বিভক্তি থাকে। যেমন—

চোখেমুখে, তেলেজলে, মায়েঝিয়ে, বাঘেগরুতে, আদায়কাঁচকলায়, সাপেনেউলে, দুধেভাতে, জলেকাদায়, বনেজঙ্গলে ইত্যাদি।

সংস্কৃতের **বহুপদী দ্বন্দ্ব** গম্ভীর রীতির সাধু বাংলায় ব্যবহৃত হয়। চলিত বা সহজ রীতির গদ্যে ইহার তত ব্যবহার হয় নাই। বহুপদী দ্বন্দ্বের উদাহরণ—(সাধু বাংলায়) কায়মনোবাক্যে ; ধর্মার্থকামমোক্ষ ; স্বর্গমর্ত্যপাতাল ; ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর ; রূপরসগন্ধস্পর্শ ; চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় ; ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্‌ব্যোম।

(দ্বন্দ্ব সমাসেরপদবিন্যাস)

দ্বন্দ্বসমাসে কোন শব্দ আগে বসিবে এবং কোন শব্দ পরে বসিবে তাহা কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করা সহজসাধ্য নয়। নিম্নে কয়েকটি রীতির উল্লেখ করা হইল।

(১) স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে থাকিলে আগে পুরুষ ও পরে স্ত্রী বসে। যেমন—দাসদাসী, স্বামীস্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাপমা, বেটাবেটি, নেড়ানেড়ী, হরগৌরী ইত্যাদি।

(১) কিন্তু, স্ত্রীপুরুষ, সীতারাম, মাগভাতার, রাধাকৃষ্ণ, মাবাপ প্রভৃতি ইহার ব্যতিক্রম।

(২) মান্যগণ্য ও প্রধানের উল্লেখ আগে হয়, পরে অন্যের উল্লেখ হয়। যেমন—প্রভুভৃত্য, গুরুশিষ্য, শ্বশুরজামাই, শাশুড়ীননদী, অন্নব্যঞ্জন।

অবশ্য এই নিয়মেরও ব্যাতিক্রম বহু। যেমন—খুড়াজেঠা, চন্দ্রসূর্য, বাপদাদা ইত্যাদি।

(৩) উপরের সম্বন্ধ না থাকিলে প্রথমে হ্রস্ব শব্দ এবং পরে দীর্ঘ শব্দ ও পরে দুরুচ্চার্য শব্দ আসে। যেমন—ইঁটপাথর, চোরডাকাত, ফুলচন্দন, ভীমার্জুন, সাঁঝসকাল, দোলদুর্গোৎসব।

কিন্তু, হাওলাৎবরাত, ভাবনাচিন্তা, পাওনাদেনা, আসামীফরিয়াদী, ইত্যাদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

২। দ্বিগু সমাস

সংখ্যাবাচক পূর্বপদের সহিত সমাহার (সমষ্টি) অর্থে যে সমাস হয় তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—

ত্রি ভুবনের সমাহার, ত্রিভুবন; চৌদ্দ ভুবনের সমাহার, চৌদ্দভুবন; অষ্ট বসুর সমাহার, অষ্টবসু; সপ্ত ঋষির সমাহার, সপ্তর্ষি; নব রত্নের সমাহার, নবরত্ন; অষ্ট প্রহরের সমাহার, অষ্টপ্রহর; সপ্ত অহের সমাহার, সপ্তাহ; ষড় ঋতুর সমাহার, ষড়্ঋতু; পাঁচ ফোড়নের সমাহার, পাঁচফোড়ন; সে (তিন) তারের সমাহার, সেতার; চৌমাথার সমাহার, চৌমাথা।

সমাহার দ্বিগুতে অনেক সময় **উত্তরপদে ঈ প্রত্যয়** হয়। যেমন—

পঞ্চবটের সমাহার, পঞ্চবটি; শত অব্দের সমাহার, শতাব্দী; ত্রি পদের

সমাহার, ত্রিপদী ; ত্রি লোকের সমাহার, ত্রিলোকা ; চৌ (চার) মোহনার সমাহার, চৌমোহনী ; পাঁচ সেরের সমাহার, পাঁচসেরী (পসুরী) ; শত বর্ষের (বার্ষিকের) সমাহার, শতবার্ষিকী।

সমাহার দ্বিগুতে কখনো কখনো **উত্তর পদে আ প্রত্যয়ও** হয়। যেমন—ত্রি ফলের সমাহার, ত্রিফলা ; তিন পায়ের সমাহার, তেপায়া, সেপায়া ইত্যাদি।

(অন্য সমাসে দ্বিগুর লক্ষণ)

দ্বিগু সমাসের সংখ্যাবাচক পূর্বপদ অনেকটা বিশেষণের কাজ করে বলিয়া ইহাকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত করা চলে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে সমাহারের অর্থ প্রধান না হইয়া অন্য অর্থ প্রধান হয়। সেসব ক্ষেত্রে দ্বিগু না বলিয়া বহুব্রীহি বা সংখ্যা-বহুব্রীহি বলিতে হইবে। যেমন—দশানন, বারমাসী, ত্রিনয়নী, ইত্যাদি।

বাংলা ব্যক্তিনাম এককড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, তিনকড়ি প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাস। এক কড়ি দ্বারা ক্রীত এককড়ি (গ্রাম্য সংস্কার অনুযায়ী মৃতবৎসা মাতা কড়ি দিয়া সন্তানকে যমের নিকট হইতে কিনিয়া লব)।

আবার কোটিপতি, লক্ষপতি ইত্যাদি পদে লক্ষের পতি, কোটির পতি অর্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইবে।

৩। তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের অন্বয় দ্বিতীয়াদি কারক-বিভক্তি দ্বারা প্রকাশ পায় এবং যাহাতে উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার—

(১) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ (পূর্বপদে দ্বিতীয়া বা কর্মকারকের বিভক্তি)
(২) তৃতীয়া তৎপুরুষ (পূর্বপদে তৃতীয়া বা করণ কারকের বিভক্তি)
(৩) চতুর্থী তৎপুরুষ (পূর্বপদে চতুর্থী বা সম্প্রদান কারকের বিভক্তি)
(৪) পঞ্চমী তৎপুরুষ (পূর্বপদে পঞ্চমী বা অপাদান কারকের বিভক্তি)
(৫) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (পূর্বপদে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ পদের বিভক্তি)
(৬) সপ্তমী তৎপুরুষ (পূর্বপদে সপ্তমী বা অধিকরণ কারকের বিভক্তি)

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : (সাধারণ কর্মকারকে)

বধূকে বরণ, বধূবরণ ; পাখিকে শিকার, পাখিশিকার ; মাছকে ধরা, মাছধরা ; গুরুকে মারা, গুরুমারা (বিদ্যা) ; ছেলেকে ভুলানো, ছেলেভুলানো (ছড়া)।

প্রাপ্ত, আপন্ন, আগত, গত, ইত্যাদি শব্দে—

বিপদকে আপন্ন, বিপদাপন্ন ; বয়ঃকে প্রাপ্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত ; শরণকে আগত, শরণাগত ; ব্যক্তিকে গত ব্যক্তিগত ; শ্রেণীকে গত, শ্রেণীগত।

ব্যাপ্তি, নিরন্তরতা বুঝাইতে—

চিরকালকে ব্যাপিয়া সুখ, চিরসুখ ; ক্ষণকালকে ব্যাপিয়া স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, চিরকালকে ব্যাপিয়া শত্রু, চিরশত্রু।

তৃতীয়া তৎপুরুষ : (তৃতীয়ান্ত কর্তৃপদে বা করণ কারকে) *

সর্প দ্বারা দষ্ট, সর্পদষ্ট ; বাল্মীকি দ্বারা রচিত, বাল্মীকিরচিত ; বজ্র দ্বারা আহত, বজ্রাহত ; রব দ্বারা আহূত, রবাহূত ; রৌদ্র দ্বারা পক্ক, রৌদ্রপক্ক ; ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা, ঢেঁকিছাঁটা ; স্নেহ দ্বারা আতুর, স্নেহাতুর ; জরা দ্বারা জীর্ণ, জরাজীর্ণ ; তৈল দ্বারা লিপ্ত, তৈললিপ্ত ; বাক্ দ্বারা দত্তা, বাগ্‌দত্তা ; (কন্যা) ; লাঠি দ্বারা পেটা, লাঠিপেটা ; মন দ্বারা গড়া, মনগড়া ; শান দ্বারা বাঁধানো, শানবাঁধানো ; জল দ্বারা মেশানো, জলমেশানো ; গোবর দ্বারা ভরা, গোবরভরা (মাথা) ; স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত, স্বর্ণনির্মিত ; রত্ন দ্বারা খচিত রত্নখচিত ; সোনা দ্বারা বাঁধান, সোনাবাঁধান ; পাথর দ্বারা চাপা, পাথরচাপা ; জল দ্বারা জীয়ন্ত, জলজীয়ন্ত ; প্রেমে ঘন, প্রেমঘন ; যত্নে কৃত, যত্নকৃত।

হীন, উন, সহ যুক্ত ইত্যাদি অর্থবাচক শব্দে—

ধন দ্বারা হীন, ধনহীন ; পোয়া দ্বারা কম, পোয়াকম ; মাতা দ্বারা হীন, মাতৃহীন ; চিনি সহ পাতা, চিনিপাতা ; ঘি সহ ভাত, ঘিভাত ; দুধ সহ সাবু, দুধসাবু ; শ্রী দ্বারা যুক্ত, শ্রীযুক্ত।

অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ—

তেলেভাজা, আগুনেপোড়া, কলেছাঁটা, পোকায়কাটা, তেলেবেগুনে (তেল সহ বেগুনে), বালির বাঁধ।

* উদাহরণগুলি সবই করণকারক নয়। কতক কর্মবাচ্যের কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি।

চতুর্থী তৎপুরুষ :

সম্প্রদান অর্থে—দেবকে দত্ত, দেবদত্ত ; কাককে বলি, কাকবলি।

দানার্থক চতুর্থী তৎপুরুষের নিদর্শন বাংলায় খুবই কম।

নিমিত্ত অর্থে—

ধর্মের নিমিত্ত পত্নী, ধর্মপত্নী ; মেয়েদের জন্য স্কুল, মেয়েস্কুল ; বিয়ের জন্য পাগলা, বিয়েপাগলা ; ধানের জন্য জমি, ধানজমি ; রান্নার জন্য ঘর, রান্নাঘর ; চিকিৎসার জন্য আলয়, চিকিৎসালয় ; পাগলের জন্য গারদ, পাগলাগারদ ; ডাকের জন্য মাশুল, ডাকমাশুল ; গাড়ীর জন্য ভাড়া, গাড়ীভাড়া ; স্কুলের জন্য ফি, স্কুলফি।

অলুক্ চতুর্থী তৎপুরুষ—

ঘানির বলদ ; মুড়ির চাল ; খোঁপার কাঁটা ; পেটের দায় ; ইত্যাদি।

স্থানচ্যুতি,অপসরণ ইত্যাদি অর্থে—

স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট, স্বর্গভ্রষ্ট ; শাখা হইতে চ্যুত, শাখাচ্যুত ; শাপ হইতে মুক্ত, শাপমুক্ত ; বুক হইতে চেরা, বুকচেরা (ধন) ; হার হইতে ছেঁড়া, হারছেঁড়া (মণি) ; ঘানি হইতে ঝরা, ঘানিঝরা (তেল) ; চাক হইতে ভাঙ্গা, চাকভাঙ্গা (মধু) , স্কুল হইতে পালানো, স্কুলপালানো (ছেলে) ; বিলাত হইতে ফেরত, বিলাতফেরত ; কাছ হইতে ছাড়া, কাছছাড়া।

ভয়, উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, ইত্যাদি অর্থে—

মৃত্যু হইতে ভয়, মৃত্যুভয়, ব্যাঘ্র হইতে ভীতি, ব্যাঘ্রভীতি ; সূর্য হইতে তাপ, সূর্যতাপ ; চন্দ্র হইতে কর, চন্দ্রকর ; শিশির হইতে উদক, শিশিরোদক ; আগা হইতে গোড়া, আগাগোড়া ; বিশ হইতে ত্রিশ বিশ ত্রিশ।

অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ—

কলের জল ; ঘানির তেল ; পুকুরের মাছ ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ :

সম্বন্ধ অর্থে—

রাজার পুত্র, রাজপুত্র ; রাজার কন্যা, রাজকন্যা ; প্রভুর পত্নী, প্রভুপত্নী ; বৃক্ষের শাখা, বৃক্ষশাখা ; নাতিনের জামাই, নাত্‌জামাই ; ঠাকুরের পো, ঠাকুর পো ; মালের গাড়ী, মালগাড়ী (অথবা, মালের জন্য গাড়ী, চতুর্থী তৎপুরুষ) ; শিক্ষার মন্দির, শিক্ষামন্দির (অথবা শিক্ষার জন্য মন্দির, চতুর্থী

তৎপুরুষ; নারীর প্রগতি, নারীপ্রগতি; ছাত্রদের আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন; খাদ্যের দপ্তর, খাদ্যদপ্তর; নাট্যের মঞ্চ, নাট্যমঞ্চ; ক্রোড়ের পত্র, ক্রোড়পত্র; কবিগণের গুরু, কবিগুরু; জাতি সমূহের সংঘ, জাতিসংঘ; মহিলাদের মজলিস, মহিলামজলিস্; ভোটের অধিকার, ভোটাধিকার; সংবাদের পত্র, সংবাদপত্র; রাষ্ট্রের পাল, রাষ্ট্রপাল; রাজার নীতি, রাজনীতি।

সহ, তুল্য, সমূহ ইত্যাদি অর্থে—

ঢাকীর সহ, ঢাকীসহ (বিসর্জন); সীতার সহ, সীতাসহ; চাঁদের পানা, চাঁদপানা; সোনার হেন, সোনাহেন; মৃত্যুর তুল্য, মৃত্যুতুল্য; ভ্রাতার গণ, ভ্রাতৃগণ, গুণের গ্রাম, গুণগ্রাম; পঙ্গের পাল, পঙ্গপাল; কীর্তির কলাপ, কীর্তিকলাপ।

অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ—

ঘোড়ার ডিম; পেটের জ্বালা, নদের নিমাই; সখের প্রাণ; গড়ের মাঠ; হাতের পাঁচ; আলুর চপ; ষাঁড়ের গোবর; ধর্মের ঢাক; পথের কাঁটা; চোখের বালি (সংস্কৃতে) ভ্রাতুষ্পুত্র।

সপ্তমী তৎপুরুষ:

অধিকরণ অর্থে—

গাছে পাকা, গাছপাকা; নিশিতে জাগা, নিশিজাগা, রাতে কানা, রাতকানা; কাশীতে বাস, কাশীবাস; বস্তায় পচা, বস্তাপচা; মধ্যাহ্নে ভোজন, মধ্যাহ্নভোজন; বিশ্বে বিশ্রুত, বিশ্ববিশ্রুত; গোলাতে ভরা, গোলাভরা; মাঠেতে ময়, মাঠময়; ঘরেতে পাতা, ঘরপাতা (দই); তীরে লগ্ন তীরলগ্ন; যুদ্ধেতে বিশারদ্, যুদ্ধবিশারদ্; বচনেতে বাগীশ, বচনবাগীশ; দক্ষিণে পন্থা, দক্ষিণাপথ।

বহুর মধ্যে তুলনায় বা নির্ধারে—

কবি মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবিশ্রেষ্ঠ; সর্ব মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সর্বজ্যেষ্ঠ; নরের মধ্যে অধম, নরাধম; সংখ্যায় লঘু, সংখ্যালঘু (তৃতীয়া তৎপুরুষও হইবে); সংখ্যায় গুরু, সংখ্যাগুরু (বা গরিষ্ঠ, বা সংখ্যাগরিষ্ঠ)।

অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ—

গায়ে হলুদ (অলুক্ বহুব্রীহিও বলা চলে); হাতে খড়ি (অলুক্ বহুব্রীহিও বলা চলে); দিনে ডাকাতি; কলেজে পড়া; সোনায় সোহাগা; গলায় দড়ি; গোড়ায় গলদ; এঁচড়ে পাকা; (সংস্কৃত) যুধিষ্ঠির।

নঞ্-তৎপুরুষ সমাস ঃ

পর পদের প্রাধান্য রাখিয়া ন (নঞ্) অব্যয়ের সহিত সমাস হইলে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হয়।

এই সমাসে ন (নঞ্) এর পর স্বরবর্ণ থাকিলে ন স্থানে অন্ হয়, এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে অ হয়।

ন (নঞ্) যোগে—

(সংস্কৃত শব্দে)—ন অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ; ন আচার, অনাচার ; ন উর্বর, অনুর্বর ; ন উন্নত, অনুন্নত ; ন অশন, অনশন ; ন গণ্য, নগণ্য (তুচ্ছ), অগণ্য (গণনাতীত) ; ন কিঞ্চিৎকর, অকিঞ্চিৎকর ; ন সহযোগ, অসহযোগ ;

(বাংলা শব্দে)—ন কাজ, অকাজ ; ন লুনি আলুনি ; ন ধোয়া, আধোয়া ; ন কাল, অকাল (অশুভ সময়), অকাল (দুর্ভিক্ষ) ঃ ন মঞ্জুর নামঞ্জুর ; নেই মামা, নেইমামা ; ন (মন্দ) গাছা, আগাছা ; নি খরচা, নিখরচা।

নঞর্থক বিদেশী উপসর্গ যোগে—

বে বন্দোবস্ত, বেবন্দোবস্ত ; বে সরকারী, বেসরকারী ; বে আইনী, বেআইনী ; গর হাজির, গরহাজির ; গর মিল, গরমিল ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস :

কৃদন্ত শব্দের সহিত উপপদের সমাস হইলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস হয়।

ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় যোগ হয়, তাহার নাম কৃৎ প্রত্যয়। ধাতুর সহিত কৃৎ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে। কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যে পদ উপসর্গের মত বসে তাহাকে উপপদ বলে। উপপদ ও কৃদন্ত সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত করা হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে কর্মধারয় বা বহুব্রীহির ভাবই প্রধান।

জল চরে যে, জলচর ; এখানে চর্ ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় যোগে **চর** কৃদন্ত শব্দ গঠিত হইল। এবং এই কৃদন্ত শব্দের পূর্বে **জল** শব্দ উপপদ রূপে যুক্ত করা হইল। এইভাবে উপপদ ও কৃদন্ত শব্দের সমাস করিয়া সমস্ত পদ হইল **জলচর**।

এইরূপ—

ছেলে ধরে যে, ছেলেধরা ; লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাহাকে, লক্ষ্মীছাড়া ; ধামা ধরে যে, ধামাধরা ; আগুনে পুড়িয়াছে যে, আগুনপোড়া ; রক্ত চোষে যে, রক্তচোষা ; গাঁট কাটে যে, গাঁটকাটা ; কাণ কাটা যার, কাণকাটা ; বাজী

করে যে, বাজীকর, হালুই (মিষ্টান্ন, হালুয়া) করে যে, হালুইকর ; ফেল মারিয়াছে যে, ফেলমারা ; ভাতারকে খায় যে, ভাতারখাগী ; মানুষ খায় যে, মানুষখেকো ; পাড়ায় বেড়ায় যে, পাড়াবেড়ানী।

(সংস্কৃত শব্দে)-খ (আকাশ) তে চরে যে, খেচর ; স্বপ্নে চরে যে, স্বপ্নচারী ; ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে, ইন্দ্রজিৎ ; গৃহে থাকে (স্থা ধাতু) যে, গৃহস্থ ; পাদ দ্বারা পান করে যে, পাদপ ; সত্য বলে (বদ্ ধাতু) যে, সত্যবাদী।

৪। কর্মধারয় সমাস

বিশেষণ পূর্বপদের সহিত **বিশেষ্য** উত্তর পদের সমাস হইয়া উত্তর পদের অর্থ প্রাধান্য হইলে কর্মধারয় সমাস হয়।

যেমন—নব অন্ন, নবান্ন ; কাঁচা কলা, কাঁচকলা ; বড় কাকা, বড়কাকা ; ছোট দিদি, ছোটদিদি, (ছোটদি, ছোড়দি) ; হারা ধন, হারাধন ; পূর্ণ চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ; নীল উৎপল, নীলোৎপল ; মহৎ (মহান্) রাজা, মহারাজ (বাংলায় মহারাজাও হইবে) ; মহা (মহতী) অষ্টমী, মহাষ্টমী ; চলৎ (চলে, নড়ে যাহা) চিত্র, চলচ্চিত্র ; পাণ্ডু (খসড়া) লিপি, পাণ্ডুলিপি ; উড়ো (যাহা উড়ে) জাহাজ, উড়োজাহাজ ; ডুবো জাহাজ, ডুবোজাহাজ ; কানা কড়ি, কানাকড়ি ; সেকেণ্ড মাষ্টার, সেকেণ্ডমাষ্টার ; হেড্ পণ্ডিত, হেড্পণ্ডিত ; কড়া পাক, কড়াপাক ; খাস (নিজস্ব) তালুক, খাসতালুক ; বিশ্ব (সকল) মানব, বিশ্বমানব ; উন বিশ, উনিশ (বিশ হইতে উন, পঞ্চমী তৎপুরুষও হইতে পারে) ; পোয়া কম, পোয়াকম (পোয়া দ্বারা কম, তৃতীয়া তৎপুরুষও হইতে পারে) ; পৌনে (পোয়াউন) সাত, পৌনেসাত (সাত হইতে পোয়া উন, পঞ্চমী তৎপুরুষও হইবে)।

দুই সমস্যমান পদে অভেদ বুঝাইলেও কর্মধারয় সমাস হইতে পারে। এরূপ কর্মধারয় বিশেষ্যে বিশেষ্যে নিষ্পন্ন হয় ও উভয় পদ প্রাধান্য পায়। **যেমন—**

যিনি রাজা তিনি ঋষি, রাজর্ষি ; যিনি মাষ্টার তিনি মশায়, মাষ্টারমশায় ; যিনি বিবি তিনি সাহেবা, বিবিসাহেবা ; যেই কলিকাতা সেই নগরী, কলিকাতা নগরী ; যেই বঙ্গ সেই দেশ, বঙ্গদেশ ; যেই গঙ্গা সেই নদী, গঙ্গানদী ; যিনি পিতা তিনি দেব, পিতৃদেব ; যেই গণ্ড সেই স্থল, গণ্ডস্থল ; যেই দয়া সেই গুণ, দয়াগুণ ; যেই ছেলে সে মানুষ, ছেলেমানুষ ;

যেই গোলাপ সেই ফুল, গোলাপফুল ; যেই ভূ সেই লোক, ভূলোক ; যেই দ্যু সেই লোক, দ্যুলোক।

একাধিক গুণ সমাবেশে দুই বিশেষণও কর্মধারয় সমাস হয়। বিশেষণে এবং বিশেষণীয় বিশেষণে মিলিয়াও কর্মধারয় হইতে পারে।

দুই বিশেষণে কর্মধারয় সমাসে গুণের **সমকালীনতা** বা **পৌর্বাপর্য** বুঝায়। যেমন—

সমকালীনতা*—যেই নীল সেই লোহিত ; নীললোহিত ; যেই কাঁচা সেই মিঠা, কাঁচামিঠা, যেই ভীষণ সেই মধুর, ভীষণমধুর ; যেই মিঠে সেই কড়া, মিঠেকড়া ; যেই স্নিগ্ধ সেই কোমল, স্নিগ্ধকোমল ; যে সুস্থ সে সবল, সুস্থসবল ; যিনি মান্য তিনি গণ্য, মান্যগণ্য ; যে কচি সে কাঁচা, কচিকাঁচা ; যাহা শীত তাহা উষ্ণ, শীতোষ্ণ।

পৌর্বাপর্য (আগে পরে)—পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত, সুপ্তোত্থিত ; পূর্বে দত্ত পরে অপহৃত, দত্তাপহৃত ; আগে ধোয়া পরে মোছা, ধোয়ামোছা ; পূর্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত, স্নাতানুলিপ্ত।

বিশেষণীয় বিশেষণ ও বিশেষণ যোগে—আধ ফোটা, আধফোটা ; সদ্য ভাজা, সদ্যভাজা ; বাসি মড়া, বাসিমড়া ; মহা পাপিষ্ঠ, মহাপাপিষ্ঠ ; সাড়ে (সার্ধ) চার, সাড়েচার (সংখ্যাবাচক চার শব্দকে বিশেষণ ধরিলে) ; নিম (অল্প) রাজি, নিমরাজি।

কর্মধারয় সমাসে পূর্বনিপাত পরনিপাত

সমাসে **নিপাত** অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্থান গ্রহণ ; পূর্বনিপাত অর্থ ব্যতিক্রম রূপে পূর্বে স্থানগ্রহণ, এবং পরনিপাত পরে স্থান গ্রহণ। কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পূর্বে বসে, পরে বিশেষ্য বসে—অর্থাৎ বিশেষণ পূর্বপদ, এবং বিশেষ্য উত্তরপদ। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া পূর্বপদ পরে আসিলে, এবং পরপদ পূর্বে গেলে, পূর্বপদের পরনিপাত, অথবা পরপদের পূর্বনিপাত হইয়াছে বলা হইবে।

যেমন—ভাজা মাছ, মাছভাজা ; দুই বছর, বছর দুই ; পোড়ামুখী, মুখপুড়ী ;

---

*গুণের সমকালীনতায় দ্বন্দ্বসমাসও বলা চলে। যেমন—কাঁচা এবং মিঠা, কাঁচামিঠা। কিন্তু সমকালীনতা না থাকিলে হইবে না। সুপ্তোত্থিত একই সঙ্গে সুপ্ত এবং উত্থিত নয়। আগে সুপ্ত পরে উত্থিত। অভেদে বিশেষ্যে বিশেষ্যে সমাসও দ্বন্দ্ব নহে। দেবর্ষিতে দুই বিশেষ্য একজনকেই বুঝাইতেছে।

অধম নর, নরাধম ; দুই গোটা, গোটাদুই ; এক জন জনেক বা জনৈক, সেদ্ধ ডিম, ডিমসেদ্ধ ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :

কর্মধারয় সমাসে অন্বয় বাচক মধ্যপদ বা পদসমূহ লুপ্ত হইলে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হয়। যেমন—

ভিক্ষা লব্ধ অন্ন, ভিক্ষান্ন ; পল (মাংস) মিশ্র অন্ন, পলান্ন ; ঘি মিশ্রিত ভাত, ঘি-ভাত, (ঘি সহ ভাত তৃতীয়া তৎপুরুষও হইবে) দুধ মিশ্রিত সাবু দুধসাবু (দুধসহ সাবু তৃতীয়া তৎপুরুষও হয় : সিংহ চিহ্নিত আসন, সিংহাসন ; মনি রাখিবার ব্যাগ মনিব্যাগ ; ভ্যানিটি প্রকাশ করে যে ব্যাগ, ভ্যানিটিব্যাগ ; সিঁদুর রাখিবার কৌটা, সিঁদুরকৌটা : (শ্বশুরের) ঘরে থাকে যে জামাই, ঘরজামাই ; হাঁটু ডোবে এমন জল, হাঁটুজল ; মৌ আহরণ করে যে মাছি, মৌমাছি : জ্বর নাশ করে যে বটিকা, জ্বরবটিকা ; টিকিট বিক্রয় করে যে বাবু, টিকিটবাবু ; টানিতে হয় যে পাখা, টানাপাখা ; বস্ত্র নির্মাণের শিল্প, বস্ত্রশিল্প ; আকাশে চলে যে যান, আকাশযান ; তুফানের মত চলে যে মেল, তুফানমেল ; আত্মলিখিত জীবনী, আত্মজীবনী ; রিস্টে পরিবার ওয়াচ, রিস্টওয়াচ।

(উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়)

যাহাকে তুলনা করা যায় তাহা উপমেয়। যাহার সহিত তুলনা করা যায় তাহা উপমান। চাঁদের মত মুখ—এখানে **মুখ উপমেয়, চাঁদ উপমান**। তুলনার মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম (Common Quality) থাকে। চাঁদের সহিত মুখের তুলনায় **সাধারণধর্ম 'লাবণ্য'**।

এইবার উপমান, উপমিত ইত্যাদি সমাসের আলোচনা করা যাইতেছে—

উপমান কর্মধারয়—উপমানকে পূর্বপদ এবং সাধারণ ধর্মকে উত্তরপদ করিয়া সমাস হইলে উপমান কর্মধারয় হয়। যেমন—

কুসুমের মত কোমল, কুসুমকোমল, যুথিকার ন্যায় শুভ্র, যুথিকাশুভ্র ; মিশির মত কালো, মিশ্‌কালো ; গরুর ন্যায় গ্রাস, গোগ্রাস ; ঘনের (মেঘ) ন্যায় শ্যাম, ঘনশ্যাম ; ফুটির ন্যায় ফাটা, ফুটিফাটা ; স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, স্ফটিকস্বচ্ছ : তুষারের মত ধবল, তুষারধবল ; বকের ন্যায় ধার্মিক, বকধার্মিক ; বিড়ালের মত তপস্বী, বিড়ালতপস্বী ; গজের মত মূর্খ, গজমূর্খ ; শশর মত ব্যস্ত, শশব্যস্ত ; ডালিমের ন্যায় রাঙা, ডালিমরাঙা ; সিল্কের ন্যায় মসৃণ, সিল্কমসৃণ।

উপমিত কর্মধারয়—উপমেয়কে পূর্বপদ ও উপমানকে উত্তরপদ করিয়া সমাস হইলে উপমিত কর্মধারয় হয়—যেমন—

পুরুষ সিংহের তুল্য, পুরুষসিংহ : নর শার্দুলের তুল্য, নরশার্দুল ; মুখ চন্দ্রের ন্যায় মুখচন্দ্র ; পদ পল্লবের ন্যায়, পদপল্লব, নয়ন কমলের মত, নয়নকমল ; তনু লতার তুল্য, তনুলতা ; দেহ যষ্টিবৎ, দেহযষ্টি।

বাংলায় উপমানকে পূর্বপদ করিয়াও উপমিত কর্মধারয়ের নিদর্শন আছে। যেমন—

চাঁদের তুল্য মুখ, চাঁদমুখ : সোনা হেন মুখ, সোনামুখ ; ফুলের মত বাতাসা, ফুলবাতাসা ; ফুলের মত বাবু, ফুলবাবু ; চন্দ্রের মত পুলি, চন্দ্রপুলি।

রূপক কর্মধারয়—উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনায় রূপক সমাস হয়। যেমন—

আঁখি রূপ পাখি, আঁখিপাখি ; শোক রূপ অনল, শোকানল ; ভক্তি রূপ সুধা, ভক্তিসুধা ; মন রূপ মাঝি, মনমাঝি ; স্নেহ রূপ ডোর, স্নেহডোর ; ঝড় রূপ কপোতী ঝড়কপোতী ; সভ্যতা রূপ নাগিনী সভ্যতানাগিনী ; সুখরূপ সাগর, সুখসাগর ; দেহ রূপ খাঁচা, দেহখাঁচা ; কীর্তি রূপ ধ্বজা, কীর্তিধ্বজা।

(কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি নিয়ম)

সখি শব্দ স্থানে সখ, যুবন্ স্থানে যুব, রাজন্ স্থানে রাজ, রাত্রি স্থানে রাত্র, মহৎ স্থানে মহা আদেশ হয়। যেমন—

প্রিয়সখ, যুবরাজ, মহারাজ, অহোরাত্র ইত্যাদি। অবশ্য বাংলায় প্রিয়-সখা দিবারাত্রি ইত্যাদি পদ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

অন্য শব্দ স্থানে অন্তর্ আদেশ হয়, এবং উহা পরে বসে। যেমন—অন্য গ্রাম, গ্রামান্তর ; অন্য দেশ, দেশান্তর।

পূর্বাহ্ণ, প্রাহ্ণ, অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, ইত্যাদি শব্দে অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। অন্য শব্দের পরে অহন্ অহ্ন হয় না। যেমন—পরাহ, সপ্তাহ, ইত্যাদি।

৫। বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা উত্তরপদের অর্থ প্রধান না হইয়া অন্য পদের অর্থ প্রাধান্য ঘটে তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন—দশানন ; এখানে দশ বা আনন কোনো পদেরই **অর্থ** প্রধান হইতেছে না, বরং দশ আনন যাহার সেই **রাবণ** পদেরই **অর্থপ্রাধান্য** ঘটিয়াছে।

এইরূপ—

বহু ব্রীহি (ধান্য) যাহার, বহুব্রীহি ; পীত অম্বর যাহার, পীতাম্বর (কৃষ্ণ) ; বজ্র পাণিতে যাহার ; বজ্রপাণি (ইন্দ্র) ; খড়্গ হস্তে যাহার, খড়্গহস্ত বা খড়্গহস্তা ; ত্রি লোচন যাহার ত্রিলোচন (শিব) ; ত্রি নয়ন যাহার, ত্রিনয়নী, ত্রিনয়না (কালী) ; দীর্ঘ বাহু যাহার, দীর্ঘবাহু ; তাল বৎ জঙ্ঘা যাহার, তালজঙ্ঘ ; কণ্ঠ নীল যাহার, নীলকণ্ঠ ; চন্দ্র চূড়ায় যাহার, চন্দ্রচূড় ; কটা চোখ যার, কটাচোখো , বিড়ালের মত অক্ষি যার, বিড়ালাক্ষী ; ডাকাতের মত বুক যাব, ডাকাবুকো ; পয় নাই যার, অপয়া ; দুই নল যাহাতে, দুনলা বা দোনলা ; একগজ পরিমাণ যার, একগজী (গজকাঠি); পাঁচ সের ওজন যার, পসুরী (বাটখারা) ; পাড়ে ফুল আছে যার, ফুলপেড়ে বা ফুলমপেড়ে (কাপড়) ; গোঁফে খেজুর যার, গোঁফখেজুরে (নিতান্ত অলস ; গোঁফে খেজুর মাখিয়া দিলে, তবে চাটিয়া খায়) ; লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাহাকে, লক্ষ্মীছাড়া ; সহ (অভিন্ন) উদয় যাহার, সহোদর ; সম গোত্র যাহার, স'গোত্র ; দুকান কাটা যার, দুকান কাটা ; ধামা ধরে যে, ধামাধরা ; পা চাটে যে, পাচাটা ; (এইগুলি উপপদ তৎপুরুষও হয়) ; পেট সর্বস্ব যাহার, পেট সর্বস্ব।

(বিভিন্ন রূপ বহুব্রীহির উদাহরণ)

ব্যতিহার বহুব্রীহি—ক্রিয়ার পারস্পরিকতা বুঝাইলে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন—হাতে হাতে যে লড়াই, হাতাহাতি ; কানে কানে যে কথা, কানাকানি ; কেশে কেশে আকর্ষণ করিয়া যে কলহ, কেশাকেশি ; মুখের দিকে মুখ করিয়া যে অবস্থান, মুখামুখি ; মুখে মুখে যে তর্ক, মুখামুখি।

সংখ্যা বহুব্রীহি—সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহা সংখ্যা বহুব্রীহি। যেমন—

দশানন (রাবণ)। পঞ্চবটী (স্থান)।
চৌরাস্তা (স্থান)। তেপায়া (আসবাব)।
সেতার (যন্ত্র)। দোনলা (যন্ত্র)।
একঘরে (ব্যক্তি)। চৌচালা (ঘর)।
একচোখো (ব্যক্তি)।

এই সমাসের কয়েকটিকে দ্বিগু সমাসও বলা চলিবে। তবে দ্বিগু বহুব্রীহি বলা চলিবে না, বহুব্রীহি বলিলে সংখ্যা বহুব্রীহি বলিতে হইবে।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি—বহুব্রীহি সমাসের অধিকাংশ উদাহরণই মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি হয়। এইজন্য এই স্বতন্ত্র বিভাগের ততটা প্রয়োজন নাই।

জলগ্রহণ নিষিদ্ধ যাহাতে—নির্জলা (একাদশী)।

পাঁচ সের ওজন যাহার—পসুরি (বাটখারা)।

দুই নল আছে যাহাতে—দোনলা (বন্দুক)।

অলুক্ বহুব্রীহি—কানে তুলসী যাহার, কানেতুলুসে ; হাতে খড়ি দেওয়া হয় যাহাতে, হাতেখড়ি (অনুষ্ঠান) ; গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যাহাতে, গায়েহলুদ (অনুষ্ঠান) ; ইত্যাদি।

অব্যয়, উপসর্গ, সমানার্থক সহযোগে বহুব্রীহি—হা (নাই) অন্ন যখন, হা অন্ন (দুর্ভিক্ষের অবস্থা) ; নি (নাই) জল যাহাতে, নির্জলা ; (উপবাস) ; অল্প আয়ু যাহার, অলপ্পেয়ে ; বে (নাই) হুঁশ যাহার, বেহুঁশ ; সহ (সম) উদর যাহাদের, সহোদর ; স (সম) গোত্র যাহাদের, সগোত্র ; স (সমান) তীর্থ (শিক্ষা) যাহাদের, সতীর্থ ; খ্যাত নাম যাহার, খ্যাতনামা ইত্যাদি।

(বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি নিয়ম)

মহৎ শব্দ স্থানে মহা, অক্ষি শব্দ স্থানে অক্ষ, ধনুস্ শব্দ স্থানে ধন্বন্, নাভি শব্দ স্থানে নাভ (নাম বুঝাইলে), সহ শব্দস্থানে (প্রায়ই) স হয়। যেমন—

মহারাজ ; গবাক্ষ (গো অক্ষি বৎ আকৃতি যাহার) ; বিশালাক্ষ ; (স্ত্রীলিঙ্গে বিশালাক্ষী) ; গাণ্ডীবধন্বা (গাণ্ডীব ধনু যাহার) , পুষ্পধন্বা ; পদ্মনাভ (বিষ্ণুর নাম) ; সবান্ধব (বান্ধবের সহিত বর্তমান যিনি)।

কতক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে ও অন্যত্র ক প্রত্যয় আসে ; যেমন—বিগত পত্নী যাহার, বিপত্নীক ; স্ত্রীর সহিত বর্তমান যিনি, সস্ত্রীক ; অর্থ (উপকার) নাই যাহাতে, অনর্থক ; অন্য মনঃ যাহার, অন্যমনস্ক।

৬। অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীত হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয়ীভাব সমাসের সমস্ত পদটিই অব্যয় হইয়া যায়। এইজন্ম ইহার উত্তর কোনো বিভক্তি সাধারণতঃ যোগ হয় না।

অব্যয়ীভাব সমাস নানা অর্থে হইতে পারে :—

সামীপ্য অর্থে—নগরের সমীপ, উপনগর ; কূলের সমীপ, উপকূল ; অক্ষির সমীপে, সমক্ষে ; অক্ষির অভিমুখে, প্রত্যক্ষে।

সাদৃশ্য অর্থে—দ্বীপের সদৃশ, উপদ্বীপ ; বনের সদৃশ, উপবন ; ভাষার সদৃশ, উপভাষা ; কথার সদৃশ, উপকথা ; মূর্তি সদৃশ, প্রতিমূর্তি।

অভাব অর্থে—ভিক্ষার অভাব, দুর্ভিক্ষ ; বিঘ্নের অভাব, নির্বিঘ্ন ; আমিষের অভাব, নিরামিষ ; ভাতের অভাব, হা-ভাত ; ইত্যাদি।

অভাবার্থক অব্যয়ীভাবকে অনেকক্ষেত্রে নঞ্ তৎপুরুষও বলা চলে।

অনুযায়ী অর্থে—বিধি অনুযায়ী, যথাবিধি ; ইষ্ট অনুযায়ী. যথেষ্ট ; শক্তি অনুযায়ী, যথাশক্তি , ইচ্ছা অনুযারী, যথেচ্ছ।

বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ) অর্থে—দিন দিন, প্রতিদিন ; ঘরে ঘরে, প্রতিঘরে ; জনে জনে, প্রতিজনে বা জনপিছু ; বছর বছর, প্রতিবছর বা ফিবছর ; রোজ রোজ, হররোজ।

ব্যাপ্তি বা সীমা অর্থে—সারা দিন, দিনভর ; জীবন পর্যন্ত, আজীবন বা যাবজ্জীবন ; বাল্য হইতে, আবাল্য ; সমুদ্র অবধি, আসমুদ্র ; আদ্য হইতে উপান্ত পর্যন্ত, আদ্যোপান্ত।

অনু বা পশ্চাৎ অর্থে—গমনের পশ্চাৎ, অনুগমন ; সরণের পশ্চাৎ, অনুসরণ। ন্যূনতা, ক্ষুদ্রতা, অধীনতা অর্থে—উপ (ন্যূন, নিম্ন) যে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ; উপ যে মাতা, উপমাতা বা বিমাতা ; সাব যে ইন্‌স্পেক্টর, সাব ইন্‌স্পেক্টর।

এই সমাসগুলিকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গতও করা চলে।

অনুশীলনী

(ক)

১। সমাস কাহাকে বলে ? সমাস কয় প্রকার ?

২। সন্ধি ও সমাসে পার্থক্য কি ?

নির্দেশ : সমাসে একাধিক পদের মিলন হয়, মিলন হইয়া একপদী ভাব হয়। যেমন—মুনির পুত্র (মুনেঃ পুত্রঃ), মুনিপুত্র (মুনিপুত্রঃ)।

কিন্তু সন্ধিতে দুইটি সন্নিহিত বর্ণের মিলন হয়। যেমন—(সংস্কৃতে) মুনিঃ+যাতি=মুনির্যাতি; এখানে মুনি এবং যাতি এই দুইটি পদ (একটি কর্তৃপদ, অপরটি ক্রিয়াপদ) পৃথকই রহিয়াছে; শুধু একটির শেষ বর্ণ ও অপরটির প্রথম বর্ণের মিলন হইয়াছে।

ব্যাকরণের নিয়ম, সম্ভবস্থলে সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে সন্ধি করিতে হয়। ইহা সংস্কৃতেও নিয়ম এবং বাংলায়ও মোটামুটি ইহাই নিয়ম। তবে বাংলায় সমাস ছাড়া সন্ধি বড় দেখা যায় না। বাংলা ভাষা, বলিতে গেলে, সন্ধির বিরোধী; যেমন—তুমি+এখানে=তুম্যেখানে ইত্যাদি বাংলায় হয় না। শুধু সমাস হইলেই সম্ভবস্থলে বাংলায় সন্ধি হয়।

৩। অলুক্ সমাস কাহাকে বলে?

৪। দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞা লেখ।

বই দেখিয়া উদাহরণ দাও—

মিলনার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব। বিপরীতার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব। বিকল্পার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব। সমার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব।

৫। দ্বন্দ্ব সমাসে কোন শব্দ আগে এবং কোন শব্দ পরে বসিবে এই সম্পর্কে কোনো নিয়ম আছে কিনা আলোচনা কর।

৬। দ্বিগু সমাস কাহাকে বলে? সংখ্যা বহুব্রীহি কাহাকে বলে? 'দশানন' কোন সমাস?

৭। তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা বল, এবং বিভিন্ন তৎপুরুষের উদাহরণ দাও।

৮। নঞ্ তৎপুরুষ কাহাকে বলে। ইহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলা যায় কি?

৯। বই দেখিয়া উদাহরণ দাও—

অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ। অলুক্ চতুর্থী তৎপুরুষ। অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ। অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

১০। উপপদ তৎপুরুষ কি উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

(খ)

১১। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে পার্থক্য কি?

১২। বই দেখিয়া উদাহরণ দাও—

বিশেষণে বিশেষ্যে কর্মধারয়। বিশেষ্যে বিশেষ্যে কর্মধারয়। বিশেষণে বিশেষণে কর্মধারয়। বিশেষণে ও বিশেষণীয় বিশেষণে কর্মধারয়।

১৩। কাঁচামিঠা, সুপ্তোত্থিত, দেবর্ষি—এই পদত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ প্রকার কর্মধারয় বল, এবং ইহাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌টিকে দ্বন্দ্ব সমাসও বলা চলিবে আলোচনা কর।

১৪। কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদের পরনিপাতের উদাহরণ দাও।

১৫। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় কি বুঝাইয়া বল।

১৬। উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় কি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

১৭। উদাহরণ দাও—

ব্যতিহার বহুব্রীহি। সংখ্যা বহুব্রীহি। অলুক্‌ বহুব্রীহি। অব্যয়াদি যোগে বহুব্রীহি।

১৮। অব্যয়ীভাব সমাস কি? বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ীভাবের উদাহরণ দাও।

(গ)

১৯। নিম্নের শব্দগুলিকে পূর্বপদ ও উত্তরপদ রূপে ব্যবহার করিয়া সমস্ত পদ গঠন কর—

অগ্নি। জল। মুখ। সুখ।

ইঙ্গিত ঃ (অগ্নি শব্দকে পূর্বপদ করিয়া) অগ্নিতাপ, অগ্নিশিখা, অগ্নিদগ্ধ, অগ্নিদেব, অগ্নিকাণ্ড, ইত্যাদি। (অগ্নি শব্দকে উত্তরপদ করিয়া) জঠরাগ্নি, মন্দাগ্নি বাড়বাগ্নি, যজ্ঞাগ্নি, ইত্যাদি।

২০। দশটি সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়া একটি নিমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

২১। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল :—

জয়-পরাজয়, অহি-নকুল, ষড়্‌ ঋতু, শতবার্ষিকী, পসুরি (পাঁচসেরী), লক্ষপতি, বয়ঃপ্রাপ্ত, বাগ্‌দত্তা, চিনিপাতা (দই), পোয়াকম, বাক্সপেঁটেরা, ধর্মপত্নী, প্রতিদিন, মেয়েস্কুল, আদ্যোপান্ত, বারমাসী, ঢেঁকিছাটা, গায়েহলুদ, মুখেভাত, জলজয়ন্তী, শ্রীযুক্ত।

২২। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল :—

ডাকমাশুল, নারীপ্রগতি, ঠাকুরপো, ঘোড়ার ডিম, দক্ষিণাপথ, যুধিষ্ঠির, ছেলেধরা, পাড়াবেড়ানী, পিতৃদেব, কাঁচামিঠে, নিমরাজি, সুপ্তোত্থিত, পোড়ারমুখো, তুফানমেল, চন্দ্রমুখ, চন্দ্রমুখী, চন্দ্রপুলি, মুখচন্দ্র, রিষ্টওয়াচ, গজমূর্খ, ডালিমরাঙা।

২৩। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল—

সভ্যতানাগিনী, সপ্তাহ, দোনলা, হাতাহাতি, অনর্থক, সগোত্র, প্রতিমূর্তি, ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট, এককড়ি (নাম), মনমাঝি, তালপুকুর, সোনামুখ, কাঁচকলা, তেলেবেগুনে, সোনায় সোহাগা, ত্রিশূলী (দুইটি সমাস আছে), সোনারতরী, মৌমাছি, যুবরাজ, দম্পতী, ফুলবাবু, ঘিভাত, ছোড়দি, বৌদি, যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

১। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয় দুই প্রকার—কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।

যেমন—কৃ + তব্য = **কর্তব্য** (করা উচিত); কৃ + অনীয় = **করণীয়** (করার যোগ্য : কৃ + ক্ত = কৃত (করা হইয়াছে) ইত্যাদি।

শব্দের উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন—রোগ + আ = রোগা (রোগের ভাবযুক্ত); সূতা + ই = সূতি (সূতার নির্মিত); রাম + আয়ণ = রামায়ণ (রাম বিষয়ে গ্রন্থ) ইত্যাদি।

কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে শব্দ হয়, তাহাকে **কৃদন্ত শব্দ** বলে; এবং তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দকে **তদ্ধিতান্ত শব্দ** বলে। কৃদন্ত শব্দের সহিত কারক বিভক্তি যুক্ত করিয়া কৃদন্ত পদ গঠিত হয় এবং তদ্ধিতান্ত শব্দের সহিত কারক বিভক্তি যোগে তদ্ধিতান্ত পদ গঠিত হয়।

২। বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

১। **শূন্য প্রত্যয়**—অনেক সময় বিনা প্রত্যয়ে ধাতুমাত্র দ্বারাও শব্দ গঠিত হয়। যেমন—বেদম **মার্**, পথের **ঘুর্**, জামার **ঝুল্**, দোলনার **দোল্**, ছুঁচের **ফোঁড়**, ইত্যাদি।

২। **অ প্রত্যয়**—আসন্নতা বা প্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—যাব যাব, নিব নিব, পড় পড় ইত্যাদি।

আসন্নতা ইত্যাদি অর্থে অ প্রত্যয় প্রায়ই দ্বৈত শব্দে ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন স্থানে এই প্রত্যয় ও, উ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কাঁদো কাঁদো, নিবু নিবু। দ্বৈত শব্দ ব্যতীত, হ + বু = হবু (হবু জামাই) ইত্যাদি।

৩। **অত, অতা, অতি, তি, তা**—মানত, বসত, ফিরতি, ফেরত, ফেরতা, ফিরতি, উঠতি, পড়তি, ভরতি, বাড়তি, চলতি, গুণতি, জান্তা (জান + তা)। এইগুলি প্রায়ই ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়।

৪। **অন, অনি, উনি,**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে চলন, বলন, বহন, সহন, বাজন, পোড়নি, চাহনি, ঝাঁকুনি কাঁপুনি, ইত্যাদি।

প্রেরণার্থক ধাতুতে চালান, বলান, কহান ইত্যাদি।

নামধাতুতে হাতান, জুতান ইত্যাদি।

(৫) **অনা, না,**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে কাঁদ্+অনা (অথবা না)= কান্না, রাঁধ+অনা=(অথবা না)=রান্না, এইরূপ বাটনা, কুটনা বস্তুবাচক বিশেষ্য গঠনে ঢাকনা (যাহা দিয়ে ঢাকে) ; ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে দেনা, (debt দিবার অবস্থা, বিষয়) ; পাওনা (পাইবার অবস্থা বা বিষয়) ; বিশেষণ গঠনে শুখনা ইত্যাদি।

(৬) **অনি, উনি, উনী, নি নী**—বিশেষ্য গঠনে ছাঁক্+অনি(অথবা নি) =ছাঁকনি ; ঢাক্+আনি (অথবা নি)=ঢাকনি ; এইরূপ রাঁধুনি, নাচুনী, বেড়ানী (পাড়াবেড়ানী) ইত্যাদি।

(৭) **অন্ত প্রত্যয়**—কোন কাজ চলিতেছে অর্থে (সংস্কৃত শতৃ শাণচের অর্থে) বাংলায় অন্তপ্রত্যয় হয়। চলন্ত, পড়ন্ত, ফুটন্ত, বাড়ন্ত ইত্যাদি।

(৮) **আ প্রত্যয়**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ধরা, পড়া, করা, রাঁধা ইত্যাদি। অন্যান্য বিশেষ্য বা বিশেষণ (ছেলে) ধরা, রাঁধা (ভাত), কাচা (কাপড়), ধোয়া (চাল) ইত্যাদি।

(৯) **আই প্রত্যয়**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে, যাচাই, বাছাই, বাঁধাই, খোদাই, সেলাই, চোলাই ; বস্তুবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণাদি গঠনে পচাই (মদ) ইত্যাদি।

(১০) **আইত, আত**—ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য গঠনে, ডাক্+আইত, আত =ডাকাইত, ডাকাত।

(১১) **আও, আউ**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে, চড়াও, ঘেরাও, ফলাও, ঢালাও পাকড়া+আও=পাকড়াও ; অবস্থাবাচক বিশেষ্য গঠনে বনিবনাও ইত্যাদি।

(১২) **আরী, আরি, উরী, উরি, উরে**—বস্তু বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য গঠনে কাট্+আরী=কাটারি, কাটারী ; ডুব+আরী ; উরী=ডুবারী, ডুবুরী, ধুন্+আরী ; উরী ধুনারী, ধুনুরী।

(১৩) **ই প্রত্যয়**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে হাসি, কাশি, ফাঁসি, ডুবি (নৌকাডুবি) ইত্যাদি।

বিশেষ্য বা বিশেষণে বেড়ি, ছুটি (ছুট্ অর্থাৎ বিরতি, মুক্তি ইত্যাদি ভাবে), চুমকি (চুমুক দিয়া পান করিবার পাত্র), চুষি ইত্যাদি।

ব্যতিহার অর্থে জানাজানি, কানাকানি, হানাহানি ইত্যাদি।

(১৪) **ইয়ে প্রত্যয়**—ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য গঠনে খাইয়ে, গাইয়ে, খেলিয়ে, পড়িয়ে, বলিয়ে, নাচিয়ে ইত্যাদি।

(১৫) **উ, উয়া, পোড়ো, ও**—ব্যক্তি বা বস্তুবাচক বিশেষ্য গঠনে পড়ুয়া, পোড়ো (পোড়ো ছেলে), (পোড়ো জমি), উড়ো (উড়ো পাখী, জাহাজ), খেলু (খেড়ু) ইত্যাদি।

(১৬) **ক, অক, উক, উকা**—বস্তু অবস্থা ইত্যাদি বাচক বিশেষ্য গঠনে মোড়ক, দোলক, বৈঠক, মড়ক (মর্ ধাতু+অক), মিশুক, ঠুনকা ইত্যাদি।

(১৭) **কা, কি, কী, কো**—বস্তুবাচক বিশেষ্য গঠনে এই প্রত্যয়গুলি প্রায়ই ধ্বন্যাত্মক ধাতুর সঙ্গে হয়, যেমন—ছেঁচকি (ছেঁচ ধ্বন্যাত্মক ধাতু+কি), পটকা, হুড়কা, (হুড়কো), ফোসকা, সড়কি, চুমকি।

(১৮) **সংস্কৃত তব্য প্রত্যয়**—বাংলা ধাতুর সহিতও সংস্কৃত উচিতার্থক তব্য প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন—কহতব্য (বাংলাধাতু কহ + সংস্কৃত প্রত্যয় তব্য), সহতব্য ইত্যাদি।

(১৯) **সংস্কৃত ত, ইত, (ক্ত) প্রত্যয়**—বাংলা ধাতুর সহিতও অতীতে সম্পন্ন অর্থে সংস্কৃত 'ত, ইত প্রত্যয়েরও কয়েকটি নিদর্শন আছে। যেমন—করিত-কর্মা (করিত=বাংলা ধাতু কর্+ইত); জানিত লোক (জানিত = বাংলা ধাতু জান্+ইত) ইত্যাদি। এইরূপ (সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ) বাংলা প্রয়োগ আহরিত, দংশিত, ইচ্ছিত, নমিত, খনিত, অনুবাদিত ইত্যাদি। (সংস্কৃতে বা তৎসম বাংলায় এই প্রয়োগগুলি যথাক্রমে আহৃত, দষ্ট, ইষ্ট, নত, খাত, অনূদিত হইবে।)

৩। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের সহিত কতকগুলি অতিরিক্ত বর্ণ থাকে। এই বর্ণগুলি শব্দ গঠনকালে পরিত্যক্ত হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহাদিগকে ইৎ বলে। ইৎ গেলে প্রত্যয়ের যে স্থায়ীভাগ থাকে তাহা ধাতু ইত্যাদির সহিত যুক্ত হয়। যেমন—কৃ+ক্ত=কৃত, এস্থলে কৃ ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয় যোগ হইয়াছে। প্রত্যয়ের ক ইৎ যায়, স্থায়ীভাগ ত থাকে, এইভাবে কৃত শব্দ পাওয়া গেল।

(অচ্ অন্ ইত্যাদি প্রত্যয়)

সংস্কৃতে—**অচ, অণ, অপ্, ক, খচ্, খট্ খশ্, ঘঞ্, ট, ড, শ** ইত্যাদি প্রত্যয়ে মাত্র অ থাকে, বাকী অংশ ইৎ যায়। এইজন্য কোনো কোনো বৈয়াকরণ এই প্রত্যয়গুলিকে বাংলায় অ প্রত্যয় বলিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

(১) **অ, অচ্**—নন্দ্+অচ্=নন্দ (আনন্দ দেয় যে), চর্+অচ =

চর (চরে যে), ভূ + ধৃ + অচ = ভূধর (ভূ ধারণ করে যে), রোগ + হৃ + অচ্ = রোগহর (রোগ হরে যে), পূজা + অর্হ্ + অচ্ = পূজার্হ (পূজার যোগ্য), নিন্দা + অর্হ্ + অচ্ = নিন্দার্হ (নিন্দার যোগ্য)।

(২) অ (অণ্, ণ্ ইৎ)—কুম্ভ + কৃ + অণ্ = কুম্ভকার (কুম্ভ করে যে), সূত্র + ধৃ + অণ্ = সূত্রধার (সূত্র ধরে যে) ইত্যাদি।

(৩) অ (অপ্, প্ ইৎ)—ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে স্পৃশ্ + অপ্ = স্পর্শ, ভূ + অপ্ = ভব, স্তু + অপ্ = স্তব, নি + যম্ + অপ = নিয়ম ইত্যাদি।

(৪) অ (ক, ক্ ইৎ)—জল + দা + ক = জলদ (জল দান করে যে), গৃহ + স্থা + ক = গৃহস্থ (গৃহে থাকে যে), স (সমান) + দৃশ + ক = সদৃশ (দেখিতে সমান যে), সর্ব + জ্ঞা + ক = সর্বজ্ঞ (সব জানে যে) ইত্যাদি।

(৫) অ (খচ্—খচ্ ইৎ)—স্বয়ং + বৃ + খচ্ = স্বয়ংবরা (স্বয়ং বরণ করে যে, স্ত্রীলিঙ্গে আ), অসূর্য + দৃশ্ + খ = অসূর্যম্পশ্যা (সূর্য দেখে নাই যে, স্ত্রীলিঙ্গে আ), যুগ + ধৃ + খ = যুগন্ধর (যুগকে ধারণ করে যে), ধুর + ধৃ + খ = ধুরন্ধর (ধুর বা ভার ধারণ করে যে, কখনও নিন্দার্থে), ভূজ + গম্ + খ = ভুজঙ্গ (ভুজ অর্থাৎ বক্রভাবে গমন করে যে), পত + গম্ + খ = পতঙ্গ (পত বা পাখা দ্বারা গমন করে যে), ইত্যাদি।

(৬) অ (খট্—খট্ ইৎ)—শুভ + কৃ + খট্ = শুভঙ্কর (শুভ করে যে), ভয় + কৃ + খট্ = ভয়ঙ্কর (ভয় জন্মায় যে), ক্ষেম + কৃ + খট্ = ক্ষেমঙ্কর) মঙ্গল করে যে) ইত্যাদি।

(৭) অ (খ্য—খ্য্ ইৎ)—পণ্ডিত + মন্ + খ্য = পণ্ডিতম্মন্য (নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে) ; কৃতার্থ + মন্ + খ্য = কৃতার্থম্মন্য (নিজেকে যে কৃতার্থ মনে করে) ইত্যাদি।

(৮) অ (ঘঞ্—ঘ্ ঞ্ ইৎ)—প্রায়ই ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন—শুচ্ + ঘঞ্ = শোক (শোচনার ভাব), নশ্ + ঘঞ্ = নাশ (নষ্ট করার ভাব), বি + বহ্ + ঘঞ্ = বিবাহ (বিশেষরূপে বহন করার ভাব), বস্ + ঘঞ্ = বাস (বসতির ভাব, যেমন কারাবাস) ইত্যাদি।

এই প্রত্যয় বস্তু, বিষয় ইত্যাদি অর্থও প্রকাশ করে। যেমন—বস্ + ঘঞ্ = বাস (গৃহ), যজ + ঘঞ্ = যাগ (যজ্ঞ), অদ্ + ঘঞ্ = ঘাস (যাহা খাওয়া যায়) পঠ্ + ঘঞ্ = পাঠ (lesson) ইত্যাদি।

(৯) অ (ট্—ট্ ইৎ)—দিবা + কৃ + ট = দিবাকর (দিবা করে যে),

জল+চর্+ট=জলচর (জলে চরে যে), খে+চর্+ট=খেচর (খে অর্থাৎ আকাশে চরে যে), ভাঃ+কৃ+ট=ভাস্কর (আলো করে যে)।

হেতু অনুকূল ইত্যাদি অর্থেও এই প্রত্যয় হয়। যেমন, শোক+কৃ+ট= শোককর (শোকের কারণ, causing grief), পুষ্টি+কৃ+ট=পুষ্টিকর (পুষ্টির অনুকূল) ইত্যাদি।

(১০) অ (ড—ড্ ইৎ)—পঙ্ক+জন্+ড=পঙ্কজ (পঙ্কে জন্মে যে, মনসি+জন্+ড=মনসিজ (মনে জন্ম যার, কামদেব), মনঃ+জন্+ড= মনোজ (মনে জন্ম যার, কামদেব), অগ্র+জন্+ড=অগ্রজ (অগ্রে জন্ম যে) পত+গম্+ড=পতঙ্গ (পত বা পাখাতে গমন করে যে), বিহায়স্+গম্+ড= বিহঙ্গ (বিহায়স্ বা আকাশে গমন করে যে), ত্বরা+গম্+ড=তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম্ (ত্বরায় গমন করে যে, অশ্ব)।

গম্ ধাতুতে বিকল্পে খচ্ প্রত্যয়ও হয়, পূর্বে খচ্ প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

(তব্য, অনীয়, য)

(১১) **তব্য, অনীয়**—উচিত, যোগ্য বা ভবিষ্যতে ঘটিবে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—কৃ+তব্য=কর্তব্য, গম্+তব্য=গন্তব্য, দৃশ+তব্য= দ্রষ্টব্য, পূজি+তব্য=পূজিতব্য, ভূ+তব্য=ভবিতব্য (যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, ইত্যাদি।

বাংলায় তব্য প্রত্যয় দ্বারা **সহতব্য, কহতব্য** প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এইগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নহে, তবে কথ্য বাংলায় বহুল প্রচলিত। এইরূপ আর একটি প্রয়োগ **দাতব্য** (চিকিৎসালয়); দা ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে **য** প্রত্যয় হইয়া **দেয় হয়; দাতব্য** সংস্কৃত শব্দ নহে, তব্য প্রত্যয় দ্বারা গঠিত বাংলা শব্দ। ইহা কথ্য লেখ্য উভয় বাংলায়ই চলে।

কৃ+অনীয়=করণীয়, দৃশ+অনীয়=দর্শনীয়, পূজি+অনীয়=পূজনীয়, অর্চ+অনীয়=অর্চনীয়, পা+অনীয়=পানীয়, শুচ্+অনীয়=শোচনীয়, রম্+অনীয়=রমণীয় ইত্যাদি।

(১২) য—ঔচিত্য, যোগ্যতা সক্ষমতা ইত্যাদি অর্থে য প্রত্যয় হয়। যেমন— ভুজ্+য=ভোগ্য (ভোগ করার যোগ্য), ত্যজ+য=ত্যাজ্য (ত্যাগ করার যোগ্য), বুধ্+য=বোধ্য (যাহা বোঝা যায়), ভিদ্+য=ভেদ্য (যাহা ভেদ করা সম্ভব), পা+য=পেয় (পান করার যোগ্য), নী+য=নেয় (নেওয়ার যোগ্য), কৃ+য=

কার্য (যাহা করা হয়), হাস্+য=হাস্য (হাসির কার্য), মন্+য=মান্য (মাননার যোগ্য) ইত্যাদি।

বাংলায় তব্য প্রত্যয়ের মত অনীয় প্রত্যয়েরও কিছু যথেচ্ছ প্রয়োগ আছে। যেমন—লক্ষ্যণীয় গ্রাহ্যনীয় ইত্যাদি। এই সকল শব্দে ধাতুর উত্তর একবার য প্রত্যয় যোগে লক্ষ্য, গ্রাহ্য ইত্যাদি শব্দ করা হইয়াছে, পুনরায় অনীয় প্রত্যয় যোগে লক্ষণীয়, গ্রাহ্যনীয় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োগগুলিকে বাংলায়ও ভুলই বলিতে হইবে। কারণ ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় দুইবার হয় না।

(শতৃ, শানচ্)

Present Participles

হইতেছে, চলিতেছে এইরূপ অর্থে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর শতৃ এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ্ হয়। যেমন—

(১৩) **অৎ (শতৃ—শ্ ঋ্ ইৎ)**—চল্+শতৃ=চলৎ (চলচ্চিত্র, চলচ্ছবি, চলচ্ছক্তি, বিদ্+শতৃ=বিদ্বস্ (বিদ্বান্)।

শতৃ প্রত্যয়ের বিশেষ কোন শব্দ বাংলায় নাই। শতৃ প্রত্যয়ে স্থায়ীভাগ অৎ কে বাংলায় অন্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাংলায় সংস্কৃত ধাতু ও বাংলা ধাতু উভয়ের সঙ্গেই অন্ত প্রত্যয় ব্যবহার হয়। যেমন—সংস্কৃত চল্+অন্ত=চলন্ত, সংস্কৃত ধাব্+অন্ত=ধাবন্ত ; বাংলা ছুট্+অন্ত=ছুটন্ত, বাংলা পড়্+অন্ত=পড়ন্ত, চল+অন্ত=চলন্ত ইত্যাদি।

(১৪) **আন, মান, ঈন (শানচ্, শ চ্ ইৎ)**—সেব্+শানচ= সেবমান (যে সেবা পাইতেছে), সেব্যমান (যে সেবা করিতেছে), দীপ্+শানচ =দীপ্যমান ; মৃ+শানচ্=ম্রিয়মান, বহ+শানচ্=বহমান, বৃধ্+শানচ্= বর্ধমান, বিদ্+শানচ্=বিদ্যমান, কৃ+শানচ্=ক্রিয়মান, শী+শানচ্=শয়ান, আস্+শানচ্=আসীন ইত্যাদি।

শানচ্ প্রত্যয় শুধু সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। খাঁটি বাংলা ধাতুর সঙ্গে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। তবে চল্ ধাতু সংস্কৃতে পরস্মৈপদ হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় ইহার সহিত শানচ্ ব্যবহার হয়। যেমন—চল্+মান (শানচ্) =চলমান (চলমান জীবন)।

(১৫) **ইষ্ণু প্রত্যয়**—হইতেছে বা হওয়া স্বভাব এইরূপ অর্থে ইষ্ণু হয়। যেমন—

চল্+ইষ্ণু=চলিষ্ণু, বৃধ+ইষ্ণু=বর্ধিষ্ণু, সহ্+ইষ্ণু=সহিষ্ণু, ক্ষি+ইষ্ণু =ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি।

(ক্ত প্রত্যয়)

(১৬) **ত (ক্ত—ক ইৎ)**—ধাতুর উত্তর ক্রিয়াসমাপ্তি অর্থে ত (ক্ত) প্রত্যয় হয়। যেমন—

গম্+ক্ত=গত, ক্রী+ক্ত=ক্রীত, গ্রস্+ক্ত=গ্রস্ত, আ+নী+ক্ত= আনীত, স্না+ক্ত=স্নাত, পা+ক্ত=পীত, নিন্দ্+ক্ত=নিন্দিত, কম্প্+ক্ত= কম্পিত, মুহ+ক্ত=মুগ্ধ, মূঢ়, ভিদ্+ক্ত=ভিন্ন, ছিদ্+ক্ত=ছিন্ন ইত্যাদি।

(ণক, তৃচ, অন, অনট্, ণিন্, ক্তিন্)

(১৭) **অক (ণক—ণ ইৎ)**—গৈ+ণক=গায়ক, কৃষ্+ণক=কৃষক, দৃশ্+ণক=দর্শক, দা+ণক=দায়ক, নী+ণক=নায়ক, হন্+ণক=ঘাতক ইত্যাদি।

(১৮) **তৃ (তৃচ, তৃন্—চ, ন্ ইৎ)**—দা+তৃন্=দাতৃ (দাতা), কৃ+তৃন্=কর্তৃ (কর্তা), নী+তৃন্=নেতৃ (নেতা), যুধ্+তৃন্=যোদ্ধৃ (যোদ্ধা), পালি+তৃন=পালয়িতৃ (পালয়িতা), সূ+তৃন্=সবিতৃ (সবিতা), হন্+তৃন্= =হন্তৃ (হন্তা) ইত্যাদি।

(১৯) **অন**—নন্দি+অন=নন্দন (যে আনন্দ দেয়), মদি+অন=মদন (যে মত্ততা আনে), সূদি+অন=সূদন (যে বধ করে, যেমন—মধুসূদন), তপ্+অন=তপন (যে তাপ দেয়)

(২০) **অন (অনট্—ট্ ইৎ)**—কৃ+অনট্=করণ, স্মৃ+অনট্=স্মরণ, মস্জ্+অনট্=মজ্জন, পত্+অনট্=পতন, ভুজ+অনট্=ভোজন, (আহার ক্রিয়া, যেমন ভোজন করা; এবং আহারের বস্তু, যেমন নিষিদ্ধ ভোজন), দৃশ+অনট্=দর্শন, (দেখবার ক্রিয়া, যেমন—দর্শন লাভ এবং দেখার বিষয়, যেমন—সুদর্শন যুবক), শী+অনট্=শয়ন (শুইবার কাজ, যেমন—শয়ন কর; এবং শুইবার আধার, যেমন—কোমল শয়ন) ইত্যাদি।

(২১) **ইন্ (ণিন্—ণ ইৎ)**—পা+ণিন্=পায়িন্ (পায়ী), জীব+ণিন্ =জীবিন্ (জীবী), সেব্+ণিন্=সেবী, সত্য+বদ্+ণিন্=সত্যবাদী ইত্যাদি।

(২২) **তি (ক্তিন্—ক্ ন্ ইৎ)**—এই প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। ভী+ক্তিন্=ভীতি, শ্রু+ক্তিন্=শ্রুতি, খ্যা+ক্তিন্=খ্যাতি,

গম্+ক্তিন্=গতি, স্থা+ক্তিন্=স্থিতি, স্বপ্+ক্তিন্=সুপ্তি, শ্রম+ক্তিন্=শ্রান্তি, বৃষ্+ক্তিন্=বৃষ্টি, বচ্+ক্তিন্=উক্তি ইত্যাদি।

(র, বর, উর, আলু)

শীলার্থ প্রত্যয়

(২৩) **র, বর, উর, আলু**—এই প্রত্যয় কয়েকটি শীল বা স্বভাব বুঝাইতে ব্যবহার হয়। যেমন—

হিন্স্+র=হিংস্র (হিংসা করা স্বভাব যাহার), নশ্+বর=নশ্বর (নাশ হওয়া স্বভাব যাহার), ভাস্+বর=ভাস্বর (উজ্জ্বলভাবে শোভা পাওয়া স্বভাব যাহার), স্থা+বর=স্থাবর (স্থিত থাকা স্বভাব যাহার), ভঙ্গ+উর=ভঙ্গুর (ভাঙ্গিয়া যাওয়া স্বভাব যাহার), মিদ্+উর=মেদুর, (মৃদুতা স্বভাব যাহার) দয়্+আলু=দয়ালু (দয়া করা স্বভাব যাহার), নি+দ্রা+আলু=নিদ্রালু (নিদ্রা স্বভাব যাহার) ইত্যাদি।

(সনন্ত ধাতুর উত্তর উ, আ)

(২৩) **সন্—উ, আ** সনন্ত ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে উ, আ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—পা+সন্=পিপাস্+উ=পিপাসু, (যে পান করিতে চায়), পিপাস্+আ=পিপাসা (পানের ইচ্ছা); জ্ঞা+সন্=জিজ্ঞাস্+উ=জিজ্ঞাসু (যে জানিতে চায়), জিজ্ঞাস্+আ (জানিবার ইচ্ছা); ভুজ+সন্=বুভুক্ষ্+উ=বুভুক্ষু (যে খাইতে চায়), বুভুক্ষ্+আ=বুভুক্ষা; চিকীষ+সন্=চিকীর্ষ্+উ=চিকীর্ষু (যে করিতে চায়), চিকীর্ষ্+আ=চিকীর্ষা (করিবার ইচ্ছা) ইত্যাদি।

৪। বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় একবার মাত্র যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর একাধিকবারও হয়। যেমন—কানু+আই=কানাই; আবার কানাই+য়া=কানাইয়া।

(১) **অ প্রত্যয়**—বাংলায় অ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের বড় প্রয়োজন হয় না। অনুকার শব্দের উত্তর কচিৎ অ প্রত্যয় যোগে বিশেষণ হয়। যেমন—কট্মট্+অ=কটমট (কটমট ভাষা), টল্মল্+অ=টলমল (টলমল নৌকা) ইত্যাদি।

(২) **আ প্রত্যয়**—আ প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

(ক) অনাদরে বা অত্যাদরে—কেষ্ট + আ = কেষ্টা, সুবল + আ = সুবলা, বামন + আ = বাম্‌না, চোর + আ = চোরা।

(খ) বিশালার্থে—খন্তা, বড়া, ডিঙা (তুলনীয় ক্ষুদ্রার্থক খন্তি, বড়ি, ডিঙ্গি)।

(গ) আছে অর্থে—তেল + আ = তেলা, গোদ + আ = গোদা, নুন + আ = নোনা, রোগ + আ = রোগা, রঙ্‌ + আ = রঙা, রাঙা।

(ঘ) স্বার্থে (স্ব অর্থে, অর্থ পরিবর্তন না করিয়া)—পাগল + আ = পাগলা, গোয়াল + আ = গোয়ালা, ভোমর + আ = ভোমরা, অমিয় + আ = অমিয়া।

(ঙ) সদৃশ অর্থে—বাঘ + আ = বাঘা (বাঘের মতন ভীষণ), হাত + আ হাতা (হাতের মত বস্তু—জামার হাতা, রাঁধিবার হাতা), কদম + আ = কদমা (কদম ফুলের মত খাদ্য)।

(চ) উৎপন্ন বা আগত অর্থে—ভৈষ (মহিষ) + আ = ভয়ষা, পশ্চিম + আ = পশ্চিমা, দক্ষিণ + আ = দক্ষিণা, চীন + আ = চীনা।

(ছ) বৃত্তি বা জীবিকা অর্থে—চাষ + আ = চাষা, ধোপ + আ = ধোপা।

(২) **আই প্রত্যয়**—

(ক) আদরার্থে—কান + আই = কানাই, বল + আই, নি + আই = নিমাই নিত + আই = নিতাই।

(খ) বিশেষণার্থক—পাটনা + আই = পাটনাই, ঢাকা + আই = ঢাকাই, মোগল + আই = মোগলাই, চোর + আই = চোরাই (মাল)।

(গ) বস্তুবাচক বিশেষ্য—মিঠা + আই = মিঠাই, চাট + আই—চাটাই, পুষ্ট + আই = পোষ্টাই।

(ঘ) ভাববাচক বিশেষ্য—চেকন + আই = চেকনা, চওড়া + আই = চওড়াই, সাফ + আই = সাফাই, বড় + আই = বড়াই, বামন + আই = বামনাই।

(ঙ) সম্পর্কবাচক শব্দে লিঙ্গ পরিবর্তনে—জাম + আই = জামাই, ননদ + আই = নন্দাই, বোন + আই = বোনাই, জেঠা + আই = জেঠাই (জেঠীমা)।

(৪) **আইত, আয়েত, আত**—বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। সেবা + আইত = সেবাইত, সেবায়েত; সঙ্গ + আত = স্যাঙাত, পো + আত = পোয়াতী (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)।

(৫) **আনা, আনি***—ভাব, ধর্ম ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়। বাবু + আনা,

* ফার্সীতেও আনা প্রত্যয় আছে। বিদেশী প্রত্যয়ের আলোচনায় তাহা বলা হইবে। উপরের দৃষ্টান্তগুলি সংস্কৃত বৎ (বান, মন্ত) প্রত্যয়জাত।

আনি = বাবুয়ানা, বাবুয়ানি ; মুন্‌শী + আনা, আনি = মুন্‌শীআনা, মুন্‌শীআনি, হিঁদু + আনা,আনি = হিঁদুআনা,হিঁদুআনি ; বিবি + আনা, আনি = বিবিয়ানা, বিবিআনি ; সাহেব + আনা = সাহেবানা, সাহেবানি (সাহেবিআনাও চলিতেছে)

(৬) **আম, আমি (ম, মি, উমি, ওমি)**—ভাব, ধর্ম ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়। জেঠা + আম, আমি = জেঠাম, জেঠামি ; বুড়া + আম, আমি = বুড়াম, বুড়ামি ; ঠক + আম, আমি = ঠকাম ঠকামি ; নেকা + আম, আমি = নেকাম, নেকামি ; বাঁদর + আম, আমি = বাঁদরাম, বাঁদরামি ; দুষ্ট + আম, আমি = দুষ্টাম, দুষ্টামি ; পাজি + আম, আমি = পেজোম, পেজোমি ; ঘর + আমি = ঘরামি (ঘর তৈরী করে যে, ব্যক্তিবাচক)।

আর, আরি, (আরি ইরি, উরি)

(ক) আত্মীয়তা অর্থে—ঝি + আরী = ঝিয়ারী ; বহু + রি = বহুড়ি ; পূর্ববঙ্গে কন্যা + রি = কন্যারী (প্রায়ই ঝিয়ারিকন্যারি যুগ্মশব্দে ব্যবহার হয়)।

এই দৃষ্টান্ত গুলিতে কিছুটা সাদৃশ্যের ভাবও আছে। যেমন—ঝিএর তুল্য ঝিয়ারী, কন্যার তুল্য কন্যারী ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে আদরার্থক প্রয়োগও আছে। যেমন, পিয় (প্রিয়) + আরি = পিয়ারী, প্যারী। আবার কোথাও কোথাও ভাববাচক প্রয়োগও আছে, যেমন—মাঝের ভাবযুক্ত মাঝরি মাঝরি ইত্যাদি।

(খ) বৃত্তিজীবি অর্থে—ভিখ + আরি = ভিখারী ; শাঁখ + আরী = শাঁখারী ; জুয়া = আরী + জুয়ারী : চাম + আর = চামার (চামারি বলিলে চামারের ভাব বুঝাইবেন) ; কাঁস + আরি = কাঁসারী ইত্যাদি।

অধিকারী বা কর্তা অর্থে ইহার ব্যবহার আছে ; যেমন—ভাঁড় + আরী = ভাঁড়ারী ; কাণ্ড + আরী = কাণ্ডারী ইত্যাদি।

(৮) **আল, আলি, (আলী, উলি, লি)**

(ক) অধিবাসী অর্থে—বঙ্গ + আল = বঙ্গাল (পূর্ববঙ্গবাসী, প্রায়শঃ হীনার্থে), বঙ্গ + আলি = বাঙ্গালী ; কাশী + আল = কাশীয়াল ; কেশেল (কাশীবাসী দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ)।

(খ) ভাব, স্বভাব ইত্যাদি অর্থে—দুধ + আল = দুধাল, তেজ + আল = তেজাল ; শাঁস + আল = শাঁসাল ; জাঁক + আল = জাঁকাল, জাঁকালো : জমক + আল = জমকাল, জমকালো ; ঝাঁঝ + আল = ঝাঁঝাল, ঝাঁঝালো ; নাগর + আলি = নাগরালি, চতুর + আলি = চতুরালি ; ঠাকুর + আলি =

ঠাকুরালী ; মেয়ে+লি=মেয়েলি ; সোনা+লি=সোনালী ; গৃহস্থ+আলি= গৃহস্থালী ; আধ+উলি=আধুলি (বস্তু বাচক)।

(গ) বৃত্তিজীবী অর্থে—কুঠি+আল=কুঠিয়াল ; লাঠি+আল=লাঠিয়াল ; রাখ+আল=রাখাল ; গো+আল=গোয়াল।

আল প্রত্যয়ের সম্প্রসারণে আলা, যেমন, গো+আলা=গোয়ালা। তৎসহ হিন্দী বালা (ওয়ালা) প্রত্যয়ের প্রভাবে দইআলা, দইওয়ালা ; বাড়ীআলা, বাড়ীওয়ালা ; পাহারাওলা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে ওয়ালী, যেমন—বাড়ীওয়ালী, দুধওয়ালী, ঘুঁটেওয়ালী ইত্যাদি।

(৯) ই, ঈ প্রত্যয়—

(ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে—উমেদার+ই=উমেদারী, বাহাদুর+ই =বাহাদুরি, চালাক+ই=চালাকি, বদমাইস+ই=বদমাইসি, ছেলেমানুষ+ই =ছেলেমানুষি, আমীর+ই=আমীরী।

(খ) বৃত্তি, ব্যবসায় ইত্যাদি অর্থে—মাষ্টার+ই=মাষ্টারি, ডাক্তার+ই =ডাক্তারি, দালাল+ই=দালালি, চাকর+ই=চাকৃরি ; কবিরাজ+ই =কবিরাজী, টিউসন (tuition)+ই=টিউসনী, জজ+অত (ফার্সী)+ই= জজিয়তী, উকিল+অত (ফার্সী)+ই=ওকালতী।

(গ) বৃত্তিজীবী, কার্যদক্ষ, প্রবণতা বিশিষ্ট ইত্যাদি অর্থে—ঢাক+ঈ= ঢাকী, ঢোল+ঈ=ঢুলী, চা+ঈ=চাষী, বারু+ঈ=বারুই (বারু=পান), দপ্তর+ঈ=দপ্তরী, আলাপ+ঈ=আলাপী, রাগ+ঈ=রাগী, মেজাজ+ঈ= মেজাজী, ভাণ্ডার+ঈ=ভাণ্ডারী, হিসাব+ঈ=হিসাবী, এস্রাজ+ঈ=এস্রাজী সেতার+ঈ=সেতারী।

(ঘ) আগত, উৎপন্ন সম্পর্কযুক্ত অর্থে—দেশ+ঈ=দেশী, দিশি, বেনারস+ঈ=বেনারসী, পাটনা+ই=পাটনাই, বৃন্দাবন+ঈ=বৃন্দাবনী, রাঢ়+ঈ=রাঢ়ী, রেশম+ঈ=রেশমী, পশম+ঈ=পশমী, সূতা+ঈ=সূতী, সুতি, জাহাজ+ঈ=জাহাজী, দক্ষিণ+ঈ=দক্ষিণী, পশ্চিম+ঈ=পশ্চিমী, খোদা+ই=খোদাই, (খোদাই খাসি, খোদাই গজব)।

(ঙ) কোন গুণে গুণান্বিত অর্থে—দাগ+ঈ=দাগী, দাম+ঈ=দামী, ভার+ঈ=ভারী, তেজ+ঈ=তেজী, দরকার+ঈ=দরকারী।

বর্ণাদির ভাব বুঝাইতে গোলাপ+ঈ=গোলাপী, গোলাপি, বেগুন+ঈ=

বেগুনী, বেগুনি ; জাফরান+ঈ=জাফরানী, জাফরানি ; কুসুম+ঈ=কুসুমী, কুসুমি ; বাদাম+ঈ=বাদামী, বাদামি।

বিশেষ ভাবযুক্ত উপহারাদিতে—প্রণাম+ঈ=প্রণামী, সেলাম+ঈ= সেলামী, দর্শন+ঈ=দর্শনী, আশীর্বাদ+ঈ=আশীর্বাদী।

বাদ্যযন্ত্রাদিতে—(ধ্বনির অনুকরণে) ডুগ্‌ডুগ্‌+ই=ডুগডুগি, ঝুম্‌ঝুম্‌+ই =ঝুম্‌ঝুমি, ইত্যাদি।

সংখ্যাশব্দের সঙ্গে বিশেষণ অর্থে—হাজার+ঈ=হাজারী (দশ হাজারী মনসবদার), শত+ঈ=শতী (সব পাঁচশতী তোড়া)।

(১০) **ইয়া, ইয়ে, এ—**

(ক) আদরে বা অনাদরে নামের সঙ্গে—কান+ইয়া=কানাইয়া, কাল +ইয়া=কালিয়া, কেলে।

(খ) উৎপন্ন, আগত ইত্যাদি অর্থে—বালি+ইয়া=বালিয়া, বেলে ; মাটি+ইয়া=মাটিয়া, মেটে ; ভোজপুর+ইয়া=ভোজপুরিয়া, ভোজপুরে ; শান্তিপুর+ইয়া=শান্তিপুরিয়া, শান্তিপুরে ; পাড়াগাঁ+ইয়ে=পাড়াগেঁয়ে, চাঁটগাঁ+ইয়ে=চাটগেঁয়ে, উত্তর+এ=উত্তুরে, দখিণ+এ=দখনে, কটক+এ =কটুকে, চীন+এ চীনে (বাদাম)।

(গ) বৃত্তিজীবী, স্বভাবসম্পন্ন ইত্যাদি অর্থে—জাল+ইয়া=জালিয়া, জেলে ; মোট+ইয়া=মুটিয়া, মুটে ; কুঠার+ইয়া=কুঠারিয়া, খোসামদ+ইয়া =খোসামুদিয়া, খোসামুদে ; ফলার+ইয়া=ফলারিয়া, ফলারে। দেমাক+ইয়া =দেমাকিয়া দেমাকে ; খুন+ইয়া=খুনিয়া, খুনে ; এক গোঁ+ইয়ে=একগুঁয়ে।

(ঘ) লক্ষণযুক্ত বা সদৃশ অর্থে বিশেষণে—জিভ+এ=জিভে (গজা), নারকোল+এ=নারকুলে (কুল, বিস্কুট) ; অনুকার শব্দের সহিত বিশেষণে—টনটন+এ=টনটনে (জ্ঞান), গনগন+এ=গনগনে (আগুন), লিকলিক+এ= লিকলিকে (সাপ),চ টপট+এ=চটপটে (ছেলে), স্যাৎস্যাৎ+এ=স্যাৎসেঁতে (জমি)।

(১১) **উ প্রত্যয়—**

ন্যূনার্থে আদরে প্রায়ই ব্যক্তির নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। খোকা+উ= খুকু, রাম্‌+উ=রামু, রাধা+উ=রাধু, নীল+উ=নীলু, পাঁচ+উ=পাঁচু, দুষ্ট+উ=দুষ্টু।

ভাব বিশেষণ গঠনে—ঢাল+উ=ঢালু, নীচ+উ=নীচু, আগ+উ=আগু, পিছ+উ=পিছু।

জাতি, বস্তু ইত্যাদি অর্থে—কল+উ=কলু (কল লইয়া কাজ করে যে), বাজ+উ=বাজু (বাহুতে পরে যাহা)।

(১২) (উয়া, ওয়া, ও)—

(ক) উৎপন্ন, নির্মিত, সম্পর্কিত ইত্যাদি অর্থে—কাঠ+উয়া=কাঠুয়া, কেঠো ; বাঁশ+উয়া=বাঁশুয়া, বেঁশো ; খড়+উয়া=খড়ো, খোড়ো (চাল), হাট+ওয়া=হেটো, মাঠ+ওয়া=মেঠো, বন+ওয়া=বুনো, ঝড়+ওয়া=ঝোড়ো, ধান+ওয়া=ধেনো (মদ)।

(খ) আসক্তি, প্রবণতা ইত্যাদি অর্থে—কোণা+ও=কুণো, বাত+ও=বেতো, টাক+ও=টেকো, জ্বর+উয়া=জ্বরুয়া, জ্বরো ; কাশ+উয়া=কাশুয়া, কেশো।

(গ) বৃত্তিজীবী, কর্মদক্ষ ইত্যাদি অর্থে—পট+উয়া=পটুয়া, পোটো ; গাছ+ওয়া=গেছো (গাছে বিচরণে দক্ষ) ; মাছ+ওয়া=মাছুয়া, মেছো (মৎস্যজীবী বা মৎস্য সম্পর্কিত), টোল+ও=টুলো, পড়+উয়া=পড়ুয়া, পোড়ো।

(ঘ) অনাদরে বা আদরে ব্যক্তিনামে—যদু+উয়া=যদুয়া, যেদো, কাল+উয়া=কালুয়া, কেলো।

বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত অপ্রধান তদ্ধিত

(ক, কা, কী, কিয়া, কে, কর, ইত্যাদি)

ঢোল+ক=ঢোলক, দম (ফার্সী)+কা=দমকা, ঝট+কা=ঝটকা, পট+কা=পটকা ছোট+কী=ছোটকী বড়+কী=বড়কী, মণ+কিয়া=মণকিয়া, মণকে ; শত+কিয়া=শতকিয়া, শতকে ; দুই+কর=দোকর ; তিন+কর=তেকর ; ছিঁচ (ছোট)+কে=ছিঁচকে ইত্যাদি।

(উড়, উড়িয়া, উরিয়া, উড়ে, ড়ে, উরে, উলি, এল, ড়া, ড়ী, রু, ইত্যাদি)

লেজ+উড়=লেজুড় ; কাঠ+উরিয়া, উরে=কাঠুরিয়া, কাঠুরে, সাপ+উড়িয়া, উড়ে=সাপুড়িয়া, সাপুড়ে, চাষা+ড়িয়া, ড়ে=চাষাড়িয়া চাষাড়ে, হাঁস+উলি=হাঁসুলি, সিঁধ+এল=সিঁধেল, গাঁজা+ল=গেঁজেল, রাজ+ড়া=রাজড়া (যেমন রাজরাজড়া), গাছ+ড়া=গাছড়া (যেমন গাছগাছড়া), বউ+ড়ী=বউড়ী, বোমা+রু=বোমারু ইত্যাদি।

(ট, টা, টি, টে, তা, তি, লা, সা, সে, চা, ছা, ইত্যাদি)

জমা+ট=জমাট, তুলা+ট=তুলট (কাগজ), চিম্+টা=চিমটা, ঝাপ্+টা=ঝাপটা পাঁশু+টা=পাঁশুটা, পাঁশুটে, ধোঁয়া+টে=ধোঁয়াটে, ঘোলা

+টে=ঘোলাট, ঘোলাটে, তামা+টে=তামাটে, লেঙ (নগ্ন)+টা=লেঙটা, নুন+তা=নোনতা, রাঙ্গ+তা=রাঙ্গতা, পানি+তা=পান্তা, চাক+তি= চাকতি, চুণা+তি=চুণাতি (চুণের পাত্র), মেঘ=লা=মেঘলা, ছ্যাব (শাব, শিশু)+লা=ছ্যাবলা, জল+শা=জলশা, জলসা, ঝাপ্+সা=ঝাপসা, আম+শী=আমশী (শুকনা আম), পাণি+সা=পানসা, পানসে, লাল+চা =লালচা, লালচে, নীল+চা=নীলচা, নীলচে।

(তুত, পনা, পানা ইত্যাদি)

(সন্তানার্থে) খুড়া+তুত=খুড়তুত, মাসী+তুত=মাসতুত, (ভাবার্থে) গিন্নি+পনা=গিন্নিপনা, কাঙ্গাল+পনা=কাঙ্গালপনা, (সাদৃশ্যার্থে), চাঁদ+ পানা=চাঁদপানা, চাঁদপারা, ইত্যাদি।

(অসংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত তদ্ধিত)

বাংলা ধাতুর সহিত সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যবহার বড় নাই (কহতব্য, সহতব্য ইত্যাদি দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া); কিন্তু বাংলা তদ্ভবাদি শব্দের সহিত এমন কি বিদেশী শব্দের সহিত সংস্কৃত তদ্ধিতের ব্যবহার যথেষ্ট আছে।

ইমা (ইমন)—ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে: লাল (ফারসী)+ইমা= লালিমা, চাঁদ+ইমা=চাঁদিমা, বঙ্ক+ইমা=বঙ্কিমা।

ঈয়—বৈদেশিক নামের সহিত: খ্রীষ্ট+ঈয়=খ্রীষ্টীয়, রুশ+ঈয়=রুশীয়, ইতালী+ঈয়=ইতালীয়।

উক—গুণ, স্বভাব ইত্যাদি প্রকাশে: লাজ+উক=লাজুক, মিথ্যা+উক =মিথুক, পেট+উক=পেটুক।

ত্ব, তা—ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে: নতুন+ত্ব=নতুনত্ব, ছোট+ত্ব= ছোটত্ব, একঘেয়ে+ত্ব=একঘেয়েত্ব, আদিখ্যে+তা=আদিখ্যেতা (দেখে নাই এমন ভাব, হ্যাংলামী)।

ময় (ময়ট্)—পূর্ণ, ব্যাপ্ত ইত্যাদি অর্থে: জল+ময়=জলময়, কাদা+ময় =কাদাময়, গাঁ+ময়=গাঁময়, ঘর+ময়=ঘরময়।

বাংলাশব্দে ফারসী, তুর্কী ইত্যাদি তদ্ধিত

আন, ওয়ান—মালিক, রক্ষক ইত্যাদি অর্থে। গাড়ী+ওয়ান=গাড়োয়ান দ্বার+ওয়ান=দারোয়ান (দরোয়ান)।

আনা, আনি—ভাববাচক বিশেষ্য। বাবু+আনা=বাবুয়ানা, বাবুয়ানি; বিবি+আনা=বিবিয়ানা, বিবিয়ানি।

খানা—কার্যস্থান, গৃহ ইত্যাদি অর্থে: ছাপা+খানা=ছাপাখানা, গোলাম+খানা=গোলামখানা, গোসল+খানা=গোসলখানা, বৈঠক+খানা=বৈঠকখানা, গরীব+খানা=গরীবখানা।

গর—নির্মাতা, বৃত্তিজীবী ইত্যাদি অর্থে: কারি+গর=কারিগর (কারিকর, 'কর' সংস্কৃত প্রত্যয়), সওদা+গর=সওদাগর।

গিরি—বৃত্তি, ভাব ইত্যাদি অর্থে: কেরানী+গিরি=কেরানীগিরি, মুটে+গিরি=মুটেগিরি, দারোগা+গিরি=দারোগাগিরি।

চা, চি, চী, আচি (তুর্কী) প্রত্যয়—পাত্র, আধার ইত্যাদি অর্থে: ডেক+চি=ডেকচি, ধুনা+চি=ধুনাচি।

বৃত্তিজীবী কর্মদক্ষ ইত্যাদি অর্থে: তবল+চি=তবলচি, মশাল+চি=মশালচি।

দান, দানি—পাত্র বা আধার অর্থে: কলম+দান=কলমদান, কলমদানি, আতর+দান=আতরদান, আতরদানি; ফুল+দান=ফুলদান, ফুলদানি, পিক+দান=পিকদান, পিকদানি।

দার—মালিক, কর্তা ইত্যাদি অর্থে: জমি+দার=জমিদার, ব্যবসা+দার=ব্যবসাদার, বাজন+দার=বাজনদার, চলন+দার=চলনদার (যে সঙ্গে চলে, escort)।

গুণযুক্ত, লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি অর্থে: বুটি+দার=বুটিদার, চমক+দার চমকদার, রঙ+দার=রঙদার, মজা+দার=মজাদার।

বাজ, বাজি—অভ্যস্ত, অভ্যাস ইত্যাদি অর্থে: মতলব+বাজ=মতলববাজ মতলববাজি; ধোঁকা+বাজ=ধোঁকাবাজ, ধোঁকাবাজি; গলা+বাজ=গলাবাজ, গলাবাজি।

সই, সহি—মত, উপযুক্ত ইত্যাদি অর্থে: জুত+সই=জুতসই, মাপ+সই=মাপসই, মানান+সই=মানানসই।

৫। সংস্কৃত তদ্ধিত

[অপত্যার্থ তদ্ধিত]

ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণায়ন ষ্ণি, ষ্ণেয়

উপরিলিখিত প্রত্যয়গুলি অপত্যার্থে ব্যবহার হয়। ইহাকে ষ্, ণ্, ইৎ যায়, এবং যথাক্রমে **অ, য, আয়ন, ই, এয়, ঈয়, ইক** থাকে।

অ (ষ্ণ)—রঘু+ষ্ণ=রাঘব, দনু+ষ্ণ=দানব, মনু+ষ্ণ=মানব, পুত্র+ষ্ণ=পৌত্র, ভরত+ষ্ণ=ভারত।

য (ষ্ণ্য)—দিতি+ষ্ণ্য=দৈত্য, অদিতি+ষ্ণ্য=আদিত্য, চণক+ষ্ণ্য=চাণক্য, গর্গ+ষ্ণ্য=গার্গ্য।

আয়ন(ষ্ণায়ন)—কাত্য+ষ্ণায়ন=কাত্যায়ণ, নর+ষ্ণায়ন=নারায়ণ, দক্ষ+ষ্ণায়ন=দাক্ষায়ণ।

ই (ষ্ণি)—দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি, সুমিত্রা+ষ্ণি=সৌমিত্রি, রাবণ+ষ্ণি=রাবণি।

এয় (ষ্ণেয়)—ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয়, বিমাতৃ+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়, রাধা+ষ্ণেয়=রাধেয়, মৃকণ্ডু+ষ্ণেয়=মার্কণ্ডেয়।

(অপত্যার্থ তদ্ধিতের অন্যার্থক প্রয়োগ)

ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ষ্ণেয, ষ্ণায়ন প্রভৃতি অপত্যার্থ প্রত্যয় অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

অ (ষ্ণ)—(উপাসক অর্থে) শিব+ষ্ণ=শৈব, বিষ্ণু+ষ্ণ=বৈষ্ণব। (পারদর্শী অর্থে) ব্যাকরণ+ষ্ণ=বৈয়াকরণ। (তজ্জাত অর্থে) হেম+ষ্ণ=হৈম, (ভাব অর্থে) শিশু+ষ্ণ=শৈশব। (তদ্দেশবাসী অর্থে) মগধ+ষ্ণ=মাগধ ; (তৎকালীন অর্থে) শরৎ+ষ্ণ=শারদ, নিশি+ষ্ণ=নৈশ।

য (ষ্ণ্য)—উপাসক অর্থে : গণপতি+ষ্ণ্য=গাণপত্য, বৃহস্পতি+ষ্ণ্য=বার্হস্পত্য।

ইক (ষ্ণিক)—(ব্যবসায়ী অর্থে) তৈল+ষ্ণিক=তৈলিক, তাম্বুল+ষ্ণিক=তাম্বুলিক। (পারদর্শী অর্থে) বেদান্ত+ষ্ণিক=বৈদান্তিক, ন্যায়+ষ্ণিক=নৈয়ায়িক। (সম্বন্ধীয় অর্থে) লোক+ষ্ণিক=লৌকিক, বিদেশ+ষ্ণিক=বৈদেশিক, ব্যবহার+ষ্ণিক=ব্যবহারিক, অণু+ষ্ণিক=আণবিক, বিদ্যুৎ+ষ্ণিক=বৈদ্যুতিক, ভূগোল+ষ্ণিক=ভৌগোলিক, ইতিহাস+ষ্ণিক=ঐতিহাসিক।

এয় (ঞ্চেয়)—(বৎসল, ভক্ত অর্থে) অতিথি + ঞ্চেয় = আতিথেয়। (যোগ্য অর্থে) পংক্তি + ঞ্চেয় = পাংক্তেয়। (কৃত অর্থে) পুরুষ + ঞ্চেয় = পৌরুষেয় (পুরুষ বা ব্যক্তি দ্বারা কৃত)।

আয়ন (ষ্ণায়ন)—(তৎ সম্পর্কিত অর্থে) রাম + ষ্ণায়ন = রামায়ণ। (জাত অর্থে) দ্বীপ + ষ্ণায়ন = দ্বৈপায়ন (দ্বীপে জাত)।

অস্ত্যর্থক প্রত্যয়

(ইন্, বিন্, মতুপ্, বতুপ, শালিন্)

ইন্, বিন্—অস্ত্যর্থে প্রয়োগ হয়। জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন্ (জ্ঞানী), মান + ইন্ = মানিন্ (মানী), ধন + ইন্ = ধনিন্ (ধনী), মায়া + বিন্ = মায়াবিন্ (মায়াবী), মেধা + বিন্ = মেধাবিন্ (মেধাবী), যশস + বিন্ = যশস্বিন্ (যশস্বী)।

মৎ, বৎ, (মতুপ্ বতুপ্ উ ইৎ যায়)—অস্ত্যর্থে প্রয়োগ হয়। শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমৎ (শ্রীমান্), ধী + মতুপ = ধীমৎ (ধীমান্), বুদ্ধি + মতুপ্ বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্), ভগ + মতুপ্ = ভগবান্, বিদ্যা + মতুপ্ = বিদ্বৎ (বিদ্বান্), (অ, আ, অথবা ম এর পর মতুপ্ প্রত্যয়ের 'ম', 'ব' হয়)। গুণ + শালীন্ = গুণশালী, ধন + শালীন = ধনশালী।

(অন্যান্য অস্ত্যর্থক ও ভাবার্থক প্রত্যয়)

(ল, শ, ইল, আল, আলু, র)

মাংস + ল = মাংসল, শ্যাম + ল = শ্যামল, বহু + ল = বহুল, ফেন + ইল = ফেনিল, জটা + ইল = জটিল, পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল, নিদ্রা + আলু = নিদ্রালু, দয়া + আলু = দয়ালু, রস + আল = রসাল, বাচ + আল = বাচাল, পাণ্ডু + র পাণ্ডুর, মুখ + র = মুখর, মধু + র = মধুর, লোম + শ = লোমশ।

(ভাবার্থক প্রত্যয় ত্ব, তা)

প্রায়ই গুণবাচক শব্দের উত্তর ত্ব, তা, প্রত্যয় হয়। সাধু + তা = সাধুতা, লঘু + তা = লঘুতা, ভীরু + তা = ভীরুতা, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, প্রভু + ত্ব = প্রভুত্ব।

(য, ণীয়, ণীন ইত্যাদি ভাবার্থক প্রত্যয়)

য—ন্যায় + য = ন্যায্য, বধ + য = বধ্য, সভা + য = সভ্য, দস্ত + য = দস্ত্য,

কণ্ঠ+য=কণ্ঠ্য, তালু+য=তালব্য, বন+য=বন্য, শীত+য=শৈত্য, লোহিত+য=লোহিত্য।

ঈয় (ণীয়) বঙ্গ+ণীয়=বঙ্গীয়, ভারত+ণীয়=ভারতীয়, শাস্ত্র+ণীয়=শাস্ত্রীয়, রাজন+ণীয়=রাজকীয়।

ঈন (ণীন)—গ্রাম+ণীন=গ্রামীণ, কুল+ণীন=কুলীন, সর্বজন+ণীন=সার্বজনীন, সর্বজনীন, কাল+ণীন=কালীন।

(জাতার্থক প্রত্যয় ইত)

পুষ্প+ইত=পুষ্পিত, মুকুল+ইত=মুকুলিত, দুঃখ+ইত=দুঃখিত, লজ্জা+ইত=লজ্জিত, তরঙ্গ+ইত=তরঙ্গিত, কলঙ্ক+ইত=কলঙ্কিত।

(স্ত্রীবাচী প্রত্যয় ও বিশেষণের তারতম্য সূচক প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের অন্তর্গত। পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে এই প্রত্যয়গুলির আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।)

অনুশীলনী

(ক)

১। প্রত্যয় কাহাকে বলে ?

২। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে পার্থক্য কি—উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

৩। "কৃৎ প্রত্যয় ধাতুর উত্তর মাত্র একবার বসে, কিন্তু তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর একাধিক বার বসিতে পারে।"

—উপরের উক্তিটি দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইয়া দাও।

৪। নিম্নলিখিত বাংলা কৃৎপ্রত্যয় গুলির দ্বারা শব্দ গঠন কর—

তি, [illegible], না, আ, আত, উরী, ইয়ে, ও, কি, কা।

(খ)

৫। (ক) তব্য প্রত্যয় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ? বাংলায় ধাতুর সহিত সংস্কৃত তব্য প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখাও।

(খ) 'চলমান' ও 'চলন্ত' এই দুইটি কৃদন্ত শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কর। এই প্রত্যয়গুলি সংস্কৃত কোন্ প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে ?

৬। এক শব্দে বল—

যুগকে ধারণ করে যে। সূর্য দেখে নাই যে (নারী)। স্বয়ং পতি বরণ

করে যে। ধুর (ভার) ধারণ করে যে। জল দান করে যে। সর্ব জ্ঞাত যাহার। ভুজ (বক্রভাবে) গমন যাহার। নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে। ভয় জন্মায় যে। বিশেষরূপে বহন করার ভাব (বি-বহ্ + ঘঞ্)। ভাঃ (আলো) করে যে। ত্বরায় গমন করে যে। সেবা পাইতেছে যে। সেবা করিতেছে যে। যে পান করিতে চায়। পান করিবার ইচ্ছা।

৭। সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় বল।

৮। শীলার্থ প্রত্যয় কি ? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

(গ)

৯। নিম্নলিখিত বাংলা তদ্ধিতের উদাহরণ দাও—

আ, আই, আত, আনা, মি, আরি, আলি, ই, ঈ, ইয়া, এ, ওযা, ও, ক, উড়, ড়া, তা।

১০। কয়েকটি বাংলা শব্দে সংস্কৃত তদ্ধিতের ব্যবহার দেখাও।

১১। বাংলায় কয়েকটি ফারসী ও অন্ততঃ একটি তুর্কী প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখাও।

১২। কয়েকটি সংস্কৃত অপত্যার্থক প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত দাও।

(ঘ)

১৩। উদাহরণ দাও—

অস্ত্যর্থ সংস্কৃত ইল প্রত্যয়। জাতার্থে সংস্কৃত ইত প্রত্যয়। ভক্ত অর্থে সংস্কৃত ষ্ণ প্রত্যয়।

১৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে তদ্ধিতযোগে নূতন শব্দে পরিণত করিয়া প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বাক্যে প্রয়োগ দেখাও—

ছেলে, লাল, জিভ, নারকোল, জটা, বেগু, বিবি, আম, সাপ, কটক, ঢাকা, টিউশন (tuition), জুয়া, পাঁজি, দখিন, মুন, রঙ।

১৫। নিম্নলিখিত তৎসম শব্দগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর—

বৈষ্ণব, মানব, তরঙ্গিত, জটিল, নিদ্রালু, গুণশালী, বার্হস্পত্য, কৃত, শোক, পঙ্কজ।

১৬। নিম্নলিখিত অসংস্কৃত শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর—

বাবুয়ানা, কানাই, কদমা (মিঠাই বিশেষ), সুবলা, ছুটন্ত, চুমকি (পান পাত্র), গাইয়ে, পাকড়াও, দুষ্টামি, পিয়ারী, সোনালী, ঢুলি, ডুগডুগি, বেতো, দমকা, মজাদার, তবলচি।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসর্গ (Prefixes)

১। সংস্কৃতের বিংশতি উপসর্গ

যে অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ (particle) ধাতুর বা শব্দের পূর্বে বসিয়া তাহাদের অর্থান্তর ঘটায় কিংবা অর্থকে বিশেষতা দান করে তাহাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গগুলি অন্যান্য শব্দের মত স্বতঃই অর্থবাচক নহে, এইজন্য ভাষায় স্বতন্ত্র শব্দরূপে ইহাদের ব্যবহারও নাই ; ইহারা শুধু ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসিয়া তাহার অর্থান্তর ঘটায় বা অর্থে বিশিষ্টতা সম্পাদন করে।

যেমন, সংস্কৃত হৃ ধাতুর (to carry away) পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গযোগে প্রহার, আহার, বিহার, সংহার, পরিহার ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি হয় এবং ইহারা যথাক্রমে প্রহার (beating), আহার (eating), বিহার (walking) সংহার (killing), পরিহার (giving up) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসিলে সমাসের পূর্বপদ হয় এবং পরবর্তী শব্দ যোগে সমস্তপদ গঠন করে। প্র আদি উপসর্গযোগে গঠিত বলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে এই সমাসের নাম প্রাদি সমাস। প্রাদি সমাসের ব্যাসবাক্যে উপসর্গের অর্থটি পূর্বপদে বলিতে হয়। যেমন—প্রভাব (প্রকৃষ্ট ভাব), সুপুরুষ (শোভন পুরুষ), উদ্বেল (উৎক্রান্ত বেলাকে), অনুতাপ (পশ্চাৎ তাপ) ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণে কুড়িটি উপসর্গের উল্লেখ করা হইয়াছে—

প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্ বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। *

নিম্নে সংস্কৃত উপসর্গগুলি সাধারণতঃ কি অর্থে ধাতু বা শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাহা সংক্ষেপে দেখানো হইল। বলা বাহুল্য, একই উপসর্গের বহু অর্থে

* সংস্কৃত ব্যাকরণে আছে, "উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে।" অর্থাৎ প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতি নিপাত (prefixes) যখন ক্রিয়া অর্থাৎ ধাতুর সহিত যোগ হয়, তখনই তাহাদিগকে উপসর্গ বলে। অন্যত্র, যেমন প্রাদি সমাসে, ইহারা শুধু নিপাত (prefixes) বা সমাসের পূর্বপদ মাত্র কিন্তু উপসর্গ নহে। সংস্কৃত মতে prefix হইলেই উপসর্গ হয় না ; শুধু prefixes to verbroots, তাহাও আবার নির্দিষ্ট কুড়িটি মাত্র সেখানে উপসর্গ।

বাংলায় কিন্তু ইংরেজি prefix (প্রাক্ সংসর্গ অব্যয়) মাত্রই উপসর্গরূপে চলিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ অবশ্য বাংলায়ও উপসর্গ সংজ্ঞার বিশুদ্ধিতার দাবী তুলিয়াছেন—কিন্তু প্রচলিত ধারণা অনুসারে এখানে প্র, পরা ইত্যাদিই উপসর্গ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে ; এখন আবার প্র প্রহারে উপসর্গ, প্রভাবে নয়—এই বিচারের প্রয়োজন বাংলা ব্যাকরণে আছে কি ? বস্তুতঃ সকল বাংলা ব্যাকরণকারইত উপসর্গকে prefix রূপে ধরিয়া নিয়াছেন।

ব্যবহার সম্ভব হয়, তাই এই তালিকা কোন মতেই পূর্ণাঙ্গ নহে, উপসর্গের অর্থদ্যোতনার আভাসমাত্র।

(সংস্কৃত উপসর্গের অর্থদ্যোতনা)

প্র—উৎকর্ষ, আধিক্য ইত্যাদি অর্থে: প্রগতি, প্রখর, প্রকর্ষ, প্রচণ্ড, প্রচলন ইত্যাদি।

পরা—বৈপরীত্য, আভিমুখ্য ইত্যাদি অর্থে: পরাজয়, পরাস্ত, পরাবৃত্ত, পরাঙ্মুখ, পরাক্রম ইত্যাদি।

অপ—বৈপরীত্য, হীনতা, স্থানান্তর, ইত্যাদি অর্থে: অপকার, অপকর্ষ, অপদেবতা, অপমৃত্যু, অপহরণ ইত্যাদি।

সম্—সমতা, একত্রতা, আভিমুখ্য ইত্যাদি অর্থে: সমবেদনা, সম্মেলন, সমাবেশ, সম্মুখ, সমক্ষে ইত্যাদি।

নি—অভাব, আতিশয্য, নিন্দা ইত্যাদি অর্থে: নিবৃত্তি, নিবেশ, নিদারুণ, নিকৃষ্ট ইত্যাদি।

অব—বিযুক্তি, বৈপরীত্য, সহজতা, আভ্যন্তর ইত্যাদি অর্থে: অবচ্ছেদ, অবজ্ঞা, অবহেলা, অবলীলা, অবগাহন ইত্যাদি।

অনু—পশ্চাৎ, সাদৃশ্য ইত্যাদি অর্থে: অনুগমন, অনুবাদ, অনুজ, অনুসরণ, অনুমান ইত্যাদি।

নির্—নঞ্, নিশ্চয়, বহিঃ ইত্যাদি অর্থে: নির্ধূম, নিষ্কলঙ্ক, নির্জলা, নিশ্চয়, নির্গমন, নিষ্কাশন, ইত্যাদি।

দুর্—মন্দ, হীন, কঠিন ইত্যাদি অর্থে: দুরাকাঙ্ক্ষা, দুষ্প্রবৃত্তি, দুর্জন, দুষ্প্রবেশ্য ইত্যাদি।

বি—বৈপরীত্য, বিচ্ছিন্নতা, বিশেষতা ইত্যাদি অর্থে: বিবর্ণ, বিকার, বিহীন, বিচ্ছেদ, বিশিষ্ট, বিষম ইত্যাদি।

অধি—আধিক্য, কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ইত্যাদি অর্থে: অধিদেবতা, অধিকার, অধিবাস, অধিকরণ (ধর্মাধিকরণ) ইত্যাদি।

সু—শোভন, সহজ, উৎকৃষ্ট, উচিত, অধিক ইত্যাদি অর্থে: সুপুরুষ, সুকুমার, সুলভ, সুজলা, সুযোগ্য, সুচিন্তিত, সুবিপুল ইত্যাদি।

উৎ—আকস্মিকতা, আতিশয্য, অতিক্রম, উর্ধ্বগমন ইত্যাদি অর্থে: উৎপাত, উৎকণ্ঠা, উদ্বাস্তু, উৎক্ষেপ, উৎকীর্ণ, উত্তীর্ণ ইত্যাদি।

পরি—ব্যাপ্তি, আবেষ্টন, বিচ্ছিন্নতা, প্রাচুর্য, নিন্দা ইত্যাদি অর্থে: পরিসর, পরিধি, পরিস্থিতি (situation), পরিচ্ছেদ, পর্যাপ্ত, পরিচর্যা, পরিত্যাগ, পরিবাদ।

প্রতি—বৈপরীত্য, সাদৃশ্য, বীপ্সা ইত্যাদি অর্থে: প্রতিকূল, প্রতিষেধ, প্রতিদান, প্রতিনিধি, প্রতিলিপি ইত্যাদি;

অভি—আভিমুখ্য, মহত্ত্ব, প্রশস্ততা ইত্যাদি অর্থে: অভিযোজনা অভিক্ষেপণ, অভিজাত, অভিনব, অভিনন্দন, অভিভাবক ইত্যাদি।

অতি—অতিক্রম, অতীত ইত্যাদি অর্থে: অতিমানব, অতিপ্রাকৃত, অতিকায়, অতীন্দ্রিয়, অতিক্রম, অতীত ইত্যাদি।

অপি—আভ্যন্তর, আবেষ্টন ইত্যাদি অর্থে: অপিনিহিতি, অপিধান (তরবারি ইত্যাদির খাপ) ইত্যাদি। (অপি উপসর্গযুক্ত তৎসম শব্দ বাংলায় প্রায় নাই)।

উপ—সামীপ্য, সাদৃশ্য, প্রশস্ততা ন্যূনতা ইত্যাদি অর্থে: উপনদী, উপবন, উপনগর, উপহার, উপকার, উপসংহার ইত্যাদি।

আ—সামীপ্য, পর্যন্ত, ঈষৎ ইত্যাদি অর্থে: আনত, আগমন, আকণ্ঠ, আপিঙ্গল, আতাম্র, আসমুদ্র, আকণ্ঠ, আভাষ, আভাস ইত্যাদি।

উপসর্গের মত ব্যবহৃত সংস্কৃত অব্যয়

আবিঃ, তিরঃ, বহিঃ, পরিঃ, প্রাদুঃ, নমঃ, অলম্. সাক্ষাৎ, পশ্চাৎ, সহ ইত্যাদি কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয় উপসর্গের মত ব্যবহার হয়। যেমন—

আবির্ভাব, আবিষ্কার, তিরস্কার, তিরোধান, বহিষ্কার, বহির্দেশ, পরিষ্কার, প্রাদুর্ভাব, নমস্কার, অলঙ্কার, সাক্ষাৎকার, পশ্চাদ্‌গামী, সহজাত, সহকর্মী ইত্যাদি।*

২। বাংলা উপসর্গ

খাঁটি বাংলা—ধাতুর পূর্বে সংস্কৃতের মত উপসর্গের ব্যবহার খুব কমই হয়। মাত্র কয়েকটি শব্দে নঞর্থক অ, আ, আন ইত্যাদি উপসর্গের ব্যবহার

* সংস্কৃত ব্যাকরণে উপরিলিখিত উপসর্গের সহিত এই সকল অব্যয়ের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নহে। ব্যবহারের দিক হইতেও ইহাদের সহিত উপসর্গের কোনই প্রভেদ নাই। তবে ইহাদিগকে উপসর্গ না বলার হয় ত বা একটি সঙ্গত কারণও থাকিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণকারও উপসর্গ বলিতে শব্দাংশ বা Particleই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অলম্ (=সম্যক্, যথেষ্ট) পশ্চাৎ, (পেছন পরবর্তী) নমস্ (বন্দনা, নতি) বহিস্ (বাহির), আবিস্ (প্রকাশ) প্রভৃতি প্রায় স্বতন্ত্র অর্থবাচী পৃথক শব্দ হইয়া উঠিয়াছে, আ, উপ, বি, উৎ ইত্যাদির মত ইহারা আর Particle নাই।

আছে। যেমন,—আকাঁড়া, আবাঁধা, আরাঁধা, আধোয়া, আনকোরা, অচিন, অচেনা ইত্যাদি।

কবিতায় 'প্রণমিলা' 'প্রকাশিলা' ইত্যাদি যে সকল পদ আছে, তাহাতে নম্, কাশ্ ইত্যাদি ধাতুর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় ইল যোগ করিয়া ধাতুকে বাংলা রূপ দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু আসলে ইহারা বাংলা ধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়াপদ নহে, তদুপরি সংস্কৃতানুসারী গম্ভীর ভাষার কবিতা ছাড়া ইহাদের অন্যত্র ব্যবহারও নাই।

তবে বাংলায় শব্দের পূর্বে উপসর্গের ব্যবহারের উদাহরণ প্রচুর আছে। এই উপসর্গগুলি শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া প্রায়ই সমাসের পূর্বপদ হয় এবং পরবর্তী শব্দটির সহযোগে একটি সমস্তপদ গঠন করে। যেমন—

আকাঁড়া (না কাঁড়া, নঞ্ তৎপুরুষ)
আকাঠ (কাঠ সদৃশ, অব্যয়ীভাব)
অনামুখো (বিকৃত মুখ যার, বহুব্রীহি)
হাভাতে (ভাতের অভাব যার, বহুব্রীহি)
বেবন্দোবস্ত (বন্দোবস্তের অভাব, অব্যয়ীভাব)
ফিসন (প্রতিসন, অব্যযীভাব) ইত্যাদি।

নিম্নে বাংলা শব্দের পূর্বে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি অব্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হইল।

উপসর্গরূপে ব্যবহৃত বাংলা অব্যয়

অ—নিন্দা, আতিশয্য ইত্যাদি অর্থে : **অঘোরে** (অতি ঘোরে, আতিশয্য) ঘুমুচ্ছে ; **অটালে** (অস্থানে, নিন্দা) পড়েছি ; এমন কি **অমন্দ** (অতিমন্দ, আতিশয্য) কথা ? অজাত (হীনজাত) (পূর্ববঙ্গে, প্রায়শঃ গালিতে)।

অনা—অদ্ভুত, বিকৃত ইত্যাদি অর্থে : কী **অনাছিষ্টি** (অদ্ভুত, fantastic) কাণ্ড। এমন **অনামুখো** (বিকৃত, awkward) দেখিনি।

আ—নঞ, সাদৃশ্য, **হীনতা** ইত্যাদি অর্থে : আলুনি (লবণ ব্যতীত, নঞর্থে)। আকাঠ মূর্খ (কাঠের মত জড়বুদ্ধি, সাদৃশ্যে)। আগাছা (বাজে গাছ, হীনার্থে), আকাম (পূর্ববঙ্গে—অকর্ম, কুকর্ম), আকথা (পূর্ববঙ্গে—অশুভ কথা, কুকথা)।

অন্ আন্—নঞর্থক। আন্‌কোরা (কোরা হয় নাই) কাপড়। আন্‌কোরা (অব্যবহৃত) জিনিস।

অব্—বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহার হয়। জ্বরে তেঁতুল খেলে অব্‌গুণ (বিরুদ্ধ গুণ, অপকার) হবে। (পূর্ববঙ্গে—'আর গুণ নাই ছার্‌গুণ আছে', অর্থাৎ ভাল গুণ নাই, খারাপ গুণ আছে)।

উন, উনু—ন্যূনার্থে ব্যবহার হয়। উনপাঁজুরে (দুর্বল, ক্ষীণ পঞ্জরাস্থি সম্পন্ন); উনুবুকো (দুর্বল, সাহসহীন)।

উভ—উচ্চ, উর্ধ্ব ইত্যাদি অর্থে: ভূমিতে পড়িয়া রাম কাঁদে উভরায় (উচ্চ কণ্ঠে)। উভলেজ (উর্ধ্বলাঙ্গুল) করিয়া পলায় কপিগণ।

কদ্—নিন্দা, কদর্যতা ইত্যাদি অর্থে: কদভ্যাস (খারাপ অভ্যাস), কদাকার (কুৎসিত আকার), কদাচার (কুৎসিত আচার)।

কু—মন্দ, হীন, অশুভ ইত্যাদি অর্থে: কুলোক (মন্দলোক), কুজাত (হীন জাত), কুদিন (অশুভ দিন)।

নি—নঞর্থে ব্যবহার হয়। নিখুঁত, নিখোঁজ, নিদয়, নিলাজ ইত্যাদি।

পাতি, পাত্—ক্ষুদ্রার্থে, হীনার্থে ব্যবহৃত হয়। পাতি হাঁস, পাতি কাক, পাতি শিয়াল, পাতিলেবু ইত্যাদি।

বি, বে—বিপরীতার্থে, নিন্দার্থে। বিভুঁই (অন্যভুঁই, স্বদেশ নহে) ; বিজোড়, বেজোড় (জোড় নহে)। বিঢপ, বেঢপ (কদাকার যুক্ত)।

স—সহার্থে বা নিশ্চিতার্থে ব্যবহৃত হয়। সজোরে (জোরের সঙ্গে), সবুট (বুট সহ) লাথি, সঠিক (নিশ্চিতই ঠিক)।

সু—ভাল, প্রশস্ত ইত্যাদি অর্থে: রামের মত সুছেলে। সুখবরটা কে দিলে? এমন সুমানুষের সন্তান।

হা—অভাব ও বিষাদ অর্থে: হাঘরে (ঘর নাই যার), হাভাতে (ভাত নাই যার), হাপুতির পুত (পুত্রহীনার পুত্র)।

রাম—উৎকৃষ্ট, বৃহৎ ইত্যাদি অর্থে: রামশালী (ধান), রাম দা, রামছাগল, রামপাখী, (মুরগী—শ্লেষে, উৎকর্ষ ও বৃহদর্থ জ্ঞাপক)।

সা, (শাহী, রাজকীয়)—উৎকর্ষ, আধিক্য ইত্যাদি অর্থে: সা জিরে (উৎকৃষ্ট জিরে বিশেষ), সা মরিচ, (উৎকৃষ্ট মরিচ বিশেষ), সা-খরচে (বেশী ব্যয় করা অভ্যাস যাহার)।

আরবী-ফারসী উপসর্গ

আম—সাধারণ, নিজ নহে অর্থে। আম দরবার, আমমোক্তার।

খাস—নিজস্ব অর্থে। খাসতালুক, খাসমহল, খাসকামরা, খাসতহবিল।

গর্—নঞর্থে, অভাবার্থে। গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

দর—নিম্নস্থ, মধ্যস্থ অর্থে। দরদালান, দরকাচা (মধ্যে কাঁচা)।

দুশ—নিন্দিত অর্থে। দুশ্‌মন।

না—নঞর্থে। নাহক (অনুচিত), নারাজ, নালায়েক, নাবালক, নাচার।

নিম্—অর্ধ অর্থে। নিমরাজি, নিমখুন।

ফি—প্রতি অর্থে। ফি বছর, ফি সন, ফি মাস, ফি হপ্তা।

ব, বা—সহার্থে, পরস্পরার্থে। বমাল (মাল সহ) বনাম (versus), বকলম (অন্যের পক্ষে দস্তখত ইত্যাদি)।

বে—নঞর্থে, অভাবার্থে। বেকার, বেআক্কেল, বেশরম, বেআদব, বে অকুফ (বেকুব), বে আইনী, বে আন্দাজ, বেহেড, বেটাইম, বেবন্দোবস্ত।

বদ্—নিন্দার্থে। বদ্‌লোক, বদ্‌রসিক, বদ্‌মেজাজ, বদ্‌জবান, বদ্‌রাগী, বদ্‌মাইশ, বদ্‌হজম।

ইংরেজি শব্দ উপসর্গরূপে ব্যবহৃত

সব্ (Sub)—অধীন নিম্নস্থ অর্থে ; সবজজ, সবডেপুটি, সবএডিটর, সবইন্‌স্পেক্টর, সবঅফিস।

হেড্ (head)—প্রধান, উচ্চতন অর্থে। হেডমৌলভী, হেডপণ্ডিত, হেডমাষ্টার, হেডমিস্ত্রী, হেডঅফিস।

ফুল (full)—পুরা অর্থে। ফুলসার্ট, ফুলহাতা, ফুলমোজা।

হাফ (half)—আধা অর্থে। হাফপেন্ট, হাফসার্ট, হাফটাইম, হাফহলিডে, হাফইস্কুল, হাফটিকিট, হাফআখড়াই।

ইংরেজি ও ফারসী হইতে আগত উপসর্গগুলি প্রধানতঃ সেই ভাষার শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। তবে ফিবছর, বেটাইম, হেডপণ্ডিত, হাফআখড়াই, ফুলহাতা ইত্যাদি জাতীয় প্রয়োগও কম নহে। *

৩। পরিভাষা গঠনে উপসর্গের নূতন প্রয়োগ

সংস্কৃত অব্যয় ও উপসর্গগুলি বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা (technical terms) গঠনে বিশেষ কার্যকরী হইতেছে। ইংরেজি প্রভৃতি

* ইংরেজি উপসর্গ সম্পর্কে আশ্চর্যবোধ করিয়া কোনো ব্যাকরণকার প্রশ্ন করিয়াছেন হেডমাষ্টারের হেডও (head=মাথা) উপসর্গ ? হেডমাষ্টারের হেড (head=মাথা) উপসগ নহে, কিন্তু মাষ্টারের পূর্বে প্রধানতার অর্থদ্যোতক 'হেড' উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় ভাষার কোন পরিভাষার বাংলা অনুবাদেও উপসর্গগুলির মূল্য অসীম। নিম্নে সংস্কৃত অব্যয় ও উপসর্গ যোগে গঠিত সামান্য কয়েকটি আধুনিক বাংলা পরিভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

অভিকর্ষ (gravitation ; দিকে বা অভিমুখে আকর্ষণ এই অর্থে)
আন্তর্জাতিক (international, ইংরেজী inter = অন্তর্)
প্রতিক্রিয়া (response, re = প্রতি)
অতিমানব (superman ; super = অতি)
সমবেদনা (sympathy, sym = সম)
নিরীশ্বরবাদ (atheism, a = নির্)
বহির্বিভাগীয় (extradepartmental, extra = বহিস্)
পরিস্থিতি (situation, ব্যাপ্তি, আবেষ্টন ইত্যাদি অর্থে পরি)
প্রাগৈতিহাসিক—Prehistoric, Pre = প্রাক্)
উপাচার্য—(Vice-Chancellor, Vice = উপ)
অসহযোগ—(Non Co-operation, Non = অ, Co = সহ)
সংশ্লেষণ, সমন্বয়—(Synthesis, Syn = সম্)
অতিবেগুনী—(Ultra-Violet, Ultra = অতি)
অবলোহিত—(infra-red, infra = অব)
পুনর্বাসন—(rehabilitation, re = পুনঃ)
উপসর্গ—(Prefix, Pre = উপ)
অনুসর্গ—(Post-position, Post = অনু)

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাহাকে বলে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। দৃষ্টান্ত দাও—

(ক) ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত উপসর্গ।

(খ) শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত উপসর্গ।

৩। উপসর্গ যোগে ধাত্বর্থের কিভাবে পরিবর্তন ঘটে আলোচনা কর।

৪। উপসর্গ যোগে কিভাবে সমস্তপদ গঠিত হয় আলোচনা কর।

৫। নিম্নের সংস্কৃত উপসর্গগুলি দ্বারা শব্দ গঠন করিয়া সেই শব্দযোগে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর।

অতি, উপ, পরি, অধি, অনু, নির, অব, অপ, পরা, সম্।

৬। বাংলায় কয়েকটি ফারসী উপসর্গের প্রচলন দেখাও।

৭। বাংলায় কয়েকটি ইংরেজি উপসর্গের ব্যবহার দেখাও।

৮। বাংলা পরিভাষা গঠনে উপসর্গের উপযোগিতা কিরূপ তাহা উদাহরণ সহকারে অতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। নিম্নে উপসর্গগুলি কোথায় কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বল—

বেদরদী, বদ্‌রাগী, বমাল, সবডেপুটি, অভিকর্ষ,. অতিকায়, উপকূল, রামপাখী, পাতিহাঁস, আপুতি, সা জিরে, আন্‌কোরা, অনাছিষ্টি, নিমরাজি, উপাচার্য, পরিস্থিতি, ফি সন।

বাক্য প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

১। বাংলা ভাষার বাক্য ও পদবিন্যাস রীতি

উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত পদসমূহ দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইলে বাক্য হয়।

প্রত্যেক ভাষারই পদবিন্যাসের একটা নিজস্ব রীতি (Syntax) থাকে; এইরূপ বাংলা ভাষারও পদবিন্যাস সম্পর্কে নিজস্ব রীতি রহিয়াছে। অবশ্য পদবিন্যাসের তেমন কোনো ধরাবাঁধা রীতি নাই; উচ্চারণ সৌকর্য ও সুশ্রাব্যতার জন্য সংস্কৃতে যে কোনো পদকে বাক্যের যে কোনো স্থানে সন্নিবেশিত করা চলে। বাংলা কবিতায়ও ছন্দ বা মিলের জন্য পদবিন্যাসের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বাংলা গদ্যে পদবিন্যাস সম্পর্কে ভাষার বিশিষ্ট রীতিটিকে সর্বতোভাবে পালন কবিতে হয়।

নিম্নে বাংলা গদ্যের সাধারণ পদাবিন্যাস রীতির সামান্য আলোচনা করা হইল—

(১) সরলবাক্যে সর্বপ্রথমে কর্তৃপদ ও সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসে। ক্রিয়াপদ সকর্মক হইলে কর্মপদটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে। ক্রিয়াপদ দ্বিকর্মক হইলে গৌণকর্ম (ব্যক্তিবাচক কর্ম) মুখ্যকর্মের (বস্তুবাচক কর্ম) পূর্বে বসে—অর্থাৎ মুখ্য কর্মটি সর্বদা ক্রিয়াপদের নিকট থাকে। যেমন—সে আমাকে দুটো টাকা দিল। ইংরেজিতে কিন্তু কর্মপদ (মুখ্য গৌণ উভয়েই) ক্রিয়াপদের পরে বসে। যেমন—He gave me two rupees.

বাংলায় কর্মপদের অর্থের উপর জোর (emphasis) দিতে হইলে তাহা পরেও বসিতে পারে। যেমন—বন্ধুত্বের বিনিময়ে তার কাছে পেলুম শুধু ঘৃণা। সবাইকে দিল দুটাকা আর আমাকে দিলে এক টাকা। ইত্যাদি।

বাংলাবাক্যে কর্তৃপদও বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গীতে ক্রিয়ার পরে বসিতে পারে। যেমন—এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী। এমন সময় পূর্বাকাশে উদিত হলেন তিমিরবিদারী সূর্যদেব। ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাবাক্যে কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের অবস্থিতি সম্পর্কে একটা রীতি থাকিলেও তাহা প্রায়শঃ বক্তার বিশেষ বাচনভঙ্গীটির উপরই বেশি নির্ভর করে।

আমাদের নিত্যকার কথোপকথনে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, (গ্রাম্য স্ত্রীলোকের) কথাবার্তায় যে অবশিষ্ট বাগ্‌রীতিটি পালিত হয়—সেখানে কর্তা ও কর্ম ব্যাকরণের নির্দেশ মানিয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের লিপিকাযুগের পদ্য রচনায়ও সাধুগদ্যের পদবিন্যাস রীতি পদে পদে লঙ্ঘিত হইয়াছে।

(২) ইংরেজিতে করণ কারক সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের পরে থাকে; কিন্তু বাংলায় করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনের উপায় বা সাধন ইত্যাদির উল্লেখ ক্রিয়ার পূর্বে হয়। যেমন—ইংরেজিতে I beat him with a stick ; কিন্তু বাংলায়, আমি তাহাকে লাঠি দিয়া মারি।

বাংলায় ক্রিয়া ঘটিবার ভাব বা পদ্ধতির উল্লেখও ক্রিয়ার পূর্বে হয়, অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়ার পূর্বে বসে। এখানেও ইংরেজির সহিত বাংলার পার্থক্য ; ইংরেজিতে adverb সাধারণতঃ ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন—He walks slowly ; কিন্তু বাংলায়, সে ধীরে হাঁটে।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গীতে করণ বা ক্রিয়াবিশেষণের অবস্থিতিও কচিৎ পরিবর্তিত হয় ; বাক্যে কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের বিন্যাসে যে বহুতর পরিবর্তন সম্ভব, এক্ষেত্রে তাহা নহে।

(৩) অপাদান ও অধিকরণ কারক, অর্থাৎ ক্রিয়া যে আধারে ঘটে বা যে আধার হইতে অপসারিত হইয়া ঘটে তাহার উল্লেখও বাংলায় ক্রিয়াপদের পূর্বেই হয়। ইংরেজিতে অপাদান বা অধিকরণ বাচক শব্দ from, in ইত্যাদি preposition যুক্ত হইয়া ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন—বাংলায়, বাক্সে টাকা আছে। এখান হইতে যাও। কিন্তু ইংরেজিতে, There is money in the box. Get out from here, ইত্যাদি।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গীতে বাংলা অপাদান ও অধিকরণের বিন্যাসেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন—শ্বশুর বাড়ি নদীর ওপারে। কনেটি আছেন বাপের বাড়িতে। বলছি, আর এসোনা এখানে। এখন, যাও এখান থেকে। ইত্যাদি।

(৪) বাংলাবাক্যে সম্বন্ধপদ যে পদের সহিত উহার সম্বন্ধ তাহার অব্যবহিত পূর্বে বসে। ইংরেজিতে apostrophe s যুক্ত হইয়া পূর্বেও বসে ; of ইত্যাদি preposition যুক্ত হইয়া পরেও বসে।

বাংলায় আদর, ব্যঙ্গ ইত্যাদি বুঝাইতে সম্বন্ধপদ পরেও বসে। যেমন—ইস্, ছেলে আমার ভারি পণ্ডিত হয়েছেন ! আহা বাছা আমার কত কষ্টই না পাচ্ছে !

(৫) বাংলা সাধারণ নির্দেশক (assertive) বাক্যে 'হয়' ক্রিয়া (প্রায়ই)

উহ্য থাকে, কিন্তু ইংরেজিতে is, are প্রভৃতি ক্রিয়া (copula) বাক্যের আবশ্যকীয় অংশ ; হিন্দীতেও এইরূপ হৈ ক্রিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। যেমন—সে ভাল ছেলে (হয় উহ্য থাকিবে, হয় যোগ করিলে ভাষা ব্যংলা থাকিবে না), কিন্তু ইংরেজিতে He is a good boy, এবং হিন্দীতে, বহ্ আচ্ছা লড়কা হৈ (এ সব ক্ষেত্রে is বা হৈ বাদ দিলে বাক্যই অশুদ্ধ হইবে)।

এইরূপ, তোমার বাড়ি কোথায় (হয়)? ইনি আমার মামা (হন)। কিন্তু ইংরেজিতে Where **is** your home? He **is** my maternal uncle. হিন্দীতে তুম্‌হারা ঘর কহাঁ **হৈ**? বহ্ হামারা মামা **হোতা হৈ**।

(৬) বাংলা নির্দেশক, প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞা সকলরূপ বাক্যেই না-সূচক অব্যয় ক্রিয়ার পরে আসে ; কিন্তু ইংরেজিতে ও হিন্দীতে ইহারা সব সময়ই আগে আসে। যেমন—আমি ভাত খাইব না। তুমি কি যাইবে না? কথা বলিও না। কিন্তু ইংরেজিতে, **I will not** take rice. Will you **not** go? **Don't** talk. এবং হিন্দীতে, হম ভাত **নহী** খাউংগা। ক্যা তুম **নহীঁ** জাওগে? বাত **মৎ** করো।

বাংলায় আমি ভাত না খাব। তুমি কি না যাবে? কথা না বল। এইরূপ বাক্য কখনও হয় না। নূতন বাংলাশেখা সাহেবসুবা এবং হিন্দুস্থানীরা এইভাবে কথা বলে।

(৭) বাংলা বাক্যে-ইয়া, এ প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া পদ সৃষ্টির একটা প্রবণতা আছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রত্যয়গুলি অনেকটা সংযোজক অব্যয়ের মত ; ভাবের দিক হইতে ইহারা দুইটি বাক্যকেই যুক্ত করে। যেমন—সে বাড়ি গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে যে তার মা অসুখ করে বিছানায় পড়ে আছে।—এই বাক্যটিতে অনেকগুলি কার্য আছে—(১) বাড়ি যাওয়া, (২) ঘরে ঢোকা, (৩) দেখা, (৪) অসুখ করা, (৫) পড়ে থাকা। ইংরেজিতে এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পূর্বে বারবার—ing যোগ করিয়া বা having done, having gone ইত্যাদি রূপে বার বার participial phrase প্রয়োগ করিলে তাহাতে আর ইংরেজিত্ব থাকিবে না। ইংরেজিতে এইরূপ বাক্যকে ভাঙ্গিয়া সমাপিকা ক্রিয়া যোগেছোট ছোট বাক্যরচনা করিয়া and দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে ; তাহার সঙ্গে দু'একটা gerund বা participle থাকিলেও ক্ষতি হইবে না।

বাংলা গদ্যে আজকাল কেহ কেহ এই ধরনের ইংরেজি রীতি প্রয়োগ করিয়া ছোট ছোট বাক্যকে আর, এবং প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত করিতেছেন।

কোথাও কোথাও ফল একেবারে খারাপ হইতেছে না। বাংলা গদ্য যেন একটু সপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বাংলার নিজস্ব ভাষা রীতিটি নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

(৮) বাংলা বাক্যে প্রত্যক্ষ উক্তিই (Direct Narration) ব্যবহার করা হয় বেশী। পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration) একেবারে নাই তাহা নহে, তবে বাংলা ভাষারীতিকে ইহা অনেকটা আড়ষ্ট করিয়া ফেলে।

বাংলায় পরোক্ষ উক্তির যে রীতিসম্মত ব্যবহার দেখা যায়, তাহা প্রায়ই ক্ষুদ্র বাক্যে। যেমন—সে বল্লে যে সে আসবে না। তুমি বলেছিলে তুমি আজ যাবে। মা আমাকে কাজটা করতে বললেন, ইত্যাদি।

(৯) বাংলা বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়াপদের মধ্যে ইংরেজির মত কালসঙ্গতি (sequence of tense) রক্ষা করিতে হয় না। এই বিষয়ে সংস্কৃত, হিন্দী ইত্যাদি ভাষাও বাংলারই মত। ইংরেজিতে He said that he would go. বাংলায়, সে বলিল সে যাইবে (বলিল = অতীত, যাইবে = ভবিষ্যৎ)। ইংরেজিতে Who could ever say that you would not pass? বাংলায়, তুমি যে পাস করিবে না কে বলিতে পারিত? (করিবে না = ভবিষ্যৎ, বলিতে পারিত = অতীত)।

(১০) বাংলায় সাপেক্ষ বাক্যের অপেক্ষা অংশগুলি (Dependent Clause সর্বদা পূর্বে আসে। ইংরেজিতে তাহা পূর্বে বা পরে সকল স্থানেই বসিতে পারে। যেমন—আমি না এলে তুমি যেওনা (সাপেক্ষ বাক্য পূর্বে)। ইংরেজিতে Do not go until I come (সাপেক্ষবাক্য পরে)। রাগ হয়েছিল বলে বকেছিলাম (সাপেক্ষ বাক্য পূর্বে)। ইংরেজিতে, I rebuked you because I felt angry (সাপেক্ষ বাক্য পরে)।

বাংলা বাগ্‌রীতিতে সাপেক্ষ বাক্যের প্রয়োগ পরেও হইতে পারে; যেমন —কাল তোমাকে বকেছিলুম রাগ হয়েছিল বলে। সে আজ আসতে পারবে না, কারণ আজই তার পরীক্ষা। এইসব ক্ষেত্রে প্রায়ই 'বলে', 'কারণ', 'কেননা' ইত্যাদি যোগে সাপেক্ষ বাক্যটিকে পরে লইয়া আসা হয়। আজকাল ইংরেজি অনুকরণে বাংলায় সাপেক্ষ বাক্যের প্রয়োগ বাড়িয়া চলিয়াছে।

(১১) বাংলায় জটিল বাক্যের (complex sentence) উপাদান বাক্য (subordinate clause) প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসে; ইংরেজি that, which প্রভৃতি সংযোজকের অনুকরণে যে, যা, যাহা, তাহা প্রভৃতি শব্দ-যোগে বাক্যের মধ্যে বা শেষে তাহা জুড়িয়া দিলে প্রায়ই বাংলার ভাষারীতির বিরোধী হয়। যেমন—এই সুমহান সিদ্ধান্ত যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

অহিংস হবে, তা জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই বক্তৃতাগন্ধী বাক্যটির গঠনরীতি বাংলার নহে, ইংরেজির ; ইংরেজিতে The great decision that our freedom struggle should be non-violent was accepted by the National Congress. বাংলায় এই বাক্যটিকে প্রকাশ করিতে হইলে উপাদান বাক্যকে আগে আনিতে হইবে। বাংলায় এই বাক্য হইবে—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (যে) অহিংস হবে, এই মহান সিদ্ধান্ত জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

(১২) বাংলায় কর্তৃবাচ্যের বাক্যেই ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা করা যায়। কর্মবাচ্য প্রায়ই ভাষাকে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম করিয়া তোলে। যেমন—সাধু বাংলায়—আমি চাঁদ দেখিতেছি—এইরূপ বাক্যই রীতিসিদ্ধ ; এই বাক্যকে, আমা কর্তৃক চাঁদ দৃষ্ট হইতেছে, আমা দ্বারা চাঁদ দেখা হইতেছে বা আমার চাঁদ দেখা হইতেছে, এইভাবে বলিলে বাংলা ভাষারীতিকেও লঙ্ঘন করা হয়।

বাংলায় বাক্যে যেখানে কর্তৃকারক অস্পষ্ট, অথবা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ নহে, সে সব ক্ষেত্রেই কর্মবাচ্যের ব্যবহার স্বাভাবিক। যেমন—কথাটা বইএ লেখা আছে। চাল ত্রিশ টাকা মণ বিক্রী হচ্ছে। ইত্যাদি।

অবশ্য স্বাভাবিক কথোপকথনে সরল বাক্যেও কর্মবাচ্যের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ আছে। যেমন—কেমন চলেছে আজকাল ? মহাশয়ের কোথায় থাকা হয় ? চল, সবাই মিলে বসা যাক। ইত্যাদি।

সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষায় পূর্বে কর্মবাচ্যেরপ্রয়োগযথেষ্টই ছিল। বর্তমানে লেখ্যভাষায়ও কর্মবাচ্য যথাসম্ভব বর্জন করা হইয়াছে।

২। বাক্যের অর্থানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ

[illegible]নুসারে বাক্যকে মোটা[illegible] ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) নির্দেশক বাক্য (As[illegible] Sentences), (২) প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentences), (৩) অনুজ্ঞা বাক্য (Imperative Sentences), (৪) ইচ্ছার্থক বাক্য (Optative Sentences)।

এই চার প্রকার বাক্যই ক্রিয়ার ঘটা বা না ঘটা অনুযায়ী অস্ত্যর্থক (Affirmative) ও নাস্ত্যর্থক (Negative) হইতে পারে।

নির্দেশক বাক্য—যে বাক্যে কোনো কিছুর উল্লেখ বা বিবরণমাত্র থাকে তাহাকে নির্দেশক বাক্য বলে। যেমন—(অস্ত্যর্থক) সূর্য পূর্বদিকে উঠে।

আমার ভায়ের নাম রাম। সে বাড়ী যাইতেছে। (নাস্ত্যর্থক) আমি ভাত খাইব না। তাহার কাছে একটাও পয়সা নাই। চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না।

প্রশ্নবোধক বাক্য—যে বাক্যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাহাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন—(অস্ত্যর্থক)—তোমার নাম কি? এক টাকায় কত নয়া পয়সা? সে এখন কোথায় থাকে? (নাস্ত্যর্থক)—তুমি কি আমার কথা রাখিবে না? তোমরা কেহই যাইবে না কেন?

প্রশ্নবোধক বাক্য সাধারণতঃ কি, কিসে, কিসের জন্য, কোথায়, কোন্‌খানে, কবে,কখন, কত, কয়টা, কে কাহার, কাহাকে, কেমন, কি করিয়া, কেমনভাবে ইত্যাদি **কিম্ শব্দজাত** পদ যোগে গঠন করিতে হয়।

কখনো কখনো কিম্ শব্দজাত পদের প্রয়োগ না করিয়াই প্রশ্নবোধক বাক্য রচিত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার বাচনভঙ্গীতে প্রশ্নের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যেমন—তুমি যাবে? না যাব না। এখন যেতে পারি? হাঁ যাও। কাল আসছ ত? না ভাই, না।

অনুজ্ঞা বাক্য—যে বাক্যে কোনো আদেশ বা অনুরোধ বা নিষেধ বুঝায় তাহাকে অনুজ্ঞা বাক্য বলে। যেমন—(অস্ত্যর্থক)—সদা সত্য কথা বলিবে। এই দুধটুকুন খেয়ে ফেল। চলুন, আমার সঙ্গে চলুন। (নাস্ত্যর্থক) সাবধান, ওদিকে যেওনা গো। আমার চিঠি না পাইলে আসিবেন না। অনুজ্ঞা বাক্যে অনেক সময় অ, উন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করিয়া উক, উন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত ইচ্ছার্থক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়। অধিকতর মর্যাদা প্রদর্শনে, বা লজ্জাঅভিমানাদিতে এই রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—বসতে আজ্ঞা হোক (মর্যাদা প্রদর্শন)। যার পাঁঠা সে লেজে কাটুক, আমার কি? (যাহার উপর ক্ষোভ, সে হয়ত সম্মুখেই আছে, এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে)। খেতে যাচ্ছি, ভাত বাড়ুক। (হয়ত নিকটস্থা পত্নীকেই বলা হইতেছে, সঙ্কোচে বা লজ্জায় ইচ্ছার্থক ক্রিয়া)।

ইচ্ছার্থক বাক্য—যে বাক্যে আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে ইচ্ছার্থক বাক্য বলে। যেমন—(অস্ত্যর্থক)—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। শত্তুরের মুখে ছাই পড়ুক। (নাস্ত্যর্থক)—এমন সর্বনাশ যেন কারুর না হয়। মায়ের বুকে আর শেল হানিস্‌নি বাবা।

ইচ্ছার্থক বাক্যে ধাতুর শেষে উক, উন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত হইয়া ইচ্ছা প্রকাশ হয়। অনেক সময় ক্রিয়ার সঙ্গে অনুজ্ঞার অ, উন ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ইহা প্রকাশ হইতে পারে। অর্থাৎ বাংলায় ইচ্ছার্থক বাক্যেও অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন—সতীসীমন্তিনী হও মা (ইচ্ছার্থে অনুজ্ঞার ক্রিয়া)। হাতের নোয়া অক্ষয় হউক (ইচ্ছার্থক ক্রিয়া)। ভগবান মঙ্গল করুন (ইচ্ছার্থক ক্রিয়া)। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক (ইচ্ছার্থে অনুজ্ঞার ক্রিয়া)।

৩। অর্থানুসারে বাক্যের অপ্রধান বিভাগ

অর্থানুসারে বাক্যের আরো দুইটি অপ্রধান বিভাগ হইতে পারে—

(১) সাপেক্ষ বাক্য, (২) সন্দেহাত্মক বাক্য।

সাপেক্ষ বাক্য—যে বাক্যে মূল কার্য অন্য কার্যের উপর নির্ভরশীল তাহাকে সাপেক্ষ বাক্য বলে। সাপেক্ষ বাক্যের দুই ভাগ। একভাগ মূল অংশ, অন্য ভাগ অপেক্ষা অংশ; মূল ভাগে মূল ক্রিয়া থাকে। অন্যভাগে মূল ক্রিয়া ঘটিতে যে ক্রিযার অপেক্ষা সেই ক্রিয়া থাকে। সাপেক্ষ বাক্যের অপেক্ষা অংশ জটিলবাক্যে (complex sentence) প্রধান বাক্যের উপাদান বাক্য. (subordinate clause) হয়, এবং সরল বাক্যে তাহা -ইলে, -ইয়া, ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সমন্বিত বাক্যাংশ (phrase) মাত্র হয়। যেমন—

জটিল বাক্যে—তুমি আসিবে, নতুবা আমি যাইব না। পরিশ্রম কর,তবেই বিদ্যালাভ হইবে।

সরল বাক্যে—তুমি গেলে আমি আসিব। দরিদ্র বলিয়া সে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই।

সাপেক্ষ বাক্যের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক দুই প্রকার হয়।

(১) কার্যকারণাত্মক (২) সাধারণ অপেক্ষা বাচক

যখন অপেক্ষা অংশ পরবর্তী কার্যের কারণ (cause) স্বরূপ হয় তখন দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক কার্যকারণাত্মক। যেমন—পরিশ্রম কর, তবেই বিদ্যালাভ হইবে। দরিদ্র বলিয়া সে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই

যখন অপেক্ষা অংশ পরবর্তী কার্যের কারণ (cause)স্বরূপ না হইয়া সামান্য শর্ত (condition)-মাত্র হয়,তখন দুই অংশের সম্পর্ক সাধারণ অপেক্ষাবাচক। যেমন—তুমি আসিলে আমি যাইব। আমি না এলে খেতে বোসোনা।

সন্দেহাত্মক বাক্য—যে বাক্যে ক্রিয়া ঘটিবে কিনা এই সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, তাহাকে সন্দেহাত্মক বাক্য বলে।

যেমন—সে কি আমার কথা শুনিবে? রাম কি আজ আসিবে না? সে বোধ হয় বাড়ী গিয়াছে। বল কি? এমন লোক কি হয়? কি জানি, হতেও পারে।

সন্দেহাত্মক বাক্য প্রশ্নবোধক হইলে সাধারণতঃ 'কি' সর্বনাম যোগে গঠিত হয়। অবশ্য উচ্চারণভঙ্গীর দ্বারা প্রশ্নের ভাব প্রকাশ করিলে সর্বনাম ব্যতিরেকেই হইতে পারে। প্রশ্নবোধক ভিন্ন এ ক্ষেত্রে হয়ত, সম্ভবতঃ, বোধ হয়, হতে পারে, কি জানি, ইতাদি অব্যয় শব্দ যোগে হয়।

অনুশীলনী

১। বাক্য কাহাকে বলে?

২। বাক্যে পদবিন্যাস রীতি বলিতে কি বোঝায়?

৩। বাংলা বাক্যে কর্তৃপদ, ক্রিয়াপদ, মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম কোথায় বসে আলোচনা কর।

৪। দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাংলা ভাষার রীতিসিদ্ধ বাক্য রচনা কর—

(ক) অধিকরণ পদ ক্রিয়ার পরে বসিয়াছে।

(খ) সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে।

৫। বাংলা বাক্যে 'না' সূচক অব্যয় সাধারণতঃ কোথায় বসে? এই বিষয়ে ইংরেজি ও হিন্দীর সঙ্গে বাংলার তুলনা কর।

৭। বাংলায় বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়াপদের মধ্যে কালসঙ্গতি রক্ষিত হয় কি? এই বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলার তুলনা কর:—

৭। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর:—

নির্দেশ বাক্য। অনুজ্ঞা বাক্য। ইচ্ছার্থক বাক্য।

৮। সাপেক্ষ বাক্য বলিতে কি বোঝায়? নিম্নোক্ত উপায়ে একটি করিয়া সাপেক্ষ বাক্য গঠন কর:—

উপাদান বাক্য দ্বারা। অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা

৯। নিম্নলিখিত বাক্যদুইটি যথাসম্ভব কম পরিবর্তন করিয়া নির্দেশানুযায়ী রূপ দাও—

সে আজ যাবে ত? (ইচ্ছার্থক বাক্যে)

বসতে আজ্ঞা হউক। (অনুজ্ঞা বাক্যে)

১০। বাংলা ভাষারীতি অনুযায়ী পদ সন্নিবেশ কর—

(ক) আমার হাতে দেখিতেছ সেই পুঁথিখানি যাহা দিয়াছিলে কাল তুমি রমেশকে পড়িতে এবং পাঠ করিয়া যাহাপারে নাই করিতে হাস্য-সংবরণ রমেশ।

(খ) আমি ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলাম যখন সেই লোকটি যাহার ছিল একগাল দাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইয়া তখন আমার সম্মুখে বলিল কাতরভাবে বাবু দেবেন আমাকে দুটো পয়সা।

(গ) শুধু এই গর্বেই যে দেশ স্বাধীন হয়েছে যদি আমরা পড়ি হয়ে আজ আত্মবিস্মৃত তবে হবে না আর আমাদের দ্বারা দেশের কল্যাণকর ভবিষ্যৎ কোন সাংগঠনিক কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাচ্য (Voice)

ক্রিয়ার যে রূপভেদের দ্বারা বাক্যে কর্তা বা কর্মের প্রাধান্য নির্ণীত হয় তাহাকে বাচ্য (Voice) বলে।

প্রকৃতপক্ষে বাচ্য অনুযায়ী বাক্যের গঠনভঙ্গিটি সম্পূর্ণই পালটাইয়া যায়। ক্রিয়ার বাচ্য তিন প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ; ইহা ছাড়া অন্য এক প্রকার বাচ্য আছে, তাহার নাম কর্মকর্তৃবাচ্য।

(ক) **কর্তৃবাচ্য**—যে বাক্যে কর্তৃপদের প্রাধান্য থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদটি প্রধানভাবে কর্তার সহিত অন্বিত হয়, কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়, সেই বাক্যকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে।

কর্তৃবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তার প্রথম বিভক্তি ও কর্মের দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন,

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।
আমি ভাত খাইয়াছি।
বিপদে মোরে রক্ষা কর।

উপরিলিখিত বাক্যগুলি কর্তৃবাচ্যের উদাহরণ। প্রথম বাক্যটিতে উঠিয়াছে ক্রিয়া চাঁদ কর্তার পুরুষ অনুযায়ী প্রথম পুরুষ হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে খাইয়াছি ক্রিয়া আমি কর্তার পুরুষ অনুযায়ী উত্তম পুরুষ হইয়াছে। এবং তৃতীয় বাক্যে রক্ষা কর ক্রিয়া তুমি কর্তার (কর্তা উহ্য) পুরুষ অনুযায়ী মধ্যম পুরুষ হইয়াছে। এইভাবে উপরের বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার অন্বয় হইয়াছে কর্তৃপদের সহিত।

(খ) **কর্মবাচ্য**—যে বাক্যে কর্মপদকে প্রধান করিয়া, ক্রিয়ার অন্বয় কর্ম-পদের সহিত করা হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পুরুষ কর্মপদের পুরুষ অনুযায়ী হয়, সেই বাক্যকে কর্মবাচ্যের বাক্য বলে।

কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্মে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।*

---

* কর্মবাচ্য প্রয়োগে স্যাৎ তৃতীয়া কর্তৃকারকে।
প্রথমান্তং ভবেৎ কর্ম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদম্॥

যেমন—

আমি চাঁদ দেখিতেছি। (কর্তৃবাচ্য)
আমা কর্তৃক চাঁদ দৃষ্ট হইতেছে। (কর্মবাচ্য)
সে পুস্তক পাঠ করিতেছে। (কর্তৃবাচ্য)
তাহা দ্বারা পুস্তক পঠিত হইতেছে। (কর্মবাচ্য)

উপরে প্রথম কর্মবাচ্য বাক্যটিতে কর্তাকে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত করিয়া আমা কর্তৃক করা হইয়াছে, এবং ক্রিয়াকে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত চাঁদ কর্মের পুরুষ অনুযায়ী প্রথম পুরুষ করা হইয়াছে। কর্মবাচ্যের দ্বিতীয় বাক্যটিতেও এইভাবে কর্তাকে তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা করা হইয়াছে। এবং পুস্তক কর্মপদকে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত করিয়া ক্রিয়াকে কর্মের পুরুষ অনুযায়ী প্রথমা পুরুষ করা হইয়াছে।

ইংরেজি Passive Voice-এর সহিত বাংলা কর্মবাচ্যের একটু পার্থক্য আছে। ইংরেজিতে The moon is being seen by me বাক্যে moon কর্তা (কারণ ক্রিয়ার অন্বয় moonএর সঙ্গে) এবং me কর্ম (কারণ by অব্যয় দ্বারা যুক্ত)। কিন্তু বাংলায় বা সংস্কৃতে ক্রিয়ার সহিত অন্বয়হীন তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত কর্তাকেও কর্তাই বলা হইবে; তবে ইহার নাম হইবে **অনুক্ত কর্তা,** অর্থাৎ কর্তার সকল লক্ষণ (ক্রিয়ার সহিত অন্বয়) এখানে উক্ত (স্পষ্ট) নহে। এবং বাংলা ও সংস্কৃতে কর্মবাচ্যের কর্ম ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া, বা, বলিতে পারি, ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী হইয়াও কর্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না, কর্মই থাকিবে। এইখানেই ইংরেজি Passive Voiceএর সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত কর্মবাচ্যের পার্থক্য।

বাংলা কর্মবাচ্য অনেকটা সংস্কৃত ভাষাভঙ্গীরই অনুসরণ। তৃতীয়ান্ত কর্তৃপদ বাংলা ভাষার রীতিসিদ্ধ নহে। কর্মবাচ্যে অনেক স্থানেই কর্তার উল্লেখ হয় না। যেমন—চোরটা ধরা পড়িয়াছে। দশ আনা সের চাল বিক্রী হচ্ছে। বাঘটাকে মারা যায় নাই। ইত্যাদি।

কখনো কখনো কর্মবাচ্যের কর্তাকে তৃতীয়ান্ত না করিয়া ষষ্ঠ্যন্তও করা হয়। যেমন—আমার ভাত খাওয়া হইয়াছে (আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হইয়াছে)। রামের অঙ্ক করা হয় নাই (রামের দ্বারা অঙ্ক করা হয় নাই)। বরের বাপের মেয়ে দেখা হয়েছে (বরের বাপের দ্বারা মেয়ে দেখা হয়েছে)। ইত্যাদি।

(গ) ভাববাচ্য—যে স্থলে ক্রিয়াপদ অকর্মক হয় এবং ক্রিয়া কর্তার সহিতও অন্বিত হয় না, ক্রিয়ার পুরুষ যেখানে স্বাধীনভাবে নির্ণীত হয়, সেই ক্রিয়া-ভাব-প্রধান বাক্যকে ভাববাচ্যের বাক্য বলে।

ভাববাচ্যে কর্তার দ্বিতীয়া, ষষ্ঠি, সপ্তমী ইত্যাদি বিভক্তি হয়। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার পুরুষ সর্বদা প্রথম পুরুষের হয়। যেমন—

তোমাকে আসিতে হইবে।
আমায় যাইতে হইবে।
খোকার শোওয়া হয় নাই।
কোথায় থাকা হয়?

উপরের বাক্যগুলিতে কর্তৃপদে দ্বিতীয়া (তোমাকে), সপ্তমী (আমায়), ষষ্ঠি (খোকার) হইয়াছে। শেষ বাক্যটিতে কর্তৃপদ উহ্য রহিয়াছে, উহ্য কর্তায় ষষ্ঠি বা তৃতীয়া (আপনার, আপনাকর্তৃক) বিভক্তি আছে। উপরের বাক্য সমূহে ক্রিয়ার পুরুষ কর্তানুযায়ী হয় নাই; কর্মানুসারী হইতেই পারে না, কারণ ক্রিয়াগুলি অকর্মক; এখানে ক্রিয়ার পুরুষ স্বাধীনভাবে সর্বদা প্রথম পুরুষ হইয়াছে।

(ঘ) **কর্মকর্তৃবাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়াপদ সকর্মক হয়, এবং কোন কিছুর কর্তৃত্ব ব্যতিরেকেই ক্রিয়া সংঘটিত হয় অথচ ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মের অন্বয় থাকে এবং কর্মকে বাহ্যতঃ কর্তা বলিয়া মনে হয় এইরূপ বাক্যকে কর্মকর্তৃ-বাচ্যের বাক্য বলা হয়। কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্ম প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন—

বিছানা গরম লাগে।
লাঠিটা ভেঙ্গে গেল।
জোর লড়াই বেধেছে।
এতে ভাল হয় না।

উপরের বাক্যগুলিতে ক্রিয়া স্বতঃই ঘটিতেছে। 'ল ক্রিয়ার সংঘট বিছানা নহে। কি গরম লাগে? না, বিছানা। অর্থাৎ বিছানা লাগে সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম। অথচ বাক্যটিতে একেবারে কর্তা সাজিয়া বসিয়াছে। কর্তার মতই বিভক্তি এবং কর্তার মতই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়। লাঠিটা, লড়াই, ভাল ইত্যাদিতেও সকর্মক ক্রিয়ার কর্মই কর্তৃবৎ প্রতীত হইতেছে এবং সকর্মক ক্রিয়াগুলি স্বতঃ সংঘটিত হইতেছে।

২। বাচ্যান্তরীকরন

(কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে)

(ক) প্রত্যয়যোগে কর্মবাচ্য (Inflexional Passive)—বাংলায় কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে পরিবর্তনের জন্য প্রাচীন বাংলায়

এ প্রত্যয় যোগ করা হইত। যেমন—**কহএ** সকল লোকে (সকল লোক দ্বারা কথিত হয়)। কোথা না **শুনিএ** (কোথাও শ্রুত হয় না)। ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলায়ও এই রীতি প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। যেমন—অন্যায় কাজ করে না (কৃত হয় না, ন ক্রিয়তে) জ্বর হলে ভাত খায় না (খাদিত হয় না, ন খাদ্যতে।) এমন খুব দেখা যায় (দৃষ্ট হয়, দৃশ্যতে ইত্যাদি)।

প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কর্মবাচ্যের একটি বিশেষ অর্থদ্যোতনা আছে। এই বাক্যগুলি প্রায়ই কোন **রীতি, আচার, স্বভাব, কর্তব্য** ইত্যাদি উল্লেখ করে।

(খ) বিশ্লেষণাত্মক কর্মবাচ্য (Analytical Passive)— বাংলার এই বিশ্লেষণাত্মক কর্মবাচ্যই সমধিক প্রচলিত। এই রীতিতে ধাতুকে প্রথমেই **বাংলা আ প্রত্যয়** বা **সংস্কৃতে ক্ত প্রত্যয়** যোগ করিয়া বিশেষণ করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর এই বিশেষণের সহিত **হ, যা, পড়্, চল্, ঘট্** ইত্যাদি ধাতুযোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

যেমন—কর্ ধাতুর সহিত আ প্রত্যয় বা ক্ত প্রত্যয়যোগে **করা, কৃত** হইল। ইহার সহিত হ ধাতু যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া হইল **করা হইয়াছে, কৃত হইয়াছে**।

যেমন, ধর ধাতুর সহিত আ প্রত্যয় ব্যক্তি প্রত্যয় যোগে **ধরা, ধৃত** হইল। ইহার সহিত পড় এবং হ ধাতু যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া হইল **ধরা, পড়িয়াছে, ধৃত হইয়াছে**।

যেমন—দেখ্ বা দৃশ্ ধাতুর সহিত আ প্রত্যয় বা ক্ত প্রত্যয় যোগে **দেখা, দৃষ্ট** হইল। ইহার সহিত যা এবং হ ধাতু যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া হইল **দেখা যাইতেছে, দৃষ্ট হইতেছে**।

নিম্নে কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখানো হইল। (শুধু সকর্মক ক্রিয়াযুক্ত বাক্যগুলিকেই কর্মবাচ্যে পরিবর্তন সম্ভব। ক্রিয়া সকর্মক না হইলে কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে।)

কর্তৃবাচ্য	**কর্মবাচ্য**
আমি অনেকদিন ভাত খাই না	আমা দ্বারা অনেকদিন ভাত খাওয়া হয় না। (বাংলা বাক্‌রীতির বিরুদ্ধ) আমার অনেকদিন ভাত খাওয়া হয় না।

এতদিন ইহা বুঝি নাই।	এতদিন ইহা বুঝা যায় নাই। (কর্তা উহ্য আছে)
বাঘে মানুষ মারিয়াছে	বাঘ কর্তৃক মানুষ মারা হইয়াছে। (বাংলা বাক্রীতির বিরুদ্ধ) বাঘের মানুষ মারা হইয়াছে। (বাংলা বাক্রীতির বিরুদ্ধ)
তস্কর পুস্তকটি অপহরণ করিয়াছে।	তস্কর কতৃক পুস্তকটি অপহৃত হইয়াছে। (সংস্কৃতানুসারী ভাষা ব্যতীত কর্তৃক রীতিবিরুদ্ধ)
মিথ্যা কথা বলিও না।	মিথ্যা কথা বলে না। (কর্তব্য নির্দেশ বলিয়া প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্য)
বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণ কৌমুদী প্রণয়ন করিয়াছেন।	ব্যাকরণকৌমুদী বিদ্যাসাগর মহাশয় (কর্তৃক) প্রণীত। (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিয়া কর্তৃক বাদ দিলেই ভাল হইবে)

(কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে)

কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হইলে স্বভাবতই তাহার ভাববাচ্যে রূপান্তর হয়। কিন্তু কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া সকর্মক হইলে তাহাকে ভাববাচ্যে অকর্মক রূপ দিতে হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত প্রধানতঃ হ যা ইত্যাদি ধাতুযোগে ভাব বাচ্যের ক্রিয়াপদ রচিত হয়। এই ক্রিয়া সর্বদাই প্রথমপুরুষে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য	**ভাববাচ্য**
সে যাইবে	তাহার যাওয়া হইবে
আমি যাইব।	আমার যাওয়া হইবে না।
খোকা শুইয়াছে।	খোকার শোওয়া হইয়াছে।

বাংলায় রীতি, স্বভাব ইত্যাদি অর্থে ভাববাচ্যের কতকগুলি রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদের কর্তৃবাচ্যরূপ হইতে ভাববাচ্যই অধিক প্রচলিত। যেমন—*সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না* (চাহিতে পারিনা বিরল)। *খালি পায়ে পথ চলা যায় না* (চলিতে পারিনা বিরল)। এমন কাজ করা চলে না (কর্তৃবাচ্যরূপবিরল)।

আদেশ, নির্দেশ, ইচ্ছা ইত্যাদি সূচক কর্তৃবাচ্য বাক্যেরও ভাববাচ্যে রূপান্তর সুন্দর হয়। যেমন—এবার ক্লাসে ফার্স্ট হবে। এবার ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া চাই। দুপুরের মধ্যে কাজটা করবে। দুপুরের মধ্যে কাজটা করা চাই

আপনি বলিব না তুমি বলিব বুঝিতে না পারায় অথবা অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মানার্থে ভাববাচ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন, মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়? (সম্মানার্থে)। কোথায় যাওয়া হবে? (আপনি বলিব না তুমি বলিব বুঝিতে না পারায়)।

অনুশীলনী

১। বাচ্য কাহাকে বলে?

২। সংজ্ঞা বল ও দৃষ্টান্ত দাও—

(ক) কর্মবাচ্য। (খ) ভাববাচ্য। (গ) কর্মকর্তৃবাচ্য।

৩। ইংরেজি Passive Voice ও বাংলা কর্মবাচ্যে পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল।

৪। প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্য গঠনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৫। কর্মবাচ্যগঠনের বিশ্লেষণাত্মক রীতিটি বুঝাইয়া বল।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি কোন বাচ্যের বল—

তোমার আসা চাই। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে। এমন কাজ করে না। বিছানা গরম লাগে। মিথ্যা কথা বলিও না। ইহা বুঝা যায় নাই।

৭। বাচ্যান্তর কর (যেখানে বাচ্যান্তরিত রূপ ভাষারীতির বিরুদ্ধ হইবে তাহাও বল)—

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এতদিন কোথায় ছিলে? সে গাছ হইতে পড়িয়া গেল। কেহই জ্বর হইলে ভাত খাইবে না। কে তোমাকে এই চিঠি লিখিয়াছে? সকলেই তাহাকে আদর করে।

৮। প্রয়োগ দেখাও:—

(ক) কর্তব্য নির্দেশ প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্য। (খ) স্বভাব বুঝাইতে ভাববাচ্য। (গ) ইচ্ছা বুঝাইতে ভাববাচ্য। (ঘ) অপরিচিতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভাববাচ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

(বাক্য বিশ্লেষণ)

১। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যেই কাহারো সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। বাক্যে যাহার সম্বন্ধে বলা হয় তাহা বাক্যের **উদ্দেশ্য,** এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা বলা হয় তাহা **বিধেয়।**

যেমন—জল পড়ে। পাতা নড়ে। এই বাক্যগুলিতে প্রথম বাক্যে **জল** সম্পর্কে বলা হইতেছে। কি বলা হইতেছে ? বলা হইতেছে **পড়ে।** দ্বিতীয় বাক্যে **পাতা** সম্পর্কে বলা হইতেছে। কি বলা হইতেছে ? বলা হইতেছে **নড়ে।** অতএব উপরের বাক্য দুইটিতে 'জল'ও 'পাতা' উদ্দেশ্য এবং 'পড়ে' ও 'নড়ে' বিধেয়।

বাক্যমাত্রেরই দুইটি অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে অবশ্যই একটি নামপদ থাকে এবং বিধেয় অংশে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। এই দুইটি মূল পদের সঙ্গে বাক্যের অর্থকে অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য অন্যান্য পদ যুক্ত হয়। তাহাতে বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয় অংশ এই দুই অংশই সম্প্রসারিত হইয়া যায়। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে নামপদের (বিশেষ্য, সর্বনাম) পরিবর্তে বিশেষণ পদ কিম্বা কোন বাক্যাংশ (phrase) কর্তারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এবং উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ কালে এই কর্তার সহিত সম্বন্ধ পদ ও নানা বিশেষণাদি যুক্ত করিয়া লইতে হয়। এইরূপ বিধেয় অংশকে সম্প্রসারিত করিবার সময় সমাপিকা ক্রিয়াটির সঙ্গে ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদি যোগ করা যায়, এবং ক্রিয়ার যে কর্ম থাকে তাহাকেও বিশেষণ ও সম্বন্ধাদি পদদ্বারা বিশেষিত করিয়া লওয়া চলে।

নিম্নে কয়েকটি বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় নির্ণয় করা হইল—

(বাক্য সমূহ)

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

তোমার দাদার ছেলে এখন কোথায় ?

আজ স্কুলে যাইতে পারিব না।

আঃ কি আরাম !

গঙ্গার পশ্চিম তটে বারাণসী।

চারটার সময় আমাদের স্কুল ছুটি হয়।

(উদ্দেশ্য বিধেয় নির্ণয়)

উদ্দেশ্য	বিধেয়
হাড়	একদা এক বাঘের গলায় ফুটিয়াছিল
তোমার দাদার ছেলে	এখন কোথায় (আছে)
(আমি)	আজ স্কুলে যাইতে পারিব না
কি আরাম	আঃ (লাগিতেছে)
বারাণসী	গঙ্গার পশ্চিম তটে (হয়)
আমাদের স্কুল	চারটার সময় ছুটি হয়

নিম্নে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারণের দুই একটি আদর্শ দেখানো হইল—

সাজাহান তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন।

উপরের বাক্যটিতে সাজাহান উদ্দেশ্য এবং বাকী অংশ বিধেয়।

উদ্দেশ্য অংশকে নিম্ন প্রকারে সম্বন্ধপদ ও বিশেষণাদি যোগে সম্প্রসারিত করা যায় :—

সাজাহান, ভারতঈশ্বর সাজাহান, মোগল সম্রাট ভারতঈশ্বর সাজাহান, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র মোগল সম্রাট ভারতঈশ্বর সাজাহান, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র প্রভূত রণবিজয়ী মোগল সম্রাট ভারতঈশ্বর সাজাহান·········

বিধেয় অংশে ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়া বিশেষণ ও তাহার কর্মের সহিত সম্বন্ধপদ ও বিশেষণাদি যোগ করিয়া, ক্রিয়ার অধিকরণ ও করণ অর্থাৎ ক্রিয়া ঘটিবার স্থান কাল ও ক্রিয়াসাধনের উপায়াদির উল্লেখ করিয়া বিধেয় অংশকে সম্প্রসারিত করা চলে :—

তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, অপূর্ব সুন্দর তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, স্থাপত্যশিল্পের অবিস্মরণীয় কীর্তি অপূর্ব সুন্দর তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, বিংশতি বৎসরের নিরলস সাধনার ফলে কলপ্রবাহিনী যমুনার পশ্চিম তটে স্থাপত্যশিল্পের অবিস্মরণীয় কীর্তি অপূর্ব সুন্দর তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন···

২। বাক্যের প্রকার ভেদ

গঠন অনুযায়ী বাক্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) **সরল বাক্য**, (২) **জটিল বাক্য (মিশ্রবাক্য)**, (৩) **যৌগিক বাক্য**।

(১) **সরল বাক্য (Simple Sentence)**—যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তৃপদ ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহাকে সরল বাক্য বলে। যেমন, রাম ভাল ছেলে। যদু চার বৎসর ধরিয়া এক ক্লাসে পড়িতেছে।

মহামতি অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য আপন কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পঠাইয়া ছিলেন।

(২) **জটিল বাক্য, (Complex Sentence)**—একটি প্রধান বাক্যের সহিত তদঙ্গীভূত অপ্রধান বাক্য যোগে যে বাক্য গঠিত হয় তাহাকে জটিল (বা মিশ্র) বাক্য বলে।

একই বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলিকে উপাদান বাক্য (clause) বলা হয়। প্রত্যেকটি উপাদান বাক্যেই একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। এইজন্য জটিল বাক্যে কর্তা একাধিক, সমাপিকা ক্রিয়াও একাধিক। জটিল বাক্যের উপাদান বাক্যগুলির পরস্পর সম্পর্কিত, একটি ব্যতীত অপরটির সঠিক অর্থবোধ হয় না। যেমন—

রাম দেখিল যে যদু চলিয়া যাইতেছে।

এই বাক্যটিতে উপাদান বাক্য দুইটি—(১) রাম দেখিল, (২) যদু চলিয়া যাইতেছে। এখানে প্রধান উপাদান বাক্য, রাম দেখিল। এবং অপ্রধান উপাদান বাক্য, যদু চলিয়া যাইতেছে। এই বাক্য দুইটি **যে** অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়া পূর্ণ বাক্য গঠন করিয়াছে।

জটিলবাক্যে একটি প্রধান উপাদান বাক্য (Principla clause) থাকে এবং তাহার সঙ্গে এক বা একাধিক অপ্রধান উপাদান বাক্য থাকে।

অপ্রধান বাক্য অর্থানুসারে তিনপ্রকার হইতে পারে—

(ক) বিশেষ্য স্থানীয় (Noun clause), (খ) নামবিশেষণ স্থানীয় (Adjective clause), (গ) ভাববিশেষণ স্থানীয় (Adverbial clause)।

(ক) যে উপাদান বাক্য প্রধান বাক্যের কোন পদের সহিতবিশেষ্যের মত অন্বিত হয তাহকে বিশেষ্য স্থানীয় উপাদান বাক্য (Noun clause) বলে। যেমন :—

সম্পূর্ণবাক্য	প্রধান উপাদান বাক্য	বিশেষ্য স্থানীয় বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
(১) রাম দেখিল যে যদু চলিয়া যাইতেছে।	রাম দেখিল	যদু চলিয়া যাইতেছে	দেখিল ক্রিয়ার কর্ম, যে অব্যয় দ্বারা যুক্ত
(২) মিথ্যা কথা বলা দোষ ইহা সকলেই জানে।	ইহা সকলেই জানে	মিথ্যা কথা বলা দোষ	ইহা কর্তৃপদের সমপদ

(খ) যে উপাদান বাক্য নামবিশেষণের মত প্রধান বাক্যের কোন পদকে বিশেষিত করে তাহা নামবিশেষণীয় উপাদান বাক্য (Adjective clause) যেমন—

সম্পূর্ণবাক্য	প্রধান উপাদান বাক্য	নাম বিশেষণ স্থানীয় উপাদান বাক্য	প্রধান পদের সহিত সম্বন্ধ
(১) যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল।	তাহাই হইল	যাহা ভাবিয়াছিলাম	তাহা পদের বিশেষণ
(২) যে রাজা সর্বাপেক্ষা সুন্দর তিনিই নল।	তিনিই নল (ছিলেন ক্রিয়া উহ্য)	যে রাজা সর্বাপেক্ষা সুন্দর (ছিলেন ক্রিয়া উহ্য)	তিনি পদের বিশেষণ

(গ) যে উপাদান বাক্য ভাববিশেষণের মত প্রধান বাক্যের কোন পদকে বিশেষিত করে তাহা ভাববিশেষণীয় উপাদান বাক্য (Adverbial clause)। যেমন—

সম্পূর্ণবাক্য	প্রধান উপাদান বাক্য	ভাববিশেষণ স্থানীয় উপাদান বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
(১) তুমি যদি না আস তবে আমি যাইব না।	(তবে) আমি যাইব না	(যদি) তুমি না আস	যাইব না ক্রিয়ার সাপেক্ষ সূচক; তবে, যদি সংযোজক
(২) তুষের আগুন যেমন জ্বলে তেমন জ্বলিতেছি।	(তেমন) (আমি) জ্বলিতেছি	তুষের আগুন (যেমন) জ্বলে	জ্বলিতেছি ক্রিয়ার বিশেষণ; যেমন, তেমন সংযোজক।

৩। **যৌগিক বাক্য (Compound Sentence)**—পরস্পর নিরপেক্ষ একাধিক বাক্য কোন সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হইলে সেই সমগ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন—

রাম স্কুলে গেল এবং আমি বাড়ি ফিরিলাম।

উপরের বাক্যটিতে দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ বাক্যকে এবং অব্যয় দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। জটিল বাক্যে যে উপাদান বাক্যগুলি থাকে তাহারা অর্থের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল; কিন্তু অব্যয় দ্বারা সংযোজিত যৌগিকগুলি পরস্পর নির্ভরশীল নহে, অর্থাৎ একটিকে বাদ দিয়াও অপরটির অর্থ হইতে পারে, কিন্তু জটিলবাক্যে কোন উপাদান বাক্য বাদ দিলে সমগ্র বাক্যের অর্থহানি ঘটিবে।

যৌগিকবাক্য একাধিক সরলবাক্য বা একাধিক জটিল বাক্য, বা সরল ও জটিল ইত্যাদি নানা বাক্য সমন্বয়ে হইতে পারে। যৌগিক বাক্যে সাধারণতঃ ও, এবং, আর, আরও, কিন্তু, সুতরাং, বরং, অপি, অপিচ ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

আমি দরিদ্র, কিন্তু আত্মমর্যাদাহীন নই।
তুমি আসিওনা, বরং আমিই যাইব।
তুমি অন্যায় করিয়াছ, তাই শাস্তি পাইলে।
(সংযোজক অব্যয় উহ্য) রাম ভাত খায়, লীলা রুটি খায়।*

৩। বাক্য পরিবর্তন

(সরল হইতে জটিল)

সরল	জটিল
ধনবানেরা সুখী।	যাহাদের ধন আছে তাহারা সুখী।
বিদ্যাহীনের জীবন বৃথা।	যাহার বিদ্যা নাই তাহার জীবন বৃথা।
পড়িলেই জানিতে পারিবে।	যদি পড়, তবেই জানিতে পারিবে।
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।	আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু চেষ্টা করিব।

* "রাম এবং শ্যাম আসিতেছে"—এইরূপ বাক্যকে কেহ কেহ যৌগিক বাক্য বলিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, এই বাক্যের অর্থ "রাম আসিতেছে এবং শ্যাম আসিতেছে" নহে। ইহার অর্থ "রাম এবং শ্যাম"—অর্থাৎ তাহারা আসিতেছে; এইভাবে ইহা সরল-বাক্য, যৌগিক নহে।

কবিগণমধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ।	যত কবি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ।
আমি চোদ্দ বছরে ম্যাট্রিক দিয়াছি।	আমার যখন চৌদ্দ বছর তখন ম্যাট্রিক দিয়াছি।
জ্বর হইলে ভাত খাইও না।	যখন জ্বর হয় তখন ভাত খাইও না।

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে বাক্যমধ্যের কোন পদকে সম্প্রসারিত করিয়া কিভাবে অপ্রধান উপাদান বাক্য সৃষ্টি করা যায়। তারপর এই অপ্রধান উপাদান বাক্য বিশেষ্য স্থানীয় হইবে, না নামবিশেষণ বা ভাববিশেষণ স্থানীয় হইবে এই-গুলি বুঝিয়া লইতে হইবে। তারপর আগের সরলবাক্যের ক্রিয়াপদটিকে জটিল বাক্যের প্রধান উপাদান বাক্যের ক্রিয়াপদ রাখিয়া যে সে, যাহা তাহা ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম, অথবা যখন তখন, যদি তবে ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়যোগে অপ্রধান উপাদান বাক্য যোজনা করিতে হইবে।

(সরল হইতে যৌগিক)

সরল	যৌগিক
সে ভাত খাইয়া স্কুলে গেল।	সে ভাত খাইল, তারপর স্কুলে গেল।
তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও আসিয়াছেন।	তিনি অসুস্থ তথাপি আসিয়াছেন।
তুমি পাশ করায় সকলেই খুশী হইয়াছে।	তুমি পাশ করিয়াছ, এজন্য সকলেই খুশী হইয়াছে।
ধনবান হইয়াও তিনি বিনীত।	তিনি ধনবান, অথচ তিনি বিনীত।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করিতে হইলে দেখিতে হইবে কিভাবে ইহাকে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি বাক্যে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। দুইটি পূর্ণবাক্যে দুইটি সমাপিকা ক্রিয়া দরকার, সুতরাং দেখিতে হইবে আর একটি সমাপিকা ক্রিয়া কিভাবে করা যায়। সরলবাক্যে যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি থাকে তাহাকেই অন্যতর সমাপিকা ক্রিয়া করিয়া দুইটি বাক্য পাওয়া যাইবে। তাহার পর বাক্য দুইটিকে যে কোন সংযোজক অব্যয় দিয়া জুড়িয়া দিলেই হইল। অনেক সময় সংযোজক অব্যয় উহ্যও রাখা চলে। তবে, যে সরল বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া নাই তাহাকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করা যায় না। আমি ভাত খাই—এই বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করা যাইবে কি করিয়া?

(জটিল হইতে সরল)

জটিল	সরল
যাহার শক্তি আছে সে কখনো ইহা সহ্য করিবে না।	শক্তিমান ব্যক্তি কখনো ইহা সহ্য করিবে না।
যাহার অন্ন নাই তাহাকে অন্ন দিবে।	শক্তি থাকিলে কেহ ইহা সহ্য করে না।
	নিরন্নকে অন্ন দিবে।
যেই রোদ উঠিল, আমরা নৌকা ছাড়িলাম।	রোদ উঠিবামাত্র আমরা নৌকা ছাড়িলাম।
সে যে ভাল তা সবাই জানে।	সবাই তাকে ভাল বলে জানে।

জটিল বাক্যকে সরলবাক্যে রূপ দিবার সময় জটিল বাক্যের অপ্রধান উপাদান বাক্যকে একটি পদ বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিতে হইবে। অপ্রধান উপাদান বাক্য যদি বিশেষ্যস্থানীয় হয় তবে সাধারণতঃ পদ বা পদসমষ্টি বিশেষ্য হইবে, এইরূপ নামবিশেষণ ও ভাববিশেষণীয় উপাদান বাক্যের পরিবর্তেও অনুরূপ পদ বা পদসমষ্টি সৃষ্টি করিতে হইবে। বিশেষ্যস্থানীয় ও নামবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্যের পরিবর্তে প্রায় অনেক সময়ই সমাসবদ্ধ পদ স্থাপন করিতে হয়।

(যৌগিক হইতে সরল)

যৌগিক	সরল
তিনি বিদ্বান কিন্তু বিনয়ী নহেন।	তিনি বিদ্বান হইলেও বিনয়ী নহেন।
রামের পিতার মৃত্যু হইয়াছে এইজন্য সে আসিতে পারে নাই।	পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রাম আসিতে পারে নাই।
সে লাঠিটা কাঁধে তুলিয়া লইল এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।	সে লাঠিটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিবার সময় দেখিতে হইবে সেই সমগ্র বাক্যের একাধিক পূর্ণবাক্যগুলির মধ্যে কোনটিতে মুখ্য বিষয় বা পরের ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন উপরের প্রথম যৌগিক বাক্যটিতে বিনয়ী নহেন কথাটিই মুখ্য ; দ্বিতীয় বাক্যটিতে আসিতে পারে নাই পরের ঘটনা, তৃতীয় বাক্যটিতে বাহির হইয়া যাওয়া পরের ঘটনা। এইসব ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় বা পরের ঘটনাটিকে সরলবাক্যে অপরিবর্তিত রাখিতে হইবে। যদি যৌগিকের বাক্যগুলির মধ্যে এইরূপ তারতম্য না থাকে, তবে তাহাকে সরলবাক্যে পরিণত করা যায় না, যেমন আমি গান গাই এবং তুমি তবলা বাজাও—এই যৌগিক বাক্যে দুইটি বিষয়ই সমান প্রধান, এজন্য ইহাকে সরলবাক্যে পরিবর্তন অসম্ভব।

অনুশীলনী

১। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ কাহাকে বলে উদাহরণ সহ উত্তর বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নের বাক্যগুলিতে উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয় অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও :—

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। একটা কথা শোন। শিগগির যাও। দিল্লী কলিকাতা হইতে নয়শত মাইল দূরে। আমরা কি আপনার নিকট হইতে এতটুকুও প্রত্যাশা করিতে পারি না? সাঁ-সাঁ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। গঙ্গার পশ্চিম পারে বারাণসী। তোমার মেজপিসীমার খুড়শাশুড়ীর সইএর বৌএর বোনঝি জামাই এখন কোথায়?

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত কর :—

(ক) কলিকাতা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত।

(খ) নিমাই সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিল।

৪। উপাদান বাক্য কাহাকে বলে বুঝাইয়া দাও।

৫। ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও :—

সরল বাক্য। জটিল বাক্য। যৌগিক বাক্য।

৬। জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের গঠনে পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল।

৭। নিম্নের বাক্যগুলিকে তাহাদের উপাদান বাক্যে বিশ্লেষিত করিয়া দেখাও :—

মিথ্য কথা বলা দোষ ইহা সকলেই জানে। যে রাজা সর্বাপেক্ষা সুন্দর তিনিই নল। তুষের আগুন যেমন জ্বলে তেমনি জ্বলিতেছি।

৮। নির্দেশানুযায়ী রূপান্তরিত কর :—

ধন থাকিলেই সুখী হয় না। (জটিল বাক্যে)

যত কবি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ। (সরল বাক্যে)

দুঃখ সত্ত্বেও তিনি নিরুদ্বেগ। (যৌগিক বাক্যে)

যাহার বুদ্ধি আছে সে কখনো ইহা বলিবে না। (সরল বাক্যে)

বৃষ্টি হইবামাত্র কৃষকেরা লাঙ্গল লইয়া মাঠে ছুটিল। (জটিল বাক্যে)

অসুস্থ হওয়ায় সে আসিতে পারে নাই। (যৌগিক বাক্যে)

চতুর্থ অধ্যায়

১। বাগ্‌ধারা (Idioms)

ব্যাকরণ বা অভিধান সম্মত ভাবে শব্দ যোজনা করিলেই রচনা সর্বত্র সুন্দর হয় তাহা নহে ; রচনাকে সরস ও প্রাণবাণ করিতে হইলে প্রত্যেক ভাষায়ই শব্দাদির যে বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে তাহা জানিয়া লইতে হয়। এই বিশিষ্ট প্রয়োগগুলি প্রায়ই ব্যাকরণ অভিধানের শাসন মানে না, ইহারা লোকমুখে ব্যবহৃত হইতে হইতে তাহাদের অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তির গুণে ভাষায় নিজের স্থান করিয়া লয়।

দুই একটি উদাহরণ লওয়া যাক্—

ইংরেজিতে **নষ্ট হওয়া** অর্থে বাগ্‌ধারা বা idiom আছে **going to dogs,** কিন্তু কোনো নতুন বাংলাশেখা সাহেব যদি তাহার তর্জমা করিয়া বলেন, **ছেলেটা কুত্তায় যাইতে বসিয়াছে,** তবে অর্থ ত কিছু হইবেই না, বরং প্রচুর হাস্যোদ্রেক করিবে। এইরূপ নষ্ট হওয়া অর্থে বাংলা বাগ্‌ধারা বা idiom **বয়ে** যাওয়া কে নূতন ইংরেজিশেখা বাঙ্গালী যদি তর্জমা করিয়া বলে, **the boy is flowing away** তবে অর্থের দিক হইতে বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই লোকব্যবহার এবং বহুল প্রচলন দ্বারা বাগ্‌ধারা গড়িয়া উঠে। তাই ইহাকে একেবারে যথাযথ ভাবেই প্রয়োগ করিতে হয়। সামান্যতম তারতম্যও সেখানে ভাষাভঙ্গীটিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে।

আরো দুই একটি উদাহরণ :—

আমরা **নষ্ট হওয়া** অর্থে বলি **মাটি হওয়া ;** কিন্তু কেহ যদি বলে **সব কাজ মৃত্তিকা হইয়াছে** তবে তাহা একটা হাস্যকর উক্তি হইবে। **মরা** অর্থে আমরা বলি **পটল তোলা** : কিন্তু কেহ যদি বলে, **পটল উত্তোলন করিয়াছে ;** তাহাতে কোনো অর্থই হইবে না।

২। নানা বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট প্রয়োগগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ (Idiomatic uses of Nouns)

(২) ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ (Idiomatic uses of Verbs)

(৩) বিশেষণ ও অব্যয়াদি পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ (Idiomatic uses of Adjectives etc.)

(৪) বিবিধ শব্দ ও পদসমষ্টির বিশিষ্ট প্রয়োগ (Idiomatic uses of words and phrases)

(৫) ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ ও যুগ্ম শব্দাদির ব্যবহার (Idiomatic uses of Onomatopoetics and Reduplicated words)

(৬) লোকোক্তি সমূহ (Proverbs)

নিম্নে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে নানা বিশিষ্ট প্রয়োগের আলোচনা হইল।

৩। বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(বিশেষ্যপদ মধ্যে মধ্যে ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া ক্রিয়া পদ গঠন করে)

হাত

পাকা হাত—মোজাটা মাসী বুনেছে, তাই এমন পাকা হাতের কাজ।

কাঁচা হাত—দেখলেই বোঝা যায় একেবারে কাঁচা হাতের কাজ।

হাত খরচ—আচ্ছা, এই দুই টাকা তোমার হাত খরচ দিলাম।

হাত পাতা—আমি যার তার কাছে হাত পাততে পারব না।

হাত আসা—কাজটা করিতে করিতেই হাত আসিয়া যাইবে।

হাত লাগান—এই সামান্য কাজে আর আপনার হাতলাগাইতেহইবেনা।

হাত গুটান—কিহে, একেবারে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলে ; আমি একা আর কত পারি ?

হাতে থাকা—দশের শূন্য নামে, হাতে থাকে এক।

মাথা

গ্রামের মাথা—নকড়ি বাবুর পরে গ্রামের নবদ্বীপ ঘোষালই গ্রামের মাথা।

রাস্তার মাথা—ঐ বড় রাস্তার মাথায় একটা বাড়ি উঠছে।

রাগের মাথা—রাগের মাথায় যা মুখে আসে তাই বলছে।

দইএর মাথা—জামাইর পাতে দইএর মাথাটা দাও।

মাথা ব্যথা—আমার এত কি মাথা ব্যথা যে তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইব।

মাথা কাটা—ওঃ, উনি একেবারে আমার মাথাটা কেটে নেবেন।

মাথা কাটা যাওয়া—ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথা কাটা গিয়াছে।
মাথা খাও—আমার মাথা খাও, সময় মত অষুধটা খেও।
মাথা-দেওয়া—এসব কাজে তুমি মাথা দিতে যেও না।
মাথা কেনা—একটা টাকা দিয়ে একেবারে মাথা কিনেছেন আর কি?
মাথায় ওঠা—বুঝলে, বানরকে আদর দিলে মাথায় উঠে।
মাথা ঘামান—তোমার বিষয় নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাতে পারি না।
মাথা ঠাণ্ডা করা—মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ, কাজটা ঠিক হয়েছে। কিনা।

মুখ

মুখচোরা—ছেলেটি বড় মুখচোরা, কারুর দিকে তাকাতেই পারে না।
মুখপোড়া—মুখ পোড়া মিন্সের জ্বালায় আর পারিনে।
মুখভার—এমন মুখভার করে বসে রয়েছ কেন, হয়েছে কি?
মুখচুন—কথাটা শুনে তার মুখচুন হয়ে গেল।
মুখে আগুন—ফেলে দে ফেলে দে, এমন টাকার মুখে আগুন।
মুখনাড়া—দেখ, কথায় কথায় এমন মুখনাড়া দিও না।
মুখচাওয়া—তার মুখ চেয়ে আর কতকাল বসে থাকবে?
মুখরক্ষা—তপেনই এ বংশের মুখরক্ষা করেছে।
মুখপাতলা—লোকটা মুখপাতলা, যা তা বলে ফেলে।

চোখ

চোখের বালি—ছোট বউ যেন সবার চোখের বালি!
চোখের দেখা—তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে দিলে না।
চোখ উঠা—চোখ উঠলে তবে গোলাপ জল দিও।
চোখ ফোটা—উঃ আমার চোখ ফুটল, কি ভুলই করেছিলাম।
চোখ খোলা—তার কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেছে।
চোখ টেপা—দুজনে চোখ টিপে টিপে হাসছ কেন? হয়েছে কি?
চোখ ঠারা—ওরা চোখ ঠারাঠারি করে কি যেন বললে।
চোখ রাখা—এই বিষয়টার উপরও একটু চোখ রাখিও।
চোখে চোখে রাখা—বড় দুরন্ত ছেলে, চোখে চোখে রাখিও।
চোখের মাথা খাওয়া—তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, এইটুকুও দেখতে পাও না!

চোখ পাকান
চোখ রাঙান } —তোমার এ চোখ পাকানোকে আমি ডরাই না।

চোখ লাগা—আহা, খাসা জিনিস, আমার চোখে লেগেছে।

চোখে পড়া—না, একটা ভুলও চোখে পড়ল না।

বিশেষ্যপদের বিশেষ প্রয়োগ বাংলায় অফুরন্ত। ব্যাকরণে অভিধানে ইহার সমগ্ররূপ প্রকাশ করা অসম্ভব। বিশেষ্যপদের বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের বাংলায় দুইটি রীতি আছে। কখনো কখনো বিশেষ্যপদগুলির অপ্রধান অর্থ প্রধান হয়। যেমন—গাঁয়ের মাথা, রাগের মাথা ইত্যাদিতে মাথা পদটি। আবার কখনো কখনো বিশেষ্যপদগুলি এক একটি ধাতুর সহযোগে বিশিষ্টার্থক ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। মাথা খাওয়া, মাথা পাতা, মাথায় উঠা ইত্যাদি এই রীতির উদাহরণ। অবশ্য এইগুলিকে ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ বলিলেও ভুল হয় না।

ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

ধরা (ধর ধাতু)

চোর ধরা—পাকড়ানো, আটক করা।

মাছ ধরা—বড়শি, জাল ইত্যাদির দ্বারা আহরণ।

রোগে ধরা—আক্রান্ত হওয়া, আপন্ন হওয়া।

ভূতে ধরা—ভীত হওয়া, আবিষ্ট হওয়া।

ট্রেন ধরা—সময় মত উঠিতে পারা।

সাহেবকে ধরা—চাকুরী ইত্যাদির জন্য তোষামোদ বা অনুগ্রহ প্রার্থনা।

ভুল ধরা—বাহির করা।

হাত ধরা—অনুনয় করা।

পায়ে ধরা—বিনীত ভাবে অনুগ্রহভিক্ষা, বা শরণ লওয়া।

মাথা ধরা—বেদনাবোধ করা!

মদ ধরা—অভ্যাস আরম্ভ করা।

ছাড়া (ছাড়্ ধাতু)

কাপড় ছাড়া—পরিবর্তন করিয়া অন্যটি পরা।

তামাক ছাড়া—অভ্যাস বর্জন।

গাড়ী ছাড়া—রওয়ানা হওয়া।

বাড়ী ছাড়া—স্থান ত্যাগ।

জ্বর ছাড়া—বিরাম হওয়া।

ভিটে ছাড়া—উচ্ছন্ন হওয়া।

ভূত ছাড়া—প্রভাব ত্যাগ করিয়া যাওয়া।

উঠা (উঠ্ ধাতু)

সূর্য উঠা—উদিত হওয়া।

রৌদ্র উঠা—ছড়াইয়া পড়া, ব্যাপ্ত হওয়া।

চুল উঠা—গজান (ঠিক বিপরীত অর্থ উন্মূলিত হওয়া, পড়িয়া যাওয়াও হয়)

রব উঠা—প্রচারিত হওয়া।

বাজারে জিনিস উঠা—বিক্রয়ার্থ আনীত হওয়া।

গাড়ীতে উঠা—আরোহণ করা।

চোখ উঠা—প্রদাহ হওয়া।

রক্ত উঠা—উদ্গীর্ণ হওয়া।

চাঁদা উঠা—সংগৃহীত হওয়া, বমন হওয়া।

ক্লাসে উঠা—প্রমোশন পাওয়া।

অন্নজল উঠা—বন্ধ হওয়া।

দোকান উঠিয়া যাওয়া—ব্যবসা ফেল পড়া।

মন উঠা—মনঃপূত হওয়া।

কাটা (কাট্ ধাতু)

সাঁতার কাটা—(সন্তরণ) করা (পূর্ববঙ্গে সাঁতার দেওয়া, পশ্চিমবঙ্গে সাঁতার কাটা)

সূতা কাটা—(তুলা হইতে সূত্রাকারে) বাহির করা।

টেরি কাটা—(কেশ) বিভাজিত করা।

কথা কাটা—তর্ক করা।

সময় কাটা—অতিবাহিত হওয়া।

ছড়া কাটা—বল, তৈরি করিয়া বলা।

ফোঁটাকাটা—বিন্যাস করণ।

সিঁধ কাটা—খনন।

ঘুড়ি কাটা—ছিন্নকরণ।

মাল কাটা—বিক্রয় করা।

বিপদ কাটা—দূর হওয়া।

তাল কাটা—ভঙ্গ হওয়া।

নক্সা কাটা—অঙ্কন করা।

নাক কাটা } —লজ্জা দেওয়া।
কান কাটা }

বাংলায় ক্রিয়াপদের অফুরন্ত বিশিষ্টার্থ প্রয়োগও আছে। প্রায় প্রত্যেকটি বাংলা ধাতুরই কিছু না কিছু বিশিষ্টার্থ আছে। এইগুলি কথোপকথন শুনিয়া ও সাহিত্য পাঠ দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। ব্যাকরণ বা অভিধান এই বিষয়ে ইঙ্গিতমাত্র করিতে পারে।

বাংলা ধাতুগুলি বিশিষ্টার্থ প্রয়োগের কালে প্রায়ই পূর্বে একটি বিশেষ্য গ্রহণ করিয়া তাহার সংযোগে এক নূতন ধাতুতে পরিণত হয়। যেমন—কাট্ ধাতুর অর্থ to cut, কিন্তু বিপদ কাটা, মাল কাটা ইত্যাদিতে অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ বিশেষ্য যোগে এই ধাতুগুলি যেন বিশিষ্টার্থক নূতন ধাতুতে পরিণত হইয়া গেল।

৫। বিশেষণাদির বিশিষ্ট প্রয়োগ

পাকা

পাকা ফল—পরিণত, ripe

পাকা চোর—দাগী, অভ্যস্ত

পাকা কাজ } —নিপুণ
পাকা হাত }

পাকা চুল—সাদা, grey

পাকা বাড়ী } —ইষ্টকাদি নির্মিত
পাকা রাস্তা }

পাকা ইট—পোড়া

পাকা খাতা—অপরিবর্তনীয়, খসড়া নহে

পাকা দেখা—কনে দেখিয়া বিবাহের শর্তাদি ঠিক করা (অনুষ্ঠান বিশেষ)

পাকা ছেলে—জ্যেঠা, নষ্ট।

কাঁচা

কাঁচা ফল—অপরিণত, green

কাঁচা মাংস
কাঁচা দুধ } —অপক্ক, আরাঁধা

কাঁচা বুদ্ধি—অপরিণত

কাঁচা ঘর
কাঁচা রাস্তা } —মাটির তৈরী

কাঁচা ঘুম—অতৃপ্ত

কাঁচা টাকা—ধাতুর মুদ্রা, নোট নহে (যথেষ্ট অর্থেও ব্যবহার আছে। যেমন—এতগুলো কাঁচা টাকা পেয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারলে না।)

কাঁচা মাল—কারখানা ইত্যাদিতে নির্মিত পণ্যরূপ পায় নাই যাহা, raw material

কাঁচা কাজ—অনিপুণ, অবিবেচনাপ্রসূত

বড়

বড় মাছ—বৃহৎ, big

বড় ভাই—অগ্রজ

বড় লোক—ধনী, মানী, অভিজাত

বড় বাবু—প্রধান, head

বড় মন—উদার

বড় মুখ—আশা, গর্ব

বড় কথা—গর্বিত

বড় দিন—বড় দিনের সূচনা, খ্রীষ্টীয় উৎসব দিবস

বড় নজর—উঁচু, অভিজাত, সুরুচিপূর্ণ

বিশেষণের ন্যায় অব্যয়াদি শব্দও বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তাহার অজস্র রূপ হইতে পারে। অব্যয় অধ্যায়ে এই সম্পর্কে সামান্য আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

৬। বিবিধ শব্দ ও পদসমষ্টির বিশিষ্ট প্রয়োগ

১। অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন)—তার কাছে সাহায্য চাওয়া অরণ্যে রোদন হবে।

২। অন্ধের নড়ি (অসহায়ের একমাত্র সহায়)—ছেলেটি বিধবার অন্ধের নড়ি (অন্ধের যষ্টি)

৩। অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ, নিষ্কর্ম)—এই অকাল কুষ্মাণ্ডটাকে এমন জামাই আদরে খাওয়াচ্ছ কেন ?

৪। অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ দর্শন)—এযে অমাবস্যার চাঁদ, এতদিনে কোথা থেকে এলে।

৫। অর্ধচন্দ্র দেওয়া (গলাধাক্কা দেওয়া)—অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় কর।

৬। অমৃতে অরুচি (ভাল জিনিসে অনিচ্ছা)—বল কি হে, সিগ্রেট খাবেনা ?. এযে অমৃতে অরুচি দেখছি।

৭। অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)—পিসীর শাশুড়ীবুড়ী কাল অক্কা পেয়েছে।

৮। অন্ধকারে ঢিলমারা (না জানিয়া অনুমান করে)—নিউটনের বাপের নাম আর্কেমিডিস্ ! এমন অন্ধকারে ঢিল মেরো না।

৯। আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী)—তোমার বাঘমারার আষাঢ়ে গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।

১০। আকাশ কুসুম (অসম্ভব আশা)—এমন আকাশকুসুম কল্পনা আমার নেই ভাই।

১১। আদায় কাঁচকলায় (বিরুদ্ধতা শত্রুতা)—এদের দুজনে একটুও বনিবনা নেই, একেবারে যেন আদায় কাঁচকলায়।

১২। আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা, আয়েসীভাব)—পরের উপর খায় আঠার মাসে বছর যায়।

১৩। আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি)—বাবা, কথা শুনে ত আমার আক্কেল গুড়ুম।

১৪। আক্কেল সেলামী (বোকামীর জন্য দণ্ড)—আগে টিকেট করলেই এ টাকাটা আক্কেল সেলামী দিতে হত না।

১৫। আদাজল খেয়ে লাগা (উদ্যমের সঙ্গে কাজ করা)—এইবার আদাজল খেয়ে লেগেছে, হয়ত পাশ করবে।

১৬। আলালের ঘরের দুলাল (ধনীর স্নেহপালিত কুসন্তান)—আলালের ঘরের দুলালদের দিয়ে কি আর দেশের কাজ হয় ?

১৭। আকাশ থেকে পড়া (হতভম্ব হওয়া)—এ কথা শুনে আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম।

১৮। ইঁচড়ে পাকা (জ্যেঠা, অকাল পক্ক)—ইঁচড়ে পাকা ছেলেটা আমার সামনে বিড়ি ফুঁকে বেড়িয়ে গেল।

১৯। উপরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধ হেতু অনিচ্ছায় কাজ করা)—ইচ্ছা ছিল না, তবু উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত কাজটা করিয়া দিলাম।

২০। উত্তম মধ্যম (প্রহার)—চোরটাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদেয় কর।

২১। উলু বনে মুক্ত ছড়ান (অনুপযুক্ত স্থানে মহার্ঘ জিনিস বিতরণ)—ওকে উপদেশ দেওয়া উলুবনে মুক্তা ছড়ান।

২২। এক হাত লওয়া (ক্ষোভ মিটাইয়া কটু বাক্য প্রয়োগ)—তাকে আজ খুব এক হাত নিয়েছি।

২৩। কথার কথা (মূল্যহীন উক্তি)—ওটা একটা কথার কথা বলেছিলাম, তাই মনে করে বসে আছ?

২৪। কলুর বলদ (নিরর্থক একঘেয়ে পরিশ্রমকারী)—সংসারে কলুর বলদ হয়ে খেটেই গেলাম।

২৫। কত ধানে কত চাল (অন্যায়ের প্রতি ফল)—কত ধানে কত চাল বাছাধন টের পাবেন এখন।

২৬। কাঠের পুতুল (নিস্পন্দ, নির্জীবৎ)—এমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি বলবে বল।

২৭। কেঁচে গণ্ডুষ করা (পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করা)—লেখাটা অদল বদল করে কিছু হবে না, একেবারে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে।

২৮। কিল খেয়ে হজম করা (অপমানিত হইয়া সহ্য করা)—এমন কিল খেয়ে হজম করবে? একটা মামলা টামলা করবে না?

২৯। কড়ায় গণ্ডায় (পুরাপুরি হিসাব)—পাওনা-দেনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে দেখছি।

৩০। কুরুক্ষেত্র বাধানো (তুমুল ঝগড়া বাধানো)—এই ব্যাপার নিয়ে তোমরা এখন কি কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে?

৩১। গভীর জলের মাছ (যাহার ধূর্ত অভিপ্রায় বোঝা যায় না)—সাবধান, ননীবাবু একটি গভীর জলের মাছ।

৩২। গণেশ উল্টানো (ব্যবসায় নষ্ট হওয়া)—মোড়ের কাপড় দোকানটি গণেশ উল্টালো কবে?

৩৩। গদাই লস্করী (দীর্ঘসূত্রী চাল)—এমন গদাই লস্করী চালে গিয়ে গাড়ী ধরতে পারবে না।

৩৪। গণ্ডারের চামড়া (নিন্দাবাক্য যাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না)—ওকে গালাগাল দিয়ে লাভ নেই, একেবারে গণ্ডারের চামড়া।

৩৫। গোকুলের ষাঁড় (অপদার্থ)—রমেশের ভাগনেটা গোকুলের ষাঁড়, শুধু খাওয়া আর তাস-পেটা ছাড়া কোনো কাজ নহে।

৩৬। গোবর গণেশ (অপদার্থ ও নির্বোধ)—ওটা একটা গোবর গণেশ কিছুই গুছিযে করতে পারে না।

৩৭। গোঁফখেজুরে (অতিশয় অলস, গোঁফ খেজুর মাখিয়া দিলে চাটিয়া খায়)—একেবারে হাতে তুলে দিলে তবে কাজটি হবে—এমন সব গোঁফ খেজুরে নিযে কি করব, বলতে পার ?

৩৮। গুড়ে বালি (আশায় নিরাশ)—তুমি ভাবছ রতন তোমাকে টাকা দেবে ? কিন্তু সে গুড়ে বালি।

৩৯। চিনির বলদ (শুধু ভারবাহী, ফলভোগী নয়)—এই সংসারে আমি হলাম চিনির বলদ, শুধু খেটেই যাব, ভোগ করতে পারব না।

৪০। চোখের বালি (চক্ষুশূল, বিরক্তির পাত্র)—এ বাড়ির ছোটবউ যেন সবার চোখের বালি।

৪১। চক্ষুদান করা (ছোট কিছু চুরি করা)—আমার হাতঘড়িটা কে যে চক্ষুদান করেছে বুঝতে পারলাম না।

৪২। চক্ষু ছানাবড়া (বিস্ময়ে বিস্ফারিত)—নাচ দেখতে গিয়ে টিকিটের দাম শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

৪৩। চোখের চামড়া নেই (চক্ষুলজ্জা না থাকা)—কুটুম্বদের সামনে যা তা বলছ, তোমার কি চোখের চামড়া নেই !

৪৪। চাঁদের হাট (গুণী ও কৃতিদের সমাবেশ)—রমেশের বাড়িতে যেন চাঁদের হাট, সব কটি ছেলেই ভাল চাকুরে।

৪৫। চোখে সর্ষে ফুল দেখা (হঠাৎ বিপন্ন বোধ করা)—পরীক্ষা সামনে এলেই ছেলেরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

৪৬। চুলোয় যাক্ (বিনষ্ট হউক)—ধর্মকর্ম সব চুলোয় যাক্, আগে মানুষের অন্নের ব্যবস্থা কর।

৪৭। ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু)—চাকরি কি ছেলের হাতে মোয়া, যে বলা মাত্রই জুটে যাবে ?

৪৮। জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)—ওর পেটে পেটে জিলিপির প্যাঁচ, ওকে এঁটে উঠা মুস্কিল।

৪৯। ঝাঁকের কই (এক দলের)—ছেলেগুলো সবাই ঝাঁকের কই দাদা, এতে আর ইতরবিশেষ নাই।

৫০। ঝাল ঝাড়া (ক্ষোভ মিটাইয়া গালি দেওয়া)—ওর কি দোষ ? ওর উপর সবাই ঝাল ঝাড়ছ কেন ?

৫১। টনক নড়া (চৈতন্য হওয়া)—হ্যাঁ ফেব্রুয়ারীতেই ত পরীক্ষা, এদ্দিনে বুঝি তোমার টনক নড়ল !

৫২। টাকার কুমির (অতিশয় ধনী)—লোকটা টাকার কুমির, কিন্তু খরচ করবে না।

৫৩। টেক্কা মারা (অনায়াসে জয়লাভ)—দেখবে, এবার পরীক্ষায় সবার উপরে টেক্কা মারবে।

৫৪। ঠোঁটকাটা (অপ্রিয় স্পষ্টবক্তা)—ওর মত ঠোঁটকাটা লোক না হলে ও কথা কেউ বলতে পারত না।

৫৫। ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য)—এমন ঠুঁটোজগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে কি করে ?

৫৬। ঠেকে শেখা (তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ)—ঠেকে শেখার ছেয়ে দেখে শেখা ভাল।

৫৭। ডুমুরের ফুল (দুর্লভ দর্শন)—কিহে পুঁটিরাম, দেখাই যে মেলে না, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে !

৫৮। ঢাকের বাঁয়া (অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি)—ওটা কাজ কর্ম কিছু বোঝে না, তবু আছেন ঢাকের বাঁয়া সঙ্গে সঙ্গে।

৫৯। ঢিমে তেতালা (মন্থর, দীর্ঘসূত্রী)—তোমাদের সব কাজই ঢিমে তেতলা, একটু চটপটে হও।

৬০। তালকানা (অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অন্যমনস্ক)—তার মততালকাণা লোককে বাজারে পাঠিও না, যা বলেছ ঠিক তার উল্টোটি নিয়ে আসবে।

৬১। তালপাতার সিপাই (অতিশীর্ণ ও দুর্বল)—এই ত তালপাতার সিপাইএর মত চেহারা, তার আবার বড়াই কত !

৬২। তাসের ঘর (সহজে ভঙ্গুর, নিরাশা সূচক)—আমার সব কল্পনা তাসের ঘরের মত ভেঙে গেল।

৬৩। তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড)—ফোঁটা তিলক দেখে ভুলো না, ওটি একটি তুলসী বনের বাঘ।

৬৪। তেলামাথায় তেল দেওয়া (যাহার আছে তাহাকে দেওয়া)—বড় চাকুরেদের মাগ্‌গিভাতা বেশী হওয়া মানে তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৬৫। তিলকে তাল করা (তুচ্ছ বিষয় বাড়াইয়া বলা)—দেখ সেখানে এমন কিছু হয়নি ; তুমি তিলকে তাল কোরো না।

৬৬। দু'কান কাটা (লোকনিন্দায় ভ্রূক্ষেপহীন)—ওটা একেবারে দু'কান কাটা, যা খুসী তা করতে পারে।

৬৭। দিনে ডাকাতি (হঠকারিতার সহিত অন্যের ক্ষতি সাধন)—চোখের উপর ব্যাঙ্কটা ফেল করালে হে, এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি দেখছি।

৬৮। দাঁত ফুটান, দন্তস্ফুট করা (কঠিন কিছু আয়ত্তে আনা)—এ অঙ্কটার ক্লাসের কেউই দাঁত ফুটাতে পারে নি।

৬৯। দাঁও মারা (সুযোগে বিপুল লাভ)—সে যুদ্ধের বাজারে কণ্ট্রাক্টরি করে বেশ বড় দাঁও মেরেছে।

৭০। ধরাকে সরা জ্ঞান (অতিগর্বিত ভাব)—দুটো পয়সা হয়েছে কিনা, ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

৭১। ধর্মের ষাঁড় (বন্ধনহীন, বেপরোয়া)—দেখ একটু কাজে মন দাও। ধর্মের ষাঁড়ের মত শুধু ঘুরে বেড়িও না।

৭২। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (সৎ)—এঃ, একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এসেছেন, বলে কিনা মিথ্যা সাক্ষী দেব না !

৭৩। ধামা ধরা (চাটুকার চাটুকারিতা)—স্পষ্ট কথাটা, আজ আর কেউ বলে না, চারদিকে সব ধামাধরার দল।

৭৪। ননীর পুতুল (আদুরে, আয়াসী)—ছেলেপুলেকে আরাম দিয়ে দিয়ে ননীর পুতুল করে তুলোনা।

৭৫। নবমীর পাঁঠা (আসন্ন বিপদে ভীত)—দেখ ছেলেটা ভয়ে নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে।

৭৬। পরের মুখে ঝাল খাওয়া (অন্যের কথায় কর্তব্য নিরূপণ)—নিজে গিয়ে দেখ ব্যাপারটা কি, পরের মুখে ঝাল খেওনা—বিপদে পড়বে।

৭৭। পাঁচভূতের কাণ্ড (বহু কর্তৃত্বে বিপর্যস্ত অবস্থা)—ওসব পাঁচভূতের কাণ্ডে আমি মাথা গলাব না।

৭৮। পোয়া বার (সৌভাগ্যের সুযোগ)—যা অবস্থা চলছে, চোরা-কারবারীর পোয়াবারো।

৭৯। পায়াভারী (অহংকারী)—আমাদের সেই জিতেন, হাকিম হয়ে এখন কি পায়াভারী হয়েছে!

৮০। পুকুর চুরি (সবসুদ্ধ)—ছোটরা পেছনে হাত পেতে নেয়, আর বড়রা যে পুকুর চুরি করে—তার বেলা?

৮১। পরের ধনে পোদ্দারি (অন্যের অর্থে মাতব্বরী)—মামার আশ্রয়ে থেকে বেশ ত পরের ধনে পোদ্দারি করছ।

৮২। পাকা ধানে মই (সর্বনাশ)—আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে তুমি আমার পিছনে লেগেছ?

৮৩। বড় মুখ (গর্ব মিশ্রিত আশা, বিশ্বাস)—আমি বড় মুখ করে তাকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম, আর তুমি এমন একটা ব্যবহার করলে?

৮৪। বাড়া ভাতে ছাই (অতি আশায় নিরাশ)—চাকরীটি পাবার সবই ঠিক ছিল, এখন বাড়া ভাতে ছাই পড়ল।

৮৫। ভরাডুবি (সর্বনাশ)—ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ে নরেশবাবুর একেবারে ভরাডুবি হয়েছে।

৮৬। ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে অনুগ্রহ)—ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হবে।

৮৭। ভিজে বেড়াল (নীরব দুর্বৃত্ত)—ওকে বিশ্বাস করোনা, ওটি একটি ভেজা বিড়াল।

৮৮। ভূতের বেগার (পণ্ডশ্রম)—শুধু ভূতের বেগারই খাটলাম, কোন লাভ হোল না।

৮৯। মাটির মানুষ (নিরীহ ব্যক্তি)—আহা, এমন মাটির মানুষ হয় না ! কিছুতেই রাগ নেই।

৯০। মগের মুল্লুক (নিয়মহীন রাজ্য)—এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি, যা খুশী তাই করবে ?

৯১। লম্বা দেওয়া (পলাইয়া যাওয়া)—চাকরটা বাক্স ভেঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে লম্বা দিয়েছে।

৯২। লেফাফা দুরস্ত (পরিচ্ছদে ও আচরণে নিখুঁত)—লোকটা খুব লেফাফা দুরস্ত, দেখে বুঝবে না যে ম্যাট্রিক পাসও নয়।

৯৩। লেজে গোবরে (কাজ করিতে গিয়া বিপর্যস্ত হওয়া)—এই কাজ করতেই একেবারে লেজে গোবরে হয়েছো ?

৯৪। ব্যাঙের আধুলি (সামান্য অর্থ)—ব্যাঙের আধুলি ত্রিশটি ত টাকা, তা নিয়ে আবার কথা।

৯৫। ব্যাঙের সর্দি (অভ্যাসগত, সহনীয়)—ইস্, এত পরিশ্রম করছ, গায়ে যে জ্বর দেখছি ?—ও কিছু নয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। এ ব্যাঙের সর্দি।

৯৬। বাগে পাওয়া (আয়ত্তে পাওয়া)—আজ বাগে পেয়েছি, বাছাধনকে ছাড়ছি না।

৯৭। বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড)—মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর গোপনে দুর্নীতির সমর্থক, এমন বিড়ালতপস্বী দেশ-নেতাই ত আজকাল বেশী।

৯৮। বকধার্মিক (ভণ্ড)—ওর নামাবলী দেখে ভুলো না কিন্তু, উনি একজন বকধার্মিক।

৯৯। বুদ্ধির ঢেঁকি (জড় বুদ্ধি)—আঃ, বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি, একে নিয়ে আর পারা যায় না।

১০০। বিন্দুবিসর্গ (সামান্য তথ্য)—আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

১০১। বোঝার উপর শাকের আঁটি (বহু পরিশ্রমের পর সহনীয় আরো সামান্য)—এত যখন করেছ এইটুকুও করে দাও, এ ত বোঝার উপর শাকের আঁটি।

১০২। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (তুচ্ছ ছলে অন্যায় গোপনের চেষ্টা)—আমি সব বুঝতে পেরেছি, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়ো না

১০৩। শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট)—এযে শাঁখের করাত হল, বলত কোন দিকে যাই।

১০৪। শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র বংশধর)—বুড়ার ছেলেরা সব মারা গেছে, নাতিটিই এখন শিবরাত্রির সলতে।

১০৫। ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ)—রামের বড় ছেলেটা একেবারে ষাঁড়ের গোবর, লেখাপড়াও শিখলে না, কাজকর্মও শিখলে না।

১০৬। সাতখুন মাপ (প্রশ্রয়, অন্যায়ের শাস্তি না দেওয়া)—বড়লোকের ছেলে, তার সাতখুন মাপ।

১০৭। সোনায় সোহাগা (উপযুক্ত মিল)—বেশ বর হয়েছে, যেমন রূপবান তেমন বিদ্বান, একেই বলে সোনায় সোহাগা।

১০৮। সোনার পাথরবাটি (অসম্ভব বস্তু)—এক সময় ছিল যখন স্ত্রী-স্বাধীনতাকে সোনার পাথরবাটি বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

১০৯। হ য ব র ল (বিশৃঙ্খল)—তোমার ঐ হ য ব র ল যুক্তি আমার মাথায় ঢুকলো না।

১১০। হাতে কলমে (practically, কাজ করিয়া)—এখানে কাঠের জোড়াটা কি করে লাগাবে আমি তোমাকে হাতে কলমে দেখিয়েছি।

১১১। হিতে বিপরীত (ভাল করতে মন্দ হওয়া)—ইন্‌জেকশনটা দিয়ে হিতে বিপরীত হল দেখছি।

১১২। হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল)—একেবারে হাতের পাঁচ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ে নেব না।

১১৩। হাতটান (চুরির অভ্যাস)—রাঁধুনীটির একটু হাতটান অভ্যেস আছে।

১১৪। হাত করা (বশে আনা)—এইবার বড় বাবুকে হাত করে ছেলের একটা চাকরি যোগাড় করতে হবে।

১১৫। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা (কলঙ্কের কথা প্রকাশ করা)—আমাকে বেশি ঘাটিওনা, তাহলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব।

১১৬। হাড় হাবাতে (দরিদ্র ও হ্যাংলা)—এই হাড়হাবাতে কুটুম্বগুলো আমাকে জ্বালিয়ে মারলে।

১১৭। হেস্ত নেস্ত (শেষ নিষ্পত্তি)—আমি আজ এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বো না

বাংলা ভাষায় পদসমষ্টির বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ খুব সহজ নহে। শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হয়—

(১) বিশিষ্টার্থক প্রয়োগগুলিতে প্রায়ই অর্থ খুব সঙ্কীর্ণ; যেমন "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির" এই কথাটির অর্থ "অতি সৎ"; কিন্তু "অতি সৎ" অর্থে সর্বত্র ইহার প্রয়োগ হইবে না। যেমন—"আমার পিতা অতি সৎ ব্যক্তি", ইহা না বলিয়া যদি বলা হয়, "আমার পিতা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির"—তাহা হইলে বাক্যটির ভাল অর্থ হইবে না। "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির" পদসমষ্টির বিশিষ্ট প্রয়োগ শুধু হীনোক্তিতেই হয়। যেমন—"ইঃ, একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির"। শ্রদ্ধাসূচক উক্তিতে এই পদসমষ্টির ব্যবহার কখনো হইবে না। এইভাবে, পদসমষ্টির সংকীর্ণ অর্থটি না বুঝিয়া তাহার বিশিষ্ট প্রয়োগ করা যায় না। ডুমুরের ফুল, অমাবস্যার চাঁদ, আক্কেল গুড়ুম, অক্কা পাওয়া, পটল তোলা, ছেলের হাতের মোয়া, ন্যাজেগোবরে—এই সব বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি প্রায়ই সশ্রদ্ধ বা মার্জিত উক্তিতে ব্যবহৃত হইবে না। শ্রোতাকে অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলা হইতেছে ইহা বুঝিয়া বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ হয়, নতুবা অর্থবিপত্তির সম্ভাবনা থাকে।

(২) বিশিষ্টার্থ প্রয়োগের বেলায় শুধু যে শব্দের হীনার্থক ও সদর্থক অভিব্যক্তি বুঝিতে হয় তাহা নহে, অন্য বিষয়েও সতর্ক থাকিতে হয়। যেমন—"তাসের ঘর" বিশিষ্টার্থ পদসমষ্টি, ইহা "ভঙ্গুরতার তুলনা" রূপে ব্যবহার হয়। কিন্তু যদি বলা হয় "বৃষ্টিতে দালানটা তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া গেল,"—তবে "তাসের ঘর" পদসমষ্টির অপপ্রয়োগই হইল। কারণ "তাসের ঘর" কথাগুলির মধ্যে শুধু ভঙ্গুরতাই নহে, আশাভঙ্গের ইঙ্গিতও আছে। এইজন্য যেখানে নিরাশা ও ভঙ্গুরতা দুইটি ভাব একত্র হইয়াছে, সেখানেই এই বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টির ব্যবহার চলিবে, নতুবা প্রয়োগ অশুদ্ধ হইবে। "তাসের ঘর" পদসমষ্টির শুদ্ধ প্রয়োগ, "আমার সকল কল্পনা তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।" এইরূপ মাটির মানুষ, মাথার ঠাকুর, ননীর পুতুল, অন্ধের যষ্টি, সোনায় সোয়াগা প্রায় সকল পদসমষ্টিরই ভাষায় ব্যবহারের ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। ঠিক স্থান বুঝিয়া ব্যবহার না করিতে পারিলে ইহারাও অর্থকে ক্লিষ্ট করিতে পারে। এমনকি অর্থবিপত্তিও ঘটাইতে পারে।

৭। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ ও যুগ্মশব্দাদির ব্যবহার

(ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

বাংলা ভাষায় এক ধরনের অব্যয় শব্দ আছে, যাহারা কোন না কোন ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। ইহারা প্রায়ই নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, কখনো কখনো তাহারা স্বতন্ত্র ধাতুও গঠন করে। এই শব্দগুলির এমনিতে বিশেষ কোন অর্থ নাই অথচ উপযুক্ত প্রয়োগ গুণে ইহারা বর্ণনাকে সজীব ও প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা আরম্ভ করেন।

এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহা শ্রুতির বিষয় নহে তাহাকেও শ্রুতিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে চাহে। যেমন, মেয়েটি **খিল খিল** করিয়া হাসিয়া উঠিল, এই বাক্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি স্পষ্টতঃই হাসির ধ্বনির অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু যখন বলি, দুপুরের রৌদ্রে মাঠ **ঝাঁ ঝাঁ** করিতেছে, তখন কোন প্রত্যক্ষ ধ্বনির অনুকরণ হইতেছে না বরং যাহা দেখার জিনিস তাহাকেই যেন শ্রুতি-গোচর করার চেষ্টা হইতেছে। এই দিক হইতে বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি তাহাদের অর্থদ্যোতনা শক্তিতে বিচিত্র। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) শব্দানুকরণকারী ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

কল কল, কুলু কুলু (জলপ্রবাহের শব্দ) ; খল খল (হাসির শব্দ) ; ঘর ঘর (চাকার শব্দ) ; ঘোঁৎ ঘোঁৎ (নাসিকার ধ্বনি—মানুষের, শূকরের) ; চুক চুক (চুমুকের শব্দ) ; ছপ ছপ (জলের শব্দ, কাপড় কাচা) ; ছলাৎ ছলাৎ (জলের উপচিয়া উঠার শব্দ) ; ঝন্ ঝন্, ঝনাৎ (ধাতব শব্দ, করতাল বাজার, বাসন পড়ার) ; ঝনৎকার (কঙ্কণের, অস্ত্রের) টাশটাশ (বাঁশ ফাটার শব্দ) ; ড্যাম কুর কুর (ঢোলের বাদ্য) ; থপ থপ (কাদার তালের শব্দ) ; পোঁ পোঁ (পেঁপুর শব্দ) রুণুরুণু রুণুঝুণু রিণিঝিণি, রিণিকি ঝিনিকি, (নূপুর, অলঙ্কার ইত্যাদির শব্দ) ; রণনঝনন (অস্ত্রের শব্দ) ; স্যাঁৎ স্যাঁৎ (ভিজামাটির শব্দ) ইত্যাদি।

(২) ভাবদ্যোতক ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

কন্‌কন্ (দাঁত ব্যথার) ; কন্‌কনে (শীতের ভাব) ; খাঁ খাঁ (শূন্যতার ভাব ; গন্‌গনে (জ্বলন্ত ভাব) ; চিন্‌চিন্ (তীক্ষ্ণ ব্যথার ভাব) ; চকচকে, চিক্‌চিক্ (ঔজ্জ্বল্যের ভাব) ; ছিপ্ ছিপে (তনুদেহের ভাব) ; ছম্ ছম্ (ভয়ের ভাব) ; ঝাঁ ঝাঁ (শূন্যতা, ব্যাপ্তি ইত্যাদি ভাব) ; ঝুর ঝুর, ঝির ঝির (লঘু বস্তুর পতন বা প্রবাহের

ভাব) ; ঝলমল, (ঔজ্জ্বল্যের ভাব) ; টনটন (ব্যথার ভাব) ; টনটনে (তীক্ষ্ণ বোধ শক্তির ভাব) ; তরতর (দ্রুত অবতরণের বা বহিয়া যাওয়ার ভাব) ; তাথৈ, তাথৈ তাথৈ, তাতা থৈ থৈ (তাণ্ডব নৃত্যের ভাব) ; থমথম (স্তব্ধতার ভাব) ; থৈ থৈ (জলাশয়ের পূর্ণতার ভাব) ; ধাঁ (দ্রুততার ভাব) ; ধূ ধূ (শূন্যতা ও ব্যাপ্তির ভাব) ফুরফুরে (লঘুতার ভাব) ; রী-রী (ঘৃণার ভাব) ; লকলক (প্রলম্বনের ভাব) ; লিকলিকে (শীর্ণতার ভাব) ; শনশন (বায়ুপ্রবাহের ভাব) ; সাঁ সাঁ (বায়ুপ্রবাহের ভাব) ; সুড়সুড় (নিঃশব্দ গমন বা স্নায়ুর ঈষৎ চাঞ্চল্যের ভাব) ; হনহন (দ্রুতগমনের ভাব) ইত্যাদি ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিরও রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ না জানিলে ভাষায় তাহা ব্যবহার করা যায় না। যেমন, গনগনে জল, ছিপ্ ছিপে ভাত, ঝাঁঝাঁ বাতাস, রী রী আকাশ এইসব ধ্বন্যাত্মক বিশেষণের কোন অর্থ হইবে না। এইরূপ ক্রিয়াবিশেষণের বেলায়ও হনহন করিয়া খাওয়া, লকলক করিয়া কথা বলা, ঝনঝন করিয়া লেখা, এইসব বাক্যাংশের কোন অর্থ হইবে না।

(দ্বিরুক্ত শব্দ)

দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহারও বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্বালোচিত ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দগুলিও অধিকাংশ দ্বিরুক্ত শব্দ। টনটন, ঝনঝন ইত্যাদি শব্দে প্রথমার্ধের ধ্বনিটি দ্বিতীয়ার্ধে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ছাড়াও বাংলায় দ্বিরুক্ত শব্দ আছে এবং তাহারা প্রায়ই বিশিষ্টার্থক হয়। যেমন **পেট** শব্দটির অর্থ **উদর (belly)** ; কিন্তু **পেটে পেটে** অর্থ **ভিতরে ভিতরে**; যেমন, পেটে পেটে এত বুদ্ধি! অথবা পেটে পেটে অর্থ **অন্তরঙ্গতাও** প্রকাশ করিতে পারে ; যেমন, ওদের পেটে পেটে ভাব। তাহা হলেই দেখা যাইতেছে, বাংলায় শব্দদ্বৈতও ভাষার বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ বা idiom এর অন্তর্গত।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে শব্দদ্বৈতের দ্বারা যে অর্থব্যঞ্জনা হয় তাহার কয়েকটির উল্লেখ হইল :—

(১) সংযোগ ও পরস্পরতা অর্থে—বুকে বুকে, মুখে মুখে, গলায় গলায়, মানুষে, মানুষে।

(২) তৎক্ষণাৎ, সদ্য অর্থে—গরম গরম, টাটকা টাটকা, হাতে হাতে, যখন তখন।

(৩) ব্যাপ্তি, পুনরাবৃত্তি, প্রত্যেক অর্থে—চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, বারে বারে, মাসে মাসে, ঘরে ঘরে, জনে জনে।

(৪) নিয়তবর্তিতা, নিরবচ্ছিন্নতা অর্থে—পেটে পেটে, তলে তলে, মনে মনে, পাশে পাশে, সঙ্গে সঙ্গে।

(৫) প্রাচুর্য, বহুত্ব অর্থে—ভুরি ভুরি, অনেক অনেক, লাল লাল, বড় বড়, বাক্স বাক্স, হাজার হাজার।

(৬) ঈষৎ ন্যূনতা; অনুকরণ অর্থে—কাঁদ কাঁদ, নিবু নিবু, পড়ো পড়ো, ভাসা ভাসা, শীত শীত, চোর চোর (খেলা), ঘোড়া ঘোড়া (খেলা)।

(যুগ্ম শব্দ)

বাংলা যুগ্ম শব্দগুলি **দ্বন্দ্ব** সমাসেরই বিশিষ্ট রূপ। ইহারা প্রায়ই etcetera বা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। ব্যতিহার বহুব্রীহি এবং কর্মধারয়েও ইহাদের ব্যবহার আছে। ইহাদের অর্থবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমাস অধ্যায়ে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরালোচনা হইল না।

৮। লোকোক্তি বা প্রবচন (**Proverbs**)

লোকোক্তি বা প্রবচন শুধু বাংলা ভাষারই বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা পৃথিবীর সকল প্রাচীন ভাষারই বিশিষ্টতা। এই লোকোক্তিগুলি নানাভাবে সৃষ্টি হয়, কোন্‌টা যে কি ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে বা কোনটির মূল কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত তাহা সব সময় অনুমান করা যায় না। তবু কতগুলি লোকোক্তির সূত্র সহজেই আমারা বুঝিতে পারি। যেমন,—

(১) "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" লোকোক্তিটি চার জামাতার কৌতুকপ্রদ গল্প হইতে আসিয়াছে।*

(২) "কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে" ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী হইতে আসিয়াছে।

(৩) "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো" বাঙ্গালী বধূর গৃহকর্মের অভিজ্ঞতা হইতে আসিয়াছে।

(৪) "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" হয়ত বা "চাচা" "বাঁচা" মিলের জন্যই এইরূপ পাইয়াছে।

---

* হবির্বিনা হরির্যাতি
বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ
প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

এইরূপে লোকোক্তিগুলির উৎস বা প্রেরণা বহুবিধ বোঝা গেল। কিন্তু তাহা যাহাই হউক, ইহারা ভাষায় সর্বদাই বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হয়। ঠিক জায়গায় একটি লোকোক্তির উল্লেখে বক্তব্য এমন পরিস্ফুট হয় যে বহু বাক্যব্যয়েও তাহা হইতে পারে না। তবে শিক্ষিত সমাজে লোকোক্তিগুলির ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, জনসাধারণের সহিত সংযোগের অভাব এবং কিছুটা বাংলা ভাষাভঙ্গী আয়ত্তীকরণের অনিচ্ছা। এবং কিছুটা ছদ্ম আভিজাত্যবোধও যে ইহার মূলে নাই তাহা নহে।

নিম্নে কয়েকটি প্রবচনবাক্য অর্থসহ দেওয়া হইল—

১। অতি চালাকের গলায় দড়ি।—অতি বুদ্ধিমান নিজে ঠকে।

২। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।—অতি বিনয়ী, অতি ভদ্র, অতি সদাচারী, প্রায়ই ধূর্ত হয়।

৩। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।—অতি লোভ করিলে আয়ত্ত ধনও নষ্ট হয়।†

৪। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।—বেশী কর্তায় কর্ম পণ্ড হয়।

৫। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।—কোন উপায়েই অসৎ সৎ হয় না।

৬। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।—নিজে নিজে মাতব্বর, কেউ মানুক বা না মানুক।

৭। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।—পরিচিতের নিকট গুণীর আদর নাই।

৮। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।—বিপদে নিজেকেই প্রথম রক্ষা কর।

৯। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।—অসৎকে সৎ করা যায় না।

১০। ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।—তুচ্ছ বা হীন কার্যের জন্য অনাদৃত ব্যক্তির প্রয়োজন।

১১। দশের লাঠি একের বোঝা।—অনেকে মিলিয়া দুরূহ কাজও সহজ হয়।

১২। ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে।—মিথ্যাকে পরাভূত করিয়া সত্য একদিন জয়ী হয়ই।

১৩। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।—অকর্মণ্য লোক কার্যহানির জন্য অন্যকে দোষী করে।

১৪। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।—যে কাজে পাঁচজনের দায়িত্ব তাহা পণ্ড হয়।

---

† খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
মরল তাঁতী বলদ কিনে॥

১৫। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।—অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন ভোগ করা যায় না।

১৬। পেটে খেলে পিঠে সয়।—লাভজনক হইলে দুঃখও সহ্য করা যায়।

১৭। মরা হাতী লাখ টাকা।—হীন অবস্থায় পড়িলেও পূর্ব গুণ হ্রাস হয় না।

১৮। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।—অল্প ক্ষমতার ব্যক্তি অল্প কিছুই করিতে পারে।

১৯। যত গর্জে তত বর্ষে না।—আড়ম্বর অনুযায়ী কার্যসমাপ্তি বা ফললাভ বিরল।

২০। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।—যাকে পছন্দ করিনা তার সব কিছুতেই ত্রুটি চোখে পড়ে।

২১। রথ দেখা ও কলা বেচা।—একসঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

২২। লাঠি যার মাটি তার।—শক্তিমানই সমৃদ্ধি লাভ করে।

২৩। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।—মন্দব্যক্তির সমর্থনে মন্দব্যক্তি আসে।

২৪। সবুরে মেওয়া ফলে।—ধৈর্য ধরিলে সুফল পাওয়া যায়।

২৫। সস্তার তিন অবস্থা।—কৃপণতা করিয়া সস্তায় জিনিস কিনিলে ঠকিতে হয়।

অনুশীলনী

১। নিম্নের ধাতুগুলির প্রত্যেকটির অন্ততঃ **পাঁচটি** করিয়া বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর—

ধর্, উঠ্, ছাড়্, কাট্, খা।

২। বাক্য রচনা কর—

চোখ উঠা। চোখ ফোটা। চোখ খোলা। চোখ লাগা। চোখ মারা।

৩। বাক্য রচনা কর—

কাঁচা হাত। কাঁচা কাজ। কাঁচা খাতা। কাঁচা মাংস। কাঁচা টাকা।

৪। পদসমষ্টির (phrases) বিশিষ্ট ব্যবহার দেখাইয়া রচনা কর—

গোকুলের ষাঁড়। ষাঁড়ের গোবর। চিনির বলদ। কলুর বলদ। ফুলবাবু। ডুমুরের ফুল। আক্কেল গুড়ুম। আক্কেল সেলামী। উত্তমমধ্যম।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়। বুদ্ধির ঢেঁকি। ঘোঁড়ার ডিম। ঢাকের বাঁয়া। হাতের পাঁচ। বালির বাঁধ। তাসের ঘর। পুকুর চুরি। পগার পার। টাকার কুমির। টেক্কা দেওয়া। দাঁও মারা। সুখের পায়রা। রাঘব বোয়াল। লম্বা দেওয়া। সর্ষে ফুল দেখা।

৫। ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাহাকে বলে? বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরিচয় দাও।

৬। প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্যরচনা কর—

ঝনঝন। খলখল। টুকটুক। টাশটাশ। পোঁপো। রণন ঝনন। ঝনাৎ ঝনাৎ। ছলাৎ ছলাৎ। ছপছপ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ।

৭। প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর—

ছিপছিপে। ঝুরঝুরে। লক লক। হন হন। তাথৈ তাথৈ। ছম ছম। থম থম। ঝাঁ ঝাঁ। ঝিম ঝিম। ধেই ধেই। ফ্যাল ফ্যাল। মিট মিট। খস খস। কিলবিল। গজ গজ। চিক চিক। গম গম। তক তক।

৮। নিম্নোক্ত প্রবাদবাক্যগুলির অর্থ বল—

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।
ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে।
অতি চালাকের গলায় দড়ি।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
এক ঢিলে দুই পাখী মারা।
পেটে খেলে পিঠে সয়।

অলঙ্কার প্রকরণ

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার

যে প্রয়োগ-কৌশল রচনাকে সুন্দর করিয়া তোলে তাহাকে **অলঙ্কার** বলে। অলঙ্কার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্যকরূপে সজ্জিত করণ।

রচনা বা কাব্যের দুই প্রকারের সৌন্দর্য আছে। একটি তাহার ধ্বনিগত (sound) সৌন্দর্য, অপরটি অর্থগত (sense) সৌন্দর্য। এইদিক দিয়া অলঙ্কারকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয়। (১) **শব্দালঙ্কার** ও (২) **অর্থালঙ্কার**।

(১) উপযুক্ত শব্দ সমবায়ে ধ্বনিগত সৌন্দর্য সৃষ্টি হইলে শব্দালঙ্কার হয়। যেমন—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

উপরের কবিতাটিতে অপূর্ব ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি হইয়াছে। রচনায় ধ্বনিগত (sound) সৌন্দর্য সাধনই হইল শব্দালঙ্কারের কাজ।

(২) উপযুক্ত শব্দাবলী রচনায় ভাবগত চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিলে অর্থালঙ্কার হয়। যেমন—

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

এখানে বুদ্ধের করুণ আঁখির সঙ্গে সন্ধ্যাতারার তুলনা করিয়া কবিতার ভাবটিকে সুন্দর করিয়া তোলা হইয়াছে। কাব্যের ভাবকে (sense) সুন্দর করিয়া তোলাই হইল অর্থালঙ্কারের কাজ।

১। শব্দালঙ্কার

(১) অনুপ্রাস (Alliteration)

একই বর্ণ পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাহাকে অনুপ্রাস বলে। যেমন,

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে **গ** ধ্বনি, **র** ধ্বনি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া অনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।

অথবা, চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চর[illegible] বিচরণ
কোথা চ[illegible] আভরণ !

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে **চ** ধ্বনি, **র** ধ্বনি, **ক** ধ্বনি পুনরাবৃত্ত হইয়া অনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।

অথবা, একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধারকুটীরে
নীরবে।

—মধুসূদন

এখানে **ক** ধ্বনি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া অনুপ্রাস সৃষ্টি করিযাছে।

অথবা, কল কোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে ॥

—ভারতচন্দ্র

এখানে প্রথমাংশে **ক** ধ্বনি, **ল** ধ্বনি এবং শেষাংশে শুধু **ল** ধ্বনির অনুপ্রাস হইয়াছে।

(২) ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি :

শব্দধ্বনির মধ্যদিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের ধ্বনির অনুকরণ হইলে ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার হয়। কোন বর্ণধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলেই অনুপ্রাস হয়, ইহাতে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত ধ্বনির মিল নাও থাকিতে পারে। যেমন,—

জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥

—শ্রীকৃষ্ণের শতনাম

এই কবিতাটির প্রথম চরণে **গ** ধ্বনির অনুপ্রাস আছে, এবং দ্বিতীয় চরণে **ক** ধ্বনির অনুপ্রাস আছে। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে এই ধ্বনির কোন প্রত্যক্ষ মিল নাই। অতএব ইহা অনুপ্রাস মাত্র। কিন্তু, ‘গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে’ কবিতাটিতে অনুপ্রাসের মধ্য দিয়া যেন মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি শোনা যাইতেছে। এখানে অনুপ্রাস দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি বর্ণনাকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য ইহা অনুপ্রাস মাত্রই নহে, ইহা ধ্বন্যুক্তি, অর্থাৎ ধ্বনি দ্বারা বর্ণনা বা উক্তি (sound echoing the sense)।

দুইরকম ধ্বন্যুক্তি আছে। এক রকম হইল বর্ণনীয় বিষয়েই যে ধ্বনি (sound) আছে তাহার অনুকরণ; আর অন্য রকম হইল বর্ণনীয় বিষয়ে কোন ধ্বনি (sound) নাই, কিন্তু রচনায় কবিগণ শব্দধ্বনির দ্বারা রচনাকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তোলা হইতেছে। যেমন—

চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘরঘর,
ঘর ঘর ক্ষীরসর আপনার নির্ভর।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এই কবিতাটিতে চরকার ঘর ঘর শব্দটি কবিতায় অনুসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ে যে ধ্বনি আছে, তারা রচনায় আসিয়াছে। কিন্তু,

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীরা সরসা। —রবীন্দ্রনাথ

এই কবিতাটিতে বর্ণনীয় বিষয়ে যে ধ্বনি আছে তাহার অনুকরণ নহে। অথচ কবিতাটি আবৃত্তি করিলে নববর্ষাগমের অপূর্ব সৌন্দর্যে মন আপ্লুত হইয়া যায়। ইহাও একপ্রকারের ধ্বন্যুক্তি এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ ধ্বন্যুক্তি।

(৩) যমক : (Analogue)

সমধ্বনিযুক্ত শব্দ বাক্যমধ্যে দুইবার দুই অর্থে প্রযুক্ত হইলে যমক অলঙ্কার হয়।

অনুপ্রাসে বর্ণের (letter) পুনরাবৃত্তি হয়, আর যমকে শব্দে (word) পুনরাবৃত্তি হয়। অনুপ্রাসে অর্থের বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কিন্তু যমকে সমধ্বনির শব্দ দুইবার দুই অর্থে ব্যবহার হইবে। এই দিক হইতে যমক শুধু শব্দালঙ্কারই নহে, ইহা অর্থলঙ্কারও বটে। যেমন—

প্রভাকর **প্রভাতে প্রভাতে** মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি জগতের শোভা॥

এই কবিতায় প্রথম চরণে **প্রভাতে** শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমবার **কিরণ (rays)** অর্থে, দ্বিতীয় বার **সকাল (morning)** অর্থে।

অথবা, **ভারত ভারতখ্যাত** আপনার গুণে।

—ভারতচন্দ্র

এখানে প্রথম ভারত **ভারতচন্দ্র** অর্থে, এবং দ্বিতীয় ভারত **ভারতবর্ষ** অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অথবা, **ঘনঘটাকারে** ধূলা উড়িল আকাশে।

—মধুসূদন

এখানে প্রথম ঘন **নিবিড়** অর্থে, দ্বিতীয় ঘন **মেঘ** অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অথবা, **আনা** দরে **আনা** যায় কত আনারস।

—ঈশ্বরগুপ্ত

এখানে প্রথম আনা **মুদ্রা** (**anna**) অর্থে, দ্বিতীয় আনা **আনয়ন** অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যমক অলঙ্কার প্রাচীন রীতির রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায় ; আধুনিক কবি সাহিত্যিকেরা ইহা খুব কমই ব্যবহার করেন।

(৪) **শ্লেষ :** (Pun or Paranomasia)

একবার প্রযুক্ত কোন শব্দ একাধিক অর্থ বুঝাইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

যমক অলঙ্কারে একই শব্দ **দুইবার** ব্যবহৃত হইয়া দুই অর্থ প্রকাশ করে ; কিন্তু শ্লেষ অলঙ্কারে কোন শব্দ **একবার** ব্যবহৃত হইয়া দুই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

কে বলে **ঈশ্বর গুপ্ত** ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় **প্রভাকর** ॥

এখানে **ঈশ্বরগুপ্ত** এবং **প্রভাকর** শব্দ দুইটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্ত = (১) ভগবান অপ্রকাশ, (২) কবির নাম ;

প্রভাকর = (১) সূর্য, (২) কবির প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম।

তাই কবিতাটির এক অর্থ—ভগবান্ অপ্রকাশ আছেন, কে বলে ? তিনি চরাচর ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার শক্তিতে সূর্য প্রকাশ পাইতেছে।

ইহার অন্য অর্থ—ঈশ্বরগুপ্ত নামক কবি গুপ্ত নহেন, তাঁহার কীর্তি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে; কেননা তাঁহারই নৈপুণ্যে প্রভাকর নামক সংবাদপত্র চলিতেছে।

অথবা; পূজা শেষে কুমারী বল্লে "ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মত **বর** দাও।"

—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

এখানে **বর** শব্দের এক অর্থ **আকাঙ্ক্ষাপূরণের আশীর্বাদ**, অন্য অর্থ **স্বামী**।

অথবা, **মধুহীন** করোনাকো তব মনঃকোকনদে।

—মধুসূদন

এখানে মধু শব্দের এক অর্থ মধু (honey), অন্য অর্থ **মধুসূদন** (কবি নিজে)।

২। অর্থালঙ্কার

(১) উপমা :

সমান ধর্মবিশিষ্ট দুই বস্তুর সাদৃশ্যকল্পনাদ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি হইলে উপমা অলঙ্কার হয়।

উপমার প্রধান অঙ্গ চারিটি—

১। **উপমেয়**—যাহাকে উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়।

২। **উপমান**—যাহার সহিত উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়।

৩। **সমানধর্মবাচক শব্দ**—যে ধর্ম বা গুণ উপমান ও উপমেয় উভয় বস্তুতে বর্তমান।

৪। **তুলনাবাচক শব্দ**—মত, মতন, যেন ইত্যাদি অব্যয়।

উপমা অলঙ্কারের একটি উদাহরণ লওয়া যাক—**মুখখানা চাঁদের মতন সুন্দর**।

এখানে **মুখ** উপমেয়, **চাঁদ** উপমান, **সুন্দর** সমানধর্ম, **মতন** তুলনাবাচক শব্দ।

আর একটি উদাহরণ—

এও যে রক্তের মত রাঙা
দুটি জবাফুল।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে **জবাফুল** উপমেয়, **রক্ত** উপমান, **রাঙা** সমানধর্ম, **মত** তুলনাবাচক শব্দ। উপমার চারিটি অঙ্গ **উল্লিখিত** থাকিলে সেই উপমাকে **পূর্ণোপমা (simile)** বলে ; যদি চারিটি অঙ্গের কোনোটি **অনুল্লিখিত** থাকে তবে তাহাকে **লুপ্তোপমা** (**metaphor**) বলা হয়।

পূর্ণোপমা : (ক) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা।

—মধুসূদন

এখানে উপমেয় **সিন্দুরবি[illegible]**, উপমান **তারারত্ন**, সমানধর্ম **শোভিল**, তুলনাবাচক শব্দ **যথা**। [illegible] এই উপমাটি **পূর্ণোপমার** নিদর্শন।

(খ) বি[illegible]া সম চকমকি
উড়ি[illegible]কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে
শন্‌শনে। —মধুসূদন

এখানে উপমেয় **কলম্বকুল** (শরসমূহ), উপমান **বিদ্যুৎঝলা**, সমানধর্ম **চকমকি উড়িল অম্বরপ্রদেশে শন্‌শনে**, সাদৃশ্যবাচক শব্দ **সম**। অতএব এই উপমাটিও **পূর্ণোপমার** নিদর্শন।

লুপ্তোপমা ঃ (ক) অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ নিনাদে।
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে উপমেয় **নিনাদ** (কণ্ঠস্বর), উপমান **অম্বুদ** (মেঘ, তাহার গর্জন বিষয়ে), কিন্তু সমান ধর্ম **গম্ভীর** এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ **বৎ** উহ্য আছে। অতএব এই উপমাটি **লুপ্তোপমার** নিদর্শন।

(খ) বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
—সঞ্জীবচন্দ্র

এখানে উপমেয় **বন্যেরা**, উপমান **শিশুরা**, সমান ধর্ম **সুন্দর**, কিন্তু সাদৃশ্য বাচক শব্দ **যেমন তেমন** উহ্য আছে। এইজন্য এই উপমাটি **লুপ্তোপমার** নিদর্শন।

(২) **উৎপ্রেক্ষা ঃ**

প্রবল সাদৃশ্য বশতঃ উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষায় সংশয় প্রকাশ করিবার জন্য 'যেন' 'বুঝি' 'বোধ হয়' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ হয়। কখনো কখনো সংশয়বাচক শব্দ উহ্যও থাকে।

ভাবের দিক হইতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় সম্পূর্ণ মিল আছে। দুইটিতেই সমানধর্মযুক্ত দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মধ্যে সামান্য প্রভেদ যাহা আছে তাহা হইল দৃষ্টিভঙ্গীর। যদি বলা হয়, **চাঁদের মতন মুখ** তবে উপমা হইল ; যদি বলা হয় **মুখ যেন চাঁদ** তবে উৎপ্রেক্ষা হইল। উপমায় শুধু দুই সমানধর্মের মধ্যে তুলনা হয়, উৎপ্রেক্ষার তুলনায় উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় জন্মে। যেমন—

রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ!
—মধুসূদন

এখানে তরুর কুসুম ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে বধূর সাজ খুলিয়া ফেলার তুলনা হইয়াছে। কিন্তু কথাটা এইভাবে বলা হইয়াছে, যেন কুসুম ঝরিয়া পড়া বিষয়টাকে তরুর সাজ খুলিয়া ফেলা বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

অথবা, ধরণী এগিয়ে এসে দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।

—নজরুল

এখানে ধরণী কবিকে যে উপহার দিতেছেন তাহা দুলালী কন্যার স্নেহ উপহারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও উপমেয় ও উপমানের প্রবল সাদৃশ্য বশতঃ উপমেয়কে উপমান বলিয়া (অর্থাৎ ধরণীকে কন্যা বলিয়া) সংশয় হইয়াছে।

(৩) রূপক :

উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। রূপক অলঙ্কারে অভেদজ্ঞাপক শব্দ 'রূপ' 'স্বরূপ' ইত্যাদি অনেক সময় উহ্য থাকে।

যেমন— কি কুক্ষণে, তোর দুঃখে দুঃখী
পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে।

—মধুসূদন

এখানে জানকী ও পাবকশিখা (অগ্নিশিখা) এই দুই বস্তুতে অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। অভেদজ্ঞাপক শব্দ 'রূপিনী'। অভেদ কল্পনার মূলে **সমানধর্ম** হইল উভয়েরই **উজ্জ্বল রূপ** এবং **ধ্বংসকরী শক্তি**।

রূপকের আরো উদাহরণ—

জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকার অপনীত হয়।

এখানে বাক্যের প্রথমাংশে জ্ঞান ও আলোক এই দুই বস্তুতে অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। শেষাংশে অজ্ঞান ও অন্ধকার ইহাদের মধ্যে অভেদ কল্পিত হইয়াছে। তাই এই বাক্যে দুইটি রূপক অলঙ্কার। অভেদজ্ঞাপক শব্দ রূপ, রূপী ইত্যাদি উহ্য আছে।

(৪) ব্যতিরেক :

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যেমন—

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা॥

—ভারতচন্দ্র

এখানে শারদশশী অ... মুখের সৌন্দর্য অধিক হইল। অর্থাৎ উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎক... ...ত হইল।

অথবা, ...নে বাড়ে কালকেতু।

গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন।

—কবিকঙ্কণ

এখানে গজরাজের গতি হইতে কালকেতুর গতি বেশী ভঙ্গিময়, কেশরীর কটিদেশ হইতে কালকেতুর কটিদেশ অধিক ক্ষীণ, এবং মুক্তাপংক্তি হইতে তাহার দশন (দাঁত) অধিকতর উজ্জ্বল বলা হইয়াছে। অর্থাৎ গতি, মাঝ (কটি) দশন এই তিনটি বিষয়েই উপমেয় উপমানের তুলনায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) সমাসোক্তি (Personification) :

বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন—

দূরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী
সুনীল বসনে ঢাকি ফুলতনুখানি
তরল গুণ্ঠন আড়ে মুখশশী উঁকি মারে
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেমবাণী।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

এখানে নির্জীব প্রাকৃতিক বিষয় সন্ধ্যাকে বধূমূর্তিতে কল্পনা করা হইয়াছে। নববধূর সাজসজ্জা ও ব্যবহার সন্ধ্যাতে আরোপ করা হইয়াছে। ইহাতে নির্জীব প্রকৃতি জীবন্তবৎ হইয়া উঠিয়াছে এবং কবিতা অধিকতর সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

অথবা, মাতার কণ্ঠে শেফালী মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী ;
পরেছে কিরীট কনক কিরণে
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুম ভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

—রবীন্দ্রনাথ

এই কবিতাটিতে বাংলা দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শরৎকালে পল্লীপ্রকৃতিতে যে বিচিত্র শোভা আছে তাহাকে মায়ের অঙ্গসজ্জা বলা হইয়াছে ; এবং প্রকৃতির এই রূপে যে মহিমা তাহাকে মায়ের মহিমা বলিয়া ভাবা হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে পার্থক্য কি উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

২। সংজ্ঞা বল ও দৃষ্টান্ত দাও—
অনুপ্রাস। ধ্বন্যুক্তি। যমক। শ্লেষ।

৩। কোথায় কোন্ প্রকার **শব্দালঙ্কার** হইয়াছে আলোচনা কর—

(ক) কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী।

(খ) সাগরজবে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল উপকূলে।

(গ) পুজাশেষে কুমারীটি বল্লে—ঠাকুর, আমাকে একটি বর দাও।

(ঘ) প্রভাকর প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি জগতের শোভা।

৪। শ্লেষ ও যমকে পার্থক্য কি বল।

৫। অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তিতে পার্থক্য কি বল।

৬। সংজ্ঞা বল ও উদাহরণ দাও—
উপমা। উৎপ্রেক্ষা। রূপক। ব্যতিরেক।

৭। লুপ্তোপমা ও পূর্ণোপমায় পার্থক্য কি ?

৮। সমাসোক্তি অলঙ্কারটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাও।
নিম্নের বাক্য দুইটি সমাসোক্তি কি না বল—

(ক) ধন্যরে দেশাচার কি অনির্বচনায় তোর মহিমা।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(খ) *'নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?' 'মহাদেবের জটা হইতে।'*

—জগদীশচন্দ্র বসু

৯। অলঙ্কার নির্ণয় কর—

(ক) আহা! দেখেছ, কেমন পটলচেরা চোখ।

(খ) আমি শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি।

(গ) গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন।

(ঘ) কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

রচনাভাগ

রচনা-শিক্ষা

রচনার অর্থ

রচনা অর্থ সৃষ্টি, নির্মাণ—যেমন, গল্প রচনা, উপন্যাস রচনা, কাব্য রচনা, প্রবন্ধ রচনা। যে লেখায় নূতন কিছু পরিস্ফুট হয়, তারই নাম রচনা। কিন্তু স্কুল-কলেজের বেলায় একটা বিশেষ অর্থে এই শব্দটি প্রয়োজ্য হয়—তার অর্থ essay বা প্রবন্ধ। ওই ইংরেজী শব্দটির মূলগত অর্থ হচ্ছে প্রয়াস, প্রকাশ-প্রচেষ্টা। ছাত্রছাত্রীদের বেলা আবার আরও একটু বিশিষ্টতর অর্থ তার আছে—নিজেদের লেখার চেষ্টা; কোনো বিশেষ বিষয়ে তাদের নিজ নিজ ভাবনা নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করা। সে লেখা সাহিত্য রচনার মত 'সৃষ্টি' না হতে পারে, কিন্তু তাতে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রকাশ-প্রচেষ্টার পরিচয় থাকবে। বিষয়ের ভাবনা, যুক্তি প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীরা পড়ে-শুনে অন্যের লেখা থেকে সংগ্রহ করবে। তা আয়ত্ত করে, নিজস্ব করে নেবে; তাতে তাদের মনের বিকাশ ও প্রসার বাড়বে। কিন্তু তারপর যখন তারা লিখতে বসবে তখন লিখবে নিজেদের বক্তব্য নিজেদের ভাষায়।

রচনার বই পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রচনার বিশেষ পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে, যথা, এক-একটি বিষয় কি ভাবে চিন্তা করতে হয়, তারপর চিন্তাকে যুক্তিবদ্ধ প্রণালীতে কি করে সাজাতে হয় এবং কেমন করে লেখা আরম্ভ করতে হয়, কেমন করে তা শেষ করতে হয় ইত্যাদি। তা ছাড়া, গোড়ার একটা কথা আছে, প্রয়োজন মত আয়োজন—কত বড় হবে লেখাটা? কত মার্কের লেখা? তাই কতটা সময়ের মধ্যে তা শেষ করা প্রয়োজন? এবুঝে সেই আয়তনের মধ্যেই প্রধান যুক্তিকে একটু প্রাধান্য দিতে হবে, গৌণ যুক্তিকে অল্প পরিসর দিতে হবে—যা অনাবশ্যক তা বর্জন করতে হবে। কিন্তু রচনার মূল অর্থ এই যে, তা শিক্ষার্থীর বা লেখকের নিজস্ব প্রচেষ্টা হবে। অন্যের লেখা মুখস্থ করে, অন্যের ভাষা উদ্‌গীরণ করে রচনা লেখা যায় না।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে রচনা-শিক্ষার সাধারণ উপায় হচ্ছে—প্রথমত: পর্যবেক্ষণ বা দেখা। চারিদিকের এই ফলপাতা পশু-পাখি-ভরা পৃথিবীকে ভালো করে দেখা, মানুষের জীবন—কাজ-কর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, বিন্যাস,—এ সব জিনিসকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে শেখা, বুঝতে পারাই প্রথম কথা। অন্য ভাষায় বলা যায়, রচনার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা অবশ্য জটিল ব্যাপার—দেখা, জানা, বোঝা, সব মিলিয়ে তা ব্যক্তির চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, পড়া; যা দেখেছি তার অর্থ বুঝবার পক্ষে এটি একটি প্রধান উপায়। তাই দরকার প্রধান-প্রধান প্রবন্ধকার ও চিন্তাশীল লেখকদের

লেখা মন [illegible]য়ে পড়া, কারও কারও লেখা বা[illegible], আর তাদের ভাব ও ভাষার বিকাশ-প্রণালী লক্ষ্য করা। এ ভা[illegible]াক [illegible] সুস্থির হয়, ভাষাবোধ মার্জিত হয়; তৃতীয় কাজ হচ্ছে, রচনা [illegible]া; তার থেকে সাধারণ প্রবন্ধাদি লেখার বিশেষ ধরন ও কৌশল আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু এ সবের মতোই প্রয়োজন, নিজে লেখার চেষ্টা, লেখা; অপরের সঙ্গে সে লেখা আলোচনা করা; বিচার করা তারপরে আবার লেখা। সম্ভব হলে কিছুদিন পরে সে বিষয় তৃতীয়বার নতুন করে লেখা,—তাতে বোঝা যায় কতটা রচনা-শিক্ষা আয়ত্ত হচ্ছে। লেখাই হচ্ছে লিখতে শেখার পথ, অন্য পথ নেই। দেখা, ভাবা ও লেখা এই তিনটিই রচনার মূলকথা।

মূল প্রয়োজন

ভাব ও ভাষা নিয়েই রচনা। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন, ভাষা ছাড়া ভাবা যায় না, আর ভাব ছাড়াও ভাষা হয় না। সে যাই হোক, রচনায় চাই সেই ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতি, একাত্ম-মিলন।

বিষয় ভাবনা

রচনার প্রথম পর্বের কাজ হল বিষয়-ভাবনা। তারও কয়েকটি অঙ্গ আছে। যেমন, (১) বিষয়-নির্ণয়: প্রসঙ্গটি কী তা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। কাগজপত্রে 'সংজ্ঞা' না লিখলেও মনে মনে তা বোঝা দরকার। (২) ভাবনা: নির্ণেয় বিষয়টি সম্বন্ধে লেখকের নিজের জ্ঞান কী, বোধ কী, অভিজ্ঞতা কী, উপলব্ধি কী—তা বুঝে নিলে, অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাবনা শুরু করলে, ভাবনা যথার্থ নিজস্ব হবে। (৩) এই জ্ঞানের বা উপলব্ধির বিশ্লেষণ: মনে মনে স্থির করা দরকার, নিজের কোন্ কোন্ ভাব সেই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত। কিম্বা, জটিল আলোচনামূলক বিষয় হলে বিশ্লেষণ করা—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কী কী যুক্তি আছে। এ কাজে প্রথমতঃ 'পয়েণ্টস্' করে বা সংকেতাকারে এক একটি ভাব ও যুক্তি কাগজে টুকে নেওয়াই উচিত। (৪) তারপরেই ভাব-বিন্যাস: বুঝে নিতে হয় প্রথম কি হবে ভূমিকা। তারপর কোন্ ভাবের পর কোন্ ভাব, কিম্বা কোন্ যুক্তির পরে কোন যুক্তি স্বাভাবিক ক্রমে আসে। শেষে আসবে উপসংহার। (৫) এর পরে পঞ্চম কাজ ভাব-বিকাশ; সংকেতাকারে যে ভাব বা যুক্তিসমূহ স্থির করা হয়েছে তা বিস্তৃতাকারে ভাবা—অবশ্য দেখ্‌তে হয় যেন (ক) ভাবের ক্রমভঙ্গ না হয়, ভাব সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হয়। (খ) সবশুদ্ধ ভাবনা যেন একটি ক্রম-পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। (গ) ভাবের বিস্তার করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক ভাব এসে না জোটে। (ঘ) কিম্বা, তুচ্ছ কথা গুরুত্ব না পায়। এবং (ঙ) উপসংহারে সমগ্র বিষয়টিকে সুসংহত আকারে সমগ্র ভাবে দেখতে হয়—তাতে বিচারের নিষ্পত্তি হয়ে যায়, ভাবের পরিসমাপ্তি বোধ জাগে।

ভাবনার পর্বটি সু[illegible] লেখার পর্ব বা প্রকাশের পর্ব সহজসাধ্য হয়। অবশ্য ভাবনার [illegible] ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কাজেই ভাবনার প্রত্যেক[illegible] প্রতিফলন ভাষায়ও থাকা স্বাভাবিক।

প্রকাশের ভাষা

প্রকাশের জন্য কয়েকটি মূল প্রয়োজনের কথা বিশেষ করে এখানে বলা হচ্ছে। প্রথম প্রয়োজন—**শুদ্ধ ভাষা** লেখা। শুদ্ধ অর্থ ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ। ভাষার নিয়ম বুঝেই ব্যাকরণের নিয়ম প্রণীত হয়—ব্যাকরণের নিয়মকে 'উপদ্রব' মনে করবার কারণ নেই। এমন কি, বানানেরও নিয়ম আছে। সে সব নিয়ম না জানাতেই অসাবধান লেখকদের নিয়ম ভাঙার দিকে ঝোঁক পড়ে। যে লেখায় নিয়ম যথার্থ ভাঙা হয় সে লেখা অশুদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দু'একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিই : চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার লেখার ও বানানের নিয়ম পূর্বে সুস্থির ছিল না। তাতে পূর্ব যুগের কোনো কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের সাধু ও চলতি পদের মিশ্রণ দেখা যায়। তা সত্ত্বেও এরূপ মিশ্রণ এখন ব্যাকরণগত ভুল বলেই গণ্য হবে : বাক্যেও 'শুভকার্য নির্বাহ হইয়াছে', 'কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম', প্রভৃতি বাক্য ভুল প্রয়োগই, তবে প্রচলিত ভুল। তৃতীয় দৃষ্টান্ত, বানানের নিয়মকে সরল করতে চাই বলে 'বুদ্ধিজীবী'কে 'বুদ্ধিজিবি' বা 'বুদ্ধিজীবি' লেখা চলে না। কিম্বা একই লেখায় একবার 'কেরানি', আবার 'কেরাণী' কিম্বা 'কেরানি' এরূপ নানা বানান লেখাও অবাঞ্ছনীয়। অবশ্য এমন কোনো কোনো শব্দ আছে যা (সংস্কৃত) ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বাংলায় সুপ্রচলিত। যেমন, 'সৃজন', 'সততা,' 'গোপন কথা,' 'আশ্চর্য ব্যাপার,' ইত্যাদি। সুপ্রচলিত শব্দের পরিবর্তে অপ্রচলিত শুদ্ধ শব্দ চালানোও রচনায় অবাঞ্ছিত। শুদ্ধ হলেও তা দোষাবহ। তাছাড়া, ইংরেজীতে যাকে ইডিয়ম (idiom) বলে তাহার সেই 'বাগ্‌ধারা' বা 'রীতিসিদ্ধ' প্রয়োগ পাল্‌টানো যায় না। 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' না চাপিয়ে 'কাঁধে' চাপানো চলে না। সাধারণ ভাবে বলা যায়, এরূপ ভাষাতেই লেখা শ্রেয়ঃ যে ভাষার শব্দ, পদ ও বাগধারা বাঙলা ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধ ও বাঙলায় সুপ্রচলিত।

দ্বিতীয় কথা : বাক্যবিন্যাসের ধারা। বাক্যের পদক্রম ও পদসঙ্গতি বিনা প্রয়োজনে ভঙ্গ করা উচিত নয়। বাঙলার সাধারণ পদক্রম (sequence of words) সুবিদিত—কর্তা প্রথমে ও ক্রিয়া শেষে আসে; মধ্যে বসে অন্যান্য 'কারক' পদ। অবশ্য ক্রিয়া ও কর্তা উহ্যও থাকতে পারে, বিশেষ্য বিশেষণ পদ প্রভৃতিরও সঙ্গতি (agreement) মত সাধারণতঃ স্থান নির্দিষ্ট। কিন্তু এই সাধারণ পদক্রমের নানা ভাবে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায়। চলতি কথায় আমরা তা করে থাকি, দীর্ঘ রচনায়ও তা করা প্রয়োজন হয়—কখনো সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রাখি; কখনো কর্তৃপদ উহ্য রাখি;—যেমন,"এক রাজা, তার

সাত রানী।" "অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক জ[illegible]মি একা। চলেছি তো চলেইছি।" ইত্যাদি। বিশেষ উদ্দেশ্যে [illegible] ক্রম-রীতির বিপর্যয় করে বাঙলা ভাষায় গতিধারার অনেক বৈচিত্র্য ([illegible]ety) শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সাধন করেন; উদ্দেশ্য হচ্ছে—ছন্দে বৈচিত্র্য আনা, এবং কোনো বিশেষ কথাকে প্রাধান্য (emphasis) দিয়ে সে দিকে পাঠকের বা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা। যেমন, "আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই ভাবে পদ-বিপর্যয়ে বাঙলা গদ্যের ছন্দ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য, এই পদ-বিপর্যয়ের রীতি বাঙলা কথ্য ভাষায় বরাবরই প্রবল; "এক যে ছিল রাজা, তার ছিল সাত রানী।" কিম্বা "রাজপুত্র চললেন—পাহাড় ডিঙিয়ে, সমুদ্র পার হয়ে, আকাশের তারার প্রদীপ পিছনে ফেলে," ইত্যাদি। "বাংলা বাক্যবিন্যাসে যদি স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, তা বলে স্বৈরাচার নেই"। (রবীন্দ্রনাথ)

সাধারণ যুক্তিবহুল রচনায় পদ-বিপর্যয় সাধারণতঃ করা উচিত নয়। করলে সাবধানে করতে হয়, না হলে ত্রুটি ঘটবে। বিনা প্রয়োজনে রীতি-ভঙ্গ ও পদ-বিপর্যয় রচনার একটি দোষ।

তৃতীয় কথা: অনুচ্ছেদ (paragraph) রচনা। সুশৃঙ্খল ভাবনাকে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সাজাতে হলে প্রবন্ধটিকেও ভাব-বিন্যাস অনুযায়ী কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হয়। (ক) একটি ভাব বা একটি যুক্তি একটি অনুচ্ছেদেই প্রকাশ করা, এই হল এজন্য সাধারণ নিয়ম। তবে অনুচ্ছেদ খুব বড় না হলে কোনো যুক্তি ও তার বিরোধী প্রশ্ন সেই অনুচ্ছেদেই শেষ করা যায়। (খ) এক অনুচ্ছেদ থেকে পরবর্তী অনুচ্ছেদে যাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ভাবের মতই ভাষার ও লেখার সূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে।

চতুর্থ কথা: সমগ্র ভাবে প্রবন্ধটি দেখা—ভাবনার প্রারম্ভ, প্রসার ও পরিণতি সকলে মিলে ভার-সাম্য রক্ষা হওয়া চাই। ভাষার রীতি পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ রয়েছে কিনা, ভাব-বিস্তারের সঙ্গে ছোট বড় নানা বাক্য ও ধ্বনি তরঙ্গ শুদ্ধ একটা ভাষা-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, এবং ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতিতে রচনাটি একটা সামগ্রিক অখণ্ডতা লাভ করেছে কিনা,—এসবই ওজন করে, বিচার করে দেখতে হয়।

এই সবই হল রচনার মূল প্রয়োজন। শব্দ-চয়ন, ভাষার রীতি প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস এসব মূল প্রয়োজন মেনে তবেই স্থির করতে হয়। না হলে সে সবের প্রয়োগও সার্থক হয় না।

ভাষার রূপ

ভাষার রূপ ও রীতি প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন ওঠে, চলতি ভাষায় লিখব, না, সাধু ভাষায় লিখব? বাঙলা ভাষার 'চলতি' ও 'সাধু' কোন্ রূপ গ্রহণ করব?

তারপরে প্রশ্ন ওঠে, কোন রীতিতে (style-এ) লিখব—সরল ভাষায়, গুরু-গম্ভীর ভাষায়, না, লঘু ভঙ্গিতে?

এসব প্রশ্নের বাঁধাধরা উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ, সার্থক শিল্পী নিজের প্রয়োজন মত সব রীতিই প্রয়োগ করেন। একথাও সত্য, লেখকের রীতি বা style হচ্ছে বহুল পরিমাণে তাঁর স্বকীয়; তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ মেখে তা গড়ে ওঠে। আর, চলতি ভাষা ও সাধু ভাষা, বাঙলা ভাষার এই দুই রূপেই বহু সুলেখক সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাজেই, সাহিত্যিক-দের বেলা 'কোন্ ভাষায় লিখব?' এসব প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে শিক্ষার্থী-দের বেলা, কি ভাবে তারা রচনা শিক্ষা করবে, এবং আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাবে?

এই শিক্ষার্থীদের আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অমূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলি (বিবিধ প্রবন্ধে 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্গ দর্শন, ১২৮৫ সাল)

ভাষা ও বিষয়

"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা।" (দ্রষ্টব্য রচনাবলী পৃঃ ৩৭৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় আশি বৎসর পূর্বে (১২৮৫ সালে) এরূপে পথ নির্দেশ করেছেন। এই মূলনীতি অনুযায়ী তাঁর নিজের ভাষাও তিনি ক্রমশঃ প্রাঞ্জল থেকে প্রাঞ্জলতর করে তোলেন। বাঙলা ভাষাও এ আশি বৎসরে একদিকে ক্রমশঃ সরল থেকে সরলতর হয়েছে, অন্যদিকে নানা-অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হয়েছে, ঋজু, বঙ্কিম বিচিত্র গতি-ভঙ্গিতে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। তার ফলে প্রয়োজন মতো এ ভাষার বিচিত্র আদর্শ আজ লেখকদের পক্ষে সুলভ। বর্তমান সময়েও এরূপ সুনিপুণ গদ্য-শিল্পীর সংখ্যা বাঙলায় কম নয়। এজন্যই শিক্ষার্থীর পক্ষে আজ আরও বেশী করে স্মরণীয় এই কথা, "রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা।" আর বিষয় অনুসারেই রচনার রূপও স্থির করতে হয়।

এ সম্পর্কে একটি কথা আছে: গদ্য রচনা মোটামুটি দু'রকমের হয়। একটি মুখ্যতঃ 'আলোচনার গদ্য'—এ হচ্ছে Prose of Reason—যুক্তিধর্মী ও প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনা। প্রবন্ধে, সংবাদপত্রেও

গদ্যের জাতি

আলোচনায় এরূপ রচনাই প্রয়োজনীয়। এসব ক্ষেত্রে ভাষার প্রধান গুণ হল স্বচ্ছতা। দ্বিতীয় ধরনের গদ্য হচ্ছে মুখ্যতঃ 'রসসৃষ্টির গদ্য'—কল্পনা-প্রধান, ভাবুকতা-প্রধান (Prose of Reflection & Imagination) গদ্য। এরূপ রচনার উদ্দেশ্য চিত্তানুরঞ্জন করা, রস-চেতনার উদ্বোধন করা। এরূপ রচনা ব্যক্তিগত কল্পনায়, আবেগে, আনন্দে, বেদনায়, কৌতুকে, রঙ্গে, রসায়িত; ভাষাও ঋজু বঙ্কিম চমৎ-কারিত্বে মনোহর। প্রবন্ধের ভাষার কথা পরে আরও আলোচনা করছি।

চলতি ভাষা ও সাধু ভাষা

চলতি ভাষায় লিখব, না, সাধু ভাষায় [illegible] —শিক্ষার্থীর এ প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত এই [illegible] [illegible]াষাই সমান চলন্ত, দু ভাষাতেই লেখা চলে [illegible] ও সেজন্যই দু ভাষাতেই রচনা লিখছি। কিন্তু দু ভাষা মিশ্রিত করা চলে না।

আমাদের বক্তব্য, এক কালে চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল আজ আর ততটা পার্থক্য নেই। এখনকার সাধু ভাষা আর সংস্কৃতশব্দের বোঝা স্বেচ্ছায় বহন করে না; আবার চলতি ভাষাও শিথিল উচ্চারণ-পদ্ধতি ও অসঙ্গত মৌখিকতার (colloquialism) পক্ষপাতী নয়। চলতি ভাষাও এখন সাধু ভাষার মতোই প্রয়োজন হলে সংস্কৃত শব্দও অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করে। দু'ভাষার পার্থক্য এসে দাঁড়িয়েছে এখন মুখ্যত: এই কয়টি জিনিসে—চলতি ভাষা কলকাতার শিক্ষিত লোকের ভাষাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে; ক্রিয়াপদে (সমাপিকা, অসমাপিকায়) ও সর্বনামের বেলা কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, আর সাধুভাষা সেখানে পুরনো বাঙালার (অ-কথিত) পদ ব্যবহার করে (যেমন, চল্‌তি 'করছে', 'করতে', 'করে', ইত্যাদি=সাধু 'করিতেছে', 'করিতে', 'করিয়া', ইত্যাদি, এবং চল্‌তি 'তারা', 'ওরা', 'এরা', ইত্যাদি=সাধু 'তাহারা', 'উহারা', 'ইহারা', ইত্যাদি)। আর আছে কিছু কিছু বাগ্‌ধারা ও বানানের নিয়মের পার্থক্য।

আর একটি সাধারণ পার্থক্য আছে—চল্‌তি ভাষার গতিছন্দ লঘুচারী, সাধু ভাষার গতিছন্দ গুরুগতি; অবশ্য কুশলী লেখক দু'টোকেই নিজের ইচ্ছামত গতি দান করতে পারেন। সাধারণ লেখকের পক্ষে বলা যায়—হাল্‌কা সুরে হাল্‌কা কথা বলা চলতি ভাষায় সহজ, এবং গভীর সুরে বলতে চাইলে সাধু ভাষাতেই বেশি সহজে তা বলা যায়।

আর একটি বড় কথা, সাধারণভাবে বলা যায় যে, চলতি ভাষার প্রভাব বাড়ছে ও বাড়বে; সাধু ভাষার প্রভাব সে তুলনায় বাড়তে পারছে না। আলাপ এবং বক্তৃতায়ও সাধু ভাষা অচল। তাই সাহিত্যের সংলাপে, নাটকে, গল্প-উপন্যাসের কথাবার্তায় চলতি ভাষাই একচ্ছত্র। তারপর, বেতারেও তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাধুভাষার প্রধান অবলম্বন এখন প্রবন্ধ-সাহিত্য, আর বাংলা সংবাদপত্রের বার্তা-বিতরণ। মোটামুটি চলতি ভাষার প্রাধান্য এখন স্বীকার্য।

বিষয় অনুযায়ী ভাষা হবে, এই মূল কথাটা মনে রেখেও ভাষার রূপ ও রীতি সম্পর্কে আরও দু' একটি সাধারণ কথা বলা যেতে পারে। প্রবন্ধ নানা বিষয়েই লেখা হয়; তবু তার দুটি শ্রেণী মানা চলে। যেমন, আলোচনা-প্রধান প্রবন্ধ—বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, জীবন-কথা,—এমন কোনো বিষয়ই নেই যা এরূপ প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে না। তাতেও দৃষ্টি-ভঙ্গি হতে পারে আবার বিচিত্র। দ্বিতীয় শ্রেণী 'রসসৃষ্টির প্রবন্ধ'—রস-রচনা

কৌতুক-রচনা, রম্যরচনা—[illegible]ত্র-চিত্র, নিসর্গ-বর্ণনা, ভ্রমণ-কাহিনী—এরূপ নানা বিষয়ে এ শ্রেণীর [illegible]চিত হতে পারে। তাও নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা সম্ভব। বিষয় ছা[illegible]র রূপ ও রীতি নির্ভর করে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরে—লেখকের উদ্দিষ্ট বা অভীষ্ট কোন্ রস ? বুদ্ধির তৃপ্তি, না, হৃদয়-বেদ্যতা ? সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল যে রূপ ও যে রীতি তাই সে রচনার পক্ষে স্বাভাবিক রীতি, স্বাভাবিক রূপ। পূর্বযুগে এক-মাত্র সাধু গদ্যেরই প্রচলন ছিল, তথাপি তার সহায়ে কৃতী লেখকেরা এই বিচিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন—যেমন, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। এখন প্রবন্ধেও চলতি বাঙলা প্রচলিত হওয়ায় আলোচনার প্রবন্ধে আলাপের আরও সহজ চাল আনা যায়, আর চিত্তানুরঞ্জনী প্রবন্ধে অনেক বেশি লঘু-কৌতুকের সরলতা ও চটুলতা বা হাল্কা চাল আনা সম্ভবপর হয়। দুই রূপের ভাষার স্বাভাবিক ঝোঁক দুদিকে : সাধু ভাষা ধীর গম্ভীরগামী ; সরলতা ও গাম্ভীর্য গুণের তা অনুকূল। চলতি ভাষায় লঘু-গতি অন্তরঙ্গতা সহজলভ্য, চলতি ভাষা তাই অন্তরঙ্গ আলাপের মাধুর্যগুণের অনুকূল। তাই বলা যায় দু ভাষাতেই প্রবন্ধ লেখা যায়, একথা সত্য ; কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী, আত্মকাহিনী প্রভৃতি রচনায় চলতি ভাষাই প্রশস্ত।

রম্যরচনা ছাড়াও সরস লঘু প্রবন্ধেও চলতি ভাষাই স্বাভাবিক। কারণ, লঘু পদে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে সুবিধা। অন্যদিকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ে লিখতে হলে সেই গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, সংস্কৃতবহুল (তৎসম) শব্দের সহায়তা নিয়ে—ক্রিয়াপদ, সর্বনাম প্রভৃতি চলতি ভাষারই হোক্, কিম্বা সাধু ভাষারই হোক্।

তথাকথিত সাধুভাষায় যে চমৎকার প্রবন্ধ রচিত হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চলতি ভাষায়ও যে বলিষ্ঠতা ও স্বচ্ছতা আসে তার দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ, রাজশেখর বসু।

এখন প্রশ্ন—রচনা শিক্ষাকালে ভাষার কোন্ রূপ শিক্ষার্থী গ্রহণ করবে ? সাধু ভাষায় লিখবে, না, চলতি ভাষায় লিখবে ? এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত বলছি—অবশ্য আমরা ধরে নিয়েছি প্রকাশ শক্তি বেশ কিছুটা আয়ত্ত না হতে কোনো শিক্ষার্থী রসসৃষ্টির চেষ্টা করবে না—বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনাই লিখবে।

শিক্ষার্থীর সমস্যা

(১) চলতি ও সাধু, বাঙলা ভাষার এই দু' রূপই শিক্ষাসাপেক্ষ—এবং দু' রূপই শিক্ষণীয়। 'সাধু ভাষা' শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বত্র আছে, কাজেই তার নিয়মনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে শিক্ষার্থীর দেরী হয় না। কিন্তু চলতি ভাষায় শিক্ষাদান পূর্বে হত না ; তা যে শিক্ষাসাপেক্ষ এই বোধই এখন পর্যন্ত অনেকের নেই। চলতি ভাষা লেখার নিয়ম-নীতিও তাই যথারীতি অনেকে আয়ত্ত

করে না। এজন্য সাধু ভাষায় লেখার রাস্তা [illegible] যত পরিচিত, চলতি ভাষায় লেখার রাস্তা অনেক সময়েই তার ত[illegible] নয়।

(২) দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি সাধারণ [illegible] কথাও নির্দেশ করা যেতে পারে—চলতি ভাষার বনিয়াদ কলকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত শ্রেণীর কথিত ভাষা,—তা ঠিক শহুরে (cockney) 'কলকাত্তাই' (যেমন, গেহু, খেহু, ইত্যাদি, বা চেলের দর, ভেয়ের বে, ইত্যাদি) নয় ; আর 'ইতুরে' (slang) ভাষাও নয় (যেমন, 'চতুর' অর্থে 'খলিফা', 'স্ত্রী' অর্থে 'মাগ্' 'স্ত্রীলোক' অর্থে 'মাগী', প্রভৃতি শব্দ ; অনেক মৌখিক ইডিয়ম্, প্রবচন, বিকৃত উচ্চারণের ঢঙ্ প্রভৃতি)। অমার্জিত বলেই এসব 'চলতি ভাষায়ও' অগ্রাহ্য। বিশেষ করে প্রবন্ধে, শিষ্ট-আলোচনায় এসবের স্থান নেই।

(৩) চলতি ভাষায়ও শিষ্ট প্রথা ও স্থূল প্রথার মধ্যে মাত্রা রক্ষা করেই সাহিত্য রচিত হয়—বিশেষ করে প্রবন্ধ-সাহিত্যে চলতি ভাষার হাল্‌কা রূপ প্রায়ই অশোভন। তাই অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপকেই আলোচনার সময়ে গ্রহণ করতে হয়। যেমন, চলতি রূপ 'জিগ্যেস' হলেও প্রবন্ধে আমরা 'জিজ্ঞাসাই' লিখব 'মিথ্যে' না লিখে 'মিথ্যা' লিখব। 'পাগলামো' না লিখে 'পাগলামি' লিখব ; 'পেতোল' 'ভেতোর' 'সেদ্ধো' প্রভৃতি না লিখে 'পিতল', 'ভিতর', 'সিদ্ধ'ও লিখতে পারি, যদিও গল্পে, নাটকে, বক্তৃতায় উচ্চারিত প্রথম রূপই গ্রাহ্য।

(৪) অনেক সময়েই চলতি ভাষায় বানান এখনো অনিশ্চিত, যেমন, করছে, কোরছে, কোচ্ছে, কোচ্চে, হত, হ'ত, হোত, ভেতোর, ভেতর ; ইত্যাদি। কিরূপে লেখা হবে,—শব্দটি 'ওপরে' লিখব না 'উপরে' লিখব—কতটা উচ্চারণানুযায়ী বানান সম্ভব, তা শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝা (না, 'বোঝা ?') দুঃসাধ্য। এসব কারণে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম পর্বে সাধু ভাষায় লেখা অভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ। তারপর, তার ভাষাবোধ ও রীতি-জ্ঞান পরিণত হলে ক্রমশঃ চলতি ভাষায় আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করাই প্রয়োজন হবে, কারণ চলতি ভাষাই বাঙলা ভাষার প্রধান রূপ।

আমাদের রচনা নিদর্শনেও আমরা এই পথই অবলম্বন করেছি।

বাক্যের রীতি

বিষয় ও উদ্দেশ্যানুরূপ ভাষার রূপ স্থির হলে প্রকাশের জন্য বাক্যরীতির কথা ওঠে। শিক্ষার্থীর পক্ষে বাক্য সম্পর্কে এ কয়টি কথা স্মরণীয় :

(১) বাক্য সরল ও জটিল দু' রকমেরই হয়। সরল বাক্য সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হলেও দীর্ঘ হতে পারে ; কিন্তু জটিল বাক্য সাধারণতঃ দীর্ঘই হয়, প্রায়ই ক্ষুদ্র হয় না। এ বিষয়ে প্রথম কথা—সাহিত্য সৃষ্টিতে, কিম্বা রচনার ভাব-প্রবাহ ও ভাষার ছন্দে সুসঙ্গতি রাখবার জন্য সব রকম বাক্যই প্রয়োজন হয়, সেই প্রবাহ ভঙ্গ হলে বা তার ছন্দপতন ঘটলে সব বাক্যই দূষণীয় হয়। (২)

শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রধান [illegible] প্রথম প্রয়োজন সরল ক্ষুদ্র বাক্য-গঠনে ক্ষমতা অর্জন। রচনার সরল [illegible] ক্যের সরলতা এক নয়। কিন্তু অনেক সময়েই সরল-বাক্য প্রধান. র [illegible] রলতা সৃষ্ট হয়। সরল বাক্য রচনার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীর বুঝা দরকার সরল দীর্ঘ বাক্য গঠনের, ও শেষে জটিল বাক্য গঠনের কৌশল। কারণ ছোট ছোট সরল বাক্যে ভাব প্রকাশের চেষ্টাই রচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সেই ছোট ছোট বাক্য একঘেয়ে হয়ে উঠতে চায়। এজন্য তাতে বৈচিত্র্য আনতে হয়—কখনো দীর্ঘ বাক্য এনে, কদাচিৎ জটিল বাক্য এনে। আসলে কিন্তু (৩) সরল হলেও নাতিদীর্ঘ. নাতিহ্রস্ব বাক্যই হওয়া উচিত রচনার প্রধান অবলম্বন; ছোট বড় বাক্য যোগ করে আনা প্রয়োজন হয় সেই সমছন্দ প্রবাহে তরঙ্গ-ভঙ্গ। একই ছাঁচে ঢালা বাক্যরীতি, ছোট হোক্, বড় হোক্, একঘেয়ে হয়ে উঠে। এজন্য বাক্যের বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে হয়—ছাঁচ ভেঙে, পদ বিপর্যয় ঘটিয়ে, বাক্যবিন্যাস পরিবর্তন করে,—কর্তা, ক্রিয়া প্রভৃতি উহ্য রেখে। বাক্য বারে বারে '-ইল', '-তেছে', '-ছিল', দিয়ে শেষ হলে মোটেই তা সুশ্রাব্য হয় না। বাঙলা মূল ক্রিয়াও অল্প কয়েকটি—করা, যাওয়া, হওয়া ইত্যাদি যথা, 'ভ্রমণ করে, সুস্থ হয়'। সমাপিকার এই দুর্বলতা বুঝে তা যথাসম্ভব মানিয়ে নিতে হয় অন্য কৌশলে, যেমন, ক্রিয়াপদ উহ্য রেখে,—'রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা।' ভাষা সরল, পরিচ্ছন্ন, সুমার্জিত। এরূপে সরল বাক্যের দ্বারাও প্রবাহ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এই প্রবাহের জন্য প্রয়োজন—এক-একটি অনুচ্ছেদে (paragraph) ভাব ও ভাষার এক-একটি অংশের সুস্থির বিস্তার ও সুসীম রূপ লাভ; এবং সকল অনুচ্ছেদ মিলিয়ে রচনার বিষয়টির সম্পূর্ণতা লাভ। এই সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন রচনার 'সূচনা' তারপর ভাবের 'বিকাশ' —এবং পরে 'উপসংহার'। সূচনা ও উপসংহারে অনেক সময়ে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায়, লেখার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করা হয়। সূচনায় একটি সজীব মনের আভাস, আর উপসংহারের সংহতিতে সম্পূর্ণ মনের আভাস পেলে পাঠক পরিতৃপ্ত হয়।

রচনার সার্থকতা

ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণতাতেই রচনার সৌন্দর্য আর তাতেই রচনার সার্থকতা। যে রচনার যে রসের সৃষ্টিই উদ্দেশ্য হোক্, সৌন্দর্যে তার সার্থকতা। তবে প্রাচীন পণ্ডিতদের আদর্শানুযায়ী রচনার কয়েকটা 'গুণ'ও নির্দেশ করা যেতে পারে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাম্য গুণ হল প্রসাদগুণ—'সরলতা ও স্পষ্টতার' ফলে তা জন্মে। বুদ্ধিগ্রাহ্য গদ্যে এইটিরই প্রয়োজন সর্বাধিক। ওজোগুণ উদ্দীপনা জোগায়, মাধুর্য গুণ চিত্তকে রসাভিষিক্ত করে,—সে সবে রচনায় শক্তি ও সরসতা জন্মে। স্থলবিশেষে অবশ্য সব 'গুণেরই' প্রয়োজন

আছে। তথাপি সাধারণ ভাবে বলতে গেলে [illegible] হবে—প্রসাদগুণেরই প্রথম প্রয়োজন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষ[illegible] দিয়ে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের বলতে চাই—কোন্‌টি ভাষার দোষ, কোন্‌টি ভাষার গুণ।

ভাষার দোষগুণ

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' (প্রচার ১২৯১, মাঘ) এদিকে ১২ দফা উপদেশ রেখে গিয়েছেন। আমাদের বিবেচনায় তা চিরস্মরণীয়। অবশ্য কয়েকটি উপদেশ নীতিমূলক; যেমন, "যশের জন্য লিখিবেন না," "টাকার জন্য লিখিবেন না," ইত্যাদি। কিন্তু কয়েকটি রচনা-বিদ্যা বিষয়ে—তা শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিশেষ প্রয়োজ্য। যেমন, ৭নং ধারার "বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। (৮) অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না।…অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।" রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্যময় অননুকরণীয় ভাষা বা প্রমথ চৌধুরীর সুচতুর বাগ-ভঙ্গী শিক্ষার্থীদের অনেক সময়ে প্রলুব্ধ করে—বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ স্মরণ করে সে প্রলোভন ত্যাগ করা প্রয়োজন। তারপর এই অমূল্য নির্দেশও (১০ নং) সকলের গ্রাহ্য: "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার ভাব পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝানো।"

অন্যান্য গুণ কেউ আয়ত্ত করতে পারেন, কেউ পারেন না; কিন্তু এই গুণটি লেখক মাত্রেরই থাকা প্রয়োজন—সরলতা ও স্পষ্টতা। চেষ্টা করলে রচনায় যা আয়ত্ত করা যায় তা হচ্ছে **সহজ শব্দের প্রয়োগ, সরল বাক্যরীতি, বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি,** এবং **ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতি।** এসবে মিলে ভাষাকে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল শ্রী দান করে; তাতে পাঠকের মন প্রসন্ন হয়, লেখার প্রসাদগুণ জন্মে, সৌন্দর্য সৃষ্ট হয়।

কয়েকটি 'সুলভ দোষের' সম্বন্ধেও আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। এগুলো বাঙালী চরিত্রে ও বাঙলা লেখায় প্রায়ই দেখা যায়। শিক্ষার্থীর তাই প্রথম থেকেই তা পরিহার করা প্রয়োজন। প্রথম দোষ, বাগ্‌-বাহুল্য, অকারণে কথা বাড়ানো একটা বিষম দোষ। দ্বিতীয় দোষ, আবেগ বাহুল্য, পাঠকের মনে আবেগ বা উদ্দীপনা সঞ্চারের লোভে প্রায়ই লেখক ভাষায় আবেগাতিশয্য প্রকাশ করেন। তৃতীয় দোষ, মাত্রাজ্ঞানহীনতা—অতিশয়োক্তি আমাদের এক মারাত্মক অভ্যাস। কিন্তু আধুনিক বুদ্ধিগ্রাহ্য গদ্য-রচনায় বর্ণনার যাথার্থ্য, বিশেষণের সার্থকতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

শেষ কথা: ফরাসী গদ্যকে অনেকে আদর্শ গদ্য বলেন। তার প্রধান গুণ কি? আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন—তা তিনটি। প্রথমতঃ স্বচ্ছতা, দ্বিতীয়তঃ স্বচ্ছতা, তৃতীয়তঃ স্বচ্ছতা। বাঙলা গদ্যের পক্ষেও এই কথা সত্য হোক্!

আমাদের বাড়ি

আমি গ্রামের ছেলে ; শহরে থাকিয়া পড়ি। কর্মোপলক্ষে আমার পিতা শহরে বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করেন। আমাদের ভাই-বোনদের লইয়া মাকেও এখানেই সংসার দেখিতে হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আমাদের তাই শহরেই কাটে। কিন্তু বাড়ি বলিতে আমরা শহরের এই ভাড়াটে বাড়িকে বুঝি না। মায়ের চক্ষে বাবার চক্ষে আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়িখানাই বাড়ি। আর শহরে প্রতিপালিত হইলেও আমরা জানি রেলে চড়িয়া, তারপর গোরুর গাড়ি বা সাইকেল রিক্সায় চাপিয়া, কাঁচা পথের উপর দিয়া, আম-জাম নানা গাছ ও ঝোপঝাড় পার হইয়া আমরা যে ছোট 'কোঠাবাড়ি'টিতে গিয়া পৌঁছাইব, তাহাই আমাদের বাড়ি—হলুদিয়ার 'মাণিক রায়ের বাড়ি'।

সূচনা

কোথায় হলুদিয়া, কে মাণিক রায়, বাড়ির কথা বলিতে তাহা আমাদের প্রথম মনেই পড়ে না। বাড়ি বলিতে বুঝি কাঁচা পথের সম্মুখে বাঁশের বেড়া দেওয়া একটি ছোট শাক-সবজি ফল-ফুলের বাগান—এখানে আমরা গাড়ি হইতে নামি। এই বেড়া আমাদের বাড়ির সম্মুখস্থ পথের দিকের সীমানা। সেখান হইতে নিকটেই ছোট একতলা একখানা কোঠাবাড়ি দেখা যায়। পথ হইতে এই ছোট খোলা বাগানটুকুর মধ্য দিয়া কুড়ি-পঁচিশ হাত গেলেই বাড়ির 'বাইরের ঘরের' বারান্দায় গিয়া উঠা যায়। অন্যেরা সেখান দিয়াই আমাদেরবাড়িতে আসেন। আমরা কিন্তু তাহার বাম পার্শ্বের একটি পায়ে চলার পথে অন্দরের দুয়ার দিয়া গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকি। সেই পথটাই বাড়ির লোকদের নিজস্ব পথ, বাহিরের বারান্দা আমাদের চোখেও বিশেষ পড়ে না। সেখানে ছুটির দিনে আমাদের খুড়া-জ্যেঠামহাশয়রা সকাল বেলা কাজকর্ম থাকিলে চৌকি টানিয়া লইয়া বিষয়-কর্মের কথা বলেন ; দেনা-পাওনার হিসাব দেখেন ; প্রতিবেশি পরিজনের সঙ্গে কাজকর্ম শেষ করেন। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তাঁহারা গ্রাম সম্পর্কীয় খুড়া-জেঠামহাশয়দের লইয়া পাশা খেলেন ; আর সন্ধ্যার পরে খানিকক্ষণ পর্যন্ত গল্প করেন। আমরা এই বারান্দার কাছেও যাই না—বাড়ি থাকিলেও দূরদূর দিয়া পলাইয়া যাই। কি জানি যদি ভটচার্জি জ্যেঠামহাশয় দেখিতে পান। তাহা হইলে তখনই তিনি ধরিয়া ফেলিবেন, আমাদের পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তার পরেই শুভঙ্করের কোনো ফাঁকি আওড়াইয়া বলিবেন—'বলো তো অর্থ কি ?'

অবস্থান

অথবা জিজ্ঞাসা করিবেন, বলো তো 'গম্' ধাতু '[illegible] [illegible]রিয়া কি শব্দ হইল ?' সেই উত্তরটা যে 'জগৎ' তাহা অবশ্য জান[illegible]াক [illegible]গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া 'গুরু' যে দীর্ঘ 'গ[illegible]' ধাতু+'ক' প্র[illegible]য়া হয় তাহা জানিব কিরূপে ? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের একটা বিভীষিকা। বাড়িতে আসিয়াও কি তাহার পরীক্ষা দিতে হইবে ?

আত্মীয় পরিজন

ছুটিতে সাধারণতঃ বাড়ি আসি। তাই বাড়ি বলিতে বেশি করিয়া মনে পড়ে আমাদের পুকুরটি, বাড়ির পশ্চাতে বাগানটা, গ্রামের শেষের ছোট নদীটা। আর তাহার অদূরের খেলার মাঠটা। অবশ্য আমাদের বাড়ির নিজের ঘর-দুয়ারের কথাও মনে পড়ে,—কিন্তু ঘর-দুয়ার তো রাত্রির আশ্রয়। আমরা শুই আমাদের বড় ঘরে। এ পাশের আরও ছোট দুই তিন খানি কুঠুরি—আমার কাকার ও কাকীমার ঘর। তাঁহারাও কাজকর্মে প্রায়ই বিদেশে থাকেন। পূজার সময়ে সকলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন। মেজ জ্যেঠামহাশয় বাড়ি থাকেন—তিনি আমার পিতার জ্যেঠতুত ভাই। দক্ষিণ দিকের হাতায় তিনি 'নূতন বাড়ি' তুলিয়াছেন। কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—বাড়িতেই তিনি বাকী জীবন কাটাইতে চান। গ্রামের স্কুলে, পঞ্চায়েতে, দশ-জনের নানা পরামর্শের কাজে তিনিই এখন গ্রামে একজন অগ্রগণ্য ভদ্রলোক। আমার পিতাও তাঁহাকে অগ্রজ বলিয়া মান্য করেন। এক হিসাবে আমাদের বাড়িরও তিনিই কর্তা—আমাদের বারান্দায় তিনিই হুঁকা লইযা আসর জমাইয়া বসেন। আমরা বাড়ি গেলে তাঁহার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। কোনো দিন পুকুরে ছিপ ফেলিয়া আমাদের সঙ্গে লইয়া বসেন। কোন্ মাছের খোঁট কিরূপ তাহা বুঝাইয়া দিবেন। আবার কোনো দিন আমাদের লইয়া সন্ধ্যার পরে গল্প জুড়িয়া দেন—তাহার ছেলেবেলার গল্প। আমাদের বাড়ি তখন কিরূপ ছিল, এই 'কোঠাবাড়ি' তখন 'দাদু' সবে নূতন নির্মাণ করিয়াছেন ইত্যাদি। তাঁহার কথায় কৌতূহল বাড়িতে থাকে—তারও আগে এই বাড়ি দেখিতে কেমন ছিল ? তারও আগে কেমন ছিল ? কেন এই বাড়ির নাম 'মানিক রায়ের বাড়ি' ? কে ছিলেন 'মানিক রায়' ? জ্যেঠামহাশয়ই জানান আমাদের পূর্বপুরুষ—গ্রামে নাকি তাঁহার অনেক প্রতিপত্তি ছিল। ধনসম্পত্তিও প্রচুর ছিল। সে সব আমাদের জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা এখন আমাদের প্রতিবেশী, আমরা পিসে-জ্যেঠা বলি, সেই সম্পর্কে তাঁহাদের কাহারও কাহারও বাপ-পিতামহ ভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। এখানেই তাঁহাদেরও বাড়ি। আমরা বাড়িতে গেলে এই সব প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাই, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলি, বেড়াই, দৌড়ঝাঁপ করি। কিন্তু শুনিয়াছি কাহারও কাহারও সঙ্গে পূর্বে আমাদের

পারিবারিক মনোমা... ছিল না। এখন অবশ্য অনেকেই জীবিকার দায়ে বিদেশে কাটায় ... ব কথা কাহারও মনে করিবার সময় হয় না। 'মানিক রায়ের বাড়ি' ... দের ও আমাদের সকলেরই বাড়ি।

জ্যেঠামশায় বাড়িতে থাকেন। কিন্তু আমাদের বাড়িতে পূর্বাপর যিনি বাড়ি আগলাইয়া আছেন, তিনি আমার বড় পিসীমা আর আমাদের পিতামহ। বাড়ির মধ্যেকার বড় কোঠায় 'দাদু' থাকেন; বড় পুরানো খাটে তাঁহার শয্যা। এখন তিনি পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। দেহেও শক্তি কমিয়াছে। তাঁহার খাটের পার্শে অন্যদিকে পিসীমার তক্তপোশ: ঘরের এদিকে সেদিকে সংসারের ছোট বড় নানা জিনিস। একটা ছোট লোহার সিন্দুক—তাহাতে নানা পুরানো দিনের টাকা ও দু' একখানা মোহরও আছে—সেই 'মানিক রায়ের' আমলের জিনিস। বড় কাঠের সিন্দুকে আছে 'দাদু'র সে কালের শাল-দোশালা, ঠাকুরমার তসরের শাড়ি—ঐরূপ একখানি শাড়ি পরিয়াই পিসীমা এখনো পূজায় বসেন। পিসীমা বালবিধবা, পিতৃগৃহেই তিনি চিরজীবন সকলের ভার লইয়া সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। আমার কাছে বাড়ি বলিতে এই 'দাদু' আর তাঁহার 'মহাভারত', এবং আরও বেশি এই পিসীমা ও তাহার হাঁড়িকুড়ি, আমসত্ত্ব, নারিকেলের নাড়ু,—আর অবশ্য গ্রীষ্মের অবকাশ হইলে—আম কাঁঠাল, সত্য নারায়ণের শিরনি।

অবশ্য আমাদের বাড়িতে এদিক-সেদিকে ছোট ছোট চালা-ঘর, আরও আছে—ঢেঁকিঘর, জ্বালানী 'কাঠের' ছাউনি, টালির চালার আমিষ-নিরামিষ রান্নাঘর। এসব জানা কথা হইলেও কম আশ্চর্য কথা নয়। নিরামিষ ঘরে পিসীমার রান্না না খাইলে কী তাহার মর্ম বুঝিবে! কিন্তু বাড়ি বলিতে আরও যাহা না ভাবিয়া পারি না তাহা আমাদের সেই বাড়ির পিছনকার বাগান—বিশেষ করিয়া তাহার কালোজামের ও পেয়ারার গাছ দুইটি। আমাকে বাড়িতে খোঁজ করিতে হইলে হয় খোঁজ করিতে হইবে ঐ দুইটি গাছের কাছাকাছি, না হইলে পুকুরের জলে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পুকুরে সাঁতার না কাটিলে যেন মনে হয় বাড়িই আসি নাই।

[মন্তব্য: বাড়ি বলতেই কি মনে হয়? পৈতৃক ভদ্রাসন—যেখানে পিতা পিতামহের আমল থেকে বাস করছি। শতকরা মাত্র দু' একজনের পক্ষে তা শহরেও হতে পারে। অধিকাংশের পক্ষেই তা গ্রামে হবার সম্ভাবনা। ইচ্ছা করেই এমন লোকের কথাই দেওয়া হল—যাদের বাস শহরে, কিন্তু যাদের নিবাস গ্রামে, এবং সেই কথাটি দিয়েই রচনা আরম্ভ করা হল। তারপর বাড়ি বলতে কি কি ভাবনা মনে এল?—'বাড়ি' কোথায়? কোন্ গ্রামে, কোন্ পাড়ায়? তার স্থানীয় পরিবেশ ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, ঘর-দুয়ার, জায়গা-জমি প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অবস্থান, ইত্যাদি। কিন্তু বাড়ি কি শুধু তা'ই? না যাদের নিয়ে বাড়ি, অর্থাৎ পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীও? এসব বাড়ির আসল প্রাণ। বিষয়টির মানবীয় উপাদান যা তাও অসাধারণ। এই হল তা হলে এ রচনার মূল সংকেত—(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ

(২) মানবীয় সম্পদ। ইচ্ছা করলে এই দুই প্রসঙ্গকে অ[illegible]লা যায়—যদি সময় থাকে, যদি লেখা দীর্ঘ করতে হয়। যেমন, বাজার, বাড়ির [illegible]কাক [illegible]রদিককার বাগান, তার সমুখের ছোট ক্ষেতের শাকসবজি ফল-ফুলের বর্ণনা, [illegible]ান, পুকুরের কথা। কিম্বা অন্দরের অভ্যন্তরের কথা—যত ইচ্ছা তা বাড়িয়ে বল[illegible] দরিদ্র পরিবারেও কত বলবার কথা থাকে—একবার 'পথের পাঁচালির' অপুর বাড়ির কথা ভাবো। তা ছাড়া, ধানী জমি, ধানের মরাই, গোলাবাড়ি, গোয়ালের গোরু, শিক্ষিত পরিবারের ভদ্রাসনের কত কিছু বাড়িতে থাকে। ধনী পরিবারের বাড়ি হলে তো 'বাবুর বাড়ি' 'কাছারি', 'বৈঠকখানা', 'মেয়েদের মহল', 'দাসীদের মহল' কত কিছু বর্ণনা করতে পারা যায়। একবার 'বিষবৃক্ষ' থেকে তা ধারণা করতে পার। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' ও 'ছেলেবেলা'য় কলকাতার অভিজাত-গৃহের আর এক বর্ণনা পাবে। তুমি হলে তো তোমার বর্ণনার জিনিস আর একদিকে অফুরন্ত। মা, ঠাকু'মা, জ্যেঠাইমা, দিদিমা প্রভৃতির নিত্যকর্ম ঠাকুর সেবা, অতিথি সেবা, গৃহস্থালীর কাজের কত খবর লিখবে? একেবারে হাল-আমলের শহুরে পরিবারের মেয়ে হলেও কি এসব তোমার চারিদিকে নেই?

যাই হও, প্রথম ও প্রধান কথা (১) যেরূপ বাড়ির সঙ্গে তোমার নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় সেরূপ একটি বাড়ির কথাই একবার প্রথম ভাববে, এবং ভাবলে দেখবে তার ঘর-দুয়ারের কথাও বলে শেষ করা যায় না। তুমি শহুরে মেয়ে বা ছেলে? তোমাদের সেই চিলে-কোঠাটার কথা বলেছ? সন্ধ্যার সময়ে যা দিয়ে উঠতে উঠতে তোমার গা ছম ছম করে? তুমি গাঁয়ের ছেলে? বাগানের সেই ঝাঁপানো আমগাছগুলির কথা মনে আছে?—যেখানে দুপুরে দাঁড়িয়ে ওদিকের ভিটেতে ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে তুমি আপনাকে হারিয়ে ফেল? কিন্তু এ সব তো বলে সহজে বোঝানো যায় না। সাহস হলে, সময় পেলে বলো তা। এত অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও মানবীয় বিষয়কে তা হলে (২) কোন্ দৃষ্টিপথ থেকে বর্ণনা করবে? তা বুঝে, (৩) তোমার ভাবসমূহ নির্বাচন করো। রচনায় একটি দৃষ্টিপথ থেকেই বাড়ির কথাটা বলা হয়েছে। মাঝে মাঝে অল্পদিনের দেখা সেই বহু পুরুষের বাড়িটার মানুষ ও দৃশ্যাবলীর জন্য যে মমতা কিশোর মনে জাগে, সেই মমতার দৃষ্টিতেই সমগ্র প্রবন্ধটি উত্থাপিত ও বিস্তৃত করা হল। এজন্যই (৪) ভাষা যথাসম্ভব সরল করে চলতি ভাষার কাছাকাছি আনা হয়েছে—যাতে মমতার সুরটি সহজ সরল কথায় বেজে ওঠে। এবার তুমি নিজে লেখো তোমার বাড়ির কথা।]

আমাদের স্কুল ॥

সেই দিনটির কথা [illegible] পড়ে যেইদিন আমাদের এই স্কুলটিতে আমি ভরতি হইতে আসি—প্রায় দশ বৎসর পূর্বেকার কথা। দশ বৎসরে এই স্কুলটির শিক্ষায় আমি কী হইয়া উঠিয়াছি, আর কি হইতে পারি নাই, আজ তাহার পরীক্ষা। দশ বৎসরের মধ্য দিয়া হয়ত অন্যায় ভাবেই আমার অমনোযোগিতা ও আমার জ্ঞানের ত্রুটির জন্য পরীক্ষক দায়ী করিবেন আমার এই স্কুলকে। কিন্তু আমি তো জানি, আমারই দোষে আমি আমার স্কুলের কত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আজ আরও দুঃখ ও লজ্জা বোধ করিতেছি। তাই গত দশ বৎসরের মধ্য দিয়া এই স্কুলটি আমার মনে কী স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারিলেও যেন আজ কতকটা স্বস্তি লাভ করিব।

সূচনা

প্রথম দিনে কিন্তু স্কুল বলিতে সর্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া বুঝিয়াছিলাম—স্কুলবাড়িটিকে। সেই বাড়ির এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। দশ বৎসরে সবগুলি ঘরের ভিৎ পাকা হইয়াছে; প্রাচীরগুলি মেরামৎ হইয়াছে; টিনের চালার পরিবর্তে লাল টালির ছাদ উঠিয়াছে। আর প্রধান শিক্ষকের আপিস, তাঁহার ঘর, শিক্ষকমহাশয়দের বিশ্রাম গৃহ, আমাদের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার,—এইগুলির জন্যও আধুনিক ধরনের সুন্দর পাকাবাড়ি নির্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞান পঠনের জন্য বীক্ষণাগার বা ল্যাবরেটারি ও চিত্রশালা বা মিউজিয়মের দুইটি কোঠা ইহার দুইদিকে শীঘ্রই যোগ হইবে।

পরিবেশ পরিচয়

চারিদিকের মাঠটি সমতল করিয়া এখন যে ফুটবল খেলার মাঠটি তৈয়ারি হইয়াছে তাহা দেখিয়া শহরের স্কুলের ছাত্ররাও আমাদের হিংসা না করিয়া পারে না। আমাদের গ্রামের নদীর পার পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে আমাদের খেলার মাঠ। তাহার প্রান্ত ঘেঁসিয়া ঝাউগাছের মধ্য দিয়া ছোট লাল রাস্তাটি আসিয়াছে স্কুলবাড়ি পর্যন্ত। আবার, অন্য দিকে রেল লাইনের দিক হইতে গ্রামে প্রবেশের পথে প্রথমেই সম্মুখে পড়িবে এই পলাশবাড়ি হাইস্কুল। ষ্টেশন হইতেও যাত্রীরা তাহার মাঠ বাড়িঘর দেখিতে পায়। ইহাই গ্রামের পুরোহিত ও পুরোরক্ষী, পল্লীপ্রকৃতির সস্নেহ আশীর্বাদ। আমাদের স্কুলের সকলের নিকটে এই পরিচয় প্রত্যক্ষ। কয়টি শহরের কয়টি অট্টালিকা-গর্বিত স্কুল এমন গর্ব করিতে পারে।

স্কুলবাড়ি, খেলার মাঠ এইসবের অপেক্ষাও কিন্তু আজ বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে আমাদের শিক্ষক মহাশয়দের কথা, বিশেষতঃ হেডমাষ্টার মহাশয়ের কথা। আর পলাশবাড়ি স্কুল বলিতেই লোকে জানে তাহার হেডমাষ্টার

অসিত রায়কে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তি[illegible] গ্রামের লোককে উৎসাহিত করিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হন [illegible] কটে উচ্চ ইংরেজী স্কুল ছিল না,—মদনদীঘির [illegible] আমাদের দিক হইতে যাতায়াত দুঃসাধ্য। কিন্তু আমাদের এই দিককার গ্রামে জমিদার ও বিত্তবান লোকও কম; কয়েকঘর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, ও বেশ কিছু কৃষক, আর পল্লীশিল্পীদের লইয়া গ্রাম। তথাপি স্কুলের জমি জোগাড় হইল; যেমন করিয়া হউক ঘর-দুয়ারও উঠিল; প্রায় শতখানেক ছাত্র লইয়া স্কুলও আরম্ভ হইল। কিন্তু হইলে কি হইবে, স্কুলের আসবাব-পত্র প্রায় নাই। সরকারী পর্যবেক্ষকরা সাহায্যদানে বিমুখ। শিক্ষক মহাশয়রা পুরা মাহিনা ও ঠিক সময়ে মাহিনা কেহই পান না। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে প্রকৃত ছাত্রসংখ্যা কমিয়া পঞ্চাশের কাছে গেল। শিক্ষকেরা আজ আসেন তো কাল পালান। দুই-দুইজন হেড্‌মাষ্টার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী গিয়া আর ফিরিয়া আসিলেন না। নিরুপায় হইয়া গ্রামের সকলে স্কুলের ভার দিলেন তখন অসিত রায়ের উপর—তিনি তখন শহরের কলেজে নূতন অধ্যাপক। সেই দিন হইতে তিনি হেডমাষ্টার হইয়া স্কুলটি বাঁচাইবার কাজে লাগিলেন। অন্যদিকে তাঁহার তাকাইবার মত সময় রহিল না। তখন ইংরেজ আমল। পুলিশের মতে অসিত রায় রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোক; —না হইলে কলেজে কাজ ছাড়িয়া স্কুলের কাজে আসিলেন কেন? সরকার তাই কিছুই সাহায্য দিতে চাহিলেন না। দীর্ঘ পনের বৎসর প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয় শেষ পর্যন্ত স্কুলটিকে দাঁড় করাইলেন। ছাত্র তখন দুইশত হইয়াছে; শিক্ষকেরা অশেষ যত্নে পড়াশুনা করান; পরীক্ষায় ফল ভালো হইতেছে; খেলাধুলায়, গ্রামের উন্নয়নের নানা কাজে ছাত্রদের মধ্যেও শিক্ষকেরা একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। স্কুল তখন জাগিয়া উঠিতেছে—এই সময়েই আমি এই স্কুলে ভর্তি হই।

পূর্ব কথা

এই ক্রমোন্নয়নের মুখে আমরা শিক্ষক-ছাত্ররা এই স্কুলে পড়াশুনায়, খেলাধুলায়, গ্রামগঠনে, কখনো জেলার কোনো সেবাকর্মে, কখনো আমাদের অঞ্চলে মহামারীর প্রতিষেধক কর্মে একযোগে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি। পুরাতন শিক্ষকেরা দুই একজন আজ আর নাই। নূতন শিক্ষকেরাও কিন্তু এইখানে আসিয়া নূতন উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যে শিক্ষকতায় সমান কৃতী তাহা বলিব না। কিন্তু সকলেই ছাত্রদের আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী, যে ছাত্রের যখন যে সাহায্য প্রয়োজন তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে করিয়া থাকেন। ছাত্র-শিক্ষকে মিলিয়া যেন একটি বৃহৎ পরিবার। শিক্ষকদের অনেকেরই বাড়ি, স্কুলের নিকটে। তাঁহাদের কাছে আমরা বাড়ির ছেলের মতো। পূজায় পার্বণে সময়ে অসময়ে আমাদের

ছাত্র-শিক্ষক পরিবার

নাড়ু, সন্দেশ, বাতাসা, [illegible] হউক না দিলে আমরাও ছাড়ি না, 'কাকী-মা'রাও আমাদের ছাড়েন [illegible]

ইহা ছাড়া, নানা সাংস্কৃতি[illegible]তিযোগিতায়ও আমাদের শিক্ষক মহাশয়রা উৎসাহ দেন। দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার শুধু নয়, সরস্বতী পূজায় ও রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক হইতে আজ আমরা ছোট নাট্যাভিনয় পর্যন্ত করিব। চারিদিকের গ্রামের লোকেও সেই আশাতে অপেক্ষা করে—স্কুলে অভিনয় হইবে! আমাদের স্কুলই আজ এই অঞ্চলের জীবন-কেন্দ্র। আর এইজন্য সত্যই যদি কেহ গৌরব করিতে পারেন, তবে গৌরবের অধিকারী আমাদের পলাশবাড়ি স্কুলের হেডমাস্টার অসিত রায় ও তাঁহার সহকর্মী শিক্ষকরা। তাঁহাদের সকলেরই কথা আজ মনে পড়ে। কিন্তু বিশেষ করিয়া মনে পড়ে সংস্কৃতের পণ্ডিত মহাশয়ের স্নেহ, আর গণিত ও মিকানিকস্-এর শিক্ষক মহাশয়ের বিদ্যাদানের আগ্রহ। ভবিষ্যতে যদি আমি ইঞ্জিনীয়ার হইতে পারি তবে তাঁহার গুণে; আর ভবিষ্যতে যদি আমি ধন-সম্পত্তি অপেক্ষা দেশকে বেশি ভালবাসি তবে তাহা আমাদের হেডমাস্টার মহাশয়ের শিক্ষায়।

সমাজের জীবন কেন্দ্র

এই স্কুলের কথা বলিতে বলিতে আজ তাই আমাদের ছাত্রদের কথাও মনে পড়ে। অনেকে আমার পূর্বে পাস করিয়া জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। সংসার পরিবার সকলই তাহাদের আছে; স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতাও সকলেই কামনা করেন। কিন্তু এই পলাশবাড়ি স্কুলের ছাত্ররা সকলেই জানে দেশ-গঠন তাহাদের জীবনের একটি প্রধান দায়িত্ব। কেহ কেহ তাহার প্রমাণ দিতেছেন। হেডমাস্টার মহাশয়ের মুখে তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম দেশের নেতাদের অপেক্ষা কম শুনিতে পাই না। তিনি বলেন, ইহারাই দেশের মেরুদণ্ড। আজ মনে করিতেছি, আমরাও কি কেহ কেহ জীবনে এমন যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিব, যাহাতে আমাদের কথাও হেডমাস্টার মহাশয় সগর্বে বলিতে পারিবেন?

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা

পলাশবাড়ির স্কুলের এই ঐতিহ্যই তাহার প্রধান গৌরব। না হইলে আমাদের স্কুলের এখনো নানা বিষয়ে অভাব—বিজ্ঞানের বিভাগ খুলিয়া কৃষি ও কারুবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য হেডমাস্টার মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—শিক্ষা অধিকর্তার নিকট হাত পাতিতেছেন, গ্রামের লোকদেরও নানা ভাবে কর্মতৎপর করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আমাদের দরিদ্র গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের স্কুল এই সুযোগ লাভ করিবে কি না কে জানে? আমাদের এখনও কত অভাব! জিম্‌নেসিয়াম কোথায়? ল্যাবরেটরি কোথায়? ভালো লাইব্রেরি কোথায়? রিডিংরুমে কয়জন বসিতে পারে? এমনি কত সমালোচনা শুনিতে হয়।

ঐতিহ্য

আমরাও জানি আমাদের স্কুলের উপকরণ-বাহুল্য নাই। কিন্তু "উপকরণ" দিয়াই কি স্কুল? না, 'স্কুল ছাত্র ও শিক্ষক লইয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়া, বিদ্যাদানে ও সমাজের মঙ্গল-সাধনের ব্রতে'—টিপাযে চাদর গায়ে পণ্ডিত' মহাশয়ের এই কথা আমাদের স্মরণ পথে জাগরূক থাকিবে।

আমার হয়ত স্কুলের শিক্ষার কাল শেষ হইল। কিন্তু যেখানেই যাই, যাহাই করি, আমি তো আজীবন বলিব আমার স্কুল 'পলাশবাড়ি হাই স্কুল'। আর সেই সঙ্গে মনে পড়িবে, এই স্কুলের ঐতিহ্য, এই আনন্দের দিনগুলি।

উপসংহার

[মন্তব্য : একটি গ্রামের স্কুলের কথাই বলা হল। শহরের স্কুল হলে কিন্তু এর অনেক কথা তার সম্পর্কে প্রয়োজ্য হবে না। মেয়ে-স্কুল হলেও না। হয়ত আজ আমাদের শহরের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার সুযোগ সুপরিসর নয়, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও এত ঘনিষ্ঠ নয়। আবার, কিছু কিছু এমন স্কুলও আছে যার বাড়িঘর উন্নত, উপকরণও প্রচুর; ছাত্ররাও অধিকাংশই সম্পন্ন পরিবারের সন্তান; পড়াশুনার সকল সুযোগই তাহাদের সহজলভ্য। মেয়ে-স্কুল, মিশনারী স্কুল প্রভৃতি আবার অন্যরূপ। আসল কথা, প্রত্যেকেই তাঁর নিজ স্কুলের নিজ অভিজ্ঞতার কথাই লিখবে। সেই ভাবনার প্রধান সংকেত দাঁড়াবে এইরূপ: স্কুলের বাড়িঘরের বর্ণনা, উপকরণের কথা, শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের কথা, ছাত্র বা ছাত্রীদের কথা (ছাত্র-ছাত্রীদের কথা এ রচনায় বেশি বিস্তৃত করা হয় নি), স্কুলে শিক্ষার অবস্থা ও সম্ভাবনা; —অবশ্য 'সূচনা' ও 'উপসংহার'ও থাকবে। নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্কুলও দেখা যায়—স্কুলে ছাত্রদের অমনোযোগ, শিক্ষকদের দুর্দশা ও ঔদাসীন্য—এসবও তো আজ একেবারে মিথ্যা নয়। তা হলে সম্পূর্ণ অন্য ভাবেই রচনা তৈরী করতে হবে। কিন্তু সাধারণ একটি স্কুলের কথা এই ভঙ্গীতে লেখাই স্বাভাবিক—কারণ, ছাত্রমাত্রই তার স্কুলের গৌরব করে, শিক্ষকদেরও শ্রদ্ধা করে।

এখন তোমার নিজের স্কুলের কথা তুমি লেখো।]

॥ আমাদের গ্রাম ॥

রেলেও আসিতে পারেন, তবে বাসে আসিলে আরও সুবিধা—একেবারে আমাদের গ্রামের পার্শ্বে আসিয়া নামিবেন। তেমাথায় যে কোন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া দিবে, "কাঁকনতলা? এই তো! মাঠ ছাড়িয়ে গেলেই গ্রামে পড়বেন।" তারপর হয়ত আবিদের সাইকেল রিক্শ থাকিলে তাহাকে ডাকিবে। না হয়, আমাদেরই গ্রামের সোনাই মণ্ডলকে কাঠ-গুদাম হইতে ধরিয়া আনিবে, "যাতো, বাবুকে তোদের কাঁকনতলার মজুমদার বাবুদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়।" আপনার হাত হইতে স্যুটকেশ বা ব্যাগ লইয়া সোনাই আপনাকে ঠিক একেবারে বাড়ির কর্তাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু পথে, "বাবুর নাম কি, নিবাস কোথায়, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" এমন কি, "বাবু কি করেন?"—এসব সোনাই জানিয়া লইতে চাহিবে না, মনে করিবেন না। অবশ্য আপনাকেও শুনিতে হইবে সোনাই কে, কি করে। আপনিও জানিতে পারিবেন, সেই কলার চাষের জমিটা মথুর সরকারের কাছে হাতছাড়া হইয়া না গেলে সোনাই এখন মজুর খাটিতে আসিত না,—সে বেণী মণ্ডলের ছেলে সোনাই মণ্ডল।

অবস্থিতি

কিন্তু আমাদের গ্রামে আপনি কেন আসিবেন? কি দেখিবেন? কি আছে এই গ্রামে? সত্যই তাহা বলা কঠিন। বাঙালা দেশের দশটা গ্রামের মতোই এই কাঁকনতলা গ্রাম,—বড়ও নয়, ছোটও নয়,—মাঝারি। এইরূপ গ্রামে যাহা থাকিবার এখানেও তাহা আছে—ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল, মশা-মাছি, সাপ-ব্যাঙ, সবই আছে; আর আছে ছত্রিশ জাত না হোক নানা জাত লইয়া গ্রাম্য জীবন। ব্রাহ্মণ কায়স্থরা গ্রামের প্রধান হইলেও সংখ্যায় অল্প। তাহা ছাড়া আছে—কামার, কুমার, তিলী প্রভৃতি নবশাক, সচ্চাষী ও চাষী কৈবর্ত কয়েক ঘর; কয়েক ঘর মুসলমান চাষী ও মিস্ত্রি,—ইহারাই গ্রামের মানুষ। ভদ্রলোকেরা সুযোগ পাইলেই শহরে যায়, কিন্তু চাষীরা যাইবে কোথায়? গ্রামে প্রধান বলিতে আমি বুঝি ইহারাই। প্রাধান্য তবু ভদ্রলোকদেরই। তাই একটা ছোট স্কুল আছে, গোটা দুয়েক পাঠশালা আছে; আর তাই ঝগড়া আছে, বিবাদ আছে। এইরূপ আরও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও আছে—যেমন আছে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর যখন 'পঞ্চায়েৎ' আছে, 'ভোট' আছে তখন 'পলিটিক্সও' আছে। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও বলিব—কাঁকনতলায় সত্যই কী আছে জানি না,—এমন কিছু একটা আছে, যাহার জন্য বলিব 'আপনি আসুন'; বলিব 'এমন গ্রাম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

প্রাচীন কীর্তি কিছু আছে কি? শুনুন তবে। পশ্চিমের ছোট নদীটি মজিয়া হাজিয়া শেষ হইয়া গেলেও এখনো আমরা জানি উহা পুরাতন 'সরস্বতীর খাত'। এই সরস্বতীই আসল সরস্বতী, ত্রিবেণীতে গিয়া যাহা যমুনায় মিলিয়াছিল। 'কোথায় সেই ত্রিবেণী,—কোথায় বা এই কাঁকনতলা'—এই কথা কেহ বলিলে আমরা মানিব না। একদিন এই খাতেই স্রোত বহিত, নৌকা চলাচল করিত, বাণিজ্য বাহিত হইত; আর গঙ্গার ধারায় গিয়া আপনাকে সঁপিয়া দিত আমাদের গ্রামের প্রাণের ধারা। তখন রেল লাইনও ছিল না, মোটরের নামও কেহ জানিত না। মানুষ এ গ্রামে আসিত নৌকাতেই

পরিবেশ

এই 'সরস্বতী' দিয়া। বাণিজ্য আসিয়াছে, ব্যবসায়ী আসিয়াছে, পাইক আসিয়াছে, রাজকর্মচারী আসিয়াছে, বর আসিয়াছে, বধূ আসিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপই হইয়াছে। শুধু কি তাহাই? এই পথে আমরা জানি—উজানীর চাঁদ বেণের পুত্রবধূ বেহুলা ভেলা ভাসাইয়া আসিয়াছিল। সেই গাঙুরের স্রোতের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া আছে এই মরা সরস্বতীর লুপ্ত ধারা। এইখান দিয়া, আমরা বেশ জানি, ধনপতি সিংহল যাত্রা করিয়াছিল, আর তাহারই অনুসন্ধানে শ্রীমন্তও গিয়াছিল এই পথে। না, আমাদের 'সরস্বতী'র কথা দেশের মানচিত্রে নাই, কিন্তু আমাদের মনের মানচিত্রে আছে। এখন অবশ্য এই মরা নদীর বুকের জমিতে চাষ হয়, আশ্চর্য রকমের রবি ফসল ফলে। বর্ষায় স্রোত না আসুক, চারিদিকের গ্রামের জল আসিয়া জমে, ধীরে ধীরে নামিতে থাকে উত্তরের দিকে, বেলে-মদনতলার খালের পথে। গ্রামের বাহিরে দূরে এক পার্শ্বে বোম্বাইয়ের এক খোজা ব্যবসায়ী ইটের জন্য জমিটা ইজারা লইয়াছে, ইটখোলায় তাহার ভাটি। নারিকেল পাতার ছাউনির তলায় হিন্দুস্থানী মেয়ে পুরুষ রাত্রি কাটায়, দিনে রৌদ্রে পোড়ে, মাটি বহে, ইসমাইল সাহেবের মজুরি তাহাদের জীবিকা। গ্রামে থাকিয়াও তাহারা কিন্তু গ্রামের কেহ নয়।

গ্রামের দিকে বড় মাঠটায় এখনো খানিকটা আগাছা—উহার খানিকটা কাটিয়া আমরা প্রস্তুত করিয়াছি খেলার মাঠ। কারণ, কাছেই গ্রামের স্কুলটি রহিয়াছে, ছেলেরা খেলে। স্কুলে ছাত্র দেড় শতের মত। খাতায় পত্রে তারা দেড় শত হইবে, তবে যথারীতি স্কুলে আসে হয়ত শতখানেক ছাত্র। চাষীদের

শিক্ষার অবস্থা

কয়েকটি ছেলে ক্লাসে নাম রাখে—'বাবুরা বলিতেছেন, নাম রাখা দরকার, বেতন লাগিবে না'। তাহাদের নিজেদেরও কাহারও কাহারও আকাঙ্ক্ষা—ছেলে স্কুলে পড়ে, লেখাপড়া শিখে, পরীক্ষায় পাস করিয়া শহরে একটা ভাল চাকরি পায়। তাহা হইলেই ভালো খাইয়া, ভালো পরিয়া দশজনের একজন হইতে পারিবে, এই পৃথিবীতে 'ভদ্দর লোকের' মত সম্মানে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

দুই বৎসর পার হইতে না হইতেই তাহারা বুঝিতে পারে—ইহা স্বপ্ন, অলীক স্বপ্ন, অসম্ভব স্বপ্ন। চাষীর [illegible] অত বই, অত কাগজ পত্র কিনিবে কিরূপে? স্কুলে গেলে তাহার জামাকাপড়ও তো কিছু চাই। আর দিনের পর দিন অত স্কুলে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? গৃহস্থের গোরুটা পর্যন্ত চরাইবার সময় হইবে না। অথচ লেখাপড়া যাহাই শিখুক স্কুলের ছায়া একবার মাড়াইলে সেই ছেলে আর চাষের কাজে হাত লাগাইতেও চাহে না, কেমন লজ্জা বোধ করে। তারপর চাষের খন্দ যখন আসে তখন যদি চাষীর ছেলে স্কুলে বসিয়া বসিয়া কেতাব মুখস্থ করে তাহা হইলে সারা বৎসর গোষ্ঠীশুদ্ধ তাহারা খাইবে কি? চাষের সুবিধা বুঝিয়া স্কুলের ছুটির ব্যবস্থা করিবার কথা আমরা একবার ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সরকারী পর্যবেক্ষক তাহা অনুমোদন করিলেন না, গ্রামের ভদ্রলোকদেরও তাহা মনঃপূত হইল না।

দরিদ্র মধ্যবিত্তদের ছেলে ও মেয়েরাই এই স্কুলে পড়ে। পদস্থ মধ্যবিত্তদের আর্থিক সঙ্গতি আছে। তাহারা জানে, শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথমাবধি ছেলেদের শিক্ষাদান না করিলে ছেলেরা 'চৌকোস' হইবে না, তাহা হইলে ভাল স্কুলে ছেলেদের ভরতি করাও অসম্ভব হইবে। তবু এই দরিদ্র মধ্যবিত্তদের শতখানেক ছেলেমেয়ে লইয়া স্কুলটি আজ পনের বৎসর চলিতেছে, মন্দ গতিতে। হেডমাস্টার মহাশয় গ্রামের মানুষ, চাটুজ্জে বাড়ির মেজকর্তা।

নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল

তিনি আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট বটে, কিন্তু বিচক্ষণ। অন্য শিক্ষকরাও নিকটবর্তী গ্রামের। ছেলেদের তাঁহারা পড়াইতে চান, কাজে ফাঁকি দিতেও চান না। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পান না। তাঁহারা দেখেন মধ্যবিত্ত ভালো ছেলেরা একটু ভালো হইয়া উঠিতে না উঠিতেই শহরের স্কুলে চলিয়া যায়। গরীবের ভালো ছেলেরা অভাব ও অপুষ্টির পীড়নে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। চাষীর ঘরের ভালো ছেলে একটু পড়িতে না পড়িতেই স্কুল ছাড়িয়া দেয়—"যা হয়েছে তাই তার যথেষ্ট। এই এ, বি, সি, ডি শিখে এরা না পারে হালের বলদ চালাতে, না জানে চাষের কথা।" আমাদের স্কুল গ্রামের কৃষক-জীবনের সঙ্গে এক হইতে পারে নাই। এক-একবার গ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদের উৎসাহ হয়—না, স্কুলটার উন্নতি করিতে হইবে। কিছুদিন নানা তোড়জোড় চলে। তারপর আবার যে-কে সেই। তথাপি স্কুলটায় কিছু ছেলে পড়ে, কিছু মেয়ে পড়ে; তাহারা বড় হয়, পাস করে। কেমন একটা অন্ধ মমতায় জড়াইয়া স্কুলটাকে মাস্টার মহাশয়েরাও আঁকড়াইয়া থাকেন। একটি ভালো ছেলে পাইলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। একটি ভালো মেয়ে পাইলে তাহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করেন। আর গ্রামের দশজনের কাছে একটু সম্মান পাইলে, প্রশংসার কথা শুনিলে, গর্বে আনন্দে সৌভাগ্যে

অতিভূত হন—কষ্ট করিয়াই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে হয়, ইহার বেশী আর কী তাঁহারা পাইবেন?

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঠশালার অবস্থাটাও অনেকটা এইরূপ। তবে সেখানে নিয়মনীতি আরও ঢিলেঢালা। পড়াশুনায় সকলেই একটু শিথিল; যত্ন, উদ্যম যেন সকলেরই স্বল্প। কারণ সকলেই যেন বুঝে—এই পড়াশুনায় কিছু লাভ হইবে না—বিদ্যাও না, অর্থও না।

প্রাথমিক শিক্ষা

স্কুলের অপেক্ষা 'জোড়-দেউলের' নাট-মন্দির বেশ সজীব। কিন্তু শতখানেক বৎসর পূর্বে যাঁহারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহারা আজ গ্রামে থাকেন না। দু'পুরুষ যাবৎ ঘোষেরা কর্মসূত্রে শহরের বাসিন্দা, মুখ কলিকাতার দিকে। জোড়-দেউলের সংরক্ষণ ভার রহিয়াছে দেবোত্র-ভোগী পুরোহিত গোষ্ঠীর উপরে। ভাগ্যক্রমে তাঁহারা নিরক্ষর নন। লেখাপড়া শিখেন, অবস্থাও সচ্ছল, অন্য উপার্জ্জনও করেন। এমনকি, ভটচাজ্জি বাড়ির দু-একটি যুবক রাজনীতিতে জড়াইয়া জেলে গিয়াছিলেন। এখনো তাঁহারা দশটা ভালো কাজের সঙ্গে সংযুক্ত রহেন। মন্দিরের পুকুরটি তাঁহারা সংস্কার করিয়া সকলের ব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। ওদিকে গ্রামের দীঘিটারও পঙ্কোদ্ধারের জন্য ঘোষ বাবুদের ধরিয়া, জিলা-বোর্ডে ছুটাছুটি করিয়া, সেবার বেশ একটা সুব্যবস্থা করিয়া আনিয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নির্বাচনের হিড়িক পড়িল, ঘোষবাবুদের ছোটবাবু হিন্দু মহাসভার প্রার্থী, আর ভটচাজ্জি গোষ্ঠীর কেশব ডাক্তার পুরাতন কংগ্রেস কর্মী। ঘোষেদেরই দেবোত্রের খাইয়া ভটচাজ্জিরা পুরুষানুক্রমে মানুষ। কিন্তু তাই বলিয়া কেশব নীতি ত্যাগ করিবেন কিরূপে? সেবারের ভোটের প্রতি-যোগিতায় দুই জনের মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইল। ঘোষেদের ছোটবাবু পরাজিত হইলেন। তখন হইতে জানা কথা—কাঁকনতলার কেশব ডাক্তার যে কাজে হাত দিবেন ঘোষবাবুরা তাহাতে বিরোধিতা করিবেনই করিবেন। এইরূপে কেশব ডাক্তারের সমস্ত কাজকর্ম তখন হইতে ঠেকিয়া গিয়াছে।

গ্রাম্য জীবনের বিবাদ

জিলা শিক্ষা বোর্ডে কেশব ডাক্তার সভ্য, সেখানে তাঁহার প্রভাব আছে—কংগ্রেসের তিনি সদস্য। তিনি স্কুলের উন্নতি করিতে গেলেন। কিন্তু স্কুল ঘোষেদের স্থাপিত, তাঁহারা অমনি বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। শিক্ষক মহাশয়দের উভয় শঙ্কটে আরও দুরবস্থা। দলের ক্ষমতাবান্ লোকদের ধরিয়া কেশব ডাক্তার চাহিতেছেন গ্রামটা পুনর্গঠিত করিবেন—তেমাথার রাস্তাটা এদিকে আসিবে, সরস্বতীর পাশ দিয়া মদনতলার খালের সঙ্গে যোগ সাধন করিবে; গ্রামোন্নয়ন ব্লকের কর্তৃপক্ষদের সহায়তায় বীজ-ধান, সার, হাল, কোদালী প্রভৃতি চাষের দ্রব্য গ্রামের চাষীদের

গ্রাম্য গঠনের চেষ্টা

সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে। কিন্তু দলের উচ্চকোঠার শহরে লোকেরা ভরসাই দেয়, সাহায্য বিশেষ দেয় না। কাজের মধ্যে কেশব ডাক্তার পারিয়াছেন দীঘির পারে ছোট একটা সরকারী স্কিমের স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলিতে। চারিটি রোগীও সেখানে থাকিতে পারে, কেশব নিজেই অবৈতনিক ডাক্তার। ঔষধপত্রও কিছু আসিয়াছে, দুই একটি মাহিনা-করা পরিচারকও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। সত্যই একটা প্রশংসনীয় কাজ কেশব ডাক্তার করিয়াছেন। এমন কি, সরকারের নিকট হইতেও দীঘিটার পঙ্কোদ্ধারের জন্য চার হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন ; গ্রামের মানুষের বাকী কাজটা করিতে হইবে। এই সরকারী টাকার ভরসায় গ্রামের লোকেরাও কাজে নামিয়াছে। দীঘিটা নিজেদের চেষ্টায় সংস্কার করিতে তাহারাও উৎসাহী। চাষীদের অনেকেরই তো বৎসরে অনেক সময় চাষের কাজের পরে কাজ থাকে না, তখন সামান্য মজুরিতেও কিছু কাজ পাইলে তাহারা সার্থক হইতে পারে। দীঘির সংস্কার উপলক্ষ্য করিয়া এই কারণে এখন একটু উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। যাহারা গ্রামের প্রাণ তাহারাই সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পূজা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসবেও এখন গ্রামে একটু সাড়া পড়ে। পূজায় অনেকে গ্রামে ফিরে। জোড়-দেউলের নাট-মন্দির সারা বৎসর খালি পড়িয়া থাকিত, দুই একজন আধাবয়সী সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে বসিয়া গল্প করিত। রামনবমীতে, জন্মাষ্টমীতে, পূজা-পার্বণে ক্বচিৎ কদাচিৎ কীর্তন হইত। দুই একজন কথক কথকতা করিতেন। ঘোষ বাবুদের বাড়ির পূজা এখন নায়েব-গোমস্তারাই শেষ করে। চাটুজ্জ্যে বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়—কোনো রূপে নমঃ নমঃ করিয়া তাঁহারা পৈতৃক পূজা নির্বাহ করেন। আমাদের যুবকেরা স্থির করিল, একটা সার্বজনীন দুর্গোৎসব গ্রামে অনুষ্ঠিত হউক। খাতা লইয়া, চাঁদা তুলিয়া, সত্যই তাহারা ব্যবস্থা করিল। নাটমন্দিরের নিকটেই মণ্ডপ বাঁধিয়া দেবীর অর্চনা হইল। একটা প্রদর্শনীও ছিল। এই উপলক্ষ্যেই কিন্তু আরও কিছু কিছু জিনিসের সূচনা হয়। মহাষ্টমী দিনে অনুষ্ঠিত হইল বীরাষ্টমী। তাহার পর নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে স্থাপিত হইল কুস্তির আখড়া। বিজয়ার পরে বৈঠক বসিল, আর কি করা যায়? আমাদের যুবকদের চেষ্টায় এইবার সেই পূজা সমিতি 'গ্রামোন্নয়ন সমিতিতে' পরিণত হইল। নাটমন্দিরের সভাতেই আমরা চাষীদের একটা 'সমবায় সমিতি' গঠন করিলাম। এক পার্শ্বে একটা গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের বাড়ির বইপত্র, ও অন্য দুই-দশ বাড়ির বই পত্র লইয়া শত পাঁচেক বই হইয়াছে। এদিকে শহরে ছুটিয়া কেশব ডাক্তারও জোগাড় করিয়া ফেলিতেছেন সরকারী অর্থ সাহায্য, একটা পাকা লাইব্রেরী বাড়ি আমরা নির্মাণ করিতে পারিব।

কিন্তু সেইখানে আমাদের সঙ্গে তাঁহার গোল বাধিতেছে। কেশব ডাক্তার বলেন, একজন মন্ত্রী-উপমন্ত্রী আনিয়া একটা ভিত্তিস্থাপনের সভা না করিলে নয়। কিন্তু এই মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের আমরা বলি 'উপদ্রব'। আমাদের মতে লাইব্রেরীর উৎসবে আপনার মত শিক্ষাব্রতী বা সাহিত্যিকই হইবেন পুরোহিত। আমরা গ্রামের লোকেরাই নিজেদের পথ নিজেরা তৈয়ারী করিব। মন্ত্রী উপমন্ত্রী অপেক্ষা আমাদের গ্রামের চাষী ও সাধারণ মানুষ আমাদের অধিক ভরসা—কেশব ডাক্তারের ইহাতেই আপত্তি। তিনি বলেন, টাকাকড়ি পাইতে হইবে, মন্ত্রীদের পরিতুষ্ট না করিলে তাহা আসিবে কোথা হইতে?

ইহার উত্তর আমরা সত্যই জানি না। তবে জানি, রাজনীতিজ্ঞদের অপেক্ষা স্বগ্রামের মানুষের উপর ভরসা রাখা অনেক সুবুদ্ধি। তাহারা নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝে, আর কাজ করিতে বলিলে কাজ করে। 'ওরা কাজ করে'—এইটিই আসল কথা। সেই কাজের ফলেই আমাদের গ্রাম মরিয়াও মরে নাই, ভবিষ্যতেও মরিবেনা। বরং আজ বাঁচিবার মত চেষ্টাও করিতেছে। ইহারাই তো গ্রামের প্রাণ, দেশের প্রাণ। তাই, আপনাকে বলিতেছি, আসুন দেখিতে পাইবেন, দেখিবেন—'ওরা কাজ করে।'

[মন্তব্য: গ্রাম অনেক রকমের হয়; ছোট বড়, উন্নত, অবনত পশ্চাৎপদ, অগ্রবর্তী, ইত্যাদি। আমাদের গ্রাম কিরূপ? সাধারণ ভাবে কয়েকটি জিনিস প্রায় সব গ্রামের সম্বন্ধেই সত্য: (১) প্রাকৃতিক সম্পদ—গাছ-গাছড়া, বনজঙ্গল, মাঠ, এবং প্রায়ই নিকটের একটি ছোট নদী। এসব জিনিস অবলম্বন করে 'কাব্যিক' ভাষায় অনেক সুন্দর বর্ণনা লেখা যায়। সাধারণতঃ তা'ই লেখা হয়। (২) এর সঙ্গে মানুষের তৈয়ারী সম্পদের কথাও আসে—পুরাতন ও নূতন। যেমন, পুরাতন মন্দির, দীঘি, ইত্যাদি। কিম্বা ফলের বাগান, ফুল-বাগিচা, পদ্মদীঘি, পুকুরের ঘাট ইত্যাদি নতুন জিনিস। তাও বেশ ভাব-সম্পদে ও শব্দ-সম্পদে বর্ণনা করা চলে। সাধারণতঃ অনেকে তা করে। (৩) তখন আসে গ্রামের মানুষের কথা। বিশদ করে এসব নানা জাতির বৃত্তি ও আর্থিক অবস্থা, বললেই (ক) গ্রামের আর্থিক অবস্থা বোঝা যাবে, (খ) সামাজিক অবস্থার কথাও বলা হবে। (৪) তারপর গ্রামের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথা—(ক) শিক্ষার, (খ) স্বাস্থ্যের, (গ) আর্থিক উন্নয়নের ও (ঘ) আনন্দ সৃষ্টির নানা প্রয়াসের কথা সে সূত্রে আসে। নানা জাতির সদ্ভাব আমোদ আহ্লাদ, উৎসব, আনন্দ এসে—'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' বাঙলার গ্রাম নিয়ে দূর থেকে যত উচ্ছ্বাস করা যায়, কাছে থেকে তা করা যায় না। রচনায় উচ্ছ্বাস করতে হলে অবশ্য ভাষারও তেমন আতিশয্য প্রয়োজন। কিন্তু উচ্ছ্বাস না থাকলেও প্রত্যেকেরই নিজ গ্রামের জন্য মমতা থাকে। এই মমতার জন্যই প্রত্যেকেরই কাছে 'আমার গ্রাম' আশ্চর্য জিনিস।

যাই হোক, গ্রামের সাধারণ প্রসঙ্গগুলি স্থির হয়ে গেলে স্থির করতে হবে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে তা দেখব ও লিখব?—(ক) সাধারণ উচ্ছ্বাস-বহুল বা 'কাব্যিক' দৃষ্টিভঙ্গীতে? না, (খ) সরস মধুর কৌতুক দৃষ্টিভঙ্গীতে? সর্বাপেক্ষা চমৎকার এই সরস-কৌতুকের দৃষ্টিভঙ্গী, তা সর্বাপেক্ষা কঠিনও। তারপরে (গ) এই বাস্তব আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী—এখানে সেই দৃষ্টিভঙ্গীই আমরা গ্রহণ করেছি। দৃষ্টিভঙ্গী স্থির হলে অবশ্য ভাবনা-রাশি থেকে উপযুক্ত দেখে প্রসঙ্গ নির্বাচন করতে হয়।

॥ একটি আদর্শ গ্রাম ॥

মিশনারিদের স্থাপিত একটি নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রাম দেখিয়াছিলাম, 'প্রভুপত্তন' সম্পূর্ণ নূতন গ্রাম। পথ-ঘাটের বিন্যাস হইতে গ্রাম প্রান্তের শেষ গৃহটি পর্যন্ত একটি সুপরিকল্পিত রীতিতে নির্মিত। কেন্দ্রস্থলে একটি সুউচ্চ গির্জা ও তাহার সুবিন্যস্ত উদ্যান, যাজকের প্রশস্ত আবাস-গৃহ ও গির্জার কর্মীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। এক প্রান্তে গির্জার গৃহপালিত পশুর জন্য পরিচ্ছন্ন ছাউনি, গির্জার গোলাবাড়ি। ইহার পরেই মিশন স্কুল একদিকে, অন্যদিকে মিশন হাসপাতাল, চারিদিকে গ্রামবাসীদের বাড়িঘর; কোনোটি ইষ্টক নির্মিত, কোনোটির রাণীগঞ্জ ইটের দেয়াল, টালির ছাদ। হাটবাজার দোকানপাট, ডাকঘর, কিছুরই অভাব নাই। কৃষিক্ষেত্র শিল্পকেন্দ্র, পশুপালন-কেন্দ্র হইতে সংস্কৃতি-কেন্দ্র সবই নবনির্মিত। 'জন-কল্যাণ' রাষ্ট্রের সরকারী সমস্ত আয়োজনও ইঁহাদের অনায়াসে করায়ত্ত। এমন কি, অর্থ ও উদ্যোগের বলে সেই অঞ্চলে অন্য সকলের পূর্বেই বিজলি সরবরাহের ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে। একটি আদর্শ গ্রামে কী কী প্রয়োজন, তাহা যেন স্পষ্ট দেখা যায়। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কর্মশক্তিকে বারে বারে প্রশংসা করিয়াছি—ইঁহাদের সংগঠন শক্তিকে আবার নমস্কার করিলাম।

চিরকালের বাঙলা গ্রাম

কিন্তু কিছুদিন পূর্বে একবার ময়নাডাঙার মাঠে আমাদের স্কাউটদের ছাউনি পড়ে। গ্রামের বাহিরে এই শিবিরে রাত্রিদিন আমাদের স্কাউটদের নানা অনুষ্ঠান; গ্রাম দেখিবার শুনিবার সময় কোথায়? তথাপি গ্রাম-প্রধানদের সঙ্গে পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। শীঘ্রই গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মাসীর বাড়িও আবিষ্কৃত হইয়া গেল। তখন অবসর পাইলেই আমরা ময়নাডাঙা ছুটিতাম। ময়নাডাঙার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। নূতন করিয়া যেন বাঙলা দেশের গ্রাম্যজীবনকে আমি উপলব্ধি করিলাম। কেমন করিয়া তাহাই

ভাবনা-বিন্যাস ও বিকাশ করতে হয় তারপরে—রচনার আকার বুঝে (প্রকাশের ভঙ্গী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই নির্ণীত হয়ে যায়।)

এই লেখাটি যে ভাবে আরম্ভ করা হল তাতে 'সূচনাতে' অনেকটা স্থান হাতছাড়া হয়ে গেল। সূচনায় একটু নূতনত্ব এল বটে, কিন্তু স্থানের অভাব ঘটলে তা হয় কমাতে হবে, নয় সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। 'উপসংহার' (গ্রামের প্রাণ) বরং আরও একটু বড় করলেই ভালো হয়। অন্ততঃ আর একটু শাণিত ও উজ্জ্বল হবে শেষ বাক্য কয়টি। প্রয়োজন মত এ লেখা অনেক ছোট করা যেতে পারে।

অন্য ভঙ্গীতে ও অন্য রকমে এরূপ বিষয় লিখিত হল আর একটি রচনায়—'একটি আদর্শ গ্রাম'। তা তুলনা করে দেখা ভালো।]

বলিতে চাই। কারণ ইহা কল্পিত আদর্শ নয়। চিরকালের বাঙলা গ্রামের কথা, এবং সেই সঙ্গে বহমান জীবনধারার কথা। বাঙলা দেশের জীবনসূত্রের সহিত ময়নাডাঙা গ্রথিত ; সেই সূত্রের মধ্যেই তাহার পুরাতনের পরিচয়, নূতনের প্রকাশ, ভবিষ্যতের আভাস।

প্রথম দৃশ্য : পুরাতন ও নূতনের ছন্দ সমাবেশ

ময়নাডাঙা পুরাতন গ্রাম। কত পুরাতন তাহা জানি না। তবে গ্রামপ্রান্তে ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত একটা শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এক সময়ে সেই দিকেই নীলকুঠির কোন সাহেবেরও কুঠি, গোলাবাড়ি, বাগান প্রভৃতি ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়। সেই দিকেই এখনো গঞ্জ, বাজার, নদীর ঘাট।

এক সময়ে এই নদীর পথেই ময়নাডাঙার সঙ্গে বাহিরের পৃথিবীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। নদীর ঘাটে তখন যাত্রী নৌকা অপেক্ষা করিত। এখানকার গঞ্জের বাস-স্টপের বাসের যাত্রীদের মতই সেই দিন গঞ্জের ঘাটে নৌকার যাত্রীরাও ভিড় করিত। মালবাহী নৌকা এখনো নদীতে চলে, উহা পুরাতন বাণিজ্যের সাক্ষী। বাস ও লরীই এখন ময়নাডাঙার ব্যবসায়ের বাহন। উহাদের সহায়ে বিশ মাইল দূরের সদর শহরের সঙ্গে ময়নাডাঙার আধুনিক বৈষয়িক জীবন গ্রথিত। অবশ্য ময়নাডাঙ্গার আর একটি প্রধান দ্বার, মাইল খানেক দূরের ময়নাডাঙা রেলস্টেশন। মালবাহী গোরুর গাড়ি কঠিন বা করুণ প্রতিবাদ তুলিয়া স্টেশনের পথে চলিয়াছে। সাইকেল রিক্শ অবিরাম ঘণ্টা বাজাইয়া বা "প্যাক-প্যাক" শব্দে পথচারীকে বিরক্ত করিয়া আত্মঘোষণায় ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে গ্রামপথের স্বচ্ছন্দগামী যাত্রীকে সচকিত করিয়া, কখনো বা ধূলির ঝড় তুলিয়া, ঘাড়ে আসিয়া পড়ে শহরের কোনো মোটর, গঞ্জের কোনো মহাকায় লরী, কিম্বা যাত্রীবাহী কোন অতিভারাক্রান্ত সরোষ-গর্জমান 'বাস'। ট্রেন-বাস-লরী—এমন কি, সাইকেল রিক্শ, শহরগামী গ্রামের মানুষ, সবাই ব্যস্ত, সবাই সতর্ক, সবাই চলমান,—ইহাই এখন ময়নাডাঙার রূপ।

বর্তমান কালের সঙ্গে ময়নাডাঙার জীবনও চলন্ত, সজীব। কিন্তু ইহারই মধ্যে গোরুর গাড়ি চিরদিনের নিয়মে চলিতেছে—মহিষের গাড়ি মালবহন করিতেছে, দরিদ্র যাত্রীরা ধীরগতিতে আপনাদের ছন্দে আপনারা চলিয়াছে। পুরাতন কালের মন্থর জীবনযাত্রা নূতন কালের ত্বরিত জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু সেই রূপায়ণে গ্রামটি আপনার শ্রী ও আপনার ছন্দ আপনি আবিষ্কার করিতেছে—ইহাই বুঝিবার মত।

স্টেশনের দিক হইতে ময়নাডাঙায় প্রবেশ করিতে এখনও চোখে পড়িবে প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রাসাদ,—সম্মুখে জলাশয়, ময়নাডাঙার বাবুদের

বাড়ি। বাবুরা দুই পুরুষ পূর্বে কলিকাতায় বাস স্থাপন করিয়াছেন। পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে কেহ একজন এক[illegible] কাছারি বাড়িতে আসিয়া বসিতেন, এক আধ রাত্রি পৈতৃক ভবনে যাপন করিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেন,—ম্যালেরিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন কিনা সেই ভয়েই দুই-এক সপ্তাহ কাটিত। আজ ভূমি-সংস্কার আইনে জমিদারি সরকারের আয়ত্ত। কাছারি বাড়িতেই সরকারের প্রয়োজন। জমিদারের নির্বন্ধাতিশয়ে গোটা জমিদার বাড়িটাও সরকার ভাড়া লইয়াছেন। যতদিন গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টির নূতন গৃহ নির্মিত না হয় ততদিন এই বাড়িতেই পঠন-পাঠন হইবে; শিক্ষিকারাও কেহ কেহ বাস করিবেন। পুরাতন প্রাসাদকে এই উদ্দেশ্যে কিছুটা সংস্কার করিতেও হইয়াছে। তথাপি এই জমিদার বাড়ির দিকে তাকাইলে মনে হইবে—ইহা যেন অতীতেরই মধ্যে নিহিত। তারপর, যদি চোখে পড়ে ইহার আঙিনায় প্রাণছন্দ তুলিয়া ময়নাডাঙার বালিকারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পিছনের হাতায় তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে, তখন বুঝিতে পারা যায় —নূতন কালের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া ময়নাডাঙার জীবন আগাইয়া আসিতে চায়।

বর্ণনা: পুরাতন ও নূতনের প্রতিষ্ঠা

জমিদার বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবশ্য আরও অনেক জিনিসের স্থান হইতেছে—কৃষির বীজকেন্দ্র, সার বিতরণ ব্যবস্থা হইয়াছে; জলাশয়েও মৎস্য চাষ হইতেছে। আরও অনেকটা স্থান এখনো পড়িয়া আছে। কিন্তু স্থানাভাব গ্রামে নাই, অন্তত ময়নাডাঙায় নাই। প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের, অথবা আসল প্রয়োজন মানুষের। আর প্রয়োজন উদ্যোগের। ভাগ্যক্রমে মানুষের অভাব ময়নাডাঙায় ঘটে নাই। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎসাহের বান ডাকিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিকল্পনার নানা জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়। পল্লী পুনর্গঠনের নূতন আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামবাসী-শহরবাসী সকলেই নূতন আশায় ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য যেন আগ্রহে অধীর।

স্বাধীনতার সেই পুণ্যক্ষণটি ময়নাডাঙার ইতিহাসে উপেক্ষায়, অভ্যাসে ক্ষয় হইয়া যাইতে পারিল না। ইহাই সৌভাগ্যের কথা। যুদ্ধ-পূর্বেই গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়টি নূতন করিয়া নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই সূত্রে যাহারা একত্রিত হইতেছিলেন তাঁহারা 'পল্লী-মঙ্গল-সমিতি' স্থাপিত করিয়া ময়না-ডাঙার জন্যও একটা পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। সেইদিন বড় বড় স্বপ্ন দেখিবার দিন, তাঁহারাও তাহা দেখিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ—যাহা প্রথম কর্তব্য তাহা প্রথম করিতে হইবে; যাহা নিজেদের শক্তিতেই সাধ্য তাহার জন্য সরকার বা ঐরূপ কোনো বাহিরের

সংকল্পের নীতি নির্ণয়

সংস্কার মুখ চাহিয়া থাকিব না। আর সর্বোপরি তাঁহাদের মন্ত্র হইল 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ'।

প্রশ্ন উঠিল, 'কাহার মঙ্গল? দুই একজন পদস্থ লোকের মঙ্গলই কি পল্লীমঙ্গল? চাষী, জেলে, মুটে মজুর, গ্রামের মূক জন-সাধারণের, কৃষক, পল্লীশিল্পীর মঙ্গলেই মূলতঃ গ্রামের মঙ্গল নয় কি?' এই আলোচনা করিতে করিতে গ্রামের সোয়া দুইশত পরিবারকে আয় অনুযায়ী তাঁহারা পাঁচটা স্তরে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল সর্বাপেক্ষা যাহারা শ্রমসাধ্য ও মঙ্গলদায়ক কাজ করে তাহারাই দরিদ্রতম,—সংখ্যায়ও তাহারাই অধিকতম। স্থির হইল দুর্বল অঙ্গেই বল সঞ্চার প্রথম কর্তব্য। ইহাদের সবল করাই সমিতির প্রধান দায়িত্ব। এই নীতি কর্তব্যের মূল সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা স্থির করেন—সর্বাগ্রে "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।"

চাই শিক্ষা: শুধু স্কুলের শিক্ষা নয়, জনশিক্ষা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। আর চাই স্বাস্থ্য, বল, 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।'—ইহাই ময়নাডাঙার নূতন 'স্বাধীনতা-সংকল্প'।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল অবশ্য গ্রামের কেন্দ্রে রহিয়া গেল। তাহাকে ময়না-ডাঙার জীবনের উচ্চতর কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলা তো সুনিশ্চিত; কিন্তু চাষীপাড়ায়, কুমোরপাড়ায়, তাঁতীপাড়ায়, গুটি তিন প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করাও প্রাথমিক প্রয়োজন। আর এই সব স্কুলে যেমন বালিকাদের শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে, তেমনি অবসর সময়ে বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই কাজে কার্যক্ষেত্রে বাধা কম আসে নাই—ঘর-দুয়ার প্রায় জুটিল না, উপকরণের অভাব ছিল, চাষীরাও দুই দিনের পরই নিরুৎসাহ বোধ করিল। দুইটি বিদ্যালয় তথাপি টিঁকিয়া গেল।

বিদ্যা বিকিরণ

স্বাস্থ্য সংগঠনের প্রচেষ্টায় গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামের চিকিৎসকদের মিলিত করিয়া পরামর্শ স্থির করা হইল—একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইবে; সপ্তাহে একদিন করিয়া এক একজন চিকিৎসক বিনা দক্ষিণায় সমাগত রোগীদের পরীক্ষা করিবেন। সে পরীক্ষায় 'যোগ্য' মনে হইলে রোগীকে রোগীর গৃহেই ডাক্তাররা বিনা দক্ষিণায় দেখিতে যাইবেন। চারজন চিকিৎসক সমিতির নিকট হইতে মাসিক সামান্য ভাতায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাই হইলেন ময়নাডাঙার 'স্বাস্থ্য-সংসদ'। কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধক টীকা দেওয়া, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা হইতে গ্রামের ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য তাঁহারাই দায়ী। এদিকেও নানা অভিযোগ উঠিত—সর্বসময়ে চিকিৎসকগণ সকলে রোগীদের সমান যত্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের সকলের

স্বাস্থ্য-সংকল্প

রোগ-জ্ঞান ও চিকিৎসার হাতযশ সমান নয়, ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবস্থাটি যে কল্যাণপ্রদ তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাতেই গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ সমিতি প্রথম লাভ করিল।

অবশ্য সব বিষয়ই নির্ভর করে অর্থসঙ্গতির উপর। সরকারী তহবিল, স্বায়ত্তশাসন-মূলক সংস্থার সহায়তা, এবং অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীদের দান— এই সব নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামবাসী জনসাধারণের আর্থিক জীবন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে শেষ পর্যন্ত গ্রামের কল্যাণ-আয়োজন সকলই ব্যর্থ হইবে। প্রথম হইতেই 'সমিতি' সম্ভবতঃ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল।

আর্থিক সংগঠন, কৃষির উন্নয়ন, নূতন শিল্প উদ্যোগ

তাই দুই বৎসর যাইতে না যাইতে আর্থিক উদ্যোগই তাহাদের প্রধান ও আশু কর্তব্য হইয়া উঠিল। বাঙালী পল্লীজীবন কৃষিকেন্দ্রিক; কৃষিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার পল্লীশিল্প। কিন্তু সমিতি দেখিল—গ্রামের এত জমি নাই যে, গ্রামের সকলে কৃষিজীবী থাকিতে পারে। জমির উৎপাদন এত নয় যে তাহাতে চাষীর জীবন সচ্ছল হইবে। যাহাও জমিতে উৎপন্ন হয়, জমিদার মহাজনের পাওনা মিটাইয়া যাহা থাকে, তাহারও দাম,—'ফড়ে' 'দালালের' হাত এড়াইয়া কতটুকু পায় সত্যকার চাষী? স্থির হইল—কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি চাই; সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সমাজের উপযোগী অন্যরূপ জীবিকা পদ্ধতির প্রবর্তন চাই; নূতন পল্লীশিল্পেরও প্রচলন প্রয়োজন। বাহিরের বাজারের সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য পথ ঘাট, পরিবহণ, সব কিছুর নূতন করিয়া পরিকল্পনা করিতে হইবে। আয়ের নূতন উপায় চাই, আরও কর্মসংস্থানের নূতন পথ চাই,—কোথায় তাহা? সরকারী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই সময়েই আরম্ভ হইতেছিল। সমিতি বুঝিল—অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করা ছাড়া পথ নাই। যাহা আছে তাহাকে যথাসম্ভব কার্যকরী করিয়া, যাহা চাই, তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে,—ইহাই বাস্তব বুদ্ধি। আর, সর্বসময়ে সর্বকর্মে চাই গ্রামের মানুষের আত্মশক্তিতে আস্থা, সমষ্টি-শক্তির স্ফুরণ।

তারপর দীর্ঘ দশ বৎসরের সেই শত প্রয়াস ও বহু ব্যর্থতার পরিচ্ছেদ যথাযথ বলা কাহার সাধ্য? আমরা যেদিন ময়নাডাঙার বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ময়নাডাঙার স্কুলের স্কাউট-মণ্ডলীর আহ্বানে সম্মিলিত হই সেদিন কিছুটা সেই ইতিহাস শুনিলাম; খানিকটা তাহার প্রমাণ দেখিলাম; আরও কতকটা মনে মনে বুঝিলাম। স্কুলের হলে তখন কৃষি-সমিতির প্রদর্শনী হইতেছে—শহরের ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া কিছু পরেই তাহা উদ্বোধন করিবেন। কাছেই 'সমবায় সমিতির' বাড়ি ও আপিস দেখা যায়। সমবায় এই কৃষি-সংগঠনের মূল ভিত্তি। আপিসের পাশেই তাঁহাদের আহূত ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সেদিন তাঁহার ছাউনি ফেলিয়াছেন।

সাধনার ফল

অদূরে দেখা যায় 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র' ও নবনির্মিত চিকিৎসালয়—সেখানে এখন সাতটি রোগীর অবস্থান ও সেবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। আরও দূরে মাঠ জুড়িয়া দেখিলাম কৃষিকেন্দ্রের আয়োজন—সেখানে হাঁস, মুর্গী, ছাগল ও গোপালন শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মৎস্য চাষের কথা শুনিলাম, দেখিবার সময় হয় নাই। জানিতাম প্রদর্শনীতে সেদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক আয়োজন আছে। শহরের একটি গানের দল আসিবে বটে, কিন্তু গানের শাখা গ্রামের ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামের ঢুলী, একতারা বাদক, সাইকেল রিকৃশা চালক, বাঁশীওয়ালা ইহাদের দ্বারাই পরিচালিত। ইহারাই প্রধানত সঙ্গীত পরিবেশন করিবে। আর গ্রামের লোকেই অভিনয় করিবে তাহাদের একজন শিক্ষক মহাশয়ের পরিচালিত একটি অনুবাদ-নাটিকা—'ইনস্পেকৃটর জেনারেল।'

সন্ধ্যা হইতে না হইতে নবাগত বিজলিতে যখন গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন মনে হইল নূতন কালের আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়িতেছে। গ্রামের চাষী, মুটে-মজুর দুই একজন করিয়া কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে। উৎসব আরম্ভ হইলে কখন ধীরে ধীরে গান ও বাদ্যে তাহারা ও আমরা একসঙ্গে মাথা নাড়িতে লাগিলাম। অভিনয়ে হাসিতেছিলাম, খুশী হইয়া উঠিলাম। সকলে যেন কেমন-করিয়া এক হইয়া গেলাম—কোথায় বা আমি, কোথায় বা কে, সবাই যেন সকলের আত্মীয়।

আত্মীয়তা বোধ

আমার গ্রামে আমি ফিরিয়া আসিয়াছি কিন্তু দেখিয়াছি একটি 'আদর্শ গ্রাম।' 'আদর্শ' বলিতেছি কেন? ময়নাডাঙার অপেক্ষা তো প্রভুপত্তন সর্বদিকেই অধিক উন্নত। কিন্তু সত্য কথা বলিব—সেই পাদ্রিপ্রবরের 'পিতৃশাসিত', গির্জা-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে আমি এতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করি নাই। কোথায় মনে হইয়াছে প্রভুপত্তনের মানুষেরা মানিয়া চলিবার অভ্যাসেই মানিয়া লইয়াছে; নিজেরা এই উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করে নাই। বাঙালী জীবনের সহজ সরলতা প্রভুপত্তনের ঊর্ধ্বাসীন ধর্মীয় কর্তৃত্বের আওতায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু ময়নাডাঙায় দেখিলাম—পথঘাটে, দোকান-পাটে তাহা তেমন সুদৃশ্য, সুসজ্জিত 'ছবির মত' গ্রাম নয়। সেই চিরদিনের বাঙালী গ্রাম। সেই ভাঙা শিবমন্দির, সেই বুড়ো বটতলা, সেই পড়ন্ত জমিদার বাড়ির অর্ধাচ্ছন্ন জীবন। কিন্তু ইহার মধ্য হইতে গা-মোড়া দিয়া, আলস্য ভাঙিয়া আমাদের চিরদিনকার বাঙালী নরনারী সহজ নিয়মে নিজের চেষ্টায় চলিবার জন্য পা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারাও বোঝে—আদর্শ অনেক দূরে—অনেক দূরে—, কিন্তু তাহারা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর চলিতেছে—বাসে, সাইকেল রিকৃশায়, গোরুর গাড়িতে—যেখানে যেমনি পারে, চলিতেছে। চলিতেছে, চলিবে—ইহারই মধ্যে ময়নাডাঙার আদর্শ।

[মন্তব্য : 'একটি আদর্শ গ্রাম নামীয় রচনাটির বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করলে দেখবে—একটু উচ্চ স্তর থেকে এই রচনাটি লেখা এবং রচনাটির প্রথম ত্রুটি দৈর্ঘ্য, দ্বিতীয় ত্রুটি অকারণে তুলনামূলক দুটি আদর্শের অবতারণা। এ সব কথা সত্য। তবে তুলনামূলক অংশ বাদ দিলে এই দৈর্ঘ্যও অনেকটা কমে আসবে—অর্থাৎ তা হলে রচনার প্রথমাংশ ও শেষাংশ বাদ যাবে। তাতেও অবশ্য রচনাটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে,—এবং নূতনত্ব সত্ত্বেও তা সাধারণ স্তরের একটি রচনার সংকেত-সূত্রও দেখিয়ে দেবে—যথা, স্বাধীনতার উৎসাহ, ময়নাডাঙার সংকল্প—কাকে নিয়ে গ্রাম ?—জনশিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নয়ন—কৃষি-সংগঠন, শিল্পোদ্যোগ সাধনার ফল—আত্মীয়তা-বোধ। অবশ্য আদর্শ গ্রামে কি কি চাই তার ইঙ্গিত জানা আছে—প্রভুপত্তনের বর্ণনায় তার উল্লেখ করেছি। বার বার তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই রচনায়ও যে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাষা গৃহীত হয়েছে তাতেও কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস বা ভাষার আড়ম্বর নেই। কারণ 'উচ্ছ্বাস' জিনিসটা নিরর্থক, ভাবেব সৌন্দর্য তাতে অনেক সময়েই নষ্ট হয়।

এ বিষয়ে আর একটি কথা—এ রচনায়ও নৈর্ব্যক্তিক মামুলী গ্রামবর্ণনার রীতি গ্রহণ করিনি। কারণ প্রত্যক্ষ-পরিচয়মূলক রচনায় তা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ করে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে রচনা লিখতে গেলে অনেক সহজভাবে স্বাধীনভাবে, অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করবার অবকাশ থাকে। আর মন থেকে এ ধরনের গ্রাম শহর প্রভৃতির চিত্র আঁকবার চেষ্টা করাও ঠিক নয়; নিজের দেখা জিনিসের বর্ণনা করাই শ্রেয়ঃ। অন্ততঃ শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম দিকে সেরূপ বর্ণনাই সহজসাধ্য হয়।

শেষ কথা—এ রচনা থেকে অন্য কয়েকটি রচনার সংকেতও পাওয়া যায় স্বতন্ত্র করে তা লেখা চলে। (ক) পল্লীমঙ্গল বলতে কি বোঝায়? পল্লী বলতে কাদের বোঝায়? কার মঙ্গল দেশের মঙ্গল? (বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন) (খ) কৃষি উন্নয়নের পথ কি? কৃষি-সমবায়, বীজ-সার, লাঙল প্রভৃতির সুব্যবস্থা, পশুপালন, মৎস্যচাষ, এবং নূতন পল্লী শিল্পের প্রবর্তন। কী সেই নূতন শিল্প, তা অবশ্য এ প্রবন্ধে বিশেষ বলা হয়নি—পরেকার অন্য রচনায় তা বলা হয়েছে। আর একটি গোড়ার কথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। (গ) শুধু উপকরণ চাপিয়ে দিলে হবে না, গ্রামের বা শহরের লোকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে, তাদের সৃষ্টিশক্তি জাগ্রত করতে হবে। তাদের আত্মবোধ ও আত্মীয়তা-বোধ জাগাতে হবে। ঐটিই সকল রকমের গঠন-মূলক প্রয়াসের মূল কথা; তা অন্য রচনা লেখার সময়েও রাখা দরকার।]

॥ বাঙলার জীব-জন্তু

একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে প্রাণ, এই দুইয়ের সংগ্রামে-সংঘর্ষেই পৃথিবীতে জীব-জগতের বিচিত্র বিকাশ। মানুষের সহিত অন্য প্রাণীর প্রধান একটি পার্থক্য এই যে, মানুষ যে পরিমাণে প্রাকৃতিকপরিবেশকে আপনার জীবনোপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, জীবজগতের পক্ষে প্রকৃতিকে সে পরিমাণে নিয়মন করা সাধ্যাতীত। সচরাচর যেরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে জাতীয় জীবের প্রাণ-ধারণ সম্ভব, সেই জাতীয় জীবই সেই পরিবেশে টিঁকিয়া থাকে—ইহারই নাম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন।' প্রকৃতি যোগ্যতম জীবকে আপনিই নির্বাচন করিয়া লইতেছে। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী জীবের বাঁচামরা নির্ধারিত।

সূচনা : জীবজন্তুর প্রাকৃতিক নির্বাচন

বাঙলার জীব-জন্তুও বাঙলার প্রাকৃতিক নির্বাচনে উত্তীর্ণ জীব-জন্তু। এই বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ, নাতিশীতোষ্ণ বায়ুমণ্ডলের এই নদীমাতৃক ও বর্ষণ-স্নিগ্ধ সমতল ভূমি—ইহাই বাঙলার প্রাকৃতিক রূপ। সেই অঞ্চলের বনভূমির যে তৃণগুল্ম-পাদপের (flora) শ্যামল শ্রী আমরা মুগ্ধ হইয়া দেখি—এই বিশেষ আকাশ ও মাটির সমাবেশে তাহাও প্রকৃতিক নির্বাচনের ফল—প্রাণ-সম্পদের একটি বিশেষ আঞ্চলিক প্রকাশ। তথাপি মাটি, জলবায়ু ও উদ্ভিদ্, তরুলতা—এই দুইকে লইয়া বাঙলার প্রকৃতি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি। সেই বঙ্গভূমিকে আশ্রয় করিয়া প্রাণের আর এক প্রকাশ বাঙলার পশু-পক্ষীতে (fauna)। তাই, বাঙলার পশু-পক্ষীর বৈচিত্র্য তাহার প্রাকৃতিক মাটিজলবায়ুর ও পাদপ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিজড়িত প্রাকৃতিক নির্বাচনের এক ফল।

ইহার মধ্যে দেশের বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক ভাগগুলিতে বিশেষ বিশেষ জীব-জন্তু দেখা যায়। হিমালয় ও তরাই অঞ্চল, রাঢ়ের শুষ্ক কঙ্করময় ডাঙা, নিম্নবঙ্গের নদী-বিধৌত সমতলভূমি, কিম্বা সমুদ্র-বিধৌত নদী-বিখণ্ডিত সুন্দরবনের বনভূমি—এই সব প্রতিটি বিশেষ বিভাগের নিজস্ব জীব-সম্পদ আছে। আবার, সেই সব বিভাগের অভ্যন্তরে আছে জল-মাটির নানা বৈচিত্র্য। তাহাতেও কোনো জীবের জীবন-ধারণ একই বিভাগের কোনো অঞ্চলে সুসাধ্য। আবার, কোনো পশু মানুষের আশ্রয় বা অনুমোদন লাভে গৃহপালিত হইয়া উঠিয়াছে, কেহবা তাহা স্বীকার না করিয়া মানুষের বৈরীরূপে বনে জঙ্গলেই বিচরণ করিয়া ফিরে।

আঞ্চলিক প্রভাব

একদা সুদূর অতীতে হয়ত ফলমূল আহরণে, মৎস্য ও পশু-শিকারেই মানুষের জীবন চলিত। তারপর যাযাবর পশুচারক মানুষের প্রধান সম্পদ হইয়া উঠে মেষ-ছাগ জাতীয় জীব ; আর শেষে গবাদি পশু— গোরু, মহিষ, ঘোড়া। গৃহপালিত জীবের মধ্যে বোধ হয় পৃথিবীর সর্বদেশেই গবাদি পশু সর্বাধিক পরিচিত। জীবনযাত্রার পক্ষে গোরু ও মহিষ মানুষের প্রধান আশ্রয়। বাঙলা দেশ কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিজীবী সমাজে গোরু মহিষের উপযোগিতা অসামান্য। কোনো কোনো দেশে অশ্বও হলকর্ষণে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বাঙলাদেশে কেন, ভারতবর্ষে সর্বত্রই বলদ লাঙলের পশু। সেই কাজে তারপরেই মহিষের স্থান। আর দুগ্ধের দিক হইতে দুই জীবেরই দান অতুলনীয়। বাঙালি অবশ্য প্রধানতঃ গো-দুগ্ধই পান করে, আর গো-দুগ্ধ হইতেই মাখন, ঘৃত, ছানার খাদ্যাদি প্রস্তুত করে। কিন্তু বাঙলাদেশেও এখন গো-দুগ্ধের অভাবে মহিষের সমাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য মহিষপালন গোপালন অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মহিষের আহারও অধিক, দুগ্ধ ও শ্রমশক্তিও অধিক। বাঙলার গবাদি জীব মাত্রই অপেক্ষাকৃত রুগ্ন, অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অপেক্ষাকৃত কম দুগ্ধ দেয়, কম পরিশ্রম করে। তবে কয়েকটি জিনিস পরীক্ষাসাপেক্ষ। বাঙলার গো-মহিষ দেখিতে বলিষ্ঠ নয়। বাঙলার প্রাকৃতিক কারণেই কি তাহা নিকৃষ্ট, না বিশেষ বংশগত কারণে নিকৃষ্ট, তাহা অনিশ্চিত। যাহাই হউক, সুপ্রজনন বিদ্যার সহায়ে জীবদের বংশগত উৎকর্ষসাধন সুসম্ভব। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পালনবিধিতে খাদ্য ও পানীয়ের সুব্যবস্থায় যে বাঙলার সাধারণ গোরুও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, এমন কি দৈনিক আধ মণ দুগ্ধ সহজেই দান করিতে পারে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতাতেই আমরা দেখিয়াছি।

গৃহপালিত জীব গবাদি পশু

হিন্দুরা গোরুকে মা বলেন, পূজা করেন। জ্ঞানীরা বলেন, মানুষের ত্যাগ-জীবনের আদর্শ প্রতীক গোরু,—যে জীবিতকালে সেবা করে, মরিয়াও চর্মাদি যোগায়। আমরা বাঙালিরা গোরুর মহিমা শাস্ত্রেই পড়ি, কার্যতঃ গো-সেবায় আমরা নিরুৎসাহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোরুর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করি না—শুধু তাহাকে দোহন করিতে চাই, সুস্থ সবল রাখিতে জানি না। আরও লজ্জার কথা, যে টুকু দুগ্ধ আমরা পাই তাহাও আমরা সুবণ্টনের ব্যবস্থা করি না। বাঙলা দেশে শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের জন্য গো-দুগ্ধের ব্যবস্থা হউক বা না হউক, দধি, ক্ষীর, কেন বহুবিধ বিলাস মিষ্টান্নের জন্য দুগ্ধের সরবরাহ অক্ষুণ্ন থাকিবে। কলিকাতার মতো বড় শহরে যেখানে অসংখ্য শিশুর দুগ্ধ জোটে না, ছানার সেখানে মিষ্টান্নের দোকান প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সত্য বটে, বাঙালির মিষ্টান্ন পৃথিবীরই একটি অতুলনীয় সম্পদ, কিন্তু গো-দুগ্ধের এই ক্রমবর্ধমান অভাব সত্ত্বেও মিষ্টান্ন-বিলাস বাঙালীর লজ্জার কথা, নির্বুদ্ধিতারও প্রমাণ।

বাঙলাদেশে অশ্ব এখনো বাহন। এক সময়ে অশ্ব ছিল যুদ্ধের প্রধান ভরসা। হস্তীও তাহাই। এখন হস্তী পাওয়া যায় তরাই'র বনে। অশ্ব দুর্লভ। ছাগ ও মেষ বাঙালীর গৃহপালিত জীব—ইহাদের দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতিও তাঁহার প্রিয়। শূকর অবশ্য উচ্চবর্ণের বাঙালির অখাদ্য। মৎস্য সকলেরই প্রিয়। কিন্তু জীবজন্তুর মধ্যে তাহা সাধারণতঃ গণ্য হয় না, আর জলাশয়ে পালিত হইলেও মৎস্য যথার্থ গৃহপালিত জীব নয়, খেচর পক্ষীও যেমন গৃহপালিত জীব নয়।

বরং জীবজন্তু বলিতে স্তন্যপায়ী জীব ব্যতীত প্রধানগৃহপালিত অণ্ডজ জীব হাঁস ও মুরগী। ডিম ও মাংস দুই জিনিসের জন্যই ইহাদের বাঙলায় সমাদর।

অণ্ডজ জীব

ইহাদেরও বংশোন্নয়ন প্রয়োজন। পক্ষিজাতীয় প্রাণীর মধ্যে কপোতও গৃহাশ্রয়ী। কিন্তু ময়না, শালিক, টিয়া প্রভৃতি বাঙলার সুপরিচিত পাখিকে জোর করিয়াই পোষ মানাইতে হয়। বাঙলায় এখনো বুলবুলির লড়াই, মুরগীর লড়াই দেখা যায়; বাজের লড়াই অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত। অণ্ডজ জীব পক্ষী বা সর্প সময়ে সময়ে গৃহাশ্রয়ী হইলেও গৃহপালিত নয়।

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে আর দুইটি জীবও গৃহে সমাদৃত—কুকুর ও বিড়াল। বাঙলা দেশের সাধারণ কুকুর বা মার্জারের জাতিগত কৌলীন্য নাই। কিন্তু

কুকুর বিড়াল

অন্য সব গুণ কুকুরের আছে। তাহা ছাড়া, এখন পৃথিবীর নানা দেশের কুকুর, মানুষের প্রযত্নে এদেশে পালিত ও বর্ধিত হইতেছে, বংশোন্নয়নও সাধিত হইতেছে। দেশী কুকুর হইতে বুলেটেরিয়র, গ্রে-হাউণ্ড, গ্রেট-ডেন ও অ্যালসেসিয়ান্ পর্যন্ত নানা সারমেয় বংশের গুণকীর্তন করিবার লোকও দেশে এখন কম নয়। কেহ কেহ মার্জার-মাহাত্ম্য কীর্তনেও উৎসাহী। দুগ্ধ-মৎস্য-রসিক এই শ্বাপদ জীবটির ক্রোধ ও শত্রুতা দুইই সুপ্রসিদ্ধ। মার্জার-প্রেমিকদের গৃহে আদরও ইহারা কম লাভ করে না। হয়ত সেই তুলনায় ইঁদুর কমই ধরে।

শৌখিন লোকেরা আদরের বিদেশীয় জীবও পোষণ করে। বিলাতী ইঁদুর তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান জীব। কেহ কেহ বাঁদর, ভালুক ও হরিণও পোষণ করে। কিন্তু এই সব মোটের উপর বন্যজীব।

গৃহপালিত জীবের দিকে দেখিলে মনে হয়, বাঙলার প্রাকৃতিক পরিবেশে —আর্দ্র জল-বাতাসে—যেন ইহারা তেমন পুষ্ট হয় না।

বন্য বা স্বাধীনচারী জীবের মধ্যে কিন্তু বাঙলার প্রকৃতির এই বিরূপতা দেখা যায় না। বাঙলার সেই উদ্দাম শক্তির পরিচয় বাঙলার ব্যাঘ্রে। বাঙলা

বন্য হিংস্র জীব

দেশের বনে-জঙ্গলে সর্বত্রই এখনো ব্যাঘ্র বাস করে। মাঝে মাঝে গ্রামেও তাহারা উপদ্রব করে। কিন্তু ব্যাঘ্রের রাজধানী সুন্দরবন—যেখানে বলা হয় 'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর'। যে কোনো

জীবের মধ্যে ব্যাঘ্র শক্তিতে অগ্রগণ্য, আর হিংস্রতায়, দৌরাত্ম্যে, জিঘাংসায় প্রায় অতুলনীয়। ব্যাঘ্রশিকারই শিকারীদের প্রধান স্বপ্ন ও প্রধান গর্ব। ব্যাঘ্রজাতীয় অন্য জীবও অবশ্য বাঙলায় আছে, যেমন, চিতা, নেকড়ে। নেকড়ে দক্ষিণ বঙ্গে এখনও গ্রামের ভীতি।

মনে রাখিতে পারি, জীবতত্ত্বের দিক হইতে বিড়াল যেমন ব্যাঘ্রগোষ্ঠীর, শিয়াল, খেঁকশিয়াল এমন কি, অ্যালসেসিয়ান্ জাতীয় কুকুরও এই নেকড়েদেরই দূর জ্ঞাতিভ্রাতা। গুহাবাসী বা শিকারী মানবের ভুক্তাবশেষ হাড়মাংসের লোভেই এই শ্রেণীর নেকড়ে প্রথম পোষ মানিয়াছিল ; শেষ পর্যন্ত এখন গৃহ-পালিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্য জ্ঞাতিরা কিন্তু মানুষের শত্রু রহিয়া গিয়াছে। শিয়ালের উপদ্রব বাংলায় যথেষ্ট। আর তাহার ধূর্ত বুদ্ধির জন্যই শিয়াল আজও বাঙালির নিকট সুপরিচিত। কিন্তু এককালে বুদ্ধিমান জীব হিসাবেই শুধু 'শিয়াল পণ্ডিতের' নাম ছিল এমন নয়, বাঙলার নানা লোক-কথায় 'শিব-ঠাকুর' ছিল বাঙালির আদরের এই জীবটি—জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ইত্যাদি।

হাতি, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিমালয় তরাইয়ের জীবরা অন্য অঞ্চলের বাঙালির নিকট সুপরিচিত নয়। একটি জীবকে তবু রাঢ় বা সাঁওতাল পরগনার নিকটস্থ বাঙালিরা সস্নেহে স্মরণ করিবে। সে কাঠবিড়ালী। জানি না তাহার কোন সদ্‌গুণ দেখিয়া বাঙালি তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেতু-নির্মাণের কর্মেও দীন সেবকের মর্যাদা দিয়াছিল? অতটা বিনয়, কর্তব্যবোধ, কৃতজ্ঞতা তাহার আছে কিনা কে জানে? কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবটির দ্রুত, সন্ত্রস্ত গতায়াত চকিত দৃষ্টি আর জয়ধ্বজার মত উড্ডীন পুচ্ছ—সবসুদ্ধ উহাকে জীব হিসাবে মানুষের সকৌতুক স্নেহের পাত্র করিয়া তুলিয়াছে।

চিড়িয়াখানায় গেলে বাঙলার ও বিভিন্ন দেশের জীবসম্পদ দেখিয়া পুল-কিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বাঙলার জীব কয়টি? মনে হয়, জীবজন্তুর প্রতি মমতাবোধ আমাদের প্রাণে থাকিলেও আমরা এখনো নিজেদের দায়িত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তরাইয়ের গণ্ডার, হাতি প্রভৃতির জন্য সংরক্ষিত বনদেশ আজ প্রয়োজন। তাহা ছাড়াও নানা শহরে জীবশালা থাকিলে শিশুদের তাহা দেখিয়া কৌতুহল বর্ধিত হয়। আর শেষ কথা, ঘরেই আমরা কয়জন যথাযথ উপায়ে কোনো প্রাণীকে পালন করিতে শিখিয়াছি?

বাঙলার নিজস্ব জীবজন্তুর পরিচয় পাই—বাঙলার লোকগাথায়। এক সময় জীবজগৎ আমাদের কাছে অত পর ছিল না। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' হইতে বাঙলার লোক-কথায় আমরা জীবজন্তুর নানা পরিচয় পাই। তাহাদের সহিত আমাদের যে নিগূঢ় নৈকট্য আছে তাহাও বুঝিতে পারি। বাঙলার জীব-জন্তুর পরিচয় গ্রহণ করিতে করিতে আমরা এই সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারি

জীবের আত্মীয়তা

—বাঙলা দেশের আকাশ-বাতাস-জল বন মাটির সঙ্গে তাহাদের যেমন সম্পর্ক তেমনি বাঙলার মানুষেরও সম্পর্ক সেই 'flora ও fauna'র সঙ্গে। এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়াই মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের বাঙালি জীবনযাত্রার স্থূল ভিত্তি রচনা করিয়াছি—এখন সভ্যতার সাধনায় তুলিতে পারি তাহার উপরে নানা অধ্যাত্ম-শিখর।

[এই রচনার বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করা হ'ল। 'বাংলা' কথাটি থাকায় আমরা বাঙলার জলবায়ু ও সেই উপলক্ষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা পড়লাম। বৈজ্ঞানিক অর্থে পর পর জীবের যে ভাগ হ'ত—তা অশেষ। এমনকি, এক স্তন্যপায়ী জীবেরও 'অদন্তী', 'মাংসাশী', 'শুণ্ডী', 'একখুরী', 'দন্তুরী', প্রভৃতি বহু বিভাগ হতে পারে। সাধারণ রচনায় তা সম্ভব নয়। যে সব পাখি, সাপ, মৎস্য, কীট-পতঙ্গ বাঙলার সুপরিচিত তাও বাদ গেল। জীবজন্তুর যে কয়টি সর্বাধিক পরিচিত একটু স্বচ্ছন্দ ভাষায় তার উল্লেখ মাত্র করা হল।

যে-কোন বিশেষ প্রাণী বিষয়েও রচনা লিখতে পারা যায়। জীবের মধ্যে প্রধান জীব, গোরু, ঘোড়া, কিম্বা কুকুর, অথবা হাতি, সিংহ, ব্যাঘ্র। তবে সাক্ষাৎ পরিচিত বলতে গোরু, ঘোড়া প্রভৃতির কথাই বলতে হয়। হাতী, সিংহ, ব্যাঘ্র স্বাভাবিক পরিবেশে যখন বাস করে তখন আমরা অনেকেই তাদের দেখতে পাই না। অন্তত সিংহ, ব্যাঘ্র দেখি পশুশালায় ও সার্কাসে। বিশেষ পাখির সম্বন্ধে রচনাও উপাদেয় হতে পারে—'ডানা' নামে একখানি উপন্যাসই 'বনফুল' পাখি নিয়ে লিখে ফেললেন। মাছও তেমনি বাঙলার সুপরিচিত প্রাণী।]

।। গোরু ।।

[গোরু বিষয়ক রচনার একটি ভাব-সংকেত দেওয়া হচ্ছে। এই সংকেতানুযায়ী অন্য জীবের কথাও চিন্তা করা যায়। একটি প্রসঙ্গকে এক এক অনুচ্ছেদে (paragraph) সম্প্রসারিত করলেই এই রচনাটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। দরকার হবে 'সূচনা' ও 'উপসংহার' যথোচিত ভাবে আবিষ্কার করা। তার ইঙ্গিতও দিচ্ছি। তবে অন্যরূপেও তা লেখা যায়। যেমন, তোমার পরিচিত একটি গোরু নিয়ে: "আমাদের ধবলী গাইটির কথা মনে পড়িলে এখনো আমার মন আনন্দে ও মমতায় ভরিয়া যায়। আমি তখন ছোট ছিলাম। কিন্তু দুই শিংওয়ালা বাড়ির গোরুটা যে আমাকে তাহার অপত্যের মত চিনিয়া লইয়াছিল তাহা ভাবিয়া অবাক হই।" ইত্যাদি। 'সূচনা' ও 'উপসংহার' প্রত্যেক জীবের জন্যই নতুন হতে পারে—তা বলাই বাহুল্য।]

একজন জ্ঞানী সাধুর সঙ্গে একবার কথা হইয়াছিল। আমরা বলিলাম, "বেদে গোমাংস আহারের উল্লেখ আছে, 'গোঘ্ন' ছিল অতিথির নাম। তথাপি গোরু আমাদের দেবতা হইলেন কি করিয়া?" তিনি বলিয়াছিলেন—"গোরু ত্যাগের প্রতীক। তাহার সমস্ত দেহ দিয়াই সে জীবিত ও মৃতাবস্থায় পৃথিবীর প্রয়োজন সাধন করিতেছে। কৃষি উৎপাদনে, দুগ্ধ দানে, চর্মদানে—সকল রকমেই

সূচনা

গোরু এই সেবার নিদর্শন। তাই গোরুর সেবা অর্থ, ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা।"—গো-পালনের আদর্শ প্রচারে গান্ধীজীও অনেকটা এই মর্মের যুক্তিই দর্শাইয়াছেন। অবশ্য অহিংসার আদর্শ ইহার সহিত গৃহীত হওয়ায় গোমাংস তারপর হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ মাংস হইয়া উঠিয়াছে।

১। সভ্যতার প্রাচীনতম সম্পদ গো-ধন—বিশেষত কৃষি সমাজে। বেদ উপনিষদে গোরুর উল্লেখ—পুরাণের গাভী 'সুরভি' ইত্যাদি—মহাদেবের বাহন নন্দী (বৃষ) ব্যতীত হর-পার্বতীর গৃহস্থালীটি আমাদের চক্ষে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

২। (যে কোন জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য) বৈজ্ঞানিক তথ্য গো-জাতির কথা—আহার্যাদির বর্ণনা (ecology), বিচরণস্থলের বর্ণনা (habitat) এবং 'স্বভাব' উল্লেখ।

৩। ষণ্ডের সার্থকতা—বলদের সার্থকতা—হল চালনায়, যানবাহনে, ঘানি টানায়, একঘেয়ে পরিশ্রমের কাজে।

৪। গাভীর উপকারিতা : এদেশে প্রধানতঃ দুগ্ধ, অন্য দেশে দুগ্ধ ও মাংস ; ও শিঙের চুড়ি, লাঠি প্রভৃতি। হাড়ের সার্থকতা চিনি শোধনে। গো-টীকা (vaccine) প্রভৃতিও স্মরণীয়।

৫। দুগ্ধ দ্রব্যের গুণাগুণ : গোদুগ্ধ সর্বাধিক বলকারক পানীয় ও আহার্য এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের অভিমত। নানা দুগ্ধজাত দ্রব্য—মাখন, ঘৃত, ছানা ও ছানার মিষ্টান্ন প্রভৃতি। দুগ্ধের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ—গুঁড়া, ঘনায়িত দুগ্ধ, ইত্যাদি।

৬। গো-বংশের উন্নয়ন—সুপ্রজনন ব্যবস্থা—গো-পালন ব্যবস্থা—অশোকের পশুচিকিৎসা ব্যবস্থা—বৈজ্ঞানিক গোশালা—হল্যাণ্ড, সুইডেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে ডেয়ারি-ফার্ম।

৭। একটি নূতন তথ্য : শোনা যায় বালক বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার গো-দোহন দেখিয়াছিলেন। গোবৎসকে বঞ্চিত করিয়া কেমন করিয়া মাতৃস্নেহের সুযোগ লইয়া গো-দোহন সাধিত হয়, তাহা দেখিয়া বিদ্যাসাগর জীবনে আর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য আহার করেন নাই। সত্যই কি, এমন নির্মম কৌশলে মাতৃস্নেহের সুযোগ না লইয়া দুগ্ধলাভ অসম্ভব? আধুনিক বিজ্ঞান বলে—তাহা মোটেই প্রয়োজন নয়। যান্ত্রিক দোহন, জন্মমাত্র গোমাতা ও গোবৎসের বিচ্ছেদ-সাধন, ইহার পথ। কারণ, মাতৃস্নেহ পরিচয়-সাপেক্ষ। বিজ্ঞান গো-মাতাকে বা গোবৎসকে কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া মানুষের আত্ম-উপকার সাধনের পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

ডেয়ারি-ফার্মিং বিজ্ঞানযোগেই সম্ভব। ভারতবর্ষে ডেয়ারি-ফার্মিং শহরেও বিস্তারলাভ করে নাই। এখনো বহুকাল পর্যন্ত আমাদের গ্রাম ও গ্রামের

গৃহজীবন অব্যাহত থাকা অনিবার্য। সেই জীবনের আদর্শ সেই কৈলাসের সংসার—একটি কল্যাণমূর্তি গোরু ও তাহার বৎস।

উপসংহার

আমরা অনেকেই আমাদের বালক জীবনের গৃহের কথা ভাবিলে বাড়ির গোরু ও গোশালার কথা মনে না করিয়া পারি না।

।। কুকুর ।।

পঞ্চপাণ্ডব জীবনের শেষযাত্রায় বিনির্গত। তাঁহাদের সঙ্গে আছে একটি জীব—ধর্মরূপী কুকুর। মহাভারতের এই আখ্যানাংশের বক্তব্য কি ইহা নয়—কুকুরের মত মানুষের এমন বিশ্বস্ত সহচর আর নাই; কুকুরই ধর্মের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য?

সূচনা

জায়া, মাতা, ভ্রাতা জীবনের মহামুহূর্তে সবাই মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম তখনো থাকেন সঙ্গী—কুকুরের মত বিশ্বস্ত। এই বিশ্বস্ততার জন্যই কুকুর ধর্মের প্রতীকরূপে মহাভারতে গৃহীত। গ্রীসের পুরাকাহিনীতে পাই গ্রীকবীর ইউলিসিস কুড়ি বৎসর দেশ-ভ্রমণের পর স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার আদরের কুকুরটি তাঁহাকে ঠিকই চিনিয়া আনন্দে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

১। কুকুর মানুষের প্রথম পোষ-মানা প্রাণী।

২। গৃহপালিত প্রাণী।

৩। পরিচয়—বংশ, খাদ্য, বাসস্থান ও স্বভাব পরিচয়, দাঁতের নখের, ল্যাজের, লোমশ দেহের বর্ণনা।

৪। বিশেষ বিশেষ জাতীয় কুকুরের পরিচয়—রক্ষী কুকুর (সেণ্ট বার্ণার্ড), প্রহরী কুকুর, মেষ-পর্যবেক্ষক কুকুর—শিকারী কুকুর, বরফের গাড়ী টানা কুকুর, গোয়েন্দা কুকুর—খেলার কুকুর—রেসের দৌড়িয়ে কুকুর।

৫। কুকুরের বুদ্ধি: সাধারণ দৃষ্টান্ত—কুকুরের বুদ্ধি শিক্ষা সাপেক্ষ, অভ্যাসগত। পাভলভের পরীক্ষায় স্থির জানা গিয়াছে কুকুরের বুদ্ধি স্নায়ুগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই নির্নীত, অভ্যস্ত ও পরিবর্তিত হয়। অবশ্য কুকুর ব্যতীত অন্য প্রাণী লইয়াও এই পরীক্ষা চলিতে পারে। কুকুরের পরীক্ষায় বুদ্ধি, অভ্যাস, আবেগ-বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে যে সত্যে পৌঁছানো গিয়াছে তাহাতে সমস্ত জীব-জগতের বাস্তব পরিচয় আরও দৃঢ়তর হইয়াছে।

কুকুরের সঙ্গ—গৃহের সঙ্গী, পথের সঙ্গী, খেলার সঙ্গী হিসাবে কুকুরের উপযোগিতা—প্রাণের বৈচিত্র্য ও প্রাণের নিবিড় আকর্ষণ মানুষকে জীব-জগতের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্যের ও পার্থক্যের ধারণা দান করে, একই কালে জ্ঞান ও আনন্দ সঞ্চারিত করে।

উপসংহার

।। বাঙলার ঋতুচক্র ।।

বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলিবেন তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। শুনিয়াছি, তাঁহাদের মতে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রধান ঋতু চারিটি। অথবা তাহাও নয়, ঋতু মাত্র দুইটি,—শীত ও গ্রীষ্ম; বাকী দুইটি —বসন্ত ও হেমন্ত—শীত-গ্রীষ্মের গতিপথের মধ্যে আসিয়া ঋতুচক্রের আবর্তনের পথটিকে মসৃণতর করিতেছে। সৌর-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবী যখন সূর্যের নিকটে আসিতে থাকে, বসন্তকাল ক্রমে তখন শেষ হইয়া যায়,—তাপ বৃদ্ধি পায়, শেষে গ্রীষ্ম ঋতুর সমাগম হয়। আবার, যখন শরৎকাল পার হইয়া যায়, শীতের প্রাদুর্ভাব হয়; পৃথিবী তখন সূর্য হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্ম ও শীতের এই সহজ সূত্রটি তবু ঋতুপরিবর্তন বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী আপনার অক্ষের উপরও আপনি ঘূর্ণ্যমান। আর সেই অক্ষ রেখাও গতিপথের সঙ্গে সমান্তরাল নয়। যদি সমান্তরাল হইত তাহা হইলে দিন রাত্রি চিরদিন সমান হইত, শীতাতপও পৃথিবীর সর্বদেশে একরূপ হইত। সমান্তরাল নয় বলিয়াই সেই রেখা যখন (২৩।২৭´) খাড়া হইয়া উঠে তখন উত্তর মেরু যদি সূর্যের দিকে হেলিয়া থাকে তাহা হইলে উত্তর গোলার্ধে তখন দিন হইবে দীর্ঘতম, রাত্রি হ্রস্বতম, এবং সূর্যের তাপ সর্বাধিক। আর ঠিক দক্ষিণ গোলার্ধে দিন তখন হইবে হ্রস্বতম, রাত্রি দীর্ঘতম আর সূর্যের তাপ সর্বাল্প। উত্তর গোলার্ধে এই দীর্ঘতম দিন আসে ২১শে জুন—প্রায়ই আমাদের বাঙলা ১০ই আষাঢ় তারিখে; আর দক্ষিণ গোলার্ধে এই দিনটি আসে ২১শে ডিসেম্বর বা আমাদের ১০ই পৌষ। এইজন্যই ঐ দুই দিনে পৃথিবীর একার্ধে যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অন্যার্ধে তখন বিষম শীত। আর এই জন্যই গ্রীষ্মকালে উত্তর মেরুর সমীপবর্তী দেশ 'নিশীথ সূর্যের দেশ' আর শীতকালে উহা প্রায় 'সূর্যহীন দিনের দেশ'। আবার পৃথিবীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সূর্যকর তার সরলরেখায় বর্ষিত হয়, তাই সেই অঞ্চল উষ্ণমণ্ডলের অঞ্চল; গ্রীষ্ম সেখানে প্রচণ্ড, শীত প্রায় অনুপস্থিত। সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব ও নিকটত্ব, ইহাই ঋতু পরিবর্তনের মূল প্রাকৃতিক কারণ। অন্য গৌণ প্রাকৃতিক কারণেও কতকাংশে শীতাতপ প্রভাবিত হয়—যথা, সমুদ্র শীতাতপের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে; মরুভূমি দুয়েরই তীব্রতা বৃদ্ধি করে—দিনে সেখানে সূর্যের তাপ অসহ্য, রাত্রিতে শীতের তীব্রতা দুর্বার। তারপরে, সূর্যের তাপে সমুদ্রের জলরাশি বাষ্প হইয়া, মেঘ হইয়া, শেষে বাতাসকে বাহন করিয়া 'মৌসুমী' বর্ষণ লইয়া, যখন এক এক অঞ্চলে আসিয়া জাঁকিয়া বসে তখন মনে হয়, শীত বা গ্রীষ্মের অপেক্ষা সেই সব পারিপার্শ্বিক

সূচনা: ঋতু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক কারণ

জীবনে তাহার প্রভাব কম নয়—বর্ষাকে, তাই সেইসব দেশ একটা বিশিষ্ট ঋতু বলিলে কিছুই অন্যায় হয় না। অন্ততঃ ভারতবর্ষে আমরা বর্ষাকে এই মর্যাদা না দিয়া পারি না, বাঙলায় তো কথাই নাই।

তাই বৈজ্ঞানিকরা বলিতে হয় চার ঋতুই বলুন, ভারতবর্ষে আমরা ছয় ঋতুতে বৎসর ভাগ করিয়াছি; সেইরূপে প্রকৃতি-জীবনকে বিন্যাস করিয়া লইয়াছি—যথা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। অবশ্য শরৎ ও হেমন্ত মূলতঃ প্রায় অভিন্ন। একমাত্র শরতের প্রথম আবির্ভাব ও হেমন্তের বিদায়োন্মুখ শিশিরার্দ্র হিমাভাসই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু শীত গ্রীষ্ম কোনো ঋতুই তো একেবারে আকস্মিক আসে না। প্রকৃতির এক-একটি রূপ ধীরে ধীরে অন্য রূপে মিশিয়া যায়। তবু ইহারই মধ্যে অনুভব করা যায় নূতন ঋতুর জন্মক্ষণটি আমরা পার হইয়া চলিয়াছি। যাহা ছিল না, তাহা আজ আসিয়াছে; আর আজ যাহা আসিয়াছে, কাল তাহা অন্যের মধ্যে বিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই ঋতুচক্রের গতি, ইহাই নিয়ম। তথাপি ঋতুপরিবর্তনের এক-একটি সীমানা আমরা ধরিয়া লই। দুই দুই মাস করিয়া বারো মাসকে আমরা ষড়্ ঋতুর মধ্যে এইরূপে ভাগ করিয়া দিই: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—গ্রীষ্মঋতুর কাল, আষাঢ়-শ্রাবণ—বর্ষাকাল; ভাদ্র-আশ্বিন—শরৎকাল, কার্তিক-অগ্রহায়ণ—হেমন্তকাল, পৌষ-মাঘ—শীতকাল, আর ফাল্গুন-চৈত্র—বসন্তকাল। ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া বা পাঁজির মাস তারিখ মিলাইয়া অবশ্য কোনো ঋতুর আবির্ভাব হয় না। গ্রীষ্মেও বর্ষা অন্তত কুল ছাপাইয়া আসে, কূল ছাপাইয়া চলে, তাহাও আমরা সকলেই জানি। তথাপি এই বর্ষচক্রের ও ঋতু চক্রের হিসাবেই আমাদের জীবন আমরা বিন্যস্ত করি।

বাঙলার ঋতুবিভাগ

বৈশাখ শুভ মাস,—বাঙালির বর্ষারম্ভ বৈশাখে। এমন বাঙালি নাই যে বৈশাখের সেই শুভাগমনকে অভিনন্দিত করিবে না। এক সময়ে তাহা ছিল শুধু 'হালখাতার' দিন, কিন্তু আজ তাহা 'নববর্ষের দিনও। আর শুধু কি তাহাই? আমরা কি 'পঁচিশে বৈশাখের ডাক' এই মাসারম্ভ-বর্ষারম্ভের শুভক্ষণেই শুনিতে পাই না? ইহাও জানি—বৈশাখকে লইয়া কাব্য করিবার অবকাশ মোটেই বেশি মিলিবে না। কারণ, বৈশাখের পূর্বেই—চৈত্রের প্রায় শেষার্ধ হইতেই—পৃথিবীর ধূলি উড়াইয়া,চোখ ধাঁধিয়া, আকাশের স্নিগ্ধ নীল সৌন্দর্যকে দীপ্তিতে, দাহতে পিঙ্গলাভ কাঠিন্যে জ্বালিয়া দিয়া, গ্রীষ্ম আসিয়া আমাদের দুয়ারে দাঁড়ায়। সেই গ্রীষ্মকে লইয়া 'কাব্য' করিবার মত উপকরণও দুর্লভ। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের মতই তাহাকে 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ' ছাড়া অন্যরূপে আমরা আহ্বান করিতে পারি না। কারণ, দেখি আকাশ ও পৃথিবী যেন পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। মাঠ শুষ্ক, নদীস্রোত শীর্ণ, জলাশয় পঙ্কমাত্রসার। জল বাঙালির প্রাণ। স্নানের জল

ঋতু পরিচয়

পানীয় জল একটু পাইলে তাই গ্রীষ্মেও প্রাণ জুড়ায়। একটুকু বাতাস পাইলে তখন দেহ শীতল হয়। নির্জীব দেহ দিনে বৃক্ষচ্ছায়ায় এলাইয়া দিয়া ও রাত্রিতে মুক্ত আকাশের তলে ঢালিয়া দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলেই মনে হয় বাঁচিলাম। কিসের বা কাজ, কিসের বা কর্ম।

অবশ্য ইহারই মধ্যে আম-জাম, কাঁঠাল-লিচু পাকিতে থাকে। তাহা দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষের পক্ষেও দুর্লভ নয়; গ্রীষ্মকে তাই একেবারে নিষ্করুণ মনে হয় না। রাত্রির আকাশের তলে তাহার আরও একটা উদার রূপও মনে জাগে। গ্রামে কখনো কথকতা বা কখনো রামায়ণ গান হয়। ফলের প্রাচুর্যের দিনে সত্য-নারায়ণের সেবাও পাড়ায় পাড়ায় চলে। তারপর কাল-বৈশাখীতে আকাশ ছাইয়া গ্রীষ্ম যদি এক একবার তাহার মেঘের জটা খুলিয়া দিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিনের সমস্ত উত্তাপের উপরে একটি শান্ত পরিতৃপ্তি নামিয়া আসে—দেহ জুড়ায়, মনও আনন্দে উল্লাসে আপনাকে ছড়াইয়া দিতে পারে।

বর্ষা

গ্রীষ্মের পর বর্ষা। পৃথিবীর ও সমুদ্রের যত উষ্ণশ্বাস বাষ্প হইয়া মেঘ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাই ভারত সমুদ্র হইতে ক্রমে আসিয়া বাঙলা দেশকেও ছাইয়া দিল। বজ্র-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ লইয়া বর্ষা যখন প্রথম বাঙলাদেশের বুকে ভাঙিয়া পড়ে তখন আর বুঝিতে দেরী হয় না যে, বর্ষা কত সুন্দর ও কত প্রবল। আকাশ ও পৃথিবীর বর্ষণধৌত রূপ, জল-ভরা নদী-জলাশয়, প্রাণের নবোল্লাসের মত শ্যামল তরু-লতার সুচিক্কণ শ্যাম বিলাস,—দেখিতে দেখিতে প্রবীণ নবীন সকল কবির অজস্র কবিতা মনে পড়িয়া যাইবে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথাও বিস্মৃত হইবার নয়—এই আসিল কৃষিপ্রাণ বাঙলার বুকে আশা—হলকর্ষণের দিন, ফসলের প্রতিশ্রুতি। আর, তার সঙ্গে ভয়ে কৃষকের প্রাণও কাঁপে। কারণ, প্রতি চার বৎসরে একবার একটি না একটি অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, নদীপথ উন্মুক্ত হইলেও পথ ঘাট দুর্গম হইয়া দরিদ্র বাঙালীর জীবন যাত্রাও বর্ষায় দুষ্কর হইবে।

তবু বর্ষা সহজে ক্ষান্ত হয় না! রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী পার হইয়া ভাদ্র ছাড়াইয়া আশ্বিনের আঙিনায় গিয়া বর্ষা ঠেকিতে চাহে। ততদিনে অবশ্য

শরৎ

প্রথম শরতের মেঘ ও বৃষ্টির পরস্পরের লুকোচুরি খেলা শেষ হইয়াছে। দেখা দিতেছে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ, 'শুভ্র যেন সে নবনী'—আর নবনীলাঞ্জনমাখা নির্মল আকাশ। সেই মেঘ ও আকাশ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে শারদীয় পূজার আগমনী কানে আসিয়া পৌঁছায়। বাঙলা দেশের প্রধান উৎসবের কাল শরৎকাল। দুর্গাপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীপান্বিতা পর্যন্ত সেই কাল প্রসারিত। আকাশ ও পৃথিবী, প্রকৃতি ও মানুষের

যুগ্ম-আয়োজনে উৎসব ও মিলনানন্দে, বাঙলার শরৎকাল চিরকল্যাণময়ী,—শারদলক্ষ্মী।

হেমন্ত অবশ্য শরতের অনুগামী—সকাল-সন্ধ্যায় হিম পাড়তে আরম্ভ কারতেছে। আকাশের নীলের উপরে অতি লঘু কুয়াশার আস্তরণ—শীতের কুয়াশার মত তাহা ঘন নয়। সেই নীল আকাশ নাই, চারিদিকে আশ্বিনের সেই সজল শ্যামলতাও নাই। তথাপি রাসপূর্ণিমার হৃদয়োচ্ছ্বাস মনকে দোলা দিয়া ফিরে। শরতের পরিণতি হেমন্ত; শরতের সেই উচ্ছ্বাস ও প্রসন্নতা ধীরে ধীরে শিথিল ও সকরুণ হইয়া উঠিতেছে।

হেমন্ত

অগ্রহায়ণ শেষ হইবার পূর্বেই সেই প্রকৃতির সজীবতার উপর শ্রান্তি ঘনাইয়া উঠে। পত্রপল্লব সজীবতা হারাইয়া পীতাভ হয়, এক এক করিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ক্ষেতের ধান পাকিতে থাকে, মনে হয় মাঠ ভরিয়া কেহ যেন সোনা ঢালিয়া দিয়াছে। শস্যে গোলা ভরিতে থাকে। ফুলেরও ফুটিবার দিন। শাক-সবজিও সুলভ। 'পৌষ পার্বণের' উৎসবে শীত সম্পূর্ণতা অর্জন করে। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙলাদেশের দুই একটি বিশেষ অঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই শীত সামান্য; সাধারণ শীতবস্ত্রেও সেই শীত উপভোগ্য,—দেহে-মনে দেয় স্বস্তি ও শক্তি।

শীত

'বসন্ত পঞ্চমীর' দিনে বাঙলায় বাণী-বন্দনা। উহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া সেই মৃদুমন্থর শীত অবশেষে বসন্তের হাতে তাহার সমস্ত আশা সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া দিয়া যায়। ঋতুরাজ বসন্তের এবার রাজ্যাভিষেক আম্রমঞ্জরীতে। দেখিতে না দেখিতে সকল গাছের শূন্য শাখায় 'প্রাণশিখার মত' নব কিশলয়ের উদ্গম হয়। পুষ্পাভরণে নবকিশোরী পৃথিবী সাজিতে বসে। বাতাস ঘুরিয়া উতলা হইয়া উঠিতে থাকে। কোথা হইতে কোকিলের ডাক শোনা যায়। তারপর আরও অনেক পাখির বন-ভরা অদ্ভুত ঝঙ্কার। চিরদিনের কবি-কল্পনা যখন বসন্তের স্তোত্র রচনা করিতে থাকে তখন অবশ্য ভুলিয়া যায় জীবাণুবাহী পীড়াও এই বসন্তেরই সহচর। স্বল্পস্থায়ী বাঙলার বসন্তের সেই অভিশাপ দূর করিবার জন্যই যেন চৈত্র পড়িতে না পড়িতেই আসিয়া যায় অনাগত গ্রীষ্মের রৌদ্রভরা আভাস। বর্ষা-বিদায়ের আয়োজন করিতে করিতে গ্রীষ্মের উত্তাপের জন্য আবার বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হয়—নূতন বৎসরের আশা বুকে লইয়া।

বসন্ত

এই বাঙালীর ঋতুচক্র—এই তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমনি করিয়া ঋতুর পর ঋতু যুগের পর যুগ আসিতেছে। সৌরমণ্ডলের যাত্রাপথে সূর্যালোকের ধারায় স্নাতা এই পৃথিবী কখনো আলোকোদ্ভাসিতা যুবতী, কখনো ক্লান্ত দেহ শুভ্রকেশী তাপসী, আবার শীতান্তের বসন্তাগমে পুনরুজ্জীবিতা চপলা কিশোরী। এই

উপসংহার

ঋতুচক্র লইয়া মানুষের আদিম চেতনা নানা দেবদেবী ও নর-নারীর পুনরুজ্জীবনের কাহিনী সৃষ্টি করিত। কিন্তু শীত বা গ্রীষ্ম, কোনো ঋতুই সম্ভবত বাঙলার নিজস্ব প্রকৃতির সার্থক পরিবেশ নয়। বাঙলার প্রকৃতি বসন্তে ঐশ্বর্যময় বটে, কিন্তু বিশিষ্টা নন। তিনি আত্মপ্রকাশ করেন বর্ষার সজল অভিষেকে শ্যামল শ্রীতে, আর শরতের শুভ্র মেঘ-খচিত শারদ-লাবণ্যে। বাঙলার ঋতুচক্রে এই দুইটি ঋতুরই তাই মর্যাদা বিশেষ প্রাপ্য।

[মন্তব্য : সূচনায় যে বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকু উত্থাপিত করা হয়েছে তা শুধু এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মূল কথাটি বোঝাবার জন্য। এই 'তত্ত্ব' অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, তবে জ্ঞান-লব্ধ, তা বাদ দিয়েও রচনাটি আরম্ভ করা যেত। এ-রচনার আসল কথা—ছয় ঋতু, তা কি-কি, তার বিশিষ্ট পরিচয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক পরিবর্তনে। সেই সঙ্গে এক আধটুকু উল্লেখ করা—মানুষ জীবনযাত্রায় কি ভাবে প্রত্যেকটি ঋতুকে স্বীকার করে নিয়েছে—উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়ে বা কর্মযোগের সূত্রে। সব কয়টি ঋতুর কথা সেরূপ বিশদ করে একটি রচনায় বলা অসম্ভব। তাই শুধু প্রত্যেকের প্রধান লক্ষণটি উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ। এক একটি বিশেষ ঋতুর-বর্ণনায় বিশদ করে সে ঋতুর কথা বলা যায়।]

॥ বসন্ত ॥

(প্রবন্ধ সংকেত)

সূচনা — সূর্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যে পৃথিবী দূরে সরিয়া গিয়াছিল আবার সে সূর্যের নিকটবর্তী হইতেছে।

বসন্তের সমাগম — প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জীবনে নব-সূচনা, প্রাণী জগতে সাড়া, 'দক্ষিণ হাওয়া পথিক হাওয়ার' ডাক; তরু-লতাপাতায় প্রথম প্রাণ সঞ্চার, নব কিশলয়ের উদ্‌গম, চূত-মুকুলের প্রকাশ, চেতনাচেতন জীবনে শিহরণ,—কোকিলের কূজন,—এই প্রাণ চাঞ্চল্যে মানুষের সুর মিলানোর চেষ্টাই 'বসন্ত পঞ্চমী'।

বসন্তের আত্মপ্রকাশ — বসন্তের আত্মপ্রকাশ—পত্রে পুষ্পে, অশোকে-পলাশে, 'দখিন হাওয়ায় উতল হাওয়ায়', ভ্রমর গুঞ্জনে, কোকিল-কূজনে। মানুষের জগতে বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় প্রাণোচ্ছ্বাস। বসন্তোৎসব, মদনোৎসব, হোলি, দোল—'সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'—ইহাতেই এই অনুভূতিরই প্রকাশ। মধুঋতুর সঙ্গে হাত মিলাইয়া স্বভাবতই আসেন বসন্ত সখা মদন ও রতি—বসন্তের আত্মপ্রকাশ যেন জীবনের

আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির ছন্দে মানুষ আপনিই ছন্দ মিলাইয়া লয়। অবশ্য নানা বিরোধী জীবাণুও সক্রিয় হইয়া উঠে, তাহাকেও নির্জিত করিতে হয়। তবু প্রাণোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া মানুষ আপনাকেই প্রকাশিত করে। আর সেই সূত্রে আপনাকে উপলব্ধি করে কামনায়, উল্লাসে, তেজে, শক্তির স্ফুরণে। ইহাই মূল সত্য।

বসন্তের বিদায়—গ্রীষ্মের আবির্ভাব : গ্রীষ্মপ্রধান দেশের 'গ্রীষ্ম' দুঃসহ, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মই জীবন-স্ফূর্তির প্রশস্ত কাল। সেই সব দেশের গ্রীষ্মে জ্বালা নাই, দাহ নাই, আছে প্রাণস্ফূর্তি। তাহাদের 'সামার' আমাদের বসন্তেরই নামান্তর।

বসন্তের বিদায়

ঋতুচক্র প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে ছন্দ রাখিয়াই প্রাণের প্রকাশ। প্রাণিজগৎ সেই ঋতুচক্রের ছন্দে বাঁধা। মানুষও তাহাই; তবে মানুষ সেই ছন্দকে সচেতন ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই অভিজ্ঞতাকে আপনার স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া আপনার শক্তিকে সমৃদ্ধ করিতে পারে; এবং আধুনিক কালে শীতাতপ কতকটা আপন চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রতিটি ঋতুকেই সার্থক করিতে পারে।

উপসংহার

[কিছু সংকেত দেওয়া হল—তা বিস্তারিত করা যায়। বলা বাহুল্য, ভাব-সংকেত সামান্যই দেওয়া সম্ভব—প্রাকৃতিক বর্ণনা, প্রাণিজগতের বর্ণনা ও শেষে মদনোৎসব থেকে হোলি পর্যন্ত মানুষের বসন্তোৎসবের বর্ণনা ছাড়া এরূপ রচনায় অন্য কিছু লিখবার নেই। তবে এরূপ রচনায় কল্পনা ও রসসৃষ্টির অফুরন্ত অবসর—কালিদাসের কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পর্যন্ত পড়ে নিলে তার অনেক কিছু প্রয়োগ করা সহজ। অবশ্য তার পূর্বে চাই লিখবার শক্তি আয়ত্ত করা। ভাষাবোধ, রীতিবোধ সুস্থির হলেই শব্দ-সম্পদে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। অনেক লেখকই এরূপ রচনায় তা করেছেন, সে সবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

॥ শরৎ ॥

যে কবিই বর্ষাকে যত স্তব-স্তুতি করুন, আর যে মানুষই বর্ষার ঘনান্ধকার মন্থর দিনরজনী যত অলস আনন্দে যাপন করিয়া পরিতৃপ্তি বোধ করুন,

সূচনা

বাঙলাদেশে কোন এক সময়ে সকলেই অনুভব করিবেন—একবার সূর্যের মুখ না দেখিলে আর জীবন কাটে না ; কিছু কালের মত এখন ক্ষান্ত হউক এই বর্ষণ, নির্মল আকাশের সঙ্গে আবার পরিচয় ঘটুক। বাঙালির মনের এই সুস্থ কামনাই যেন মূর্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ায় শরৎকালে।

বর্ষণক্লান্ত মেঘের ভার এক সময়ে কাটিতে আরম্ভ করে, মেঘ ও রৌদ্রে চলে তখন শিকার। এই একখানা খণ্ড মেঘ দেখিতে না দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া এক পশলা বৃষ্টিতে সকলকে ব্যস্ত চমকিত করিয়া গেল। সে যাইতে

শরতের আগমনঃ প্রাকৃতিক বর্ণনা

না যাইতে তাহার পিছনে তাড়া করিয়া আসিল মেঘমুক্ত আকাশের নির্মল শুভ্র-সূর্যকর—গাছের পাতা হইতে, পৃথিবীর মুখ হইতে শেষ জলরেখা মুছিয়া লইয়া হাসি ফুটাইয়া তুলিবে। শরতের প্রথম আভাস এইরূপ। তারপর আরও দ্রুত, আরও ত্বরিত সেই খেলা। পলায়মান একটি মেঘের খণ্ড হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া যেন চুরি করিয়াই পৃথিবীকে একটু ভিজাইয়া যাইবে। কিন্তু সেই সুযোগ তাহার মিলিল কই? হৈ হৈ করিয়া দুর্দান্ত বালকের মত ছুটিয়া আসিল আকাশের রৌদ্র। হাসিতে ফাটিয়া পড়িল আকাশ—পৃথিবীর গায় একটু জলের দাগ পড়িতে না পড়িতেই তাহা মুছিয়া লইল। এমনি করিয়াই মেঘ ও বৃষ্টির খেলা শেষ করিয়া শরৎঋতু আসে বাঙলায়। নীল আকাশের প্রসারিত বক্ষে শুভ্র মেঘের খণ্ড দ্রুত বাতাসে উড়িয়া আসে, নিশ্চিন্ত আলস্যে ভাসিতে থাকে। দুই হাত ভরিয়া তাহার সোনার আলোর অঞ্জলী—শরৎ পল্লীর মাঠে ঘাটে, ক্ষেতে, সুচিক্কণ তৃণদলে, তরঙ্গিত ধান্যশীর্ষে, সুশ্যামল তরুলতার মাথায় ছড়াইয়া দিতেছে। নগরে প্রান্তরে—মানুষের চোখে, মানুষের মুখে তাহার আভা ফুটিয়া উঠে। নদীতীরের কাশ ফুলের শুভ্র হাসি আর সোনালি রৌদ্রের চমক এক সঙ্গে মিশিয়া যায়। কূলভরা নদীর ক্ষুরধার স্রোতের উপর ঝলকিয়া উঠিতে থাকে হাজার মাণিকের ছটা। রাত্রিতে নির্মেঘ আকাশের সমস্ত নীলের উপর রজত-ধারা ঢালিয়া দেখা দিবে শারদীয় চন্দ্রমা। 'এমন রাত্রিতেই' বুঝি ছায়াপথ ধরিয়া দেবকন্যারা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে চান—মানুষের ঘরে মানুষের কল্পনায় রূপ-লাভ করিবার সাধ লইয়া। রাত্রি ভরিয়া শেফালি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; কুমুদ-কহ্লার শুভ প্রভাতের সম্ভাষণ জানাইবে। পদ্মের সঙ্গে হৃদয় মেলিয়া দিবে বাঙালার

পল্লী প্রকৃতি; উহার উপর তাঁহার শুভ্র পা দুখানি রাখিয়া দাঁড়াইবেন শারদলক্ষ্মী।

স্নেহমেদুর মমতায় যেন পৃথিবীর মাতৃ-হৃদয় আপনাকে মেলিয়া দিতে চায়। সজল বাতাসই যেন বহিয়া আনে—প্রতি প্রভাতের আলোই যেন জানাইয়া দেয়—জগন্মাতার আগমনীর আভাস। বাঙলার ঘরে ঘরে দিন গণনা আরম্ভ হয়। হিসাবের কড়ি কুড়াইয়া, জমাইয়া, যে করিয়াই হোক্ শারদীয় উৎসবের আনন্দে অংশ লইতে হইবে। ব্যবসায়ী নৌকা তখন পণ্যভার গঞ্জে পৌঁছাইয়া দিয়াছে; শহরের পথে পথে ভিড় বাড়িতেছে; দোকানে-বাজারে সমারোহ। গাড়ি ছুটিয়াছে, মোটর লরী ও বাস প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত।

শারদীয় উৎসব

অবকাশ উদযাপনের নব-নব আহ্বান লইয়া ভ্রমণেচ্ছুদের কুতূহলী মনকে সকলে মিলিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া লইতে উদ্যোগী। 'দেশের বাড়িতে চলুন—যেখানে বাঙলার শারদলক্ষ্মী এখনো চিরদিনের মতো' আশীর্বাদ লইয়া অপেক্ষমাণ'! 'চলুন পাহাড়ে—দার্জিলিঙে, মুসৌরিতে, কিম্বা সিমলা, নৈনিতালে—সৌভাগ্য যেখানে দরিদ্রের সর্ব স্পর্শ মুক্ত হইয়া নব-নব চিত্ত-চমৎকারী উদ্যোগে আপনাকে এই দুর্ভাগ্যের দেশেও দুর্ভাগ্য ভুলাইয়া দিবে'! 'আসুন রাঙা মাটির দেশে—দেওঘর, ঘাটশিলা, হাজারিবাগ, রাঁচিতে—মুক্ত প্রান্তরে যেখানে পাইবেন মুক্তির আস্বাদন।' কিম্বা, 'কোথায় যাইবেন? কলিকাতায় আসুন। দেখিবেন পাড়ায় পাড়ায় মহোৎসব, সার্বজনীনের উদ্দীপনা। ষড়ৈশ্বর্যময় দুর্গোৎসব।' পরস্পরে পাল্লা দিয়া আলোকবিলাসের, মণ্ডপসজ্জার, জাতীয় প্রদর্শনী ও প্রতিমার নব নব ভঙ্গী উদ্ভাবনার বিচিত্র প্রচেষ্টা। উৎসাহ যেন সময়ে সময়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন।

ভ্রমণের দিন

কিন্তু যেখানেই যিনি যান—পূজা বাঙালীর পক্ষে পূজাই। সেই দিন সেইখানে তিনি বাঙলার সেই শারদীয় পূজার স্বপ্ন না দেখিয়া পারিবেন না। তারপর, বিজয়া আসিবে। পরম কল্যাণের মন্ত্র, নিখিল শান্তি ও নির্মল সৌহার্দ্যের বাণীকে একবারের মত আমরা বাঙালি জীবনে স্বীকার করিয়া লইব। সেই চেতনায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার জন্য প্রস্তুত হইব। ধীরে ধীরে শান্ত উৎসাহে প্রস্তুত হইব শ্যামাপূজার ও দীপান্বিতার জন্য।

উৎসব শেষ

ততক্ষণে দেখিব চারিদিকে যেন একটু একটু হিমের হাওয়ার স্পর্শ লাগিতেছে। আকাশে যেন ক্ষীণ একটু কুয়াশার ছায়া। ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় যেন রাত্রির শিশিরাশ্রুর কণা টলমল। এসব দেখিব আর বুঝিব—এবার কাশের গুচ্ছ বাঁধিয়া, শেফালির মালা গাঁথিয়া, 'নবীন ধানের মঞ্জরীতে ডালা সাজাইয়া'

উপসংহার

শারদলক্ষ্মী আপনার স্থলে অভিষিক্ত করিয়া যাইবেন হেমন্তকে—প্রশান্ত প্রাচুর্যকে, নিরুদ্বেল সুস্থিরতাকে। হেমন্তের হাত দিয়া যেন শরতেরই শেষ আশীর্বাদ পৌঁছিবে বাঙলার গৃহে গৃহে।

বাঙালির জীবনে বসন্তের পুষ্পরাগ-রক্তিম সমারোহ সামান্য নয়। কিন্তু শরৎই বাঙলার বিশেষ রূপ—এই ঋতুটির সঙ্গে যেন বাঙালির প্রকৃতি আপনাকে এক করিয়া দেখে। প্রকৃতির শ্যাম সজল এই সমারোহের সঙ্গে বাঙালি আপনার আশা আনন্দ, উৎসব-সৌন্দর্যকে মিশাইয়া প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইতে পারিয়াছে।

।। একটি বর্ষার দিন ।।

'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন-ঘোর বরিষায়'—কী যে বলা যায়, তা কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না। হয়ত কবি না হলে বর্ষার দিনের কথা বোঝা সম্ভব নয়। রাত্রি থেকেই বৃষ্টি চলছে। সকালে সূর্যের মুখ দেখবার আশা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। ঘোলাটে একটা পাংশু রঙের আকাশ,—বৃষ্টি থামেনি, ভিজে বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে আসছে। কবিরা হয়ত বলবেন 'বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে—একতারা—আ—আ।' কিন্তু এই শহরের বুকে বসে তা বলবার উপায় নেই।

সূচনা

পল্লীবাসী হলে হয়ত পল্লীগ্রামে তেমন কোন বাউলকে আবিষ্কার করা যেতে পারত। মানতেও পারা যেত—'পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নুপুর মধুর বাজে'। কিম্বা রাত্রির সেই 'রিম ঝিম' শব্দের স্মৃতি একটু নেশা সৃষ্টি করত দিনের বেলাও। নিশ্চয়ই কোথাও কদম্ব কেয়া ফুটে থাকবে। খালে, বিলে, জলাশয়, পথের ধারের জলপ্রণালীতে এখানে-ওখানে কুমুদ-কহ্লার ফুটেছে নিশ্চয়। বাঙলা দেশে এখনো এসব গাছ লতা জন্মে, ফুল ফোটে। আর 'মত্ত দাদুরীর' ডাক গ্রামবাসীরা শুনতে পায়। ক্ষেত-ভরা জল, বৃষ্টির ছাঁট, চাষীর প্রাণভরা আগ্রহ,

পল্লীবর্ষা

নদীর জলে নতুন ধার, নতুন তেজ,—এ সবই এই বাদলার দিনে বাঙলার গ্রামে আজ পাওয়া যাবে। কিন্তু কবি না ⁄ ়ল গৃহবন্দী সেই পল্লীবাসীরা কতটা এই দিনটি উপভোগ করতে পারছেন, তা জানি না। কারণ, সকলেরই বিষয়কর্ম আছে। অধিকাংশেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা জীবিকার প্রশ্ন জটিল, ঘরে বসে থাকবার জো নেই। এমন কি, প্রেমিক প্রেমিকারও উপায় নেই—'দিন যাপনের প্রাণ-ধারণের' দাবিকে অগ্রাহ্য করবে। প্রয়োজনের তাগিদে বের হতে গেলেই বেরুতে হবে নিষ্পাদুকপদে; আধভেজা জামা কাপড় পরে ও জুতো ও ছাতা হাতে নিয়ে। তারপর সেই ছাতায় বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে, পথের কাদা ভেঙে, মাঠের জল পেরিয়ে চলতে চলতে বাঙলার বর্ষা উপভোগ করা,—এই শুধু থাকে বাকী। ওদিকে সকালে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গৃহকর্ম আরম্ভ করবেন গৃহিণী। ভেজা কাঠে বা ভেজা ঘুঁটেতে উনুন ধরানো, বাড়ীঘর মোছা, ঘাট থেকে পিছল পথে জল নিয়ে ফেরা, একঘেয়ে 'থোড় বড়ি খাড়া-খাড়া বড়ি থোড়' রান্নায় বসে যাওয়া—হয়ত তাও আধ ভেজা শাড়িতে। আসলে গৃহকর্তাই হোন গৃহিনীই হোন, গ্রামবাসী কয়জনার পক্ষে এই বর্ষার দিন উপভোগ্য হতে পারে? দু' একজন আরাম-পিয়াসী যদি বা বর্ষা সমাগমে দুই একদিন 'পালঙ্কে শুইয়া রঙ্গে নিদ্রা যান মনের হরিষে'—এই বহু-পরিচিত বর্ষায় সে সাধ তারও আর নেই—বর্ষার দিন তারও আর কাটে না।

শহরে,—কোলকাতার কর্মমুখর জীবনে,তেমন আরাম যাদের আরও হতে পারে তারা সংখ্যায় হযত কম নয়। আর মোটর সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল, রেস্টুরেণ্ট, ক্যাবারে সুদ্ধ তাদের নর্ম-বিধানের আয়োজনগুলোও তুচ্ছ নয়। কিন্তু সত্যই প্রথম বর্ষার শেষে ক'দিন বর্ষা তাদেরও নিকট উপভোগ্য থাকে? প্রথম বর্ষাই উপভোগ্য। গ্রীষ্মান্তে প্রথম যখন দিগন্তব্যাপী শ্যাম-সমারোহ নিয়ে আষাঢ়ের মেঘ কোলকাতার আকাশে দেখা দেয়, সেই আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে সত্যই কবিদের হৃদয় নেচে ওঠে,—'ময়ূরের মতই নাচে'। সাধারণ মানুষেরও মনে সে সময়ে আশা জাগে; চোখে স্বপ্ন না নামুক, আনন্দের ছায়া পড়ে; মন সরস প্রতিশ্রুতির সন্ধান পায়। গুরু গুরু গর্জনের ও প্রবল বারিপতনের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র হাঁকিয়া ওঠে—প্রথম বর্ষার সে একটা বহু অপেক্ষিত অভিজ্ঞতা। কারণ, এই কলকাতা শহরে ইঁট কাঠের পাষাণকারার মধ্যে গ্রীষ্ম ছাড়াও প্রকৃতির আর যে কোনো রূপ আছে তা'ই প্রায় এতদিন ভুলে যেতে হয়েছিল। তাই কলকাতার পক্ষে প্রথম বর্ষাকে অভিনন্দন না করা অস্বাভাবিক।

শহরে প্রথম বর্ষার অভিনন্দন

কিন্তু এই কলকাতায়ও তার পরে যখন বর্ষা জমে বস্‌ল, আষাঢ়ের বর্ষণ আর ফুরোয় না, সূর্য যে কবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন, তা আর মনে পড়ে না—তখন এমনি বর্ষার দিনকে অভিনন্দন করতে পারে—নিতান্ত কবি ছাড়া বা কবিদের সহায়তা ছাড়া—কে, কোন পথে ?

বর্ষার একঘেয়েমি

সারা রাত্রি বৃষ্টি হয়েছে। মুষল ধারে না হোক, বারে বারে নিদ্রার ফাঁকে তা টের পেয়েছি। সন্দেহ হয়েছে বন্ধ জানালার ফাঁকে জল গড়িয়ে ঘরের মেঝেয় আসছে বুঝি। প্রভাতে মেঘের ভার বেশি নেই, কিন্তু বৃষ্টি চল্‌ছে। সে শুধু প্রকৃতির ছলনা। ভিজে ভিজে বাজারে বেরুবার আয়োজন করতে না-করতেই আকাশ আরোও কালো হযে উঠলো। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ সজলতা বৃদ্ধি পেল। তারপর প্রবল স্বননে এল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা, ভেজা ইট-পাথরের গায়েও যেন শরাঘাতের শব্দ উঠ্‌ছে। আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। ছাদের জল সরোষে লাফিয়ে পড়লো উঠোনে ও পথের ওপর। দেখতে না দেখতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধারার সৃষ্টি করে ছুট্‌ল পথের দিকে। চারিদিকের আকাশ ও পৃথিবী শ্বেত আচ্ছাদনে ঝাপসা হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পৃথিবীতে আর কোন সত্য নেই—এই বর্ষণমুখর প্রভাতটি ছাড়া। তারপরে বৃষ্টির তেজ প্রশমিত হতে লাগল, পনের মিনিট পরে একটু অন্ধকার কাটল, কিন্তু তখনো বৃষ্টি একেবারে ধরে নি, বর্ষণ একেবারে ক্ষান্ত হল না। সমস্ত দিনেও যে ক্ষান্ত হবে আকাশের রঙ্‌ দেখে তা মনে হল না। সত্যই আজ বর্ষার দিন।

বর্ষার দিন

কলকাতার রাস্তায় শুধু জল জমেছে বলে লাভ নেই, এতক্ষণে নৌকা চলেছে বললেও হয়ত মিথ্যা হত না। দু' এক স্থানে ফুটপাত জেগে আছে এবং বর্ষণধৌত কালো টারের পথও জলনির্মুক্ত। কিন্তু কলকাতার অর্ধাংশ যে এক কোমর জলে বা এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে নিশ্চল, নিরুপায়, তাতে সন্দেহ নেই।

বর্ষার প্রকোপ

পথচারী যারা বৃষ্টির সময়ে গাড়ি-বারান্দায়, দোকানের আচ্ছাদনে ও অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছিল এবার তাদের পথচলার বিড়ম্বনা। ট্রাম বন্ধ হয়েছে, বাস অধিকাংশ নিশ্চল, মোটর ট্যাক্সি হয় জল-বন্দী, না হয় আত্মরক্ষায় নিরুদ্দেশ। কদাচিৎ আশার স্বপ্ন-ধ্বনির মত রিক্‌শার ঠুং ঠুং শোনা যায়। কিন্তু সে আশার ধ্বনি এগিয়ে আর আসে না,—পথিমধ্যেই কেউ হয়ত গাড়ির সওয়ারী হয়ে বসেছে। জুতো খুলে, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে, কাছা-বাঁচাতে গিয়ে কোঁচা ভিজিয়ে বা জামার আস্তিন জলনিষিক্ত করে যাঁরা চললেন—বর্ষা উপভোগ করবার মত অবস্থা তাঁদের নয়। হয়ত তাঁরা মনে মনে

চাইবেন—একবার যদি পুলিশের কালো গাড়িটা আসত আর তাঁদের গ্রেফতার করে তুলে নিত। কিম্বা আসত 'হিন্দু সৎকার সমিতির' বড় গাড়িটা, —আর তাঁরা হতে পারতেন তার যাত্রী—অবশ্য সাময়িকভাবে। কিন্তু সত্যিই যদি তেমন কোন বড় মালবাহী লরী বা যাত্রীবাহী বাস এসে পড়ে তা হলে এই পথচারীদের তখন বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না। ঢেউ তুলে সে গাড়ী এগিয়ে যাবে; আর ঢেউ-এর আঘাত ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে লাগবে গিয়ে দুপারের বাড়ির সিঁড়িতে—দেয়ালে। আর পথচারী যখন সে দৃশ্য দেখছেন ততক্ষণে তাঁর সতর্ক-সাম্‌লানো জামা-কাপড় ছাপিয়ে সে ঢেউ ধুয়ে দেবে তাঁকে কোমর পর্যন্ত।

সকাল বেলা এ বৃষ্টির শেষে আপিসের বাস যখন বেরুবে তার বহু-পূর্বেই আাপসের যাত্রীরা এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বীপের মত পথের এক একটি উঁচু ঘাটিতে। বাস আসে না, এলেও তাতে উঠতে পারার আশা নেই; সে চেষ্টায় ভেজা জুতো আরও খানিকটা ভিজবে, আরও খানিকটা দশ জন যাত্রীর হুড়োহুড়িতে আপিসের জামা-কাপড়ে জল-কাদার দাগ লাগবে। ট্রাউজারে-ধুতিতে, স্যুটে-পা-জামায়, শাড়িতে-ব্লাউজে—সবই তখন একদর। কেউ কারো তোয়াকা রাখে না, পরোয়া করে না। 'লেডিজ ফার্স্ট' নয়, 'সেলফ ফার্ষ্ট',—এই সনাতন, আদিম 'অরণ্যনীতিই' একটি ঘণ্টার বৃষ্টিতে কলকাতার যাত্রী-সমাজে এখন চেপে বসেছে।

বেলা বাড়বে—এরই মধ্যে কেউ যুদ্ধশ্রান্ত সেনানীর মত স্কুলে আপিসে দর্শন দিয়ে হাজিরা সই করবেন। আরও ঘণ্টা খানেক কোলাহল চিৎকারের মধ্যে আলোচনা চলবে—কার পাড়ায় কত জল, এবং আজকে অপরাহ্নে মোহনবাগানের খেলাটা হবে কি হবে না, হলে তা মাটি হবে, ইত্যাদি। তারপর 'এমন বৃষ্টির দিনে' বাড়ি ফেরার কথাই চিন্তনীয়, আলোচ্য এবং প্রধান কর্তব্য। অবশ্য তারও পূর্বে জল নামা প্রয়োজন, বাসে-চলা সম্ভাব্য হওয়া চাই এবং আপিসে যখন আসা গিয়েছে তখন এক-আধটা চিঠি-পত্র দেখা, লেখা, এসবও না করলে নয়।

অবশ্য কলকাতার সকল মানুষকে অত নির্বোধ মনে করবারও কারণ নেই। বৃষ্টির জোর দেখে বুদ্ধিমান লোকেরা কেউ কেউ বুঝেছেন—শত চেষ্টা করলেও বিকেলের দিকে ছাড়া ট্রাম-বাস চলাচল স্বাভাবিক হবে না। অতএব, কেউ কেউ আপিসের ভাবনা ছেড়ে দিলেন। আহারান্তে বৃষ্টির দিনটি ঠিকমত উপভোগ করবার আয়োজন করলেন—অর্থাৎ শয্যার শরণ নিলেন। সব বুদ্ধিমান লোক অত আরামপ্রিয় নয়। অবস্থা বুঝে তাঁরা কেউ-কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার নিকটবর্তী আড্ডায় তাস নিয়ে বসে গিয়েছেন—এমন বৃষ্টির দিনটা বৃথা নষ্ট করা যায় না।

কিন্তু দিন-মজুরির মানুষের, কিম্বা ফেরিওয়ালার বা ছোট দোকানী-পশারীর পক্ষে উপায় নেই। [illegible] করে হোক দিনের রুটি তাদের জোগাড় করতেই হবে। পথের জলে তাদের অসুবিধা নেই, বাড়িতেই বা এমন কি আরাম? কলকাতার অর্ধেক মেহনতী সাধারণ মানুষ বস্তিতে থাকে। বস্তির অবস্থা বলা সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও শোভন নয়। এমনিতেই তা বাসের অযোগ্য। বর্ষার দিনে আশ্রয়েরও অযোগ্য—ঘরের মধ্যে অন্ধকার চিরস্থায়ী। বৃষ্টিতে নানা ধরনের ছাদের ফাঁকে বা ফুটোয় ভিতরে জল পড়ে। নিচু বস্তিতে জল স্থায়িভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বর্ষণ বেশী হলেই পৃথিবীর যত আবর্জনা নিয়ে বৃষ্টির জল বস্তির গলি ছাড়িয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। যত সহজে ও তাড়াতাড়ি আসে তত সহজে তা ঘর ছেড়ে নেমে যায় না। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের গলির অভ্যন্তরের পাকা বাড়িতেই কি দুর্দশা কম? সেঁৎসেঁতে মেঝেতে যেন পা ফেলতে মন সরে না। গৃহিণীরা ভেজা কাপড় নিয়ে বিব্রত—কোথায় টাঙিয়ে দেবেন। ঘরগুলো তার বেষ্টনীতে খণ্ড খণ্ড দুর্গ হয়ে ওঠে। কোনোরূপে ভিজে ঘুঁটে ও কয়লায় রান্না নামিয়ে দু-মুঠো ভাত ডাল স্বামী পুত্রকন্যার পাতে দিতে দিতে, তথাপি তাঁরা আঁচ করতে থাকেন—এবেলা না-হলে ওবেলা খিচুড়ি করা যাক। একটু ইলিশ মাছ জোগাড় হবে না?

বস্তির দুর্দশা

হ্যাঁ, সত্যই, সুখস্বপ্নও আছে—তা কবি-কল্পনা নয়। গরম গরম খিচুড়ি আর তার সঙ্গে এই বর্ষার দিনে মাছ-ভাজা—বাঙালী জীবনের এই দিনে তা কি তুচ্ছ স্বপ্ন? ফুটবলের মাঠেও সেই সঙ্গে ভিড় হবে—যদি খেলা হয়। আর ট্রাম-বাস মুখরিত করে ভেজা কাপড়ে সেই খেলার গল্প করতে করতে গৃহে ফিরবেন হাজার হাজার বালক-যুবক-বৃদ্ধ। কিন্তু খেলা এমন বৃষ্টির দিনে সম্ভবত হবে না। দু'চারজন হয়ত এরই মধ্যে গঙ্গার ধারে ঘুরবেন গঙ্গার ইলিশের আশায়—এও কি কম বিলাস? অবশ্য মহানগরীর সকলের দৃষ্টি অত সামান্য বস্তুতেই সীমাবদ্ধ নয়। কেউ ফিল্‌ম্-এ যাবেন। হোটেলের ডাইনিং হলে খেয়ে এমন দিনটি সঙ্গীতে-নৃত্যে উপভোগ করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবেন ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীরা। সেখানে আলো, গান, সুস্বাদু খাদ্য-পেয়, ফল, পানীয়, কিছুরই অভাব নেই।

আষাঢ়ের সান্ত্বনা

কে বলে কলকাতার বর্ষা হাস্যলাস্য-হীন ম্লানমুখী, শ্লথমন্থর-গতি? কলকাতা শত হলেও ইন্দ্রপুরী। ক্লাব-ক্যাবারে—সঙ্গীত-নৃত্যে এই বর্ষা উদ্‌যাপন যদি সামর্থ্যের অতীত হয়, তা হলেও ঘরের ডাল-চালে যখন গৃহিণী খিচুড়ি ও ডিমভাজার ব্যবস্থা করছেন—ততক্ষণ না হয় একবার রবীন্দ্রনাথই

খুলে বসবেন কোনও বর্ষাবিরক্ত শিক্ষক বা ছাত্র বা সাংবাদিক বা কর্মচারী—আর পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতেই গুঞ্জরণ করবেন—

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়—'
—কী সেই বর্ষার দিনের কথাটি ?

[মন্তব্য : এ রচনাটি আমরা চলতি ভাষায় লিখলাম কেন ? প্রথমতঃ, সাধুভাষায় লেখা আয়ত্ত হলে পর চলতি ভাষায় লেখাও অভ্যাস করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, কোনো বিশেষ বিষয় চলতি ভাষাতে লেখাই সুবিধাজনক—যদিও সরল সাধুভাষায়ও তা লেখা না চলে তা নয়। তেমন বিশেষ বিষয় এটি। কি করে ? 'একটি বর্ষার দিন'—এ কথার 'একটি' শব্দটি থেকে বোঝা যায়, বিশেষ একটি বর্ষার দিনের বর্ণনা, এবং সেদিনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বর্ণনাই অভিপ্রেত। এরূপ অভিজ্ঞতা বর্ণনার বেলা চলতি ভাষায় বর্ণনা সজীব হয়। তারপর দৃষ্টিভঙ্গী যদি লঘু হয় তা হলে চলতি ভাষাতেই তা ব্যক্ত করা আরও সহজ। এই দু'কারণে চলতি ভাষার একটি রচনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

দৃষ্টিভঙ্গী যে লঘু তা রচনার সূচনাতেই বোঝা যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই একটি সুপরিচিত প্রেমের ভাবের কবিতাকে লঘুভাবে উত্থাপন করা হয়েছে—তাতে রচনার লঘু মেজাজ সৃষ্টি হল। আর সে কথা দিয়েই রচনাটি শেষ করায় সে ভাবের পরিসমাপ্তিও হল।

শহর গ্রামের নানা দৃশ্য, এবং নানা শ্রেণীর লোকের নানা অবস্থার বিষয়ও ইঙ্গিতে এ রচনাতে উত্থাপন করা হয়েছে। কাজেই একেবারে রঙ্গ-রস সৃষ্টি করাও এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়; করলে ভারসাম্য থাকত না। আর একটি কথা—বহুদিকের দৃশ্য ও অবস্থার ইঙ্গিত আছে; কিন্তু সময়ের অভাব ও স্থানের অভাব হলে লেখককে শুধু তার দু'একটি দিক অবলম্বন করেই রচনা লিখতে হবে—সব দিকের ইঙ্গিত দেওয়াও সম্ভব হবে না। এখানে তা রইল স্মৃতির পুঁজি বাড়াবার জন্য।]

॥ কাগজ ॥

কাগজ না হইলে আজ বোধ হয় সভ্য-জাতিদের একটি দিনও চলে না। অথচ ভাবিয়া অবাক মানিতে হয়—মানুষ সেদিনও কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিত না। তথাপি তখনো তাহার দিন চলিয়াছে—চাষী চাষ করিয়াছে; শিল্পীরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা বস্তু নির্মাণ করিয়াছে; রাজা ও রাজপুরুষেরা রাজ্যশাসন করিয়াছেন; আর জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতেরাও নিজ নিজ চিন্তার দানে মানুষের সভ্যতাকে শুধু বহন করেন নাই, দেশ-দেশান্তরে যুগ-যুগান্তরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে, কাগজ ছাড়াও সভ্যতা চলিতেছিল, কিন্তু কাগজের মত সুপ্রচলিত লেখন-উপাদান আবিষ্কৃত না হইলে সভ্যতার এই বিপুল বিস্তার ব্যাহত হইত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবশ্যকীয় ঐতিহ্যরক্ষাও সহজসাধ্য হইত না।

সূচনা

কাগজ সম্ভবত চীনেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়। তখন 'হান্'-সম্রাটদের রাজত্বকাল। খ্রীষ্টীয় ১০২ অব্দে চাই লুন নামক একজন চীনা রাজপুরুষ গাছের বল্কল্, শন, কাপড়ের টুকরা, এমন কি জাল বুনিবার সূতা—এই সব মিশাইয়া প্রথম লিখিবার মতো কাগজ প্রস্তুত করিলেন। আমাদের দেশে তখন কণিষ্কের বংশধর শক সম্রাটরা রাজত্ব করিতেছেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দার্শনিক ও রাসায়নিক পণ্ডিতবর্গের অভাব নাই। ইউরোপেও তখন রোম সম্রাটদের গৌরবের দিন,—মিশর, সিরিয়া ও সমস্ত ভূমধ্যমণ্ডল লইয়া রোম-সাম্রাজ্যের তখন একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের তো প্রশ্নই উঠে না,—কাগজের ব্যবহারও তখন পর্যন্ত এই দুই সুসভ্য জাতি জানে না। বিদ্যা বলি, রাজকর্মের হিসাব-পত্র বলি, কিছুই এখনকার মত তাহারা কাগজের পিঠে লিখিয়া রাখিতে পারেন না। লেখার পদ্ধতি অবশ্য অনেক পূর্বেই আয়ত্ত হইয়াছে। কিন্তু লেখার যখন সহজ-লভ্য উপকরণ নাই তখন লিখন-বিদ্যার বিস্তারও সহজ নয়, আর লেখার বিদ্যাও তখন সুপ্রচলিত হয় নাই—তাহা বুঝা যায়।

আবিষ্কারের পূর্বে

তথাপি লিখন-পদ্ধতি আরও হাজার দুই তিন বৎসরের অধিক পুরাতন। এক হিসাবে বলা হয় লিখিত বস্তু যেদিন হইতে পাওয়া যায় সেদিন হইতেই প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ উত্তীর্ণ হইয়া সভ্যতা ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করিয়াছে। যুগান্তরের সেই প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতায়—রৌদ্রদগ্ধ অজস্র মাটির টালিতে প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা তাহার হিসাব পত্র, আইন-কানুন, ঘোষণাপত্র প্রভৃতি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এইরূপই প্রাচীনতম অন্য

প্রাচীন লেখ-পত্র

এক প্রয়াস হয় মিশরে—মিশরের নদীতীরের নল-খাগড়া বা শর গাছ চিঁরিয়া মিশরীয়রা লেখ-পত্র প্রস্তুত করেন। সেই নল-খাগড়ার গাছেরই নাম ছিল 'পেপাইরুস', তাহা হইতেই রোমের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাষার 'পেপার' শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ পেপাইরুস্-এর সহিত পরে প্রচলিত হয় মেষ-চর্মে বা 'পার্চমেণ্টে' লেখার পদ্ধতি।

আমাদের দেশের কথা আরও বিচিত্র। মনে হয় ভারতবর্ষে বেদ-বেদাঙ্গ গুরুগৃহে অভ্যাস করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখাই ছিল প্রধান নিয়ম। তারপর লেখা প্রথম চলিত গিরিগাত্রে, প্রস্তর-পৃষ্ঠে;—অশোক অনুশাসনে আমরা তাহার প্রমাণ পাই। ইহার পরে শিলালিপির মতই ছিল তাম্রলিপি,—রাজ্যের স্থায়ী ঘোষণা, দানপত্র, প্রভৃতি তাহাতেই লেখা হইত। তাহা ছাড়া ছিল ভূর্জপত্র। তারপরে আসিল তালপাতার পুঁথির যুগ। আরও শেষে 'তুলোট কাগজ'। এখনো যে তালপাতায় পুঁথিলেখা হয় না, তাহা নয়; তুলোট কাগজও একেবারে উঠিয়া যায় নাই;—কিন্তু কাগজ না হইলে আজ কি করিয়া আমাদের দিন চলিবে তাহা ভাবাই প্রায় অসম্ভব।

ভারতবর্ষ

'কাগজ' শব্দটি অবশ্য আরবী ভাষা হইতে মুসলমান আমলে আমাদের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুপূর্বেই চীন হইতে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কাগজের ব্যবহার শিখিয়া ভারতবর্ষেও তাহা লেখার জন্য প্রবর্তিত করেন। অন্য দিকে, তুর্ক ও আরবীয় সভ্যতার মাধ্যমে চীনের কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী পাশ্চাত্য দেশেও প্রসারিত হয়। তথাপি 'পার্চমেণ্ট' বা চর্মপত্র অনেক দিন পর্যন্ত ইউরোপে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। আবার ইরানে তাহাই 'পোস্তা', আমাদেরও পুস্তক শব্দের রূপ দেয়। কিন্তু কাগজের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, কাগজের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতে থাকে। শেষে শত পাঁচেক বৎসর পূর্বে মুদ্রাযন্ত্রাবিষ্কারের সঙ্গে এদিকে আসিল মহাবিপ্লব। কারণ, তখন আসিল সর্বজনীন লিখন-পঠনের সুযোগ,—কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রে মিলিয়া জ্ঞানকে এখন সর্বজন-লভ্য করিয়া ফেলিয়াছে।

কাগজের আমদানি

হাতে তৈয়ারী কাগজ এখনো আছে বটে, কিন্তু কাগজের কলেই এখন কাগজ সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। তুলোর কাপড়ের মত আঁশযুক্ত জিনিসই এখনো কাগজের প্রধান উপকরণ। উহা জলে ভিজাইয়া পচাইয়া মণ্ড করিয়া পরে সেই মণ্ডকে চাপ দিয়া পাতের আকারে পরিণত করিতে হয়। তাহাতে রজন, ফিটকিরি প্রভৃতি নানা রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত রঙ মিশাইয়া,—এখনো এভাবে হাতে তৈরী কাগজ তৈয়ারী হয়। যেরূপ কষ্টায়ত্ত প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত, তাহাতে হাতে তৈয়ারী কাগজ সুলভ হইতে পারে কিনা সন্দেহ। অবশ্য উৎকৃষ্ট হাতের তৈয়ারী কাগজের চাহিদা আছে, সেজন্য দাম বেশী দিতেও

প্রস্তুতি পদ্ধতি

শৌখিন লোকেরা আপত্তি করে না। তবে কলেই এখন কাগজ সাধারণতঃ তৈয়ারী হয়। আমাদের দেশে 'সাবাই' নামক ঘাস, ও বাঁশ, পুরাতন ন্যাকড়া প্রভৃতি হইতে কলের কাগজ উৎপন্ন হয়। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ সুইডেন, কানাডায় কাগজের মূল উপকরণ এক জাতীয় গাছ—উহার বিরাট বন সেই সব দেশের মাটিজলে সুসম্ভব। সেই গাছ চিরিয়া গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া জলে ভিজাইয়া মণ্ড তৈয়ারী করা হয়; তারপর ব্লিচিং পাউডার ও আধুনিকতম নানাবিধ রাসায়নিকের প্রয়োগে এইসব নানাবিধ কাগজ উৎপন্ন হয়। মূলের প্রাচীন প্রক্রিয়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রমশঃ শোধিত হইয়াছে।

শুধু যেমন-তেমন লিখিবার কাগজে এখন আর এই মহৈশ্বর্যময় সভ্যতার চাহিদা পূরণ করা যায় না। লিখিবার কাগজ স্থায়ী হোক, উৎকৃষ্ট হোক, ইহা তো নিশ্চয়ই প্রথম প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্রের মাপ ও দাপট বুঝিয়া তাহা নানা আকৃতির ও নানা প্রকৃতির হইবে, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা ছাড়া লেখার হোক ছাপার হোক, কাগজ সুন্দর হইবে, মসৃণ হইবে, চমৎকার শাদা হইবে,—ইহাই বা কে না চায়? কেহ কেহ চাহিবে—পার্চমেন্টের মত মোটা হোক, তুলট কাগজের মত উহার কৃত্রিম-অমসৃণতা থাকুক। কেহ চাহিবে মলাটের জন্য মোটা কাগজ, বা ডোরা-কাটা নানা ডিজাইনের কাগজ, কিম্বা পীসবোর্ড। কেহ বলিবে—ছবি ছাপার মোটা মসৃণ কাগজ চাই। আবার, চাই সস্তায় মুদ্রনের জন্য খবরের কাগজের কাগজ বা নিউজ্‌প্রিন্ট্‌। ইহার পরেও আবার কেহ চাহিবে মাল প্যাক্ করিবার মোড়কের কাগজ, কেহ চাহিবে বাক্‌স তৈয়ারী করিবার পেস্ট বোর্ড। এইখানেই কি শেষ? ফুরফুরে কাগজে ঘুড়ি উড়াইব, রঙীন কাগজে ঘর সাজাইব, ফুল বানাইব, কাঁচি কাটিয়া কাগজের মূর্তি বানাইব, এমন কি, খাবার টেবিলে ন্যাপকিনের মতই হাত মুখ মুছিয়া ফেলিয়া দিব—চাই এরূপ শখের কাগজও।

বিবিধ প্রকারের কাগজ

কাগজ যেন সমস্ত দিক হইতে আজ সভ্যতার পাদপীঠ হইয়া উঠিয়াছে। কাগজ ও মুদ্রিত গ্রন্থ, পুস্তক, পুস্তিকা আজ সর্ব মানুষের আয়ত্ত। যৎকিঞ্চিৎ মূল্য দিতে পারিলেই যে কোনো মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের চিন্তার অংশীদার হইতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য ও মানুষের যাবতীয় শিল্প-সম্পদের সঙ্গে সহজেই এইভাবে মানুষ আপনার পরিচয় সাধন করিয়া লয়। কোনো ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর বা পুরোহিত গোষ্ঠীর সাধ্য নাই শাস্ত্রকে তালপাতার পুঁথিতে বাঁধিয়া আপনার একচেটিয়া সম্পত্তি করিয়া রাখিবেন। আজ এমন দরিদ্র শিক্ষিত পরিবার নাই যাঁহারা দুই একখানি গ্রন্থের অধিকারী নন; যাঁহারা দুই একখানি সংবাদপত্রের যোগে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের সঙ্গে আপন যোগ স্থাপন করেন

প্রয়োজন

না। অথচ এই সেদিনও দুই একটি মন্দিরে, দুই একজন ভাগ্যবানের গৃহেই মাত্র থাকিত এক আধখানি পুঁথি এক আধ পৃষ্ঠা তুলট কাগজে লেখা জন্মপত্রিকা ও বংশতালিকা।

কাগজ নিশ্চয়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান বাহন; কিন্তু আনন্দের ও রস সম্পদেরই কি কম বাহন কাগজ? লাইব্রেরিতে বসিয়া কাগজে মুখ রাখিয়া আমরা 'মানব-মহাসমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি শুনিতে পাই,' তাহা রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরি প্রসঙ্গে আমাদের বলিয়াছেন। কিন্তু ছিন্নবস্ত্রে, ভাঙা মাচায়, কোনরূপে দিনান্তে ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া আপন কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুলিয়া আমার গ্রামের দোকানী যে মহাবিশ্বের অধিকার লাভ করে,—আমি গ্রামের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতে পড়িতে যে স্বপ্ন-জীবনের প্রসাদলাভ করি—তাহা কি কম সত্য? 'কাগজের যুগ' না আসিলে এই সম্পদ, এই স্বপ্ন কি আমাদের কাহারও ভাগ্যে জুটিত?—যদিই বা আমরা কেহ জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে,—কিংবা সিজার অগস্টাসের রোমে,—তাহাতেই বা কি হইত?

এই কাগজের যুগে জন্মিয়া নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করি। আঠার শত বৎসর পূর্বেকার চীনা মহাশিল্পী চাই লুনকেও সেলাম করি। তবে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—আশীর্বাদকে যে আমরা অভিশাপই করিয়া তুলিতেছি। বিশেষত খবরের কাগজের অত্যাচারের কথা ভাবিয়া মনে হয়—সত্যই সেই সংবাদ-পত্রের রঙের-হাওয়াই-শার্ট-পরা ফিরিঙ্গি যুবকের মতো আমাদের পৃথিবীকে আমরা বিচিত্র-সচিত্র কাগজে-কাগজে মুড়িয়া সার্কাসের ক্লাউন বা ভাঁড় করিয়া তুলিতেছি না কি? আবার নিজেকে আশ্বাস দিই—রেডিও ফিল্ম, টেলিভিশন মিলাইয়া কাগজের সঙ্গে একটা ভারসাম্য হয়ত সভ্যতাও স্থাপন করিয়া লইবে। কাগজের উপরে মগজ আছে; মাভৈঃ॥

উপসংহার

[একটি অতি-পরিচিত বিষয়ে মামুলী ভাবে প্রবন্ধের পরীক্ষা করা গেল। এর মধ্যে ভাব বা ভাষার বেশি কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব নয়। একটু নূতনত্ব আনা যায়—দুভাবে: যদি কাগজ কিভাবে তৈরী হয় সে Process আরও বিশদ করা যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ শুষ্ক হয়ে উঠলে প্রবন্ধই মাটি হবে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কাগজের ব্যবহারে চীনে, পারস্যে, পাশ্চাত্য দেশে কি ভাবে মানুষ প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ সংরক্ষিত করেছে—তাও বলা যায়। অবশ্য অনেকাংশে তা 'লাইব্রেরীর' ও 'লিপি' আবিষ্কারের কথা। এ-রচনার মূল কথাটা—কাগজের আবিষ্কারে আমরা কতটা উপকৃত হয়েছি; এই কথাটাই বিশদ করতে হবে। এবং তা করতে গেলে অনিবার্য রূপেই এ-রচনায় এসে যায় মুদ্রাযন্ত্রের অবদানের কথা। কাগজের অত্যাচার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিতান্তই রচনাটিতে একটু লঘু সুর আমদানি করবার জন্য—এবং সেরূপ সুরে রচনাটির উপসংহার করবার দায়ে। সে সব কথা বাদ দিয়ে অন্যভাবেও রচনা শেষ করা যেত—যেমন, ভারতবর্ষে কাগজের দুর্মূল্যতার কথা পেড়ে, শিক্ষার্থীদের সস্তা দরে কাগজ সরবরাহের দাবি তুলে এবং কাগজের ব্যবসা থেকে মুনাফা-নীতি দূর করবার কথা বলে।

সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে এ-বিষয়ে লিখতে পারা যায়—'কাগজের আত্মকথা' নাম দিয়ে লেখা চলে। কাগজই বলে যাবে তার জন্ম ও বিস্তারের কথা, আর সদসদ নানা প্রয়োগের কথা। ভাষা গম্ভীর না হয়ে হালকা হলেই তখন ভালো হয়। হালকা চলতি ভাষাতে নিজেও লিখতে পার—কাগজ নিয়ে যেন তুমি বসেছ, নিজেই কথা বলছ—'না লিখলে আমার চিন্তা খেই হারিয়ে যায়, ভালো করে ভাবকে চিনতেও পারি না'—এভাবে লেখা শুরু করতে পার।]

।। চা ।।

বিদেশে যে সব পণ্য রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ সর্বাধিক অর্থ অর্জন করে তাহার মধ্যে এখন চা প্রধান। তাই, অর্থনীতিকদের কাছে চা-এর এখন বিশেষ আদর। আর অর্থনীতিতে যাহার প্রাধান্য রাজনীতিতেও তাহাকে অবজ্ঞা করিবে কে? শাসক মহলে চা-এর তাই বিষম সম্মান। কিন্তু আমরা বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষ, আমরা অত-শত বুঝি না—বিক্রয়ের মুনাফা আমাদের পকেটে আসে না। বৈদেশিক মুদ্রার্জনের মাহাত্ম্যও আমাদের নিকট রহস্য। বরং, দিনের পর দিন চায়ের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া দুঃখে, নৈরাশ্যে আমরা চা-পায়ী বঙ্গ-সন্তানরা এক-একবার ক্ষেপিয়া উঠি। দুই বেলা দুইমুষ্টি ভাত জুটানো দুর্ঘট। সকাল বা বিকালে দু'পেয়ালা চাও যে হাতে লইয়া একবারের মত ক্ষুধার জ্বালা ভুলিব, 'ধূম্রবতী' পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিব—'আঃ', তাহাতেও এত বাদ সাধিলে চলিবে কেন? চা বিদেশে অর্থার্জন করিতেছে,—আরও করুক। জাতীয় ধনকোষ পূর্ণ করিয়া দিক। কিন্তু আমাদের জন্যও একটু সস্তা দরে এই সামান্যতৃপ্তিটুকু তো অর্জন করিয়া দিতে পারে—আর তাহাই কি এই বাঙালী জীবনে একটা কম আশীর্বাদ?—সকাল সন্ধ্যায় শুধু দুই পেয়ালা করিয়া এই অমৃত পান।

ভূমিকা: চায়ের গুরুত্ব

অথচ সেদিনও নাকি আমরা চা পানে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমাদের শিরোমণি খুড়ো যে চা না খান তা নয়, তবে তিনি আমাদের সর্বদাই বুঝান,—'চা-পান, না, বিষপান'। কিন্তু ভট্টাচাজ্জি দাদা মহাশয় জীবনে চা স্পর্শ করেন নাই। তামাক ও নস্যির সঙ্গে সিদ্ধিও তাঁহার চলিতে পারে, কিন্তু চা কিছুতেই নয়। তিনি সময় পাইলেই আমাদের শোনান, কেমন করিয়া এ দেশে চায়ের প্রচলন হইল—তখন আসামে চা হইত, ইংরেজরা কোম্পানির মালিক; যেমন করিয়া চীনে তাহারা আফিম ধরায় তেমনি করিয়াই এদেশে চা লইয়া আসিল। প্রথমে শহরের চৌরাস্তায়, হাটে, বাজারে চা তৈয়ারী করিয়া দেখাইত কি করিয়া এই বস্তু তৈয়ারী করিতে হয়। তারপর এক কাপ করিয়া বিনা পয়সায় অপিসের শেষে বাবুদের, হাটে বাজারে লোকজনদের, চা খাওয়াইত। শুধু তাহা নয়। বিনা দক্ষিণায় এক একটি চায়ের পুরিয়াও সকলকে উপহার দিত—বাড়ি লইয়া গিয়া সপরিবারে খাইয়া দেখিবে। এভাবে মাস কয়েক চলিল। তারপর চায়ের দাম হইল এক পয়সায় এক পেয়ালা। আরও কিছু কাল পরে বাড়ির জন্য পুরিয়া দেওয়াও বন্ধ হইল। লোকেই তখন তাহা

চা-পানের প্রচলন

কিনিবে। আরও কিছুকাল, তখন চা দেওয়াও বন্ধ,—চায়ের দোকান বসিয়া গেল। তারপর—"আজ তো এই দশা। সকালে হইতে না হইতেই 'চা-চা'। —সমস্ত জাতিটাই এখন 'চা-তাল'।"

কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়—এভাবেই আমরা চা পান শিখিয়াছি। চা-বাগানের বিদেশী মালিকরা ও আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীরা এই দেশে চা-এর প্রচলন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজ শিখাইয়াছে বলিয়াই কি চা বর্জনীয়? ইংরেজের মারফৎ আধুনিক সভ্যতার অনেক জিনিস আমরা পাইয়াছি—ফুটবল, ক্রিকেট, কত কিছুর কথা বলিতে পারা যায়। চা সেজন্য মন্দ হইবে কেন? আর ইংরেজই বা চা খাইতে শিখিয়াছে কত বৎসর? দুই শত বৎসর মাত্র। তাহারা এ ব্যাপারে চীনের শিষ্য। বাণিজ্য-সূত্রে চীনের চা বিলাতে আসিল। তাহার প্রস্তুত প্রণালী কি ইংরেজ ভালো করিয়া জানিত? কত মজার গল্পই না এ সম্পর্কে আছে। প্রথম নাকি লণ্ডনে চা গেল—বড় বড় অভিজাত গৃহে। কর্তারা বন্ধু-বান্ধবদের চায়ের নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাঘটা করিয়া গরমজলে চা ঢালিলেন। তারপর সেই জল ফেলিয়া দিয়া চায়ের সিদ্ধ পাতা মহাসমারোহে খাইয়াই তাঁহারা ভারি চমৎকার চা খাইলেন। সে ভুল যখন ভাঙিল, তখনো চায়ের রসকে দুধ-চিনি ঢালিয়া 'স্বাদু' না করিয়া ইংরেজরা চা পান করিতে পারিলেন না। তাই পাশ্চাত্য ধরনের চা-পান দুগ্ধ-মিশ্রিত এবং প্রায়ই শর্করা শোধিত চা-পান। আমরাও চা-এর এই রূপের সঙ্গেই পরিচিত। অবশ্য ইহাতে চায়ের ট্যানিন নামক ক্ষতিকর রসটুকু শোধিত হইয়া যায়। কিন্তু চায়ের প্রাচীনতম রসিক চীনারা। জাপানী, কোরীয়, তুর্ক, রুশ প্রভৃতি জাতি চীনাদের মত বিশুদ্ধ চা-রসই পান করেন—চিনি-দুধ-মিশানো চা চীনাদের চক্ষে ছেলেদের সব কিছুকে মিষ্ট করিয়া খাইবার লোভের মতই কৌতুকজনক।

চা-পানের নানা ধরন

চীনেই চা প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই সম্পর্কে আরও মজার কাহিনী আছে। চীনে 'চেন' বা 'ধ্যান' বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন ভারতীয় ভিক্ষু বোধি ধর্ম। দিবা রাত্র ধ্যানই তাঁহার সাধনা। কিন্তু ধ্যানের পক্ষে নিদ্রা বড় বাধা, সেই বাধা দূর করিবার উপায় তিনি আবিষ্কার করিলেন—তাহাই 'চা'। সেই হইতে চীনে চায়ের প্রবর্তন। চীন হইতে তাহা কোরিয়ায়, জাপানে যায়। অন্যদিকে তুর্কিস্তান দিয়া যায় রুশ দেশে। আর যায় তিব্বতে মঙ্গোলিয়ায়, ডাইনে বামে। তবে তিব্বতীরা চায়ের সঙ্গে মিশায় ছাগলের মাখন। আর রুশরা চা পান করে নেবু মিশাইয়া, ইচ্ছা হইলে তাহাতে চিনিও দেওয়া যায়।

সামাজিকতার উপাদান

ইংরেজি ধরনের চা পান, ও চা-পানে অতিথিকে আপ্যায়িত করার ইংরেজি প্রথা—আজ পাশ্চাত্য প্রভাবে সভ্য-জগতে চালু হইয়াছে। আমেরিকা অবশ্য

এখনো কফিই বেশি পান করে; আরব জাতিদের মধ্যেও কফির প্রচলন বেশি। তবু চা এখন পৃথিবীর সাধারণ মানুষের প্রধান নির্দোষ পানীয়, সামাজিকতার প্রচলিত উপাদান। তবে চীনে জাপানে চা-পান অমন মামুলী প্রয়োজন বা মামুলী ভদ্রতা মাত্র নয়। এ চা-পানের সঙ্গে জড়িত আছে তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার স্বচ্ছন্দ শ্রী, শোভন মর্যাদা, সুসভ্য শালীনতা। চীনে যে কোনো গৃহে পদার্পণ করিলেই অতিথিকে গৃহকর্তা চা ঢালিয়া দিবেন —যতক্ষণ অতিথি গৃহে থাকিবেন ততক্ষণ পেয়ালা খালি হইলে বা জুড়াইয়া গেলে বারে বারে চা ঢালিয়া দিতেই হইবে, ইহাই চীনের শিষ্টাচার। আর চায়েরও প্রকার ভেদ চীনে অফুরন্ত। শুষ্ক পাতা ছাড়া, সবুজ পাতার 'সবুজ চা' তো সাধারণ জিনিস। অবশ্য তাহারও রকমফের আছে। জুঁইফুলের গন্ধ থাকিবে কোনো চায়ে, কোনো চায়ে আরও বৈচিত্র্য, আরও সুগন্ধ! চীনা কবিরা বলেন, চীনে প্রায় পাঁচ শত ধরনের চা পাওয়া যায়। হয়ত কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। জাপানে চায়ের সমাদরের আর এক বৈশিষ্ট্য— রবীন্দ্রনাথ তাহা 'চা-চক্রে' বর্ণনা করিয়াছেন। চা-পান যেন একটি শান্ত শ্রী সমন্বিত পূজা-বিশেষ;—প্রাচীন শিষ্ট-সমাজের নিয়মে বাঁধা সেই বৈঠকের উঠা-বসা, চা-ঢালা ও চা-পান। জাতির জীবনের শ্রী ও শিষ্ট রীতি তাহাতে স্বপ্রকাশ। রুশ দেশেও এক সময়ে চা ছিল একটা প্রধান জিনিস—স্যামুভারে চা সিদ্ধ হইত, গৃহাগতকে তাহা গেলাসে ঢালিয়া পরিবেশন করা হইত। এখন অবশ্য সে নিয়ম প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তবে চা-পানের অভ্যাস সর্বস্তরেই ব্যাপক।

চা-চাষ ও শিল্প

চীনে যে নানারূপ সাধারণ ও শৌখিন চায়ের চাষ হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে চায়ের এক প্রধান উৎপাদক ভারতবর্ষ; তারপরে সিংহল, জাভা, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চল। এসব দেশের বৃষ্টিবহুল, নিচু পাহাড় বা পাহাড়ের গায়ে চায়ের চাষ হয়। স্তরে স্তরে সার বাঁধিয়া পাহাড়ের গায়ে গাছ রোপিত হয়। এক একটি ঝাঁকড়া গাছ দুই তিন হাত উঁচু। 'দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি' বাছিয়া তোলে কুলী মেয়েরা ও পুরুষেরা। তারপরে সে পাতা শুকানো হয়, কলে শোধন করা হয়, তা পাক দেওয়া হয়, তারপরে তাহাতে নানাভাবে 'মিশ্রণ' হয়—এক এক ধরনের মিশ্রণের মার্কার নামে হয় চায়ের পরিচয়। ইহার পরে তাহা যায় ব্যবসায়ীদের হাতে—কলিকাতায় ও লণ্ডনে তাহার নিলামের বাজার।

আমাদের দেশের মধ্যে আসামে, হিমালয়ের তরাইতে বিশেষ করিয়া দার্জিলিং অঞ্চলে, নীলগিরি (উটকামুণ্ড) পাহাড়ে, মৈশুরে, কেরালায় চমৎকার চা জন্মে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের চায়ের বিভিন্ন খ্যাতি। তবে দার্জিলিং-এর কিছু চা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট চায়ের মধ্যে গণ্য। আসামের চা গাঢ় রঙ

ও বিশেষ একটা কড়া ঘ্রাণের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য 'স্বাদু' চা বলিতে দার্জিলিং-এর কোনো-কোনো অঞ্চলের, সিংহলের ও নীলগিরির চা—তাহা অতুলনীয়। তবে বিলাতের বাজারের প্রসিদ্ধ ধনিক গোষ্ঠীরাই সে রস ভোগ করেন।

চায়ের চাষ আমাদের দেশে ইংরেজ চা-কররা প্রথম প্রবর্তিত করে। তাহা ১৮৩৪ সনের কাছাকাছি। আসামে প্রথম জমি তৈয়ারী করিতে তাহাদের অনেক কষ্ট করিতে হয়। কিন্তু এই চা-বাগিচা নির্মাণের সূত্রেই ইংরেজ শাসকদের সহযোগে ইংরেজ ক্ষেত্র-মালিকরা প্রায় সমগ্র আসাম কবলিত করে। ওঁরাও, কোল, ভীল, ছত্তিসগড়ী, প্রভৃতি জাতের মেয়ে-পুরুষ 'কুলি' সংগ্রহ করিয়া তাহারা যে ভাবে চা উৎপাদন করিত তাহাতেই বাঙালী শিক্ষিতরা চা পানের বিরোধী হইয়া উঠেন—তাঁহারা বলিলেন, 'চা না, কুলির রক্ত।' আসাম ছিল চা-করদের খাস রাজত্ব। পরে অনেক বাধা সত্ত্বেও দেশীয় মালিকেরা চা চাষ আরম্ভ করে। অপেক্ষাকৃত অল্প পুঁজি, সরকারের ঔদাসীন্য, বিদেশী ব্যাংক প্রভৃতির বিমুখতা, আর ইংরেজ চা-কর প্রতিযোগীদের বৈরিতা—এই সব কারণে অনেক দিন পর্যন্ত তাহারা চা-শিল্পে ও চা-ব্যবসায়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন। পরে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করেন। জলপাইগুড়ি ও আসামে এরূপ অবস্থাপন্ন দেশীয় চা-করদের অভাব নাই। স্বাধীনতা লাভের পরে তাঁহারাও এখন প্রবল ক্ষমতাশালী—ইংরেজ মালিকেরা পর্যন্ত এইসব দেশীয় মালিকদের, বিশেষতঃ মারোয়াড়ী মুনাফাখোরদের নিজেদের অংশীদার করিয়া লইতে এখন ব্যস্ত। মুনাফার বন্ধনে দেশী-বিদেশী চা-মালিকেরা সবাই মিত্র—যদিও এখনো ব্যবসায়ের মূল কেন্দ্র লণ্ডন, আসল কর্ণধার ইংরেজ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী; আর লাভের বড় অঙ্ক হইতেও তাই আমাদের দেশ, আমাদের সরকার বঞ্চিত, আর দেশের উৎকৃষ্ট চা দেশের মানুষ চক্ষেও দেখে না; যাহা দেখে তাহাও মুনাফার কল্যাণে দুর্মূল্য।

চা-করের অত্যাচার

এতবড় লাভের কারবারে অন্যত্রও যে ব্যবসায়ীরা অগ্রসর হইবেন না, এমন হইতে পারে না। দেশে বিদেশে চায়ের ক্ষেত্র বাড়িতেছে, উৎপাদনও তাই বাড়িতেছে। চাহিদার অপেক্ষা এই রূপে উৎপাদন বাড়িতে থাকিলে মুনাফার হার কমিতে থাকিবে। অতএব, এখন মালিকপক্ষ মন্ত্রণা করিয়া উৎপাদন কমাইয়া রাখিতেছেন। অন্যদিকে নূতন নূতন লোককে চা-পান শিখাইয়া চাহিদাও বাড়াইয়া তুলিতেছেন। এই সুযোগে চায়ের দাম বাড়াইয়া দিতেও বাধা নাই। সরকারকে মুনাফার ছিঁটেফোঁটার একটা অংশ ট্যাকস্ রূপে দিলে সরকার নীরব থাকিবে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ক্রেতারা চায়ের দর বাঁধিবার

চা-শিল্পের বর্তমান অবস্থা

উৎপাদন ব্যয় যাচাই করিবার, এবং উৎপাদন বাড়াইবার ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করিবার দাবি করিলে আজ অন্যায় হইবে না। কারণ, এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র সুখ বা আরাম এই নির্দোষ পানীয়ে।

অনেকে হয়ত বলিবেন, চা কি নির্দোষ পানীয়? আমরা বলি, অপরিমিত পরিমাণে যে কোন জিনিস গ্রহণেই শরীরে ক্ষতি হয়। ভাতেও হয়, রুটিতেও হয়; চায়েতেও হইবার কথা। না হইলে সত্যই চা পানে যদি সহজে ক্ষতি হইত তাহা হইলে চীনের মানুষ জাপানের মানুষ, রুশিয়ার মানুষ অনেক আগেই লুপ্ত হইত। সকলেই জানে সামান্য চা-পানে,—বিশেষত দুধ চিনি দিয়া চা-পানে,—শরীরের ক্ষতি হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অথচ, শীত গ্রীষ্মে, দিনে-রাত্রিতে, কাজের মধ্যে ও গল্পের আসরে এক পেয়ালা চা পাইলে শরীর তৃপ্ত হয়, মনস্নিগ্ধ হয়, এবং মেজাজ শরিফ হয়। কে না বলিবে চায়ের সম্বন্ধে সেই পুরাতন সত্য : "The cup that cheers but not inebriates ?" এমন কি এই দুর্দিনে বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথিকে এক পেয়ালা চা দিয়া ভদ্রতা রক্ষা করাও চলে। চায়ের দাম, চিনির দাম, দুধের দাম বাড়িলে তাহাও সম্ভব হইবে না।

নির্দোষ পানীয়

[প্রবন্ধটিকে মামুলী ভাবে উত্থাপন করতে পারা যেত : চা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ সহজ—(ক) কিরূপে চা চাষ হয়, (খ) কিরূপে কারখানায় তা শোধন হয়, ইত্যাদি; এবং (গ) তাতে কত ব্যবসায়ের লাভ হয়; (গ) কিম্বা চা-মজুরদের দুর্দশা কিরূপ, মুনাফার কোন্ অংশ তাদের জোটে, আর (ঘ) সামাজিকতার দিক। এসব কথা এখানেও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। কিন্তু একটু সকৌতুক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কথাগুলি উত্থাপন করতে গিয়ে সব বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করা হল না। যতই প্রসঙ্গ অগ্রসর হল ততই সেই কৌতুক দৃষ্টি সামলাতে হল। রচনা আরও বাড়িয়ে নিলে অবশ্য সে ভঙ্গী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও সব কথা বলা চলত। কিন্তু, কোনো রচনায় সব কথাই বলতে হবে, এমন কথাও নেই। মুখ্য কথাই বলা দরকার। যা'ই হোক; চা সম্বন্ধে অসংখ্য লেখা আছে—বিশেষ করে অদ্ভুত চিন্তাশীল বই—A Book of Tea]

।। এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ ।।

বর্তমান যুগকে অনেকে অনেক নাম দিয়াছেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা সার্থক নাম বোধ হয় এই যে, এযুগ 'বিজ্ঞানের যুগ'। একবার যদি আমরা মানুষের জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে স্বীকার করিতে বাধ্য হই—মানুষের জীবন যাত্রার যেই রূপের সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত বিজ্ঞানের সহায়তা না পাইলে তাহা সম্ভব হইত না। বিজ্ঞান-হীন মানুষও বাঁচিতে পারিত,—একদিন বাঁচিয়া ছিল, এখনো হয়ত আফ্রিকার কোনো দুর্গম অরণ্যে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সে জীবনযাত্রা এখন আমাদের কষ্ট করিয়া কল্পনা করিতে হয়। এই কথা বুঝিতে পারি—সে মানুষ ছিল প্রকৃতির ক্রীড়নক; প্রকৃতির সহযোগী নয়, তাহার অসহায় পরিচারক। সে বনের ফলমূল খাইত, পশু শিকার করিত, নগ্নদেহে শীতাতপে পর্বত কন্দরে, বৃক্ষশাখায় দিন যাপন করিত। আর আঘাতে ব্যাধিতে ঋতুর স্বাভাবিক নিয়মে নিঃসহায় রূপে অপেক্ষা করিত মৃত্যুর বা নিরাময়ের।

সূচনা

ইহাকে যদি 'স্বাভাবিক জীবন' বলি, তাহা হইলে মানুষের মূল স্বভাব, দেহের ও মনের ধর্মকেই অস্বীকার করা হইবে। দ্বিপদ মানুষ মস্তিষ্ক লইয়া ভূ-পৃষ্ঠে যখন খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন দুই স্বচ্ছন্দ হস্তের এবং উন্নত মস্তিষ্কের ব্যবহারও তাহার পক্ষে স্বভাবসম্মত। প্রাণযাত্রার স্বাভাবিক তাগিদেই উহাদের ব্যবহার না করিয়াও সে পারে না। সেই তাগিদেই সে শিখিয়াছে হাত ও মাথা খাটাইয়া হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে,— ফল পাড়িতে ও শিকার মারিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক যেই নিয়মে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, পাথরে পাথর ঠুকিতে ঠুকিতে স্থূলভাবে সেই নিয়মকেও মানুষ আয়ত্ত করিতে ও আপন প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর মুখের ধ্বনিতে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও তথ্য আদান প্রদান করিতে করিতে ভাষার সম্পদও আহরণ করিয়া চলিয়াছে। এই আদিম মানুষকে আজ 'সভ্য' বলিলে হয়ত আপত্তি হইবে, কিন্তু হাতিয়ার গড়া, অগ্নির আবিষ্কার, ভাষার স্ফূর্তি,—ইহাতেই সভ্যতার সূচনা। এই সব উদ্ভাবনাকে বিজ্ঞান বলিলেও হয়ত এখন আমরা বিস্মিত হইব, কিন্তু ইহাই বিজ্ঞানের আরম্ভ। কারণ, বিজ্ঞানের মূল লক্ষণ ইহাতে চিহ্নিত—কী সেই লক্ষণ? প্রয়োজন

বিজ্ঞানের সূচনা

ও তাঁহার প্রতিবিধান, তথ্যের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার বস্তুগত পদ্ধতি, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার ও কার্যতঃ তাহার সার্থক প্রয়োগ। এই মূল বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করিয়া জীবনের বহু দিক হইতে মানুষ আপনার প্রয়োজন মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছে। প্রস্তরের হাতিয়ার ব্রোঞ্জের ব্যবহার, লৌহ ইস্পাতের ব্যবহার, বাষ্প ও বিদ্যুতের ব্যবহার করিতে করিতে এখন আনবিক শক্তি ও সূর্য-তাপের ব্যবহারের দিকে চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের শাখা বহু হইতে বহুতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, এমন কি, সমাজ-বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত নূতন নূতন বিদ্যার ক্ষেত্র এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছে।

তথাপি মানুষের জন্মের তুলনায় এই বিজ্ঞানের সূচনা কিম্বা সভ্যতার সূচনা খুব বেশি দিনের কথা নয়। আর বিজ্ঞানের যুগ তো মাত্র সেদিনের কথা।—রোজার বেকনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পদ্ধতির আবিষ্কারে তার অভ্যাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পত্তন হইয়াছে বাষ্পীয় যন্ত্রের পত্তনে—ফলিত বিজ্ঞানের বিরাট-উদ্যোগে। অনেকে মনে করেন—মানবের সূচনা প্রায় আড়াই-লক্ষ বৎসর পূর্বেকার কথা, আর সভ্যতার সূচনা মাত্র ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্বেকার কথা। এই মোট আড়াই লক্ষ বৎসরের কালটিকে যদি বারো ঘণ্টার কাল বলিয়া কল্পনা করি তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন—মিশর ব্যাবিলনের সভ্যতা জন্মিয়াছিল মাত্র ২০ মিনিট পূর্বে। প্রাচীন চীনের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হয়ত ৯ মিনিট পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল; ভারতবর্ষ ও গ্রীসে তাহা ৭ মিনিট পূর্বে দেখা গিয়াছিল। মাত্র মিনিট খানেক পূর্বে বেকন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষার গোড়াপত্তন করিয়াছেন। আর এখনো পুরা আধ মিনিট হয় নাই যে, বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'বৈজ্ঞানিক যুগের' জীবন মাত্র এই আধ মিনিটের কথা। পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় নিমেষ-পাতেরও সময় নয়। কিন্তু কী অপরিমিত এই ত্রিশ সেকেণ্ডের বিস্ময়। এই যুগের সেই সহজ বিস্ময়ের হিসাব লইতে কে পারিবে?

এ-যুগের বয়স

কাণ্ট বলিয়াছিলেন, "দুইটি জিনিস আমাকে বিস্ময়ে ভরিয়া তোলে—তারাভরা আকাশ ও মানুষের অন্তর।" কাণ্টের সে বিস্ময় এতদিনে বিজ্ঞানের যথার্থ সাধন-বস্তু হইয়াছে। পৃথিবী ও আকাশ ছাড়াইয়া একদিকে তাহা মহাকাশে পাড়ি দিয়াছে, অন্যদিকে মানুষের মনের মহাকাশেও সন্ধানে নামিয়াছে।

যুগের উদ্যোগ

নিশ্চয়ই এই জগৎ-জোড়া উদ্যোগের জন্যই 'বিজ্ঞানের যুগ' বলিয়া এই যুগের পরিচয়। রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, চলচ্চিত্র, বেতার, বেতারচিত্র,

রেডিয়াম, রঞ্জনরশ্মি হইতে আণবিক শক্তির আবিষ্কার, মহাকাশ-অভিযান, অ্যান্টি-বায়োটিক্‌স্ ও শৈলীবিদ্যার আধুনিক প্রয়াস—এই সবে বিজ্ঞানের যে ফলিত প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই একশত বৎসর পূর্বেও মানুষের কল্পনাতীত ছিল—প্রত্যেকটিতেই জ্ঞানের জগতের এক-একটা বিপ্লবের নিদর্শন।

এই সব অসংখ্য উদ্যোগের প্রয়োগে মানুষের জীবন ধারা পরিবর্তিত হইবার কথা। কারণ, মানুষ আপনার অসামান্য সম্ভাব্যতার প্রমাণ তাহাতে পাইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে বিজ্ঞান আজ শুধু বিদ্যার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা প্রাকৃতিক নিয়মাবিষ্কার ও যন্ত্রোদ্ভাবনাও বুঝায় না—সেই সঙ্গে বুঝায় এক নূতন জীবন পদ্ধতি (way of life)। যুগের এই জীবন-পথের পরিচয় বহন করে নানা উদ্যোগ আয়োজন। কিন্তু যুগের জীবন-দৃষ্টি, ধ্যান ও ভাবনা বুঝিতে হয় আরও একটু তলাইয়া দেখিয়া। এ যুগের সেই ভাবনার প্রধান কথা এই যে, মানুষ বিজ্ঞানের নিয়মে ও নিজের শক্তিতে আজ আস্থাবান। ইহার পূর্ব পর্যন্ত সে জানিত—প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ বুঝি কোনো অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির বা সর্বজ্ঞ অপ্রাকৃতিক শক্তির লীলা, অজ্ঞাত শক্তির বিধান। মন্ত্রেতন্ত্রে স্তবস্তুতিতে সেই অপ্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট করিলেই জীবনে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে প্রথম কথা এই যে, সেই 'অপ্রাকৃতিকের অত্যাচার' হইতে মানব-জীবন মুক্ত; প্রাকৃতিক নিয়মকে জানিলে মানাইয়া লইবার কৌশল উদ্ভাবনা মানুষ এখন করিতে পারে। এই বিজ্ঞানের যুগকে এইজন্যই মানুষের আত্ম-কর্তৃত্ব লাভের যুগও বলা যায়—আত্মাবিষ্কারের যুগও বলা যায়।

জীবনের রূপান্তর

এই কথাও সেই সঙ্গেই পরিষ্কার—মানুষের ইতিহাসই শুধু প্রবহমান, পরিবর্তমান নয়; বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারও একেবারে নিরঙ্কুশ বা শাশ্বত সত্য নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে যে সত্য 'মাধ্যাকর্ষণ' উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল আইনস্টাইন আসিয়া দেখাইলেন তাহাও অপূর্ণ। 'আপেক্ষিকতাবাদ'-এ সেই নিয়মের আরও পূর্ণতর সন্ধান মিলিল। তাই বলিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় চির-অজ্ঞেয়ও কিছু নাই—আজ যাহা অজ্ঞেয় কাল তাহা জ্ঞাত হইতে পারে। বিজ্ঞানের সাধনা সত্যের সাধনা, কিন্তু সেই সত্য চির-প্রকাশমান ও চির-প্রবহমান। বিজ্ঞান শুধু নিরপেক্ষ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর সত্যের পথে মানুষকে লইয়া চলিয়াছে। যাহা শাশ্বত সত্য তাহা ধর্মের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা তাহার সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কি, সংশয়সম্পন্ন। সত্যের নব নব রূপের আবিষ্কার, পুরাতন ধারণার পরিবর্তন, আত্ম-সংশোধন,—ইহাই বিজ্ঞানের ধর্ম, কিন্তু ইহা ধর্মের বিভীষিকা।

বিজ্ঞানের ধর্ম

আর একটি কথাও তাই এই প্রসঙ্গে বুঝিবার মত : বিজ্ঞানের দায়িত্ব এই যে বিজ্ঞান সত্যের সাধক। অনেক বিজ্ঞান-তপস্বী তাই বলিবেন, প্রয়োজনের তাড়না ও প্রয়োগের সফলতা দিয়া বিজ্ঞানের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু আজ বিজ্ঞান 'স্বরাজ' লাভ করিয়াছে। অগ্নি আবিষ্কারে কাহার গৃহ পুড়িল তাহা আবিষ্কারকের ভাবনার কথা নয় ; দাহিকা শক্তির আবিষ্কারই তাহার সাধনা ছিল। তেমনি আণবিক শক্তির কে অপব্যবহার করিল তাহা বৈজ্ঞানিকের দ্রষ্টব্য নয়। সেই মহাশক্তির সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ইহাই বৈজ্ঞানিকের পক্ষে আসল কথা। কিন্তু সকলেই জানেন—এই কথা অর্ধসত্য। বিজ্ঞান এখনো স্বরাজ লাভ করে নাই ; সে শাসক শক্তির প্রসাদজীবী দাস। তাহাদের যুদ্ধের উপাদান না যোগাইলে বিজ্ঞানের ব্যয়সাধ্য সাধনা তখনি নিরুদ্ধ হয়। তাই, এই কথা মানিতেই হইবে জন্মাবধি বিজ্ঞান এই প্রেরণা স্বীকার করিয়াছে—জীবন-যাত্রায় মানুষকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া তাহার ব্রত। সেই প্রাথমিক দায়িত্ব এড়াইবার উপায় বৈজ্ঞানিকের নাই। উপায় নাই বলিয়াই তাহার সাধনা শুধু বিজ্ঞানের সাধনা নয়, সমাজ-বিন্যাসেরও সাধনা—শান্তির সাধনা, কল্যাণের সাধনা, মানবতার সাধনাও। যে বিজ্ঞান-তপস্বী জীবনভ্রষ্ট, তিনি স্বধর্মভ্রষ্টও।

বিজ্ঞানের দায়িত্ব

বিজ্ঞানের ধর্ম তাহা হইলে কি? সকল যুগে যাহা বিজ্ঞানকে ধারণ করিয়া আছে ও থাকিবে তাহাই বিজ্ঞানের ধর্ম। তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিষ্ঠা নয়, নিছক জ্ঞান-তপস্যার নির্মল আনন্দও নয়। তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানব-জীবনের সক্রিয় সুসঙ্গতি। প্রাকৃতিক নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যন্ত্র-গর্বিত মানুষের আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা উঠে না। কারণ, যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না—আণবিক বিস্ফোরণেও নয়। তাহাতে মানুষ ধ্বংস হইবে মাত্র, আণবিক নিয়মের পরিবর্তন হইবে না এবং পরিবর্তনহইবে না বলিয়াই মানুষ নিজে ধ্বংস হইবে। বরং দেখিতে পাই প্রথমাবধি যে সাধনা বিজ্ঞানের প্রয়াসে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার নিগূঢ় অর্থ এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর জ্ঞান আহরণ করিয়াই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা লাভ করে। এই সাধনায় এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্ব-প্রকৃতির ও মানব-প্রকৃতির সচেতন সহযোগিতায় এক নূতন মহাসুষমার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে—ইহাই এই বিজ্ঞানের যুগের ভবিষ্যদাভাস।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য

[মন্তব্য : এ-রচনায় ইচ্ছা করেই কয়েকটি বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যা এ-রচনা ছাড়াও অন্য রচনার উপাদান যোগাবে—যেমন, (১) 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা' বললে বিজ্ঞান যে সভ্যতার প্রধান অবলম্বন একথা বলা প্রয়োজন। আধুনিক কালে অবশ্য তা স্পষ্ট। 'বিজ্ঞানের সূচনা' ও 'এ-যুগের উদ্যোগ' ও 'বিজ্ঞানের ধর্ম' প্রভৃতি অনেক অনুচ্ছেদ থেকে সেরূপ রচনার উপাদান গ্রহণ করা চল বে। আসলে বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন এ রচনা উপলক্ষ

করে উপস্থাপিত করা হয়েছে—যেমন, 'বিজ্ঞানের উৎস সামাজিক প্রয়োজন' (এ-বিষয়ে Bernal এর Social Origin of Science সুপরিচিত গ্রন্থ) (২) 'বিজ্ঞান ও সমাজ' বিষয়ে রচনা লিখতে হলে এ তত্ত্ব, এবং 'জীবনের রূপান্তর', 'বিজ্ঞানের দায়িত্ব' প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবশ্য আলোচ্য। (৩) 'এ-যুগের সমস্যা' নিয়ে রচনা লিখতে হলেও বর্ণ বৈষম্য, জাতি বৈষম্য, প্রভৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি প্রশ্ন বিচার্য, বিজ্ঞানের 'অপপ্রয়োগের সমস্যাও' আলোচ্য। বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা কী, বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য কী,—এসব প্রশ্ন অনেক সময়েই ওঠে। এ রচনায় সংক্ষেপে সেসব আলোচনার একটু আভাস দেওয়া হয়েছে। সেসব বিষয়ে পৃথক রচনা লিখতে গেলে অবশ্য প্রত্যেকটি বিষয়েই আলোচনার আরও অনেক বিষয় থাক্‌বে। তবে এ রচনা থেকে অনেক সহায়তা হবে।

সম্পূর্ণ অন্য ভাবে এ রচনা লেখা যেত—যেমন, সূচনায় কাণ্টের উক্তিটি দিয়ে আরম্ভ করা গেল। বলা হল এ যুগে বিজ্ঞান এ সাধনাই করছে, এ বিস্ময়কেই জ্ঞানগম্য করতে চায়। তারপর রচনা আরম্ভ। বিজ্ঞানের যুগ বললে সাধারণত রচনায় যা বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে—(১) এ যুগের সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ সমূহের উল্লেখ। 'যুগের উদ্যোগ' দফার বক্তব্যকে আরও অনেক বিশদ করা যেতে পারে, করা উচিতও। (২) তারপর বলতে পারি কেমন করে, কবে, এযুগ আরম্ভ হল (ক) 'বিজ্ঞানের সূচনা' অংশটি দু'তিনটি বাক্যে সংক্ষিপ্ত করে 'এ যুগের বয়স' পর্বটি পরিবর্তিত করে লেখা যায়—প্রাচীন মিশরে, চীনে, ভারত-গ্রীসে বিজ্ঞান-চর্চার কথা। ভারতের উল্লেখ একটু বেশী করে করা যেতে পারে—আয়ুর্বেদ, রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা আর কারুবিদ্যা, বস্তুবিদ্যার নানা তথাকথিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় (চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, দশমিক গণনা পদ্ধতি, জ্যোতিষী, লৌহ-ইস্পাতে সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভ প্রভৃতি উল্লেখ করলেই হবে)। তারপর বলতে হবে (খ) আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ শুরু হল ৩।৪ শত বৎসর পূর্বে। সে প্রসঙ্গে বেকনের যুক্তি-পদ্ধতি, কোপার্নিকাস, কেপলার, হার্বে, নিউটন প্রভৃতির নাম শুধু উল্লেখ করলেই হবে। কিন্তু বড় বিপ্লব—(/) একদিকে ওয়াটের বাষ্প-ইঞ্জিন। ইংলণ্ডের খনি থেকে জল পাম্পে করে বের করবার প্রয়োজনেই প্রথম এই বাষ্প-ইঞ্জিন প্রযুক্ত হল, পরে উনবিংশ শতাব্দীতে মাল টানার রেলগাড়িতে যুক্ত হল, এবং যন্ত্র-উদ্ভাবনার ও শিল্প-বিপ্লবের প্রেরণা দিল। আর (৵) অন্যদিকে একশত বৎসর (১৮৫৯) পূর্বে প্রকাশিত হয় ডারুইনের 'অভিব্যক্তিবাদের' তত্ত্ব। এই ১০০।১৫০ বৎসর ধরে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ চলছে। অবশ্য তৃতীয় আর এক ভাবে এই আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রম বিজয়ের কথা সাজাতে পারা যায়—প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহ-ইস্পাতের যুগ, বাষ্প-বিদ্যুতের যুগ, আর এখন আণবিক যুগের প্রারম্ভ—এইভাবে সাজানোই বিজ্ঞানসম্মত। এরমধ্যে বাষ্প বিদ্যুতের যুগ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ গণনা করা হয়। সে সময়েই ডারুইনের প্রাণিবিদ্যার গোড়া-পত্তনও হয়েছে। এইভাবে ঐতিহাসিক পর্যায় দেখানো হলে (৩) তৃতীয়তঃ বলতে হবে এ যুগের জীবনযাত্রায় ও চিন্তায় রূপান্তরের কথা—যথা বিজ্ঞান অর্থ একটা বিশেষ জীবন-পদ্ধতি। বিজ্ঞান অর্থ অলৌকিকতায় অবিশ্বাস ; ঐহিক, মানব-কেন্দ্রিক ধর্মে বিশ্বাস ; মানুষের নিজ শক্তিতে আস্থা। এভাবে উঠে পড়ে (৪) বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতিতুলনা। মূল রচনায় যে ভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে সে ভাবে কথাটা না উত্থাপিত করে বলা যায়—'বিজ্ঞান ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বস্তুজগতের কথা বলে। ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা তার পক্ষে অবান্তর, বরং বাধা। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, হৃদয়াবেগ-মাখা জীবনও সত্য। সেই হৃদয়জগতের সত্যের ঠিকানা দিতে পারে—বিজ্ঞান নয়, শিল্পকলা ও ধর্মানুভূতি।' এভাবে কথাটা বললে কেউ আপত্তি করবে না। (৫) শেষে, এ যুগের বিজ্ঞানের সংকটের কথা বলতে হবে। তাতে বলা যায়—বিজ্ঞান স্বরাজ পায়নি, লাভের ও ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজ তথাকথিত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়, দায়িত্ব-পালন, মানুষের মঙ্গল।

এসব যুক্তি-সংকেত মনে রাখলে বিজ্ঞান-বিষয়ক অধিকাংশ রচনা লেখাই সুসাধ্য হবে]

॥ বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা ॥

সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা লইয়া বহু তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু মানব-সভ্যতার কথা উঠিলে আমরা জানি—মানুষের ইতিহাসে এই সভ্যতার জন্ম বহুদিন হয় নাই। হয়ত, মোট মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর।

সূচনা

বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন—আদিম বন্য জীবন (savagery) ছাড়াইয়া বর্বরতার (barbarism) যুগে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতেই মানুষের দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আরও হাজার তিন-চার বৎসরে বর্বরতার আদি ও অন্ত্য স্তর উত্তীর্ণ হইয়া সভ্যতার (civilization) স্তরে সে পৌঁছে—যখন সে নগর-পত্তন করিয়াছে, নাগরিক জীবনের বিন্যাস করিতে পারিয়াছে। আদিকালে ফলমূল বা শিকারের পশুই ছিল মানুষের খাদ্য। তখন তাই খাদ্য দুর্লভ ছিল, ছোট বিচ্ছিন্ন বসতিতে মানুষ বাস করিত। হল-চালনায় ও সেচের উন্নতিতেই অল্প জমিতে যথেষ্ট খাদ্যোৎপাদন সম্ভব হইল; মানুষের পক্ষেও ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গ্রাম্যবসতি ছাড়াইয়া নগর-পত্তন করা সম্ভব হইল। হল-চালন, পশু-পালন, প্রস্তর ও ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার, এবং উৎপন্ন আদান-প্রদানে নৌকা ও শকটের সহায়তা লাভ করিতে করিতে কৃষক, কারিগর, বণিক, পুরোহিত ও রাজা-রাজন্য লইয়া এইরূপ পৌর সভ্যতা গঠিত হইয়া উঠিল—লেখার পদ্ধতিও তখন আয়ত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ মিশরের নীল নদের উপত্যকায় ও মেসোপোতামিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস, এই দুই নদীর 'দোয়াবেই' নাকি সভ্যতার আবির্ভাব—অবশ্য ভূমধ্য-সাগরের ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এবং চীনে পীতনদের উপত্যকায়ও তাহার আবির্ভাব সেইরূপ প্রাচীন। ইহার পরে ভারতবর্ষে তাহার আবির্ভাব। কিন্তু বিস্ময়ের কথা যাহা তাহা এই—মাত্র কয়েক হাজার বৎসরে মানব-সভ্যতার কী বিপুল বৈভব! যতই দিন অতিবাহিত হইতেছে ততই তাহার গতি-মাত্রা (tempo) বাড়িয়া চলিয়াছে, ততই যেন অভাবনীয় ঐশ্বর্যের ও দুর্জ্ঞেয় জটিলতার, অথচ মহত্তর সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া যাইতেছে।

মানব সভ্যতার সূচনা

কী বিশেষ সম্পদে মানব-সভ্যতার এই সৌভাগ্য, এই সম্ভাবনা, এই জটিলতা ও এই মহৎ গরিমা?—সম্ভবত একটি কথায় তাহাকে বলা যায় 'বিজ্ঞান।' বিজ্ঞানের দানেই মানব-সভ্যতার এই অভিনব বিকাশ ও এই জটিল ভবিষ্যৎ।

পণ্ডিতেরা অবশ্য বলিবেন আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া সাধারণ ভাবে বলি এক হিসাবে তাহার জন্ম মাত্র দুই শত বৎসর পূর্বে—হয়ত আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের ও শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হইতে তাহার কাল পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু অন্য অর্থে বিজ্ঞান প্রায় মানুষের জন্মগত অধিকার। পরিণত

মস্তিষ্ক ও হস্তের অধিকারী হইয়া যে জীব জন্মগ্রহণ করিল সে প্রথমাবধিই আপন অভিজ্ঞতা হইতে জীবনের অবস্থা বুঝিতে চাহিয়াছে। আর সেই অবস্থা বুঝিয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সে আগুনের ব্যবহার শিখিল, পাথর কাটিয়া হাতিয়ার গড়িল, শীতাতপে আপনাকে বাসগৃহে ও পশুচর্মে রক্ষা করিতে লাগিল। আর ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের ভাব ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদানও করিতে পারিল। বিজ্ঞানের প্রথম সূচনা এইরূপে, আর সভ্যতারও সূচনা ইহাতেই।

বিজ্ঞানই সভ্যতার নির্মাতা

এই আদি-বিজ্ঞান ও প্রাচীন-বিজ্ঞানের স্তরে অবশ্য বিজ্ঞানের স্বরূপ বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিজের শক্তির সন্ধানও তাই সে তখন লাভ করিতে পারে নাই। তখনো অলৌকিকে ছিল তাহার অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভয়। কার্য-কারণ সূত্রে প্রাকৃতিক ক্রিয়া-কলাপ বুঝিয়া, সেই প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় নিজের জীবন-যাত্রাকে গঠন করিবার চেষ্টা দেখা দিল মাত্র তিন-চার শত বৎসর পূর্বে। রোজার বেকনকে মনে করা হয় এই যুক্তি-ধারার গুরু। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, হার্বে ও শেষে নিউটন প্রভৃতি মহামনস্বীরা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেন। আর তাহাতেই মানব সভ্যতাও আধুনিক কালে পুনর্গঠিত ও রচিত হইয়া উঠিল।

কেমন করিয়া প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ, প্রভৃতি যুগ উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানের দানে মানুষ আধুনিক কালে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং তারপর কী দ্রুতগতিতে বাষ্পযুগ, বিদ্যুৎযুগ ছাড়াইয়া এখন আণবিক যুগের দ্বারে আসিয়া মানব সভ্যতা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায় কেমন করিয়া মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানই দিনের পর দিন প্রধানতম শক্তির উৎস, সভ্যতার উৎস, এমন কি, ধ্যান-ধারণারও নূতন নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, বিজ্ঞান অর্থ এখন শুধু রেল, স্টিমার, বিমান, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন কিম্বা বাষ্প, বিদ্যুৎ আণবিক শক্তি চালিত যান-বাহন ও উৎপাদন যন্ত্র বুঝায় না। উহাদের প্রভাবে পুনর্গঠিত পৃথিবী-জোড়া আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও মানুষে-মানুষে আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকেও বুঝায়। বীজাণু-তত্ত্ব, এক্স রে, পেনিসিলিন, এ্যান্টিবায়োটিক্স্ এমন কি, শল্যবিদ্যার মত চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া সমূহকেও বুঝায়। শিল্প-কলা, মুদ্রাযন্ত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, বেতারচিত্র প্রভৃতি আধুনিক সমাজ-সম্পদ ও চিত্তসম্পদকেও বুঝায়। এক কথায়, বিজ্ঞান বলিতে আধুনিক মানুষের সমগ্র জীবন-পদ্ধতিকেই (way of life) বুঝায়। মানব-সভ্যতায় বিজ্ঞানের দান গণিতে বসিয়া তাই শুধু শিশুর বিস্ময়ে প্রাকৃত-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির হিসাব কিংবা মহাকাশের অভিযানের কথা জানিলেই

বিজ্ঞানের অর্থ— 'জীবনের রূপায়ণ'

চলে না। বুঝিতে হয় বিজ্ঞান শুধু ঐ অভাবনীয় কতকগুলি 'খেলা' নয়—উহা জীবনের রূপায়ণ। মানব-সভ্যতার রূপান্তরে মানুষের জীবনের রূপ আজ কী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝাও প্রয়োজন। মানুষ পূর্বে সব জিনিসের জন্যই দেবতার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিত; আত্মশক্তিতে তাহার আস্থা প্রায় ছিল না। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে না—তাহার স্থলে দেখি মানবীয় শক্তিতে তাহার আস্থা, ঐহিক জীবনে তাহার আগ্রহ।

এই সত্য মনে রাখিলে মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের সমসাময়িক অসম্পূর্ণতার কারণও বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞানের দায়িত্ব ও উহার সাধনার ভবিষ্যৎ রূপও কতকাংশে উপলব্ধি করা যায়। কারণ, আজ আমাদের ধর্মে আস্থা কম, অলৌকিক শক্তিতে ভক্তি নাই। অথচ আমরা বর্তমান সভ্যতার প্রয়োজনানুরূপে বর্তমান মানব-জীবনকেও তো রূপায়িত করিতে পারিতেছি না। আমরা বহু যন্ত্র, বহু বস্তু ও বহু পণ্য উৎপাদন করিতেছি, সঞ্চয় করিতেছি; কিন্তু তাহার সার্থকতা সাধন করিতেছি কি? পৃথিবীতে নাকি এত খাদ্য ও এত বস্ত্রের উৎপাদন হয় যে এখন আর কাহারও পুষ্টির অভাব বা আচ্ছাদনের অভাব হইবার কথা নয়। অথচ, পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক এখনো প্রায় অন্ন-বস্ত্রহীন। আমেরিকায় বাড়তি গম, কফি, কমলালেবু সমুদ্রে ঢালিয়া বা পুড়াইয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কারণ, তাহা না হইলে বাজারে এসব দ্রব্যের দাম পড়িয়া যাইবে, এই সব দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার বাড়িবে না। আবার এমন অনেক আবিষ্কার আছে যাহা চালু করিলে মানুষের পরম লাভ হইবে, যেমন চিরস্থায়ী বাল্‌ব। উহা প্রচলিত হইলে কিন্তু এখনকার মত প্রদীপ ব্যবসায়ীদের মুনাফা চিরদিন বজায় থাকিবে না। অতএব, ঐরূপ আবিষ্কার প্রদীপ ব্যবসায়ীরা পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া এসব দ্রব্যের উৎপাদনও প্রবর্তন বন্ধ করিয়া রাখিল। চোখের উপরই আমরা দেখি—ঔষধের ভেজাল, খাদ্যের ভেজালে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় দান বিফল হইতেছে। ইহাও জানি,—যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কারে যোগ না দিলে বৈজ্ঞানিকরা পদচ্যুত হন। তাঁহাদের ল্যাবরেটরিতে সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, ফলে বৈজ্ঞানিকদের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বহুদিকের প্রমাণ হইতে বুঝি—'সমাজের রূপায়ণ' না করিলে জীবনের রূপায়ণ ব্যর্থ হয়। অতএব, বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব আজ সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস। মুনাফার জন্য নয়, মানব-সহযোগিতায় ও মানব-মৈত্রীর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানকে উৎসর্গ করাই এই পথে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। ব্যক্তিস্বার্থ, জাতিস্বার্থ নির্বিশেষে সমাজ-তত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকেও যথার্থ বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে—এবং আণবিক শক্তি ও সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে এই সমাজ রূপায়ণে প্রয়োগ করিতে হইবে।

সমাজের রূপায়ণ

ইহাতেও অবশ্য জীবনের রূপায়ণ সম্পূর্ণ হইবে না। মানুষের ব্যক্তি জীবনের প্রীতি-আনন্দের সম্বন্ধে বিজ্ঞান নিরপেক্ষ। কার্যকারণ সূত্রে আমরা প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা যতটা লাভ করিয়াছি, ততটা নিজেদের অন্তরকে সংযত ও প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে শিখি নাই। অবশ্য সমাজের যথোচিত বিন্যাস ঘটিলে ব্যক্তির সেই শুভবুদ্ধি অনেকটা মালিন্যমুক্ত হইবে। কিন্তু তখনো প্রয়োজন থাকিবে নিজের অন্তরকে বুঝিবার; পরের ভাবনাকে জানিবার; আমার প্রতিবেশীকে আমারই মত প্রেম, প্রীতি, ক্রোধ, ভয়-মিশ্রিত মানুষ রূপে দেখিবার, বুঝিবার, আত্মীয় করিবার। মনোবিজ্ঞান, ও নন্দন-বিজ্ঞান সেই পথে নূতন আলোক দেখাইতে পারিবে,—আধুনিক মনোবিজ্ঞানের, বিশেষতঃ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণা হইতে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। মানুষের মন হইবে ভাবী বিজ্ঞানের প্রধান একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র।

মনঃসমীক্ষণ

মানব-সভ্যতা বিজ্ঞানের দানে যতই বিকশিত হইয়াছে, ততই জটিলও হইয়াছে। শুধু মহাকাশে নয়—আপনার অন্তরাকাশেও বিজ্ঞান তাহাকে জয়ী করিবে,—ইহাই এখন সভ্যতার দাবি।

[মন্তব্য : 'এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ' নামীয় রচনাটি থেকে আরও অনেক কথা জানতে পারবে। তা থেকে নোতুন করেও রচনাটি লিখতে পার।]

॥ আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান-সাধনা ॥

[*প্রবন্ধ-সংকেত*]

বিজ্ঞানের অনুশীলনেই সভ্যতার বিকাশ—প্রাচীন ভারতের সভ্যতা শুধু অধ্যাত্ম-জ্ঞানেরই চর্চা করে নাই, বাস্তব জ্ঞানেরও গৌরবময় অনুশীলন করিয়াছে। ভারতীয় সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্লেষণ শক্তিতে—ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতিতে; তারপর আয়ুর্বেদ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, এমন কি, স্থাপত্য প্রভৃতি নানা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে (যেমন, সমুদ্র গুপ্তের স্তম্ভ)। মুসলমান আমলেও এই ঐতিহ্য লুপ্ত হয় নাই। আরব ও যবন (গ্রীকোরোমান) বিজ্ঞানের ঐতিহ্য লইয়া মুসলমান-জগৎ বিজ্ঞান চর্চা করিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে নব্যবিজ্ঞানের চর্চায় যে জোয়ার আসিল মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে মোহবদ্ধ ছিল।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা

ভারতবর্ষে নব্যবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় ব্রিটিশ আমলে—প্রথম পর্বে লক্ষণীয় স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা, হিন্দু কলেজে বিজ্ঞান পাঠের আয়োজন, পাদ্রিদের রচিত 'পশ্বাবলী', কেরির কৃষি-বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রধান প্রতিষ্ঠান স্থাপন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিন্তায় ভারতীয়দের আগ্রহ। বস্তুনিষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাধানাথ শিকদার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। আর উল্লেখযোগ্য মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিষ্ঠান (১৮৭৬), 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম প্রভৃতি মনস্বীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আগ্রহ। মনে রাখিতে হইবে, পরাধীন জাতির পক্ষে মূলতঃ বিজ্ঞানের দ্বার ছিল তখন রুদ্ধ—বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছিল সুদুর্লভ। দ্বিতীয় স্তরে দেখি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্রিটিশ মনস্বীদের ভারতে বিজ্ঞানচর্চা।—ইহার মধ্যে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (১৮৫০), কেরি প্রমুখদের 'হর্টিকালচারাল সোসাইটি' প্রভৃতি গঠন 'জিওলোজিক্যাল সার্ভে' (১৮৫১), প্রাকৃত-বিজ্ঞান চর্চা, 'উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সার্ভে' (১৮৬৯), প্রভৃতি গঠন উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়দের 'বিজ্ঞান-বোধন'—ইহার ক্রমবিস্তার এইরূপ—মহেন্দ্রলালের পর জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির প্রাথমিক প্রয়াস; ১৯১৪তে সায়েন্স কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা;—কলিকাতা সায়েন্স কলেজে বিজ্ঞান গবেষণার সূচনা;—মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বিজ্ঞান গবেষণায় প্রবেশ; 'হফকিন ইনস্টিটিউট' (১৮৯৯), 'টাটা ইনস্টিটিউট' প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্রহ্মচারীর কালা জ্বরের ঔষধ আবিষ্কার। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৩৫), এবং সরকারী 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৪১) যুদ্ধের তাড়নায়।

নব্যবিজ্ঞানের প্রবর্তন ও বাধা

বিজ্ঞান-চর্চার বাধা অপসারিত হইতে থাকে (ক) মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে। আপৎকালে শাসকরাও তখন বিজ্ঞানকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন; (খ) স্বাধীনতা লাভে (১৯৪৭),—ভারতবাসী অবশেষে বিজ্ঞান আশ্রয় করিয়া দেশ ও জীবন পুনর্গঠন করিবার সুযোগ পাইল। যথা:

বাধা অপসারণ

1. কাউন্সিল অব ন্যাচারেল রিসার্চ এণ্ড সায়ন্টিফিক রিসার্চের প্রতিষ্ঠা (১৯৫২ সালে)। ইহার তত্ত্বাবধানে নূতন নূতন সরকারী গবেষণা-মন্দির ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। প্রায় ১৯।২০টি এখন প্রতিষ্ঠিত। যথা, **নিম্নলিখিত 'ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি' স্থাপিত হইয়াছে:**

১। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি—নয়া

২। ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি—পুণা।

৩।	”	মেটলার্জিক্যাল ল্যাবরেটরী	—জামসেদপুর।
৪।	”	ফ্যুয়েল (খনিজ) ”	—দিগবাদি (ধানবাদ)।
৫।	”	গ্লাস ও সিরামিক ”	—যাদবপুর।
৬।	”	লেদর ”	—মাদ্রাজ।
৭।	”	ড্রাগ রিসার্চ ”	—লক্ষ্ণৌ।
৮।	”	ইলেকট্রো কেমিক্যাল	—কড়াইকুড়ি।
৯।	”	রোড রিসার্চ ”	—নয়াদিল্লী।
১০।	”	বিল্ডিং রিসার্চ ”	—রুরকি।
১১।	”	স্ট্যাণ্ডার্ড রিসার্চ ”	—নয়াদিল্লী।
১২।	”	সল্ট রিসার্চ ”	—ভবনগর।

II. অ্যাটোমিক রিসার্চ কমিশন—(১৯৪৮)

(১) ডাক্তার ভাবার পরিচালনাধীন—টাটা ইনস্টিটিউট্। এই গবেষণাগারে এখন আণবিক শক্তি উৎপাদন হইবে।

(২) কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের সহিত সংযুক্ত ডাঃ সাহার স্থাপিত পরমাণু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট।

(৩) ত্রিবাঙ্কুরের আলোয়ে'র 'রেয়ার আর্থ ফ্যাকটরি'—মোনাজাইট, বালুকণা হইতে ক্লোরিড, কারবোনেট ও থোরিয়াম অক্সাইড উৎপাদন চলিতেছে।

III. বহু বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রভৃতি মারফৎ বিজ্ঞানের নানা গবেষণা, ও নানাদিকে সরকারী সহায়তা দান।

(১) পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রসার—পুণায় কৃষির, কলিকাতায় পাটের, নানকুমে লাক্ষার, দেরাদুনে বন্যজাত প্রভৃতি দ্রব্যের গবেষণার বিস্তার।

(২) বৈষয়িক উদ্দেশ্যে বে-সরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত গবেষণা মন্দির—টাটা, বিড়লা, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও আই-সি-আই প্রভৃতি বিলাতী ব্যবসায়ীদের প্রয়াস এই দিকে লক্ষণীয়।

(৩) শিল্প-বিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের যুগে আমরা প্রবেশ করিতেছি—স্টিল, তৈল-শোধন, পেনিসিলিন প্রস্তুত প্রভৃতি অজস্র কর্মে আমরা উদ্যোগী, সরকারী ও বেসরকারী বহু উদ্যোগ চারিদিকে সুস্পষ্ট।

উপসংহার

ত্রুটি (ক) আমাদের যতটা ঢক্কা-নিনাদ ততটা কাজ নাই ; (খ) সাধনা অপেক্ষা চাতুরীর দিকে ঝোঁক বাড়িতেছে। (গ) অন্যদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি আরও দ্রুত চলিয়াছে—আমরা সে তুলনায় অগ্রবর্তী হই নাই, বরং আরও পিছনে পড়িয়া যাইতেছি। (ঘ) জীবনে বিজ্ঞানের দান প্রয়োগ করি না।—পুঁথিতে পড়ি, ল্যাবরেটরিতে দেখি, কিন্তু তাহা জীবনে খাটাই না।

॥ আণবিক যুগ ॥

ইতিহাসের যুগবিভাগ বহুদিন যাবৎ মানুষ করিয়াছিল রাজা ও রাজবংশের উত্থান-পতন দিয়া, কিম্বা জগদবরেণ্য ধর্মগুরুদের জন্ম ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার সন-তারিখ দিয়া। কালের গণনায় দুইই আজ বাতিল হইতে চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিচারে মানুষের ইতিহাস—তাহার সামগ্রিক আত্মবিকাশের ইতিহাস। সেই হিসাবে ইতিহাসের কাল-বিভাগ হয় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের এক-একটি রহস্য-উন্মোচনে, এবং প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের অধিকার-লাভে। এইরূপে প্রস্তরযুগ গিয়াছে, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগ অতিবাহিত হইয়াছে। বাষ্প ও বিদ্যুতের যুগও প্রায় শত'বৎসরের শেষে আজ যাইতে বসিয়াছে। মানুষ এখন আণবিক যুগের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কারণ, আণবিক শক্তির উপর মানুষ অধিকার লাভ করিয়াছে। মানুষের সভ্যতায় এখন ক্রমে আণবিক শক্তিই প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে। বাষ্প ও বিদ্যুৎ শক্তি পর্যন্ত সেই তুলনায় হইবে গৌণ।

সূচনা : যুগ বিভাগের সূত্র

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই শক্তিই আধার। ইট-কাঠ পাথরই বলি আর জীবজগৎই বলি সকলেরই মধ্যে শক্তি সক্রিয়। বিশ্বশক্তির মূলাধার তবে কি?—এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা হয়ত নিরর্থক। তথাপি প্রকৃতি-রাজ্যের অশেষ রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অন্তত গ্রীসে ও ভারতবর্ষে কোনো কোনো মহামনস্বী জিজ্ঞাসু প্রাচীন কালেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই জগৎ মূলতঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সেই ক্ষুদ্রতম অণুকণাকে অনেকদিন পর্যন্ত মলিকিউল (molecule) বলিয়াই অভিহিত করিতেন। তারপর উহাকেও ভাগ করিয়া পাইলেন পরমাণু বা অ্যাটম্। উহাই চূড়ান্ত, উহাকে আর ভাগ করা চলিবেনা—ইহাই ছিল বিজ্ঞানের বহুদিনের বিশ্বাস। এই পরমাণু কণার দ্বারাই পৃথিবীর ৯২টি মৌলিক পদার্থ (element) গঠিত। সর্বাপেক্ষা লঘু-পরমাণু কণা হাইড্রোজেন। উহার ওজন ১ ধরিলে, সর্বাপেক্ষা গুরু পরমাণু উরেনিয়ামের ওজন হয় ২৩৬'৭। আর পরমাণু মাত্রই এত ক্ষুদ্র যে তাহার ধারণা করাও দুঃসাধ্য। যেমন, ১২ ইঞ্চি কার্বনে ঠাসাঠাসি করিয়া পুরিলে ১ ইঞ্চিতেই .০ কোটি পরমাণু ধরিবে। ক্রমে দেখা গেল প্রত্যেক পরমাণুরও কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস বলিয়া একটি বস্তু আছে; উহারই চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান অন্য বস্তুপুঞ্জও রহিয়াছে। এই কেন্দ্রে থাকে প্রোটোন ও নিউট্রন, আর উহার চারিদিকে বিচরণ করে ইলেকট্রন। আর প্রোটন ইলেকট্রন দুই

পরমাণুর গবেষণা

এর মধ্যে যে পজিটিভ্ ও নিগেটিভ্ বিদ্যুৎ-প্রবাহ থাকে তাহাতে প্রতি পরমাণুর মধ্যে সাম্য ঘটিয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন অ্যাটমের ইলেকট্রনের সংখ্যানুযায়ী 'চার্জ' বা শক্তি বিভিন্ন। যেমন, হাইড্রোজনে ১, উরেনিয়ামে ৯২। প্রতি পদার্থই তড়িৎ-আধার। ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটোনের এই সংখ্যার বিভিন্ন পরিমাণে ও নানা বিন্যাসেই বিচিত্র পদার্থ গঠিত। সেই পরিমাণ বাড়িলে বা কমিলে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন, প্রকৃতির কারখানায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের এই পরিবর্তনে রেডিয়াম রূপান্তরিত হয় শিশায়। অ্যাটমের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ভাঙ্গিয়া উহাতে নূতন কিছু ঢুকাইতে পারিলে এই আণবিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা এই তত্ত্ব প্রায় ১৯০৫ সালের কাছাকাছি জানিতে পারিলেন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভাঙিতে (fission) পারিলে যে কী প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হইবে, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ভাঙ্গিবার উপায় কি?

বহুদেশের বহু আণবিক বৈজ্ঞানিকের গবেষণা নানা ভাবে এই দিকে মানুষের আণবিক-জ্ঞানকে অগ্রসর করিয়া দিতে থাকে। কোনো একজন বিশেষ মনস্বীর দানে নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগের চিরাগত নিয়মেই আণবিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ক্রমশঃ উদ্ধার করা সম্ভব হইল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (খ্রীঃ ১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ে সামরিক প্রয়োজনে এই আণবিক শক্তি আয়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। হিট্‌লারের য়িহুদী-ধ্বংস নীতির ফলে জার্মানির শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তখন মার্কিন দেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। হিট্‌লারের দানবীয় ধ্বংসনীতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের ও অন্যান্য মনস্বীদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা একত্রিত হয়—মার্কিন রাষ্ট্রের প্রভূত ধনবল ও বিরাট যন্ত্রবল ইঁহাদের গবেষণা ও পরীক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র নির্মাণ করিয়া দিল। উরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভাঙনে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিকে বোমার আকারে অধিকার করার চেষ্টা এইভাবে চলে। যুদ্ধের শেষ দিকে আণবিক শক্তির এই রহস্য উদ্ধার করিয়া সত্যই আণবিক বিস্ফোরণের আয়োজন হইল। ইউরোপের যুদ্ধ তখন শেষ হইয়াছে; জাপানের পরাজয়ের পক্ষেও বাধা নাই। এমনি সময়ে আণবিক বোমার প্রথম বিস্ফোরণ করা হয়—প্রথম ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর; তারপর দুইদিন পরে নাগাশাকি শহরের উপর। 'সামগ্রিক যুদ্ধ' এইবার প্রায় সামগ্রিক ধ্বংসের বিভীষিকা সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া শেষ হইল। মহাধ্বংসের মধ্য দিয়া এইরূপে সেই দিন আণবিক যুগ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইল।

কিন্তু আণবিক শক্তি শুধু ধ্বংসের দূত নয়। যে অগ্নি মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তাহার সর্বনাশ করিতে পারে, সেই অগ্নির মত পরম সুহৃদ মানুষের আর কে

আছে? তাহাকে দেবতার দূত বলিয়াই আর্যরা তাই স্তব করিতেন।

আণবিক যুগের আশীর্বাদ

আণবিক শক্তিও অনন্ত আশীর্বাদ লইয়া উদিত হইতে চায়। ইহার কল্যাণদায়িনী শক্তি না থাকিলে আণবিক যুগকে আমরা 'আণবিক যুগ' না বলিয়া "প্রলয়ের ক্ষণ'ও বলিতে পারিতাম। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরাই কার্যত দেখাইয়া দিতেছেন আণবিক শক্তির সহায়তায় মানুষ সভ্যতার এক নূতন রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছে। আণবিক শক্তির দানে অফুরন্ত শস্যভারে নূতন সমৃদ্ধি আয়ত্ত হইতে পারে। তেজঃপ্রভাবে বাড়িঘরের শীতাতপ অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। যানবাহনের গতিবেগকে বহুগুণে বর্ধিত করিয়া জীবনকে সমৃদ্ধতর করা সহজ। চিকিৎসা বিদ্যায় অবশ্য আণবিক বিজ্ঞানের সহায়ে ইতিমধ্যেই বহু উন্নতি সাধিত হইতেছে। কিন্তু সেখানেও আরও বিরাট আবিষ্কার সন্নিকট। যান-বাহনের দিক হইতে বলা যায় বাষ্প-বিদ্যুতের অপেক্ষাও বহু সহস্রগুণ কার্যকরী আণবিক শক্তি ;—অবশ্য সেই প্রয়োগ এখন পর্যন্ত প্রধানতঃ "ডুবোজাহাজ' প্রভৃতি যুদ্ধ-সম্পর্কিত বাহনেই নিযোজিত রহিয়াছে। তবে সোভিয়েত দেশে দুস্তর পাহাড় চূর্ণ করিয়া মরুপ্রদেশে জলধারা বহিয়া আনিবার পথ-নির্মাণে আণবিক শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই দেশ শান্তিপূর্ণ আর্থিক বিকাশের স্বপক্ষেও এই শক্তির প্রয়োগে উদ্যোগী। শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিগবেষণায় আণবিক বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে নূতন ও বহুল শস্য উৎপাদন সম্ভব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে আগামী কয়েক বৎসরে যে কী বিরাট রূপান্তর ঘটিবে তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়।

স্বীকার করিতে হইবে, আণবিক বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির সুযোগ গ্রহণে সোভিয়েত সমাজ যতটা সচেষ্ট হইয়াছে অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রশক্তি বা সমাজশক্তি

শক্তির অপপ্রয়োগ

ততটা সেইদিকে আগ্রহশীল নয়। অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম আণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়। উহা একচেটিয়া করিয়া রাখা ছিল মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির অভীষ্ট। তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আণবিক গবেষণায় এখনো সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকরা মার্কিণ রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকদের পিছনে ফেলিয়া গিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তবে আমেরিকার আণবিক গবেষণা প্রায় ৯০ ভাগই সমরাস্ত্রের ও ধ্বংসাস্ত্রের আবিষ্কারে প্রযুক্ত। যুদ্ধোদ্দেশ্যেই যেন তাহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাধনা। তাহাদের ভাবখানা এইরূপ—সোভিয়েত যদি ক্ষেপণাস্ত্রে (missile) অভাবনীয় বলের অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আণবিক বিস্ফোরণাস্ত্রে ততোধিক বল আয়ত্ত করিবে, অতি-আসুরিক বলদর্পে সোভিয়েতকে শাসাইবে ও ইচ্ছানুরূপ ধ্বংস করিবে; সেই নিধন-যজ্ঞে যদি পৃথিবীর মানুষ ভস্মীভূত হইয়া যায়—তাহাতেই বা কি?

মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ এইরূপে এই আণবিক যুগের মানুষের আপন ধৃষ্টতায় ও দুর্বুদ্ধিতে আজ সত্যই বিভীষিকাচ্ছন্ন। তাই আইনষ্টাইনের মত মহামনস্বী মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে গভীর হতাশায় ও বেদনায় বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"বিজ্ঞানের এইরূপ অপব্যবহার হইবে জানিলে আমি প্লাম্বার বা ড্রেন ও কলের মিস্ত্রি হইতাম।" ফ্রান্সের জোলিও কুরি, যুক্তরাষ্ট্রের ওপেনহাইম, ইংলণ্ডে বের্ণল প্রমুখ দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা অনেকেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন—প্রায় আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছেন। রাষ্ট্রনায়কদের নিকট ইঁহারা প্রতিনিয়ত বাধা পাইতেছেন। আণবিক যুগ শুধু ধ্বংসের বিভীষিকাই বহিয়া আনে নাই, বৈজ্ঞানিকের জগতে, মহামনস্বিতার জগতে যে "আণবিক বিবেক-বোধ" নূতন বিশ্ববোধ ও দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিতেছে, ইহাও ভুলিবার নয়।

'আণবিক' নব চেতনা

আসল কথা, ইতিহাসে আণবিক শক্তি এক বিপ্লবী শক্তির মতই আবির্ভূত হইয়াছে। বারুদের আবিষ্কারে যেমন সামন্ত-সমাজের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে, আণবিক শক্তির আবিষ্কারেও আজ সেইরূপ যুদ্ধ, জাতিগত স্বার্থান্ধতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং মুনাফাদারী পদ্ধতিতে সমাজ পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আণবিক যুগ তাই বিপ্লবী যুগ—অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্য হইতে নূতন সৃষ্টির সাধনা।

বিপ্লবের যুগ

[মন্তব্য : 'যুগ' কথাটির উপর কতকটা জোর দিয়ে এই রচনাটির সূচনা করা হয়েছে, এবং উপসংহারেও সেই যুগের অর্থটাই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি 'আণবিক শক্তি' শুধু এই নামে রচনাটি লিখতে হত, তাহলে এরূপ 'সূচনা' ও উপসংহার' অসঙ্গত হয়ে উঠত। তখন সূচনা করা চলত অন্যভাবে :—যেমন, 'পরমাণুর গবেষণা অনুচ্ছেদ হইতে এইভাবে— "......'অনোরনীয়ান্ মহতোমহীয়ান্',—উপনিষদের ঋষিরা এইরূপেই পরম ব্রহ্মকে বিশ্বশক্তি জ্ঞানে ধ্যান করিয়াছেন। অণু-পরমাণুর মধ্যেও যে মহতোমহীয়ান্ শক্তিই বর্তমান, এই সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন আধুনিক যুগের ঋষিরা—তাঁহারাই বৈজ্ঞানিক। বিশ্বসত্যকে জানিবার জন্য তাঁহাদের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তপস্যা ও আত্মদানের সাধনা চলিয়াছে, ইহা কোন ঋষির পক্ষে না স্পৃহনীয় হইত ?" ইত্যাদি।

উপসংহার অবশ্য এই রচনার অনুরূপও হতে পারে—তবে সে ভাবটি আরও একটু প্রকটিত করা উচিত। "প্রকৃতি রাজ্যের এক-একটা বিরাট শক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গেই সমাজের পরিবর্তনও অনিবার্য হয়। সে পরিবর্তনে যাদের স্বার্থহানি হয় তারা বাধা দেয়। কাজেই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, এমন কি সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার ফলে সৃষ্টির নূতন যুগ আসে, মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। সভ্য মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত এই অনিবার্য সংগ্রামকে যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে ও দ্রুতগতিতে পরিচালনা করে, নূতন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে তোলা। সভ্যতার এই দায়িত্ববোধও মানুষ আজ স্বীকার করে। তাই, আণবিক বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে কোনো রাষ্ট্রীয় দলই একেবারে অসম্মতি প্রকাশ করে না—অনিচ্ছুকরা চায় প্রকারান্তরে তা নাকচ করতে। তাই যত কম সংখ্যাতেই হোক্, বৈজ্ঞানিকেরাও বিজ্ঞানের এরূপ অপপ্রয়োগে আপত্তি করেছেন। কিন্তু দরকার হচ্ছে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা এবং সাধারণ

॥ পরিশ্রম ॥

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের নিকট প্রধান সত্য এই যে, মানুষের কর্মশক্তির সার্থক প্রয়োগেই সমাজের সার্থকতা। কর্মশক্তি শ্রমশক্তির অন্য নাম; কাজ পরিশ্রমেরই ফল। প্রতি মানুষেরই কাজের শক্তি আছে, এবং যাহা তাহার জীবিকার্জনের জন্য প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষাও বেশি শক্তি আছে। এই কর্মশক্তি এই ভাবে উদ্বৃত্ত থাকে বলিয়াই গিরিগুহাবাসী আদিম মানুষ খাওয়া-পরাতেই সন্তুষ্ট রহে নাই; সভ্যতা গঠন করিয়াছে। ক্রমবর্ধমান সেই মহা-আয়োজন তাহার কর্মশক্তিরই পরিণত ফল। মানুষের শ্রমশক্তি, কর্মশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক বলিয়াই সভ্যতারও এইরূপ বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।

সূচনা: পরিশ্রম স্বাভাবিক ধর্ম

নিতান্ত বিকৃতচিত্ত মানুষ ছাড়া সকলেই স্বাভাবিকভাবে আপন কর্মশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে চায়। স্বাভাবিকভাবে জীবিকার্জনের মত পরিশ্রম করিতেও কেহই পরাঙ্মুখ নয়। এই শেষ কথাটি শুনিলে একটু চমকিত হইতে হয়। কারণ, আমরা ধরিয়া লই পরিশ্রম বুঝি মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। আলস্যই বুঝি মানুষের প্রবৃত্তি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিব—তাহা মোটেই সত্য নয়। জীবনের চিহ্নই হইল কর্ম। প্রাণশক্তির নিয়মই হইল আপনার প্রকাশ ও বিকাশ। এই প্রকাশ ও বিকাশ প্রথমতঃ কর্মসাপেক্ষ, দ্বিতীয়তঃ চিন্তাসাপেক্ষ।

আজ যে আমরা এই মূল সত্য ভুলিতে বসিয়াছি তাহার কারণ বহু লোকের শ্রমের ফল যে মুষ্টিমেয় লোক অনায়াসে ভোগ করিয়া চলে, তাহারা অনেকেই সমাজে ক্ষমতাবান্, মান্যগণ্য, এমন কি 'অভিজাত'। আর ওই পরিশ্রমী মানুষের পরিশ্রমের বোঝা দুর্বহ: গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব নিদারুণ; শিক্ষাদীক্ষা সন্তান-সন্ততির পালন-ব্যবস্থা, এক কথায় তাহাদের জীবনযাত্রা প্রায় অমানুষিক

পরিশ্রম ও সমাজ-বিকৃতি

মানুষের সুস্থ বুদ্ধিকে সংগঠিত ও সক্রিয় করা।—প্রয়োজন আণবিক শক্তির সঙ্গে মানবিক শক্তির শুভ পরিণয়।"

আরও দু' একটি কথা আছে—প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরমাণুতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলা যায়, বাঙলায়ও সেরূপ বই আছে। অন্য কথা কমিয়ে সে বিষয়ে আরও লিখতে পারলে সেরূপ রচনা আদরণীয় হবে। দ্বিতীয়তঃ 'আণবিক আশীর্বাদের' তালিকা দীর্ঘ করা আরও সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, তা'ই আসল কথা। Peaceful use of Atomic Energy'র উপর বহু সরল ইংরেজি ও বাঙলা পুস্তিকা আছে, তা বেশ চিত্তাকর্ষক। তৃতীয়তঃ আণবিক বিজ্ঞান বহু দেশের বিজ্ঞানীর দানে পুষ্ট, এ কথাটি নাম করে করে দেখানো যে, বিজ্ঞানের পথে সকল জাতির বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতাই উন্নতির মূল। শেষে, 'আণবিক তত্ত্ব' আমেরিকা 'এক চেটিয়া' করে রাখতে চেয়েও পারে নি, এই তথ্যটি উল্লেখ করা—"বিজ্ঞান এরূপ পণ্য নয়, বা জাতীয় সম্পত্তি নয়, বিশ্বমানবের ও বিশ্বমনীষার তা সাধনা।"

রকমের ভয়াবহ। বলাবাহুল্য, ইহা একটা বিকৃত সামাজিক অবস্থা। এই-জন্যই বর্তমান সমাজে পরিশ্রম কথাটির অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'মুখে রক্ত তুলিয়া খাটা'; 'শ্রম ও শ্রমজীবী'র জীবন হইয়া উঠিয়াছে বিভীষিকা; এবং শ্রমজীবীও সঙ্গতিহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন মানুষ হিসাবে হইয়া উঠিয়াছে সমাজের সকলের অবহেলার কিম্বা করুণার পাত্র। এই সমাজ-বিকৃতির জন্যই পরিশ্রম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি-বিকৃতি ঘটিয়াছে।

অথচ, শ্রম-গুণেই সভ্যতা সভ্যতা হইয়া উঠিয়াছে; মানুষ পশু হইতে স্বতন্ত্র জীব হইয়া উঠিয়াছে; আপনার সমাজ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। শিক্ষা বলি, সভ্যতা বলি, শিল্প বলি, বিজ্ঞান বলি, মানুষের মানসিক সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক বিকাশের যত গরিমা করি,—সকলের আদিতে এই পরিশ্রম, অন্তে এই পরিশ্রম, মধ্যে এই পরিশ্রম। প্রতি পদে, প্রতি অণু পরমাণুতে, মানুষের পরিশ্রমের দানকে আহরণ করিয়াই সভ্যতা প্রাণবান। বরং, ইহাই দেখা যায় সভ্যতা বিজ্ঞানবলে আজ এতটা মানুষের শ্রমশক্তিকে বাড়াইয়া দিয়াছে যে, আজ সাধারণভাবে মানুষের দুই-এক ঘণ্টা কাজ করিলেই চলে; বাকী সময় সে আপনার আত্মবিকাশে ও খেলাধূলায়, গানে-বাজনায়, চিত্তরঞ্জনে সার্থক করিতে পারে। অবশ্য তাহার পূর্বে প্রয়োজন সকলের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করা, এবং প্রত্যেকের শ্রমশক্তিকে বিজ্ঞানবলে কর্মোৎপাদক করা।

শ্রম সভ্যতার আদিঅন্ত

পরিশ্রম ব্যতীত সমাজ চলে না, এবং শ্রমশক্তিই সৃষ্টিশক্তি, সেই শ্রমশক্তির ক্রমবিকাশেই মানুষের সভ্যতারও তাই ক্রমবিকাশ—এই কথা হয়ত বুঝিতে দেরী হয় না। কিন্তু কিসে এই শ্রমশক্তির সার্থকতা? তাহাই প্রশ্ন।

সার্থকতা কিসে?

নিশ্চয়ই, দৈহিক ও মানসিক প্রয়াসে সার্থক ও প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্তব্য উদ্‌যাপন করা সকলেরই মূল ধর্ম। কিন্তু কথাটা এত সরল নয়। সংসারত্যাগী বলিবেন,—নিষ্ক্রিয়ভাবে ভগবচ্চিন্তাই সর্বাপেক্ষা বড় কর্ম। যে পরিশ্রম মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ইঁহারা কার্যত তাহাতেই অস্বীকৃত হইয়া বলিবেন—তাঁহারা উচ্চ চিন্তার মানুষ হিসাবেই সমাজের পালনীয় এবং পূজনীয়। আবার, আয়েসি, অভিজাতদের পক্ষ লইয়া পণ্ডিতেরা সমাজতত্ত্বের নজীর দেখাইয়া বলিবেন—"সমাজে যদি এরূপ কিছু অবকাশ-ভোগী মানুষ না থাকে তাহা হইলে উচ্চাঙ্গের শিল্প, চিন্তা, দর্শন, এই সবই সৃষ্টি হইতে পারিবে না।" অথচ, আলস্য জিনিসটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, মানুষের দেহমনের ক্ষয়ের ও বিকৃতির কারণ; এই কথাই প্রধান সত্য। তথাপি দুর্বৃত্তের যেমন ছলের অভাব হয় না, অলস শ্রেণীর স্বপক্ষেও যুক্তির অভাব হয় না। মোট কথা, যে সমাজ-বিকৃতির জন্য পরিশ্রম ভয়াবহ, এবং অনেকটা

পরিশ্রম বিনষ্ট হয়, সেই সমাজ-বিকৃতি পোষণে যাহাদের স্বার্থ তাহারা এইরূপ নানা তর্ক তুলিবেন। কিন্তু প্রধান কথা হইল এই যে, ন্যায়সঙ্গত সমাজ ব্যবস্থায় আলস্যের স্থান নাই। 'যে শ্রম করিবে না সে আহার পাইবে না', ইহা মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের ও ব্যক্তির বিকাশের সুসঙ্গত নিয়মে পরিশ্রমের বিন্যাস করা প্রয়োজন। অবশ্য গোড়ার কথাটাও বোঝা দরকার—বিজ্ঞানের বলে পরিশ্রমের ফলবৃদ্ধি করা ও জীবিকার প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় কমাইয়া অবকাশ বাড়ানো বরাবর লক্ষ্য থাকা উচিত—সেইরূপ অবকাশ আলস্যের কারণ হইবে না, আনন্দের কারণ হইবে।

সামাজিক বিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে মনে রাখা দরকার, দেহের পরিশ্রম ও মস্তিষ্কের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন, দুইই মূলতঃ তুল্যমূল্য। কোনো কাজের মূল্য সেই কাজের সামাজিক প্রয়োজনের জন্য, কাহারও 'পজিশ্যানের' জন্য নয়। যেখানে যেটির প্রয়োজন সেখানেই তাহা সার্থক। চিকিৎসকের মত মহদুপকারী কে আছে? কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কাজের অপেক্ষা নার্সের কাজেই কি সমাজের কম প্রয়োজন? না জমাদারের কাজই কম মূল্যবান? অবশ্য একটিতে বেশি যোগ্যতা লাগে, তাই তাহার মূল্য বেশি। সমাজ একদিন দুয়েরই যথাযোগ্য সমাদর করিবে। কিন্তু এখনো বোঝা দরকার—কোনো কাজই সার্থক হইলে সামান্য নয়। মজুর এবং ম্যানেজার, কৃষক এবং বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক এবং রাষ্ট্রনায়ক—প্রত্যেকেরই সমাজে সমান প্রয়োজন। আর, নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাশক্তি সেই সামাজিক প্রয়োজন মিটাইলে প্রত্যেকেই পূজনীয়।

পরিশ্রমের মূল্য

আর একটি কথাও আছে—সকলের সব বিষয়ে সমান দক্ষতা জন্মে না। সাধারণতঃ অবশ্য অনেকেই প্রায় সমান শক্তির অধিকারী, সুযোগ পাইলে তাহার স্ফুরণ হয়। কিন্তু কেহ কেহ অসামান্য শক্তিরও অধিকারী। আবার কাহারও স্বাভাবিক প্রবণতা কাজকর্মে, কাহারও বা সঙ্গীতে, ভাবনায়। সমাজের পক্ষে তাই প্রয়োজন—প্রথমতঃ প্রত্যেকের স্বাভাবিক বিকাশের সমান সুযোগ দান করা। তারপরে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রত্যেককে নিজের পথে সার্থক হইতে দেওয়া। ইহাও দুঃসাধ্য আদর্শ। কিন্তু সমান সুযোগে যে যাহা হইবার তাহা হইবে, এইজন্য সমান সুযোগ প্রয়োজন। এবং ঠিক এইজন্যই দরকার প্রত্যেকের অবকাশ—এবং সেই অবকাশ সার্থক করিবার মত স্বাধীনতা।

সকলে সমান সুযোগ লাভ করিলেই যে আপনা হইতেই সমান পণ্ডিত বা সমান কর্মদক্ষ কারুবিদ্ হইবে না, তাহা আমরা বুঝি; কারণ সকলের মেধা বা দৈহিক নৈপুণ্য প্রভৃতি সমান নয়। কিন্তু কাহার শক্তি কতটা, তাহা সমান সুযোগ না পাইলে বলা যায় না। ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে—মেধা, নৈপুণ্য, জন্মগত শক্তি সমান

শক্তির পরিশ্রম

সুযোগ পাইলেই ফুটিয়া উঠিবে তাহাও নয়। সেইজন্য চাই ব্যক্তিগত সাধনা, অর্থাৎ পরিশ্রম। প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একজন শিল্পী বলিয়াছেন, "উহা শতকরা ৯০ ভাগ মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ফল আর শতকরা ১০ ভাগ মাত্র প্রেরণার ফল।" এই পরিশ্রমের ফলে যে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিসম্পন্ন সেও তাহার অপেক্ষা অধিকতর ভাগ্যবান-এর সমকক্ষ হইতে পারে, এমন কি, তাহাকে ছাড়াইয়াও যাইতে পারে। জীবন-সংগ্রামে যে দেশে সকলেই সমান সুবিধাভোগী, সেখানেও ইহা সত্য। আর যেখানে সমান আর্থিক সুযোগ নাই, সেখানে সংগ্রাম তীব্রতর,এবং মানুষের পরিশ্রমের পরিমাণও আরও অধিকতর হওয়া প্রয়োজন। পরিশ্রম করিয়াও অনেকে ভুলের জন্য বা নানা প্রতিকুল অবস্থার চক্রান্তে ব্যক্তিগত সার্থকতা অর্জন করিতে পারে না, ইহা দেখা যায়। কিন্তু পরিশ্রম না করিলে তাহা অর্জন করিবার আশাও নাই, অধিকারও নাই। তাহা ছাড়া, যে অলস সেই কি কিছু না করিয়া থাকে? সে যাহা করে তাহার নাম অকর্ম ও কুকর্ম।

সমাজের সমস্ত ভিত্তিই পরিশ্রমের দ্বারা গঠিত ও পরিপুষ্ট। আগামী দিনের সমাজ এই সত্যটা বুঝিয়া পরিশ্রমের সার্থকতার পথ আরও প্রসারিত করিবে। বিজ্ঞানের বলে মানুষের শ্রমশক্তি এখনি বহুগুণ বাড়িয়াছে; আরও বহু-বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে—তখনই পরিশ্রমের প্রকৃত প্রয়োগ ও প্রকৃত মর্যাদা-দান সম্ভব হইবে।

॥ বাঙলার ফুল ॥

পত্র পুষ্প ফল জল—ইহা ছাড়া আমাদের দেবপূজাও নির্বাহিত হয় না। আর্য-সভ্যতায় যাগ-যজ্ঞে অগ্নি, ঘৃত, সমিধ প্রভৃতি না হইলেই নয়; ভারতীয় সভ্যতার দেবার্চনায়ও তেমনি প্রকৃতির এই দান-সমূহই উপাদান—প্রকৃতির নানা রূপের মধ্য দিয়াই যেন আমাদের ভারতীয় আদিপুরুষেরা বিশ্ব-বিধাতার বিধান ও তাঁহার প্রকাশ দুইই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রকৃতির কোনো প্রকাশই তুচ্ছ নয়; কিন্তু প্রকৃতির যে রূপের মধ্য দিয়া আমরা জগতের কমনীয় কান্তি ও নির্মলতার আভাস বিশেষ করিয়া দেখি তাহা পুষ্পময়ী প্রকৃতিলক্ষ্মীর রূপ। বাঙলার প্রকৃতি অবশ্য বিলাসিনী রূপে এই ফুল সজ্জায় মাতেন না, তাহার পুষ্পরচনা যেন স্বভাব-রচনা, প্রয়াসহীন স্বাভাবিক প্রকাশ।

সূচনা

তরুলতা মাত্রই ভূমি ও জলের স্বাভাবিক দান, পৃথিবী ও আকাশের আশীর্বাদ। অবশ্য সকল দেশেই বন্য ফুল লতা ও গাছ মানুষের যত্নে তাহার উদ্যানে গৃহাঙ্গনে আবার অভিনবত্ব, নূতন রূপ ও সুষমা লাভ করিয়াছে। বাঙলার মানুষও কোনো কোনো ফুলকে সেইভাবে আপনার করিয়া লইয়াছে। বাঙলার মাটির ও আকাশের সঙ্গে যেমন, তেমনি বাঙালী জীবনের সঙ্গেও—পুষ্পতরু ও পুষ্পস্তবকনম্রা লতার প্রাণের যোগ। বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোথাও আমরা দেখি একজাতীয় ফুলের প্রাচুর্য, কোথাও অন্য জাতীয় ফুলে প্রকৃতির ঔদার্য। কারো বা রূপ একটি দিনের মত, কারও বা আয়ু একটি ঋতুর মত। আবার ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে কোনো ফুল ফুটিয়া দশ দিক আলো করিয়া দেয়, কোনো ফুল ঝরিয়া পড়ে। বৈশাখ না আসিতেই আমরা চাঁপা, গন্ধরাজ, টগরের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখনো কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে রক্তবর্ণের বিলাস শেষ হয় নাই। রজনীগন্ধা তখন হইতেই আমাদের রজনীর সপ্রেম সহচরী। জুঁই ও বেলফুল মালায় গাঁথা হইতে থাকে; চাঁপার গন্ধ বাতাসে ফিরিয়া বেড়ায়—আমাদের রূপকথার ক্ষুদ্র বোন পারুলকে ডাকিতে থাকে। তারপর আষাঢ়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ ও কেতকীর দিন আসে; কদম্ব নব-শিহরণে বিকশিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। শরতে কাশ ফুলের হাসি ছড়াইয়া পদ্ম ফুটিয়া উঠিতে থাকে। হেমন্ত আসিতে না আসিতেই শেফালির সঙ্গে রাত্রি প্রভাতে পরিচয় হয়। আসে শীত—গাঁদা, সূর্যমুখীর কাল। তারপর বসন্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে অশোক কিংশুক হইতে শিমূলের

ঋতু ও ভূমির বৈশিষ্ট্য

শাখায় পর্যন্ত জাগিয়া উঠে রক্তিমার উন্মাদনা। কৃষ্ণচূড়া ও গুলমোহিরের দিনও আর দূরে নাই—তাহা জানিতে পারি 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে'। পুষ্পে পুষ্পে বাঙলার ঋতু-মণ্ডপ সারা বৎসর ধরিয়া ভরিয়াই থাকে। তাই কদম্ব ও কেয়াকে লইয়া যখন বর্ষার দিনে বিমুগ্ধ হইব, তখন অশোক-পলাশের কথাই বা বিস্মৃত হইব কেন?

তথাপি সুন্দরের স্বীকৃতি সকলেই করিবে; গুণের সমাদরই বা কে না করিয়া পারে? আর, যেখানে রূপ ও গুণ একত্রিত সেখানে মানুষের প্রাণ আপনা হইতেই উল্লসিত হইতে উঠে। সর্বদিক হইতে দেখিলে, ভারতবর্ষে যে ফুলের রূপে গন্ধে তুলনা নাই সে ফুল বোধ হয় পদ্ম। আমাদের প্রাচীন কাব্যে অশোক-কিংশুকেরও বহু স্তুতি আছে। কালিদাসের শ্লোকে-শ্লোকে আমরা ভারতীয় প্রকৃতির অশেষ পুষ্পসজ্জা ও ভারতীয় জীবনযাত্রায় অসামান্য পুষ্প-প্রীতির চিত্র দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য বাঙলার প্রকৃতি ও বাঙালী জীবনেও লাভ করিয়াছে। সেই ধারাতেই পদ্ম ভারতের ও বাঙালীর সমস্ত সৌন্দর্যের, ঐশ্বর্যের, বিশেষ করিয়া মাধুর্যের ও মঙ্গলের প্রতীক। কমল, শতদল, পঙ্কজ, উৎপল প্রভৃতি কত নামই আমরা তাহার দিয়াছি। আমাদের কবি-কল্পনায় পদ্মের স্থান অতুলনীয়। নয়ন-কমল হইতে চরণ-কমল পর্যন্ত, দেব ও মানবশ্রীর সর্বউপমার জন্যই আমরা পদ্মের শরণ লই। প্রাচীনতম কাল হইতে আমাদের ভাস্কর্যে ও ললিত কলায় পদ্মই প্রধান। আজও আমাদের লোক-জীবনের কথায়, কল্পনায়, মণ্ডন-শিল্পে পদ্মেরই প্রাধান্য অবিসম্বাদিত। তথাপি এই সুজলা বাঙলা দেশের মত অন্য কোথাও বোধ হয় পদ্ম এত আপনার নয়। তাই রক্ত-কমল, শ্বেত-কমল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পদ্মের রূপ দেখিতে আমাদের চোখ স্বাভাবিক ভাবে নাচিয়া উঠে।

সমাদৃত ফুল

পদ্ম বলিলে অবশ্য সাধারণত আমরা জলপদ্মই বুঝি, কিন্তু স্থলপদ্মই কি রূপে কম সুন্দর? তবে জলপদ্মের সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায় কুমুদ-কহ্লারের কথা। বাঙলার জলভরা মাঠে, পুকুরে, এখানে সেখানে তাহা আরও বেশি ফুটিয়া থাকে। রেলের লাইনের দুই পার্শ্ব হইতে বাঙলার অতিথিকে পদ্মের মতই সানন্দে, অধিকতর প্রাচুর্যে, প্রথম অভিনন্দন জানায় পদ্মের অপেক্ষাও বেশি রক্ত-কুমুদের স্নিগ্ধ প্রস্ফুট হাস্য।

কিন্তু অন্য সকল ফুলকে ছাড়িয়া দিলেও যে ফুল আমাদের ভালবাসার মধ্যে অক্ষয় তাহাকে বিস্মৃত হওয়া চলে না। এক সময়ে তাহা ছিল বেল ফুল। বেলের গোড়ে গলায় পরিয়া আজও আমরা বিলাসমুহূর্তে পুলকিত হই। জীবনের স্নিগ্ধ মুহূর্তগুলিতে জুঁই ফুলকে স্মরণ করি, মালতীকেও বরণ করি। কিন্তু যে ফুলে আজ আমাদের মনে একটি প্রীতিস্নিগ্ধ রসলোক গড়িয়া উঠে তাহা রজনীগন্ধা। লম্বা ডাঁটের মাথায় এই নাতি-বিলাসিনী ফুলটি যেন

আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে আপনি সচেতন, আপন দৃঢ়তায় অনমনীয়। অথচ সে দৃঢ়তায় ঔদ্ধত্য না[illegible] অশ্রদ্ধা নাই, উগ্রতা নাই—তাহার স্নিগ্ধ আঘ্রাণে অন্তরের কমনীয় শ্রী ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত।

সাধারণ ফুল

বৈশিষ্ট্য অবশ্য কাহারও একচেটিয়া নয়। প্রত্যেকেই নিজের রূপে বা নিজের গুণে নিজে স্বীকার্য। বাঙলা দেশের জাতি, যুথী, মালতী, মল্লিকা-দেরই শুধু সমাদর করিব কেন? আমরা অতসী, অপরা-জিতা, জবা, দোপাটি বা আকন্দ, করবীকেই কি তুচ্ছ করিতে পারি? অন্ততঃ এই কথা তো জানি এই আমাদের সর্ব-জন পরিচিত 'গাঁদারও' যদি যত্ন করি তাহা হইলে তাহার মত বাগান আলো করিয়া দীর্ঘদিন আমাদের চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে অন্য কোন্ ফুল? আসলে, যে ফুল সহজেই ফুটিয়া উঠে আমরা তাহার মূল্য দিতে ভুলিয়া যাই—ইহা একটা সত্য কথা, লজ্জার কথাও বটে।

লজ্জার কথা আরও আছে। যাহা যত্নের অপেক্ষা রাখে এমন ফুলকেও আমরা বাঙালীরা সাধারণতঃ পালন করিতে বিশেষ চেষ্টা করি না। মনে করি দুই দশ জন ভাগ্যবান ও বিলাসী মানুষই বুঝি ফুলের কেয়ারী করিবে ও টবে বিদেশীয় ফুলের পরিচর্যা করিবে। এমন কি, গোলাপের মত এত বিশ্বসমাদৃত ফুলের রাণীকেও আমরা যথোচিত সমাদর করিতে শিখি নাই। ক্রিসেন্থিমাম, ডালিয়া, কার্ণেশন প্রভৃতি নিতান্তই এখনো বিদেশীয়। কিন্তু গোলাপকে পর-দেশী বলিলে আজ আমাদের দৈন্যই প্রকাশ পায়। অথচ, পৃথিবীতে শত শত শ্রেণীর গোলাপের বিচিত্র পরিশীলন চলিয়াছে, আমরা তাহার সন্ধান রাখি না। মানুষের সভ্যতার ও সৌন্দর্যবোধের একটা লক্ষণ তাহার এই উদ্যান রচনায় দেখা যায়। ফলোদ্যানের অপেক্ষাও পুষ্পোদ্যান মানুষের সেই উন্নততর সৌন্দর্যবোধের প্রমাণ।

উপসংহার

বিশ্ব-প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে মানব-প্রকৃতি আপনার সুরটি মিলাইয়াই আপনার জীবনকে শ্রেয়তর ও প্রেয়তর স্তরে তুলিয়া ধরে। বনের ফুলকে গৃহের ফুল করিয়া মানুষ বনের ফুলের স্বাভাবিক বিকাশকে সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে। তাহা করিতে করিতেই মানুষ তাহার মনের ফুলেরও সন্ধান পাইয়াছে, তাহার বিকাশ সাধনও করিয়াছে। সভ্যতা মানুষের এই মনের ফুল। ফুলের সমাদরে নানা ফুলের নানা বিকাশের পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া মানুষের এই সভ্যতার জন্য আগ্রহই প্রকাশিত হয়। বাঙালীর সেই সভ্য-দৃষ্টি যতই গভীর ও দৃঢ় হইবে ততই দেশীয় ও বিদেশীয় সর্ব-ফুলকে সে আপনার করিয়া লইতে শিখিবে।

[মন্তব্য : যে সব ফুলের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত সে সব ফুলেরকথাই এরূপ রচনায় বলা প্রথম প্রয়োজন। তবে আজকাল বিদেশীয় ফুলের সমাদর অনেক বেশি; তাতে আপত্তি

॥ বাঙলার পরিচিত পাখি ॥

শিশুকাল হইতে আমরা বাঙালিরা 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর' গল্প শুনিয়া আসি। কখনো বা রূপকথার জগতে 'শুক-সারির' সঙ্গে পরিচিত হই। উপাখ্যানের আশ্রয়ে অপরিচিত 'হীরামন' পাখির অভূতপুর্ব কাহিনীও জানিতে পারি। ছোট টুনটুনি তো আমাদের সকলের প্রিয়। হিতোপদেশের পাতা হইতে 'বায়স', 'টিট্টিভ', 'হংস' প্রভৃতি আমাদের সহিত আলাপ জমাইয়া তোলে। আরও বড় হইতেই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের জগৎ হইতে কাদম্বরীর 'শুক' আমাদের অপূর্ব কাহিনী শোনায়। বাঙালী হিন্দুর পুত্রকন্যারা প্রথম চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত হয় লক্ষ্মীর বাহন 'কাল-পেঁচার' সঙ্গে আর নারায়ণের বাহন 'গরুড়ের' সঙ্গে। যে কবির কাব্যজীবন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদনা হইতে উচ্ছ্বিত হইল তাঁহার মুখ হইতে ধর্মপ্রাণ জটায়ুর বীর্য ও আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়া করুণ মহিমায় আমরা প্রবুদ্ধ হই। কিম্বা, মহাভারতের ধর্মরূপী বকের মুখে শুনিতে পাই মহদ্‌জ্ঞানের উপদেশ। এইরূপে বাঙালীর জীবন পক্ষিলোকের সঙ্গে একটা কল্পনার সূক্ষ্মতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অভ্যস্ত হয়। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলকে লইয়া যে বিশ্ব-জীবন চিরদিন আবর্তিত ও বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে আমরা যে তাহারই অঙ্গ, জীবদেরই আত্মীয়, এই

সূচনা: কল্পলোকের পরিচয়

করবার কিছু নেই। কারণ, দেশের মাটি-জলেই তা জন্মে, তা 'দেশীয়' ব'নে যাচ্ছে। বিশেষতঃ মানুষের যত্নে তার অনেক উন্নতি হয়েছে। এসব ফুলের কথা এখানে প্রায় উল্লেখ করা হল না। কারণ, বাঙালী সাধারণ শিক্ষিত পরিবারও এসব ফুলের বাগান তৈরী করতে পারে না, এবং এসব ফুলের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য জানে না। বিশেষতঃ 'বাঙলার' ফুল বলতে বাঙলার সুপরিচিত ফুলের কথাই বোঝায়।

সম্পূর্ণ অন্যভাবেও এ রচনা লেখা চল্‌ত। একটু বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যেত (ক) কোন্ ফুলের স্বভাব কি, (খ) গাছের ফুল, লতার ফুল, জলের ফুল, স্থলের ফুল ইত্যাদি ফুল কি ভাবে কোন্‌টি জন্মে, কুঁড়ি থেকে বড় হয়ে ফোটে; কেমন তা দেখতে; মঞ্জরী পল্লব, গর্ভকোষ ইত্যাদির বৈচিত্র্যও বর্ণের বিশেষত্বের অপেক্ষা কম নয়; (গ) কোন্ গাছ বা লতার পরিচর্যা কি ভাবে করতে হয়, (ঘ) কি ভাবে কোন্ ফুলের জন্ম ঘটে—ভ্রমরের সহায়ে কিম্বা ওরূপ মধ্যস্থতা ছাড়া, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে বাঙলায়ও বই আছে। সাধারণ প্রকৃতি-পরিচয় থাকলেই চলে। এ সব সংকেত অবলম্বন করে একটা নূতন রচনা লিখলে কেমন হয়?

তাছাড়া, এক-একটি প্রসিদ্ধ ফুল নিয়েও এক-একটি রচনা কেন, একটি বই লেখা চলে। গোলাপের বিষয়ে তো এক লাইব্রেরি বই পাওয়া ইংরেজিতে। আর 'কাব্য' করতে হলে তো কথাই নেই—পদ্ম, গোলাপ, কিম্বা মাঠের ফুল, ঘাসের ফুলই কি সে পক্ষে তুচ্ছ?]

তত্ত্ব আমাদের অধ্যাত্ম-চেতনায় প্রথমাবধি সত্য হইয়া উঠে। শুধু কি তাহাই? আমরা জটায়ুর সঙ্গে যেমন একাত্ম হইয়া যুদ্ধ করি, তেমনি আমাদের ছোট্ট টুনটুনির সঙ্গেও একাত্ম হইয়া সমস্ত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষ লইয়া অত্যাচারী দর্পিত শক্তিকে পরাভূত, নির্জিত ও উপহাস করিয়া খুশি হই।

সুপরিচিত পাখি

যে সব পাখির সঙ্গে বাঙালির প্রভাত হইতে না হইতেই পরিচয় ঘটে তাহার মধ্যে কাককে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। এই নিকষ-কৃষ্ণ ধূর্ত পাখিটি ছাদের আড়ালে, গাছের ডালে বা গৃহের প্রাঙ্গণে পরম উদাসীন চিত্তে বসিয়া থাকে। বুঝিবার উপায় থাকে না যে, বয়স্ক কেহ নিকটে না থাকিলে এক মুহূর্তেই সে যে-কোন-একটি খাদ্যদ্রব্য লুটিয়া লইয়া পলায়ন করিবে। শালিকের সঙ্গেও সকাল বেলাই সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু তাহাকে তাড়না করিতে হয় না; গৃহের প্রাঙ্গণে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক আধটি খুদ-কুঁড়া পাইলেই তুষ্ট। কিচির-মিচির ডাক শুনিয়া মুগ্ধ না হইলেও বারে বারে যখন এই ছোট পাখিটি আপন সঙ্গীদের সহিত উড়িয়া উড়িয়া আসে যায় তখন তাহার ধূসর পক্ষের অন্তরালস্থ শ্বেতাভা একটু সচকিত কৌতূহলের সঞ্চার করে। ইহাই যে রূপকথার 'সারিকা' তাহা অবশ্য মনে পড়ে না; কারণ ছোট হইলেও, বড় বেশি পরিচিত, সাধারণ এই পাখিটি।

পোষা-পাখি

অথচ, যে সব পাখি শখ করিয়া মানুষে পালন করে শালিক তাহাদের মধ্যে তত সমাদৃত নয়। এক সময়ে হয়ত ভারতবর্ষে তাহার সমাদর ছিল, তাই রূপকথার রাজকন্যাকে আমরা বারে বারে শারিকার শরণ লইতে দেখি। ইহাও দেখি—শারিকা ভূত ভবিষ্যৎ জানে, রাজকন্যা-রাজপুত্রের চির হিতাকাঙ্ক্ষিণী;—কল্যাণ-বুদ্ধিই তাহার বিশেষত্ব। 'শুক' অবশ্য ভিন্ন জাতীয় পক্ষী—টিয়াপাখি বলিলেই সে আমাদের আপনার হইয়া যায়। ধানের ক্ষেতে ঝাঁকে ঝাঁকে এই পাখি উড়িয়া আসে; কখনো মঠের চূড়ায় বাসা বাঁধিয়া থাকে। শুক-চঞ্চু কবিদের উপমা, কিন্তু উহা সুন্দর বলিবার উপায় নাই। না হইলে সেই হরিৎ-শ্যামল মসৃণ দেহ ও রক্তবর্ণ ঠোঁট দুইটি দেখিতে সত্যই সুন্দর। প্রত্যেক পাখিরই পালকে এরূপ মসৃণতা আছে—দেহের স্নেহরস ক্ষরণে তাহাতে এই মসৃণতা দেখা দেয়। তাই পালকের গায়ে জল লাগিলেও জলের দাগ পড়েনা। ধরিয়া পোষ মানাইলে 'টিয়া পাখি' গৃহপালিত হইয়া উঠে। শিখাইলে শিস্ দেয়, বাড়ির লোকদের নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে, ছেলেমেয়েদের মুখে শুনিতে শুনিতে বলিতে পারে—'মা খেতে দাও', 'কে এলো?' ইত্যাদি। টিয়ার মতই ছোলা, দানা, চিঁড়া কলা, খাইয়া দাঁড়ে বসিয়া থাকে কালো সুন্দর পাখি ময়না। ঠিক এইরূপেই তাহাকেও বশ

করা যায়। সেও কথা বলে। সর্বাপেক্ষা এই বিদ্যায় সিদ্ধ কাকাতুয়া—কিন্তু উহা বাঙলা দেশের পাখি নয়, 'দ্বীপময় ভারতের' জাভা-সুমাত্রা হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছে। অনেক ছোট ছোট সুন্দর পাখি আছে, দেখিতেও তাহারা সুন্দর। কেহ কেহ পাখিওয়ালাদের নিকট হইতে উহাদের কিনিয়া শখ করিয়া স্বগৃহে খাঁচায় পোষেন। অবশ্য, ধনী শৌখিন লোকেরা কেহ কেহ পক্ষিশালাও স্থাপন করেন, দেশ ও বিদেশের নানা বিচিত্র রূপের ও স্বভাবের পক্ষী পালনে তাঁহাদের শখ। তাঁহাদের কাহারও থাকে বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য, কাহারও শুধু নির্মল বিলাসিতা।

বনের পাখি কিন্তু বনই ভালবাসে, খাঁচার আদর মানিয়া লয় না। বহু পাখিরই আদর আছে—কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, বুলবুল প্রভৃতি তাহাদের মধুর সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ। 'বউ কথা কও', 'চোখ গেল' প্রভৃতি পাখিরও সমাদর ঐ সব নাম হইতেই বুঝা যায়। ঘুঘুর ডাক নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে মানুষের মনকে উদাস করিয়া দেয়। পড়ো বাড়িতে উহারা চরিয়া বেড়ায় বলিয়াই 'বাস্তু ঘুঘু' 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো' প্রভৃতি বিশেষ অর্থের কথাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি ঘুঘুকে কেহ দোষারোপ করে না। পেঁচার আদর ও ভীতি দুই-ই আছে। কোনো কোনোটি লক্ষ্মী পেঁচা, আবার কোনো কোনোটি অজানিত আশঙ্কার বাহক। পায়রা গৃহস্থকে জ্বালাতন করে, তথাপি কেহ কেহ তাহার জন্য ছাদে মাচা বাঁধিয়া রাখে, ঘরে বাক্‌সে খোপ তৈয়ারী করিয়া দেয়; সাদরে আকাশে উড়াইয়া পায়রার খেলা দেখে—নীল আকাশের গায়ে পায়রার ঝাঁকের খেলা দেখিতে চমৎকার। অবশ্য এককালে প্রাচীন ভারতে যেমন বিলাসীদের বলভিতে থাকিত পারাবত, তেমনি ভবন-শিখিকে হাততালি দিয়া নাচানোও ছিল মেঘ-মেদুর বর্ষায় বিলাসিনী পুরবঁধূদের আর একটি শখ। এখন ময়ূর ভারতের নিজস্ব পাখি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ময়ূর সাধারণত বাঙলা দেশে দেখা যায় না; উত্তরভারতেই তাহার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। কেকা ধ্বনিও বাঙলাদেশে সাধারণত শোনা যায় না। বর্ষায় ময়ূরের পেখম ধরাও তাই এখানে একটু দুর্লভ বস্তু।

সমাদৃত পক্ষী

প্রাচীন ভারতে ময়ূর সুখাদ্য বলিয়াও গণ্য হইত। সম্ভবতঃ শুধু 'বন্য কুক্কুট' নয়, কুক্কুটেরও সেদিন সমাদর ছিল। অতি প্রাচীন রাজাদের মুদ্রায় দুই পক্ষীরই তাই চিত্র পাওয়া যায়। আজ অবশ্য হিন্দুরা সাধারণত মুর্গী পালন করেন না, কিন্তু হাঁস ও পায়রা বাঙলার সর্বজাতিরই গৃহপালিত পক্ষী। হাঁসের নানা জাতি আছে। উহার ডিম্ব ও মাংস দু-ই পুষ্টিকর ও সুখাদ্য বলিয়া গ্রাহ্য। তবে যাহারা ভোজন-রসিক তাঁহারা বলেন—এদিকে মুর্গীর তুলনা নাই, গ্রামের কৃষক গৃহস্থদের পক্ষে অবশ্য দুইই সযত্নে পালনীয়। পক্ষী দুইটি ও উহাদের ডিম্বাদি বিক্রয়ের

গৃহপালিত পক্ষী

দ্বারা গৃহস্থের জীবিকার্জনের সহায়তা হয়। অবশ্য দুইই পালনে যত্ন প্রয়োজন। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের দেশে গতানুগতিক নিয়মেই এই পক্ষিপালন চলিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশে poultry farming এর যে অনুশীলন হইয়াছে তাহাতে মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি পক্ষীর অদ্ভুত রকমের উন্নতি ঘটিয়াছে। একেই তো বংশগত ভাবে সেইসব দেশের এই সব পক্ষী বড় ও সুন্দর, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য উহাদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত ঘটে, কৃত্রিম তাপে ডিম সুপরিস্ফুট হয়, এবং দুইই সুরক্ষিত ও সুস্বাদু করার ব্যবস্থা থাকে।

শিকারী পাখি হিসাবে আমাদের দেশে মুর্গী, বাজ, কুড়াল প্রভৃতি এখনো পালিত হয়। শ্যেন কাহাকে বলে জানি না, চিল কিন্তু সুপরিচিত পক্ষী। আর শ্যেনদৃষ্টিতেই সে সুযোগ মত ছোঁ মারিয়া খাদ্য কাড়িয়া লয়। আসলে অনেক পাখিই শিকারী—তবে কেহ কেহ ক্ষুদ্রপ্রাণী শিকার করে। মাছরাঙা বক প্রভৃতির মাছের উপর লোভ। তবে পায়রার মত কেহ কেহ প্রধানতঃ খুদকণারই বেশি ভক্ত। মানুষেরও পাখি-শিকারের নেশা সামান্য নয়—রামায়ণের যুগ হইতেই তো মানুষ পাখি শিকার করিয়া ফিরে। বনে জঙ্গলে জলায় নদীর ধারে আজ শিকারীরা নানাপাখির খোঁজে তাই ঘুরিয়া বেড়ায়—মাংসের লোভ অপেক্ষাও শিকারের নেশাই অনেকের প্রবল।

শিকার ও পাখি

বাঙ্‌লার পাখি বলিয়া আমরা যাহাদের জানি তাহারাও অনেকে বাঙ্‌লার নয়। এক এক ঋতুতে বাঙ্‌লা দেশে তাহাদের আবির্ভাব দেখা যায়। সম্প্রতি বর্ষাকালে (১৯৫৯ ইং) সুন্দরবন অঞ্চলে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পেঙ্গুইন, পেলিকান প্রভৃতি আসিতেছে। সাধারণতঃ হেমন্ত হইতে বসন্ত পর্যন্ত আমরা নানা জাতীয় পাখিকে হঠাৎ দেখিতে পাই ; তাহাদের সার বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেও দেখি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এসব অনেক পাখি আসে হিমালয়ের ওপারের সুদূর তুহিন-তাড়নায়—হয়ত সাইবেরিয়া হইতে। প্রাণযাত্রার প্রয়োজনে ইহারা ঋতু হইতে ঋতুতে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মানুষের কাছে এই আকাশ-যাত্রী বলাকার বাণী যেন, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।' কিন্তু পক্ষীর আকাশ ছাড়াইয়া আজ মানুষের প্রয়াস মহাকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে। তাই শুধু পক্ষীর কেন, মনে হয়, মানুষের কথাও ইহা,—আকাশের শেষ নাই ॥

উপসংহার : দিগ্-দিগন্তরের যাত্রী

[মন্তব্য :—যিনি পক্ষিতত্ত্ব জানেন তিনি এ রচনা পড়ে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু একটি রচনায় সব কথা বলা যায় না। এত বিচিত্র তথ্য পক্ষী সম্বন্ধে আছে যে, তা ছোট রচনায় লেখা সম্ভব নয়। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্য আরও একটু দেওয়া চলে। তা'হলে 'সূচনার অংশ খর্ব

॥ তরুলতা ॥

সংস্কৃত কবিরা পৃথিবীকে বলিয়াছেন 'কানন-কুন্তলা।' হয়ত সত্যই বলিয়াছেন। কারণ, মানব কন্যাকেও আমরা মুণ্ডিতশীর্ষা কল্পনা করিতে পারি; তাপসীরূপে তাহার একটি গভীর সৌন্দর্যের কথাও ধ্যান করিয়া শ্রদ্ধাবনত হইতে পারি। কিন্তু নিষ্পাদপা পৃথিবীর রূপ কল্পনা করিতে গিয়া বড়ই ব্যর্থ বোধ করিতে হয়। এই শ্যামা-বসুন্ধরার যত শ্যামলিমা তাহাতেই যেন আমরা দেখি তাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত মমতার প্রকাশ। গিরি-গৈরিকস্রাবী পৃথিবীর সমস্ত ক্রূরতা ছাপাইয়া ইতিহাসেও জয়ী হইয়াছে তাহার সেই শ্যাম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের দান।

সূচনা

অথচ, বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সত্যই এই পৃথিবীতে একদিন তরুলতা-গুল্মের কোনো চিহ্ন ছিল না। এই উষ্ণস্রাবী বস্তুপিণ্ড সূর্যমণ্ডলে প্রথম যখন পরিভ্রমণ করিতেছিল তখনো তাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইত না। তারপর যে ভাবেই উদ্ভূত হউক, প্রাণ-কণিকা পৃথিবীর জলরাশির মধ্যেই সম্ভবত আশ্রয় লাভ করিল। আর, আরও পরে কোটি কোটি বৎসর অতিক্রম করিয়া—এই জলমাটি ও আকাশের উত্তাপের সহায়ে সমুদ্র জলে গুল্ম-সদৃশ প্রাণ বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহাকে সম্ভবতঃ 'উদ্ভিদ্' বলিবার উপায় নাই, সমুদ্র-সলিলেই তখনো তাহা ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাও প্রাণী। পৃথিবীর সাধারণ নিশ্চল তরুলতাও প্রাণ-ধর্মের অধিকারী—প্রাণী মাত্রেরই মত জন্মে, বৃদ্ধিলাভ করে, শেষে ক্ষয় হয়। পৃথিবীর প্রাণধারা অবশ্য এই উদ্ভিদ্ জন্মের সীমা ছাড়াইয়া জীবজন্তুর, পশু-পক্ষীর সোপান ভাঙিয়া ভাঙিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানুষকেই শেষ পর্যন্ত জীবনধারার শীর্ষভাগে স্থাপন করিয়া দিয়াছে। তৃণলতা-জাতীয় প্রাণ-সম্পদকে আশ্রয় করিয়া দেখা দিয়াছে তৃণভোজী জীব; মাংসাশী জীবেরা আবার তৃণভোজীদের ও অন্য

প্রাণী ও পাদপ

করতে পারি। নিতান্তই ভাব ও ভাষায় সুখপাঠ্য করবার জন্য এভাবে 'সূচনা' দীর্ঘ করা হয়েছে। ওভাবের দুই তিনটি বাক্যে 'সূচনা' শেষ করে একটু বৈজ্ঞানিক তথ্য দেওয়া যায়—যেমন; (ক) পাখি হচ্ছে 'অণ্ডজ জীব'; তা দিয়ে ডিম ফোটে; (খ) তারপর বলা যায় ভূচর, খেচর জলচর পাখির কথা, পাখির ডানা, উড়বার শক্তির ব্যাখ্যা; দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা ও স্মৃতি শক্তির তীক্ষ্ণতা (যেমন, সংবাদবাহী পায়রার কথা); (গ) তারপর পালিত পক্ষী, শৌখিন পক্ষী প্রভৃতির কথা, আরও একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলা চলে। অবশ্য কথা হচ্ছে—রচনার জন্য লভ্য সময় ও আয়তন বুঝে সংকেতগুলো বাড়ানো কমানো চাই। আর, যদি বৈজ্ঞানিক কথা বলা হয়, তা হলে তা যথার্থ হওয়া চাই এবং নীরস না হওয়া চাই।]

মাংসাশীদের আহার্যরূপে গ্রহণ করিয়া বাঁচে। আর মানুষের মত সুপরিচিত জীবেরা একই কালে তৃণভোজী ও মাংসাশী। হয়ত বা এই দুই পর্যায়ের জীবেরই জীবনীশক্তির বিশিষ্ট রহস্য মানুষ নিজেরই বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা এইবার আয়ত্ত করিয়া লইবে। শস্যরূপে তরুলতার দান আমরা লাভ করি, ফলরূপে উহার দান আমরা অন্য প্রাণীদের সঙ্গে আহরণ করি; শাকান্ন-রূপেও আমরা তাহা বাঁটিয়া লই। আর, অন্য দিকে এই শ্যামলশ্রী, বৃক্ষ-লতার বিচিত্র রমণীয়তা, ডালে ডালে ফুল ফুটাইয়া তাঁহার পৃথিবীর বুকে এই অজস্র বর্ণের বিলাস,—এই সকলকে আমরা জীবনের পরিচয় অপেক্ষাও প্রাকৃতিক দান বলিয়াই বেশি জানি। উহার কমনীয় কান্তিতে আমাদের অন্তরের সৌন্দর্যবোধও জাগ্রত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। মানুষের দেহই শুধু তরুলতার দানে সুদৃঢ় হয় না, তাহার চোখের তৃপ্তি ও মনের আনন্দও এই শ্যামলশ্রীতে উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত হইয়াছে।

জাতি-উপজাতি

উদ্ভিদ্ বলিতে আমরা অবশ্য মৃত্তিকাভেদ করিয়া যে তরুলতা জন্মে তাহাদেরই গণ্য করি। কিন্তু সমুদ্রজলে ইহাদের আদিম জাতি-প্রজাতির অজস্র বংশ-প্রবর উদ্ভিন্ন হইয়াছে। তাহারাও তরুলতা, তাহাদেরও বৈচিত্র্য ও রমণীয়তা কম নয়। পৃথিবীর মৃত্তিকাকে আশ্রয় করিয়া যে উদ্ভিদ জগতের প্রকাশ, আমরা চোখ মেলিলেই তাহার সহিত পরিচিত হই। কিন্তু বিপুলা এই পৃথিবীর সেই নিশ্চল জীবন-বাহনদের কতটুকু আমরা জানি? যে কোন একখানা সামান্য উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের গ্রন্থ দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়।

ছোট বড় তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ হইতে অরণ্যের বনস্পতি—কত রূপ বৃক্ষই না পৃথিবীতে আছে। তৃণ লতা ওষধি, কত শ্রেণীতেই না তাহা বিভক্ত হয়। ইহার এক একটি শ্রেণীরও পরিচয় আমরা লইয়া শেষ করিতে পারি না। বাঁশ যে একজাতীয় ঘাস বৈজ্ঞানিকদের এই তত্ত্বকথা শুনিয়া কি আমাদের হাসি পায় না? লতা অন্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে। ওষধি এক ফলনের শেষে মরিয়া যায়। আবার পরগাছা বড়গাছের উপর জন্মে, গাছের গৃহীত আহার্যই সে শোষণ করিয়া লয়,—মাটির সহিত তাহার সম্পর্কও নাই।

সাধারণতঃ গাছ বীজ হইতে জন্মে, কিন্তু সব গাছই কি তাই? কত ফুল গাছ ও ফলের গাছ তো আমরা শাখা কাটিয়া রোপণ করি; 'কলম' বাঁধিয়া লিচু, আম প্রভৃতি গাছ নূতন উৎপাদন করি।

জলমাটির দান

মাটি ও আলো, ইহাই গাছের প্রাণের অবলম্বন। মাটি হইতে গাছ শিকড় দিয়া আপন প্রয়োজনীয় রস আহরণ করিয়া লয়; আর উপরে শাখা ছড়াইয়া, পাতার আঙুল মেলিয়া, সূর্যালোক অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করে,—ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু এক-এক শ্রেণীর গাছের এক-এক ধরনের মাটির প্রয়োজন। ভিজা মাটি, শুকনা

মাটি, নরম মাটি, শক্ত মাটি, নানা রাসায়নিক গুণ ও লক্ষণযুক্ত মাটি (soil) বিশেষ বিশেষ গাছের জন্য প্রয়োজন। তাহা ছাড়াও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর গাছের জীবন নির্ভর করে। অনেক গাছ শুধু উষ্ণমণ্ডলেই বাঁচে, শীতমণ্ডলের গাছও অনেক 'সময় অন্যত্র বাঁচে না। আবার, কোনো গাছের বর্ষাতেই শ্রীবৃদ্ধি, কোনো গাছের বর্ষাতে জীবন বিপন্ন। নারিকেলের মত কোনো গাছ সমুদ্র উপকূলে চমৎকার বৃদ্ধি পায়। কমলালেবু গাছ আর্দ্র আবহাওয়ায় চুন মিশ্রিত জমিতে ভালো জন্মে। আবার পাইন শ্রেণীর গাছ পার্বত্য প্রদেশেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে। এইরূপ অজস্র বৈচিত্র্য, অজস্র বংশের অজস্র জলবায়ু ও মাটির বৈশিষ্ট্য।

কোনো গাছের বৈশিষ্ট্য ফুলে, কোনো গাছের বৈশিষ্ট্য ফলে, আর বট অশ্বত্থের মত কোনো গাছের বৈশিষ্ট্য তাহার ছায়ায় ও রূপে। সাধারণতঃ সকল গাছ মাটি হইতে রস আহরণ করে মূল ও শিকড়ের দ্বারা। কাহারও শিকড় সুদূর প্রসারী, কাহারও মূল সুদূর-প্রোথিত। কিন্তু রস গ্রহণে উহাদের উপযোগিতা, উহাদের বাঁধনে গাছ মৃত্তিকা আঁকড়াইয়া থাকে।

বৃক্ষ-দেহ

মাটি হইতে উঠিয়া যেখানে গাছের শাখা প্রথম বাহির হইয়াছে, তৎপূর্ব-স্থল পর্যন্ত গাছের দেহটির নাম কাণ্ড (trunk)। তাহার পর শাখা; শাখা ভাগ হইয়া যায় প্রশাখায়। শেষে আসে পত্র—সূর্যকর নিজের মধ্যে ইহারা আত্মসাৎ করিয়া লয়। তাই পাতার রঙ হয় সবুজ, উহা প্রাণের রঙ, তাজা রঙ। যখন তাহার তেজ কমিয়া আসে—প্রায়ই শীত কালে—তখন পাতা হরিদ্রাভ হইয়া পড়ে। তারপরে ঝরিয়া যায়।

কোনো কোনো গাছে ফুল ধরিয়া পরে বীজ আসে। বীজ হইতে আবার নূতন গাছ জন্মে। কোনো কোনো গাছে ফুল আর ফলে পরিণত হয় না—ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যায়; অধিকাংশ ফুলের গাছের এই অবস্থা। এক ফুল হইতে আর এক ফুলে মধু সঞ্চারিত করিয়া মৌমাছি ও ভ্রমর সেরূপ ফুলগাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেয়। সাধারণত মৃত্তিকা ও রৌদ্র হইতে গাছ পুষ্টি গ্রহণ করিলেও সব গাছ নিরীহ, অহিংস না হইতে পারে। এমন গাছও আছে যাহার পাতা মুখ বাড়াইয়া থাকে, পোকা-মাকড় পাইলে আস্তে আস্তে পাতা গুণ্ঠিত হইয়া যায়—প্রাণীটিকে সেই গাছ জীর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে। আরও ভয়ানক জিঘাংসু গাছও আছে—দক্ষিণ আমেরিকায় কোনো কোনো গাছ হরিণ-জাতীয় প্রাণীকেও হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ক্রমশঃ শোষণ করিয়া ফেলে। জীব হইতে জীবনের পুষ্টি সর্বাধিক সুসাধ্য। তাই গাছ যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবকে পোষণ করে, দু'একটি এইরূপ গাছও পাইলে জীবকে গ্রাস করে।

জন্ম ও পুষ্টি

গাছ হইতে যে মানুষের খাদ্য ফল মূল শাক-সবজি আহার্য অনেক জিনিসই মিলে, চাষ করিয়া শস্য মিলে, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি। আচ্ছাদনোপযোগী তুলা শণ পাটও মিলে, রবার লাক্ষা প্রভৃতি একদিকে মিলে, আর একদিকে জ্বালানি কাঠও আসবাবপত্রের কাঠ, এমন কি, ঔষধপত্র পর্যন্ত বহু আবশ্যিক জিনিস বৃক্ষলতাদি হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

মনুষ্যের প্রয়োজন

আমাদের দেশে না হউক, অন্যদেশে এক সময়ে ধারণা ছিল গাছ বুঝি নিশ্চল বলিয়া নিষ্প্রাণ। এবং শাকান্ন খাইলেই বুঝি জীবহত্যা হয় না। এখন আর সে ধারণা নাই। কিন্তু গাছ নিশ্চেতন কিনা, তাহার স্নায়বীয় সামর্থ্য কতখানি, তাহা জগদীশচন্দ্রের পরেও সুস্থির হয় নাই। একটি কথা বুঝা যায়—প্রাণের এই বিচিত্র প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও জীব-জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই বিশ্বব্যাপী ভারসাম্য রক্ষা করিয়া বন-বিনাশের পরিবর্তে বন-বিন্যাস ও বৃক্ষরোপণও মানুষের প্রয়োজন। না হইলে বর্ষাকালে বর্ষণের অভাব হয়, এমন কি অঞ্চল বিশেষে বন্যার বিরুদ্ধেও বাধা থাকে না, ইত্যাদি। মানুষের জ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই সে বুঝিতেছে—এই ব্যাপক বিশ্ব-সাম্যে মানুষও উদ্ভিদ-জগতের ও জীবজগতের আত্মীয়। তৃণতরুলতা পাতা ওষধি বনস্পতি সকলের মঙ্গলেই পৃথিবীর মঙ্গল, মানুষের মঙ্গল। উদ্ভিদ্-জগতের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিলে এই বৈদিক বিশ্ব-চেতনা মানুষের মনকে গম্ভীর ও শ্রদ্ধাবনত করিয়া তোলে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক ভারসাম্য

[মন্তব্য : ইচ্ছা করেই এমন অনেক তথ্য বলা হল যা মনে রাখলে অন্য গাছ সম্বন্ধে রচনা লেখা সহজ হয়]

॥ কলাগাছ ॥

[প্রবন্ধ-সংকেত]

বাঙলা দেশের সুপরিচিত গাছ কলাগাছ। উৎসবে, মঙ্গলাচরণে, বিশেষতঃ হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে কলাগাছ তোরণ-শোভা সম্পাদন করে। আর কলা দেবপূজায় প্রায় অপরিহার্য নৈবেদ্য।

সূচনা

কলাগাছ ওষধি-জাতীয় গাছ—অর্থাৎ এক ফলনেই তার আয়ু সম্পূর্ণ। পরিচয় সুবিদিত—শাখাপ্রশাখাহীন, বল্কল-আচ্ছাদন ; ডালপালা নাই, গাছের মাথা হইতে বড় বড় পাতা ছড়াইয়া পড়ে—আর সেই কাঁধেই প্রথম আসিবে ফুল, তাহাই 'মোচা' হইবে, তাহাতে যখন কলা বাহির হইবে তখন তাহা ডাঁট সুদ্ধ হইয়া উঠিবে 'কলার কাঁদি।'

জাতি ও বর্ণনা

প্রায় সর্বত্র লভ্য হলেও প্রধান জন্মক্ষেত্র—ভারতবর্ষ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা ও আমেরিকা।

জন্মক্ষেত্র

গাছের গোড়া হইতে চারা বাহির হয়, তাহা উঠাইয়া আবার অন্যস্থলে রোপন করিতে হয়। ছাই ও গোবর বাঙলার সর্বত্রচলিত সার। এ গাছ খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি জন্মে। গাছের প্রধান দান—(ক) ফল, তার পূর্বাবস্থায় মোচা, থোড়, কাঁচকলা প্রভৃতি ব্যঞ্জন ; (খ) কলাপাতা—আহারের নৈবেদ্যের 'থালা', 'ঠোঙা' ; চমৎকার শ্যামল-শ্রী।

উৎপাদন ও উপকারিতা

ফলের পরিচয়ে বিবিধ শ্রেণীর পরিচয় :—ফলের পরিচয় : কাঁচাকলা পাকাকলা। পাকাকলার নাম—বাঙলার মর্তমান, পূর্ব বাঙলার জাহাজী বা 'সফ্‌রী' কলা এবং অগ্নীশ্বর, চাঁপাকলা, বীজকলা, 'সিঙ্গাপুরী'।

বিবিধ শ্রেণী

সহজে জন্মে ও প্রচুর ফল ধরে বলিয়াই কলাগাছের যথোচিত আদর সর্ব-জায়গায় হয় না। কলা সস্তা বলিয়াই আমরা জানি না, পৃথিবীর যে কোন ভালো ফলের মতই মর্তমান কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল। সেইরূপ পৃথিবীর ইহা একটি সুশোভন গাছ। কচি কলাপাতার সৌন্দর্যের তুলনা নাই—দীর্ঘ ঘন শ্যাম পত্রে এ রৌদ্রোজ্জ্বল দেশে কলাগাছ নয়নাভিরাম। এই আবশ্যকতা ও শ্রী মিলিয়াই কলাগাছ আমাদের আদিম পিতামহ পিতামহীদের নিকট জীবনের সকল কর্মে স্বাকৃতি পাইয়াছিল—অভ্যাসে পর্যবসিত হইলেও তাহার সে দান এখনো আমাদের স্বীকার্য।

উপসংহার

॥ বাঁশগাছ ॥

[প্রবন্ধ সংকেত]

(জাতি ও শ্রেণী বিভাগ)—বৈজ্ঞানিকরা বলিবেন, বাঁশ একজাতীয় ঘাস। শুনিয়া হাসি পাইবে, কিন্তু উপায় নাই—বিজ্ঞানের তথ্য মানুষের পরিচিত সত্যকে এমন আজগুবি করিয়া তোলে। সূর্য যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে না, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে,—এই পৃথিবী যে সমতল বিস্তীর্ণ ভূমি নয়, একটি কমলালেবুর মত গোলক, উত্তরে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা,—এই সবসত্য যদি মানিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে বাঁশকেও একজাতীয় ঘাস বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব। শুধু বুঝিতে হইবে—ঘাসের লক্ষণ কী ; বাঁশের মধ্যে সেই লক্ষণ কি পরিমাণে আছে, অথচ বৃক্ষের সাধারণ লক্ষণ নাই। অবশ্য তখনি বুঝিব আমাদের

সূচনা

পরিচিত মাঠের দূর্বা কিম্বা বনের ঘাস আর বাঁশ এক জাতীয় হইলেও এক জিনিস নয়, এক শ্রেণীর জিনিসও নয়।

স্থানভেদ ও বাঁশের প্রকারভেদ

বাঁশের জন্ম ঝাড়ে—নানা দেশে নানা রূপ—যেমন পশ্চিম বাঙলার সমতল ভূমির বাঁশ (গাঁটওয়ালা শক্ত), পাহাড়ীয়া বাঁশ (সরু), বিশেষতঃ আসাম-ব্রহ্ম-চীন সীমান্ত অঞ্চলের বিবিধ বাঁশ।

উপযোগিতা

(ক) ঘর দুয়ারের মূল উপাদান—বাঁশের বেড়া, ছাউনি, মাচা, ইত্যাদি; খড়ের চালার বাঁশের বেড়া যুক্ত নাণাবিধ ঘর—পূর্ব বাঙালার 'জলটুঙি'; বাঁশের 'তরজার ঘর', 'মাঁচার' মেঝ—(খ) সহায়ক উপকরণ—বাঁশের ভাড়া, ঠেকা, খুঁটি, টাঙাবার আলনা, কাঠামো, (প্রতিমার) গাড়ির ছাউনি, কঞ্চি, কাঠি, (গ) লাঠি, চেরা বাঁশ, প্রভৃতি; এবং (ঘ) কাগজের মূল উপাদান (ঙ) তৈজস পত্র—আসন, বাক্স-পেটারা (চ) খাদ্য—কচি বাঁশ, হাড়ি-চাপা ও কচি ডগা। (ছ) শৌখিন জিনিস—বাঁশি, বস্তু হিসাবে সামান্য, কিন্তু অসামান্য সম্পদ। চীনে বাঁশের ব্যবহার—অদ্ভুত সার্থকতা, চারু ও কারুশিল্পের একত্র সমাবেশ।

উপসংহার

'ফাল্গুনা'তে দাদার চৌপদী মারফৎ আমরা জানিতে পারি—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে।
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে॥
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্ব মাঝে।
যেহেতু সে লাগে বিশ্ব কাজে॥

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সকৌতুক অবজ্ঞার হাসিতে দাদার চৌপদীটি আমাদের উপহার দিয়াছেন—বাঁশির বাজনাতেই বাঁশের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কবির সেই কৌতুকের হাসিতে যোগদান করিয়াও আমরা বলিতে পারি—

লাঠি হোক্, কাঠি হোক,
হয় হোক বাঁশি।
দাদা ক'ন, জেনো ঠিক,
বাঁশ তবু ঘাসই॥

॥ ফলগাছ ॥

[আমগাছ]

আম ভারতবর্ষের একটি সুপরিচিত ফল। সম্ভবত ফলের মধ্যে আমই ভারতের বিশিষ্ট ফল—ফুলের মধ্যে যেমন পদ্ম। বিদেশীয়দের যদি কোনো ভারতীয় ফলে পরিতোষ বিধান করিতে হয় তাহা হইলে আম্রফলের কথা স্বভাবতই মনে হয়। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রায় কয়েক ঝুড়ি আম তাঁহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল—বিদেশীয় সুহৃদদের আপ্যায়িত করিবার মত সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে আমই তাঁহার মনঃপূত হইয়াছিল ; অবশ্য সুরক্ষিত না হওয়ায় পথে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

সূচনা : ভারতের বিশিষ্ট ফল

আশ্চর্য হইবার কিছু নয়, পুরাতন কালে আমাদের সংস্কৃত ভাষায় আম্রফলের অন্য নাম ছিল 'অমৃত'।

প্রাচীন ভারতে আম্রবৃক্ষের সমাদর কম ছিল না। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গণনায় বেদ-উপনিষদের পরেই বুদ্ধদেবের কাল। সেইকালে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে আমরা যে সব কাহিনী পাই তাহাতে মাঝে মাঝে আমরা আম্রবনের উল্লেখ দেখি। যেমন অনেক সময়ে শুনি—বুদ্ধদেবের এই কাহিনী ঘটিয়াছিল শাস্তা যখন কোনো আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। বুদ্ধদেবের পরিক্রমিত মগধ ও কোশল দেশ বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ; সে সময়ে এখনকার মতই উহা আম্রকাননে সমাচ্ছন্ন ছিল। আম্রবৃক্ষের যে শান্তশ্রী ও পবিত্রতার জন্য খ্যাতি ছিল এই-সব বৌদ্ধ কাহিনী হইতে তাহাও বুঝিতে পারি। ইহাও বুঝিতে পারি—সেদিন আম্রচ্ছায়ায় এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমাজ ও ধর্মগুরুরা আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, সমাজের সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদান করিতেন ; আম্রবন ছিল তপোবনের তুল্য শান্তির ও শিক্ষার কেন্দ্র।

আম্রবৃক্ষের সমাদর

আম্রবৃক্ষের ঘনছায়া ও সুশ্যাম পল্লব ও সুগন্ধ মুকুলের সঙ্গে ভারতের মানুষের জন্মগত পরিচয় থাকে। এখনো বাঙলার উৎসব আনন্দ আম্রপল্লব ব্যতীত চলে না। মঙ্গলঘটে সেই পল্লব না হইলেই নয়,—হয়ত এই প্রথা এই-দেশে প্রাচীনতম কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বেদ-উপনিষদের অপেক্ষাও সম্ভবতঃ এই লোক-সংস্কার ও লোক-আচার প্রাচীনতর। ভারতবর্ষের মানুষ তপোবন ও এরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তরুলতা পাতার সঙ্গে আপনার সহজ আত্মীয়তা অনুভব করিয়া আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকেও একটা সহজশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন। যেসব

উপকরণে তাহার পূজা আরাধনা উৎসব-আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠে, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিব, সেইসব প্রায়ই প্রথমতঃ ছিল তাহার সরল জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। দ্বিতীয়তঃ, সেই জীবনযাত্রার সঙ্গে সুসমঞ্জ একটা সরলশ্রী সেই সব উপকরণে সৃষ্টি হইত। আবশ্যকতা ও সৌন্দর্য, দুইয়েরই জন্য আম্রবৃক্ষ, আম্রবীথি, আম্রবন এই পূর্ব ভারতের জীবনযাত্রায় একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়া থাকিবে। অন্যান্য বৃক্ষের মত আম্রবৃক্ষেরও কাঠের ও পাতার সাধারণ উপযোগিতা ছিল—আমসারের উপকরণ দীর্ঘস্থায়ীও হয়। কিন্তু আমের কাঠ জ্বালানি কাঠ হিসাবে কাঁচা অবস্থায়ও অগ্নিদাহ্য। এইজন্যও প্রতি গৃহস্থ আমবাগান রাখিতেন, অন্ততঃ শবদাহের কাজে অকস্মাৎ প্রয়োজনে আমের ডালপালা বিশেষ উপযোগী। অবশ্য উদ্যান-রচনার বহুবিধ উপাদান, তরুলতার বহু দান আজ আমরা এইদেশে দেখি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যান-রচনা একটি আয়াসসাধ্য, অর্থসাধ্য সুকুমার বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পল্লী-প্রকৃতি আম্রবনের শ্যামঘন ছায়াটি আশ্রয় করিয়া সহজশ্রীতে যুগ যুগ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। তাহার সৌন্দর্য বা তাহার ঐশ্বর্য তাই বলিয়া বিন্দুমাত্র খর্বিত হয় নাই। 'আমবাগানের' ছায়াটি আজও গ্রীষ্মের দুপুরে বাঙলার পল্লীমায়ের শান্ত গৃহাঙ্গনের মত স্নেহশীতল মনে হয়।

আম্রবৃক্ষেরও যে যত্নের ও পরিচর্যার প্রয়োজন নাই, তাহা নয়। প্রকৃতির অনেক দানই মানব-হস্তের যত্নে আপনার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

আম্রবৃক্ষের যত্ন

আমও তেমনি একটি ফল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আম গাছ জন্মিবার কথা। কিন্তু অনুকূলক্ষেত্রে সযত্নে এই বৃক্ষের বংশোন্নয়নের চেষ্টা হয়ত ভারতবাসীই করিয়াছিল। তাই ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আম্রবৃক্ষের এইরূপ চমৎকার পরিণতি বিশেষ ঘটে নাই। আবার, ভারতবর্ষেরও কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলে জলমাটির গুণে যত সুস্বাদু আম লাভ করা যায় দেশের অন্যত্র তাহা লাভ করা যায় না। পশ্চিম দেশের উপকূলে আলফাঁসো ও অন্য দুই একটি জাতের আম প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু গঙ্গার সমীপবর্তী বারাণসী, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পূর্ব ভারতের এইসব অঞ্চলে উৎকৃষ্ট আম্রফল ফলে। পূর্বভারতেও তত উৎকৃষ্ট আম আর অন্য কোথাও নাই। উত্তরবঙ্গে বা মধ্যবঙ্গেও সুস্বাদু আম প্রচুর ফলে। কিন্তু অন্য-খানকার উৎকৃষ্ট আম অনেক সময়েই মূলতঃ প্রসিদ্ধ কলমের চারার ফল, বা ঐরূপ কুলীন বংশের কোনো যত্নবর্ধিত ফসল। কারণ, এই দেশের জলবায়ুতে উৎকৃষ্ট গাছের বংশগুণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় বানের জল বা বৃষ্টির জল জমিলে গাছের ক্ষতি অনিবার্য। গাছের নিকটস্থ ভূমি পরিচ্ছন্ন না হইলে গাছ পোকায় ধরিবে, ফলের অভ্যন্তরেও সে কীট বাসা বাঁধিবে, আর অযত্নে

বন্য গন্ধে ফলের নিজস্ব স্বাদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই জন্য সত্যই যে সব অঞ্চলের আম প্রসিদ্ধ সে সব অঞ্চলে দেখা যায় আমবাগান যেন গৃহস্থের গৃহাঙ্গন অপেক্ষাও সযত্ন মার্জিত। আর, আম এমনি আদৃত অর্থকরী ফসল যে এক একটি আমবাগান উহার মালিকদের নিকট স্বর্ণখনিরই মত আদরণীয়। মাত্র তিনটি মাসের চেষ্টাতেই যে এমন মূল্যবান ফসল লাভ হয়, তাহা নয়। বৎসরে সব সময়েই আম গাছের ও আমবাগানের যত্ন লইতে হয়; তবেই লক্ষ্মী কৃপা করেন। এজন্যই বারাণসী, পাটনা মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলের এক-একটি আমবাগান দেখিলে চোখ জুড়ায়। সত্যই যেন লক্ষ্মী সেখানে তাহার আসন পাতিবেন—পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ, ঘন-পল্লব ছায়ায় প্রতিটি আম্রকানন শান্ত মধুর। মাঘের শেষে ফাল্গুন পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আম্রবন মঞ্জরীত হইয়া উঠিবে; ভ্রমরের গুঞ্জন লাগিবে; পাখির কূজনও আরম্ভ হইবে; সংস্কৃত কবিদের কল্পনায় বসন্ত তাঁহার চুতমুকুলের শিরোভূষণ লইয়া সেখানে আবির্ভূত হইবেন।

নানাজাতির আম

যেসব উৎকৃষ্ট জাতের আমের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহার মধ্যে বোম্বাই এর আলফাঁসো সুবিখ্যাত—সম্ভবত ইহা পর্তুগীজদের প্রদত্ত নাম। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে বারাণসী ও পাটনার ল্যাংড়া (বিহারীরা ইহাকেই বলে 'মালদহ' আম) আমের রাজা। উহার বিশেষ স্বাদ অবিস্মরণীয় —কিছুতেই ভুলিবার নয়। ইহা ছাড়া, মুর্শিদাবাদ-মালদহ অঞ্চলেও অনেক জাতীয় সুমিষ্ট আমের উৎপাদন হয়—বেগমখোস, গোপাল-ভোগ, ক্ষীরসাপাত, ইত্যাদি। ফজলি আমও দেখিতে বড়, সুপুষ্ট দেহ। এই সব কোন কোন আম মনে হয় নবাবী আমলের শৌখিন আমির ওমরাহদের যত্নেই এই পরিণতি লাভ করিয়াছে। পর্তুগীজ ও মুসলমানদের ফুল-ফলের বাগানের শখ ছিল; তাঁহারা আম্রবৃক্ষের উদ্যানও রচনা করিতেন। শুধু গাছ নয়, আম্ররসিক আভজাতরা আমফলকেও নানা প্রকারে যত্ন করিয়া ভোজনোপযোগী করিতেন। তাঁহাদের সেই নির্দেশ উপদেশ শুনিলে কৌতুক বোধ করিতে হয়—তুলার ভিতরে পোষণ করিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরে জাগিয়া, বেগমখোসের রসাস্বাদন যে না করিয়াছে সে অরসিককে এমন ফল প্রদান করা যে একটা দুর্ভাগ্য, তাহা অন্য লোকে বুঝিবে না। কারণ দেরী হইলেই আর যে সেই বিশেষ স্বাদের বৈশিষ্ট্যটুকু থাকিবে না।

আম রক্ষার ব্যবস্থা

সত্যই দুর্ভাগ্য যে বৎসরে মাত্র অল্প কয়েকদিন আম পাওয়া যায়, বাকী সময়টা তাহার অপেক্ষায় কাটাইতে হয়। তাহাও সাধারণতঃ দুই বৎসরে একটি ভালো ফলন লাভ করা সম্ভব। আর যখন গাছে প্রথম বোল আসে তখন হইতেই যেন আমের শত্রুরা চক্রান্ত করিতে থাকে—ঝড়, জল আসিবে, শিলাবৃষ্টি দেখা দিবে, শেষে ফল একটু রঙ

ধরিতে না ধরিতেই পশু পাখি তাহা খাইতে আরম্ভ করিবে: তাহার পর যখন ফসল বাজারে দেখা দিবে, তখন তাড়াতাড়ি তাহা বিক্রয় করা প্রয়োজন না হইলে পচিয়া নষ্ট হইবে। অবশ্য, যে যত্নে মানুষ আমের বংশোন্নতি করিয়াছে সেই যত্নে ফল-রক্ষার ব্যবস্থাও করিতে পারে। আমসত্ত্ব, আচার, আমসি, চাটনি, এই সব জিনিস ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতেই আবিষ্কৃত। তাই বলিয়া কি কেহ আমসত্ত্বের অনাদর করিতে পারে? এখন আতপনিয়ন্ত্রিত গুদামে ও গৃহের রিফ্রিজারেটর-এ আমও দীর্ঘ দিন রক্ষা করা চলে। 'আম-রক্ষার' সুব্যবস্থা হইলে বাঙলা বিহারের গৃহস্থদের কোটি কোটি টাকা লাভ হইতে পারে। তাহা ছাড়াও এখনো বৎসরে তিনমাস এই সব অঞ্চলের দরিদ্ররা গাছতলার কুড়ানো আম খাইয়াই অনেক দিন কাটায়। যাহারা ভাগ্যবান তাহারা এমন দেবভোগ্য ফল প্রচুর খাইয়া আরও কান্তিমান্ হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

উপসংহার

কারণ, আমকে সুস্বাদু ফল বলিলেই তাহার গুণ বলা শেষ হইয়া যায় না। আম অতিভোজনে পরিপাকের গোলযোগ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সত্যই পরিপাকের শক্তির ক্ষতি হয় না—নিতান্তই তাহা সাময়িক। বিশেষতঃ, আমের মিষ্টতায় যে শর্করা-গুণ বা গ্লুকোজ থাকে তাহা হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষ পরিপোষক—স্বাস্থ্যের পরম সম্পদ। এ দেশের মত হতভাগ্য দেশের দরিদ্ররা যে অঞ্চলে আম প্রচুর জন্মে সেই সব স্থলে অন্তত কিছুদিন প্রথম শ্রেণীর এই স্বাস্থ্যদায়ক রসটি পান করিয়া কতকটা শক্তি আহরণ করে। আর উহার আঁটিটিতে পর্যন্ত ভেপু তৈয়ারী করিয়া বাজাইতে বাজাইতে দরিদ্র বাঙলার দরিদ্র বালক-বালিকা সমস্ত পল্লীটিতে খুশি ছড়াইয়া বেড়ায়।

আমাদের দেশে এখনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃক্ষপালন ও ফসল-উন্নয়ন বিশেষ আরম্ভ হয় নাই। মনে হয়, আমের মত এমন একটি উৎকৃষ্ট গাছের সমস্ত পরিচয় আমরা এখনো লাভ করি নাই—বিজ্ঞান হয়ত তাহা আবিষ্কার করিবে। যাহা সামান্য যত্নে পাইয়াছি তাহাতেও দেখিতেছি আবশ্যকতায় ও শোভনতায় কী অসামান্য লাভ হইতেছে। আর, নদী জল-মাঠ-ঘাট-ফুল-ফল সমস্ত মিলাইয়া আমাদের এই পল্লীপ্রধান সভ্যতা যাহাতে 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়' হইয়া উঠে—তাহার মধ্যে এই অতি পরিচিত আম্রবৃক্ষ, আম্রকুঞ্জ আম্রবীথি নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়।

[মন্তব্য : একটি গাছের সম্বন্ধে রচনা লেখা অনেক সময়ে বেশ কঠিন। গাছ চোখে ভালো লাগিলেও অনেক গাছের সম্বন্ধে আমাদের বেশি জ্ঞান থাকে না। লিখতে হলে প্রথমেই স্থির করা দরকার কোন জাতীয় গাছের সম্বন্ধে লিখব; গাছ বলতেই বাঙলায় আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল প্রভৃতি ফলের গাছ বুঝায়; কিম্বা বোঝাবে শাল-বাঁশ জারুল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাঠের গাছ; অথবা শিমুল, পলাশ, বকুল শেফালি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ফুলের গাছ। সব গাছেরই সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথা আছে। প্রথমত জাতির কথা—বৃক্ষ, তৃণ, ওষধি

।। ফুটবল খেলা ।।

ফুটবল বিলাতী খেলা। কিন্তু খেলার বোধ হয় জাতি নাই, আমাদের দেশে ফুটবলের মত এমন লোকপ্রিয় খেলা আজ আর কোথায়? ইংরেজের পার্লেয়ামেণ্ট, ডিমোক্র্যাসি প্রভৃতির মতই গত ষাট-সত্তর বৎসরে ফুটবল, অন্তত বাঙলা দেশে, আমাদের নিজেদের খেলা হইয়া গিয়াছে।

সূচনা

কলিকাতার কথা আমরা জানি, ফুটবলের নামে কলিকাতার বালক-বৃদ্ধ পাগল। ছাত্র-ছাত্রী কেরানি কর্মচারী দোকানি-পশারি মুটে-মজুর হইতে অফিসের 'বড় সাহেব' 'বড় বাবু'—ছোট-মেজ-সেজ সাহেব ও কেরানি-বাবুরা, এমন কি সঙ্গতিপন্ন ঘরের মহিলারা পর্যন্ত ভীড় করিয়া ফুটবল খেলা দেখিতে যান। অপরাহ্ণের সূর্যকর কিম্বা বর্ষার বারিপাত সবই ফুটবলের জন্য তুচ্ছ। আর যতই খেলার মাঠে রজতমানে দাঁড়াইবার স্থান—আসন, সম্মানিত আসন, সদস্যাসন—নির্দিষ্ট হউক, একবার খেলা আরম্ভ হইলে প্রায় সকলেই সমান, সকলেই দেখিতে দেখিতে 'সাধারণ দর্শক' বনিয়া যান, নিজ নিজ পক্ষীয়দের ভাগ্যের আবর্তনে-বিবর্তনে হর্ষ-বিষাদে মগ্ন হন। অনেকেই চীৎকার করিয়া, হাত-পা ছুঁড়িয়া হাসেন, কাঁদেন, লাফান-ঝাঁপান। তারপর খেলা শেষে অনেকেই শ্রান্তদেহে কিন্তু তৃপ্তমনে, সেইদিনের খেলার গল্প করিতে করিতে বাড়ি ফিরেন। কেহ কেহ ক্ষুণ্ণ মনে রাগিয়া-মাগিয়া তর্ক করেন,—রেফারির পক্ষপাতিত্ব, খেলোয়াড়ের দোষ, অপর পক্ষের খেলোয়াড়ী গুণের অভাব প্রভৃতি কী যে সেই তর্কের বিষয় নয়, তাহা বলা কঠিন। কেহ ক্ষোভে গুম মারিয়া যান। পরীক্ষায় ফেল করিলে যেমন কোন কোনো ছাত্র হতাশ হইয়া পড়ে তেমনি কদাচিৎ এক আধজন খেলাপাগল দর্শক দুঃখে ক্ষোভে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া একেবারে আত্মহত্যাও করিয়া বসেন, শোনা যায়।

ফুটবলের জনপ্রিয়তা

না কি জাতীয় সে গাছ? তারপর তার জন্ম, পরিবেশ, প্রয়োজনীয় বিশেষ মাটি ও জলের গুণ আর হাওয়ার গুণ, ফুল ও বীজের কথা, অঙ্কুরের কথা। তৃতীয়তঃ আকারের কথা—শিকড়, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল-ফলের বিশেষত্ব। চতুর্থত, উপযোগিতার কথা—কি কাজে লাগে, আরও কি কাজে লাগতে পারে।

একেবারে বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষ বিষয়গত বর্ণনা দিয়েও এরূপ গাছের রচনা লেখা যায়, আবার ভাবনা-কল্পনা মিশিয়েও গাছের কথা লেখা যায়। যেমন, একটি আমগাছের আত্ম-কথাও লেখা হতে পারে। দুই ভঙ্গিতে মিলিয়ে লিখতে পারলেই সুবিধা। আমগাছ, নারিকেল গাছ প্রভৃতি বিষয়ে তবু তথ্য সহজলভ্য, কিন্তু অশ্বত্থের মত প্রকাণ্ড বিরাট বৃক্ষ সম্বন্ধে কয়টি তথ্য শিক্ষার্থী খুঁজে পায়?]

আমরা মফঃস্বলের লোক। মহানগরীর মত অতটা রাজোচিত আড়ম্বর-আয়োজনে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিতে পারি না, অত উৎসাহে আত্মহারা হইবারও সুযোগ পাই না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বলেন আমরা ফুটবল খেলা ভালোবাসি না, খেলিতে বা খেলা দেখিতে আমাদের উৎসাহ নাই, তাহা হইলে বলিব—তিনি আমাদের প্রতি অবিচার করিলেন। আমরা কি বাঙালি নই? 'মোহন বাগানের' নামে কি আমাদের মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগে না? ইহা কি আমরা জানি না—ওয়াটার্লুর যুদ্ধ বিলাতের ঈটনের-হ্যারোর খেলার মাঠে বিজিত হউক বা না হউক, আমাদের স্বরাজ-সাধনার, স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় রকমের মহড়া কলিকাতার ফুটবলের মাঠে বর্ষে বর্ষে বরাবর ঘটিয়াছে?—'ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়দের' খেলায় কিম্বা 'মোহনবাগান বনাম ক্যালকাটার' খেলায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে প্রতি বৎসর প্রতিদিন এক-একটা করিয়া স্বাধীনতার খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। আর তাহার ফলাফলে আমাদের অগ্রজরা, পিতৃ-পিতৃব্যরা, প্রতিদিন পরাধীন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের উন্মাদনা ও শাসক ইংরেজের অনমনীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধ-সংকল্প গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন—খেলোয়াড়ী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়াও এইভাবে আমাদের আত্মশক্তি সঞ্চয়ের সাধনাও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা স্বাধীন। তাই, ফুটবল জাতীয় খেলা আর তাই আমাদেরও ফুটবল-খেলায় উদাসীন বলিয়া অভিহিত করিলে আমরা ক্ষুব্ধ হইব।

ফুটবল খেলার জাতীয় দান

বরং, আমরা বলিতে পারি—আমাদের গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ফুটবল না খেলিয়াছি আমরা এমন কেহই নাই। কলিকাতায় মাঠ আছে? কয়জন কয়দিন সেখানে খেলিবার সুযোগ পায়? কয়জন সত্যই খেলিতে পায়? আমরা মফঃস্বলের ছেলেরা তো সকলেই আবাল্য ফুটবলে লাথি মারিতে শিখি। হাঁ, কিছু না জুটিলে রবারের একটা বল জুটাইয়া লই। তাহাও না পাইলে বাতাপী নেবুতেই লাথি মারিয়া ছুটাছুটি করি, গোল দিই। দেশে বড় খেলোয়াড় কয়জন হয়? তাই বলিয়া কি অন্যেরা খেলিবে না? খেলার আনন্দে সকলেরই অধিকার আছে। তাই ফুটবল খেলায় আমাদের উৎসাহ নাই, ফুটবল খেলি নাই, এইরূপ অপবাদ দিলে আমরা তাহা স্বীকার করিব না।

গ্রামের উৎসাহ

এ কথা ঠিক—আমরা অত স্বচ্ছল নই। তাই খেলায় অত আড়ম্বর আমাদের নাই। বিলাতী অনেক খেলার অপেক্ষা ফুটবল সস্তার খেলা। তথাপি গ্রামের বাঙালির পক্ষে তাহার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা—ষোড়শোপচারে দেবীপূজার মতই নিখুঁত তাহা নির্বাহ করা,—প্রায় অসম্ভব। তবে আমরা জানি ফুটবলের জন্য কী চাই প্রথম চাই—একটা মাপ-সই সমতল মাঠ ও একটা চল-সই মাপের ফুটবল।

খেলার সাজ সরঞ্জাম

গ্রামের পক্ষে মাঠ দুর্লভ নয়। কলিকাতার মত ফুটপাতে, গলির পথে, বা পার্কের কোণায় খেলিয়া আমাদের শখ মিটাইতে হয় না। গ্রামের মাঠ অবশ্য খেলার উপযোগী করিয়া সমতল করিয়া লইতে হয়। মাপ-মত সীমা টানিয়া লম্বালম্বি চতুষ্কোণ খেলার মাঠে পরিণত করিয়া দুইপ্রান্তে আমরা স্থাপন করি কোনো রকমে তিন-তিনটি বাঁশের 'গোল-পোস্ট' বা লক্ষ্য-ফটক; তাহা হইলেই ফুটবলের খেলার মাঠ হইল। অবশ্য বাহিরের ধনী খেলার দলেরা 'লক্ষ্য-ফটকের' পশ্চাতে একটা জাল টাঙান—'বল' লক্ষ্যফটক উত্তীর্ণ হইলে তাহা জালে পড়ে, লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে তখন সংশয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু, 'জাল' আমাদের মত দরিদ্র গ্রামের খেলোয়াড়দের পক্ষে বিলাসিতা। নিশ্চয়ই অর্থ থাকিলে উহার ব্যবস্থা আমরাও করিতাম। অর্থাভাবের জন্যই মাঠের আয়োজনে জালও অপরিহার্য নয় বলিয়া আমরা মনে করি। মাঠ ও বলই আসলে অপরিহার্য। 'বল' কলিকাতা বা শহরের দোকান হইতে কিনিতেই হয়। হাওয়া পুরিয়া তাহাকে আমরাও সকলের মত খেলার উপযোগী করিয়া লই।

মাঠ ও বলের পরে চাই—খেলার মানুষ। দুই পক্ষে এগারো এগারো করিয়া বাইশ জন খেলোয়াড়ের অভাব আমাদের বড় হয় না। তবে, সত্য কথা, আমাদের মধ্যে কেহই গোলে দাঁড়াইয়া থাকিতে চায় না। নিশ্চয়ই সেই কাজে দায়িত্ব অনেক। কিন্তু তাহা বোঝা যায় যখন খেলার প্রতিযোগিতা জমিয়া উঠে তখন। না হইলে গোলে যে খেলে, ছুটাছুটি করিতে না পারিয়া তার বিরক্তিই বোধ করিবার কথা। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মাঠে বিন্যাস হয় আমাদের দেশের নিয়মে। যেমন, লক্ষ্য-রক্ষী বা গোল কিপারের সম্মুখেই থাকে দুইজন ব্যাক্ বা পৃষ্ঠরক্ষী, তাহাদেরও প্রধান কাজ রক্ষা। তাহাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে ও মধ্যে তিনজন অর্ধরক্ষী বা হাফ্‌ব্যাক্। তাহারা বিপক্ষের কাছ হইতে বল কাড়িয়া লয়; আর নিজেদের 'ফরোয়ার্ড' বা 'অগ্রগামী' দলকে সেই বল জোগাইয়া দেয়—স্বপক্ষ তাহা লইয়া বিপক্ষ-আক্রমণে ধাবিত হয়। প্রতি পক্ষেরই এইরূপ পাঁচজন অগ্রগামী; দুই প্রান্তে দুই, দুই উপপ্রান্তে দুই, আর কেন্দ্রে এক। ইহাদের প্রধান কাজ বিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করা —'গোল দেওয়া'। অবশ্য, মোট কাজ প্রতি দুই পক্ষের এগারোজনের সকলেরই এক—আত্মরক্ষা ও বিপক্ষের পরাভব। তাই নিজ নিজ স্থলের দায়িত্ব অনুযায়ী সকলকেই একযোগে 'একদল' হইয়া খেলিতে হয়—ইহার নাম team work। এইজন্য প্রতিদলের একজন থাকেন ক্যাপ্তেন—নায়ক; খেলার মাঠে দল-পরিচালনার সর্বদায়িত্ব তাঁহার;—তিনিই সেনাপতি।

খেলার রীতিনিয়ম

প্রতিদিনের সাধারণ খেলায় বাইশজন খেলোয়াড় যথেষ্ট—দুইপক্ষেরই এইরূপ 'একাদশ বীরের' সংগ্রাম। কিন্তু প্রতিযোগিতার খেলায় এবং

রীতিমত খেলায় আরও তিনজন নির্দলীয় খেলা-নিয়ামকের প্রয়োজন। যেমন, একজন রেফারি, যিনি খেলার সার্বভৌম নিয়ামক হন, বাঁশী বাজাইয়াখেলার প্রত্যেকটি পর্বের পরিচালনা করেন,—তিনিই খেলার পূর্ণ শাসক। খেলার মাঠে তাঁহার সিদ্ধান্তই আইন। তাহা ভুল হইলেও আপত্তি করা অশোভন; অমান্য করা তো বেআইনী, ও দণ্ডনীয়। ইঁহার সহযোগী থাকেন মাঠের লম্বালম্বি সীমারেখায় দুইজন—সীমান্ত দর্শক বা লাইন্স্‌ম্যান; বল সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাঁহারা জানান—'আউট', অর্থাৎ মাঠের 'বাহির' হইয়া গিয়াছে। শেষ যাহাদের পায়ে ঠেকিয়া বল বাহিরে গেল তাহাদের বিপক্ষেরা তখন সীমান্তে দাঁড়াইয়া সীমান্ত-দর্শকের পর্যবেক্ষণে বল দুই হাতে ছুঁড়িবে। অবশ্য লক্ষ্যরক্ষী ছাড়া ফুটবল কেহ হাতে স্পর্শ করিলেই তাহা দূষণীয়—কেবল এই সীমান্ত ছোঁড়ার সময়ে তাহা আবার হাতে ছুঁড়িতে হয়। তাহা ছাড়াও খেলার নামে কেহ ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, হুড়োহুড়ি করিলেও দূষণীয় হয়—সেই জন্য যুক্তিসঙ্গত বহু নিয়ম বা রীতি আছে। অধ্যক্ষ নিয়ামক দেখেন যেন তাহা যথাযথ পালিত হয়।

তথাপি মজা, এই খেলায় এমনি নেশা চড়িয়া যায় যে, খেলোয়াড়রা কেহ কেহ ঝোঁকের বশে রীতিনিয়ম ভাঙিয়া বসে। কেহ কেহ ধাক্কা না দিয়া বা অন্যকে জখন না করিয়াই যেন খেলিতে পারে না। আরও ভয়ঙ্কর কথা কেহ কেহ রেফারির নির্দেশকেও মানিতে চাহে না। বলাবাহুল্য, খেলোয়াড়দের পক্ষে,—এমন কি, তাহাদের পক্ষীয় দর্শকের পক্ষেও—ইহা একটি গুরুতর অপরাধ—unsportsmanlike। খেলার সর্বাপেক্ষা বড় কথাই এই sportsmanship বা 'খেলোয়াড়ী গুণ'। বিপক্ষের প্রতি সৌজন্য ও রেফারির বাধ্যতা উহার মূল কথা। শুনিয়াছি ইংরেজের সমাজে sportsmanship অলঙ্ঘ্য নীতি। খেলায় বিপক্ষকে পরাজয়ই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হইল, প্রতিযোগিতা। আমার শক্তি ও বিপক্ষীয়ের শক্তি, দুই-এর প্রতিযোগিতায় দুই-পক্ষেরই শারীরিক, মানসিক স্ফুরণ। 'হারি জিতি নাহি লাজ,'—হাস্যমুখে তাহা গ্রহণ করিব—শান্ত মর্যাদায়।

খেলোয়াড়ী গুণ

তাই তলাইয়া দেখিলে মনে হইবে আরও গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিতও এই কথাটিতে আছে। জীবনেও জয়-পরাজয় আমাদের লক্ষ্য বটে, কিন্তু আসল সার্থকতা এই সুশৃঙ্খল প্রতিযোগিতায়, এই সুসভ্য জীবন-সংগ্রামে। সার্থকতা সিদ্ধিতে নয় সাধনায়; সাধনার মধ্য দিয়া নিজ নিজ শক্তির স্ফুরণে। সভ্যতার মান যতই উচ্চ হইবে ততই খেলার এই সত্যও আমাদের কাছে আদরণীয় হইবে।

কিন্তু এই মূল সত্য কি আমরা মনে রাখিতেছি? শুনিতেছি—আমাদের দেশেও খেলার মাঠ জুয়াড়ীর জায়গা হইয়া উঠিয়াছে। খেলা লইয়াও রেষারেষির অন্ত নাই। তাহা সত্ত্বেও জানি—বিলাতে—খেলার সেই ঐতিহ্য নিচু হয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশে সেই সুস্থ ঐতিহ্য সৃষ্টি হইতে না হইতেই

ফুটবল খেলা জুয়াড়ীর কবলে গিয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে ফুটবল খেলার মানও দিনের পর দিন নিচু হইতেছে।

।। একটি ক্রিকেট খেলার কথা ।।

ইংরেজা বলে-ক্রিকেট খেলার রাজা। কারণ, ক্রিকেট নাকি ইংরেজদের জাতীয় খেলা—অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ায়ও তাহাই। আমাদের দেশেও ক্রিকেট মহাসম্মানিত খেলা বটে, কিন্তু বিলাতের মতো এখানে তাহা সাধারণের খেলা নয়। ফুটবলের মতো তাহা আমাদের সকলকে মাতাইয়া তুলিতেও পারে না। ইহার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে ক্রিকেটের মতো ব্যয়সাধ্য খেলার ব্যবস্থা সহজ নয়। ক্রিকেট গরীবানা-ভাবে খেলা চলে না। খুব 'গৃহস্থ' ভাবে খেলিতে হইলেও তাহার জন্য আয়োজন-উপচার অনেক চাই। তবে কোনো রকমে খেলিবার মত আয়োজন করিতে পারিলে ক্রিকেট খেলায়ও রস পাওয়া যায়। সেদিন কলিকাতায় একটি বড় প্রতিযোগিতা দেখিতে গিয়া আমার তাহা বেশ মনে হইল।

টেষ্ট ম্যাচ চারদিন ধরিয়া খেলা হইবে, প্রতিদিন দশটা হইতে পাঁচটা। ভাবিয়াই তো আমার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছিল। সেবার আমাদের ইস্কুলের সঙ্গে পূর্বস্থলী স্কুলের খেলা হয়। মাত্র দুইদিনের খেলা। পূর্বস্থলীর ছাত্ররা দুই দফায় ১৭৭ 'রান্' করিল, আমরা ১৩৩ 'রান্' করিয়া হারিলাম। এইজন্য এই খেলাটার সম্বন্ধে আমার মনে একটু বিরূপতা ছিল। এদল বল দেয়, ওদল পিটায়। আর ইহাদের বল দিতে না-দিতে ৬ বলে এক-একজনের পালা বদল হয়। আবার, উহাদের কেহ পিটাইতে আরম্ভ করিতে না-করিতেই 'আউট হয়', বিদায় নেয়। নূতন খেলোয়াড় আসিতে আসিতে সব জুড়াইতে থাকে। ক্রিকেট খেলার মধ্যে ছেদ এত বেশী যেন খেলাটা জমিতেই চায় না। তবু তো উহা ছিল দুইদিনের খেলা, এখন চার দিন এমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া খেলা দেখা —আমার তো মনে হয় ধৈর্যের পরীক্ষাই দিতে হইবে।

খেলার নমুনা

তথাপি শখ ছিল। বড়দিনে কাকার কাছে কলিকাতায় আসিয়াছি। আসিয়াই দেখিলাম—খুড়তুতো ভাইরা খেলোয়াড়দের ছক মুখস্থ করিতেছে। কে কবে কোথায় কত রান্ করিয়াছিল, কত বলে কত জনকে আউট করিয়াছিল—এসব তর্কের এক আধটুকু রেশ সংবাদপত্র মারফৎ আমরাও মফঃস্বলে পাইতাম! কিন্তু কলিকাতায় যেন এই সব তথ্যেরই উপর সকলের 'পাস-ফেলের' পরীক্ষা চলিতেছে। আমিও গোপনে গোপনে কয়েকটা তথ্য মুখস্থ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছি—

দর্শকদের উৎসাহ

রণজিতের খেলার বৈশিষ্ট্য ছিল কি; দলীপসিংজী, পাটৌদির নবাব, ইঁহাদের কাহার খ্যাতি কেন? এমন কি জন ব্রাডম্যান, আর হ্যামণ্ডের কৃতিত্বের স্বরূপও জানি। অন্ততঃ মুখে ভাবটা দেখাই বিজয় মার্চেন্ট, অমরনাথ, মুস্তাক আলী প্রভৃতি ভারতীয়দের কিম্বা ইংলণ্ডের হাট্ন্, বেডসের, অস্ট্রেলিয়ার মরিস, মিলার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়লকট, রামাদীন প্রভৃতি একান্তই আমার জানা লোক।

কাকাবাবু কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন। তাই আমার জন্যও টিকেটের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া নিজের সঙ্গে খেলা দেখিতে লইয়া চলিলেন। সাধ পূর্ণ হইল। তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া খেলা দেখিতে ছুটিতে কেমন একটু মৃদু উত্তেজনা ও গৌরবও অনুভব করিলাম। তারপর ভীড় পার হইয়া যখন গ্যালারিতে গিয়া বসিলাম তখন সমবেত জনতা ও সম্মুখের উন্মুক্ত প্রান্তর দেখিয়া কেমন অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি গ্রামের ছেলে—এমন লোক সমাবেশ দেখি নাই। আরও চমৎকৃত হইলাম—সযত্ন প্রস্তুত উইকেট দেখিয়া। মাঠের মধ্যখানে দুইদিকে তিনটি করিয়া ছয়টি স্টাম্প, মাথায় বেল। স্টাম্পের দুই সারের মধ্যখানে ২২ গজ জমি, হরিৎশ্যামল শষ্পাচ্ছন্ন এই ভূমিখণ্ডেরই নাম পীচ্ বা উইকেট। কী যত্নে তাহা পালিত, দেখিয়াই বুঝা যায়। এ-যেন রাজশয্যা। শুনিয়াছি এমন কোমল সতেজ তৃণাচ্ছাদিত না হইলে রবারের গালিচা দিয়াই এই পীচ্ ঢাকিয়া লইয়া খেলিতে হয়। কারণ, দেখা দরকার উহার উপর বল পড়িয়া বল যেন মাটির দোষে বিকৃত গতি না পায়, গতিবেগ না হারায়। বোলিং ও ব্যাটিং অর্থাৎ বল দিবার ও বল পিটাইবার কৃতিত্ব দুইই নির্ভর করে এই জমিটুকুর বিশিষ্ট অবস্থার উপর।

ব্যবস্থা ও আয়োজন

আধঘণ্টা খানেক অপেক্ষার পরে আম্পায়ার আসিলেন, দুই পক্ষের অধিনায়করাও অগ্রসর হইলেন। উইকেটের সম্মুখে টাকা শূন্যে ঘুরাইয়া 'টস্' হইল—কাহার দাবি প্রথম বলিয়া স্বীকৃত হইবে। টস্-এ জিতিয়া ভারতীয় দল প্রথম 'ব্যাট' করিবার বা পিটাইবার অধিকার গ্রহণ করিল—বিদেশীয় দল 'ফিল্ড' করিবার বা বল দিয়া দায়িত্ব পালন করিতে আসিল। যিনি বল করিবেন তাঁহার পরামর্শ মত তাঁহাদের কাপ্তেন মাঠে এগারোজন খেলোয়াড়কে সন্নিবেশিত করিলেন—ডাইনে বামে, পিছনে, সম্মুখে দূরে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। এবার করতালির মধ্যে ভারতীয় দলের দুইজন তাঁবু হইতে ব্যাট করিতে আসিলেন। ইঁহাদের নাম মুখস্থ ছিল, এইবার চোখে দেখিলাম। ধড়া-চূড়া-পরা, চোস্ত ট্রাউজারের ইস্ত্রিশুদ্ধ প্যাডে পা মোড়া, দীর্ঘদেহ পুরুষদের মুখভাব দূর হইতে বুঝা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা চলিতেছিলেন বেশ সতেজ দৃঢ়পদে।

আম্পায়াররা—বিচারকদ্বয়—‘বল’ দেখিয়া অনুমোদন করিয়া দিলেন। ‘বোলিং’ আরম্ভ হইল। যিনি বল করেন আম্পায়াররা দুই উইকেটের পার্শ্ব হইতে তাঁহার দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিতেছেন—খেলের আইন-লঙ্ঘন যেন না হয়। যাঁহারা মাঠে তাঁহারা প্রত্যেকে যেন বাঘের মত ওৎ পাতিয়া আছেন—তাঁহার দিকে ‘ক্যাচ’ উঠিলে পিটানো বল শূন্যে থাকিতে ধরিবেন, বল আসিলে আটকাইবেন। প্রত্যেকেরই ভঙ্গিতে একটা চাপা উত্তেজনা। যিনি পিটাইবেন তিনি এক একবার বিপক্ষের সেই চক্রব্যূহের বল-সন্নিবেশ দেখিয়া লন—ইঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার শক্তির ও কৌশলের পরিচয় দিতে হইবে। কাজটা সহজ নয়। একে তো বল দ্রুতগতি—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে হয়। এক-একটি এক-এক ধাঁচে আসে—যেন কোনো ধাঁচ তিনি চিনিয়া উঠিতে না পারেন। আবার, ছ বল পরে পরে বোলার বদল হয়—নূতন বোলারের নূতন পদ্ধতির বল্ল দেওয়া। অনেকেই আবার বাম হাতে বল দেন—তাঁহাদের বলের ধাঁচ আরও অপরিচিত ঠেকিবার কথা। ব্যাট্‌স্‌ম্যান একটু ভুল করিলেই বলটি পিছনের স্টাম্প উড়াইয়া দিবে—তাহা হইলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান ‘বোলড্ আউট’ (মার) হইবেন। আবার, ঠিকমত বলকে পিটাইতে না পারিলেই ‘ক্যাচ’ উঠিবে—তাহা মাঠের খেলোয়াড় মাটিতে পড়িবার পূর্বে নির্ঘাত ধরিবেন, তাহা হইলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান ‘কট্ আউট’ হইবেন। অনেকে বল দেয় এরূপ যে উহা পিটাইতে লোভ হইবে, আর পিটাইলেই ‘ক্যাচ’ উঠিবে, আবার সে ‘ক্যাচ’ও মাঠের বিশেষ একটি ক্ষেত্রের দিকে উঠিবে—বোলার পূর্বেই সেই ক্ষেত্রে আপন পক্ষের বল-সন্নিবেশ করিয়া রাখেন। ইহা ছাড়া, যিনি ব্যাট্ করেন বল মারিয়া নিজের সহযোগীর সঙ্গে ছুটিয়া রান্ করিতে গেলে তাহাদের দেখিতে হইবে যেন দুইজনে ঠিক সময়ের মধ্যে দৌড় সম্পূর্ণ করিতে পারেন—কেহ নিজে স্টাম্পের কোটে পৌঁছিবার পূর্বেই যেন বিপক্ষের বল সেই স্টাম্প স্পর্শ না করে—তাহা হইলে সে ‘রান্ আউট’ হইবে। বিপক্ষের এগারো-রক্ষী পরিবৃত হইয়া এইরূপে এক-একজন খেলোয়াড় তাহার সহযোগীকে লইয়া বল পিটান, রান্ করেন—দু এক মারে বল শত্রুব্যূহের ফাঁক দিয়া সীমানা পার হয়,—সেই ‘বাউণ্ডারি’ মারে ৪ রান হয়। আর পিটাইয়া একেবারে মাথার উপর দিয়া সীমানা পার করিলে কথা নাই—৬ রান, ‘ওভার বাউণ্ডারি’। করতালি ও হর্ষধ্বনির ধুম পড়ে—আর সত্যই সেই পিটুনি দেখিবার মত।

সাধারণ বর্ণনা

এই সব তো ক্রিকেট খেলার সাধারণ নিয়ম। আরও কত নিয়ম আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ‘দশ জনকে’ আউট করিয়া সাধারণতঃ অন্যদল নিজেরা পিটাইবার ভার লয়। তাহাদের দশজনের মার হইলে এক ইনিংস বা পালা শেষ। তখন আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্যায়। এইরূপ দুই পর্যায়ে মিলিয়া খেলার জয়-পরাজয়। ইহার ভিতরে মজা

হার জিত

আছে—তিনদিন হোক্, পাঁচদিন হোক্ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইরূপ বড়-বড় হারজিতের খেলা শেষ না হইলে খেলা 'অমীমাংসিত,' বা 'ড্র', সমান-সমান বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তাই যাঁহারা প্রথম পর্যায়েই খুব বেশি রান্ করে, তাহারা নিজেদের জয় সুনিশ্চিত বুঝিলে কখনো দশজনে ব্যাট শেষ না করিয়াই বিপক্ষকে ছাড়িয়া দেয়—তাহাদের দুই পর্যায়ের ইনিংস্ যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়—এমন কি, দ্বিতীয় দফায় নিজেদেরও ব্যাট্ করা প্রয়োজন না হইলে করিবে না। আবার, বিপক্ষ যদি এত কম রান্ করে যে মনে হয় দুই বারেও তাহাদের ধরিতে পারিবে না—তখন বিপক্ষকে বলে, 'দ্বিতীয় পালায় 'তোমরাই আবার পিটাও'—'ফলো অন।' দুইবার পিটাইয়া তাহাদের রান্ ছাড়াইয়া গেলে তাহারা দ্বিতীয়বার ব্যাট করিয়া হারাইবে। কিন্তু দ্বিতীয়বারে যদি বিপক্ষও ভালো পিটায়, বহুক্ষণ ধরিয়া পিটায়, তাহা হইলে খেলা অমীমাংসিত থাকিবে। অতএব বিপক্ষেরও নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা দু তিন রকমের হইতে পারে : প্রথমতঃ জয়ের চেষ্টা। প্রথম দফাতেই যত বেশি রান্ করিয়া প্রতিপক্ষের মোট রান্ ছাড়াইয়া যাও। কিন্তু পরাজয় সুনিশ্চিত বুঝিলে, এবং 'ফলো অন' করিতে হইলে যত সাবধানে সম্ভব খেলো,—যাহাতে দ্বিতীয় পর্বে সকলে আউট না হইতেই শেষ পর্যন্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাহা হইলেও খেলা সমান-সমান।

কলিকাতায় সেবার আমাদের দলের মান এইভাবেই যখন শেষ দিনে রক্ষা পাইল, আমরা তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বুঝিলাম, সমস্ত খেলাটাই যেন একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মহড়া। তবে ক্ষাত্রধর্মের মত ইহাতেও চাই পুরা-পুরি ভদ্রতার গুণ। স্পোর্টসম্যানশিপ বা এই ভদ্রতার নামই হইয়াছে 'ক্রিকেট'। অবশ্য দুই পক্ষের বিচার শক্তির, ধৈর্যের ও কৌশলের পরীক্ষাও এই খেলায় কম নয়। কিন্তু সর্বোপরি চাই 'শিষ্ট রীতি', স্পোর্টসম্যানশিপ্।

একদিন ফাঁক দিয়া চারিদিন বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিতে দেখিতে আমি একটু একটু করিয়া যেন এই খেলার রহস্য বুঝিলাম—প্রত্যেকেই সতর্ক, প্রত্যেকেই সুনিশ্চিত। বল ছুঁড়িবারও বা কত বৈচিত্র্য। পিটাইবারই বা কত অভিনবত্ব। প্রত্যেকেরই চেষ্টা—তাহার ধাঁচ যেন প্রতিপক্ষ বুঝিয়া ফেলিতে না পারে;—না বুঝিতে পারিলেই তাহার সুবিধা। হঠাৎ দুই একজন এমন মার মারিলেন যে বল যেন আকাশ ছুঁইবে। আবার কেহ এমন বল করিলেন যে, বল যেন পাক খাইতেছে, অথবা মাটির তল দিয়াই ছুটিতেছে। কাহারও পিটাইবার শ্রী আশ্চর্য সুন্দর; কাহারও বলের তেজ তেমনি ভয়াবহ, দুর্বার।

ক্রিকেট ধর্ম

বসিয়া বসিয়া দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম—এই খেলা খুবই শিক্ষাসাপেক্ষ। অনেক বেশি ক্ষিপ্রকারিতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৈহিক শক্তি তো লাগেই,

তাহা ছাড়া বেশ অর্থবলও প্রয়োজন। কিন্তু ক্রিকেট খেলা দেখিতেও ধৈর্য থাকা চাই—দৃষ্টি থাকা চাই—আর শিষ্টাচারের মর্যাদাও বুঝা চাই।

॥ দৌড়-ঝাঁপ-প্রতিযোগিতা ॥

(Sports)

(জিলার স্কুল বা কয়েকটি কলেজের দৌড়-ঝাঁপ)—বার্ষিক প্রতিযোগিতা।

উপলক্ষ্য ও ক্রীড়াস্থলী —মাঠের বর্ণনা—ছকের ডোরা-কাটা চিহ্ন, উঁচু লাফ, লম্বা লাফ প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য কোপানো মাটি, বেড়া দেওয়া জায়গা, ইত্যাদি। লক্ষ্য করা যায় ব্যবস্থাপকদের ব্যস্ততা—খেলোয়াড়দের উত্তেজনা।

কয়েকটি দৌড় (ফ্ল্যাট রেস্), বল ছোঁড়া, লাফ, বেড়া ডিঙানো দৌড়—

প্রতিযোগিতার কার্যসূচী বস্তাবাঁধা দৌড়—দুজনের তিন পায়ে দৌড়—সাইকেল চালনা—বাধাবন্ধ অতিক্রমের দৌড়—দড়ি টানাটানি—পুরস্কার বিতরণ।

দৌড় ঝাঁপে শুধু দৈহিক উন্নতি হয় না, প্রয়োজনীয় মানসিক বৃত্তিরও

উপসংহার অনুশীলন হয়—সর্বাঙ্গীণ জীবনস্ফূর্তি—গ্রীকদের আদর্শ, অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবে তাহার উদ্বোধন হইত।

।। ব্যায়াম প্রদর্শনী ।।

বার্ষিক উৎসব—পেরালেল বার, হরাইজণ্ট্যাল বার—ময়ুর ভঙ্গী—
উপলক্ষ্য দুর্গাপ্রতিমা রূপায়ণ, কাঁঠি হাতে ৫।১০ জনের একত্রিত খেলা—পেশী সঞ্চালন—মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি।

অ্যাক্রোবেটিক্স্ বা অদ্ভুত কতকগুলি 'তামাসা' দেখানো উদ্দেশ্য হওয়া
উপসংহার উচিত নয়; উদ্দেশ্য (ক) দেহচর্চা, শক্তি ও স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি, (খ) মনুষ্যদেহের বিচিত্র সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করা। এই পৃথিবীর যত মহৎ কর্ম কোনটিই দেহকে অবজ্ঞা করিয়া সাধন করা যায় না।

[মন্তব্য: দেশী ও বিলাতী অসংখ্য রকমের খেলাধূলা আছে। খেলা জীবনের ধর্ম,—প্রাণীরাও খেলে। খেলাধূলা সম্বন্ধে রচনা লেখার প্রকৃষ্ট উপায়—প্রথম দিকে কোনো একটি প্রত্যক্ষ খেলার বর্ণনা—কোথায়, কিভাবে খেলা আরম্ভ হইল ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরে—বিশেষ খেলার নিয়মনীতিসুদ্ধ বর্ণনা। অবশ্য এরূপ বর্ণনা খুব একঘেয়ে হবে; বিদেশী খেলা হলে তার বর্ণনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করে উপায় নেই। লেখার পদ্ধতি আয়ত্ত হলেও বিশেষ একদিনের খেলার বর্ণনা দিয়ে খেলার রচনা লিখতে সুবিধা বেশি। সে রচনা যে চিত্তাকর্ষক হতে পারে, তা ভালো ভালো সংবাদপত্রের খেলার রিপোর্ট থেকে দেখতে পারি। আর খেলার বর্ণনা যে সাহিত্য হয় তা ইংরেজিতে কারও কারও ক্রিকেট খেলা বিষয়ক রচনা পড়লে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও খেলার বর্ণনা লিখে কেউ কেউ যথেষ্ট নাম করেছেন। তাঁদের লিখিত বিবরণ পড়া উচিত।

অন্য সব রচনার অপেক্ষাও খেলার রচনা যদি একটু কৌতুক-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা যায় তা হলে উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু যথেষ্ট সময় ও স্থান না পেলে তা সম্ভব হয় না। আমাদের ফুটবল ও ক্রিকেটের রচনা দুটিতে তার একটু চেষ্টা করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে তা আরও বাড়িয়ে নেওয়া যেত—খেলোয়াড়দের বিশেষত্ব বর্ণনায়, কে কি ভাবে বল ধরে বা ছোড়ে, কিম্বা কার কি মুদ্রাদোষ—এসব বর্ণনা করা যায়। দর্শকদেরও সেরূপ হর্ষবিষাদ থেকে ইতর আচরণের কথা সরস ভাবে বলা চলতে পারে। ক্রিকেটের বর্ণনায় আরও বলা যায় দর্শকদের 'স্নবারি' বা বড়মানুষি ও নকল সাহেবিয়ানার কথা। তারপরে বলা উচিত বাঙলা দেশে এখনকার খেলার দুরবস্থার কথা। কৌশলী হলে এ প্রশ্নও তোলা যায়—খেলার অর্থ কি, খেলা কেন? খেলার আনন্দ বুঝি, কিন্তু খেলা দেখে বা না-দেখে হৈ-চৈ করা অনেকটাই ফ্যাশান-গত উৎসাহ নয় কি?]

।। বাঙালির উৎসব ।।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "মানুষের উৎসব কবে ? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে,—বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। ………প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী —কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।"

সূচনা

এই মহত্ত্বের বোধ ও আপন শক্তির বোধ আনন্দের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সেই প্রকাশের অবকাশ কখনো মানুষের জীবনে আসে প্রকৃতির ঋতু পর্যায়ের সঙ্গে—তখন 'ঋতু উৎসবের' সেই আয়োজনে সহজ প্রাণচ্ছন্দকে মানুষ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া প্রকৃতির ছন্দের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেয়, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রময় বিশ্ব হইতে তাহার তৃণ বৃক্ষলতা সবকিছুর সঙ্গে আপন আত্মীয়তা উপলব্ধি করে। আবার, কখনো অবকাশ আসে মানুষের সংসার হইতে। সমাজযাত্রার গতিস্ফূর্তিতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ঘেরা এই মানব সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র তুচ্ছতা ও দৈনন্দিনতা হইতে জীবনকে তখন ছাড়াইয়া লইয়া মানুষ আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মধ্যে মানব-প্রীতির সম্পর্কটি আবিষ্কার করে—এই সংসারের মধ্যেই সংসারের যে সর্বময় স্নেহ-মধুর, মমতা-মাখা রূপটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা জানিয়া লয়। আবার এই বিশ্ব-রহস্যের বিচিত্র লীলার অনুভূতি—কখনো প্রকৃতি কখনো মানুষের রাজ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহাকে ভক্তিতে ভাব-কল্পনায় আপ্লুত, অভিভূত করিয়া তোলে। তখন পূজায়-পার্বণে সে আপনাকে মেলিয়া ধরিতে চায়,—বিধাতার নিকট আত্ম-নিবেদন করে। এমনি করিয়াই এই উৎসব ব্যাপারটি কখনো তাহার জীবনে আসে ঋতু-উৎসবরূপে, কখনো সামাজিক উৎসবরূপে, কখনও ধর্মোৎসবরূপে ; আর প্রায়ই আসে আনন্দের মধ্য দিয়া এক হইয়া, প্রকৃতি-মানুষ প্রীতিতে-পূজায় এক হইয়া। কিন্তু যখন যেভাবেই আসুক—সে দিনটি উৎসবের মানুষ মহৎ সে দিনটি সে অসাধারণ ; কারণ সেদিনটি সে আনন্দের ভাবময় রূপ, সেদিন সে 'ক্ষুদ্র আমি' ছাড়িয়া 'বৃহৎ আমির' বিগ্রহ।

উৎসবের উৎস

বাঙালির জীবনে এই উৎসবের প্রধান অবসর কি, রূপই বা কি ?—সকল উৎসবের সঙ্গেই হয়ত দেবতার পূজা কোনো না কোনো ভাবে জড়াইয়া আছে, তাই বলিয়া সব উৎসবের মূল দেবমাহাত্ম্য নয়। কোনো উৎসবের মূল প্রকৃতির আত্মীয়তা, কোনোটির মানব-মাহাত্ম্য।

বর্ষারম্ভে আমরা আজকাল নববর্ষের উৎসবে আধুনিক পাশ্চাত্য-জীবনের উৎসব-রীতি প্রবর্তিত করিতেছি বটে, কিন্তু 'চৈত্র-সংক্রান্তি' দিয়া আমরা যে বর্ষটিকে বিদায় দিয়া আসিলাম তাহাতে রহিয়াছে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কের একটি পর্বের স্বীকৃতি।

প্রকৃতির আত্মীয়তা

বৈশাখকেও আমরা সেই সূত্রেই পবিত্র উৎবরের মাস বলিয়া জানি। বৈশাখী পূর্ণিমা, বৈশাখী মেলা ও নানা মেয়েলি ব্রতে পূজায় উৎসবে আমরা সেই প্রাকৃতিক সত্যকে অভিনন্দিত করি। বর্ষার উৎসব হয়ত রথে-ঝুলনে আমাদের নিকট শুধু ধর্মোৎসব বলিয়াই মনে হয়। পরে আসে শারদোৎসব। নবপত্রিকার অভিষেক হইতে আশ্বিনের ফলে পত্রে শারদলক্ষ্মীকেও স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের শারদীয় মহোৎসবকেও উদ্‌যাপন করি। 'পূজা' পূজা নয়—দুর্গাপূজা হইতে জগদ্ধাত্রী পূজা পর্যন্ত দীর্ঘ আনন্দের দিন। তারপর নবান্ন ও পৌষ-পার্বণ। প্রকৃতির দানের সঙ্গে মানুষের প্রয়াস মিলিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের এই শুভ-সুযোগটি রচনা করিয়া, আমাদের হেমন্ত শীতের দিনগুলিকে আশা-আশ্বাসে ভরিয়া দেয়। আবার আসে বসন্ত। সেই নবকিশলয়ের মত শাড়িটি পরিয়া 'বসন্ত পঞ্চমী' আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—সরস্বতী পূজার পরম সুন্দর জায়োজনে সঙ্গীতে-গানে, সম্মেলনে প্রাণ যেন মুখর। আসিল দোলযাত্রা। আর আমরা জানি—'সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'। ইহাই আমাদের হোলির আহ্বান। আবার 'চৈত্র সংক্রান্তি'।

প্রকৃতির এইরূপ প্রতিটি প্রকাশ আমাদের জীবনে আত্মচেতনার বিচিত্র ও শাশ্বত আহ্বান। প্রতিপদেই—শুধু পুরুষ নয়, বাঙালি পুরুষ, বাঙালি মেয়েও আমাদের ব্রত পার্বণে, অগোচরে স্বীকার করে—'এই পৃথিবী, এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই গ্রহনক্ষত্র—ইহারাও আমার আপন, আত্মীয়।'

তাহাদের সঙ্গে বাঙালি মেয়ে আপন অন্তরঙ্গতা অনুভব করে বলিয়াই তাহার স্বামীপুত্র ধনজন-সম্পদের কামনাকেও মাঘ-মণ্ডলের ও ঘেঁটু ব্রত-পার্বণের মধ্য দিয়া অকুণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারে। বিবাহ মাতৃত্ব, সংসার সুখের প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রকাশ—ইহাই

সংসার স্বীকৃতি

তো তাহার নারী জীবন। প্রতি পর্বেই তাই একটি না একটি উৎসব—তাহা লইয়াই আল্পনা, চিত্রণ। বাঙালি সংসারের সেই উৎসবের সংখ্যাই কি কম? আজ বিবাহ, কাল বধূরূপে সন্তান-সম্ভাবনায় ভাগ্যবতী, পরশু তাহার কোল জুড়িয়া শঙ্খধ্বনির মধ্যে নবজাতকের আবির্ভাব। তারপর তাহার ষষ্ঠী, তাহার অন্নপ্রাশন। প্রতিদিনই সেই নবাগতকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের জনক-জননীর, পিতামহ-পিতামহীর, আত্মীয়-পরিজনের সকলের শত আয়োজন। এইরূপ বাঙালি উৎসবের কি সংখ্যার শেষ আছে? বধূরূপে যদি কন্যা বরণীয়া হইয়া থাকে জামাতৃরূপে 'জামাইষষ্ঠীতে' বর পাইবে সম্বর্ধনা। আর

'ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়' পিতৃকুলগর্বিত সকল ভগ্নীর কাছে ভাই-এর সমাদর। প্রতি সমাজেই মায়ের-ভাইয়ের স্নেহেতে সংসার জীইয়া থাকে। কিন্তু সে স্নেহ বাঙালি জীবনকে যে কত পাকে জড়াইয়া-জড়াইয়া কত বিচিত্র মাধুর্যে ও মমতায় তাহাকে সরস করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বাহির হইতে কে বুঝিতে পারে? এত দৈন্য, এত দুঃখ, এত অভাবের মধ্যেও আমাদের সেই সরস সত্তাই আমাদের জীয়াইয়া রাখিয়াছে। তাই আমরা শুধু কেরানি নই, আমরা কোনো একটু স্থলে—গৃহের একান্ত স্বীকৃতিতে, সমাজের সস্নেহ অবকাশে—একটি আপন মানুষও।

আর এই সত্য জানি ও বুঝি বলিয়াই হয়ত আমাদের কাছে দেবতাও কোনো সুদূর বিস্ময় নন—যিনি অনন্ত শূন্যে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে শুধু আমাকে বিচারের জন্যই বসিয়া আছেন। না, বাঙালির কাছে তাহার দেবতা প্রকৃতির প্রতি-প্রকাশে প্রকাশিত, সংসারের প্রতি পর্বে প্রকাশমান—তাঁহাকে আমরা আপন মনে করি। প্রতিটি ঋতু-পরিবর্তনের উৎসবে, প্রতিটি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, পূজায় পার্বণে তাঁহাকে না হইলে চলে না। দশপ্রহরণধারিণী জগন্মাতা আমাদের দেশমাতৃকা,তিনিই আবার আমাদের পিতৃগৃহ সমাগতা কন্যা গৌরী—মেনকার নয়নের মণি। এইরূপে আমাদের কাছে প্রতিটি পূজায় যেন গৃহোৎসব—শুধু সুদূর দেবতার ধ্যান নয়। লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, কালীপূজা, সব পূজাই আমাদের সুখদুঃখের কামনায় উদ্‌যাপিত হয়।

বিশ্বরহস্যের অঙ্গীকার

আমাদের প্রতি উৎসবেরই একটা সামগ্রিক রূপও আছে। তাই বিভিন্ন কোনো একটি অনুষ্ঠান বা আয়োজনে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। উৎসবের সেই রূপটি হিন্দু সমাজে সহজে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাহা পারেন নাই। এই বাতাস, এই জল, এই স্নেহ-মেদুর জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরে এক হইতে চাহে নাই বলিয়াই তাহাদের উৎসব যেন একটু বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও ফলজলের মধ্য হইতে তাহা সমুদ্ভূত নয়। তথাপি ঈদ্, মোহারম, শবেবরাৎ, বাঙালির জীবনে উৎসব হিসাবে জীবন্ত জিনিস। আর পৌষ-পার্বণের মতই 'খ্রীষ্টমাস' একটা পরিতৃপ্তির আশা বহন করিয়া আনে।

নূতন-উৎসব চেতনা

এই ভারতের বাহিরের অন্য জলবায়ুতে উৎপন্ন উৎসবগুলিকে আপনার করার মধ্যে বাঙালির একটা নাতিকর্কশ গ্রহণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আরও নূতন উৎসবে আধুনিক কালের বাঙালির নূতন জীবন-চেতনার পরিচয়ও দেখিতে পাই। কী সেই নূতন উৎসব? পাশ্চাত্য পয়লা জানুআরি তাহার একটি। আমরা উহাকে 'নববর্ষ' বলি না; কিন্তু তথাপি কার্যত সেইরূপেই জানি। আমাদের পয়লা বৈশাখ,আমাদের হালখাতা কি তাই বলিয়া

কিছুমাত্র ম্লান হইবে? এইরূপ নূতন উৎসব—'পনেরই আগস্ট' আর 'পঁচিশে বৈশাখ'—আমাদের চেতনা আর কোন্ উৎসবের মধ্য দিয়া এমন সত্য করিয়া জানে—আমরা মহৎ, আমরা বিশ্বের আত্মীয়?

এই মহত্ত্বের বোধ, এই মানব সাম্যের বোধ, এই আনন্দের মধ্য দিয়া নিজেকে উপলব্ধি আর 'পরকে আপনার করিবার মত' শক্তি—ইহাই তো উৎসবের ধর্ম। সেই আপন সত্তার উদ্বোধনকেও আমরা নিজেদের সাজ-সজ্জায়, গৃহের সেই পুষ্পপল্লবের মালায় ও আল্পনার রূপে-কল্পনায় প্রকাশ করিয়াই কি ক্ষান্ত হই? আমরা আসর রচনা করি, সঙ্গীতে নাট্যে আমাদের প্রাণসত্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চাই। হাসিতে গানে মিলনে, শুভেচ্ছার বিনিময়ে এক-এক বারের মত জানি—শুধু আমরাই প্রবুদ্ধ হই নাই—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।'

উপসংহার

॥ দুর্গোৎসব

'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা'—কিন্তু আশ্বিনে কেন? বাঙালি বলিবেন, শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে। দুর্গা ছিলেন 'বাসন্তী' দেবতা।* কিন্তু লঙ্কা জয়ের প্রয়োজনে শ্রীরামচন্দ্র অকালে মহিষাসুর-মর্দিনী এই অম্বিকার উপাসনার অয়োজন করেন। তখন হইতেই শারদীয় মহোৎসবের সূচনা।

সূচনা

বলা বাহুল্য, ইহা বাঙালির নিজস্ব কল্পনা ও ব্যবস্থা। যিনি মহিষমর্দিনী মহাশক্তি, তিনি 'চণ্ডী'র চণ্ডীদেবী। মহিষাসুর প্রপীড়িত দেবতারা সকলে যখন একযোগে পরিত্রাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে দিব্য তেজঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। আর সকলকার তেজে সম্মেলিত হইয়া জ্যোতির্ময়ী সিংহবাহিনী, দশপ্রহরণধারিণী, মহৈশ্বর্যময়ী মহাশক্তি রূপে আবির্ভূতা হইলেন। ইনিই দুর্গতিনাশিনী 'দুর্গা'—পদতলে নিহত মহিষাসুর, সিংহবাহিনী অসুর সংহারে সমুদ্যতা।

কাহিনী

কিন্তু পুরাণের কাহিনী যুদ্ধকাহিনীরূপে শেষ হইতে পারে নাই। বাঙালি কল্পনা দুর্গার 'শিবের ঘরণী' গৌরী-রূপকেও ছাড়িতে নারাজ। তাই রণচণ্ডীর পার্শ্বেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সমস্ত পরিবারটি আনিয়া বাঙালি স্থাপিত করিয়াছেন। লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়-গণেশ কেহই বাদ পড়িয়া যায় নাই। মাথার উপরে প্রায়-প্রচ্ছন্ন মহেশ্বর আরগণেশের

দেবতার বিকাশ

পার্শ্বে তাঁহার 'কলাবৌটি' পর্যন্ত থাকেন। সমস্ত 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' মধ্য দিয়া রণদামামার উপরে পিতৃগৃহাগতা কন্যা গৌরীর কল্পনাটি ছাপাইয়া উঠিয়াছে। গিরিরাজ ও মেনকার স্নেহ-সরস ছায়ায় অমন সংগ্রামমত্তা শক্তিস্বরূপিণী হইয়া উঠিয়াছেন সৌভাগ্যবতী হাস্যোজ্জ্বলা ভগবতী—মুখে যাঁহার সংহারমূর্তির ক্ষীণতম ছায়াও নাই।—কিন্তু মাত্র এই দুই কল্পনার মিলনেই কি দুর্গোৎসব?

শুভ-সূচনা কলাবৌয়ের স্নানাভিষেক হইতে বুঝিতে পারি আরও পূর্বেকার কোন্ আদিম শারদোৎসবকেও রূপান্তরিত করিয়া এই পূজা-উৎসবের সঙ্গে বাঙালি কল্পনা জুড়িয়া দিয়াছে। এইরূপে একই মহৈশ্বর্যময়ী বরাভয়নাশিনী মহাভয়ঙ্করী দেবী আমাদের সকল কামনা-বাসনা পূরণকারিনী, করুণাময়ী মাতৃস্বরূপিনী ভগবতী রূপে পূজিতা! আবার গৌরীরূপে প্রতি গৃহে পতিগৃহ হইতে পিতৃগৃহাগতা স্নেহময়ী কন্যারূপেও কল্পিতা। আর এখন,—বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন ব্যাখ্যার পর হইতে,—তিনি যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেশমাতৃকা—'মা যা হইবেন'—সেই রূপেও কল্পিতা, তাহাও সম্ভবত আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি। আর শুধু দেশমাতৃকাই বা কেন, মানব-মৈত্রীর আগামী দিনে যদি ধরণী-মাতাকেও এই বিশ্ব-জননী রূপে আমরা কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠি,তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। হিন্দুর দেবতা চিরবিকাশমান চিরপ্রকাশমান। দেশে-দেশে দেশজ কল্পনাকে ও যুগে যুগে যুগকল্পনাকে এমনি করিয়া আত্ম-মহিমায় অঙ্গীকার করিযা লইতে পারে বলিয়াই তো সেই দেবতাও চির-জীবন্ত,—একটা মাত্র নিশ্চল স্থাণু ভাবে পরিকল্পিত দেবতা নন।

অন্তত দুর্গাপ্রতিমা ও দুর্গাপূজার মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রাণ-চেতনার ও শ্রেষ্ঠ ভাব-রসধারার মিলন ঘটিয়াছে, তাহা মানিতে হয়। তাই বহু প্রতিমা-বিরোধী বাঙালিও বাঙালির এই মহোৎসবকে আপনার উৎসব বলিয়া মানিয়া লন,—শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীর বিশেষ দেবীর 'পূজা' বলিয়া মনে করেন না।

সেই দেবীপূজা অবশ্য শাস্ত্রবিধিমত তেমনি চলে। ষষ্ঠিতে বোধন হয়, সপ্তমী অষ্টমী, নবমী, তিন দিন পুরোহিত চণ্ডীর পূজা তন্ত্রোক্ত নিয়মে পরিচালিত করেন,—পূর্বাপেক্ষা কম হইলেও, ছাগ এবং কোথাও মহিষবলিতে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ রক্তে ভাসিয়া যায়। তারপর দশমীতে বিসর্জন আর সন্ধ্যায় শান্তিজল দান—'পুনরাগমনায় চ' সেই প্রার্থনা।

পূজা-পদ্ধতি

এইসব অবশ্যপালনীয় রীতিনীতি। কিন্তু শাস্ত্রের বিপুল মন্ত্ররাশি ও জটিল প্রকরণ লইয়া তাই বলিয়া কেহ মাথাঘামায় না। ভক্তেরা অবশ্য ভক্তিভরেই পূজা করেন। কিন্তু অধিকাংশেই আরও প্রাণ ভরিয়া করেন পূজার উৎসব। শঙ্খ-ঘণ্টা ঢাক-ঢোলের সমারোহ, পূজামণ্ডপের ধূপবাস-আচ্ছন্ন মধুর রহস্য, আলোকসজ্জায় সন্ধ্যারতির সুন্দর

পূজার উৎসব

উজ্জ্বল পরিবেশ—সাধারণের নিকট ইহা আরও সত্য। সেই সঙ্গে তেমনি মানিতে হইবে—সত্য এখনো বাঙালী মায়ের সতৃষ্ণ স্ফুরিতনেত্রে সেই কন্যার আগমনী প্রতীক্ষা, তিন দিন ধরিয়া তাহার সস্নেহ সমাদর, দশমীতে দেবীর মুখখানি অঞ্চলে মুছিয়া সাশ্রুনেত্রে আবার বিদায়দান—'মা, আবার এসো।' এই একটি মুহূর্তে সমস্ত বাঙালীর অন্তঃপুর-জীবনের করুণ সুন্দর ইতিহাস প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। তারপর বিদায়ের বাজনা বাজে—বিদায়-মুখিনী দেবী প্রতিমাকে লইয়া বিসর্জনের বিরাট উৎসব সব ভুলিয়া শুধু বিজয়োল্লাসেই পথ বাহিয়া চলে, আর বিসর্জনের শেষে পৃথিবীর যাবতীয় বৈষম্য, দ্বন্দ্ব দ্বেষ, ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া সকল মানুষের সঙ্গে প্রীতি নমস্কার-আলিঙ্গন বিনিময় করিয়া মানব-ভ্রাতৃত্বকে বিজয়ার পরমবিজয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়—তখন যেন জীববলি মন্ত্রাবৃত্তি, মূর্তিপূজা প্রভৃতি চিরাগত প্রথার সত্য-মিথ্যা, বহু বিতর্কের সর্ব সন্দেহের সমাধান হইয়া যায়;—আমরা উপলব্ধি করি, বাঙালীর এই 'পূজা' এক জাতীয় ও মহামানবীয় উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়।

সর্বাঙ্গীণ উৎসব

তাই তো এই পূজাকে উপলক্ষ করিয়া এত হাসি, এত বাঁশি, এত আলো, এত কলাকৌশলের প্রয়াস জমিয়া উঠে। সমস্ত বৎসরের ব্যবসা-বাণিজ্য এই শারদোৎসবের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। কেনা-কাটা, নূতন বসন, নূতন ভূষণ, প্রীতি স্নেহের সমস্ত বিনিময়—এই সময়টিতে যেন না হইলেই নয়। দেশে অভাবের তাড়না আছে, এমন কি খাদ্যেরও অপ্রতুলতা পীড়াদায়ক। তবু এই পূজার দিনে একবার সেইসব ভুলিতে চাহিবে না, এমন অভাগা কেহ আছে? সারা বৎসরের মত এই পূজার ছুটি ও পূজার ভ্রমণের পরিকল্পনায় দিন গণিতে থাকে বিশ্রামকামী ও বিলাসকামী বিত্তবানরা। যেমন সর্বাঙ্গীণ এই শারদীয়া পূজা তেমনি উৎসবেরই আকর্ষণও সত্যই সর্বজনীন।

সর্বজনীন উৎসব

আসলে, দুর্গোৎসব সর্বদাই ছিল সামাজিক উৎসব। কেহ একজন ভাগ্যবান্ হয়ত দেবীর পূজা স্বগৃহে করিবেন; কিন্তু তাঁহার পূজায় চাই ষোড়শোপচার—সমাজের সকল বৃত্তির মানুষের সহ-যোগিতা; পূজা-প্রাঙ্গণও সমাজের সকল স্তরের মানুষের সমাগমে হওয়া চাই ধন্য। অবশ্য এই সত্যটা এই ব্যক্তিতান্ত্রিক কালের গৃহ-কর্তারা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন, তাই সামাজিক মর্যাদাসচেতন মানুষেরাও আজ সর্বজনীন পূজার আয়োজন করিয়াছেন। পূজা অপেক্ষাও সর্বজনীন পূজায় তাই সেই সামাজিক সত্য-শিক্ষাদীক্ষা, সংহতি ও প্রগতির সংকল্প প্রকট হইয়া উঠে। আর সেই সুযোগ লইয়া এ যুগের যত সামাজিক উৎকটতাও স্পর্ধিত হয়। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, প্রতিমার অর্থহীন 'আর্ট'-বিলাসে,

উৎসবের ও বিজয়ার উন্মত্ত আড়ম্বরে আমরা এই জাতীয় উৎসবের মধ্যে জাতীয় ব্যাধির লক্ষণগুলিও প্রকটিত হইতে দেখি।

উপায় নাই। আমরা একটা নূতন যুগের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যতক্ষণ জীবনে সেই যুগ-চৈতন্য সুস্পষ্ট শালীনতায় গ্রাহ্য না হইবে ততক্ষণ পূজা বলি, উৎসব বলি, যাহাই বলি, সব কিছুতেই আমাদের এই ছন্দোহীন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিবে। কিন্তু যদি কোনো জিনিসের মধ্যে আমাদের জাতীয় মানসের মহিমময় প্রকাশ এখনো সম্ভব হয়, তবে তাহা সম্ভব হয় দুর্গাপূজায়। উহার পরিকল্পনা, উহার আয়োজন, উহার পরিবেশ ও সর্বাঙ্গীণতা, সর্বোপরি উহার মহামিলনের বাণী—সবই একটা মহৎ সত্যের প্রকাশ।

উপসংহার

॥ একটি উৎসবের কথা ঃ রবীন্দ্র-জয়ন্তী ॥

একটি উৎসবের কথাই বলিতেছি—পূজা-পার্বণের কথা নয়। জানি আমাদের জীবনে এতকাল পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক উৎসবের সঙ্গে কোনো না কোনো ধর্মগত সংস্কার জড়িত থাকিত। ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই আমরা প্রতিদিনের সংসারের তুচ্ছতা, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব পিছনে ফেলিয়া একবারের মত নিখিল মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়-বন্ধন উপলব্ধি করিতাম। এই 'মানুষের মহৎ সত্তায় জাগরণের' নাম যদি উৎসব হয় তাহা হইলে বলিতে পারি—কে আমাদের বাঙালী চিত্তকে এই আত্মচেতনায়, বিশ্বের আত্মীয়তায় ও আনন্দের উপলব্ধিতে এমন করিয়া জাগ্রত করিয়াছে—আমাদের বাঙালি প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথের মত? তাই রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মত এমন জাতীয় উৎসব আমাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে?—আমি তাই এই বৎসরের রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উৎসবটির কথাই বলিতেছি।

সূচনা

এমন শহর-গ্রাম বা প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে এই 'পঁচিশে বৈশাখের ডাকে' জোয়ার না লাগে। ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে পূর্ব হইতেই আয়োজন শুরু হয়। 'কবি-পক্ষের' উৎসবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থা ব্যতীতও প্রতিটি ক্লাব সমিতি, ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, কর্মচারী ক্লাব, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যেভাবে মাতিয়া উঠে, তাহাতে পনের দিন জুড়িয়া যেন বাঙলা দেশে একটা সংস্কৃতির মহাসত্র বসে। কোনো কালে এই দেশের আর কোনো উৎসবে এমন সংস্কৃতি-সমারোহ আর

ব্যাপকতায় জাতীয় উৎসব

হইত কিনা জানি না। প্রতিদিনই অজস্র সভার অনুষ্ঠান। সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাসাধিক পূর্ব হইতে স্বীকৃত করাইয়া রাখিতে হয়—না হইলে কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। বিশেষ দিনে মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া পুষ্পসজ্জিত কবি-প্রতিকৃতির পদতলে আসিয়া তাঁহারা আসন লন—স্বচ্ছন্দ হাস্যে, সযত্ন সজ্জায় তাঁহারাও সচেতন। ধূপবাসে গৃহ আমোদিত। চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি। প্রসিদ্ধ হোক্ অপ্রসিদ্ধ হোক, সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পীদের চাই। সঙ্গীত ছাড়া বাঙলার কোন উৎসবের অনুষ্ঠান হয়? আর রবীন্দ্রনাথের উৎসব তো সঙ্গীত ব্যতীত ভাবাই অসম্ভব। তারপর, দুই-একটি ভাষণ—সভাপতিও অতিথিদের রবীন্দ্র-দর্শন, রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যাখ্যা, কবির উদ্দেশ্যে ভক্তি ও ভাবাবেগমিশ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু আসলে চাই—গান, আবৃত্তি, আর অন্ততঃ এক আধটুকু নৃত্য; তারপর সম্ভব হইলে, রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়। সঙ্গীত ও নৃত্য, ইহাই আয়োজনের এখন মূল আকর্ষণ। সত্যই তো, সংস্কৃতির মূল পরিচয় তো এই সব কলাবিদ্যার উৎকর্ষে।

এই উৎসবের ক্রম-প্রকাশিত রূপের বা প্যাটার্ণের মধ্যে আজ তাই আমাদের জাতীয়-মানসের যে বিসদৃশতা প্রতিফলিত হয় তাহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রবীন্দ্র-জয়ন্তী বলিলেই আজ নাচ ও গানের যেমন হউক ব্যবস্থা বোঝায়। রবীন্দ্র-পরিচয়, কাব্য-আলোচনা, সভাপতির সশ্রদ্ধ ভাষণ, কাব্য-রসিকদের রবীন্দ্র-ব্যাখ্যান, সবই গৌণ। উৎসবের মাইক, উৎসবের গৃহসজ্জা, উৎসবের অন্য উপকরণের মতোই এই সব না হইলে নয়—এই মাত্র। কিন্তু উৎসবের প্রধান লক্ষণ: কোনো রেডিও শিল্পী একটি গান গাহিবেন; কোনো 'আধুনিক' বা কোনো রেডিও-সঙ্গীত একাধিক শুনিবার দাবি। কোনো কলাবিদ্ দশ মিনিটের জন্য একটি যন্ত্র-সঙ্গীতে আলাপ করিবেন; কি করিয়া তাহাদের ফাঁকে ঢুকিবে নাচ ও গান। কোন্ নূতন গায়িকা একটি গান গাহিবার আশায় প্রথমাবধি কাল গুনিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, আর হঠাৎ কোন্ নৃত্য-শিল্পী বা সঙ্গীত-বিশারদ না আসিয়া উৎসবের উদ্যোক্তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে 'পাব্লিকের' নিকট হতমান করিয়া দিলেন। কিম্বা, সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন নাই, প্রধান অতিথি তিন ঘণ্টা পূর্বেই আসিয়া বসিয়া আছেন। এমনি সব ছোট-বড় কমিডি-ট্র্যাজেডি মিলিয়া বহু উদ্যোগ ও আয়োজনের বিশৃঙ্খল বাহুল্যে বাঙালির হুজুগ-প্রিয়তা, পরিকল্পনাহীন উৎসাহের, যত্নহীন সমারোহের দিকটিও রবীন্দ্র জয়ন্তীতে প্রায়ই প্রকট হইয়া উঠে।

হুজুগের বাড়াবাড়ি

এমন আনন্দের ও শ্রদ্ধাভক্তির উৎসবটির তাই কোথায় যেন তাল কাটিয়া যাইতেছে। হুজুগ বাড়িতেছে, উৎসবের প্রাণ ক্ষয় হইতেছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথকে জাতির জনসাধারণ যে আপনার করিয়া লইয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

সেই সত্যটিকে মানিয়া আমরাও স্কুলে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন করিব, স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু গত বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা একটু সংশয়-গ্রস্তও ছিলাম। গতবার আমাদের স্থানীয় এম্-এল্-সি মহাশয়কে নানা কারণে সভাপতি করিতে হইয়াছিল। তারপর তিনি যেই গানের দলকে আনিয়া সেদিন মহারবে উৎসব করিলেন তাহাতে দেশে কৃষির ফলন বাড়িবে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের বাঙলার শিক্ষক, ইংরেজির শিক্ষক প্রভৃতি শিক্ষক মহাশয়রা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। এইবার তাই স্থির হইল —আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কেই সভাপতি হইতে হইবে। তিনিই স্থির করিলেন সভাপতির কোনো বক্তৃতা নাই—তিনি শুধু কার্যসূচীটি নির্বাহ করাইয়া দিবেন। সেই কার্যসূচীও নূতন করিয়া প্রণীত হইল।

কার্যসূচীটি অভিনব। বাঙলার শিক্ষক মহাশয়ই তাঁহার শিক্ষক বন্ধুদের সহিত বসিয়া দিন পনের পূর্বে তাহা প্রণয়ন করিলেন। তাঁহাদের প্রথম নীতি হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতেই উৎসবের সমস্ত কার্যসূচী প্রণীত হইবে —গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা বিধেয়। দ্বিতীয় স্থির হইল—এই কবিপক্ষে প্রতিদিন স্কুলের প্রথম কার্যারম্ভে স্কুলের মিলন-মণ্ডপে বা হলঘরে রবীন্দ্র-নাথের একটি করিয়া গল্প ও রচনা পাঠ হইবে। একদিন হইবে শিশুপাঠ্য রচনা পাঠ, অন্যদিন উচ্চতর রচনা পাঠ। প্রতিদিনই তাহার পরে আরম্ভ হইবে দিনের পাঠারম্ভ। পঁচিশে বৈশাখের দিনটিতে প্রধান উৎসব। ফুলে ও পাতায় উৎসবের সজ্জা সুসম্পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধি সভারম্ভে পুষ্প-মাল্যে কবিকে সার বাঁধিয়া অর্ঘ নিবেদন করিয়া 'কবি-প্রণাম' জ্ঞাপন করিবে।

তাহার পরে দেড় ঘণ্টার মত কবি-সঙ্গীত ও কবি-রচনায় কবি-পরিচয় গ্রহণ করা চলিবে। আমাদের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সুকণ্ঠ ছাত্রটির নেতৃত্বে প্রতি ক্লাসের একটি ছাত্র সমবেত হইয়া একযোগে প্রথমে গাহিবে রবীন্দ্র-নাথের 'উদ্বোধন সঙ্গীত'। ইহার পরে প্রথম পাঠ হইবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। তারপর একটি রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি—'জন্মদিনে'; রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প পাঠ; আবার কবিতা-আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, একটি ক্ষুদ্র নাটিকার এক-একটি ভূমিকাংশ একজন ছাত্রের পাঠে অভিনয়ের আভাস; সর্বশেষে আবার সঙ্গীত।

এই কার্যসূচী প্রণীত হইলে তাহার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। ছাত্রদের মধ্য হইতে কণ্ঠের গুণ ও উচ্চারণ-কুশলতা দেখিয়া এক-একজন একটি বিষয় আবৃত্তির ও পাঠের ভার লাভ করিল। নাটিকার গীতাংশ প্রায় বর্জন না করিয়া উপায় রহিল না। কিন্তু ভূমিকাংশে অঙ্গভঙ্গি না করিয়া বিশুদ্ধ স্বর-বিন্যাসে কবি-বাণী অর্থপূর্ণ করিবার মত শিক্ষাদানের ভার শিক্ষক মহাশয়রা গ্রহণ করিলেন। শিক্ষক মহাশয়দের সভাপতিরূপে প্রধান শিক্ষক গ্রহণ

করিলেন শিক্ষাবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধটি পাঠের দায়িত্ব। আর বাঙলার শিক্ষক গ্রহণ করিলেন 'গল্প সল্প' হইতে একটি গল্প পড়িবার ভার। ইংরেজির শিক্ষক গ্রহণ করিলেন 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি পাঠের ভার। ইহা ছাড়া কিন্তু সমস্ত আবৃত্তি, গান ও পাঠের দায়িত্ব আমাদের ছাত্রদের, এবং উৎসবের সকল আয়োজনের দায়িত্ব আমাদের উৎসব সমিতির; শিক্ষক মহাশয়রা থাকিবেন উপদেষ্টা।

যতই শিক্ষক মহাশয়রা বলুন, প্রথমটা আমরা এই কার্যস্থচীতে উৎসাহ বোধ করি নাই। আমরা আবার কে কী পড়িব? বেণুই বা নূতন কী গাহিবে? প্রতিদিনই তো তাহার গান শুনি। আর স্থনীলই বা নূতন কী আবৃত্তি করিবে—উহার গলা তো খেলার মাঠেতে প্রতিদিনই সকলে শোনে? বাহির হইতে কেহ যদি গায়ক বা শিল্পী না আসে তাহা হইলে গ্রামের লোকেরা কেহ আমাদের উৎসবে আসিবে কেন? গ্রামে কয়টি উৎসব আছে? এই একটি দিনের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া থাকেন—নামজাদা হউক অখ্যাত হউক বাহিরের দুই একজন শিল্পী হয়ত গান করিবেন। এক-আধটি আত্মীয়-স্থানীয়া অপরিচিতা মেয়েকেও নৃত্য-শিল্পে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রামের কোনো বালিকা এত দুঃসাহসিনী না হইলেও গ্রামের লোকেও এখন নৃত্য-কলাতে আকৃষ্ট হন—'বৈজয়ন্তীমালা' প্রভৃতি নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে গঞ্জের সিনেমা-গৃহে তাহাদের অনেকেরই পরিচয় ঘটিয়াছে। অতএব, এক আধটুকু নৃত্য-কলা না হইলে কি করিয়া তাঁহারা তুষ্ট হইবেন? বিশেষতঃ, 'রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে'ও নাচ হইবে না! ইহাতে রবীন্দ্রনাথই তো আপত্তি করিতেন। আর সভাপতি? আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এম্-এ। তাঁহার ব্যক্তিত্বও আছে, বিদ্যাও আছে, তাহা আমরা ছাত্ররা যেমন বুঝি তেমন অন্যে বুঝিবে কেন?—একজন বাঙালি 'সাহিত্যিক' মাসিক পত্রের 'লেখক' অন্তত লেখক-নামীয় বাহিরের যে-কেহ একজন—কোঁচা দোলাইয়া চাদর ঝুলাইয়া সভায় 'পৌরোহিত্য' না করিলে কে জানিবে যে উৎসব হইতেছে? সবাই বলিবে 'হেডমাস্টার নিজে প্রেসিডেণ্ট হইয়া বসিয়াছে'।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। স্কুলের পরে মহড়া চলিল, পাঠ শিক্ষা আরম্ভ হইল,—আবৃত্তির জন্য পুরা মুখস্থ না করিয়া আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম না। তারপর যথা দিনে উৎসবও আরম্ভ হইল। আমরা প্রাণপণে পদ্মফুলে কবি প্রতিকৃতি সাজাইলাম। জুঁই ফুলের মালায় তাহা অলঙ্কৃত করিলাম। ধূপে-দীপে কবির এক ধরনের আরতি করিলাম। তারপর, শঙ্কিত ভীত কণ্ঠে প্রথম উদ্বোধন সঙ্গীত গানও করিলাম। কেমন করিয়া কি হইল কে জানে? গান জমিয়া গেল। প্রথমেই সেই যে সভা জমিল হেডমাস্টার মহাশয়ের পাঠে তাহা আর এক স্থর উপরে উঠিয়া গেল। কে জানিত রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে এত কথা ভাবিয়া রাখিয়াছেন? ইহার পরে

আবৃত্তি করিতে আমার পা কাঁপিলেও ভুল হইল না—উচ্চারণও বোধ হয় পরিষ্কারই হইল। আবার গান। যখন শিক্ষক মহাশয়রা রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিলেন তখন মনে হইল আমরা যেন এক নূতন রাজ্যে চলিয়া গেলাম—সে রাজ্য রবীন্দ্র-রাজ্য। সকলে বুঝিলাম এই পৃথিবীতে এই তো আমাদের বাঙালিদের পরিচয়—আমরা রবীন্দ্র-রাজ্যের মানুষ। সে রাজার ভাষায় আমরা নিজের পরিচয় নিজেরা প্রতিদিন নূতন করিয়া জানিব—ইহাই তো 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র উদ্দেশ্য। 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা' আমরা সম্পূর্ণ করিলাম।

॥ দেশ-ভ্রমণ ॥

কূপমণ্ডুক শব্দটির অর্থ সুবিদিত। কিন্তু এমন অর্থ হইল কেন?—নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যে জীব বদ্ধ সে জানে পৃথিবী বুঝি ঐটুকুই—ইহার বেশি জানিবার নাই, বুঝিবার নাই। তাই নিজ পরিবেশের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকিলে মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য; জ্ঞানের পরিধিও তাহার বাহিরে যাইবে না; আর জীবনের বহু সৌন্দর্য থাকিবে অনাস্বাদিত। অবশ্য এই যুগে আমরা লাইব্রেরীতে বসিয়াও মহাসমুদ্রের তরঙ্গধ্বনি শুনিতে পাই। গৃহে বসিয়া থাকিলেও আমেরিকার কণ্ঠ বা মস্কোর কথা আমাদের কানে পৌঁছাইতে পারে। আর চলচ্চিত্রের প্রসাদে পৃথিবীর রূপ ও মানুষের জীবন-যাত্রাও বহুলাংশে দেখিয়া ফেলিতে পারি। তাই বলিয়া কি ভ্রমণের উপযোগিতা বা আনন্দ কিছুমাত্র কমিয়া গিয়াছে? নিশ্চয়ই নয়। বরং বলিতে পারি মানুষের সভ্যতা যতই বিচিত্র পৃথিবীর বিস্ময়কে আমাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরিতেছে—সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত কিছুই যখন দুর্গম রহিতেছে না—তখন ততই যেন আমরা প্রত্যেকেই আরও বুঝিতেছি—'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' জলে স্থলে আকাশে সকল প্রকারের যানবাহন যতই বাড়িতেছে, ততই মানুষের মনও মানুষকে জানিবার, পৃথিবীকে দেখিবার আশায়-আনন্দে, জ্ঞানে ও অনুভূতিতে মাতিয়া উঠিতেছে। দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা যতই অপসারিত হইতেছে ততই দেশ-বিদেশের সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞানের, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, ভূগোলের পড়া পৃথিবী ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া পৃথিবী এক নয়, এক হইতে পারে না।

সূচনা

ভ্রমণের প্রয়োজন বৃদ্ধি

দেখিবার মত জিনিস তো কম নয়। কোনো দেশেই দর্শনীয় বস্তু গণিয়া শেষ করা যায় না। একটি কেন, দুই-দশটি পুঁথিতেও বুঝাইয়া বলাও

অসম্ভব। তাহা ছাড়া, গেজেটিয়ার, সেন্সাস রিপোর্ট, এ সব গুলিয়া খাইলেই কি কেহ চোখে না দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন বাঙলা দেশ কি? বাঙালি কি? কিম্বা, আরও ক্ষুদ্র দেশ, আমাদের প্রতিবেশী আসাম, কিরূপ? অহমিয়ারা কাহারা? কত বিচিত্র সে দেশের প্রাকৃতিক সন্নিবেশ, শোভা সৌন্দর্য; কত সমৃদ্ধ সে পশুপক্ষীতে, তরু-লতায়; আরওসমৃদ্ধ নৃজাতির গণনায়,—সাংস্কৃতিক বিন্যাসে আহারে-বিহারে, বসনে-ভূষণে, রূপেরসে গন্ধে গানে, আত্মপ্রকাশের শত বৈচিত্র্যে। অবশ্য চোখে দেখিয়াও কেহ তাহা শেষ করিতে পারে না, ইহাও সত্য। আর দেখিবার মত চোখ সকলের নাই, সকলে সব বিষয় দেখিতে চাহেনও না। কিন্তু না দেখিয়া—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিয়া—কেহ যে সত্যই কিছু বুঝিতে পারেন, তাহাও ঠিক নয়। আর দেখার ফলেই যথার্থ শেখা সম্ভব। সেই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়, উহা জীবনের অঙ্গ হইয়া উঠে। তাহাতে বুদ্ধির স্ফূর্তি আছে, যুক্তির বিকাশ ঘটে, আর আপন অন্তরের মধ্যে আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়।

শিক্ষার সম্পূর্ণতা

কথাটা অত্যুক্তি নয়। আমরা তো আমাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা ও জন্মলব্ধ রীতিনীতি লইয়া বেশ মনে করি—ইহাই সঙ্গত, ইহাই সনাতন। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া একবার বিদেশে গেলেই বুঝি-আমাদের রীতিনীতি এমন-কিছু বিধাতার স্বমুখনিঃসৃত বিধান নয়। পৃথিবীতে আরও মানুষ আছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পথে মানুষ আরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-বিধি প্রণয়ন করিয়াছে। সেইসবও বুঝিবার মতো, জানিবার মতো,—হয়ত কখনো কখনো আমাদের পক্ষে কোনো কোনো জিনিস গ্রহণ করিবার মতোও—অন্তত তাহাদের পরিবেশে তাহাদের ব্যবস্থা কেন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিবার মতো প্রশ্ন। আর, সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞাসা জাগে—কোন্ কারণ-পরম্পরায় আমাদের বিধি-বিধান, আমাদের সমাজ-যাত্রা গড়িয়া উঠিয়াছে? অবস্থান্তরে তাহা কতটা পরিবর্তনীয়, আর সত্যসত্যই এই অবস্থাই বা কতটা সনাতন, কতটা তাহা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বিবর্তমান। অবশ্য,মানুষের আজন্ম অভ্যস্ত দৃষ্টি সহজে পরিবর্তিত হয় না। তথাপি ভ্রমণের ফলে আপন ভিত্তিতে মানুষ চিনিতে ও বুঝিতে শিখে'—তাহা শুধু অভ্যাস থাকিয়া যায় না। আহা ছাড়া, এত বিচিত্র রীতিনীতির মধ্যে, ধ্যান-ধারণার মধ্যেও দেখি—সেই বিচিত্র মানুষ মানুষই,—সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে, ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হয়, ক্ষুৎ-পিপাসায় উন্মত্ত হয়—আবার পুত্রকন্যা পরিবারের জন্য প্রাণও দিতে পারে! সকল মানুষই এক মানুষ-জাতির সন্তান—যত বিচিত্র হউক তাহাদের সমাজ, রীতিনীতি, ধ্যানধারণা।

চৈতন্যের সম্প্রসারণ

এইরূপ ভাবনার ব্যতিক্রম যে না ঘটে তাহা নয়। কিন্তু সাধারণভাবে দেশ-ভ্রমণের সূত্রে মানুষের শুধু বুদ্ধির নয়, শুধু জ্ঞানের নয়, প্রাণৈশ্বর্যের,

অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিধি বিস্তৃত হয়, চৈতন্যের সম্প্রসারণ হয়, সমগ্রভাবে জীবনই ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠে।

হয়ত কেহ কেহ বলিবেন—আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া, মায়া, ইনকাস্ ইকুতা প্রভৃতি জাতিদের সভ্যতা বিলুপ্ত করিয়া—রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস করিয়া কোন্ প্রাণৈশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে সুসভ্য ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতার কাণ্ডারীরা? নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন অকারণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের চৈতন্য সেই নব-অভিজ্ঞতায় আপন অভ্যস্ত অভিমান বা বর্বর লোভ কোনোটাই তখন-তখনি পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু ইহাও তো মনে রাখিবার মতো—আমেরিকা আবিষ্কার ইউরোপের মনোজগতের এমন রূপান্তরের সূচনা করিল যে, পৃথিবীতে তাহাতে যুগান্তর নিকটতর হইয়া উঠিল। এইরূপেই মার্কো পলো, কিম্বা লিভিংষ্টোন, মঙ্গো পার্ক প্রভৃতি পর্যটকগণ সভ্যতার এক-একটা প্রদীপ শিখাকে জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন—যাহার তেজ তখন-তখনি না হউক, দিনের পর দিন বাড়িয়াই গিয়াছে। আবার, এই তর্কটা ছাড়িয়া দিয়া একবার অন্য কথাটা স্মরণ করি—মার্কো পলোকে না পাইলে ইউরোপের প্রাচ্য-জ্ঞান কতটা ক্ষুণ্ণ হইত। বিশেষতঃ মেগেস্থানিস, গুয়ান ৎসাং, ফা হিয়ান, ইব্‌ন-বতুতা, অল বারুনির ভ্রমণ বৃত্তান্তের অভাবে ভারতের ইতিহাসের—সমাজের, ধর্মের,—কত পৃষ্ঠাই তো চিরবিলুপ্ত হইয়া যাইত।—শুধু ধর্ম নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের তাড়নাতে কলম্বস, ভাস্কো দি-গামার মত এক-একজন মহাযাত্রী নূতন দেশের পথ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। আর সেই ভ্রমণের পথ বাহিয়া ব্যবসা বাণিজ্য শতগুণ সহস্রগুণ হইয়া উঠিয়াছে; জাতিতে-জাতিতে মৈত্রী বা বিরোধের বন্ধন রচনা করিয়া পৃথিবীর আত্ম-পরিচয়ের পথ প্রশস্ততর করিয়াছে। তাই আজ পৃথিবী শতখণ্ডে সীমাবদ্ধ হইলেও এক পৃথিবী, মানুষ এত অনৈক্যের মধ্যেও এত একত্রিত। বাণিজ্যের বাসনা বা লোভের তাড়নাতেও মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবনের মহত্ত বিকাশের কেন্দ্রে গিয়া পৌঁছিতেছে। কলম্বসের অভিযানে লোভ, শোষণ বা ক্রুর-কঠিন নির্মমতাই তাই চরম কথা নয়। চরম কথা এই যে, দুয়ার খুলিল, সম্ভাবনা দেখা দিল, চৈতন্যের নব-অভ্যুদয়কে পরাহত করিবার আর উপায় রহিল না।

সভ্যতার সামগ্রিক বিস্তার

অবশ্য কেহ হয়ত বলিবেন, 'এই মহাপর্যটকদের কথা স্বতন্ত্র, ইঁহারা ইতিহাসের সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম বলিয়া স্মরণীয়।' কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। ইঁহারা শুধু স্মৃতির পাতাতে দাগ কাটিবার মতো উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন, এই যা। না হইলে অগণিত মানুষ তখনো দেশদেশান্তরে যাইত, তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের অভিজ্ঞতা, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম-পিপাসা যত

সাধারণ তীর্থ-যাত্রা

ক্ষীণভাবেই হোক্ জাগাইয়া তুলিত। ইতিহাসের সেই বিস্মৃত কর্মীদের দান কিন্তু অনুল্লিখিত হইলেও বিলুপ্ত নয়। না হইলে গুয়ান্‌ৎসাংএর অনুরূপ তীর্থযাত্রার অভাব ছিল না। তাহারা শুধু বৌদ্ধধর্মের প্রসার করে নাই, ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন বাঁধিয়া দিয়াছে। আমাদের নাম-না-জানা পিতামহ-পিতামহীরা চিরদিন ভারত-পরিক্রমা করিয়াছেন, আর সেই সূত্রে ভারত-জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা অজ্ঞাত উত্তরাধিকার রূপে আমাদেরও হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আজ অবশ্য এই যুগের যান-বাহন ও যোগাযোগের সৌকর্যে ভ্রমণ অনেক বেশি সহজ, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা কাহাকেও তাই বলিতে হয় না—ভ্রমণে শিক্ষার সম্পূর্ণতা ঘটে। আর এই কথাও মানিতে বাধা হয় না—ভ্রমণ-সূত্রে যে আনন্দ, যে বিস্ময়, যে অভিজ্ঞতা আজ সাধারণ মানুষও লাভ করে পূর্বযুগে তাহা অসাধারণ মানুষেরও অকল্পিত ছিল; আর এই যুগেও তাহার অধ্যাত্ম-দান অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াই আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

ভ্রমণের রূপান্তর

আর একটি কথাও স্মরণীয়। মানুষের যান-বাহন যেরূপ সর্বগামিত্বের শক্তিলাভ করিতেছে তাহাতে আজ ভ্রমণের রূপ এভারেস্ট হইতে দক্ষিণ মেরু অভিযানে আকার-লাভ করিতেছে। মহাশূন্যের দিকেও মানুষ রকেটের ভেলা ভাসাইতেছে; ইহার বৈজ্ঞানিক ও মানবিক তাৎপর্য না বলিলেও চলে। কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রমণ অর্থ শুধু বিমান-যোগে শূন্যপথে এক-একটি মহাদেশের বক্ষে পদাঙ্ক রাখিয়া যাওয়া নয়। অবশ্য তাহাও ভ্রমণ—তাহাতেও আনন্দ আছে, নেশা আছে, এমন কি, চিত্তের প্রসারতাও আছে। কিন্তু ভ্রমণ অর্থ পৃথিবীর পরিচয়, মানুষের পরিচয়, পৃথিবী ও মানুষে রচিত মানুষের বিভিন্ন জীবন-রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। শূন্যে ভ্রাম্যমাণ 'টুরিষ্ট' তাহা হইতে বঞ্চিত। তাহা অপেক্ষা 'দুয়ার হইতে অদূরে' যাইতে যাইতেও—ভ্রমণের যথার্থ দৃষ্টি থাকিলে—আমরা কতকটা সেই সুখ লাভ করিতে পারি। শুধু মহাকাশের দিকে তাকাইয়া নয়, ঘরের বাহিরের শূন্য শিশিরবিন্দুটির সঙ্গে পরিচয় করিতে করিতেও আবার বুঝিতে পারি—

সাধারণ ভ্রমণের বিস্ময়

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি॥'

তবে, রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিও পরিভ্রমণেরই অভিজ্ঞতালব্ধ॥

।। একটি ভ্রমণ-কাহিনী ।।

ভাগ্যবশে ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। পিতৃ-পিতৃব্যের কর্মস্থল এক বৎসরের বেশি দুই বৎসর যদি কোথাও স্থায়ী হয়, তাহা তিন বৎসর অতিক্রম করিতে পারে নাই। স্বল্প-জীবনের বহু ভ্রমণের মধ্যে আমি যদি দিল্লী বোম্বাই ছাড়িয়া মাত্র একটি দিনের ভ্রমণ-কাহিনী বলি তবে আশা করি ভুল বুঝিবেন না। একটি দিনের কাহিনী হইলেও সেই দিনটি তুচ্ছ নয়।

সূচনা :

পূজার ছুটিতে কাকার নিকটে পাটনা গিয়াছিলাম। সেই খানেই ছুটি কাটাইতেছি। শাক-সব্জি ও মাছ-মাংসের সঙ্গে আদরে-আরামে পূজার ছুটি কাটাইতেছিলাম। পরিচয় জন্মিয়াছিল প্রতিবেশি-পরিবারের পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে। জলি ও লিলিই একদিন বলিয়া বসিল, 'তুমিও চলো।'

কোথায় জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় ?'

'রাজগির'।

মনটা নাচিয়া উঠিল। কিন্তু চাল ছাড়িতে পারি না, তাই বলিলাম, 'ও আমার দেখা আছে।'

আয়োজন ও ব্যবস্থা

—'তবে তো আরও ভালো। তুমিই হবে আমাদের গাইড্।'—কথাটা বলিলেন কিন্তু মাসীমা—লিলির মা।

বুঝিলাম আমার চালটা মাসীমা ধরিয়া ফেলিয়াছেন—রাজগির-নালন্দা আমার বইএর মারফৎই 'দেখা'। কিন্তু তাহা না বুঝিতে দিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমিই হবে গাইড্।' পলাইবার পথ পাইলাম না। কাকা-কাকীমাকে তখনি খবর পাঠাইয়া মাসীমা একেবারে কথাটা পাকা করিয়া ফেলিলেন।

পরদিন ভোর না হইতেই মাসীমা দুই পার্শ্বে নিজের ও প্রতিবেশী গুটিদুই ছেলেমেয়ে আর সম্মুখে ড্রাইভারের পার্শ্বে আমাকে ও ডুন-সামরিক বিদ্যালয়ের ভাবী-ছাত্র তাঁহার পুত্র জলিকে সেই নাতিবৃহৎ মোটরখানার খাঁচায় পুরিয়া বহু-অভিজ্ঞা নেত্রীর মত যাত্রা করিলেন। অবশ্য সঙ্গে আরও ছিল নাতিক্ষুদ্র খাবারের ঝুড়ি হইতে শুরু করিয়া একটি স্যুটকেস—'কুণ্ডে' স্নান করিতে হইবে তো। শহরের ঘুম না ভাঙিতেই আমরা তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়া খোলাপথে পড়িতে চাই। ড্রাইভার ভিখনের গুণে তাহা সম্ভব হইল। শহরের বাহির দিয়া নয়া শড়ক। রেল লাইন দূরে রাখিয়া বরাবর ক্ষেত ও গ্রামের মধ্য দিয়া তাহা অনেক দূরে গিয়াছে—না হইলে পাটনা সিটির গাড়ি ও মানুষের ভিড়ে আমাদের দেরী

ভ্রমণ-পথ

হইত। 'বুদ্ধ জয়ন্তী' উপলক্ষে দুই বৎসর পূর্বে এই পথের সংস্কার হইয়াছে—এস্‌ফাল্‌টে মোড়া এই আন্তর্জাতিক যাত্রীর রাজপথ এখন মোটর যাত্রীর স্বর্গপথ।

সম্মুখে সূর্যদেব উঠিতে লাগিলেন—কেহই এখানে তাঁহার পথরোধ করিয়া নাই। বাড়িঘর, মন্দির-মসজিদ, চিমনি-গম্বুজ, সব বহু দূরে। মাঠের পর মাঠ, ভোরের হাওয়া, অফুরন্ত শস্য ক্ষেত্র। এখানে-ওখানে মাথা উঁচু করিয়া কুঁয়োর জল তোলার বংশদণ্ড ক্ষেতের মধ্যে খাড়া হইয়া আছে—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। থাকিলেও আমি দেখি না। কারণ, রেলে হোক কি মোটরে হোক, খোলা মাঠ দেখিতে আমার চোখ ক্লান্ত হয় না। তবে চোখে না দেখিলেও শুনিবার মত অজস্র কথা ছিল। পিছনে ও পাশে শুনি, 'হাউ গ্রীন্'। কিম্বা মাসীমায়ের কণ্ঠ—'যদি দেখতিস্ এখন বাঙলা দেশ।' ভিখন কখনো মাসীমায়ের, কখনো তাহার পুত্রকন্যাদের প্রশ্নের উত্তর জোগাইয়া-জোগাইয়া গাড়ির তেজ বাড়াইয়া দিতেছে। সম্মুখের সূর্য যেন আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাহার দক্ষ হাতের কাণ্ডটাই দেখিতেছে। 'জরাসন্ধের কারাগার ছিল এখানে'। শুনিয়া কন্যা লিলি জিজ্ঞাসা করিল, 'মামি, হু ইজ জরাসন্ধ'? মাসীমা ম্লান হাসিলেন,বলিলেন,—"কেন তোমার'স্টরিজ ফ্রম্ দি বাইবেল'-এ নেই?—সে তোমার ডাডির দোস্ত্"। গাড়ি পাশ কাটাইয়া পাটনা-ফতোহার পুরাতন পথে ফিরিয়া গেল। অদূরে গঙ্গা—কদাচিৎ গাছের আড়ালে, প্রায়ই মাঠের গায়ে; প্রভাত সূর্যের রূপালি ছটায় সেই গঙ্গা ঝিকমিক করিতেছে। পথে দুই পার্শ্বে ছায়াভরা বড় বড় গাছ, এখানে-ওখানে এক-আধটি দোকান। মাঝে মাঝে পেট্রোলের ঘাঁটি। আবার মাঠের মধ্যে দামোদরের বাড়তি-বিজলির বাহক ইস্পাতের কাঠামো।

চা-পর্ব

মাসীমা বলিলেন, 'ওটা কোন জায়গা, ভিখন?'

'বক্তিয়ারপুর'।

'একবার চা খেতে হবে, না, হাবু?'—আমাকেই মাসীমা বলিলেন। কারণ, অন্যেরা সকলে নীরব হইয়াছে।

মাসীমায়ের 'চা' যে চা নয়, তাহা জানিতাম। ঝুড়িগুলিও হাল্‌কা মনে হয় নাই। পথের পার্শ্বে একটা টিউবওয়েল দেখিয়া গাড়ি থামিল। সকলে গোল হইয়া বসিলাম। তারপর চা'-এর কাপ, খাবারের হাফ্‌ডিশ, রুটি-মাখন, ডিমসিদ্ধ, ফুলকো, এবং আরো কত কী যে বাহির হইল তাহা আগে বুঝি নাই। সকলকে দিয়া, ভিখনকে খাওয়াইয়া, মাসী নিজের জন্য ঢালিয়া লইলেন বড় এক পেয়ালা চা। খাবার তিনি ছুঁইলেন না। আমি—পীড়াপীড়ি করিলাম "সে হবে না মাসীমা।" ধমক দিয়া মাসীমা বলিলেন, "উঠ্‌বে? না বক্তিয়ারপুরে বসে বক্তাগিরি ফলাবে?"

তাঁহার ধমকে স্নেহ ছিল, নির্দেশও ছিল।

গাড়ি আবার ছুটিল। আবার তেমনি পথ—পথের পার্শ্বে ছোট-রেলের লাইন। গাছ বড় নাই, মাঠ, ক্ষেত, অফুরন্ত ফসল। সকলে ঝিমাইতেছিল। মাসীমায়ের সঙ্গে কথা বলিবার মত আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বলিলেন, 'তোর মোটরে বেড়াতে ভালো লাগে, হাবু ?'

আমি বলিলাম, 'মন্দ কি ?—এমন খাবারের ঝুড়ি সঙ্গে থাকলে।'

মাসীমা হাসিলেন, 'হুঁ! আচ্ছা—নৌকোয় ঘুরবি নদীতে নদীতে, খালে-বিলে ঝোপে-জঙ্গলে—কিম্বা পদ্মায়—হাঁ, টাটকা ইলিশ পাবি—ভাজা, আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝোল'।

বুঝিলাম মাসীমা বাঙাল দেশের মেয়ে।

'সে হবে না, এখন তা পাকিস্তান।'

'তা আর বুঝি না ?—তবু দেখতে ইচ্ছা করে।'

মাসীমী চুপ করিয়া রহিলেন। চোখ যেন কেমন হইয়া গেল। বুঝিলাম তাঁহার মন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। ভাগ্যে 'বিহার শরিফ্' দেখা দিল। বলিলাম, 'বিহার শরিফ্ এলো।' গবেষণা ফলাইতে ছাড়িলাম না। জানাইলাম—বক্তিয়ার খিলজীর সময় ঐখানেই সম্ভবত ছিল 'ওদন্তপুরীর বিহার।' মাসীমা চকিত হইলেন,—'কোথায় ?'

আমি বলিলাম, 'পাহাড়ের চূড়ায়।'

'কোন্ পাহাড়ের কোন্ চূড়ায় ?'

'তাহা আমি কি করিয়া জানিব ?'

কিন্তু মাসীমায়ের জানিতে আগ্রহ। বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই চোখে যেন তিনি কী খুঁজিতেছেন। শহর আসিয়া পড়িল। ছেলেমেয়েরাও তন্দ্রা-ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। ওদন্তপুরী বিহার কি ? বিহার শহরকেও বিহার বলে বুঝি ? মাসীমা শুনিয়া ক্ষীণ হাস্য হাসিলেন। বলিলেন, 'ঠিক। কিন্তু কোথায় ছিল ওদন্তপুরী বিহার, গাইড্ মশায় ? কি করে জানলেন তা ছিল এখানে ?'

সত্য কথা বলিলাম, 'পড়েছিলাম—স্কুলের সাহিত্য বইতে; তারপরে বৌদ্ধ ইতিহাসের কথা ও কাহিনীতে।'

মাসীমা বলিলেন, 'ওই তো মুশকিল। বাঙলা পড়লেই তোমাদের মাথায় ঘুরবে রামায়ণ মহাভারত। পাতা খুললেই তোমাদের চোখে ফুটবে রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা। অথচ দেখো আমরা দিল্লীতে ছিলাম, ফিরুজ শাহ্ কোট্-লাও চিনি, অশোকের স্তম্ভও দেখি; কিন্তু তা নিয়ে ওখানে কেউ মাথা ঘামাই আমরা ?'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু মনে মনে জপি নৌকোতে পদ্মায় ঘোরার কথা আর ইলিশ মাছের ঝোল—'

'না, হাবু, তুই বড় ফাজিল'।—মাসীমা সস্নেহে তিরস্কার করিলেন। 'কোথায় ওদন্তপুরী, কোথায় নালন্দা, দেখাবে কি গাইড্ মশায়? বইয়ে তো পড়েছ—কিন্তু কোথায়?'—বুঝিলাম, ইহা মাসীমা'র দুঃখের তিরস্কার।

পথে বাঁক ঘুরিয়া, গ্রাম পার্শ্বে রাখিয়া গাড়ি নালন্দার স্তূপের দিকে চলিল। দূর হইতে তাহা দেখা যায়। এ কালের মিউজিয়মের হাতায় গাড়ি রাখিয়া আমরা এক পলক উহার অভ্যন্তরের জিনিসপত্র দেখিয়া লইলাম। ভগ্নস্তূপের প্রাপ্ত জিনিস এখানেই সুরক্ষিত—পাথরের মূর্তি, ভগ্ন শিলালিপি, কোনো তামার লিখন। ইংরেজিতেও সে সবের পরিচয় লেখা আছে বিদেশীয়দের জন্য। মাসীমা তাহা পড়িতেছেন আর যেন কি খুঁজিয়া পাইতেছেন। আবার নূতন করিয়া আরও কি খুঁজিয়া পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছেন। কোথায়? কোথায়?—বলিতেছেন, 'কোথায় গাইড্ মহাশয়, কী দেখব—বল্‌ছ না।—কোথায়? কোথায়?'

দেখিবার আসল জিনিস নালন্দার ভগ্ন বিহারের সারি। তাহা সম্মুখেই। সেইখানে চলিলাম। এদিকে-সেদিকে উঁচু ঢিবি এখনো রহিয়াছে। উহার কোন্‌টির নিচে কি আছে কে বলিবে? কোন্ সাধকের সমাধি চৈত্য, কোন্ ভক্তের স্থাপিত দেবায়তন, কে জানে? যাহাই যেখানে থাকুক বা না থাকুক—এখান হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর একটা বিরাট আদর্শের আমন্ত্রণ লইয়া শত শত পণ্ডিত পৃথিবীর মানুষের নিকটে উপস্থিত হইত; তিব্বতে, চীনে দূর-দূরান্তরে তাহারা আপনাদের সাধনা ছড়াইয়া দিয়াছে;—শুধু এই ভাবনার মধ্যেও যেন কেমন একটা গম্ভীর রহস্য আছে। বিহারের প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে যেন তাহা আরও একটা রূপ লইয়া দাঁড়াইল। চৌদ্দ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে এক সময়ে দিবারাত্রির অসংখ্য বিনয়-নিয়মের সূত্রে আপনাদের জ্ঞানের ও সত্যের সাধনাকে মূর্ত করিতে চাহিয়াছে—ভাবিতে আজও একটা বিরাট বিস্ময় মনে জাগে। প্রতিটি বিহারের অভ্যন্তরস্থ আঙিনায় উচ্চ মঞ্চ। তাহার উপর আচার্য দাঁড়াইতেন, চারিদিকে বসিতেন দেশ-বিদেশের সমাগত বিদ্যার্থিমণ্ডলী। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠ, তাহার মধ্যে শিলাশয্যা। প্রাচীরের প্রদীপের কুলুঙ্গিতে সহস্র বৎসর পূর্বেকার মসীরেখা এখনো লক্ষণীয়। সত্যই, প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে! বৌদ্ধ সাধনার মসীরেখাটুকুই শুধু এখনো কোনো মৃত্তিকানিহিত মানব মনের লুপ্ত কুঠুরিতে আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।—নির্বাকচিত্তে বিহারের উচ্চ চূড়ায় গিয়া উঠিলাম। বিরাট দৃশ্য সম্মুখে। মধ্য পথের বাম পার্শ্বে এক-একটি আরাধ্য মূর্তি—আর দক্ষিণ পার্শ্বে এক-একটি বিহার—এইরূপে মন্দিরও বিহারের সারি চলিয়া গিয়াছে এই প্রধান মন্দিরের পদতল হইতে আধুনিক কালের গ্রামের দিকে। নালন্দার সমস্ত পরিকল্পনাটি এখন উদ্‌ঘাটিত, মৃত্তিকাতলের প্রোথিত ভাস্কর্য কতকাংশে আবিষ্কৃত। সমুদ্রপার হইতে ও হিমালয়ের

উত্তরপৃষ্ঠ হইতে যাহারা পূজোপকরণ লইয়া আসিত, তাহাদেরও এক-আধটুকু উৎকীর্ণ স্বাক্ষর আজ পড়িতে পারা যায়। সমস্ত বিদ্যায়তনের অঙ্গন 'বুদ্ধ জয়ন্তীর' পর হইতে আজ সযত্ন রোপিত ফুলে-পল্লবে শোভন ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।"

রৌদ্র বাড়িতেছে। চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতা ও শূন্যতা। 'কী ছিল', তাহার সঙ্গেই 'কিছুই থাকে না', এই কথাটাও যেন সেই রৌদ্র-শিখায় ঝলসিয়া উঠিতেছে। মাসীমায়ের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তথাপি খুঁজিতেছে—'কোথায়? কোথায়?' ছেলেমেয়েদের এক-একবার তিনি বুঝাইতে চাহেন—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কী। কিন্তু পারেন না।

কাহার চায়ের এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। জলি ফ্লাস্ক খুলিতেছিল—মাসীমা সেই শব্দ শুনিয়া যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এখানে নয়। গাড়িতে চলো—" ঝুড়ির ভার আরও একটু হাল্‌কা করিয়া গাড়ি ছুটিয়া চলিল। পথে মাসীমা শিলাও'র চিঁড়া লইলেন। খাজার দোকানে সন্ধ্যার জন্য অগ্রিম টাকা সমেত অর্ডার দিতেও ভুলিলেন না! রাজগিরের গ্রামে যখন পৌঁছিলাম বেলা তখন প্রায় একটা। গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথ ও ইতস্ততঃ সঞ্চরমান সর্বত্র গরু ও মানুষের জন্য গাড়ি ধীরে চলিতে বাধ্য। দৈন্য ও শ্রীহীনতা সর্বত্রই পীড়াদায়ক। তাহা এখানে আরও পীড়াদায়ক মনে হয়। বিরাট সাইক্লোপিয়ান বেষ্টনীর মধ্য দিয়া পথ শেষে অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। এদিকে-সেদিকে হিন্দু ও জৈন ধর্মশালা, বৌদ্ধ যাত্রী-ভবন, দোকানপত্র। মাসীমা সরাসরি কুণ্ডে গেলেন; কুণ্ড 'তীর্থ' হইয়া পড়িয়াছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের পুণ্যে নাকি রোগ আরোগ্য হয়। অতএব পৃথিবীর যত রোগ, যত কদর্যতা, যত বীভৎসতা কুণ্ডের প্রস্রবণের জলে আশ্রয় খোঁজে। মাসীমা দেখিয়া যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া চলিলেন। একটা হোটেলে ঘর ভাড়া লইয়া সকলে স্নান সারিলাম। আহার্যও আসিল। তাহা দেখিয়া মাসীমায়ের চক্ষু স্থির। মাছ না থাক মাছি কম নয়, মাংস যতটা তদপেক্ষা মশ্‌লা বেশি। কাঁটা চামচের বর্ণচ্ছটা দেখিয়া মাসীমা শালপাতা পাড়িলেন; এবং ঝুড়ির জুড়ানো চপ্‌ কাট্‌লেট গরম করাইয়া লইলেন। বাড়ির রুটি-তরকারীর সঙ্গে কলা, আপেল, ও অন্নে যাহা উদরস্থ করিলাম তাহা সাধারণ দিনের অপেক্ষা বেশি ছাড়া কম নয়।

স্বভাবতঃ একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। আমাদের খাটে ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাসীমা মোড়া লইয়া বাহিরে গিয়া চুল শুকাইতে বসিলেন। হাতে দেখিলাম একখানা বই। বাঙলা গল্প না পড়িলে দুপুরে তাঁর ভাত হজম হয় না, এই কথা জলি-লিলির মুখে শুনিয়াছিলাম।

আমাদের ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু মাসীমা আমাদের স্বস্তি দিলেন না। বেলা পড়িয়া গেলে আর দেখিবে কী?—কিন্তু দেখিবারই বা কী আছে? কুণ্ড তো দেখাই হইয়া গিয়াছে। বিরাট বিস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে গিরিব্রজপুরে ছিল

জরাসন্ধের রাজধানী। কিন্তু সে তো ইতিহাস নয়, পুরাণের কাহিনী। তারপর তাহার নাম হইল রাজগৃহ—মগধের প্রথম রাজধানী। গৌতম বুদ্ধ ও জৈন মহাবীর দুই সত্যদ্রষ্টা যখন এই অঞ্চলে আপনাদের উপলব্ধ সত্য প্রচার করিতেছিলেন, বিম্বিসার ছিলেন তখন মগধের রাজা। এইখানেই 'নৃপতি বিম্বিসার, নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা পদনখকণা তাঁর',—আমি বলিতে না বলিতেই, মাসীমা বলিলেন—'তারপর? 'অজাতশত্রু রাজা হল যবে'? আমি হার মানিলাম না—'সেখানে সেই কারাগার গবাক্ষ থেকে তখন বন্দী বিম্বিসার প্রাতঃ-সন্ধ্যায় দেখতেন দূরে পর্বতগাত্রের পথে ভগবান তথাগত পদচারণা করছেন—এই কারাগারেই তাঁর অনাহারে মৃত্যু ঘটে। জৈনরা বলেন তিনি জৈন আদর্শানুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন।—ওইখানেই সপ্তপর্ণী; গুহামুখে মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধদের প্রথম অধিবেশন বসে—মহা-কাশ্যপের নেতৃত্বে।

'কোথায়? '—মাসীমায়ের সেই সাগ্রহ প্রশ্ন।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল অপরাহ্নের অধিত্যকায়। অদূরে 'শোন্ ভাণ্ডার'। মাঝে 'মণিয়ার মঠ'—কোনো এককালে নাগপূজার একটা কেন্দ্র ছিল এইখানে, তাহারই পুনরাবিষ্কৃত সাক্ষ্য। আরও গিয়া সেই সম্ভাব্য ক্ষেত্রও দেখিলাম যেখানে বিম্বিসার সম্ভবত বন্দী ছিলেন—আর পর্বত-গাত্রের পথে দেখিতেন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও পদচারণা। কিন্তু এখন কিছুই দেখিবার মতো নয়—ভ্রমণেচ্ছুরাও এখানে তাই বিশেষ আসে না! এদিকে সেদিকে গ্রামের মেয়েরা বনের কাঠ কুড়ায়, ছেলেরা গোরু মহিষ চরায়। কিছু যে ছিল, কিন্তু নাই—তাহা যেন এই অপরাহ্নের আলোকে বোঝা দায়। ছল-কৌতুকে মাসীমা মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "বলুন, গাইড মহাশয়, কোথায় সেই 'স্তূপপাদমূল' যেখানে শ্রীমতী জ্বালিয়েছিল প্রদীপ"—

আমি বুঝিলাম। বলিলাম, 'মাসীমা, সে দেখতে হলে যেতে হয় আড়াই হাজার বছর আগে—'

এবার মাসীমা পারিলেন না। আমার দিকে তাকাইয়া সস্নেহে বলিলেন, 'উহুঁ, আড়াই হাজার বছর পরেও বাঙালি কবির কবিতায় আছে সেই প্রদীপ-শিখা, আর তা জ্বলছে আমাদের বাঙালিদের মনের কোঠায়'।

রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলাম। চোখে ঘুম। মাসীমা হাতে একখানা বই দিয়া বলিলেন, 'নিন্ গাইড্ মহাশয়, এই আপনার দক্ষিণা'। মাসীমায়ের হাতের সেই বইখানাই। কিন্তু এ যে 'নটীর পূজা'!

[মন্তব্য : ভ্রমণ কাহিনীর রূপের অন্ত নেই। তাতে প্রধান কথা অবশ্য পথের কথা, ও গন্তব্য স্থল থাকলে তার কথা (যেমন, এ ক্ষেত্রে রাজগির)। কিন্তু ভ্রমণ উপলক্ষ করে সব কথাই আসতে পারে—দৃশ্য বর্ণনা, যাত্রী বা দেশের লোকজনের বর্ণনা, তাদের জীবনযাত্রার কথা, ধ্যান-ধারণার কথা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ শিক্ষা ও মাতৃভাষা ॥

সূচনা : এমন অদ্ভুত প্রশ্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উঠে কিনা সন্দেহ যে, 'শিক্ষা কি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হইবে, না, হইবে অপরের মাতৃভাষায়?' দুর্ভাগা ভারতবাসীর ইতিহাসেরই ইহা পরিহাস। না হইলে এইরূপ প্রশ্ন মনে হইতে শুধু অবান্তর নয়, একেবারেই অস্বাভাবিক।

বিভ্রান্তির হিসাব পরাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকার যে আমাদের সমস্ত জীবনটাকেই কত বিকৃত ও কত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে, এই প্রশ্নটাই তাহার প্রমাণ। শতাধিক বৎসর যাবৎ আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে ইংরেজি ভাষার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে যে, আমরা আজ প্রথমতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারি না এই অবস্থাটাই অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ দেখি না—ইংরেজির মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু ইংরেজি ভাষারই গুণে যে নিত্যনবশক্তিতে বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা নয়; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অনুশীলনই তাহার কারণ। তৃতীয়তঃ,ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আহরণ আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাপক হইবার সম্ভাবনা নাই; এবং যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্‌রা তাহা আহরণ করিয়াছে তাহাদেরও জীবনকে উহা সার্থকতা দান করিতে পারে না। চতুর্থতঃ অস্বাভাবিক এই অপচয়ের ব্যবস্থা অপেক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষায় স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা আহরণের ব্যবস্থা সুসম্ভব, এবং তাহাই যথানিয়মে সর্বাধিক ফলদায়ক।

ইতিহাসের অভিশাপ ইংরেজ রাজত্বের নিয়মেই ইংরেজি ভাষা আমাদের 'রাজভাষা' ও 'শিক্ষার ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পূর্বে যে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা চলিত না তাহা নয়। স্বভাতই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকল্পিত সমৃদ্ধি আমাদের রামমোহন প্রমুখ মনস্বীদের ও জ্ঞানান্বেষীদের চমৎকৃত করিয়াছিল। বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা বা

প্রভৃতির লেখায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু লেখার নির্ধারিত সময় ও সীমা বুঝে দু একটি বিষয় লেখাই শ্রেয়ঃ। এ জন্য কোন বিশেষ স্থলের বর্ণনা করতে হলে, দিল্লী কাশী প্রভৃতি গ্রহণ না করে, প্রসিদ্ধ অথচ ক্ষুদ্র কোনো স্থলই নেওয়া উচিত। তারপর যে জন্য তা প্রসিদ্ধ তাও বোঝানো দরকার। ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তি থাকলেও তা বলতেই হবে); তারপর সেখানকার জীবনযাত্রা, লোকজন, পথঘাট ইত্যাদি। সর্বশেষে সম্ভব হলে পথের বর্ণনা ও সঙ্গীসহচরদের বর্ণনা। এ রচনায় আমরা প্রায় উল্টোদিক থেকে তা দেখলাম—কতকটা তা বোঝাতে যে ভ্রমণ-কাহিনী কত অদ্ভুত হতে পারে, তার ঠিকানা নেই। সাধারণের মধ্যে
 অসাধারণের আবিষ্কার কম কৃতিত্ব নয়।]

সংস্কৃত, পারশী প্রভৃতির চর্চায়ও তাঁহারা বিমুখ ছিলেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের সুযোগ। 'ওরিয়েণ্টালিষ্ট বনাম এ্যাংলিসিস্টদের' তর্কটা সেদিনে এই মূল কথাটা গুলাইয়া দিয়াছিল—কী লক্ষ্য ও কী উপলক্ষ্য। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য শিক্ষাই আসল লক্ষ্য, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা তাহার সাময়িক ও আনুষঙ্গিক উপলক্ষ্যমাত্র—পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার তাহা অপরিহার্য অঙ্গ নয়। আজ অবশ্য আমাদের নিকট ইহা সহজবোধ্য। কারণ, আমরা জানি জার্মান, ফরাসি রুশ প্রভৃতি ভাষাও আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার যোগ্য বাহন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরেজিভাষার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। কিন্তু সেদিনকার অপরিণত বিকাশের মুহূর্তে ঐরূপ অমূলক ধারণাও কিছুটা এই দেশে প্রশ্রয় পাইয়াছিল। আর, মেকলে ১৮৩৫এর শিক্ষা মন্তব্যে সেই ভ্রান্তিকেই 'নীতি' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। তৎসঙ্গে অতি অল্প-কালের মধ্যেই চাকরির সুযোগও ইংরেজিশিক্ষিতদের নিকটই সুলভ হইয়া উঠিল। আর, এই দুই কারণে মিলিয়া যে দেশীয় ভাষা-শিক্ষা পর্যন্ত ক্রমেই অবহেলিত হইতে লাগিল তাহাও শতাব্দীর মধ্যভাগেই সুস্পষ্ট হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বঙ্গ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন এই উপলব্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই যে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সাধারণের ভাষায় ছাড়া সম্ভবপর নয়। আধুনিক জ্ঞানকে দেশীয় ভাষায় পরিবেশন যে সুসম্ভব অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগণ তাহা প্রমাণিত করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভাষা বা ঐরূপ ভারতীয় ভাষার বিকাশ সেকালের অস্বাভাবিক ব্যবস্থাতে খর্বিত হইয়াই থাকে। কারণ 'রাজভাষা' ও শিক্ষার ভাষারূপে ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠা সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে। এমনকি, এমন ধারণাই প্রশ্রয় পাইল যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা; ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার মূল্য এইজন্য যে, তাহা ইংরেজিতে পড়িতে হয়, এবং ছাত্ররা তাহাতে ইংরেজি ভাষাতে আরও রপ্ত হয়। এইজন্যই আজ মানিতে হয়, সেদিন মেকলের সিদ্ধান্ত যতই পাশ্চাত্য বিদ্যা দ্রুত ও সহজ আহরণের সুযোগ আমাদের দিয়া থাকুক, তাহা জনশিক্ষার পক্ষে, দেশের শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে, এক বিষম অভিশাপ।

মাতৃভাষার দুর্বিপাক

দেশের মনস্বীরা অবশ্য এই সম্বন্ধে সচেতন হইবার পর কোনোরূপে উহার প্রতিবিধান করিবার জন্য কম চেষ্টা করেন নাই যুবক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মহামনস্বী বঙ্কিম মাতৃভাষায় ছাড়া বিদ্যা যে সহজায়ত্ত হয় না, জ্ঞান যে সার্থক হয় না, ব্যাপক হইবে না, এই যুক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সবলে উত্থাপন করেন। তপস্বী গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্জয় নেতা বঙ্কিম তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বাঙলাকে পঠনীয় বিষয়ও করিতে সমর্থ হইলেন না। রবীন্দ্রনাথের

মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস

তীক্ষ্ণ লেখনী সেদিন (খ্রীঃ ১৮৯২) 'শিক্ষার হেরফের'এ এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তির অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই শিক্ষাগুরু অক্লান্ত কণ্ঠে মাতৃভাষাকে 'শিক্ষার বাহন' করিবার জন্য দাবি জানাইয়া গিয়াছেন। বিপক্ষের এমন কোনো দ্বিধা, এমন কোনো সংশয়, এমন কোনো সত্যমিথ্যা যুক্তি নাই, যাহা রবীন্দ্রনাথ খণ্ডন করেন নাই; কিম্বা যাহার বিরুদ্ধে যুক্তির পুনরুক্তি করিতে করিতে তিনি একবারও ক্লান্তি বোধ করিয়াছেন।

অবশ্য কিছু যে ইহাতে ফল না হইয়াছে তাহা নয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় "বিমাতৃমন্দিরে মাতৃভাষাকে" একটু ঠাঁই দিয়াছিলেন। ১৯৪০ হইতে প্রবেশিকার ছাত্রদের মাতৃভাষায় পাঠ ও প্রশ্নোত্তর দানও বিকল্পে অনুমোদিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে কলা-বিভাগের কলেজীয় শিক্ষায় বি-এ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা এখন প্রায় নিয়মিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়ে ও স্নাতকোত্তর (বাংলা প্রভৃতি বিষয় ছাড়া) বিভাগে এখনো ইংরেজিই মাধ্যম; বাংলা অদৃশ্য। সমস্ত ভারতের বর্তমান অবস্থা (১৯৬০) 'কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ নিয়োগ সমিতির' প্রদত্ত তথ্যাদি দেখিয়া মনে হয় এইরূপ—বিহার প্রভৃতি কোনো কোনো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীকে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম করা হইয়াছে। মাদ্রাজেও তামিলকে সে গৌরব দানের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি রাজ্যে মাতৃভাষা সেই মর্যাদা এখনো লাভ করে নাই।

বর্তমান অবস্থা

বাঙালির দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের দেশে তাঁহার ভাষা এখনো শিক্ষা-ক্ষেত্রে সর্বত্র সম্মানিত নয়। বাঙালির দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক সুদীর্ঘ যুক্তি-বিচারের পরেও এখনো তাঁহার দেশে পুরাতন সংশয়বাদী যথার্থ বৈদ্বজ্জনও আছেন। কেন তাঁহাদের সংশয়, কি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা?

কেহ বলিবেন, বাংলা ভাষার এত শক্তি নাই যে সকল বিদ্যা, বিশেষতঃ বিজ্ঞানিক ধারণা, প্রকাশ করিতে পারে। সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতের বিরাট উত্তরাধিকার বাংলার আছে, ইহা তাঁহারা যথাসময়ে ভুলিয়া যান। এই বিষয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দৃষ্টান্তই প্রমাণ। তিনি দেখাইয়াছেন উচ্চতম বৈজ্ঞানিক চিন্তাও বাংলায় প্রকাশ করা সুসম্ভব। কেহ ওজর তুলিবেন, দেশীয় পরিভাষা নাই। প্রয়োজনীয় পরিভাষা যে প্রণীত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা হয়ত জানিতেও চাহেন না। আর বুঝিতে চাহেন না যে, যে-পরিভাষা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রাহ্য তাহাকে ভাবান্তর করা প্রায়ই নিরর্থক। বস্তুতঃ 'পরিভাষার' বিচারও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চমৎকাররূপে করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতেছেন, সর্বভারতের শিক্ষার যোগাযোগ ও মানদণ্ড ইংরেজিতে না রাখিলে চলিবে কেন? ইঁহারা জানেন, কিরূপে ইংরেজির শাসনে সেই

সংশয়ের বিচার

যোগাযোগ বাহিরে থাকিলেও সেরূপ সর্বভারতীয় মানদণ্ড এখনো নাই। হিন্দু বা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 'মান' সর্ববিষয়ে এক নয়। এবং এই মান-সাম্য ভাষা ছাড়া অন্য উপায়েও রাখা চলে। তারপর, রাজ্য পরিবর্তন করিয়া শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা যে ছাত্রের হইবে সে অভীষ্ট রাজ্যের ভাষাতেই শিক্ষালাভ করিবে। জার্মানিতে পড়িতে গেলে কি ফরাসী ছাত্রের বা ভারতীয় ছাত্রের জার্মান না শিখিলে চলে? চতুর্থতঃ, কেহ বলিবেন, বাঙলায় পাঠ্যপুস্তক কোথায়? আসলে, পাঠ হইবে জানিলে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও প্রকাশে বিলম্ব হয় না। কঠিন পাঠ্যপুস্তক কেয়ারি-করা বাগান নয় যে শখ করিয়া কেহ উহার চাষ করিবে। তাহা ছাড়া প্রয়োজন মতো ইংরেজিতে বা ফরাসিতে পুস্তক পড়িতে কে আপত্তি করিতেছে? অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা মাতৃভাষায় পরিচালনার ব্যবস্থা করিলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বা ইংরেজিভাষায় গ্রন্থ পাঠ নিষিদ্ধ হইবে কেন! সেইরূপ বাধা কে দিতে চাহে?

শিক্ষার সহজ পথ

মূল প্রশ্ন হইল—মানুষ কোন ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিবে? মাতৃভাষায়? না, প্রথমে বহুবৎসরের পণ্ডশ্রমে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় একটি ভাষায় অর্ধ-শিক্ষিত বা সিকি-শিক্ষিত হইয়া, তাহা (ইংরেজি-ভাষা) বুঝিয়া-না-বুঝিয়া মুখস্থ করিতে করিতে, ভূগোল ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, প্রভৃতির সাধারণ জ্ঞানলাভ করাই সহজসাধ্য? বহু সময়, বহু স্মৃতিশক্তি ও শ্রমশক্তি একমাত্র বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় অপচয় করিতে হয়। তারপর আর কি থাকে ছাত্রদের মানসিক শক্তি ও জ্ঞানলাভের সময় যে, সেই ছাত্র ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করিবে?—বাঁকা ঠোটে কেহ কেহ আবার বলিবেন, ইংরেজিতে যদি বা কিছু অধ্যাপকরা পড়াইতে পারেন, ছাত্ররা উত্তর দিতে পারে, বাঙলায় অধ্যাপক বা ছাত্র তাহাও পারেন না। হয়ত একথা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, বিদ্যা যে শিক্ষামণ্ডল হইতে তাঁহারা আহরণ করেন তাহাতে খিচুড়ি-ইংরেজি এখনো সহজগ্রাহ্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্য—অধ্যাপক মহাশয় হইতে ছাত্র পর্যন্ত কেহই বিদ্যাটা আসলে 'আয়ত্ত' করেন না, 'মুখস্থ' করেন। আয়ত্ত হইলে বিদ্যাকে মাতৃভাষায় বলা সম্ভব নয়, পরভাষায় বলা সহজসাধ্য, তাই এমন যুক্তি সেই মুখস্থ-সর্বস্ব পণ্ডিতদের সাজাইতে হয়। ইহার নাম 'কেতাবী বিদ্যা', ইহারই নাম অনধিগত বিদ্যা, অসার্থক শিক্ষা—বিদ্যার ছদ্মবেশে আসলে একটা বিদ্যা-বিকৃতি।

মুখস্থের আশ্রয়

মাতৃভাষা কি?

বিরক্ত হইয়া কেহ তর্ক তুলিবেন, মাতৃভাষা কি? যে বিদ্যা যে ভাষায় আয়ত্ত করা সহজ, তাহাই সে বিদ্যার যোগ্যভাষা, আর সেই বিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে মাতৃভাষা। তাই পলিটিক্সে-ইকোনমিকসে ইংরেজিই স্বাভাবিক ভাষা, ঐ শাস্ত্রের জন্য তাহাই মাতৃভাষা।

কথাটা কিন্তু ঠিক বিপরীত। আসলে যাহা জন্মাবধি স্বাভাবিক ভাষা তাহাই মাতৃভাষা এবং যাহা মাতৃভাষা তাহাই বুদ্ধির পক্ষে, যুক্তির পক্ষে, সকল বিচার-বিবেচনার পক্ষে প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক ভাষা। চিকিৎসা বা পলিটিকস-ইকোনমিকসের মত বিশেষ বিদ্যার বিশেষ পারিভাষিক নিশ্চয়ই সেই ভাষায়ও গ্রাহ্য। কিন্তু পারিভাষিক ও ভাষা একবস্তু নয়।

ইংরেজির স্থান

তথাপি কেহ বলিবেন, ইংরেজি না হইলে আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহ হইতে আমরা দূরে পড়িয়া থাকিব। কিন্তু 'ইংরেজি না হইতে' কে বলিতেছে? বরং বলিব, ইংরেজি কেন, আরও অন্য ভাষাও প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষণীয় হউক। ইংরেজি এদেশে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করুক। কারণ, ভাষা হিসাবে ইংরেজি মহৎ; ভাষা হিসাবে উহা 'সাম্রাজ্যবাদীও' নয়। কারণ, ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরও উহা ভাষা।

উপসংহার

ভারতবর্ষে উহা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া আমাদের স্বাভাবিক ভাষা ও শিক্ষার বিকাশধারাকে এতদিন ব্যাহত করিয়াছে। এখন সেই অমঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে তাহাকে সরাইয়া দিলেই ইংরেজিকে সশ্রদ্ধ মনে প্রয়োজন মত চর্চা করিতে পারি। আমারই তাহাতে মঙ্গল।

আমার মাতৃভাষায় আমায় শিক্ষালাভের যে স্বাভাবিক পথ সে পথ মুক্ত করিতেই হইবে; তাহাতেই আমার জনগণেরও শিক্ষা স্বাভাবিক ও সম্ভব।

॥ বিজ্ঞান-শিক্ষা ও মানব-বিদ্যা ॥

সূচনা

একশত বৎসর পরে সম্প্রতি (১৯৫৯) ইংলণ্ডে নূতন করিয়া তর্ক বাঁধিয়াছে চিরায়ত (classics) সাহিত্য ও ভাষাপ্রভৃতি শিক্ষার আয়োজন কতটা আছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার আয়োজন আছে কিনা, ইহাই ছিল একশত বৎসর পূর্বে তর্কের বিষয়। সেই তর্কে সেদিন টি.ই.হাক্সলি, হর্বট স্পেন্সার প্রমুখ বিজ্ঞানের তপস্বীরা গ্রীক-লাতিন দর্শনাদি অধীতব্য বিদ্যার পার্শ্বে বিজ্ঞান শিক্ষার দাবিটুকু প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিলাতের চিরায়ত বিদ্যার পীঠস্থান অক্স্ফোর্ড-কেম্ব্রিজের মহামহোপাধ্যায়রা তখন কিছুতেই বিজ্ঞানকে বিদ্যার মধ্যে গণ্য করিতে চাহেন নাই।

একশত বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। এই কথা উল্লেখই যথেষ্ট কেম্ব্রিজের অধুনাতন পরিচালক-গোষ্ঠী

আর গ্রীক-লাতিন প্রভৃতিকে অবশ্যপাঠ্য বিষয় রূপে রক্ষা প্রয়োজন মনে করেন না। অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত কার্যতঃ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সনাতনী গুরুরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তথাপি যাহা সত্য তাহা এই—আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনায় পুরাতন ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন নিতান্তই শাস্ত্রের কচকচি বলিয়া মনে হয়। সত্যই কি তাহা তাহা? তাহা হইলে বিজ্ঞান বা কারু-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-সমূহে কেন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আধ্যাত্ম-শাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ-শাস্ত্র শিক্ষারও ব্যবস্থা হইতেছে? আমাদেরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, খড়্গাপুরের কারুবিদ্যার কলেজেও কেন সমাজ-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হইতেছে। কারুবৈজ্ঞানিকেরা কি মনে করেন উহা শুধু বিদ্যার অলঙ্করণ, একটু অবকাশরঞ্জন? না, উভয়পক্ষই বুঝিতেছে সকলবিদ্যার মহা-সমন্বয়েই সত্য প্রকাশিত?

শিক্ষা-ধারণার পরিবর্তন

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও সাহিত্য-শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও মূল্য, এই ১৯৫৯এ ডারুইনের Origin of the Species প্রকাশের শতবার্ষিকীতে একটু বিচার করিয়া দেখিলে হয়।

সদ্য সদ্য (২রা জুলাই ১৯৫৯) যখন সোভিয়েত বিজ্ঞান গুটি দুই জীবন্ত প্রাণীকে তাহাদের নিক্ষিপ্ত রকেটে মহাকাশে পাঠাইয়া আবার স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিয়া জীবজগতের ও মহাকাশের তত্ত্বকে পরীক্ষা করিতে লাগিয়াছে, আর "মেচ্‌তা" সূর্যের চারিদিকে ২রা জানুয়ারী হইতে অবিরাম গতিতে পরি-ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে, তখন আর কাহাকেও বিজ্ঞানের বিজয়যাত্রার গুরুত্ব বুঝাইতে হয় না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতি নিমেষে আজ বাংলা দেশের মানুষকে বিজলী ও স্টিমের প্রভাব, বিজলীরেল হইতে বেতারে শোনা খেলার খবরে পর্যন্ত প্রায় প্রতি মুহূর্তে স্বীকার করিতে হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একসরে, পেনিসিলিন, সালফা-ঔষধপত্র প্রভৃতি গত বিশ বৎসরে যে ভাবে আমাদের জীবনকে দীর্ঘায়িত ও রোগমুক্ত করিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানকে আজ শুধু পাশ্চাত্য জগতের ইন্দ্রজালের কারখানা ভাবা অসম্ভব। সত্য কথা এই যে, মানুষ আজ আপন পৃথিবীর রূপান্তর করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রকৃতি-জিজ্ঞাসা

শুধু এই বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব রূপান্তরেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এখন সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, তারপর শত বৎসর পূর্বেকার প্রাণি-বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত ধারার শত সহস্র তরঙ্গ তুলিয়া আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশ কার্যকারণাবদ্ধ যুক্তি-পরম্পরার প্রয়োগে মানুষের জগতের তাবৎ ক্ষেত্রেই বাহুবিস্তার করিতেছে। ব্যক্তি

সমাজ ও মনের প্রকৃতি বিজ্ঞান

নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিয়ম নীতি আবিষ্কার, পৃথিবীকে জানা-বোঝার এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য মানুষকে জানা-বোঝার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা কি একেবারে অসম্ভব? স্বার্থিক জীবন, সামাজিক জীবন, এমন কি, মানসিক জীবনও একালে শতগুণ জটিল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও চিন্তায় তাহারও কি গতি-নিয়ম নির্ণয় করা যায় না?—সবল কণ্ঠে এই প্রশ্ন লইয়া ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। মহাকাশ অভিযানের সঙ্গে মানব মহাকাশেও তাহার দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ কষিয়া বসিয়া গিয়াছেন—একদিকে পাব্‌লভ-পন্থী বস্তু-সাধকরা, অন্যদিকে ইয়ুং-ফ্রয়েড পন্থী নির্জ্ঞান চৈতন্যবাদীরা। কোথায় তবে বিজ্ঞানের শেষ সীমানা? সোভিয়েত-বিদ্যায় তো সাহিত্যও Science of Literature নামে বিজ্ঞান-মহাপর্ষদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, "Science is nothing but trained and organised sense." একমাত্র ললিতকলাই সেই দেশে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাহারও কতটা বিজ্ঞানের অধিগত হইতে চলিয়াছে কে বলিবে? বিজ্ঞানের পথেই কি সাহিত্যের রহস্যমোচন হইবে?

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের কথা কি বলিতে পারি? তাহা হইলে বলিতে দ্বিধা করিব না—বিজ্ঞান-হীন "মানববিদ্যা" বা 'হিউম্যানিটিজ্', সাহিত্য শিল্প ও দর্শনশাস্ত্রের বস্তু-বোধহীন চিন্তা যে কত অসার্থক, হৃদয়াবেগ বা অন্তর-সত্যকে পর্যন্ত কতটা বিকৃত করে, ভারতবর্ষই তো তাহার দৃষ্টান্ত। মানুষের এত অপমান যেখানে ঘটিয়াছে সেখানে সত্যই মানববিদ্যার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া লাভ কি? আর সাহিত্যে শিল্পে ভাবাবেগের দ্বারা যে জীবনের কোনো সত্যই শেষ পর্যন্ত লাভ করা যায় না, তাহার প্রমাণ আমাদের তথাকথিত—'অধ্যাত্ম বিলাস।' দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া আমরা 'বাঙালি মস্তিষ্কের অপব্যবহার' করিয়াছি, 'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল' এই তর্ক তুলিয়া; কিম্বা, একেবারে স্থূল মূঢ়তার অভিসম্পাতে সহজ বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া; বস্তুজগৎ সম্বন্ধে সাধারণ জিজ্ঞাসা ও জীবনের স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতাকে পর্যন্ত অবসন্ন করিয়া। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার, বৈজ্ঞানিক কর্ম-প্রচেষ্টা, বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড—ফলিত বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান, দুয়েরই বিদ্যুদ্‌গতিতে বা আলোক-গতিতে প্রকাশেই আমাদের জীবন যথার্থরূপে সংগঠন সম্ভব। অথচ, আমাদের আয়োজন সে তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও ব্যাহত। কাজেই, আমাদের যদি কোনো প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই 'বিজ্ঞান, আরও বিজ্ঞান, আরও বিজ্ঞান'। Light, more light! ইহাতেই মুক্তি!—আপাততঃ দশ বিশ বৎসর দর্শনশাস্ত্রেরও কচ্‌কচি বন্ধ থাকুক, দর্শনকে science of sciences রূপে, সর্ববিদ্যার বৈজ্ঞানিক সাধনপদ্ধতি রূপেই যেন গ্রহণ করি। সাহিত্য ও শিল্পের মানসিক

ভারতের সাক্ষ্য

পরিশীলনধর্মী চর্যাও না হয় সীমাবদ্ধ থাকুক এখনকার মত—একবার বিজ্ঞানের পথে সর্বাগ্রে জীবনের ভিত্তিভূমিকে আমরা রচনা করিয়া লই।

বিজ্ঞানের পথ বস্তুসত্যের পথ

কিন্তু সত্যই কি বিজ্ঞানের পথ ও সাহিত্যের পথ ভিন্নমুখী? অথবা উহা সমদূর সরলরেখার পথ? তাহাই মানিতে হয়। ইহা সত্য, এককালে একসঙ্গে যাত্রারম্ভ করিলেও বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-রহস্যের বস্তুগতরূপ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কার্য-কারণ সূত্রাবলম্বন করিয়া বস্তুর মধ্য হইতে নিয়মের রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তারপর সেই নিয়মের সূত্র ধরিয়াই বস্তুবিশ্বকে আপনার সহকারী করিয়া তুলিয়া নিত্য প্রয়াসে বিশ্বরহস্যের 'মহতো মহীয়ান' রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

মানব-বিদ্যা ও পথ

কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য এই বিশ্ব-রহস্যকে অন্তরের দিক হইতে ধরিতে চাহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি শুধু বস্তুরূপের দিকে নয়, উহার সহিত জড়িত অন্তর-সত্যের দিকে। শিল্পীর চক্ষে সূর্য শুধু নানা বস্তুর পিণ্ড নয় অন্তরাকাশের পূষন্; শিল্পের পক্ষে মানুষ শুধু প্রাণি-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত নয়, এক-একটি বিশিষ্ট সত্তা; কাহারও বা পরম প্রিয়, এবং সমস্ত বিজ্ঞানের অতীত; জীবন শুধু জন্ম-মৃত্যুর অধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সক্ষম অন্ধ প্রাণশক্তি নয়—'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।' তাই, বিজ্ঞানের সৃষ্টি নবনবাবিষ্কারে পরিবর্তিত হয়, নিউটনের আবিষ্কার আইনষ্টাইন-এর পরে অপূর্ণ প্রমাণিত হয়; কিন্তু হ্যামলেট বাতিল হয় না, রূপরসের মূল্য অক্ষয়। শিল্পের জগৎ এই জগতেরই অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করে। তাহাতে কি হয়? নিশ্চয়ই দীপক রাগে বিজলীর বাতি জ্বলে না, একটি ধান্যকণাও 'মেঘদূতে' বেশি উৎপন্ন হয় না।

তাহা হইলে এই মানব-বিদ্যার দান কি? এমন লোক অবশ্য আছেন যাঁহারা মিলটনের কবিতা শুনিয়া প্রশ্ন করেন, 'উহাতে কি প্রমাণিত হইল?' তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মিলটনের তাৎপর্য না বুঝিলেও শুনিয়াছি কোনো কোনো উচ্চতর গণিতের গবেষক, বিশ্ব-বিজ্ঞানের মনস্বি-নেতা সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া যান।

বিজ্ঞানের পথ আত্মনাশা?

আধুনিক বিজ্ঞান যতই বিশ্বনিয়ম আবিষ্কার করিতেছে ও ব্যবহারিক জীবনকে সেই নিয়মানুযায়ী সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, ততই আর একটা বিষয়ও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতেছে—এই সত্য-সাধনা ক্রমশঃ মৃত্যু-সাধনায় ও আত্মহত্যার চক্রান্তে পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান যতটা সৃষ্টি করিতেছে তাহার অপেক্ষাও বুঝি ধ্বংসেই বেশি মাতিয়াছে। এইখানেই প্রশ্ন উঠিল—বিজ্ঞান কি বিশুদ্ধ নিরাসক্ত সত্য-সাধনা? আত্ম-ধ্বংসের সম্বন্ধেও কি বিজ্ঞান-নিরাসক্ত থাকিবে? তাঁহার চক্ষে কি জীবনের মূল্য নাই, মানুষের জন্য তাহার মমতা নাই? আমাদের মঙ্গলামঙ্গল গণনা নিতান্ত মিথ্যা?

এই যদি বিজ্ঞানের বক্তব্য হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের ভাবনা বড়ই অসম্পূর্ণ। মানুষের কোনো ভাবনাই এরূপ অমানুষিক হইতে পারে না। মূল্যবোধের সম্বন্ধে, কল্যাণবোধের সম্বন্ধেও তাই বিজ্ঞান নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সেরূপ নিরপেক্ষতা মানব-প্রকৃতিরই বিরোধী। তাই বিজ্ঞানের সাধনায় যদি সত্যাবিষ্কার হয় তাহা হইলে এই সত্যও বিজ্ঞানের স্বীকার্য—মানব-প্রকৃতি শুধু জড়প্রকৃতি নয়। মঙ্গলামঙ্গলকেও মানুষ সত্য মনে করে, অতীত-ভবিষ্যৎ সে কল্পনা করে, আবেগ অনুভূতিও তাহার এক বিস্ময়। মানুষ জড়-প্রকৃতির যেমন অধীন তেমনি আবার সেই প্রকৃতিরই নিয়মে চিৎশক্তিরও আধার। ইহাও একটা পরম সত্য। বিজ্ঞান কি বলিয়া দিতে পারিবে গৌতম বুদ্ধের মস্তিষ্ক কতটুকু ছিল; ব্লাড্ প্রেশার কী পরিমাণ স্বল্প ছিল, কিম্বা কোন্ বিশেষ 'কম্‌প্লেক্‌স্'-এর বশবর্তী হইয়া এই রাজকুমার পত্নীপুত্র ত্যাগ করিলেন? তাহা পারিলেও কি সেই মহত্তর, নিগূঢ়তর ব্যক্তিসত্তার পরিচয় তাহাতে পাওয়া যাইত? না। এই সত্য বুঝিলেই বিজ্ঞান মানিবে তাহার দ্বিতীয় অসম্পূর্ণতা: ব্যক্তি-বিশেষের প্রেম ও ভালবাসার হিসাব বিজ্ঞানের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বড় জোর সে বলিতে পারে কোন বাস্তব কারণে সাধারণ ভাবে মানুষের কি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। কিন্তু তাহাতে কি মায়ের প্রাণের বা বিশিষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরাবেগের কোনো 'নিদান' পাওয়া যায়? প্রকৃতপক্ষে জীবনের যাহা বৃহত্তম রহস্য—জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, প্রণয়—তাহার সম্মুখে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়।

বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা

আর ঠিক এইখানেই শিল্পের, সাহিত্যের কতকাংশে দর্শনেরও সার্থকতা। জীবন-রহস্যের এই জটিল বিভাগের সত্য সাহিত্যের, শিল্পের প্রসাদেই আমাদের অধিগত হয়। ভালবাসার তন্ময়তায় কিম্বা হিমালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা যে সত্যের মুখামুখি হই তাহা মানুষকে পণ্যোৎপাদনে সহায়তা করে না, কিন্তু মানুষকে পূর্ণতার আভাস দান করে; বলিতে বাধ্য করে—পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণং পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণাৎ পূর্ণমাদায় পূর্ণৈবাবশিষ্যতে।

মানব-বিদ্যার সার্থকতা

আধুনিক বিজ্ঞানও সেই সত্যের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। শুধু বস্তুজীবনকে নয়, সমগ্র জীবনকেই সে মর্যাদা দিয়া জীব-চৈতন্যের অলক্ষিত নীতি-নিয়ম আবিষ্কার করিতে বদ্ধপরিকর। অপরদিকে সাহিত্যও বুঝিতেছে—তাহার পূর্ণতার সাধনা কখনো পূর্ণ হয় না যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক সত্যের পাশ কাটাইয়া সে শুধু ভাবলোকেই আপনাকে পূর্ণ করিতে চায়। মানুষ তো শুধু ভাবের ফানুষ নয়, বাস্তব জগতের রূপান্তরেই তাহার রূপান্তর সম্ভব। বিশ্বনিয়মের সঙ্গে আপনার সুরটি মিলাইতে পারিলেই তাহার পূর্ণতা। এমনি করিয়া এই পূর্ণতার সাধনায় শিল্প ও বিজ্ঞানের দুই সম-দূর সাধনপথ নিকটে আসিয়া মিলিতেছে।

সমন্বয়ের দিকে

।। ছাত্র ও রাজনীতি ।।

'ছাত্র ও রাজনীতি' একটি বিতর্কমূলক বিষয়। কেন বিতর্ক?

বিতর্কের কারণ বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে এ বিতর্ক কোথায় উঠিতেছে? ইংলণ্ডে ওঠে? ওঠে না। আমেরিকায় ওঠে? ওঠে না। অপরদিকে সোভিয়েত দেশে ওঠে? কখনো না। চীনে ওঠে? নিশ্চয়ই না। ওঠে তাহা হইলে কোথায়? যেখানে রাজনীতি সাধারণ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া সুস্থ রূপলাভ করে নাই, সেখানে। ইংলণ্ড আমেরিকায় ওঠে না, কারণ, সেখানে সাধারণ নিয়মে গণতন্ত্রী শাসক শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাবী শাসকবর্গ রূপে দেশের ছাত্রগণ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও শাসক-সুলভ ভাবনায় শিক্ষিত হইয়া ওঠে। সমাজ নেতারাও বাধা দেন না, ছাত্ররাও অতিরিক্ত মাথা ঘামায় না। সোভিয়েত দেশ চীন প্রভৃতি দেশে প্রশ্ন ওঠে না, কারণ, সমস্ত সমাজ জীবণই সেখানে মুনাফাবিরোধী রাজনীতির দ্বারা চালিত। ছাত্রদেরও আবাল্য সেই রাজনীতির মধ্যে সুসঙ্গত স্থান লইতে হয়—সেইরূপ শিক্ষাও দেওয়া হয়।

বিতর্কের কারণ

আমাদের দেশে এই বিতর্ক দেখা দেয় কেন? প্রথমতঃ, আমাদের গণতন্ত্রী ঐতিহ্য নাই, ছাত্রদেরও স্বাভাবিক অধিকার নাই, ছাত্রদের স্বাভাবিক চেতনাও তাই ব্যাহত। ছাত্রদের পাঠের অধিকার, খেলার অধিকার, আত্ম-বিকাশের অধিকার, এইসবও সর্বত্র যেন আন্দোলন সাপেক্ষ। তাই, দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে ছাত্রদের অতিরিক্ত আগ্রহ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া পরাধীন দেশের ছাত্র সমাজ একটা স্বাধীনতার আগ্রহ ও সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি করে ও লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সহজে এই প্রবণতা কাটিয়া যায় না। প্রয়োজনলাভের পক্ষে আন্দোলন ও সংগ্রামই প্রধান পথ ও লক্ষ্য হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, উহা কাটিয়া যাইবার পক্ষে আরও বাধা হয় এই যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দল ও মতবাদের সমস্যা এই ঐতিহ্যপুষ্ট ছাত্রদের আলোড়িত করে। রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাধীনতার পূর্বেও ছাত্রদের উপর নির্ভর করিত, পরেও তাহাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ভিড়াইতে থাকে। চতুর্থতঃ, স্বাধীনভাবে শক্তি বিকাশের অন্য পথ-সমূহ এই দেশের ছাত্রদের পক্ষে দুর্লভ রহিয়া গিয়াছে —দায়িত্বের বা আনন্দের কাজে তাহাদের স্থান নাই। সমাজসেবায়, কলা-অনুশীলনে, বহির্বিশ্বের পরিচয়ে, ভ্রমণাভিযানের সমস্ত পথ তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ। খেলার আয়োজনই কি সর্বত্র আছে?

ভারতের অবস্থা

কিন্তু প্রথম ও প্রধান কথা, রাজনীতি কাহাকে বলে যে, তাহাতে এত সংশয়? অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, মানুষ মাত্রই রাজনীতিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবের একরূপে না একরূপে সমাজজীবনে যোগ দিতেই হয়। সেই হিসাবে রাজনীতিতে যে নিরপেক্ষ সেও রাজনীতিক জীব—অর্থাৎ প্রচলিত রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীদের সে নিষ্ক্রিয় সমর্থক। কিন্তু সকলেই রাজনীতিক জীব হইলেও সকলের রাজনৈতিক দায়িত্ব সমান নয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বা Citizen এর যতটা দায়িত্ব অপ্রাপ্ত বয়স্কের ততটা নয়। আবার, কাহারও কাহারও আরও বিশেষ দায়িত্ব আছে। যে রাজনীতি-পন্থী কর্মি তাহার রাজনীতিবিষয়ে যতটা দায়িত্ব একজন অধ্যাপকের বা গবেষকের ততটা দায়িত্ব নয়। তাহা হইলে শিক্ষাব্রতীর বা ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নাই, সাধারণ দায়িত্ব আছে।

রাজনীতির নানারূপ

সমাজকে ভাঙিবার-গড়িবার সাধারণ দায়িত্ব শিশু ও বালক ব্যতীত অন্য ছাত্রদের আছে; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব, পরোক্ষ দায়িত্ব, এক বিশেষ ধরণের দায়িত্ব। যেমন—পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রী দেশে কলেজ-পাঠি ছাত্রদের থাকিবে—(ক) নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার দায়িত্ব; উহার মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ক ব্যবস্থা আলোচনা করিবার, এবং সেই সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মত স্থির করিবার ও মত প্রকাশ করিবার দায়িত্ব; (খ) স্ব-স্ব রাজনীতিক আদর্শানুযায়ী ছাত্র গোষ্ঠী গড়িবার অধিকার। যেমন—বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্‌সারভেটিব, লিবারেল, লেবর প্রভৃতি মতাবলম্বী ছাত্র-গোষ্ঠী আছে। (গ) শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এবং আইন কানুন না ভাঙিয়া যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে, সভায় মিছিলে যোগদানের অধিকার। অবশ্য ধর্মঘট করিয়া, বা ক্লাস ভাঙিয়া ঐরূপ আন্দোলন শৃঙ্খলাভঙ্গের সামিল তাহা না বলিলেও চলে। তাহা ছাড়া, একেবারে বালক বা শিশু বয়সে (অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রের পক্ষে) পরোক্ষ রাজনীতিও বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়।

পরোক্ষ দায়িত্ব

সাধারণভাবে এই মূল নীতিই সত্য যে, ছাত্রদের মানুষ হইতে হইবে। তাই বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের ভাবী রাজনীতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যও সংযত ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। রাজনীতি ও শিক্ষা সাপেক্ষ, প্রস্তুতি সাপেক্ষ। সেই প্রস্তুতির প্রয়োজনেই ছাত্রজীবনের পর্বে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের (direct action) রাজনীতি ও দলগত (partisan) রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করা অসঙ্গত। অবশ্য কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুতর ক্ষণে এই সাধারণ নিয়মও শিথিল করিতে হয়—যুদ্ধ বাধিলে কে তখন ছাত্রদের হিতোপদেশ দেন? যুদ্ধ না বাধিবার কর্মেই বা

সাধারণ কর্তব্য ও অসাধারণ মুহূর্তের কর্তব্য

তবে এই আণবিক ধ্বংসের যুগে ছাত্রদের সক্রিয় আন্দোলনে বাধা দেওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? আসলে ভবিষ্যৎ জীবন ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রাজনৈতিক কর্ম করিলে ছাত্রদের পক্ষেও তাহা প্রশংসনীয়ই হয়। তথাপি প্রধানতঃ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তর্ক আলোচনা এবং বিযুক্ত (unengaged) অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেদিগকে ভাবী দায়িত্ব-পালনের জন্য প্রস্তুত করাই ছাত্রদের সাধারণভাবে কর্তব্যপালন। কিন্তু তাই বলিয়া দুর্গত-সেবা, সমাজ-সেবা, পল্লী-উন্নয়নে যোগদান, শ্রমিক আন্দোলনে নানা বিষয়ে সাহায্যদান—ইহা হইতে ছাত্রদের বিরত রাখিবারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ইহাও ত শিক্ষারই অঙ্গ, সেই শিক্ষা মনুষ্যত্বের শিক্ষা।

চাই সুস্থ পরিবেশ

এই কথা সত্য যে, আধুনিক ভারতে ছাত্রদের সত্য-মিথ্যা নানা রাজনৈতিক কারণে প্রতিনিয়ত উত্তেজনা জুটিতেছে। তাহাতে শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়া ও ছাত্র-কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া ছাত্ররা কতকাংশে শক্তির অপচয় করিতেছেন, এবং ভাবী সমাজ গঠনের দায়িত্বের দিক হইতে অপরাধী হইতেছেন। অর্থাৎ ছাত্ররা যথার্থ রাজনৈতিক কর্তব্য করিতেছেন না, সময়ে সময়ে ভ্রান্ত রাজনৈতিক উত্তেজনায় ভুগিতেছেন কিন্তু ইহার জন্য দোষী কি তাহারা? না, সমাজ-নেতারা? সমাজ-শ্রেষ্ঠদের কর্তব্যবিমুখতা, অকর্মণ্যতা ও অসাধুতা, পার্লেমেণ্টারি ঐতিহ্যানুযায়ী সুস্থ রাজনৈতিক গঠনে অক্ষমতা? সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন করিলে তাহাতে ছাত্রদেরও সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা ফিরিয়া আসিবে। আর একটা কথাও মনে রাখিবার মত—সমস্ত পৃথিবী যুগাবর্তনের মুখে। অনেক তথাকথিত সভ্যদেশে ছাত্রদের রাজনীতির প্রতি বিমুখতার কারণ সুস্থ চেতনা নয়, সেক্স ও অপরাধপ্রবণতা। উহা অপেক্ষা রাজনীতি শতবার কাম্য।

।। শিক্ষার পরীক্ষা ।।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি,—আমাদের দেশে কোনো ছাত্রকে এই প্রশ্ন করিলে তাহার সত্যকার উত্তর হইবে, "পরীক্ষায় পাস করা।" অথবা, আরও একটু তলাইয়া দেখিলে উত্তরটি এই—"কোনরূপে একটা চাকরি লাভ।" তবে পাস না করিলে যে শিক্ষার কোনো সার্থকতা নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। আমাদের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিই তাই পরীক্ষা-কেন্দ্রিক।

বিদ্যার যে যাচাই প্রয়োজন, এই কথা সকলেরই স্বীকার্য। সেই 'যাচাই'র পদ্ধতি লইয়াই প্রশ্ন। আমাদের দেশে গত দেড়শত বৎসরে যে পরীক্ষা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত আমরা সকলেই পরিচিত।

প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি

তাহার সারকথা এই—কোনো বিশেষ দিবসে, বিশেষ সময়ের মধ্যে, শিক্ষার্থীকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। সাধারণতঃ লিখিত প্রশ্ন ও লিখিত উত্তরই নিয়ম। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মৌখিক প্রশ্ন ও মৌখিক উত্তরের প্রথাও প্রচলিত আছে। আবার বিজ্ঞান-বিষয়ক বিদ্যার পরীক্ষায় বীক্ষণাগারে হাতে-কলমে প্রশ্ন-উত্তরের ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু যাহাই হউক, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে যদি একটা শতকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর লাভ করিতে পারা যায়, তবেই অধীত বিদ্যার, মার্জিত বুদ্ধির, এবং প্রয়োজনীয় ধী-শক্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য হওয়া যায়—অন্যথা নয়।

মনে রাখা যাইতে পারে—আকস্মিক পীড়া বা পারিবারিক বিপদপাতে যদি সেই দিনটিতে এই পরীক্ষার জন্য কেহ উপস্থিত হইতে না পারিল, তবে তাহার বিদ্যার পরীক্ষা হইল না, এবং দীর্ঘদিনের জন্য তাহার যোগ্যতা অস্বীকৃত রহিল। এইরূপে তাহার সময়ের ও জীবনের অপচয়ও ঘটিল। কিম্বা, যদিই বা উপস্থিত হইয়াও বহু অধীত বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সে অজ্ঞ থাকে, কিম্বা ঐ সময়ের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর সাজাইয়া লিখিবার মত কৌশল সে না জানে, অথবা ঐ বিশেষ কয়টি প্রশ্নের উত্তর বিশেষ ধারায় লিখিয়া উঠিতে না পারে,—তাহা হইলেও পরীক্ষকের মাপকাঠিতে সে শিক্ষার্থী নির্বোধ, হয়ত বুদ্ধিহীন এবং পাঠে অমনোযোগী,—সমাজের সকলের চক্ষে 'ফেল'।

পরীক্ষার প্রহসন

বর্তমান অবস্থা মনে রাখিলে ইহাও বুঝা সহজ—পরীক্ষার্থী সব করিলে, সব লিখিলেও শত শত ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর পড়িতে পড়িতে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ—নিজের অজ্ঞাতেও ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া, বা পরীক্ষার কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া, পরিক্লান্ত পরীক্ষক যে

পরীক্ষকের বিড়ম্বনা

মার্কটা দিলেন—উপরওয়ালার তাড়নায় পরীক্ষকেরও থাকে সময়াভাব—তাহাতে পরীক্ষার্থীর দুই এক বৎসরের সমস্ত বিদ্যার একটা চড়ান্ত যাচাই হইয়া যায়।

নিশ্চয়ই ব্যাপারটা হাস্যকর। কিন্তু 'ফেল' কথাটার সামাজিক ও নৈতিক অর্থ যাঁহারা বোঝেন তাঁহারা জানেন উহা কী 'ট্র্যাজিডি'। শুধুমাত্র ঐ মার্কটা কী বিভীষিকা। তাহার উপর, উহারই ফলে শিক্ষার্থীর জীবিকা-ভাগ্য এবং তাই ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ভাগ্যই প্রায় নিশ্চিত হইয়া যায়। হয়ত তাহা নিশ্চিত হইল এই জন্য যে, চায়ের অভাবে পরীক্ষক মহাশয়ের কাগজ দেখিবার কালে মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কিম্বা ছাত্রটি কোনো একটি বিষয়ে, যেমন—ইতিহাস, সত্যই অপটু ;—আকবরের পলিসি, ডালহৌসির কার্যাবলী প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে সে জানে না ;—অতএব, তাহাকে দিয়া কি করিয়া আর হিসাব-নবিশের কাজ হইবে ?

সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই যখন এইরূপ পরীক্ষা-কেন্দ্রিক পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা, এবং বিশেষ সময়ের মধ্যে বিশেষ প্রশ্নাবলীর উত্তর-দানের চাতুর্য পরীক্ষা,—তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই যদি কার্যতঃ এই প্রশ্নোত্তরের বিদ্যাকেই চরম 'জ্ঞান' বলিয়া মনে করে—নোট, কোশ্চেনস্ এণ্ড এনসারস, ভেরি ইমপরটেণ্ট কোশ্চেনস্ এণ্ড এনসার্স, হাউ টু এনসার, 'কী' ও সিক্রেটের শরণ লইয়াই—এমনকি, রচনা পুস্তকেরও রচনা মুখস্থ করিয়া—এই শিক্ষা-বৈতরণী পার হইয়া বাঁচিতে চায়,—তাহা হইলে কি তাহাদের খুব দোষ দেওয়া যায় ? এবম্বিধ ফাঁকির রাজ্যে বিদ্যার বা বুদ্ধির পরিমাপের অবকাশ কোথায় ? স্মৃতিশক্তিরই মাত্র কতকটা পরীক্ষা হইতে পারে। বিদ্যার ব্যবহারিক সার্থকতা, ছাত্রের সাধারণ বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ শক্তি, বোধের বিকাশ,—কিম্বা তীক্ষ্ণতা, সংযম সাহস, দৃঢ়তা, —ইহার কথা তোলাই এইক্ষেত্রে অবান্তর। তবে মনে করা চলে, এই বাধা-বিঘ্ন জানিয়া-শুনিয়াও যে ছাত্র ইহার মধ্যে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, ভাবী জীবনে সে নিশ্চয়ই যেইদিকে যাউক কৃতী বলিয়াই প্রমাণিত হইবার সম্ভাবনা। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু 'পাস'-চতুর অনেকেই যে তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অকর্মণ্য প্রমাণিত হন, তাহাও সেইরূপ সত্য।

ফাঁকির মাহাত্ম্য

অবশ্য বলা চলে, কর্মজীবনেও প্রশাসনিক পরীক্ষা বা অনুরূপ প্রয়োজনীয় চাকরির পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহারাও যাচাই করিয়া কর্মী গ্রহণ করে—শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাই শেষ নয়। কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষভাবেই জানেন প্রশাসনিক পরীক্ষাসমূহও এই ছাঁচেই ঢালা। তাহার উপর সেই স্থানে আরও "পরীক্ষা" থাকে—'ভিভা-ভোসি'। এম-এ পরীক্ষার 'নাইন্থ্' পেপারের মতো উহা তথাকথিত 'স্মার্টনেসের' পরীক্ষা বা ঝকমকির পরীক্ষায়—যেন প্রার্থীরা প্রত্যেকেই জঙ্গীবিভাগের রঙরুট, কিম্বা সিনেমার তারকা না হইলে

চাকরির পরীক্ষা

অপিস চলিবে না। তাহা ছাড়া, কৌলিক-প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ও সেই পরীক্ষায় কম নয়।

অথচ বিদ্যার যাচাই প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। যাচাই না করিয়া কাহাকেও কৃতী বলা চলে না। চাকরির পরীক্ষা প্রাচীন চীনের উদ্ভাবিত। ধন-কুল নির্বিশেষে প্রশাসনিক-গোষ্ঠী নির্বাচনের এইরূপ উপায় আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই পরীক্ষার ইহা একটি বিশেষ গুণ। দ্বিতীয় কথা, শিক্ষাকালে এই পরীক্ষার খড়্গ মাথার উপরে এইভাবে ঝোলে বলিয়াই বর্ষ শেষে এ দেশের পরীক্ষার্থী ছাত্র রাত জাগিয়া, সালসা খাইয়া, যত সম্ভব বইএর দুষ্পাচ্য পাচনকে নোটের 'টেবলয়েড' করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া—যেমন করিয়াই হোক্,—কিছুটা পড়ে, কিছুটা প্রতিযোগিতায় মাতে, কিছুটা হারজিতের খেলায় দাঁড়াইবার মত যোগ্যতাও অর্জন করে।

পরীক্ষার গুণ

সম্ভবতঃ যতক্ষণ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তিত না হয় ততক্ষণ এই ধারার পরীক্ষা-পদ্ধতিও পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। ক্লাশে বহু ছাত্রকে লইয়া এইরূপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক-একটি পরিক্লান্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিলে, সে শিক্ষাকে বাঁধা ধরা পথে কয়েকটি কৌশলশিক্ষাতেই পরিণত করিতে শিক্ষকও বাধ্য—তাঁহার উপায়ান্তর নাই। প্রতি ছাত্রের স্ফুটনোন্মুখ বিশেষ মনের উপযোগী, বিশেষ ঝোঁকের উপযুক্ত, বিশেষ ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের কথা বর্তমান ব্যবস্থায় নাই। আর তাহা না থাকিলে শিক্ষার মুলোচ্ছেদই হয়, এই বোধেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার, শিক্ষা-পদ্ধতির ও পরীক্ষা-পদ্ধতির এমন বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-পদ্ধতি একটা পাপচক্রের মত সমস্ত শিক্ষাদর্শকে অস্বীকার করিয়া এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও এখন প্রায় অচল করিয়া তুলিতেছে।

শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি পবস্পর সম্পর্কিত

পরীক্ষা নিশ্চয়ই প্রার্থনীয়। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আমুল সংস্কার না হইলে এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মৌলিক সংস্কারও সম্ভব নয়। পরীক্ষা-সমস্যা লইয়া তাই শিক্ষা-গবেষকরা চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু কয়েকটা সামান্য সংস্কার হয়ত তৎসাপেক্ষে এখনো করা যায়। যেমন—(১) ছাত্র-পরীক্ষায় একটা 'ছত্রের মেলা' না বসাইয়া পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিত করা; ও তিন মাস পরে পরে অকৃতকার্য ছাত্রদের পুনঃ-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। (২) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে আরও গুরুত্ব দান করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে স্কুল-কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ, সেই পরীক্ষার ও ক্লাস-শিক্ষকেরও মতামতে কিছু পরিমাণে গুরুত্ব-অর্পণ; (৩) প্রশ্নপত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক বিষয়ের স্মৃতিপরীক্ষার চেষ্টা না করিয়া ছাত্রকে ইচ্ছানুরূপ যে কোনো প্রশ্নে যেরূপ ইচ্ছা উত্তরদানের অধিকার দান;—অর্থাৎ

মৌলিক ও সামান্য সংস্কার

তাহার বোধশক্তির ও বুদ্ধির পরিচয়ের অবকাশ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া; (৪) নম্বর-হিসাবে পরিমাপ না দিয়া পর্যায়-হিসাবে ছাত্রের পরিমাপ, সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষাগ্রহণ, এবং উহাকে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা না মনে করিয়া পর্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তির পরীক্ষায় পরিণত করা, ইত্যাদি।

উপসংহার

অবশ্য শেষ পর্যন্ত মনে রাখিতেই হইবে—বিদ্যার পরীক্ষা ও জীবনের পরীক্ষা এক নয়। শিক্ষার আদর্শে ও শিক্ষার ব্যবস্থায় জীবনের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আমরা যত ঔদাসীন্য দেখাইব, ততই শিক্ষা ও পরীক্ষা দুইই হইবে এইরূপে জীবনের প্রহসন।

॥ আমাদের শিক্ষা-সংস্কার ॥

সূচনা

পৃথিবীর সর্বদেশেই বোধ হয় শিক্ষা-সংস্কারের প্রশ্ন আজ প্রবল। কারণ, জ্ঞানের পরিধি এমন দ্রুত-গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, কাল যাহা যথেষ্ট মনে হইত আজ তাহা যথেষ্ট নয়। এমন কি, কাল যাহা সত্য বলিয়া জানিতাম আজ তাহাও হয়ত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। অন্তত তেমন সত্য বলিয়া তাহাকে আর আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিব না। বিজ্ঞানের বিবর্ধমান শাখা-প্রশাখার জন্য একদিকে তাই সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞান (specialisation) আহরণের ব্যবস্থা করা অনিবার্য; অন্যদিকে জ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির (all-round development), জ্ঞানেরও সর্বজনীনতা সাধন (universalisation) বা সাধারণ বোধগামিতার (popularisation) অয়োজন করাও আবশ্যক। আর শুধু সেইখানেই বা থামিবার আবশ্যক কি? বিজ্ঞানের সহিত মানুষের চিৎশক্তির ও মানুষের কল্যাণবুদ্ধির উৎকর্ষ, প্রসার, মানবতাবোধ, দায়িত্ববোধ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্ফূর্তির আয়োজন না করিলে—মানব-মনের সুষম বিকাশের (harmonious) সুযোগ না ঘটিলে—সমস্ত শিক্ষাই তো কুশিক্ষায় পরিণত হইতে পারে। অতএব, শিক্ষা-সংস্কারের প্রশ্ন সমস্ত পৃথিবীতেই সভ্যতার এক মূল প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতা কী চায়, তাহার উপরই নির্ভর করে কী শিক্ষা আজ আমরা চাহিব।

পৃথিবীর এই সাধারণ সমস্যা ব্যতীতও বিভিন্ন দেশেরও শিক্ষা বিষয়ে নিজস্ব সমস্যা ও নিজস্ব প্রয়োজন আছে। কারণ, পৃথিবীতে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার দেশে দেশে অ-সমান; সুযোগ-সহায়তাও প্রত্যেকের

বিভিন্ন ধরনের। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের পক্ষে আবার ইহা আরও বেশী সত্য। আমাদের প্রাচীন জীবনযাত্রা ও জীবন-দৃষ্টির সম্মুখে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো তীব্র শিখা জ্বলিয়াছে সত্য, কিন্তু ইংরেজ আমলে তাহার সহায়ে আমাদের পক্ষে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করিবার সুযোগ ছিল অতিসীমিত। আমরা পুরাতন শিক্ষাধারা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, আবার জ্ঞানের সহস্রমুখী ধারায় অবগাহনের অধিকার হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছি। প্রধানতঃ কেরানি হইবার ফাঁকে ফাঁকে দুই এক অঞ্জলি জ্ঞানামৃত পান করিয়াই ধন্য হইয়াছি। আজ স্বাধীনতার যুগে আমাদের নিজেদের মতো করিয়া নিজেদের শিক্ষা-আয়োজনের অবকাশ প্রথম সমাগত হইযাছে। জানিয়া বুঝিয়া আমরা নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণযনের দায়িত্বও মানিয়া লইয়াছি। উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক প্রতি স্তরের শিক্ষা-বিষয়ে কমিশন-বিষয়ে কমিশন-কমিটি প্রভৃতি বসাইয়া একটু সুচিন্তিত শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবনার চেষ্টাও করিতেছি। সেই আলোকে আমাদের মূল সামাজিক বিকাশের সম্ভাবনা ও পরিককল্পনানুযায়ী শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-বিন্যাসও করিতেছি; সামর্থ্যানুযায়ী উহাকে অধিকতর অর্থব্যয়ের নীতি ও প্রয়াসও চলিতেছে। এতকাল পরে তত্ত্বগত শিক্ষার সহিত দেশগঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, কারুবিদ্যা ও নানা বৃত্তিশিক্ষা গুরুত্বলাভ করিয়াছে। শিক্ষা বিষয়ে আমরা উদাসীন, এখন এমন কথা বলিবার উপায় নাই।

আমাদের প্রচেষ্টা

শিক্ষা-সংস্কারের একটা মূল উদ্দেশ্য ও মূলনীতি হযত আমাদের বিবিধ বিভাগেরও বিবিধ স্তরের সংস্কার প্রয়াসের মধ্য দিয়া স্বীকৃত। উদ্দেশ্যের দিক হইতে বোধ হয় বলা যায়—ভারতবর্ষের বহুদিনে অবরুদ্ধ সমাজ জীবনকে মুক্ত, স্বাধীন ও ভারতবর্ষকে আধুনিক কালের অগ্রসর জাতিদের সহযাত্রী শক্তিরূপে গড়িয়া তোলাই আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য; আর আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই। বলা বাহুল্য, সমাজ-শক্তির এই স্ফুরণের জন্য আমরা চাই ব্যক্তির সর্ববৃত্তির সুসমঞ্জ বিকাশ, এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা-বোধেরও সুস্থির প্রত্যয়। কিন্তু কার্যতঃ উদ্দেশ্য হইল আমাদের সমাজকে অগ্রগামী সমাজরূপে গঠন।

শিক্ষা-সংস্কারের রূপরেখা

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মূলনীতি রূপে আমরা সংবিধানেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম—ইং ১৯৬০ এর মধ্যে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক সকলের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। কারণ, গণতন্ত্রের ভিত্তি গণশিক্ষা; সামাজিক অগ্রগতির প্রধান শক্তিও গণশক্তি। অতএব, একদিকে চাই আগামী দিনের জনশক্তিকে শিক্ষাদান, অন্যদিকে বর্তমান নিরক্ষর বয়স্কদেরও সাধারণ শিক্ষাদান।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত, অথবা ওয়ার্ধার প্রণীত ও সার্জেন্ট-শোধিত, 'বুনিয়াদী শিক্ষাকে' আমরা শিক্ষা প্রণালী রূপে গ্রহণ করিয়াছি—অবশ্য কার্যতঃ তাহার প্রয়োগ এখনো অতি সামান্যই হইয়াছে। এই শিক্ষার মূল কথাটা এই যে, কাজের মধ্য দিয়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিবে, পুঁথির বোঝা তাহাদের উপর চাপানো হইবে না। 'কাজ' বলিতে প্রধানত গান্ধীজীর উদ্দিষ্ট চরকার কাজই বড় করিয়া ধরা হয়, অন্যরূপ কাজও আছে। এই 'কর্মকেন্দ্রিক' শিক্ষা তাই প্রায় 'চরকাকেন্দ্রিক' শিক্ষা হইয়া উঠিতে চায়, তাহা মিথ্যা নয়।

'বুনিয়াদী শিক্ষা'

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন যাহা ঘটিতেছে তাহা কোনো সংজ্ঞার মধ্যে পড়িবে না। মোট ১১ বৎসরব্যাপী শিক্ষাকালের মধ্যে ছাত্ররা মাতৃভাষার মাধ্যমে কলেজের মধ্য পর্বের (ইণ্টারমিডিয়েট্) শিক্ষাকে অতিক্রম করিবে এবং পরে ৩ বৎসর কলেজীয় শিক্ষায় স্নাতক বিদ্যার অধিকারী হইবে। অর্থাৎ মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার পূর্বকার ১০+৪ এই ধাঁজ পরিবর্তিত হইয়া এখন ১১+৩ এই ধাঁজে তাহা সাজানো হইতেছে। তবে উহারও মধ্যে আবার প্রথম ১১ দুই পর্বে বিভক্ত হইবে—'জুনিয়ার সেকেণ্ডরি স্কুল' ৮ বৎসর পর্যন্ত আর তারপরে ৩ বৎসর 'হায়ার সেকেণ্ডরি' স্কুল। ইহার উদ্দেশ্য প্রথম ৪ বৎসরের স্তরে একটি দাড়ি টানিয়া সাধারণ কারুশিক্ষার দিকে সাধারণ বুদ্ধির বহুসংখ্যক ছাত্রকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া; বাকী যোগ্য ছাত্রদের পরবর্তী ৪ বৎসরের শিক্ষায় বিজ্ঞান, কারুবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি ও সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার খাদে চালনা করিয়া বেশ স্থির শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা।

'মধ্যশিক্ষার' নূতন কাঠামো

এইরূপ ১১ বৎসর ব্যাপী মধ্যশিক্ষার শেষে অধিকাংশই জীবনে প্রবেশ করিবে, আর কলেজে ছুটিবে না। অবশ্য কিছু কিছু যোগ্য ছাত্র তখন সামাজিক প্রয়োজনানুরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষার উচ্চবিভাগে প্রবেশ করিবে; এবং আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বৎসর কাল পড়িয়া কলা ও বিজ্ঞানের স্নাতক শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে। সাধারণ কলেজীয় শিক্ষায় এখনকার অবাঞ্ছিত ভিড় প্রতিরোধ করিয়া সেই শিক্ষার মান উন্নত করা,—গঠন-গত শিক্ষাসংস্কারের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

কার্যতঃ মধ্যশিক্ষার দশবৎসরের স্কুলগুলিকে—অন্তত বাঙলাদেশের ১,৬০০ স্কুলকে,—বিজ্ঞান, কারুবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদানের উপযুক্ত ১১ বৎসরের 'সর্বার্থক' স্কুলে পরিণত করা সম্ভব হইতেছে না। এবং যে ৫।৬ শত স্কুলে তাহা হইতেছে (১৯৬১) তাহারাও শিক্ষক অভাবে পঠন-পাঠনের সু-ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। বহু বাদবিতর্কের পরে ছাত্রদের জন্য যে পাঠক্রম প্রণীত ও নির্দিষ্ট

কাঠামো—ভাঙা, গড়া নয়

হইয়াছে তাহা দুর্ভার, দুষ্পাচ্য ও বাস্তববোধহীন কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া শিক্ষকগণ বলেন। এমনকি, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে মধ্যস্তরের শিক্ষার সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা, এখন পর্যন্ত এই পাঠক্রমের দ্বারা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গেও এই পাঠ-সংস্কারানুযায়ী মধ্যশিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা প্রথম অবহেলিত ছিল, এখন সে চেষ্টা হইতেছে। উপযুক্ত পাঠ্যাদিও রচনা করিবার চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বে করে নাই। অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কার আসিতেছে এখন পর্যন্ত মাত্র অবিবেচনা ও প্রস্তুতিহীন অব্যবস্থার আকারে।

বৃত্তিশিক্ষা, ও কারিগরি শিক্ষা

অবশ্য দেশে বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার আয়োজন অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে তাহা কিছু নয়। এবং নূতন কৃষি-শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমের অনুপাতেও তাহা অপ্রচুর। অন্য দিকে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও মোটেই প্রয়োজনানুরূপ নয়। ছাত্র-বৃদ্ধি. শিক্ষা-সংস্কার, প্রভৃতি প্রয়াসও তাই অবাস্তব হইয়া পড়িতেছে।

বাস্তবক্ষেত্রে, যাহা স্বাধীনতার এই এক যুগের শেষে ও দুইটি পরিকল্পনার প্রায় অবসানকালে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার কোনো কারণ নাই।

উপসংহার : শিক্ষার দুরবস্থা

প্রথমতঃ আমাদের সংবিধান বিহিত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ১৯৬০ সালে কেন, ১৯৭০।১৯৭৫ সালেও সত্য হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার জন্য শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা না করিয়া আমরা ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার জন্য শিক্ষার আয়োজন করাই এখন যথেষ্ট বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছি। অর্থাৎ বাস্তববোধের নামে সংস্কারাদর্শের প্রধানতম লক্ষ্যটিকে খর্ব করিয়াছি দুই দিকেই—লক্ষ্য কাল পিছাইয়া দিয়াছি ও শিক্ষাকাল কমাইয়া দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, নিশ্চয়ই আমাদের সাক্ষর সংখ্যা ও শিক্ষিত সংখ্যা আনুপাতিকভাবে সর্ববিভাগে ও সর্বশাখায় বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে। কিন্তু গুণগতভাবে, এমনকি, সামান্য সার্থকতার দিক হইতেও, যে মোটামুটি এই শিক্ষার অধোগতি ঘটিয়াছে, এই সত্য সকলেই প্রায় গভীর আশঙ্কার সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। তৃতীয়তঃ, শিক্ষা-সংস্কারে নানা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও পরীক্ষা করিয়া আমরা যতটা গঠন-গত পরিবর্তন সাধন করিতে উৎসাহী হইয়াছি, শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষানীতি ও শিক্ষার কার্যগত প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে তাহার অর্ধেক চেষ্টা করি নাই। এমন কি, কোনো কোনো দিকে, যেমন শিক্ষানীতি বিষয়ে, চেষ্টাও করি নাই। কয়েকটা সূত্র আওড়াইয়া ভবিতব্যের হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াই চোখ বুঁজিয়া থাকি। কোনো কোনো বিষয়ে, যেমন শিক্ষাদর্শ-ব্যাপারে, কতকগুলি অর্থহীন

বাগাড়ম্বর করি, আর কোনো কোনো বিষয়ে, যেমন ছাত্রদের পাঠ্যনির্ণয়ে, পরীক্ষা ব্যাপারে, যাহা করি তাহা মূঢ়তা ও দায়িত্বহীনতা। এমন কি, শিক্ষার মাধ্যমের মত প্রশ্নেও আমরা এখ[illegible]ন্ত মন স্থির করিতে পারি নাই। সর্বশেষে শিক্ষকের কথা। অতি [illegible] তাঁহাদের আর্থিক দাবি কতকটা পূরণ করা হইলেও এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক কন্‌স্টেবলের অপেক্ষা কম বেতন পান; স্কুল শিক্ষক, কলেজ শিক্ষকও দুর্মূল্যের অনুপাতে অর্থ বা সামাজিক সম্মানের অধিকারী হন নাই। হয়ত দোষ শিক্ষা-সংস্কারকদের একারও নয়, দোষ হয়ত সাধারণভাবে সমাজ-নেতৃত্বের। কিন্তু একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

॥ বেতার বার্তা ॥

'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা'—

সূচনা প্রকৃতি কিন্তু চিরদিনই কথা কহিয়াছে, মানুষেরই তাহা শুনিবার মত কান ছিল না। নবজাত শিশুর মত আপন অচৈতন্য লোকে এতকাল মানুষ প্রকৃতির সেই আহ্বানের স্থূল প্রতিক্রিয়ায় হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, দেয়ালা করিয়াছে। প্রকৃতিকেই বা জানিয়াছে কই, নিজেকেই বা বুঝিয়াছে কই? বরং এই যুগেই মানুষ প্রকৃতির সেই সহস্র-দ্বার লীলা নিকেতনের একটি একটি করিয়া দ্বার পার হইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও এই রঙ্গশালায় তাহার লীলা-সহচর রূপে আবিষ্কার করিতে চলিয়াছে। প্রকৃতি তো সেই পুরানো প্রকৃতিই রহিয়াছেন—বিশ্ব সঙ্গীতের তাল কাটিবার উপায় নাই। বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে মানুষের চৈতন্যদ্বার না খুলিতে তাহার কর্ণই বধির ছিল। প্রকৃতিই বরং আপন বিশ্বলীলার আসরে এই ভুল-ভ্রান্তিভরা নিয়ম-ভোলা মানব-প্রকৃতির সচেতন প্রাণ-স্পর্শ কামনা করিয়া আপন একাকিত্বে আপনি কাঁদিয়া ফিরিয়াছে। হাজার হাজার বছর কাটিয়াছে তবু তো মানুষ তাহার সুরে আপন সুরটি মিলাইবার মত চেতনা লাভ করে নাই। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির দ্বৈত-লীলার খেলা সবে তো জমিতে আরম্ভ করিয়াছে—আর এই মিলন-বিরহের মাল্যরচনা করিতেছে বিজ্ঞান এক-একটি করিয়া ফুল গাঁথিয়া।

বিদ্যুৎ হইতে বেতার

বিদ্যুতের মালা যেদিন মানুষের গলায় বিজ্ঞান পরাইয়া দিল সেদিনই তাহার নবযৌবনের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। 'ঈথর' হউক, 'ইলেকট্রন' হউক, যে নামেই যে তত্ত্ব পরি[illegible]ন উক্ত[illegible] টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে তাহাকে রূপায়িত ক[illegible]সার্থ করিতে মানুষ ঘোষণা করিতে পারিল "আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা"। যে শব্দ ঈথর-তরঙ্গে, তারপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপায়িত হইয়া বিদ্যুৎ-সূত্রে দূর-দূরান্তরে প্রবাহিত, সে তো তারের আশ্রয় ছাড়াও নিকটের মানুষের কানে পূর্বাপর পৌঁছিতেছে। তাহা হইলে সেই ঈথর-তরঙ্গ দূরযাত্রার জন্য তারের অব্যাহত সূত্রের যে মুখাপেক্ষী থাকিবে, এমন কি কথা আছে? ঠিক-ঠিক ঈথর-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারিলে, আর ঠিক সেই তরঙ্গটিকে ধরিবার মত 'আকাশ-তার' পাইলে, এবং গ্রাহক-যন্ত্র থাকিলে, দূর-দূরান্তরের কথা আমরা কেন শুনিতে পাইব না? ফ্যারাডে, ম্যাকস্ওয়েলের আবিষ্কারকে যাহারা এই পরিণতির দিকে আনিয়া পৌঁছাইলেন তাঁহাদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও ছিলেন একজন। কিন্তু গৌরবের জয়মাল্য লাভ হইয়াছে ইতালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনির —সে ১৮৯৭ সালের কথা। তারপর নিখিল মানুষের অধিকারে ও সেবায় সেই 'বেতার টেলিগ্রাফ' এখন শতশত বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রেরক-যন্ত্রে' বাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টি করিয়া, 'গ্রাহক-যন্ত্রের' যন্ত্র-সংলগ্ন 'আকাশ-তার' আশ্রয় করিয়া, দূর-দূরান্তরের বাণীকে মানুষের কানে পৌঁছাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির অবিলুপ্ত 'আকাশ-বাণী' আজ শুনিতে আর বাধা নাই। সামান্য ঘড়ির মত যন্ত্রেও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি, ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যেও তাহার 'প্রেরক-যন্ত্র' লইয়া ফিরিতে পারি; বাড়িতে বসিয়া শুনিতে পারি, মোটরে চলিতে চলিতেও বলিতে, জানিতে এবং শুনাইতে পারি। শুধু তাহাই নয়—এই 'বেতার-বাণী' আজ 'টেলিভিশন' রূপে রূপময় বাণীও হইয়া উঠিয়াছে। চলচ্চিত্র সবাক্ হইলে 'বেতার সাক্ষাৎ-ই' বা অনায়ত্ত রহিবে কেন?

বেতারের উপযোগিতা

দূরকে নিকট করিবার সঙ্গে মানুষের জীবনে যে পূর্ণতার সুযোগ আসিল তাহা তো আজ প্রত্যক্ষ। কোনরূপে একটি রেডিও যন্ত্র রাখিতে যে পারে আজ তাহার পক্ষে শুধু স্বদেশের নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের সুযোগ আয়ত্ত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ও রসাত্মক বাক্-সৌন্দর্যের উপভোগও অবারিত। জ্ঞানের জগৎ ও আনন্দের জগৎ, দুইই ইচ্ছানুসারে উন্মুক্ত। খঞ্জ হউক, অন্ধ হউক, পীড়িত শয্যাশায়ী হউক,—শুধু বধির না হইলেই হইল—জীবন্ত পৃথিবীর ভাবনা ও রসসম্পদ হইতে আর কাহারও বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। এমনকি, ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্তেই কলের কান মোচড়াইয়া মহামনস্বী ও মহামাত্যকে সমভাবে বিদায় করিতে পারি, আবার, পরমুহূর্তে ডাকিয়া আনিতে পারি।

কিম্বা দূরান্তরের অন্য কাহাকেও বরণ করিতে পারি—এমনিতর রাজাধিরাজ আমি একালের সাধারণ মানুষ।

এইসব খেয়ালিপনার কথা ছাড়িয়া ও যে সাধারণ লাভ মানুষের ঘটিতেছে তাহা অসাধারণ। সংবাদপত্র যা কিছু মানুষকে জোগায় তাহার প্রায় অধিকাংশ জিনিসই রেডিওর প্রসাদে আরও দ্রুত আরও সহজে মানুষের লাভ হয়। সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ, খেলার খবর ও বাজারের বিবরণ, আবহাওয়া ও তথ্য-পরিবেশন, এই সব তো জানাই যাইবে। তাহা ছাড়া জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের কথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সমস্যার আলোচনা, ব্যবস্থাপিত আলাপ, বিতর্ক, সম্মেলনের সাক্ষাৎ বিবরণ, বক্তৃতা,—এইরূপ নিত্য নূতন কর্মোদ্যোগের তথ্য দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করাও সম্ভব হইতেছে। এমনকি, মহাকাশে নিক্ষিপ্ত রকেট হইতে আকাশ বাণীর প্রসাদে আজ মহাকাশের তথ্যও উদ্ধার করা হইয়াছে। শুধু দুই দশ-জনের জন্য নয়, দুই এক শতের জন্যও নয়, আক্ষুদ্র সমগ্র জন-সাধারণের এত বড় শিক্ষাগার, এত বড় গ্রন্থালয়,—পূর্বযুগের লোকশিল্পীরাও কল্পনা করিতে পারিতেন না। অথচ সেই সঙ্গেই নানা স্তর ও নানা মণ্ডলীর উপযুক্ত যৌথ-শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়—শিশুমহল, নারীমহল, শিক্ষার্থীর আসর, শ্রমিক মহল, কৃষক মহল, পল্লীমহল হইতে চিঠি পত্রের উত্তর পর্যন্ত কত যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও বিবেচ্য। এমন কথা বলিব না, সব দেশে সব সময়ে গণশিক্ষার বা সুশিক্ষার এই মহান্ সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয়; কিম্বা স্কুলে, কলেজে, পার্কে সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে শিক্ষার এই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা যদি না হয় তবে সে দুর্ভাগ্য সেই দেশের। কারণ, আমাদের মতো রাষ্ট্রায়ত্তই হউক, কি মার্কিন মুলুকের মত মুনাফাদারী ব্যবসাই হউক, দেশ যেরূপ শিক্ষা চাহে রেডিও সেইরূপ শিক্ষার আয়োজন করিতে বাধ্য হয়।

শিক্ষার আশ্রয়

শিক্ষার মতোই রেডিও আনন্দের পরম আশ্রয়। সঙ্গীত ও নাটকের সকল ধারাই তাহার মাধ্যমে উন্মুক্ত। যে ওস্তাদের গান বা যন্ত্রালাপ আমরা কালেভদ্রে কলিকাতায় শুনিতাম আজ বেতারে তাহা গ্রামের সাধারণ মানুষও শুনিতে পায়। ফলে, স্বীকার করিতেই হইবে শিল্পী শুধু অর্থগৌরব ও বৃহত্তর সংখ্যক সমজদারের সাধুবাদই লাভ করেন না, সাধারণ মানুষেরও গানের কান, রাগ-রাগিণীরও বোধ ও রুচিও উন্নত হইতে পারে। ইউরোপীয় সঙ্গীত হইতে দক্ষিণী সঙ্গীত পর্যন্ত সকল সঙ্গীতের সম্বন্ধেই শ্রোতার অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে। নাটকের ব্যাপারে তো আমরা জানি টেলিভিশন না হইলে রেডিওতে পাই শুধুই শ্রাব্য নাট্য। কিন্তু যে সব রাজ্যে নানা কারণে রঙ্গমঞ্চ সুপ্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে রেডিওর

আনন্দের আশ্রয়

প্রসাদেই একটা নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়-কলা গড়িয়া উঠিতেছে। অবশ্য, বেতার বিষয়েও অস্বীকার করিবার উপায় নাই—দেশের রুচি, দাবী সম্বন্ধে যদি দেশ সচেতন না হয় তাহা [illegible]কা গানে, বাজে সুরে, বাজে নাটকে দেশের 'কলাবোধ বিপন্ন হয়। আর তাহা যে হয়, ইহা অন্ততঃ আমরা এই দেশে বেশ জানি।

একটা বড় কথা এই সূত্রেই বুঝি—বহুমানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি, ভাব ও কল্পনাকে প্রভাবিত করিবার এই বিরাট উদ্যোগ বোধ হয় এখন সর্বাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। ভারতবর্ষের মত দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শুভাশুভের অনেকখানি দায়িত্ব রেডিওর উপর বর্তিতেছে। ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধ বা সন্ধি পর্যন্ত সকল ব্যাপারের সংবাদের একটা বড় মাধ্যম রেডিও। তাই ইহা সমাজ-আয়ত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং ঠিক এই কারণেই রেডিও-ব্যবস্থা দলায়ত্ত বা শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হওয়াও একটা বিষম বিপদ—সামাজিক বিরোধের তাহা উপলক্ষ ও উপকরণ। এমন কি, রেডিও জাতিগত, রাষ্ট্রগত বিরোধের, কিম্বা ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বিবাদ বিসম্বাদের নূতন অস্ত্রও হইতে পারে, তাহাও জানি। অতএব, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়—বেতার-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই কর্তব্য সাধিত হয় না; রাষ্ট্রকেও দায়িত্ববোধে, জনসাধারণের শুভবোধে, আন্তর্জাতিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হইতে হয়। তবেই রেডিওর যে আশীর্বাদ তাহা বিপদমুক্ত মানুষের লাভ হইতে পারে।

পরিচালনার দায়িত্ব

বিজ্ঞান এক-একটি করিয়া মহৎ সম্পদ মানুষের হাতে জোগাইলে হইবে কি, মানুষ যদি মুনাফার মর্কট-বুদ্ধি বা মালিকানার শ্বাপদ-শক্তি দ্বারাই চালিত হয়, তাহা হইলে উহা তাহার গলায় মুক্তার হারের মতো দুর্দশাই লাভ করিবে। দোষটা মুক্তার হারের নয়, বিজ্ঞানেরও নয়, রেডিওরও নয়; মানুষেরই বৈজ্ঞানিক চেতনায় আপন জীবন গঠনের অক্ষমতা। তবে ইহাও নিশ্চয়—'আকাশে পাতিয়া কান' সে যখন একবার এই বিশ্বব্যাপী মহানিয়মের গান শুনিয়াছে তখন নিজেকেও সেই সুরে নিয়মিত করিবার মত স্বাভাবিক বুদ্ধিও এই অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার আয়ত্ত হইবে। সেই অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন এই সাধারণ মানুষকে লইয়া মহামানবের সমাজ গড়িয়া উঠিবে—ইহাই আসল আকাশ-বাণী।

উপসংহার

চলচ্চিত্রের প্রভাব ॥

সূচনা : সিনেমার উৎকট প্রভাব

যদি সমাজ-বৈজ্ঞানিকরা সব[illegible]তে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, আধুনিক কালের প্রধান নিয়ন্তা কে, তাহা হইলে তাহারা হয়ত বলিবেন—অর্থ। কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে আরও একটু পরীক্ষা করিলে তাহারা বলিবেন, এ যুগের গঠনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—মন্দির নয়, পার্লেমেণ্ট নয়, এমনকি ফটকা বাজার নয়, ফিন্যান্স ক্যাপিটেলও নয়, হলিউড ও দেশে দেশে বিস্তৃত এই 'চর্চ অব্ দি সিলভার স্ক্রিন্'। এ যুগের কিশোরি-কিশোরী ছাত্র-ছাত্রীর সহলে সর্বাধিক বিশ্রুতকীর্তি কাহারা? আর, পৃথিবীর এই ভাবী পরিচালকদের চক্ষে জীবনের কোন্ সার্থকতা দুর্লভ হইলেও সর্বাধিক লোভনীয়? চিত্র-তারকার 'জৌলুষ' জীবন। ছোট হউক বড় হউক, মেজো হউক, সোজা হউক, মেয়ে হউক পুরুষ হউক, স্কুল-পালানো ছাত্র হউক বা দুপুরের নিদ্রা অভ্যস্তা গৃহিণী হউন,—শীতে-গ্রীষ্মে, রৌদ্রে বর্ষায়, যুদ্ধের দিনে শান্তির দিনে, দুর্মূল্যতার দিনে বাজারের পয়সা বাঁচাইয়া, সস্তার দিনে বিশেষ তারকা-মার্কা শাড়ী কিনিয়া, যে মন্দিরের দ্বারে হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টান ইহুদী-পার্শী নাস্তিক-আস্তিক মালিক-শ্রমিক সকলে ভীড় করিয়া দর্শনার্থী, সে মন্দির দেবমন্দির নয়, বিদ্যামন্দির নয়, নাট্যমন্দির নয়, চিত্রমন্দির। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা হইতে, প্রাচীরের বিশাল চিত্র-বিজ্ঞাপন হইতে, রসাল সিনেমা পত্রিকায় শতভঙ্গির "তারকা" চিত্র হইতে, কে এই যুগে উদ্ধার পাইবে? আর, এই উপাসনায় সকলেই সমনিষ্ঠাবান্। শুনিয়াছি ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস্-এর নামে লণ্ডনের পথঘাট লোকের ভিড়ে বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ (১৯২১এ) সখেদে ভাবিয়াছিলেন—'এই জাতিই তো সেক্স্পীয়রের জাতি!' আর, (১৯৫৬ সালেও) সোভিয়েত দেশের অগণ্য নর-নারী যখন ভারতবাসী দেখিলেই সোৎসাহে বলিয়া উঠে 'রাজকাপুর' তখন অনেক কমিউনিস্টই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া ভাবেন, 'ইহারাই তো লেনিনের জাতি।' 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম', 'কমিউ-নিজম্'ও 'ফ্রি-এণ্টার প্রাইজ', সকল ব্যবস্থাই রজতপর্দায় তদ্গতপ্রাণ।

চলচ্চিত্রের প্রধান সার্থ

সত্যই বানরের হাতে বিজ্ঞান মুক্তার হার তুলিয়া দিয়াছে কিনা তাহা ভাবিতে হয়। তবে ইহা যে মুক্তার হার তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ মুনাফার দায়ে চলচ্চিত্রের অপব্যবহার, প্রমোদের নামে যৌন-আবেদনের উৎকট ছড়াছড়ি, প্রাণশক্তির নামে খুন রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ক্রূরতর সমাজ-বিরোধী পাশবতা, নিত্যনূতন যত অদ্ভুত ইতরতা, শ্রীহীনতা, আজগুবি

আচার নিয়ম, বিভ্রম বিলাস,—সিনেমা দুই হাতে যাহা বিলাইয়া মানুষকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছে তাহাইতো সিনেমার স্বধর্ম নয়। ইহা বরং সিনেমার বিকৃতি—বিকৃতি-বিলা[illegible]ন বিচা[illegible]কবর্গের চক্রান্তে মানুষের একটি মহৎ-শক্তির বিকৃতি। এমন কি, [illegible]তে মুনাফার লোভে বিকৃত ক্ষুধার এই ফাঁদ অলিতে-গলিতে পাতা হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষ হইতে এখনো চলচ্চিত্রকে স্বাগতই করিতে হয়। কারণ, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবনে, জীবিকার একঘেয়ে যান্ত্রিক পেষণে, যে শ্রান্তি ও যে শূন্যতা জমিয়া উঠে তাহা হইতে তাহাদের মুক্তি প্রয়োজন। সে 'মুক্তির' সনাতন ব্যবসা চালায় পানশালা ও জুয়ার আড্ডা। উচ্চতর মুক্তি কখনো কখনো জোগায় নাট্যশালা, নৃত্যশালা, সঙ্গীতশালা প্রভৃতি। কিন্তু সাধারণ নর-নারীর পক্ষে উহাদের দক্ষিণা জোগানো প্রায় সময়েই দুঃসাধ্য। যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিতেই ফিল্‌মের মত এইরূপ আনন্দ-পরিবেশনের আয়োজন সম্ভবপর হইয়াছে। যাহা সুলভ ও জনসাধারণের সহজ-আয়ত্ত, সাধারণ মানুষকে সেইরূপ আনন্দের সুযোগদান করিয়াছে,—চলচ্চিত্রের মূল সার্থকতা এই-খানেই। ইহাই তো একালের লোকশিল্প—সে তুলনায় রেডিও, সংবাদপত্রের স্থানও তাহার পরে। ক্লান্তিক্লিষ্ট মানুষের বহু বিক্ষোভ এইরূপে লাঘব না করিলে সামাজিক অপঘাত কম হইত না, তাহাও অনুমেয়।

আর ঠিক এই জনতার চিত্তাকর্ষণের লোভে ও জনতার দক্ষিণার প্রতি-যোগিতাতেই মুনাফাকামীরা ফিল্‌মকে শুধু আনন্দের আয়োজন না করিয়া, বিভ্রম-বিলাসের এবং প্রমোদের নামে লুণ্ঠনের ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যে চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ এই বিষের উৎসে পরিণত হয় নাই তাহার কারণ মানুষের মধ্যে সুস্থ বুদ্ধি মরে না। মিথ্যায় প্রবঞ্চিত বা যৌনাবেদনে প্রলুব্ধ হইলেও জনসাধারণ অসৎ প্রবৃত্তির বশ নয়। এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের সত্যবোধ, কল্যাণবোধ ও সৌন্দর্যবোধও নিতান্ত সামান্য শক্তি নয়। সমস্ত চক্রান্তের মধ্যেও তাহা বারেবারে আত্মপ্রকাশ করে। তাই, প্রকাশের সার্থক যন্ত্র রূপে, শিক্ষার সফল বাহন রূপে, এবং যুগ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে—একই কালে চলচ্চিত্র এ যুগের সৃষ্টি-মুখিতারও প্রধান সাক্ষ্য।

প্রকাশের কথাই ধরা যাউক। প্রকাশের প্রয়োজনে কোনো সময়েই সামান্য নয়। মানুষ তাহার নিজের কথা প্রকাশ করিতে চায়। সমাজও তাহার আপন সত্যের প্রকাশ কামনা করে। ফল-লাভের প্রয়োজনে প্রকাশ ছাড়িয়া তাই প্রচারেরও পথ গ্রহণ করিতে হয়। বৈষয়িক প্রতিষ্ঠানের তো কথাই নাই, সমাজের, রাষ্ট্রের, ও বহুপ্রতিষ্ঠানেরই আপন-আপন তথ্য প্রকাশ বা প্রচার না করিলে চলে না। প্রচার আর প্রকাশ এক কথা নয়,—তথাপি

প্রকাশ শক্তি, প্রচার ক্ষমতা

মানব-কল্যাণে, 'বহুজনহিতায়' যে প্রচার তাহাকেও প্রকাশধর্মে পরিচালনা করিলে ফল আরও সহজগ্রাহ্য ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। চলচ্চিত্র সার্থকরূপে এই প্রচারের নানা কাজ নির্বাহ করিতে [illegible]। আমরা এখনো এদেশের কোনো কোনো 'ডকুমেণ্টারি' বা 'দলিল[illegible]ছবি' হইতেও কতকটা পরিচয় পাই। বস্ত্রশিল্পের প্রচারে বয়নশিল্পের যে চলচ্চিত্র, গৌতমবুদ্ধের জীবন-কথা যে প্রাচীন ভাস্কর্য হইতে রূপায়িত হইয়াছে, কোনারকের ও মহাবলীপুরম্-এর ভাস্কর্যচিত্র, হাতের কাজের আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য জাল, বা হাতি ধরিবার কৌশল প্রভৃতির ছবি,—এইসব দলিল-চিত্র দেশে-বিদেশেও আদরণীয় হইয়াছে। দেশকে জানিবার, বুঝিবার এমন সুযোগ কে দিতে পারিত? অবশ্য ইহা ছাড়াও প্রকাশের প্রয়োজন প্রতিনিয়তই থাকে। সাময়িক সংবাদের ছবি, আর্থিক উপযোগের দৃশ্য, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনাদির যে চিত্রাদি থাকে তাহাতে সংবাদপত্রের সংবাদ চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষ এবং স্বকর্ণে শ্রুত হইয়া উঠে। এই সংবাদের ছবিতে যে প্রচারের বাড়াবাড়ি হয় তাহা আমরা জানি। তবু 'দক্ষিণমেরু অভিযানের চিত্র', হিমালয় অভিযানের ফরাসী চিত্র, ইহাও যে সংবাদ চিত্র তাহা ভুলিবার নয়। এইসব দেখিয়া দেখিয়া শুধু সংবাদই জানি না, অনুভব করি শত সত্ত্বেও পৃথিবী বিচিত্র, আর মানুষের মহিমারও অন্ত নাই। অর্থাৎ সংবাদও চলচ্চিত্রে প্রাণ লাভ করে। এমন কি, বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও দুষ্পাচ্য না হইতে পারে। তৈল কোম্পানির বিজ্ঞাপনোদ্দেশ্যে গৃহীত ও ফ্লাহার্টির 'লুসিয়ানা ডেস্' দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কয়জন বিজ্ঞাপন-দাতার এমন শুভবুদ্ধি হইবে—অমন চিত্র তৈয়ারী করাইবে?

বলাবাহুল্য, সমাজ-কল্যাণ প্রচারের সঙ্গে শিক্ষা-প্রচারের পার্থক্য বিশেষ নাই। তথাপি শিক্ষার উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র বহুভাবে প্রকাশ-আয়োজন করিতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক ফিলমের সহায়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও আনন্দ দুইই বর্ধিত করা হয়। অনেক বিদ্যালয়েই চিত্রাগার আছে। অনেক 'ডকুমেণ্টারি' এই দিকে সার্থক প্রয়াস। তাহা ছাড়া জীবনী-চিত্র—সে মাদাম কুরির, জোলার, পাবলোবের কিম্বা জগদীশচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের জীবনী-চিত্রও হইতে পারে,—যে মহৎশিক্ষার আকর তাহাও প্রত্যক্ষ। অবশ্য ধর্মশিক্ষার চিত্রও আছে। কিন্তু তাহাতে সময়ে সময়ে এতই উৎকট প্রচার থাকে যে, নিতান্ত সরলবুদ্ধি মানুষ ছাড়া সেরূপ ধর্মশিক্ষায় কেহ সাড়া দিতে পারে না। ইতিহাস ভূগোল, প্রাকৃতবিজ্ঞান, এমন কি মহাকাশিক অভিযানের এত বিচিত্র শিক্ষা-সম্পদ মানুষের হাতে আছে যে, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের পক্ষে কোনো সময়ে স্থূল বিষয় বা স্থূল পদ্ধতি গ্রহণ করিবার কারণ নাই। কত দেখিব? একবার ওয়ালট্ ডিস্নের 'দি লিভিং ডেজার্ট' এর মত একখানি

শিক্ষা-বিস্তার

ফিল্‌ম দেখিলেই মনে হইবে এত শিক্ষা টনে টনে পুঁথি গিলিয়াও পাইতাম না।

যে শিল্প মহৎ, প্রকাশ হিসাবে তাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; আর আনন্দের মধ্য দিয়াই তাহা পরম শিল্প হইয়া উঠে। তথাপি শিল্পকলার প্রধান লক্ষ্য সৃষ্টি, আর সৃষ্টির মধ্য দিয়া আনন্দদান—যাহার আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে। কাজেই, শিক্ষা-প্রধান চলচ্চিত্রকেই সর্ব কারণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। একই কালে প্রকাশের, শিক্ষার ও আনন্দের জন্য তাহার সার্বিক সার্থকতা। আবার একাধারে চিত্রের রূপায়ণ কলা, নাটকের ঘটনা-ধর্মী গতিময়তা, সঙ্গীতের আবেদন—এক কথায় চিত্র, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রধান শিক্ষা-মাধ্যম সমূহের সমন্বয় করিয়া চলচ্চিত্রই বিংশ শতকের 'যুগশিল্প' হইয়া উঠিয়াছে। হলিউড্ যতই চলচ্চিত্রকে আফিমের মত প্রয়োগ করিয়া দর্শকদের আত্মবিস্মৃতি করিতে চাহুক, প্রতি দেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-শিল্পীই তাহার মধ্য দিয়া প্রাণপণে মানুষের আত্মপরিচয় মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে। ইঁহাদেরও নাম এক-আধটি নয়, ঐরূপ চিত্রও এক আধ শত নয়। আইজেনস্টাইন-পুদোভকিন্-দবশেংকোর যুগ শেষ হয় নাই, চার্লি চ্যাপলিনের হলিউড ত্যাগেও সে ধারা শুকাইবে না। জাপানে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, আর এই মুহূর্তে পোল্যাণ্ডেও, তাহার অদ্ভুত স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আজ বিচিত্র তরঙ্গময়। আর এই কথাই বা ভুলিব কেন—ভারতবর্ষও সেই যুগশিল্পের আসরে স্থান পাইয়াছে। বরং বাঙলা সাহিত্যের মতোই বাঙলা চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়ের দানে পৃথিবীতে স্বীকৃত—আমাদের সংস্কৃতির দুর্দিনে তাহা কি কম অর্থপূর্ণ ঘটনা?

উপসংহার

তাই বলিতে হয়, চলচ্চিত্রের প্রভাব শুধু তরুণ-তরুণীর চলচিত্ততা ও লঘুতা দেখিয়া অনুধাবন করা যায় না। উহার ভবিষ্যৎও শুধু এই মুনাফা-তন্ত্রের পরিবেশন-দুষ্কৃতি হইতে অনুমান করা উচিত নয়। মুনাফার মর্কট-বৃত্তি নিঃশেষ হইলে, বা সমাজ-হিতে এই শিল্পটি নিয়ন্ত্রিত হইলে, চলচ্চিত্রেরও সত্যকারের মুক্তিক্ষণ আসিবে। এই বন্ধন দশার মধ্যেও কল্যাণকামী রাষ্ট্র, এবং বহু দেশের নিরপেক্ষ শিল্প-মণ্ডলী নানা প্রদর্শনী, পুরস্কার ও পারিতোষিক দানে চলচ্চিত্রকে কতকটা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে সাহায্য করিতেছে। নিশ্চয়ই সর্ব সময়ে ইহারাও নিঃস্বার্থ ও অভ্রান্ত নয়, তথাপি ইহারা অনেকাংশে সমাজ-মঙ্গল ও কল্যাণবোধের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ। আসল কথা সব সময়েই এই—জন-চিত্তের অন্তর্নিহিত সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হইলেই চলচ্চিত্রের আসল মঙ্গল।

॥ মহাকাশ অভিযান

মহাদার্শনিক কাণ্টের একটি কথা আছে : "দুইটি জিনিসে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না—উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ আর নিম্নে মানুষের মানস-লোক।" জ্যোতির্বিজ্ঞান সেই আকাশের রহস্যকে দূর হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতেছিল বিস্ময়ের সীমা যেন আরও পিছাইয়া যাইতেছে। এমনি সময় আরম্ভ হইল মহাকাশ-অভিযানের যুগ—মহাশূন্যের রহস্য নিকট হইতে অনুসন্ধান করা চাই।

সূচনা

এই সেই দিন ১৯৫৭এর অক্টোবরের প্রারম্ভে ২।৩ তারিখে বিশ্ববাসী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া শুনিল মানুষের হাতে গড়া এক নূতন চাঁদ জন্মিয়াছে, সোভিয়েতের প্রেরিত 'রকেট' ৩রা অক্টোবর মহাশূন্যে যাত্রা করিয়া পৃথিবীর নূতন উপগ্রহ রূপে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করিয়াছে। ইহাই প্রথম 'স্পুৎনিক' বা সহযাত্রী। চমৎকৃত পৃথিবীর বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই একমাস পরেই (৩রা নভেম্বর) 'দ্বিতীয় স্পুৎনিক' প্রথম জীবন্ত প্রাণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করিল। আরও তিনমাস পরেই (১লা ফেব্রুআরি, ১৯৫৮) মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের 'রকেট 'আলফা—১৯৫৮'ও সেই মহাশূন্যের পথে তাহাদের অনুবর্তী হইয়াছে, জানা গেল। ছয়মাস অতিবাহিত না হইতেই, ১৫ই মে, ১৯৫৮, 'তৃতীয় স্পুৎনিক' পৃথিবীর আরও ঊর্ধ্বে পৃথিবী পরিক্রমা আরম্ভ করিল। আর শুধু তাহাই নয়, জানা গেল, এই 'তৃতীয় স্পুৎনিক' আবার অক্ষতদেহে পৃথিবীতে ফিরিয়াও আসিতে পারিবে। আকাশ অভিযান যখন সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানের প্রয়াসে প্রায় 'পরিচিত বিস্ময়' হইয়া উঠিতেছে, তখন ১৯৫৯এর ২রা জানু-আরি আর একবার চমক ভাঙ্গিয়া মানুষ শুনিল সোভিয়েতের উৎক্ষিপ্ত নূতন আর এক 'রকেট' পৃথিবী ছাড়াইয়া, চন্দ্রলোক ছাড়াইয়া, সূর্যলোকে যাত্রা করিয়াছে—চার পাঁচ দিনের মধ্যেই (৭।৮ জানুআরি) তাহা মানুষের সৃষ্ট সূর্যের প্রথম গ্রহ রূপে সূর্যপরিক্রমা করিয়া চলিল। মানুষের স্বপ্ন যেন মহাকাশ ছুঁইল; তাই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই গ্রহটির নাম দিয়াছেন 'মেচ্‌তা' বা স্বপ্ন। ঠিক ছয় মাস পরে (২রা জুলাই ১৯৫৯) আর একটি 'রকেট' আর এক দিকে নূতন বিজয়-যাত্রার সাফল্য লইয়া আসিল—দুইটি কুকুর ও একটি খরগোস, এই তিনটি জীবন্ত প্রাণীকে বুকে লইয়া মহাকাশ ঘুরিয়া আবার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই জীবন্ত প্রাণী তিনটি সহ রকেটটি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। তারপর ১৯৬০এ সোভিয়েত 'স্পেস্‌শিপ' দুইটি কুকুর লইয়া মহাকাশ ঘুরিয়া

'স্পুৎনিক হইতে 'মেচ্‌তা'

ফিরিয়া আসিল। আর, ১৯৬১ (ফেব্রুয়ারি) শুক্র গ্রহের দিকে তাহাদের বিরাট রকেট স্টেশন চলিয়াছে। এদিকে মার্কিন রাষ্ট্রও সমান তালে ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতে ছাড়িতেছে না। [illegible]সরও অতিবাহিত হয় নাই, ইহার মধ্যে স্পুৎনিকের পথে যেন যাত্রীর [illegible]গিয়া গিয়াছে—আর বিস্ময়েরও বিদ্যুদ্দীপ্ত তেমনি বাড়িতেছে।

একটির পর একটি প্রয়াসে এইরূপে ত্বরিতগতিতে যখন মহাকাশের দ্বারের পর দ্বার খুলিয়া যাইতেছে, তখন ইহাও বুঝিতে পারি সেই দ্বারের দিকে মানুষের কল্পনা ছুটিয়া গিয়াছে কত কত কাল ধরিয়া; তারপর আরও কত কাল ধরিয়া তাহাতে জানিয়া না-জানিয়া একটির পর একটি করাঘাত করিয়াছে কত দেশের মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও প্রয়াস; শেষে একটি মুহূর্তে বিস্মিত পৃথিবীর সম্মুখে সেই প্রথম দ্বার খুলিয়া গেল ১৯৫৭ এর ২।৩রা অক্টোবর স্পুৎনিকের সাফল্যে। বিজ্ঞানের কোনো সাফল্যই কাহারও একার নয়, কাহারও একচেটিয়া থাকিতেও পারিবে না। বৈজ্ঞানিকগণের এক জনার হাত হইতে মশাল তুলিয়া লইয়াছেন অন্য একজনা, হয়ত ভিন্ন দেশে, এমন কি ভিন্নকালেও। ইহাই আনবিক শক্তির বেলা ঘটিয়াছে, ইহাই মহাকাশ অভিযানেও ঘটিতেছে। যে 'রকেট' বা হাউই'র তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া মহাকাশ অভিযান অগ্রসর হইয়া গেল তাহাও তো প্রাচীন চীন হাজার বৎসর পূর্বেই জানিয়াছিল। ভারতবর্ষে আমরাও 'আতসবাজির' ছটায় ইউরোপের চোখকে চমকাইয়া দিয়াছি। জ্বালানি পুড়াইয়া বায়বীয় চাপ সৃষ্টি করা যায়, আর তাহার ধাক্কায় হাউই ছুটিয়া চলে। যদি তেমন জ্বালানি লাভ করা যায়, আর পর্যায়ে পর্যায়ে সেই চাপ ও ধাক্কার সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে রকেটের ঊর্ধ্বগতি অনেকদূর বাড়াইয়া ফেলা যাইবে—ইহা প্রায় 'গাছ হইতে আপেল মাটিতে পড়ার' মতই সহজবোধ্য। তথাপি পদার্থবিজ্ঞানের ও রসায়নের আরও বহুদিককার জ্ঞানকে অধিগত করিয়া তবে গত মহাযুদ্ধে জার্মানির "ভি—২"র মত ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত হইল—উহা রকেটেরই একটা লক্ষণীয় বিকাশ। ১৯৫৪ সাল হইতে শূন্যাভিযানে ইহার ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োগও কল্পিত হয়।

'রকেটের' পদ্ধতি

ঠিক যেই সময়ে স্পুৎনিক প্রস্তুত হইতেছিল তখনি 'আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষের' (১লা অক্টোবর, ১৯৫৭) পূর্বাহ্নে আমেরিকা জানাইয়াছিল মহাকাশে তাহাদের রকেট ও কৃত্রিম গ্রহ প্রেরণের দিনও সন্নিকট। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের বহুতথ্য তাহা উদ্ধার করিবে। 'স্পুৎনিক' অবশ্য বিনা বাগাড়ম্বরে তখনি সেই গৌরব আপনার করিয়া লইল। তিন পর্য্যায়ের রকেটে সেই উপগ্রহটিকে ৫৬০ মাইল ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিল—ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে প্রথম স্পুৎনিক ২ মাস ধরিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিল। যে-যে-ভূপদার্থ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য উহার সহায়ে লাভ হয় তাহাও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীকে জানাইতে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকগণ ত্রুটি করেন নাই। বহু-

পর্যায় যে রকেটের মাথায় ১ম, ২য়, ৩য় উপগ্রহগুলি বসানো ছিল তাহার মধ্যে ঐ উদ্দেশ্যে ছিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। সেই সব বিভিন্ন স্পুৎনিকের মডেলও চিত্রে প্রদর্শনীতে সোভিয়েত দে[illegible] বেড়ায়, উহার প্রায় সকল বিবরণই এখন সর্বদেশের বিদিত। এক[illegible] রকেট এক একটি ধাক্কায় চালাইয়া ইহাকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া নিচে পড়িয়া যায়। প্রথম রকেট এইভাবে 'ট্রপোস্ফিয়ার'ও 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' পার করিয়া দিয়া পড়িয়া যায়, দ্বিতীয় রকেট এই অ্যালুমিনিয়মের 'উপগ্রহকে' 'আয়োনোস্ফিয়ারে' উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। শূন্যে পরিক্রমা করিতে লাগিল শুধু 'উপগ্রহ'।

ডিম্বাকার কক্ষপথে স্পুৎনিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক-একবার পৃথিবীর নিকটে আসে, মেচতা আসে সূর্যের নিকটে,—আবার দূরে চলিয়া যায়। পৃথিবীর নিকটে আসিলে বায়ু সংঘর্ষে তাহার গতিবেগ কমে, পরে বৃত্তাকার হইয়া আসিতে থাকে, শেষে স্পুৎনিকের আয়ু ফুরায়। অবশ্য তৃতীয় স্পুৎনিক হইতে এইরূপ উপগ্রহকে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

কী সেই জ্বালানি যাহার গুণে এই রকেট উৎক্ষেপ সম্ভব, কী সেই যন্ত্রপাতির বৈচিত্র্য, আর, শেষ পর্যন্ত, কীই বা সেই সমুন্নত নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যাহাতে সজীব প্রাণী সুদ্ধ 'সৌর গ্রহকে' এখন নির্দিষ্ট স্থানে নামাইয়া আনাও সম্ভব হইতেছে? এইসব তো মানুষের সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু কারুবিজ্ঞানের, গণিতের, এবং উচ্চ বিজ্ঞানের বহুদিকের ক্ষুদ্র বৃহৎ শত সমস্যার যে জ্ঞাত ও সম্ভাব্য সমাধান এই সূত্রে বৈজ্ঞানিক জগতের গোচর হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট ধারণাও সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সুসাধ্য নয়। একথা বুঝিতে পারি, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে নাই সেখানকার তথ্য এখন ক্রমশঃই গোচর হইবে। যেমন, উর্ধ্বের কোন্ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব কি, উষ্ণতা কিরূপ, আর্দ্রতাই বা কতটা, এই সব তথ্য। তাহা ছাড়া, সহজ বুদ্ধিতেও বুঝি মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধেও নূতন তথ্য আয়ত্ত হইবে—যেই সময়ে (২রা জুলাই) নূতন গ্রহ প্রাণী তিনটিকে লইয়া সূর্যলোকের কক্ষ হইয়া ফিরিয়া আসিল তখনি (৬ই হইতে ১৩ই জুলাই ১৯৫৯) মস্কোতে 'আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক রশ্মির সম্মেলন' আরম্ভ হইতেছিল। সোভিয়েত মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক দমিত্রি স্কোবেলৎসিন এই গ্রহ উপগ্রহের মারফৎ প্রাপ্ত মূল্যবান্ তথ্য সম্মেলনে ব্যাখ্যা করেন। বৈজ্ঞানিকগণ সেই প্রাণী তিনটিকেও দেখিয়াছেন এবং মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের তথ্য ও গবেষণাও শুনিয়াছেন। নিশ্চয়ই "কোয়ান্টাম রশ্মি পরিচালিত ভবিষ্যতের মহাব্যোমযান" সম্বন্ধে যে গবেষণা সোভিয়েত বিজ্ঞানে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও জানিয়াছেন। অতি-বেগুনী রশ্মি ও একস্-রশ্মি বিষয়ে পৃথিবী হইতে জানিবার উপায় নাই ;—

বিজ্ঞানের গবেষণা

উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আকাশ হইতেই এখন আহরণ করা যাইতেছে। আর আমাদের আয়ন-মণ্ডল এই রশ্মি দুইটির উপর নির্ভর করে; দূর পাল্লার বেতারবার্তায় আবার এই আয়ন-মণ্ডলের প্রভাব সমধিক। তাহা ছাড়া পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ে, এবং জীবের দেহে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই ক্ষেত্রের বাহিরে কোন্ কৌশলে প্রাণরক্ষা সম্ভব, ইত্যাদি অজস্র তথ্য বিচার বিবেচনার জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে।

কিন্তু এই সব অপেক্ষাও সাধারণ ভাবে অধিক চিন্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে—সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য। সোভিয়েত যদি ক্ষেপণাস্ত্রের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখে তাহা হইলে কি পৃথিবীর মুনাফা-তন্ত্রী সাম্রাজ্যের দুশ্চিন্তার কথা নয়? মার্কিণ রাষ্ট্র অবশ্য ক্ষেপণাস্ত্রে এখন (১৯৬১) সোভিয়েতের সমকক্ষ; তবে রকেট্-বিদ্যায় সমকক্ষ নয়। সোভিয়েত যত আণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র বন্ধের কথাই বলুক, যত সহ-অবস্থান নীতিই চাহুক, আসল কথা মৃত্যুদণ্ডের ও শাসনদণ্ডের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র শোষণবাদের নেতা আমেরিকারই থাকা চাই। না হইলেই তাহার দুশ্চিন্তার কথা। খ্রুশ্চভ যদি ডাক দিয়া বলেন, "স্পুৎনিকের প্রতিযোগিতায় সকলে যোগদান করুন", তাহা হইলে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে হইবে 'না'। এ যেন সেই ধরনের কথা "জ্ঞানের মশাল আর কাহারও হাতে জ্বলিলেই ভয়ের কথা। কারণ, সেই মশালে এই মানুষ কখন আমার ঘরেও তো আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। অতএব জ্ঞানের মশাল একমাত্র আমারই হাতে থাকিবে।"

এই বিকৃত ও বিষাক্ত মানসিকতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবার কাণ্টের কথা স্মরণ করিতে হয়—সত্যই মানুষের মানস গতির উপর আমরা কতটুকু নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিয়াছি? মানব-মহিমার পার্শ্বেই যদি এতখানি সর্বগ্রাসী নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্বেষ জমিতে থাকে, তাহা হইলে মহাকাশ বিজয়েও মানুষ আপনার ধ্বংসগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না। স্পুৎনিক এই সত্যই নির্দেশ করিয়াছে—এই পৃথিবী মহাবিশ্বের সহযাত্রী, প্রতিটি মানব-গোষ্ঠীও এখানে পরস্পরের সহযাত্রী ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।

।। বাঙলা[illegible]ত ।।

এত কি ছাই জানিতাম। ছেলেবেলায় ঠাকুরমা ও পিসিমায়ের কাছে মানুষ হইয়াছি—বাবা ছিলেন রেলের কর্মচারী। বাঙলা দেশের বাহিরেই

সূচনা :
বৃদ্ধাদের দান

তখনো তাঁহার জীবন কাটিত; কখনো বেশ দূরে, কখনো একটু নিকটে। মাও যাইতেন তাঁহার সঙ্গে, —বিদেশে উপার্জনক্ষম মানুষটিকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সুস্থ রাখিয়া ছোট ভাইবোনদের সামলাইতে; তাঁহার দিন কাটিত জনমানববর্জিত রেলস্টেশনের কোয়ার্টারে: জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে আমি প্রথমে ঠাকুরমার কাছে রহিয়া গিয়াছিলাম। আদর লাভ করিয়া সেই যে গ্রামের বাড়িতে তাহার কাছটি জুড়িয়া বসিলাম, তাহার পরে আমার নিঃসন্তানা বিধবা পিসিমা বা আমার বর্ষিয়সী ঠাকুরমা কাহাকেও আমি আর ছাড়িতে চাহিলাম না। দুই একবার বাবা মার কাছে গিয়াছি—রেল ভ্রমণটাই ছিল তাহার প্রধান আকর্ষণ; কিন্তু সেখানে থাকিবার কথা উঠিলেই বাধা দিতাম। একটা বড় কারণ ছিল—গ্রামের বাড়িতে লেখাপড়ার উপদ্রব কম, পাঠশালায় যাওয়া আসাও ছিল আমার ইচ্ছাধীন। পিসিমা তাড়না কযিলে ঠাকু'মায়ের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া কিভাবে সেই তাড়নাকে রোধ করিতে হইবে, তাহা কেহ না বলিলেও নিজেই শিখিয়া লইয়াছিলাম। অবশ্য, দুই একদিন হাঁড়িকুড়ি লইয়া উঠানে খেলিতে খেলিতে শ্রান্ত হইয়া নিজেই আবার পাঠশালায় গিয়া বসিতাম।

পিসিমা তখন পরিহাস করিয়া বলিতেন, "কি হল, তোর পুতুলরাণীর জন্য পাত্র পেলি না বুঝি? পাবি কি? যে মেয়ে লেখাপড়া শেখেনি, তার সঙ্গে কে বিয়ে দেবে তার ছেলের?" বুঝিতাম, কথাটায় সত্য আছে। নিজেও তাই আবার স্লেট লইয়া, পেন্‌সিল লইয়া বসিতাম।

এমনি অবস্থার নিজেই জোর করিয়া পাঁচ বৎসর বয়সে লইয়া বসিলাম 'মাঘ-মণ্ডলের ব্রত'। সঙ্গিনীরাও অনেকে তখন নানা ব্রত লইতেছে। মনে

একটি ব্রত
'মাঘ মণ্ডল'

মনে তাই হিংসা হইতেছিল। ঠাকু'মা হয়ত পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, পিসিমায়েরই ছিল দ্বিধা। "লেপ কাঁথা ছাড়িয়া মাঘের ভোরে উঠিবেন কি তোমার রাজরানী?" তারপর, কবে ওর বাবা-মা আসিয়া লইয়া যাইবে; তখন ব্রত যাইবে কোথায়?" ইত্যাদি। কিন্তু কার্যকালে দেখিলাম ব্রতের যত আয়োজন পিসিমাই সব ঠিক করিলেন। আর দুই দিন পরেই নিজে দেখিলাম মাঘের

প্রত্যুষে সেই লেপ ছাড়িয়া ওঠাও সত্যই খুব আরামের নয়। তবু ওদিকে পুকুরের অন্য ঘাটে পাড়ার মেয়েদের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে—

‘ওঠো, ওঠো [illegible] ঝিকিমিকি দিয়া,
ঘরে আছে সু[illegible]দার কন্যা তুল্যা দিমু বিয়া।’

এমন অবস্থায় শুইয়া থাকাও সম্ভব নয়; তাই উঠিতাম; পিসিমায়ের উপর উল্টা রাগ করিতাম, “ডাকলে না কেন? ওবাড়ির মেয়েরা ব্রত শুরু করিয়া দিয়াছে।”—যেন পিসিমাই শয্যা ছাড়িয়া উঠেন নাই। ঠাকু’মাকে বলিতাম; “তুমিই বা কি করিতেছ? শেষ রাত্রি হইতে তো বাড়িতে গোবর-ছড়া দিয়া ফিরিতেছিলে। কেবল আমাকে ডাকিতে পারনা।”—দোষটা যেন তাঁহাদের। কোনো মতে চোখে মুখে জল দিয়া আমিও গিয়া বসিতাম সেই পুকুরের ঘাটে, উচ্চ কণ্ঠে সুয্যি ঠাকুরকে আহ্বান জানাইতাম। দেরী হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বরের জোরে সেই ত্রুটি সুয্যিঠাকুর সামলাইয়া লইতে বাধ্য হইবেন, ‘রাউলের ব্যাটা গঙ্গাধরও’ বিবাহের জন্য সাজিয়া আসিবেন। কিন্তু বিবাহের আয়োজনের রিক্ততায় সকলেই খিলখিলাইয়া হাসিতেছে। তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতাম পরিহাস-প্রবণা মালিনীদের,

“হাসিস না-লো মাল্যানীরা তোরা আমার সই।
মাঘমণ্ডলের ব্রত করুম, ফুল পামু কই।”
“আছে আছে লো ফুল, মাল্যানীদের কাছে।
মাঘ-মণ্ডলেয় ব্রত করতে তুল্যা দিমু হাতে।”

মালিনী, তিলেনী, ব্রাহ্মণী, গ্রামের প্রত্যেকেই হাসিয়াছেন, কিন্তু সকলেই আবার উদার চিত্তে তুলিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের দান—ফুল, তেল, পৈতা,—এমনিতর বরের সব সজ্জা উপকরণ। কারণ প্রত্যেকের দান কুড়াইয়া লইলে আমার কন্যা-বিবাহ সম্পূর্ণ হইবে না; সকলের সঙ্গেই যে আমার ও আমার কন্যা-কুটুম্বের জীবন জড়িত।

পুকুর ঘাটের ব্রত কথার শেষে ফিরিয়া আসিতাম বাড়ির উঠানের ‘মণ্ডল’ অর্চনায়। প্রতি বৎসরে একটি করিয়া মণ্ডল-রেখা বাড়িয়া সাত বৎসরে

মণ্ডল চিত্রণ

সপ্তমণ্ডলে তাহার সম্পূর্ণতা হইবে; ব্রত-সাঙ্গের মহৎ সৌভাগ্য তখন আমার লাভ হইবে। বাড়িতে এদিকে আগেই কিন্তু ‘বামুন জ্যেঠাই’ মণ্ডল আঁকিতে বসিয়া গিয়াছেন। ইটের লাল গুঁড়া, কয়লার কালো গুঁড়া, চালের শাদা গুঁড়া, হলুদের হলুদ—এমনি নানা রঙের গুঁড়া পিসিমাই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বামুন জ্যেঠাই’র কুলাইবে না। নিজেও ঘরে বসিয়া নূতন রঙের গুঁড়া

তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহা লইয়া বসিয়াছেন। আমি নূতন ব্রত লইয়াছি—মাত্র এক মণ্ডল এ বৎসর তাঁহাকে আঁকিতে হইবে। তথাপি তাহাতেও মণ্ডলের ঊর্ধ্বে উষ্ণীষ উপবীত-ধারী বৃ[illegible] সূর্যদেব থাকিবেন। চোখ, মুখ, কেশ গুম্ফ সবই তাহার পিঙ্গলে [illegible]চিত্র। নিম্নে নৌকাকৃতি অর্ধচন্দ্র, শঙ্খধবল কমকান্তি। উপকরণ থাকিলে, হাত থাকিলে এই অঙ্কেনও কি না করা যায়—'বামুন জ্যেঠাই' তাহাই যেন দেখাইয়া দিতেন। রেখার কি আশ্চর্য নিশ্চিত ঋজুতা—বৃত্তাকারে কি তার সরল স্নিগ্ধতা। লোভ হইত—নিজেও টান দিই। সেইরূপ শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন বামুন জ্যেঠাই ও পিসিমা, 'আঁক দেখি এই মণ্ডলের পার্শ্বে চিরুনি, দর্পণ'। কিম্বা, 'ঐ ধানছড়া ও নৌকা', অথবা 'ঐ শঙ্খ ও পদ্ম।' কিন্তু আমার যে আঁকিবার শখ—শুধু পদ্ম নয় শঙ্খ নয়, সেই পদ্মলতা, শঙ্খলতা, কলালতা—নামহীন এমন কি, কস্মিনকালে কেহ দেখে নাই এমন লতার পর লতা—পাতার পর পাতা, আঁকের পর আঁক—ইহাই তো আমাদের বাঙলা দেশের আলপনা।

রৌদ্র উঠিতেছে—মণ্ডল পূজা শেষ না করিলেই নয়। নিচেকার অঙ্কিত 'খাটে' দাঁড়াইয়া আবার প্রার্থনা জানাইতাম—সুখের কামনা, সাধের কামনা। ধনজন, স্বামী-পুত্রকন্যা, তারপর পিতৃকুলের সৌভাগ্য, শ্বশুরকুলের ঐশ্বর্য, আরামের আশা বিলাসের স্বপ্ন—নিয়ম-ধরা ছড়ায় কত কি যে চাইতে থাকিতাম, তাহাতে সেই বয়সেও কখনো লজ্জায়; কখনো মজায় হাসিতাম। 'সতীন কাঁটা'কে যেভাবে হেনস্থা করিবার কথা বলিতাম তখনো তাহা ভাবিয়া হাসিয়াছি। সতীন আবার আসিবে কেন? সে যুগ কি আর আছে? সতীন এমন পর কি? আমাদের দুগ্‌গার 'বড় মা', 'ছোট মাকে দেখিয়াছি; শুনিয়াছি তাঁহারা সতীন। কিন্তু তাঁহারা তো বেশ আছেন—দুই বোনের মত। অবশ্য দুগ্‌গার বড় মা সন্তানহীনা। কিন্তু তাঁহার ছেলেমেয়ে থাকলেই কি তাঁহারা দুইজনে খুনাখুনি করিতেন? সতীন থাকিলেই সতীনের পুত্রকন্যাদের পর্যন্ত অমন করিয়া শাস্তি দিতে হইবে নাকি? ঠাকু'মা বলিতেন—'দিতিস কিনা দেখতাম যদি জন্মাতিস আমার ঠাকু'মায়ের আমলে। সাত-সাতটা সতীনের সংসারে তিনি ছিলেন কর্ত্রী'। আমি ভাবিতাম—তাহারা প্রত্যেকেই যদি এই ব্রত করিতেন, তবে তাঁহাদের কয়জনার নাক-কান তখন অক্ষত থাকিত? অবশ্য এমন করিয়া বলিবার মত বয়স আমার তখন নয়। তবে জিনিসটা বড়ই কৌতুকজনক বোধ হইত। পরে সবে মিলিয়া কোথায় তাল কাটিয়া গেল—তখন তাহা কিন্তু মনে হয় নাই—কেবল মনে হইত এই মজার কথাগুলি মিথ্যা।

মণ্ডল পূজার পরে মুখে জল দিতাম। মনে হইত—হাঁ, একটা কাজের মত কাজ করিয়া দিনটা আরম্ভ হইয়াছে। সারাদিন মণ্ডলের শোভা লক্ষ্য করিতাম। পাড়ার দুষ্ট্‌ ছেলেরা আমাদের মেয়েদের হিংসা করিয়া এই অঙ্কিত

মণ্ডল কখন নষ্ট করিয়া দিবে, সেই ভয়ও করিতাম। এমন দিনে নিশ্চয়ই পাঠশালায় যাওয়া নিরর্থক—একটা কাজের মত কাজ করিয়াছি। কিন্তু পিসিমা তাহা বুঝিতে চাহিবেন [illegible] আর ওদিকে বেলা বাড়িলে খেলিবার জন্য কাহাকেও আর পাওয়া যায় [illegible] ব্রত ও আমাকে পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া সকলেই কাজে চলিয়া যায়। একটা খেদ মনে লইয়াই তখন আমিও গিয়া পাঠশালায় বসিতাম।

নানাবিধ ব্রত

তিন বৎর পূর্ণ হইয়াছিল—মনে হইয়াছিল যথানিয়মে ব্রত সাঙ্গও হইবে। এমন কি, ইতিমধ্যে আরও দুই একটা ব্রতও লইয়া ফেলিয়াছি। মাঘের সন্ধ্যায় 'তারা-ব্রত' করি, পিটুলি গুলিয়া 'খাট' আঁকিতে আমিও শিখিয়াছি। জল কামনায় 'পুণ্য পুকুর ব্রত'ও করিব, কিন্তু বুঝিতেছি মানুষের কামনার শেষ নাই, ব্রতেরও শেষ নাই। আমরা যখন ধন-জন-কামনা করিয়া ছড়া, ব্রতকথা দিয়া ও আলপনা আঁকিয়া বামুন-জ্যেঠাই ও পিসিমাদের নেতৃত্বে এই সব আমাদের মেয়েলি ব্রত করিতেছি, ওদিকে তখন যে চাটুজ্যে গিন্নী, বেনে পিসি, মিস্তির জ্যেঠাই পুরোহিত-ব্রাহ্মণ লইয়া ব্রাহ্মণ ভোজ ও দান-ধ্যানের জোয়ার তুলিয়া করিতেছেন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাবিত্রী ব্রত, কার্ত্তিকেয় ব্রত কিম্বা অক্ষয়-তৃতীয়া বা শিবচতুর্দশীর মত তিথিব্রত। শুধু কি তাহাই? দেখিলাম তিথি ব্রতের মত ছোটখাটো দেবদেবীর ব্রতও তো কম জাঁকিয়া বসে নাই—শুভ চণ্ডীর ব্রত, অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত, নাগ পঞ্চমীর ব্রত—ইহা শাস্ত্রে মন্ত্রে কোথাও ছিল না। কিন্তু এখন ইঁহারা 'কুল' দেবতা। এই সব ব্রতে নৈবেদ্য আছে, দক্ষিণা আছে, ঘটা আছে। তবু এই ব্রতগুলির 'কথাও' কি দেবতাদের কম কৃতিত্বের প্রমাণ। আমাদের পাড়ায় বামুন-জ্যেঠাই সে কথাকে এমন করিয়া জমাইয়া তোলেন যে, কোথায় লাগে তাহার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প? মনে হয় উহাতো ভীম-অর্জ্জুনের কথা নয়—যেন আমাদেরই গ্রামের ভীমা জেলে ও তার বউ-ছেলের দুঃখ-সুখের কথা। ধনপতি শ্রীমন্তই বা এমন কি ফোর্ড, রথস্‌চাইল্‌ড্‌?

কিন্তু বলিয়াছি—তিন বৎসর পরে একদিন সত্যই আমার এই চিন্তায় একটা ছেদ পড়িয়া গেল। বাবা-মায়ের কাছে যাইতে হইল, কারণ লেখাপড়া না শিখিলে চলিবে না—সেই গাঙ্গুলী পিসিরই যুক্তি আর কি। রেল কলোনিতে আর সূয্যি ঠাকুরকে ঝিকিমিকি দিয়া উঠিতে হয় না—ইঞ্জিনের তীব্র চীৎকারে ও কালো ধোঁয়ায় পালাইয়া বেড়াইতে হয়।

চিরন্ত বনাম আধুনিকতা?

সেই মালিনীরাই বা কোথায়, সেই আমার ব্রাহ্মণকন্যারাই বা কোথায়? মায়ের উদ্যোগে ব্রত শেষ করিতে করিতে ক্রমেই যেন বুঝিলাম—যেখানে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সেখানে সুন্দর—শিশুরা মায়ের কোলে, পাহাড়ীরা পাহাড়ের বুকে,—আমাদের মেয়েলি ব্রত আমাদের গ্রামের মেয়েদের জীবনে। আরও

বুঝিলাম—সেই অক্ষয় তৃতীয়া, সেই দধি সংক্রান্তি, সেই অরণ্য ষষ্ঠী—এককালে দেবদ্বিজের, পুরোহিত-ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা [illegible]ই প্রসারিত হউক, আজ একালে রেল-কলোনীতে বাফিল্ম-রেডিও, [illegible]তি উৎসব আলোড়িত আমাদের আধুনিক জীবনে আর পূর্ব প্রাণ ফিরিয়া পাইবে না। আমাদের জীবনের মধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা উৎসব, স্কুলের বার্ষিক সম্মেলন, সঙ্গীত অভিনয়, সেবাদলের সম্মেলন প্রভৃতি আয়োজন সেই কুলীন উৎসবগুলির স্থান পূরণ করিয়া আধুনিক কালের সঙ্গে আমাদের বাঁধিয়া দিতেছে। কিন্তু সেই আমাদের ছোট-ছোট সংসারের ছোট-ছোট কামনা এদিনের শ্রীহীন দুঃখ-দারিদ্র্যের ভারে পিষিয়া গুঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সামান্য পিটুলি গুঁড়া লইয়া মাঙ্গলিক আলপনা আঁকিয়া,—কিম্বা সেই অঙ্গারের গুঁড়া, ওই ইটের পাটালি রঙের সহায়েই—আমাদের বামুন-জ্যেঠাই'র আশ্চর্য বর্ণ-রেখাবোধ সার্থকতা লাভ করিত। বাঙালী মেয়ের সেই স্বাভাবিক সৃষ্টি-কুশলতাকে কি আজ আমরা একটা নূতন সৃষ্টিপথের সন্ধান দিতে পারিতেছি? এই খাপছাড়া আধুনিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন,—নারী হৃদয়ের শাশ্বত কামনা-আশ্রয়ী সেই মেয়েলি ব্রতের 'চিরত্ব'? কিম্বা, ব্রতেরই সমজাতীয় লোক-শিল্পের শাশ্বত শ্রীমণ্ডিত 'ব্রতকথার', ব্রতের ছড়ার, ব্রতের আলপনার সেই স্বাভাবিক 'চিরত্ব গুণ'?—আমাদের সেই বামুন জ্যেঠাই'র রঙের স্বাভাবিক সুষমা, তাহার বলিবার ভঙ্গির অকৃত্রিম চমৎকারিত্ব—ইহা কি স্কুল-কলেজের ডোমেস্টিক সয়েন্সের ঘট-পট আঁকা শৌখীনতার মধ্যে বা আমাদের কলোনির ট্রাফিক-সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের সম্বর্ধনায় অঙ্কিত আলপনার সূত্রে আমি আর ফিরিয়া পাইব?

[মন্তব্য : ব্রত জিনিসটি মেয়েদের নিজস্ব। এজন্যই এ রচনাটি একটি মেয়ের জবানীতে লিখিত হল। সাধারণ ভাবেও এসব কথা বলা যেত—কত রকমের ব্রত বিভাগ, তাহার ভাব, কি তাহার আচার-নিয়ম কিম্বা ব্যবস্থা (আলপনা ও এরূপ অলঙ্করণ) ইত্যাদি কিন্তু একটি বিশেষ ব্রতকে উপলক্ষ্য করে—বিশেষ ব্রত-পালিকার মুখ দিয়ে বললে তা আরও সজীব করে তোলা যায়—এখানে তার আভাস দেওয়া হল। আর একটী কথা—দেশের অর্ধেক মানুষই যে মেয়ে সে কথাটিও একটু মনে রাখার প্রয়োজন আছে। তবে এরূপ ভঙ্গির রচনা চলিত ভাষায় লেখাই সুবিধাজনক।]

।। সংবা[illegible]পাঠ ।।

ভূমিকা

নেপোলিয়ন সম্বন্ধে একটি কথা আছে। তিনি ইতিহাস দেখিতে হইলে বলিতেন, 'Bring me my liar' সংবাদপত্রকে বলা যায়—Current History বা ইতিহাস-চলন্তিকা। আর নেপোলিয়ন কেন, এ যুগের ক্ষুদ্রতম পাঠকটিও মর্মে মর্মে বুঝিবেন—সংবাদপত্র মিথ্যার ঝুড়ি। এরং প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু আধুনিক কালের সংবাদপত্র সত্য ও মিথ্যাকে এমন ভাবেই মিশাইবার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে যে, তাহা হইতে সাধারণ পাঠকের তথ্য উদ্ধার প্রায় দুঃসাধ্য। অথচ প্রতি মানুষের পক্ষে জানিবার ইচ্ছা ও আধুনিক জীবনের গতি-প্রকৃতি বুঝিবার প্রয়োজন দিনের পর দিন বাড়িয়া গিয়াছে। কাহারও নিশ্চিন্ত বা নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই।

সংবাদ পত্রের জন্মশর্ত

পৃথিবীর সভ্য সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জনসমষ্টির পক্ষে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ আর নাই। আপনার সীমার মধ্যে আপনাকে লইয়া একান্ত জীবন যাপন আজ কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহাছাড়া, রাজ-শসিত হউক, একনায়ক-শাসিত হউক, কিম্বা জন-প্রতিনিধি শাসিত হউক, কোনো রাষ্ট্রই প্রজাসাধারণের সক্রিয় সহকারিতা ব্যতীত আজ আর চলিতে পারে না। জন-সমাজের এই দায়িত্ব যতই সমাজ-বিকাশের নিয়মে স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাদের পক্ষে তথ্য অবগতিও ততই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই তথ্য-অবগতি বা সংবাদ প্রচারের বাহন হিসাবে প্রথম দেখা দেয় সংবাদপত্র। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রচারের নানা শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পায়, নানা সমৃদ্ধি ও নূতন প্রবণতা দেখা দেয়; অন্য দিকে সংবাদপত্রের পার্শ্বে তাহারই জুড়িদার রূপে আসিয়া জোটে—রেডিও, বার্তা সবাকৃবীক্ষণ (টেলিভিসন), ইত্যাদি। জনসাধারণের সম্মুখে প্রতি দিন শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব নব সরস সংবাদ পশরা ইহারা খুলিয়া ধরিতে সমর্থ। সমাজ জীবনে সাধারণের সংযোগ সহযোগিতার প্রয়োজন দেখাদিতেই প্রথমে সংবাদপত্রের জন্মক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অবশ্য তার পরে তদনুযায়ী কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি বাস্তব আয়োজনের উদ্ভাবনায় সংবাদপত্রের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। যন্ত্রবিজ্ঞানের এই উন্নতিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিপুল তথ্য যে সস্তায় সংবাদপত্র পরিবেশন করে, তাহাতে ইহাকেই বলা যায় জনতার আলোক-দূত।

"চতুর্থ প্রতিষ্ঠান"

এই জন্যই বলা শ্রেয়ঃ, সংবাদপত্র আধুনিক যুগের ও আধুনিক গণতন্ত্রেরই সঙ্গে সহজাত। না হইলে অনেক জিনিসের মত চীনদেশেই সংবাদপত্র প্রথম [illegible]ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিলে অ[illegible]সনকেই বা সংবাদপত্র বলিব না কেন? তথাপি, সংবাদপত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা শুধু সরকারী ঘোষণাপত্র, প্রচারবার্তা নয়। প্রথমতঃ, তাহা আধুনিক জীবনের নবায়মান বিচিত্র তথ্যের পরিবেশক; দ্বিতীয়তঃ, সেই সূত্রেই বিকাশোন্মুখ জনমনের ও বিভিন্ন জনমতের সে প্রধান বাহক; এবং তৃতীয়তঃ, তথ্য ও মতের বাহকরূপে জনমতের প্রধান এক সংগঠক। কার্যত ইহার ব্যতিক্রম আজ অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, কিন্তু সংবাদপত্র সম্বন্ধে ইহাই যে স্বাভাবিক ধারণা, তাহা বিস্মৃত হইবার কারণ নাই।

আধুনিক সংবাদপত্রের জন্মতাই ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে আরম্ভ হয়, বলা শ্রেয়। এই কারণে, ফরাসী বিপ্লবের যুগে সংবাদপত্রের নাম হয় 'ফোর্থ এস্টেট'—চতুর্থ বর্গীয় (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের) প্রতিষ্ঠান। গণতন্ত্রের সহিতই সংবাদপত্রেরও দ্রুত বিকাশ ঘটে। অষ্টদশ শতক সেই বিকাশের একটা প্রধান কাল। পাশ্চাত্য বহু দেশেই তখন হইতে উহার উদ্ভব সুনিশ্চিত হয়। সংবাদসেবীরা তখন হইতে শাসক-শক্তির কার্যাদি সম্পর্কে জন-সাধারণকে অবহিত ও পরিচালিত করিতে যত্নপর হন। শাসক-শক্তিও প্রথমে তাঁহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া পরে ক্রমশঃ 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা' স্বীকার করিয়া লন; আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী তথ্য পরিবেশনে সচেষ্ট হন, নিজের অনুকূল জনমত গঠনের কৌশলও আয়ত্ত করিতে থাকেন। সংবাদপত্রের মালিকানা আয়ত্ত করিয়া উহাকে নিজেদের অস্ত্র করিয়া লন। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-বিজ্ঞানের যোগ ঘটায় সংবাদপত্রের এই প্রচার ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতি ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, সংস্কৃতি বিষয়ক নানা বিশেষ পত্রের উদ্ভব হইতে থাকে। ইহাই হয় 'জনতার বিশ্ববিদ্যালয়।' আর উহার সঙ্গেই দেখা গেল লক্ষে লক্ষে প্রচারিত সংবাদপত্র ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের বড় মাধ্যম। সংবাদপত্র লাভজনক এক বিরাট ব্যবসা এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বহুবিধ ক্ষমতা-লাভের দুর্বার অস্ত্র।

বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান

বিংশশতকে তাই সংবাদপত্রের যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই—প্রথমতঃ লক্ষে লক্ষে প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহ ব্যবসা হিসাবে এক-একটি সংবাদপত্র-ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর হাতে গিয়া পড়িতেছে—একক পরিচালিত সংবাদপত্র ক্ষুদ্র

ব্যবসায়ের মতই একচেটিয়া ব্যবসায়-পদ্ধতির প্রতাপে লুপ্তপ্রায়। এক-একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠান যুক্ত হইতেছে শুধু ব্যবসায়ের নিয়মে। আবার [illegible]কার মত দেশে তাহাদেরও কুক্ষিগত করিয়া বসে কোনো মহাকায় [illegible] যাহারা সংবাদ সরবরাহ সংস্থার ও বিজ্ঞাপন-সংস্থার অধিকারী, নিউজ-প্রিণ্টার বা কাগজের ব্যবসার অধিকারী, এমনকি, সেই কাগজেরও উদ্ভবক্ষেত্র দূরান্তরের বনানীরও একচ্ছত্র অধিকারী। ইহা আবার দেখা যায় আসলে ইহা কোনো ফিন্যান্স ক্যাপিটেল বা ব্যাংক ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি লগ্নীপুজির' কবলিত বা তাহাদের তাঁবেদার। এইরূপ সর্বগ্রাসী ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যের বাহিরে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচা কোনো সংবাদপত্রের সাধ্য নয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে এই সব ধনিকতন্ত্রীদেশে ধনিক-স্বার্থ বা একচেটিয়া পুঁজিচক্রের মূল স্বার্থ অনুযায়ী সংবাদপত্র বর্তমান সময়ে সংবাদ পরিবেশন করে—অর্থাৎ সেই স্বার্থানুযায়ী সংবাদ অতিরঞ্জিত করে, একেবারে চাপিয়া দেয়, সাজায়-গুছায়, নানা কৌশলে সাধারণের নিকট তুচ্ছরূপে প্রতিভাত করে। আর সংবাদ বা তথ্য সম্বন্ধে যখন এইরূপ নীতি, তখন মতের সম্বন্ধে তো কথাই নাই। কারণ, জনগণের মতামত মালিকের স্বার্থানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই তো সংবাদ-বিকৃতিও করা হয়। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের মন ভুলাইবার জন্যও সংবাদপত্রের এখন বিরাট ও বিচিত্র আয়োজন করিতে হয়। কারণ, শত হইলেও বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, এবং কোনো না কোনো কৌশলে ক্রেতার মন ভুলাইতেই হইবে। সেইজন্য কাহারও চেষ্টা থাকে সাংস্কৃতিক বস্তুকে সরস চটকদার করিয়া সাধারণের নিকট পরিবেশন—তাহাতে সাধারণের আস্থা দৃঢ়ভাবে অর্জন করা যায়। কেহ মনে করে যত তরল আমোদ, হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতির সংবাদ পাঠ করিতে পারিলেই জনতা খুশী হয়। তাই ইহাদের চেষ্টা থাকে সেইরূপ আফিম বা কড়া নেশা—যেমন, যৌন আবেদন, খুন-রাহাজানি প্রভৃতি উৎকট অপরাধবহুল সংবাদ পরিবেশন করা। এইরূপে দেখা যায় পৃথিবীরও সমাজের প্রকৃত সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষাও নানা তরল —এমন কি, অসুস্থ ও বিকৃত রুচির ঘটনা ও বিজ্ঞাপনই এখন বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্রের বারো বা চৌদ্দ আনা অংশ জুড়িয়া থাকে, বাকী সামান্য অংশে থাকে সংবাদ—অতি সংক্ষিপ্ত ও অবহেলিত আকারে। গার্ডিয়ান, টাইমস্, নিউজ ক্রনিকৃল প্রভৃতি ব্রিটেনে দুই-চারিটি দৈনিক সংবাদপত্র নানা প্রচেষ্টায় সংবাদপত্রের যাহা প্রধান কর্তব্য—সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন সংবাদ পরিবেশন, —তাহা করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের রুচি বিকৃত না হইলেও ভূমিকা নিরপেক্ষ নয়। তথ্যকে একটু-না-একটু নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী তাহারাও খণ্ডিত বা মণ্ডিত করে। শ্রমিক মতবাদের মুখপাত্র পত্র সাম্যবাদী ডেলি

ওয়ার্কারও নিজ মতানুযায়ী সংবাদই প্রকাশ করে। কিন্তু দায়িত্বহীন নয়, ইহা সত্য।

এইরূপে সংবাদ-গোপনের ঝো[illegible] ও তথাকথিত 'সংবাদ' রচনার কৌশলে সংবাদপত্র সত্য চিত্র পা[illegible]কে পরিবেশন করে না! জনমত গঠনের দিক হইতে অধিকাংশ সংবাদপত্রের চেষ্টা প্রধানত সুস্থ মত গঠন নয়, নিজের অনুকূলে মত প্রভাবিত করা, এমন কি বিভ্রান্ত করা; এবং জনমতের উন্নয়নের দিক হইতে বলিতে হয়—আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দান অপেক্ষা কার্যত নানা বিকৃত, অসুস্থ উদ্দীপনায় পাঠকের মনকে বিস্রস্ত, বিভ্রান্ত ও আত্মভ্রষ্ট করাই সংবাদপত্রের কাজ হইয়া উঠিয়াছে।

এই কারণে সংবাদপত্রকে এখন বলা হইয়া থাকে—"ডেন্‌জারাস্‌ এস্টেট", অর্থাৎ "বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান।" অবশ্য ইহার মূল কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। ব্যবসায়িক স্বার্থও মুনাফার মৃগয়া যেখানে অবাধ উদ্দাম, সেই সব দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যন্ত সেই বিকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে প্রযুক্ত হয়—ধর্ম ও দেবতাও নিস্তার পায় না। তাহা হইলে সেইসব দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের মত সংবাদপত্রেরও যে এইরূপ পরিণতি ঘটিবে, তাহাও জানা কথা। ধনিকতন্ত্রী সমাজে ধনিককবলিত সংবাদপত্রের ইহাই নিয়তি। 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা' কথাটা কার্যত হইয়াছে যন্ত্রাধিকারী মহামালিকদের যদৃচ্ছা আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির স্বাধীনতা।

ভারতীয় সংবাদপত্র

আমাদের দেশে অবশ্য সংবাদপত্র এখনো কীর্তিতে বা অপকীর্তিতে পাশ্চাত্য দেশের মত সেই ভয়াবহ পর্বে গিয়া পৌঁছায় নাই। তাহার কারণ, আমাদের দেশে মুনাফার মৃগয়া এখনো তেমন সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, শতকরা ৭৫টি মানুষ যেখানে নিরক্ষর সেখানে সংবাদপত্রের প্রচারও সীমাবদ্ধ—সু বা কু কোনো শিক্ষাই সে দিতে পারে না। ইহা অবশ্য সৌভাগ্যের কথা নয়, দুর্ভাগ্যের কথাই। তথাপি এই দেশেও যে সংবাদপত্র সেই ব্যবসা-পঙ্কে ও পাশ্চাত্য বিকৃতি-চক্রে ক্রমশঃ জড়াইয়া পড়িতেছে, ভারতীয় প্রেস কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিড়লা-গোয়েঙ্কার মত পুঁজিপতিগোষ্ঠী মালিক স্বার্থের দায়ে বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিক হইয়াছে। পূর্বেকার জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র কয়টি হয় মুনাফা লুণ্ঠনে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগদান করিতেছে এবং শোষণরাদের সপক্ষে সংবাদ হইতে মতামত পর্যন্ত তাহারাও উগ্রভাবেই পরিচালনা করিতেছে; না হইলে তাহারা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সম্পাদকগণ মালিকের বেতন-বাধ্য প্রচারকে পরিণত হইতেছে, না হয় চাকরী হারাইতেছে; অ-লেখক মালিকেরাই সম্পাদক সাজিতেছে। আর সত্য চাপা দেওয়া, মিথ্যা পরিবেশন—ইহাও কি কম?

এই নিয়তি হইতে সংবাদপত্রের রক্ষার কয়েকটি উপায় আমাদের প্রেস কমিশন নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা মালিকদের বাধায় কার্যকর হয় না। তাই [illegible] সংস্থায় সংবাদপত্র শোধনের নূতন উপায় চিন্তা করাই [illegible]জন। যেমন প্রথমতঃ সংবাদপত্রের ব্যবসায় মুনাফা আদায় করা চলিবে না; ইহা পাব্লিক ট্রাস্টরূপে গণ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উহার মালিকানা থাকিবে চেম্বার অব কমার্স, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমবায় প্রভৃতি জন-প্রতিষ্ঠানের হাতে এবং এক-একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের হাতে। তৃতীয়তঃ সাংবাদিকের (মালিকের নয়), বিশেষতঃ সম্পাদক-মণ্ডলীর দায়িত্ব হইবে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পত্র পরিচালনা।

সমাজের প্রতিরক্ষা পথ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্স এইরূপে সংবাদপত্র শোধনে সুচেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু মুনাফাতন্ত্রের আধিপত্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। এখন আমাদের দেশেও মুনাফাতন্ত্রের প্রতাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে উপায় কি? পাঠকের পক্ষেও সংবাদপত্রের হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেমন সংবাদপত্র পাঠ কালে—প্রথমতঃ প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্বন্ধেই মনে রাখিতে হইবে তাহার মালিক কি, কি তাহাদের স্বার্থ, সেই স্বার্থানুযায়ী তাহারা সংবাদ কিভাবে উপস্থিত করিবে; এবং একচেটিয়া সংবাদপরিবেশক পি, টি, আই, রয়টার কোন রঙে সংবাদকে রঞ্জিত করে। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদপত্রের সংবাদের মতই কোনো সম্পাদকীয় অভিমতও বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ না করা। তৃতীয়তঃ, বাস্তব দৃষ্টি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নিজের চিৎ-শক্তিকে সর্বদা উন্মুখ করিয়া রাখা।

সংবাদপাঠের প্রস্তুতি

মন্তব্য: রচনা বিষয়—সংবাদপত্র পাঠ: সংবাদপত্র কি, তাতে কি থাকে, সংগঠন কিরূপ, এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সংবাদপত্র সম্বন্ধে দশখানা বই লিখলেও তার সকল কথা বলা যায় না। এখানে আমরা তাই সংক্ষেপে তার ইতিহাস বলে তার প্রয়োজনের দিকটি নির্দেশ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে তার অপপ্রয়োগের নির্দেশ করেছি। প্রয়োজন সংবাদপত্র পাঠক মেনেই নেন, বরং তিনি মনে রাখেন না ক্ষতির দিকটা। সংবাদপত্র পাঠের গোড়াতেই সতর্ক হওয়া দরকার—সংবাদ কতখানি বুদ্ধি ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করছে। তাই বিচার বুদ্ধিকে রাখতে হয় শাণিত—যাতে সত্যমিথ্যা সংবাদের মধ্য থেকে সত্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এদিনে সংবাদপত্র পাঠের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত Question everytning: না হলেই ঠকতে হবে।]

॥ পঞ্চশীল ॥

আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন বেদনামথিত অন্তরে গৌতম বুদ্ধ বিশ্বের দুঃখজালার নির্বাণ খুঁজিয়াছিলেন। মানুষে-মানুষে ব্যবহারের সম্পর্ক তিনি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন মানব-ধর্মের মহৎসত্যের উপরে—ক্ষমা, মৈত্রী, উপেক্ষা হইবে ব্যক্তির জীবন মন্ত্র। ব্যক্তির জীবনকে সেই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনে তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন 'পঞ্চশীল'। উহা ছিল ব্যক্তি-জীবনের পালনীয় কয়েকটি নির্মল নিয়ম।

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলের সত্যকে সম্রাট অশোক শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, মানুষের সমাজজীবনে রূপায়িত দেখিবার আশায় আপনার অনুশাসনসমূহ খোদিত করিয়া যান। ইহার পরে দুই হাজার বৎসর গিয়াছে। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে এই সুনীতি ও সদ্ধর্মের অনুশাসন রূপায়িত করিবার প্রয়োজন এখনো ফুরায় নাই। কিন্তু সমাজপ্রগতির নিয়মে ইহাও উপলব্ধ হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানবনীতিকে স্বীকৃতি না দিলে মানুষের সমগ্র জীবন-যাত্রা ব্যাহত হইয়া পড়ে। সেখানেও চাই স্বাধিকারে আস্থা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায়ের মর্যাদা, এমন কি, ক্ষমা অহিংসারও, যথাসম্ভব সশ্রদ্ধ স্থান। বিংশ শতকের মধ্যভাগে দুইটি সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের শেষে পৃথিবী যখন আজ সর্বগ্রাসী ধ্বংসের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে না ভাবিয়া উপায় নাই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যদি আজ মানবীয় শ্রদ্ধা ও কল্যাণ-বোধের উপরে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারি তাহা হইলে সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ কিছুই আর রক্ষা পাইবে না; এক সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে সব তলাইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি

মানুষের আত্মদ্রোহ তথাপি তাহার আত্মবোধের নিকট সহজে নির্জিত হয় না। রাজনৈতিকদের সেই আত্মদ্রোহই স্বার্থবুদ্ধির বিকৃতিতে প্রথম মহা-যুদ্ধের শেষে 'লীগ অব নেশান্‌স্'-এর প্রয়াসকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে। এখনো 'ইউ-এন-ও'-এর আয়োজনকে উহা ক্ষয় করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মানুষের শুভ-চেতনাও অপরাজেয়। তাই রাজনৈতিক হারজিতের খেলার পাশাপাশিই—সেই কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা না করিয়াও—মানুষের শুভ সঙ্কল্প আপনাকে ঘোষিত করিয়াছে

মানুষের আত্মদ্রোহ

পঞ্চশীলের প্রতিজ্ঞায়। ইহা আকস্মিক নয় যে, সেই গৌতম বুদ্ধেরই দেশে এই 'পঞ্চশীলের' নূতন নীতিও উদ্‌গীত হইল। তথাপি ইহা ভারতের পক্ষে মহৎ গৌরবের কথা, স্বাধীন ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এ যুগের এই মানবনীতির প্রধান মুখপাত্র হইতে পারিয়াছেন। হয়ত ইহা শুধু 'পঞ্চশীলের' মাহাত্ম্য নয়, এই কথারও প্রমাণ যে নানা দৈন্য ও গ্লানির মধ্যেও আমাদের মানবচেতনা একেবারে মালিন্যগ্রস্ত হয় নাই।

মনে রাখিতে পারি 'পঞ্চশীল' যে ব্যক্তির আচরণ-ধর্ম হইতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলসূত্র রূপে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ ইতিহাস থামিয়া নাই। শত দ্বন্দ্ব-বিরোধের রক্তপিচ্ছিল পথ বহিয়াও মানুষ আপনার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সর্ব-মানুষের আত্মীয় সম্পর্ককেই ক্রমশঃ বেশি বেশি করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর স্বার্থবুদ্ধিও তাহাকে ছাড়িতেছে না। ইতিহাস-জোড়া এই বিরাট আত্ম-বিকাশের প্রতিটি প্রযাসের মধ্যেই সেই স্বার্থবুদ্ধি,—ব্যক্তিস্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ, এমন কি, শ্রেণীহীন সমাজের' স্বার্থ ও 'মুক্ত পৃথিবীর' স্বার্থের নামে ধ্বংসের বীজও বপন করিয়া চলিয়াছে। বরং মানুষের সভ্যতা যতই অগ্রসর হইতেছে সভ্যতাবিরোধী শক্তিও এক হিসাবে ততই কুটিল ও হিংস্র হইযা উঠিতেছে।

স্বার্থের অপঘাত

বিংশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী যতটুকু মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তাহাও আর সে পায় নাই। দেখিতে-না-দেখিতে দুই শিবিরে পৃথিবী বিভক্ত হইয়া গেল। অস্ত্র কেহই ত্যাগ করিল না—করিতে পারিবেই বা কিরূপে? কারণ, মুনাফার বিরাট প্রাসাদ সে অস্ত্রোৎপাদন ছাড়া আপনাকে খাড়া রাখিতে পারিবে না। অথচ অস্ত্রোৎপাদন চলিলে অস্ত্র ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই যুদ্ধও প্রয়োজন হইবে। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'! আণবিক বোমার উপরে হাইড্রোজেন বোমা, তাহারও উপরে 'ক্ষেপণাস্ত্র' লইয়া পৃথিবীর মহাশক্তিরা মহাধ্বংসের আয়োজনেই যেন সুসম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। জেনেভা কিম্বা নিউইয়র্কের অস্ত্র ত্যাগের জটলার দিকে তাকাইলে মনে হয় এই হলাহল পানেই যেন মানুষের আগ্রহ। শুধু কি তাহাই? যুদ্ধও তো আসলে থামিতে পারে নাই। কোরিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে একদিকে ভাবী মহাযুদ্ধের মহড়া চলিয়াছে, অন্য দিকে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের বাড়ন্ত অস্ত্রের বিক্রয়-সুযোগও রচনা করা চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে জোট বাঁধা ব্যূহরচনা। একদিকে আইয়ুব খাঁ, চিয়াং কাইসেক, সিং ম্যান রী, অন্যদিকে বাগদাদ চক্র ও আটলান্টিক চক্র। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে, আইসল্যাণ্ডে, তুর্কি-গ্রীসে আণবিক যুদ্ধের ঘাঁটি নির্মাণ, বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর জাল রচনা। পাকিস্তানে, ফিলিপিনে, জাপানে

জার্মানিতে—আকাশে, মাটিতে, সমুদ্রে, পাতালে—কোথাও যেন মানুষের আর আত্মরক্ষা করিবার ছিদ্রটুকুও না থাকে।

মৃত্যুর এই চক্রান্ত কিছুমাত্র মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে যদি বিস্মৃত হই মানুষের জয়যাত্রা আরও [illegible]র হইতেছে, তাহা হইলেই ভুল করিব।

এশিয়া-আফ্রিকার জাগরণ

মহাযুদ্ধের অগ্নিশুদ্ধ এশিয়ার দিকে তাকাইলেই বুঝিব,—কত নতুন জাতি আজ স্বাধীন জীবন গড়িবার অবকাশ লাভ করিয়াছে। কী বিরাট সংকল্পে আজ ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের মহত্তম জনসমষ্টি উদ্বুদ্ধ। আর, সমগ্র আফ্রিকায় হিংস্রতার মুখেও, ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও কৃষ্ণকায় জাতিপুঞ্জের জাগরণ ইতিহাসের কত বড় এক বিস্ময়। দক্ষিণ আমেরিকার জীবনচাঞ্চল্য কত সম্ভাবনাময়। বেশ বুঝি—সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরাইয়াছে। জাতিপুঞ্জের স্বাধিকারলাভ সুনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে—মানবনেতৃত্বে পাশ্চাত্য জাতিদের একচেটিয়া অধিকার শেষ হইয়া পূর্বের দিকে হাওয়া ফিরিতেছে। এই বিরাট সত্যকে স্বাগত করিয়া মানুষের মহৎ প্রযাসকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া—জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় শান্তির পক্ষে প্রত্যেকের অবাধগতি নিশ্চিত করা—ইহাই এই যুগের প্রত্যেক মানুষের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি, কারণ ইহাই এখন মানব-ধর্মের বাস্তব দাবি।

'পঞ্চশীল' সেই পথনির্দেশ।

মানুষের অগ্রগতি শান্তির পথে চলিলেই সে কল্যাণদায়ক হয়, শুধু তাহা নয়; সেই অগ্রগতি তখনই নিষ্কণ্টক পথে দ্রুততর ছন্দে চলিতে পারে। তাই 'পঞ্চশীলের' প্রধান লক্ষ্য হইল জাতিতে জাতিতে সেই শান্তির নীতিকে মানিয়া লওয়া। পাঁচটি ধারাকে ভিত্তি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে—যে নীতিপঞ্চক পণ্ডিত নেহরু ও চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই একযোগে প্রথম প্রণয়ন করিলেন। তাহার মর্ম এই—

(১) ভারত-চীন পরস্পর পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও নিজ রাষ্ট্রে সার্বভৌম অধিকার সশ্রদ্ধমনে স্বীকার করে।

(২) তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবে না।

(৩) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা আদর্শগত কোন কারণে তাহারা কেহ অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৪) প্রত্যেকের সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণসাধন স্বীকৃত হইবে।

(৫) শান্তিতে সহাবস্থিতি তাহাদের স্বীকার্য।

বিচার করিলে দেখা যাইবে—মানবতার যে আদর্শ আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, এই পঞ্চশীলে তাহা স্বীকৃত। প্রতি

রাষ্ট্রের অধিকার ও প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইহাতে এক সঙ্গেই স্বীকৃত। আমার যতখানি অধিকার আছে অপরেরও ততখানি অধিকার আমার স্বীকার্য,—এই যে ব্যক্তি-আচরণের সুস্থনীতি, আন্তর্জাতিক জীবনেরও তাহাই সুস্থনীতি।

সুস্থ মানব নীতি—সহাবস্থান

অবশ্য ইহার পিছনেও একটি সত্য আছে। তাহা এই যে, আমার যেমন জাতীয় স্বাধীনতার ও সার্বভৌম রাষ্ট্রাধিকার আছে, পৃথিবীর সকল জাতিরই সেইরূপ স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের অধিকার আছে। পঞ্চশীলে এই কথাটির আক্ষরিক উল্লেখ না থাকিলেও পঞ্চশীলের নীতিতে উহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। ভারতের ও চীনের রাজনৈতিক চেতনা এই বোধে প্রবুদ্ধ বলিয়াই এশিয়ার ও আফ্রিকার এবং সমগ্র পৃথিবীর মানব-হিতৈষীদের চক্ষে আমরা শ্রদ্ধার পাত্র। এবং ঠিক এই কারণেই, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি ও তাঁহাদের তাঁবেদার চক্রের নিকট ভারতবর্ষ সন্দেহভাজন, চীন তো শত্রুরূপেই গণ্য। এই জন্যই পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রসমূহ পঞ্চশীল স্বীকার না করিয়া পারে নাই। বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) এশিয়ার ও আফ্রিকার ২৯টি জাতি উহাকে সম্বর্ধনা জানায়; ভারত ও চীনের পরে—এশিয়ায় উহার সমর্থক ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, লাওস; মধ্যপ্রাচ্যে মিশর, সৌদি আরব; ইউরোপে সোভিয়েত সংঘ, প্যোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি। তবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন রাষ্ট্রই শুধু 'পঞ্চশাল' সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ নয়, উহাদের শিবিরের দক্ষিণ-এশিয়া জোটের বা আটলান্টিক জোটের হতভাগ্য রাষ্ট্রগুলিও তাহাতে উদাসীন। সহাবস্থানেও তাহাদের আপত্তি। অবশ্য এই কথা স্মরণীয়—পঞ্চশীল কোনো একটি তৃতীয় জোট গঠনের কৌশল নয়। ভারতবর্ষ দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকিয়া সকলকে লইয়া 'শান্তির অঞ্চল' স্থাপন ও বিস্তার করিতে চায়। আর তাহার আন্তর্জাতিক নীতির মূল সূত্র পঞ্চশাল।

এই কথাও স্মরণীয়—এই মানবনীতি স্বীকার করিবা মাত্রই যে তাহা সকল কর্মে উদ্‌যাপিত হইতেছে, তাহা নয়। আমরা জানি 'পঞ্চশীলের' ধারাসমূহের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটে। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ কিম্বা চীনের পক্ষে তিব্বতের লামা-বিদ্রোহ দমন, অনেকের মতে পঞ্চশীলের নীতিভঙ্গ। কাশ্মীর সম্বন্ধেও পাকিস্তান ভারতকে সেইরূপ দোষারোপ করে। কিন্তু এই সব প্রত্যেকটি বিষয়ই বিতর্কসাপেক্ষ। যদি স্বীকারও করা যায়, পঞ্চশীলের নীতি কোথাও কোথাও জাতীয় স্বার্থে কেহ কেহ ভঙ্গ করিতেছে, তাহাতেও 'পঞ্চশীলই' যে তাহারা মুখ্যত প্রতিপালন করিতে চায়, এই সত্য অপ্রমাণিত হয়না। জাতিতে জাতিতে মতভেদের কারণ ঘটিবে, কিন্তু আদর্শ হিসাবে, এবং পালনীয় আদর্শ হিসাবে ভারত চীন, সোভিয়েত সংঘের তো পঞ্চশীলই গ্রাহ্য। অথচ ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন তাহা

রূপায়ণের বিপদ

একবারও স্বীকার করিতে অক্ষম। এত বড় মহৎ আদর্শ রূপায়ণের পক্ষে নিশ্চয়ই ক্ষণে ক্ষণে ত্রুটি ঘটিবে। কিন্তু তথাপি তাহা অকপটরূপে গৃহীত হইতেছে, রূপায়িত হইতেছে, ইতিহাসে তাহার জন্মও তাই প্রমাণিত হইতেছে, ইহাই প্রধান কথা। আড়াই হাজার বৎসরের মধ্য দিয়া ইহাই তো দেখা যাইতেছে—মানুষের মানবতা অপরাজেয়।

॥ ধর্মঘট ॥

সূচনা

বাঙলা 'ধর্মঘট' কথাটির একদিন যাহা অর্থ ছিল আজ তাহা নাই। আজ 'ধর্মঘট' বলিতে বুঝায় 'শ্রমিক ধর্মঘট', ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'স্ট্রাইক্'। তবে 'জেনারেল স্ট্রাইক বলিতে প্রায়ই 'সাধারণ ধর্মঘট' না বলিয়া আমরা বলি 'হরতাল।' যে অর্থে বাঙলায় 'ধর্মঘট' কথাটি মূলত প্রচলিত ছিল তাহাও অর্থহীন নয়। পশ্চিম বাঙলায় 'ধর্ম ঠাকুর' সুপরিচিত দেবতা। প্রধানতঃ তিনি নিম্নবর্ণের নর-নারীর দেবতা। ইহারাই আমাদের চির প্রচলিত সমাজের শ্রমজীবী মানুষ, নানা ক্ষুদ্র কারিগর বৃত্তিজীবী। সমাজ-কর্তৃপক্ষের অত্যাচার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিলে এই কারিগর মজুররা কাজ বন্ধ করিত; 'ধর্ম ঠাকুর'-এর ঘট স্থাপন করিয়া শপথ করিত—তাহাদের ক্ষোভের কারণ বিদূরিত না হইলে তাহারা কাজ পুনরারম্ভ করিবে না। কখনো কখনো সমস্ত গ্রামও সমাজ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এইরূপ ধর্মের ঘট বসাইয়া নিজেদের প্রতিরোধ ঘোষণা করিত—তখন সেই ধর্মঘট গ্রামের 'জেনারেল স্ট্রাইক-এ পরিণত হইত বলা যায়। সেইরূপ ইহাও বোঝা যায়—'স্ট্রাইক' অবশ্য এই যুগের শ্রমিকদের মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ; কিন্তু পূর্বযুগেও উহার অনুরূপ জিনিস অজ্ঞাত ছিল না; আমাদের সমাজের মধ্যেও তখন শাসক ও শাসিতের বৈষম্য ছিল, তখনো বিরোধ বাধিত, সেই বিরোধেরই চরম রূপ 'ধর্মঘট', 'প্রজাবিদ্রোহ' 'হরতাল' প্রভৃতি। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যন্ত্রযুগে যন্ত্রের মালিক হইয়াছেন ধনিক, শ্রমজীবী-বৃত্তিজীবীরা হইয়াছেন ধনিকদের শ্রমিক, (ওয়েজ স্লেভ্)—ধর্মঘটও প্রধানত হইয়াছে ধনিক-শ্রমিক বিরোধের চরম প্রতিরোধ-অস্ত্র।

শোষণ-সম্পর্ক

এইরূপ বিরোধের মূল কারণ দুর্বোধ্য নয়। তাহা এই যে, শোষণের উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ বহুদিন হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি আদিম কালে যাহাই থাকুক, সমাজে বহুদিন হইতেই এক শ্রেণী শাসকরূপে ও শোষকরূপে উপরে অধিষ্ঠিত আছে; অন্য শ্রেণী শোষিত রূপে ও শাসিত রূপে তাহাদের নির্দেশে সমাজ ভার বহন

করিতেছে। এই শোষণের জন্য চিরদিনই শোষকে ও শোষিতে সঙ্ঘাত আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বর্তমানে সেই শোষণের রূপ কি তাহা তথাপি অনুধাবনযোগ্য। কারণ, ধর্মঘট বর্তমান যুগেরই জিনিস।

শ্রেণী স্বার্থের সঙ্ঘাত

প্রভু ও ক্রীতদাসের যুগ, সামন্ত ও ভূমিদাসের যুগ শেষ করিয়া সমাজে আসিয়াছিল বণিক-প্রাধান্যের যুগ। বণিকেরা নিজেদের কারখানাতেই মজুর খাটাইয়া বিক্রয়ের পণ্য উৎপাদন করিলে তাহারা অধিকতর মুনাফা করিতে পারে তাহা দেখিল। ক্রমে যন্ত্রাবিষ্কারে তাহাদের সেই কারখানা বৃদ্ধি পাইল, মুনাফাও বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব যুগের চাষী ছাড়াও তখন ছোট ছোট কারিগর, বৃত্তিজীবীরা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া শ্রমিকে পরিণত হইতে লাগিল। যন্ত্রযুগের এই উৎপাদনেরই নাম ধনিক উৎপাদন'। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় কারখানায় মালিকেরা পুঁজিপতি, ধনিক শ্রেণী, মুনাফার অধিকারী। আর কারখানার মজুরেরা শুধু শ্রমের অধিকারী, মালিকদের কারখানায় নিজের দৈহিক শ্রম বিক্রয় করিয়া জীবিকা সংস্থান করে। মালিকের স্বার্থ—যথাসম্ভবকমপারিশ্রমিকে কারখানায় যত বেশী সম্ভব শ্রমিকের পরিশ্রম আদায় করা, কারণ তাহাতেই তাহার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। লাভ বা মুনাফা জিনিসটি আপনা-আপনি পুঁজি হইতে জন্মে না, শ্রমিকদের শ্রমের ফলে জন্মে —কারণ, একমাত্র শ্রমই সকল সৃষ্টির আকর। শ্রমেই কারখানা চলে, পণ্য উৎপন্ন হয়; এবং শ্রমের ফলে যে পরিমাণ ও যে মূল্যের জিনিস উৎপন্ন হয়, তাহার মোট দামের একটি অংশ মাত্র 'পারিশ্রমিক' ও অন্যান্য খাতে ব্যয়িত হয়, আর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই মুনাফা। এই মূল সত্যটি অনেকে বিস্মৃত হয় যে, শ্রমিকের পরিশ্রমের যে অংশটির প্রাপ্য-দাম শ্রমিক পায় না, মালিক শোষণ করে, তাহারই নাম মুনাফা। কাজেই, শ্রমিকের এই দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিব যে, শ্রমিকের স্বার্থে যদি আপনার পরিশ্রমের পুরা দাম আদায় করা হয়, তাহা হইলে মুনাফা বলিয়া আর কিছু থাকিতে পারে না। আবার, মালিকের স্বার্থে যদি যত বেশি সম্ভব মুনাফা করা হয়, তাহা হইলে শ্রমের যত কম দামই শ্রমিক পাইবে। অতএব, দুই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্ঘাত একেবারে মৌলিক —যতক্ষণ ধনিকের মালিকানা ততক্ষণ মুনাফা থাকিবে; যতক্ষণ মুনাফা থাকিবে ততক্ষণ শ্রমিক আপনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে কিছু না কিছু বঞ্চিত হইবে।

সাধারণ কারণ

ইহাই যদি সমস্যার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারি শ্রমিকের লক্ষ্য যে কোনো উপায়ে সে আপন ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিবে, মালিকও যে-কোনো ছলে আপনার মুনাফা তাই বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই মৌলিক সংঘাত কারখানার

কাজকর্মে নানা সূত্রে নানা রূপে তাই প্রতিনিয়ত দেখা দেয়। যেমন, দেখা যায় শ্রমিকেরা ন্যায্য-মজুরির দাবি তুলিয়া মজুরি বৃদ্ধি দাবি করে; মুনাফা বৃদ্ধি হইলে চায় আপনার মজুরির হার বৃদ্ধি, কখনো চাহে মজুরির নামে, কখনো বোনাস বা পুরস্কারের নামে। শ্রমিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দাবি করে বর্ধিত মজুরি, আপনার শ্রম-কাল হ্রাস করিযাও সে চায় পরোক্ষে তাহার মজুরি বাড়াইতে। কারখানায় উন্নত যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে শ্রমিকের শ্রমকাল না বাড়িলে শ্রম-ক্লেশ বাড়ে, তাহাতেও শ্রমিক চায় বর্ধিত হারের মজুরি। তাহা ছাড়া, নিম্নতম মজুরি, স্ত্রী-পুরুষের সমান কাজের সমান মজুরি। দুর্ঘটনা-জনিত ক্ষতি, রোগে চিকিৎসা, বাসভবন, বার্ধক্যের ভাতা ব্যবস্থা, প্রভৃতি নানা দাবি আদায় করিয়া আধুনিক কালে শ্রমিক আপনার জীবন-মান বৃদ্ধি করিতে চায়। এই সব শ্রমিক পক্ষের ধর্মঘটের সাধারণ কারণ। এইরূপ প্রতিটি কারণের জন্যই তাহাকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হয়, দাবি তুলিতে হয়, আন্দোলন করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলন ধর্মঘটেও রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাও জানা কথা।

ইহা ছাড়াও ধর্মঘটের কারণ আছে—উহা মালিকপক্ষের কারণ। উহার কয়েকটি কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। আরও বহু কারণ জুটিতে পারে, —মালিকের অগাধ ক্ষমতা, কিন্তু একটি মাত্র ভয়—শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ও শ্রমিক ঐক্য। কারখানায় কাজের প্রয়োজনে মালিকই শ্রমিকদের একত্রিত করিয়াছে। সেই ঐকত্রিক শক্তিতেই পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই ঐকত্রিক শক্তি যেন ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়, ইহাই মালিকের প্রথম দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য যে ভাবেই হউক আপন মুনাফার ভাগ বাড়াইয়া চলা। এইজন্য একদিকে মালিকের চেষ্টা থাকে—যাহাতে শ্রমিক সঙ্ঘ না গড়িয়া উঠে, গড়িয়া উঠিলেও যেন তাহা মালিকের অনুগত দালালদের হাতে থাকে। যথার্থ শ্রমিক সঙ্ঘকে স্বীকার না করা, শ্রমিক-ঐক্য ভাঙিয়া দেওয়া শ্রমিক নেতাদের ছাঁটাই করা, এমন কি বেগতিক বুঝিলে সাময়িকভাবে 'লক-আউট'বা কারখানা তালাবন্ধ করা,—মালিকের এই সব কৌশল এক দিকে। অন্য দিকে কৌশল,—সকল রকমে মজুরি কমানো, মজুরের সুযোগ-সুবিধা কমাইয়া কারখানার ব্যয় কমানো, মুনাফা বাড়ানো, চিকিৎসা ক্ষতিপূরণ প্রসব-ভাতা প্রভৃতি যতরূপ শ্রমিক হিতব্যবস্থার সরকারী নির্দেশ থাকুক তাহা কার্যতঃ পালন না করিয়া ব্যয় হ্রাস করা, এবং যতই প্রকাশ্যে 'টাকার মজুরি' বাড়ুক 'প্রকৃত মজুরি কমাইয়া রাখা,' যাহা প্রকাশ্যে ডান হাত দিতে বাধ্য হয় বাম হাতে গোপনে তাহা কাড়িয়া লওয়া—আর, পরোক্ষে মজুর-পল্লীর নিকটে মদের দোকান হইতে মন্দির-মসজিদ্ যাহা হয়, সমস্ত পোষণ করিয়া মজুরের সহজ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া। এইরূপ অজস্র উপায়ে

মালিক প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে শ্রমিক শক্তিকে নানা সূত্রে বরাবর আক্রমণ করিতে থাকে। দাবির আন্দোলনের সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধেও শ্রমিক শক্তির প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করিতে হয়।

শ্রমিক প্রতিরোধ

শ্রমিক প্রতিরোধের প্রাথমিক রূপ হইল—শ্রমিক সংগঠন, ইউনিয়ন গঠন। অনেক সময়ে অপরিণতবুদ্ধি শ্রমিক তাহা না করিয়া স্বতোৎসারিত উৎসাহে আন্দোলন করে, এমন কি ধর্মঘটও করিয়া বসে। কিন্তু প্রায়ই তাহাতে তাহারা ব্যর্থ হয, আর ব্যর্থ হইলে আরও দুর্দশাপন্ন হয়। শ্রমিক-সংগঠন আবেদন-নিবেদন, আইনের সুযোগে আপোষ-নিষ্পত্তি, তারপর নানাবিধ পথে দাবি আদায় ও রক্ষার প্রথমতঃ চেষ্টা করে। চরম প্রয়োজন না হইলে ধর্মঘটে অগ্রসর হয় না। অবশ্য অগ্রসর হইলে দেখিতে হয় যেন জন-সাধারণ, অন্তত শ্রমিক সাধারণ, তাহাদের দাবি জানিতে পারে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, এমন কি, অবস্থা তেমন চরম রকমের গুরুতর হইলে সমাজের সাধারণ সহানুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্ব শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘটও আহ্বান করিতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি কোনো কোনো দেশের "সাধারণ ধর্মঘটের' অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে—এইরূপ সাধারণ ধর্মঘট জনসাধারণ সমর্থন করিতে উৎসাহ বোধ করে না, অপরপক্ষে রাষ্ট্রশক্তিও তাহা নিঃশেষে দমন করে।

ধর্মঘটের ফলাফল

শুধু 'সাধারণ ধর্মঘট' নয়, সাধারণতঃ ছোট বা বড় প্রায় ধর্মঘটের ফলেই দেখা যায়—ধর্মঘটে সমাজের ক্ষতি হয় অনেক। সাধারণের অসুবিধা, সামাজিক অস্বস্তি, শ্রমশক্তি অ-প্রয়োগে উৎপাদনের ক্ষতি, এই সব তো আছেই, এমন কি ধর্মঘটের ফলে পরিবার পরিজনসুদ্ধ যে ক্ষতি শ্রমিকগণ সহ্য করেন, যে দুর্দশা ভোগ করেন, সার্থক ধর্মঘটের পরেও তাহারা তাহা সহজে সামলাইয়া উঠিতে পারেন না। আবার, অনেক সময়ে দেখা যায়, বাহ্যত যদি কোনো লাভ শ্রমিকের হইয়াও থাকে অল্পকালের মধ্যেই গুপ্ত পথে মালিক নিজের মুনাফা অটুট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন—শ্রমিকের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ উন্নত হয় নাই। এইজন্য অনেকেই ধর্মঘটের বিরোধী। কিন্তু এই কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়—আজ পর্যন্ত যে সব শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে অনেক ধর্মঘটের কঠোর শ্রমিক-সংগ্রামের ফলে তাহা লাভ করা গিয়াছে; তবে, অনেকে সরকারী কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের ধর্মঘটের আরও বিরোধী, এবং জন-প্রয়োজনীয় কর্মে—রেলে, ডাকঘরে,—ধর্মঘটের উপর অত্যন্ত বিরক্ত। তারপর স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সামাজিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট দেখিয়া প্রায় লোকেই ক্ষুব্ধ হন।

বলা বাহুল্য, কোনো অবস্থাতেই বিবেচনা না করিয়া ধর্মঘটে শ্রমিকদের অগ্রসর হওয়া মূঢ়তা। প্রতিবিধানের অন্য পথ যখন সত্যই আর থাকে না একমাত্র তখনি ধর্মঘট-রূপ শ্রমিক-সংগ্রামের চরম পথ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ধর্মঘটের প্রতি বিরূপতা-পোষণের পূর্বে সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয়—সেই বিপন্ন, হয়ত বা বিভ্রান্ত, এমন কি বিপথগামী শ্রমিকসমূহের দুঃখ-দুর্দৈব ও দুরবস্থার সম্বন্ধে কি আমরা অবহিত ছিলাম? তাহাদের মানুষের মতো বাঁচিবার ব্যবস্থা আছে কিম্বা নাই, ইহা জানাও কি সামাজিক মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ছিল না? কেন আমরা পূর্বাহ্নেই দেখি না—মুনাফা না ফাঁপাইয়া মজুরের মজুরি বাড়ুক, কর্মসময় কমুক, কারখানার ভিতরের অবস্থার উন্নতি হউক, প্রত্যেক মজুরের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি মানবাধিকার আয়ত্ত হউক, মানুষের মতো বাঁচিবার অধিকার আমাদের দেশের মজুরও লাভ করুক? শাসকশক্তি কর্তব্য পালন না করা পর্যন্ত কী অধিকার আমার আছে শ্রমিককে বলিব 'শোষকদের মতানুযায়ী কর্তব্য পালন করো'?

ন্যায়-অন্যায় বোধ

আসলে, সভ্য সমাজে এই মূল সত্যটা এতই পরিষ্কার যে ধনিক-শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ছাড়া অন্য অস্ত্র নাই। এই জন্যই সভ্য রাষ্ট্র অন্যান্য বিরোধ মীমাংসার উপায় গ্রহণ করিয়া ধর্মঘটের কারণ বিদূরিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ধর্মঘটকে বে আইনী-করে না।

আপস-মীমাংসার বিষয়েও স্মরণীয়—উহাতে যত সুবিধা ক্ষমতাবান্ ধনিক-গোষ্ঠীই ভোগ করেন, শ্রমিকেরা নয়। তাহা ছাড়া, মূলতঃ মালিকের মুনাফা জিনিসটাই তো অন্যায্য জিনিস। বে-আইনী করিতে হইলে উহাকেই বে-আইনী করিতে হয়। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে মনে হয় ধর্মঘট যখন তখন শ্রমিকের পক্ষে প্রযোজ্য অস্ত্র নয় বটে, কিন্তু কোনো সময়েই তাহাকে অন্যায় বলা চলে না।

চরম প্রশ্ন

।। আমাদের বেকার-সমস্যা ।।

সূচনা

কর্মক্ষম মানুষ কাজ করিতে চায় অথচ কাজ পায় না, ইহা যে কোন সমাজের পক্ষেই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। কারণ, মানুষের কর্মশক্তির এই অপচয় মূলত সমাজের জীবনীশক্তিরই অপচয়। মানুষের কর্মকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ। প্রতিটি মানুষের কর্ম-সংস্থানের ও কর্ম-শক্তির সামাজিক সার্থকতাতেই সমাজের সার্থকতা। এই জন্যই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিজ্ঞরা মনে করেন—যে-কোনো সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূক্ত নরনারীর পূর্ণ কর্ম-সংস্থান (Full employment)। সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই যুগের সমাজের প্রধান দায়িত্ব।

মূল কারণ : মুনাফা-বাদী সমাজ

অথচ আধুনিক কালে পৃথিবীর বহুদেশেই বেকারত্ব একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। মাঝে মাঝে তাহা সঙ্কটে পরিণত হয় মাঝে মাঝে তাহার উপশম হয়, এই মাত্র। অবশ্য এমন দেশও আছে যেখানে মানুষ বেকার নাই—যেমন, সোভিয়েত দেশ। নূতন চীন ও পূর্ব-ইউরোপের দেশসমূহও এই সমস্যা সমাধানকরিয়াছে। সমাজতন্ত্রী দেশে বেকার নাই, অথচ বেকার ছাড়া ধনিকতন্ত্রী দেশ নাই। স্বভাবতই ইহা হইতে বেকারত্বের মূল কারণ কি, তাহা বুঝা সহজ।

বেকারের রূপ

প্রত্যেক ধনিকতন্ত্রী দেশেরই হয়ত বিশিষ্ট কিছু কিছু কারণ আছে। কিন্তু মূল কারণ সকলেরই এক। তাহা কি ? সংক্ষেপে বলা যায়—সমাজতন্ত্রী দেশে ক্রমাগত কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে কর্মোদ্যোগ অবাধ বাড়িতেছে, তাই কর্ম-সংস্থান অফুরন্ত। এবং যতই উৎপাদন বাড়িতেছে ততই পারিশ্রমিক বাড়িতেছে ; আর নূতন কর্মোদ্যোগে আরও অর্থ প্রযুক্ত হইতেছে। ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে নয়, সমাজের সাধারণ স্বার্থে সমস্ত ব্যবস্থা হয় ; তাই সমাজের কর্মোদ্যোগ কেবলই বাড়িয়া চলে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রী দেশে ধনিকেরা ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়াইবার জন্য ব্যবসাপত্র চালায়; চূড়ান্ত মুনাফার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ শ্রমজীবী নিযুক্ত করে। তাহাদের এক উদ্দেশ্য হইল কম পারিশ্রমিক দিয়া মুনাফা বৃদ্ধি। অন্তত কিছু শ্রমিক পূর্বাপর বেকার ও অসহায় না হইলে কম পারিশ্রমিকে শ্রমিক সুলভ হয় না। অতএব শতকরা ৫।৭ জন শ্রমিককে (permanent unemployment) সব সময়েই বেকার রাখা মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, নূতন যন্ত্র বসাইলে মজুরি কম দিয়া বেশি উৎপাদন ও মুনাফা করা সম্ভব ; অতএব মজুরদেরও কিছুটা কর্মনাশ (frictional unemployment) অবশ্যম্ভাবী। সমাজতন্ত্রী সমাজ যখন উন্নত যন্ত্র বসায় তখন পরিকল্পনানুযায়ী কারখানার উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের জন্য নূতন কর্মসংস্থান করে। অতএব, 'পূর্ণ কর্মসংস্থান' ব্যক্তিগত মালিকানার সমাজে হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও অবশ্য

গভীরতর কারণ আছে। ব্যক্তিগত মুনাফাই যেখানে লক্ষ্য, সমাজের সাধারণ স্বার্থ যেখানে লক্ষ্য নয়, সেখানে শ্রমিক-সাধারণের মজুরি কম, তাই তাহাদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা হয় না; মুনাফার ও বাজারের মারামারিতে কর্মোদ্যোগও মন্দগতিতে চলে। মাঝে মাঝে তাহাতে মন্দা (Slump) দেখা দেয়, গভীর আর্থিক সংকট আসে। তখন আরও কাজ কমে, শ্রমজীবীরাও বেকার হয়। ইহা হইতেও ধনিকতন্ত্রী দেশের নিষ্কৃতি নাই। এই অবস্থায় স্থায়ী হয় তাহাদের সাধারণ সঙ্কট। অর্থনীতিজ্ঞরা অবশ্য নানা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া মন্দার প্রকোপকে হ্রাস করিবার পরামর্শ দিতেছেন; কিন্তু বেকারত্ব থাকিয়াই যাইতেছে। একমাত্র যুদ্ধ বাধিলে তাহা সাময়িক ভাবে হ্রাস পায়।

ধনিকতন্ত্রের সাধারণ অরাজকতায় 'মুনাফার বলি' হিসাবে ভারতবর্ষেও শ্রম-সমর্থ লোক বেকার থাকিবে, তাহা জানা কথা। কিন্তু ভারতবর্ষে মন্দা থাকুক বা না থাকুক সর্ব সময়েই বহুসংখ্যক লোক বেকার বসিয়া থাকে, আরও বেশি লোক অর্ধ-বেকার (under-employed) বা 'প্রচ্ছন্ন' (disguised) বেকার থাকিয়া যায়—বৎসরে পুরা সময় কাজ পায় না। ইহা ভারতের বেকার-সমস্যা, তথা বাঙলার বেকার সমস্যার একটি প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু ইহার কারণ কি?

ভারতে বেকার-সমস্যা

কারণ ঐতিহাসিক-সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ। আমাদের প্রাচীন কৃষি-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা ও পল্লী-শিল্পের সর্বনাশ সাধন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ আপনার বাণিজ্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাতে আমাদের গ্রামের লক্ষ লক্ষ কুটির শিল্পী, তন্তুবায়, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি নানা কারিগর বৃত্তিহীন হইয়া পড়ে। ইঁহারা অনেকেই বাধ্য হইয়া কৃষির উপর নির্ভর করিতে চাহে। কৃষিতে ক্রমেই তাহারা বাড়তি হয়। তাহাতে কৃষিক্ষেত্রেও বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা বাড়ে। ইহারাই অন্নাভাবে তখন দেশ বিদেশে 'কুলি হিসাবে' চালান গিয়াছে। —এখনো মানুষের অধম অবস্থায় রিক্সা ও 'ঠেলা' টানে, পশুর মতো বাঁচিতে চায়। অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপেই পরাধীন ভারতে শিল্পও বাড়িতে পারে নাই। শিল্পাভাবে পুরাতন শিল্পীরাও বেকারের সংখ্যাই বাড়াইয়াছে। ইহা ভারতের কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারে সাধারণ পরিস্থিতি।

সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ

ইংরেজ আমলে দিনের পর দিন এই দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষ এমনি করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, কি কৃষিতে কি শিল্পে কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি পায় নাই। মজুর সস্তা বিলাতী ও দেশীয় পাইয়া মালিকেরা যে উদ্যোগে গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কয়েক লক্ষ লোকের কলে-কারখানায় রেলে এবং সরকারী চাকরিতে কর্মসংস্থান ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বহুগুণ লোকের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

বিকৃত মালিক-প্রয়াস

আর যাহারা কাজ করে তাহাদেরও শতকরা ৮০টি লোকের পারিশ্রমিক এত সামান্য যে, কর্মবান্ লোকেরাও বিশেষ ক্রয়ক্ষমতা লাভ করে নাই। নূতন উদ্যোগে পণ্য উৎপন্ন হইলেও, যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ২৬৫৲ (১৯৬১তে ৩০০৲) টাকা, সেই দেশে সেই পণ্য বিক্রয় হইবে? তাই মুনাফার লোভে নূতন কল কারখানা পত্তনেও পুঁজিপতিরা উৎসাহী নন।

বরং এই দেশে মুনাফাবাজরা দেখে পণ্য উৎপাদন কমাইয়া, এবং তাহার দ্বারা শ্রমিকের কর্মসংস্থানও হ্রাস করিয়া, পণ্যের অভাব বাড়াইলে চোরাবাজারে অনেক বেশী মুনাফা হয়। অতএব, চোরাবাজার যত বাড়িতেছে বেকারের অঙ্কও ততই আরও বাড়িবে। এই সব বিকৃত মালিক-প্রয়াস ব্রিটেনের পাপকে দেশীয় মুনাফাবাজরা আরও দুর্বহ করিয়া তুলিতেছে।

পশ্চিম বাঙলার সেই দুর্বহ অভিশাপ আরও জটিল ও মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে অনেক কারণে। তাহার মধ্যে প্রধান বঙ্গবিভাগ ও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর গৃহহীন, ভূমিহীন, বৃত্তিহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন অবস্থায় পশ্চিম বাঙলায় আগমন। পশ্চিম বাঙলার সমাজ নেতারা যদি সুস্থ ও সক্রিয়, রাষ্ট্রনেতারা যদি সাধু ও কর্মদক্ষ হইত, তাহা হইলেও এই সমস্যার ত্বরিত সমাধান সহজসাধ্য হইত না। দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহা হয় নাই। ভারত-সরকারের নিকট পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা যে পরিমাণ সাহায্য পায় তাহার সিকি ভাগ সাহায্যও বাঙলার উদ্বাস্তুরা পায় নাই। কোনোদিকেই পুনর্বাসনের সার্থক উদ্যোগের যখন চিহ্ন নাই, তখন এই উদ্বাস্তু দলও সুস্থ সাহসে উদ্যোগ-গঠনে তৎপর হয় নাই। তাহারা বেকারের সংখ্যা বাড়াইতেছে, বিকৃত পরিস্থিতিকে আরও বিকৃত করিয়াছে।

বাঙলার দুর্দৈব উদ্বাস্তু

ইহা ছাড়াও বাঙলার বেকার-সমস্যার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সর্ব-ভারতেই আজ মূল সমস্যা দেশের সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধির সমস্যা, শ্রমশক্তির সার্থক প্রয়োগের সমস্যা, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বাঙলায় আবার তাহা আরও করুণ ও জটিল। বাঙলা দেশে জমির উপর চাপ সর্বাপেক্ষা বেশী। সুদীর্ঘ দিনের জমিদারী প্রথার ফলে কৃষির সুব্যবস্থা আরও মারাত্মক সমস্যা। কৃষি-নির্ভর বহু লক্ষ লোক তাই আসলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা আংশিক বেকার। শিল্প বাণিজ্য-ক্ষেত্রে দেখি বাঙালার ব্যবসা, বাণিজ্য, কলকারখানা, খনি, চা-বাগান সবই প্রায় অবাঙালির অধিকৃত। এই মালিক গোষ্ঠীর মুখ চাহিয়াই বাঙলা সরকারও চলিতে বাধ্য। অন্যদিকে শ্রমসাধ্য অধিকাংশ কাজও বাঙালির হাতছাড়া। রেলের কুলি, কারখানার মজুর, রাস্তার মুটেমজুর, ছোট দোকান-পশারী, বিহার-উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ইত্যাদি সকল রাজ্যেরই শ্রমজীবী বাঙলায় অন্নসংস্থান করিতে পারে, কিন্তু বাঙালি—উদ্বাস্তু হউক, গৃহস্থ হউক—

সর্বশ্রেণীর কর্মহীনতা

অধিকাংশই কর্মহীন। মনে হয় অনেকে কর্মকুণ্ঠ, কিন্তু অনেকে যে কমমজুরিতে মানুষের অধম জীবন যাপনে অস্বীকৃত, তাহাও মনে রাখা উচিত। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি অনেককাল কলম পিষিয়া ও জমিদারীর মধ্যস্বত্বের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া টিকিয়াছিল—আজ সেই 'কৃষি-জীবিকার' ফাঁকিতে আর দিন চলে না। অথচ আপিসে মাদ্রাজি কেরানি ও পাঞ্জাবী কর্মচারীতে ছাইয়া যাইতেছে; কারণ বাঙালি কেরানি বড় অবাধ্য, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও জীবনযাত্রা দাবি করে। এককথায় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সর্বস্তরের বাঙালিই একভাবে না একভাবে বেকার-সংখ্যা বাড়াইতেছে।

শিক্ষিত-বেকার

ইহার মধ্যেও যে বাঙলার শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের মাত্র শতকরা ২৫টি লোক 'অক্ষর' চিনে, স্বল্প-শিক্ষিত শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১০ জনও নয়। তথাপি সেই শিক্ষিতের কর্মসংস্থান হয়না—এই কথা শুনিলে অন্য যে কোনো দেশের মানুষ বিশ্বাস করিবে না। এমনি বাঙলার সমাজের দুর্দশা। ইহা শুধু বাঙালি সর্বশ্রেণীর কর্মহীনতা নয়, বাঙালি সমাজনায়কদের অকর্মণ্যতাও বটে।

পরিকল্পনা ও বেকার সমস্যা

শুধু বাঙালিকে দোষ দিয়াই বা কি হইবে। সমগ্র ভারতেরও অবস্থা শোচনীয়। তাই তো সেইসব স্থানের মানুষ 'রুজির' নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে এখানে আসিয়া যায়। একটা বিরাট চেষ্টায় আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম—কৃষির উন্নতি করিব, শিল্পের গোড়া পত্তন করিব, সাধারণের আয়বৃদ্ধি করিব। সেইরূপ আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া আমরা নূতন কর্মোদ্যোগ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কোন্ অভাবনীয় নিয়তি যে, যাহাই করি না কেন, আমাদের বেকারত্ব কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে? আমরা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০ লক্ষের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করিয়া ৮ লক্ষের কর্মসংস্থানও করিতে পারি নাই, অথচ ১৫ লক্ষ নূতন কর্মের প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে গিয়া তাই পরিকল্পনা-বিশারদরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সংকটের কথা কেহ কল্পনাও করে নাই—যত কর্মসংস্থান হইবে লোকসংখ্যা তাহার অপেক্ষা বেশি হইবে।

মৌলিক সমাধান

আসল কথা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ভারতের বেকার-সমস্যা চিন্তা করিতে হইবে এবং নূতন করিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া আর্থিক-উদ্যোগেও কর্মসংস্থানে অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত গোড়াতেই আমাদের গণনায় ভুল থাকিয়া যাইতেছে। যেমন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নির্দেশে দুর্ভাগ্য মনে না করিয়াও আর্থিক উদ্যোগে অগ্রসর হওয়া যায়। চীন তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে—দেশের শ্রমশক্তিকে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উদ্যোগে নিযুক্ত করিয়া চীন 'পূর্ণ কর্মসংস্থান' নীতিরও দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। অন্যদিকে, সেই লোকশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত আয় শিল্পোদ্যোগে খাটাইয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সমাধান করিতেছে। হয়ত মুনাফাতন্ত্রের বিলোপ-সাধনেই চীনে তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয়, তাঁহা হইলে মুনাফাতন্ত্রের অবসান করিয়াই ভারতেরও আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

অবশ্য এই মৌলিক সমাধান ছাড়াও বর্তমান অবস্থার কিছুটা উন্নতিসাধন করা যায়। যেমন, বড় বড় আড়ম্বরপূর্ণ প্রয়াসের পরিকল্পনা না করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি মৌলিক শিল্পোদ্যোগ গঠন করা, দ্বিতীয়তঃ সেই সঙ্গেই জাপানী আদর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তনে স্বল্পবিত্তদের উৎসাহ দান, এবং তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন করা;—এইরূপ কর্মসূচীতেও যথেষ্ট ফললাভ করা সম্ভব। আরও বহু লোকের কর্মসংস্থান এই সামাজিক ব্যবস্থাও হয়—পল্লীশিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সমবায় সহায়তা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির সুযোগ দিলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

অবশ্য শুধু সরকারের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাতে পুরুষকার নাই। বাঙালি মধ্যবিত্তকে দৈহিক শ্রমের মর্যাদা বুঝিয়া কলম-পেষা 'কেরানি বাবু' হইবার লোভ ছাড়িতে হইবে। নূতন জগৎ যাহারা গড়িতেছে তাহাদের কলম-পেষা 'কেরানিবাবু' হইলে চলিবে না, হাতে-কলমে কাজকরা কারুবিদ্, কারিগর, মিস্ত্রি, technicians হইতে হইবে। একমাত্র কারুশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার অধিকারী হইলে এই শিক্ষিত-সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। অবশ্য দেশের শিক্ষা বিস্তারের কাজেও লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিতের কাজ হইবার কথা। এইরূপে বাঙালি নিম্নবিত্ত স্বল্প-শিক্ষিতরাও মিস্ত্রি, মজুর রূপে শিল্পে ও নানা শ্রমসাধ্য কর্মে এখনো আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। মানুষের যোগ্য জীবিকামান নিশ্চয়ই তাহারা ছাড়িবেন না—তবে দৈহিক শ্রমে কুণ্ঠিত হইলেও চলিবে না।

শেষ কথাটা তাই থাকিয়া যায়—সমস্যার এই সাময়িক সমাধানের সাধারণ প্রয়াসও সার্থক হইবে না—যদি বাঙালি জনসাধারণ না বোঝে পৃথিবী শ্রমবলেই চলিয়াছে, ফাঁকি দিয়া আরাম করিবার উপায় নাই, যদি এই জনসাধারণের প্রাণে নূতন-গঠনের সঙ্কল্প ও উদ্দীপনা জাগ্রত হয়, এবং জনসাধারণ দেখে সমাজনায়করাও ফাঁকি দিয়া চলিতেছেন না—তাহারা অপদার্থ নয়, অসার নয়। চাই উপযুক্ত সমাজ নেতৃত্ব। সমাজ-বিকারের যদি অবসানে ঘটে, তাহা হইলে বেকারত্ব কতক্ষণ?

উপসংহার : চাই যোগ্য নেতৃত্ব

।। বাঙালির ভবিষ্যৎ ।।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিতে মানুষের আগ্রহ বোধ হয় সর্বজনীন। দৈবজ্ঞের নিকট হাত পাতিয়া বসিতে কেহই ছাড়েন না। কারণ, কী করিব তাহা যদি বা জানি, তাহা হইলে কী হইবে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। যদি নিষ্ফলই হইব তবে এত ছুটাছুটি, কাড়াকাড়ি করিতেছি কেন? বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেও এই কথা মনে পড়ে। ১৯০৪-০৫ সালে স্বদেশীর যুগে গোখ্‌লের মত বিচক্ষণ ভারতীয় মনস্বীরাই কি কল্পনা করিতে পারিতেন ৫০ বৎসর যাইতে না যাইতে বাঙালী জীবন ভাগ্যের খেলায় এমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে? 'What Bengal thinks today India thinks to-morrow'—এইতো ছিল সেদিন বাঙালির সম্বন্ধে গোখ্‌লের বিচার। আর, শুধু চিন্তাক্ষেত্রে নয়, কর্মক্ষেত্রেও বুকের রক্ত দিয়া বাঙালি তখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার সাধনায় পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অথচ, আজ মনে হয়,—সত্যই আশঙ্কা হয়,—বাঙালির বুঝি জাতি হিসাবে আর বাঁচিবার আশা নাই।

সূচনা

শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্তমান মুহূর্তে বাঙালির অবস্থার কথা ভাবিলে চারিদিকেই দেখি তাহার পথ যেন বন্ধ। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জাতীয় চেতনায় প্রবুদ্ধ সাড়ে ছয় কোটি বাঙালি আজ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যেন আত্মহত্যাই করিতে বসিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রে বাঙালি একটি সংখ্যাল্প গোষ্ঠী—৪০ কোটির দেশে ৪ কোটিও নয়। পাকিস্তানেও বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও ক্ষমতায় দুর্বল। নয়াদিল্লীর চোখে পশ্চিম বাঙলা Problem State; করাচীর চক্ষে পূর্ববাঙলা অবজ্ঞার পাত্র। নয়াদিল্লীর বিরূপতা ছাড়িয়া দিলেও ঘরের বাহিরে প্রতিবেশীর সমাজে দেখি—বিহারে বাঙালি কোণঠাসা, উড়িষ্যায় বাঙালি লাঞ্ছিত, আসামে তো বাঙালিকে খেদাইবার জেহাদ। নিশ্চয়ই অকারণে বাঙালিও তাহার প্রতিবেশীদের বিরাগভাজন হয় নাই। কিন্তু যত কারণই থাকুক বিগত শতাব্দীতে সে এই প্রতিবেশীদের সেবাও করিয়াছে—অন্তত সমগ্র ভারতকে জাতীয়তার মন্ত্রে জাগ্রত করিয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ কে শোনে?

বাঙলার বাহিরে বাঙালির দুর্দশা

তথাপি নিজগৃহে যদি বাঙালি এই দ্বিখণ্ডিত হৃতবল জীবনেও আত্মস্থ হইতে পারে তাহা হইলে হয়ত বাহিরের বিরোধও কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু সেইখানেই বা অবস্থা কি? বাঙলার বাঙালির কথাই ধরা যাউক।

প্রথমতঃ আর্থিক অবস্থার কথাই ধরি। আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় থাকিলে শত বিপদপাতেও সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে।

বঙ্গ-বিভাগের বিষ-প্রতিক্রিয়ায় বাঙলার শরীর কালি হইয়া উঠিয়াছে। যে উচ্চ কণ্ঠে দায়িত্বহীন বাঙালি নেতারা ১৯৪৭ এ পূর্ব বাঙলার হিন্দুকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারা সে প্রতিশ্রুতির সম্ভবত অর্থও উপলব্ধি করেন নাই। অন্ততঃ, পূর্ব বাঙলার হিন্দু বাঙালিকে রক্ষা করিবার কোনো উপায় আর উন্মুক্ত রাখেন নাই। এখন পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব দ্বার রুদ্ধ উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন না দিলেই নয়; পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন যে দুঃসাধ্য তাহা তো জানা আছে। পশ্চিম বাঙলায় সমস্ত ভারতের তামিল তেলেগু পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানীর 'বাসন' সম্ভব হইলেও বাঙালির পুনর্বাসন অসম্ভব। প্রতি দিন অ-বাঙালি এখানে বাড়িতেছে। কিন্তু বাঙালির স্থান নাই। উদ্বাস্তুর সমস্যা কঠিন সমস্যা; কিন্তু যদি বাঙালি সমাজ-নেতাদের সামান্য সাধুতা ও কর্মদক্ষতা এবং ভারতীয় নেতাদের একটু আন্তরিকতা থাকিত, তাহা হইলেও হয়ত এই সমস্যা কিছুটা সমাধান হইবে আশা করা যাইত। এখন মনে হয় তাহা দুরাশা। মনে হয় বাধ্য হইয়াই বিভ্রান্ত উদ্বাস্তুরাও দিনের পর দিন দেহমনে পচিয়া গলিয়া দেশসুদ্ধ মড়ক ধরাইবে।

দ্বিতীয় কথা, বাঙলার কৃষি সঙ্কট দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। জমিদারী প্রথা লোপ হইলেও কৃষক জমির মালিকানা পায় নাই। তাই কৃষির উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ সৃষ্টি হয় নাই। এবং যতই 'বৈজ্ঞানিক চাষের' বাগাড়ম্বর করা হউক এখনো বাঙলার কৃষিতে তাহার বিশেষ প্রয়োগ হয় নাই। তাহা যদি না হয়, শতকরা ৬০টি বাঙালির কোন্ উন্নতির সম্ভাবনা হইতেছে? কৃষির উন্নতির নামে কিছু অর্থব্যয় করাই কি সব?

অপরদিকে, বাঙালির পল্লী-শিল্প ছারখার হইয়াছে, এখনো হইতেছে। যে কোনো কারণেই হউক, তাহার পুনর্জীবনের চিহ্ন বা সম্ভাবনা দেখা যায় না। কোথায় সস্তায় বিদ্যুতের সরবরাহ? কোথায় জাপানী আদর্শে পরিচালিত কুটির-শিল্প? কোথায় সমবায়ের প্রয়োগ? পল্লীমঙ্গলের ব্লক গড়িয়া কি ইহার কোনো ব্যবস্থা হইতেছে?

তৃতীয় কথা, ভারতের মধ্যে বাঙলা কতকাংশে শিল্পোন্নত। কিন্তু কাহার হাতে সেই শিল্প? উহার মালিক ইংরেজ, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া প্রভৃতি, অর্থাৎ বাঙালি ছাড়া পৃথিবীর সর্বজাতি। উহার শ্রমিক—বিহারী, হিন্দুস্থানী, বিলাসপুরিয়া, ওড়িয়া, প্রভৃতি ভারতের সর্বজাতি। বাঙালি তাহাতে কয়জন? এই শিল্পোন্নয়নে তবে কাহার উন্নয়ন? বাঙালির নয়।

চতুর্থ কথা, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থা। হয়ত তাহাদের দুর্দশা খুব বেশি করিয়া সকলের চোখে পড়ে। কারণ, ইহারাই নূতন ভারতকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, দেশসেবায় ও স্বাধীনতার সাধনায়, আধ্যাত্মিক প্রেরণায়

ও মানসিক চর্চায় প্রায় দেড় শতাব্দীকাল পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পূর্বকালের স্বচ্ছন্দ সেই আর্থিক ভিত্তি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। জমির উপস্বত্ব লাভের আশা ফুরাইয়াছে, শিল্পে তাহার স্থান নাই, কেরানিগিরিতেও সে ক্রমশঃই কোণঠাসা হইতেছে। সরকারী চাকরিতে কখনো প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত, কখনো বিরুদ্ধ প্রাদেশিকতায় সে বিব্রত। 'অবশ্য সেই দীর্ঘ শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু আজ তাহা পথ হারাইয়া বসিয়াছে। জীবনে সে যেন আজ পরাজয়ের কোঠায়। তাহার ক্ষোভের দুঃখের, হতাশার, বিদ্রোহেরও তাই অন্ত নাই। কিন্তু তাহাতেই কি পথ হইবে?

শিক্ষা ও বুদ্ধিচর্চায়

আর্থিক অবস্থা ছাড়িয়া বাঙালির অন্য অবস্থার কথা ভাবিলেও আমাদের চোখে এই মুহূর্তে আশার আলো বড় দেখা দিবে না। শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা ধরিলে বলিব, জানি ভারতবর্ষে অন্যত্র যে অবস্থা তাহাও শোচনীয়। কিন্তু চাকরির প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় আমাদের ক্রমাগত এই নিষ্ফলতা তো অবজ্ঞা করিবার মতো জিনিস নয়। তারপর, যদি একবার আমাদের গত একশত বৎসরের শিক্ষারমান, সাংস্কৃতিক প্রয়াসের কথা মনে করি তাহা হইলে মানিতেই হইবে, সে প্রদীপ-শিখায় আজ যেন তেজ নাই। জ্ঞানের সাধনায় কি হইতেছে, কেন এমন হইতেছে? নিষ্ঠাহীন বিদ্যার বাহাদুরি, ফাঁকি, চালাকি—উহা এত বাড়িল কি করিয়া?

স্বাস্থ্য ও দেহচর্চা

স্বাস্থ্য ও দেহচর্চার কথা ভাবিলে একদিকে যক্ষ্মার বিস্তার, অন্যদিকে ফুটবলের মাঠে খেলার ক্রমাবনতির কথা মনে না করিয়া পথ নাই। জানি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, জাতিগত আমাদের দেহদৌর্বল্য এসব মিথ্যা নয়। কিন্তু তাহা লইয়াই তো আমরা পূর্বেও খেলিয়াছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে পিস্তল লইয়া দাঁড়াইয়াছি, হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি পরিয়াছি—আর দুর্ভিক্ষে প্লাবনে সমস্ত দেশের সেবাভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র জাতিকে সেবার মধ্য দিয়া আপনার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এখন? সে সাহস কোথায় গেল? সে তীব্রচ্ছটা বীর্য, শান্ত নর-নারায়ণ সেবার ব্রত কেন নাই?

সত্যই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে দেখি মেঘে মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। তবু কে বলিতে পারে যে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আবার এক নূতন রূপান্তরের সূর্যালোকিত পৃথিবীতে আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইব না? মেঘের ফাঁকে একেবারেই যে সূর্যরশ্মি দেখা যায় না এমন নয়। যতই বলুক বাঙলা "সমস্যা পীড়িত", কলিকাতা "মিছিলের শহর"—আমরা জানি আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শ সাময়িক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক তুচ্ছ করিয়া পৃথিবী-ব্যাপী গণ-জাগরণের ও সমাজ-সাম্যের কাছে

আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে—উহা তো কম সত্য নয়। সাময়িক লাভের হিসাব করিয়া আমরা পূর্বযুগে স্বাধীনতার সাধনা করি নাই, সাময়িক লাভের হিসাব করিয়া এই যুগে শোষণহীন সমাজতন্ত্রের কথাও আমরা প্রচার করি না। এই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও আমরা টিঁকিয়া আছি—বাঙালি কারিগর কারখানায় প্রশংসা পায়, বাঙালি ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক, কারুবিদ্, সম্মানিত কর্মী। স্বাস্থ্য ও দেহচর্চায় পশ্চাৎপদ হইয়াও আমরা দেহোন্নতির চর্চা কম করি নাই, বাঁচিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিই নাই। আর, আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতিতে আগ্রহ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। আজ ভারতের অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীরাও অগ্রসর হইতেছে, হইবেন, ইহাও আমাদের কামনা। তথাপি আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য, বাঙলা-শিল্পকলা অগ্রগণ্য। পৃথিবীতেই তাহার আদর আছে, বিজ্ঞানের ও মনস্বিতার ক্ষেত্রে এখনো আমরা সচেষ্ট। আর ফিলম্-এ, নাট্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ।

তাই বলিতেছিলাম—দুর্দিন আসিতেছে ঠিক, পূর্ব গৌরব ম্লান হইয়া যাইতেছে তাহাও সত্য। কিন্তু জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজ বাঙালি এখনো মহৎ সম্ভাবনার অধিকারী। কিন্তু চাই আরও কায়িক পরিশ্রম, মানসিক দৃঢ়তা এবং চাই নবজীবন গঠনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাহা থাকিলে কে বলিবে যে যদি পঞ্চাশ বৎসরে ভাগ্যের নিপীড়ন আরও বৃদ্ধি না পায় বাঙলার ভবিষ্যৎ আবার নূতন শ্রী সঙ্কল্পে ঝলমল করিয়া উঠিবে না?

।। পল্লী-উন্নয়ন ।।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতবাসীর জীবন যাত্রা পল্লীকেন্দ্রিক—ইতিহাসের এই সত্যটি বিস্মৃত হইবার মতো নয়। ইহাও কল্পনা করিতে পারি, আগামী দিনে যখন শিল্পোন্নত নূতন ভারত জন্মলাভ করিবে, যখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিরও-উন্নয়নে এই পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন কৃষি-প্রণালীরই পরিবর্তন সাধিত হইবে, তখনো ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশই থাকিবে। এমনকি, শিল্পাগ্রসর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পল্লী ছাড়িয়া শুধু মাত্র কলিকাতাকে ঘিরিয়া পাক খাইয়া এই পৌর প্রদীপের প্রদীপ্ত-শিখায় পুড়িয়া মরিবে না। কিন্তু যদি মনে করি, বাঙলার বা ভারতবর্ষের গ্রাম তথাপি এখনকার মত প্রাণ-সম্পদহীন পল্লীই থাকিবে, অথবা, প্রাচীন-কালের স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বল্প-সন্তুষ্ট

সূচনা

বহির্বিমুখ প্রাণযাত্রার কেন্দ্র হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে বলিব আমরা অলীক 'উন্নতির' কল্পনা করিতেছি, অলীক 'অতীতের'ও আরাধনা করিতেছি, এবং আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতিকেই বিস্মৃত হইয়া রচনা করিতে চাহিতেছি একটা অসম্ভব স্বপ্ন। প্রকৃতপক্ষে, দেশে যদি শিল্পোন্নয়ন হয় তাহা হইলে গ্রামবাসীও তাহার ফলভাগী হইবে। আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন হইলে বাঙলার পল্লীজীবনের উন্নয়ন তো অনিবার্য। বরং কৃষি-উন্নয়নের সঙ্গে পল্লী-উন্নয়ন প্রায় একসূত্রে বাঁধা, ইহাই সত্য

প্রাথমিক প্রয়োজন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

কী ছিল আর কী হইয়াছে, স্বভাবতঃই বাঙলার পল্লীর কথা বলিতেই তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু ভাবাবেগ সংযত করিয়া একবার ভাবি না কেন—'মা কি হইবেন', 'মা কি হইতে পারেন?'

'সোনার বাঙলা' আজ দুর্ভিক্ষের বাঙলা, দুর্ভাগ্যের বাঙলা। তাহাকে জীয়াইতে হইলে আজ প্রথমেই প্রয়োজন হইবে তাহার জীবনের সামগ্রিক পুনর্গঠন।

অবশ্য সকল গঠনেরই মূল কথা—গঠনের চেতনা, সৃষ্টির ভাবনা, জ্ঞানের আলোক-বিস্তার। শিক্ষালাভের ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক আয়োজন না থাকিলে কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়—আর্থিক নয়, সামাজিক নয়, দৈহিক নয়, মানসিক নয়, কোনো কিছুরই নয়। শিক্ষার সেই ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের সেই আয়োজন পল্লী উন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজন। আবার ইহার মধ্যেও জনশিক্ষার আয়োজনই প্রথম প্রয়োজন।

জনশিক্ষার ব্যবস্থা

এককালে বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও, পুঁথিপত্র না পড়িয়াও, এ দেশের পল্লীবাসী যাত্রায়, কথকতায়, লোকগানে, শিল্পে, সাধু সজ্জনের সাহচর্যে, মুখে মুখে তৎকালীন সুশিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিত। আজ সে সব লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রায় নিষ্প্রাণ। তাহা অবহেলা করিবার কথা বলিতেছি না, কিন্তু শিক্ষা-বিস্তারের যে নবতম আয়োজন বর্তমান সভ্যতা প্রণয়ন করিয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রামবাসী আপামর সাধারণ কেন পাইবে না? সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পাঠশালা, স্কুল নিশ্চয়ই সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এবং প্রাথমিক পর্বে পল্লী-বিদ্যালয় পল্লীবাসীর প্রধান প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষাদান করিবে,- তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু তাহা ছাড়াও গ্রামে নিশ্চয়ই থাকিবে পাঠাগার ও গ্রন্থশালা; নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হইবে স্কুলে, গ্রন্থশালায়, নাটমন্দিরে-বেতারবাণীর এবং শিক্ষামূলক নানা সভার, সম্মেলনের বক্তৃতার ও আলোচনার।

স্বাস্থ্যের দাবি যে এক হিসাবে আরও মৌলিক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দীর্ঘকালের অবজ্ঞায়, অখাদ্যে, অপুষ্টিকর খাদ্যে, ভেজালে তাহা আরও আজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর। স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের সঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জলের, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষেধক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের সাধারণ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত কি প্রয়োজন নয়? শুধু দাতব্য চিকিৎসালয় শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্লিনিক—এই কী যথেষ্ট? মাতৃসদন শিশু পালনের সুব্যবস্থা প্রভৃতি দেহপালনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই সুসংঘটিত না করিলে চলিবে কেন? নূতন ঔষধপত্র, পেনিসিলিন, অ্যান্টিবায়োটিক্‌স, সালফা ঔষধ অকালমৃত্যুকে দূরতর করিয়াছে। কিন্তু যদি স্বাস্থ্যোন্নতির আযোজন না হয় তাহা হইলে অকাল বার্ধক্যের ও দৈহিক অক্ষমতার বোঝাই দেশে দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উঠিবে। অতএব চাই—স্বাস্থ্য উজ্জ্বল পরমায়ু।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন

এইবার প্রধান প্রয়োজনে ফিরিয়া আসা যাউক—প্রত্যেকটি প্রয়োজনের পক্ষেই উহা প্রায় মৌলিক—আর্থিক উন্নয়নের কথা। পল্লীর এই আর্থিক উন্নয়নের বিরাট ও জটিল সমস্যা কেহ বিস্মৃত হইতে পারে না, কেহ সম্ভবতঃ সবিস্তারে তাহা বলিয়াও উঠিতে পারে না। কী চাই, তাহার তালিকা যেমন অশেষ; কী নাই, তাহার তালিকাও তেমনি অফুরন্ত। এই দুই অভাবের মধ্যে একটা সঙ্গতি রক্ষা করিবার মতো প্রথম সূত্র হইল—সমবায়িক নীতিতে পল্লী-উন্নয়নের সংগঠন স্থাপন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ।

মূলনীতি স্থির হইলে প্রথমতঃ চাই কৃষির উন্নয়ন, অর্থাৎ কৃষকের জমির মালিকানা লাভ, বৈজ্ঞানিক চাষের সর্ববিধ ব্যবস্থা—যেমন, চীনে হইতেছে। আর চাই উন্নত সার, উন্নত বীজ, উন্নত সেচ, উন্নত হল-কর্ষণে, গভীরতর কর্ষণে, উৎপাদনবৃদ্ধি, ফসলের সযত্ন রক্ষণ, সমবায় পদ্ধতিতে ধর্মগোলা পত্তন, আর ক্রয়-বিক্রয়ের আয়োজন। দ্বিতীয়তঃ চাই পল্লী শিল্পের বিকাশ—কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে সরাইয়া আনিয়া এই পল্লী-শিল্পের উৎপাদনে নিয়োগ। তারপর সেই পল্লী-শিল্পের সংগঠন। নূতন কুটির-শিল্পের প্রবর্তন, পুরাতন কুটির-শিল্পের সংস্কার-সাধন, লোকশিল্পের সম্ভাব্যতা বুঝিয়া উৎসাহ দান, ইহাতো সর্বজন-স্বীকৃত কথা। শুধু তাঁত ও বস্ত্রের কথা বা চর্মদ্রব্যের কথা নয়, ছুরি কাঁচি, পিতল কাঁসা, চিরুনি বোতাম প্রভৃতি বহু জিনিসই শহরের বিরাট কারখানায় এখন প্রস্তুত না করিয়া পল্লীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় উৎপন্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু উহার জন্যও চাই স্বল্প সুদে পুঁজি জোগানো, ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা; তারপর বিদ্যুৎ সরবরাহ, পথঘাট-যানবাহনের সুব্যবস্থার দ্বারা আমদানী-রপ্তানীর পথ প্রশস্ত করা। বলা বাহুল্য, গ্রামের বৃত্তিহীন জনসাধারণকে বৃত্তি জোগাইতে না পারিলে তাহারা পল্লীতে পল্লী-সৌন্দর্য ও পল্লী-শ্রী খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে না—শহরে ছুটিবে, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই।

প্রাণধারণের প্রয়োজন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই শহরের প্রশস্ত জীবন প্রবাহের আকর্ষণে তাহারা পল্লীর পায়ের ধুলা পল্লীতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া শহরের ধূম্র ও বহ্নিময় জীবনে আত্মসমর্পণ করিবে।

হাঁ, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মানুষ পল্লী ছাড়িয়া শহরের আকর্ষণে ছুটিয়া আসে, আসে বলিয়াই শহর জাঁকিয়া উঠে। আসে বলিয়াই জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর হয়, সভ্যতা শতধারায় আপনাকে বিকশিত করিবার তাড়না বোধ করে। শ্রমশিল্পের বিস্তার বাড়ে, যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক জোটে। হয়ত ক্লেদ বাড়ে, গ্লানি বাড়ে, অভাব বাড়ে, অপরাধ বাড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে চৈতন্যের পরিধি। বাড়ে মানসিক সংস্কারের স্থলে বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসার নূতন তাগিদ। জীবন সম্বন্ধে নূতন আশা, নূতন প্রত্যাশা, নূতন অভীপ্সা। অতএব, শহরকে 'নিষিদ্ধ এলাকা' করিয়া লাভ নাই, তাহা নিষ্ফল হইবে, শহরের পক্ষেও অকল্যাণকর হইবে। বরং গ্রামকেই যথাসম্ভব শহরের সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ করিতে হইবে। যানবাহনের যোগাযোগ, বিদ্যুতের সরবরাহ, জ্ঞানাহরণের জন্য স্কুল লাইব্রেরী, রেডিও-সংবাদপত্র প্রভৃতি অনেকাংশে গ্রাম্যজীবন সহনীয় করিবে। তখনো নিরানন্দ পল্লীতে যদি পল্লী-উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন না হয়, মেলা না বসে, পল্লী গানের আসর না জমিয়া উঠে, এবং নৃত্য-নাট্য হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহে এক আধদিন করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে বা স্কুলে চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে পল্লী অধিবাসীর প্রাণ বুভুক্ষু থাকিবে। আর এইসব ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ হইলে যানবাহনে, রেডিও-ফিলমে মিলিয়া আধুনিক পল্লী উন্নীত হইয়া কি শহরের অনুরূপ হইয়া উঠিবে না?

চাই আনন্দের যোজনা

হাঁ, তাহাই হইবে। পল্লী-উন্নয়নের অর্থই এই। আধুনিক সভ্যতার সমস্ত আধুনিক সুবিধাসমূহ পল্লীবাসীরও আয়ত্ত হইবে—শহর ও পল্লীর মধ্যে যে অস্বাভাবিক পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দূর হইবে। তবেই পল্লীর শ্যামল শ্রী হইবে কল্যাণ-শ্রী।

উপসংহার

।। কুটির শিল্প ।।

[প্রবন্ধ-সংকেত]

আধুনিক যুগ যন্ত্রোৎপাদনের যুগ, অতিকায় যন্ত্র কলকারখানার যুগ (large-scale production), ইহা সাধারণ সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির-শিল্প কি অচল? না।

সূচনা

১। কুটির শিল্পের সার্থকতা লোপ পায় নাই; (ক) বড় বড় শিল্পের জোগানদার হিসাবে ছোট ছোট কুটির শিল্প বিকশিত হইতে পারে। যেমন, জাপানে হইয়াছে। উহার উৎপাদন খরচ সামান্য—গৃহস্থ সপরিবারে উৎপাদন করিতে পারে। (খ) তাহা ছাড়াও, সকল দেশেই পল্লীবাসী কুটির-শিল্পকে পোষণ করিয়া চলে। (গ) ব্যক্তির নিজস্ব রুচি, কারুকর্ম ও নৈপুণ্যের চিহ্ন বহন করিয়া কলা-বস্তু হিসাবেও কিছু কিছু কুটির-শিল্প সর্বদেশেই আদরণীয়।

২। আমাদের দেশ পল্লীকেন্দ্রিক বিরাট দেশ; অনেকাংশে পল্লীনির্ভর; পল্লীজীবনও কতকাংশে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। নিশ্চয়ই দেশে যন্ত্রবহুল শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন সস্তা ও সরল যন্ত্রে কুটিরগত উৎপাদন। কারণ, (ক) সর্বব্যাপী শিল্প রাতারাতি বিকাশলাভ করিবে, ইহা সম্ভব নয়। (খ) বিরাট জনবলকে দেশ সংগঠনে সার্থক করিতে হইবে—তাহার কর্মসংস্থান বিরাট যন্ত্রে হইবে না, হইবে কুটির শিল্পে। (গ) উহাতে গ্রাম ও সমাজের রূপান্তর সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হইবে।

৩। প্রয়োজন (ক) যেখানে সম্ভব বিলুপ্ত কুটির-শিল্পের উদ্ধার। যেমন, তাঁত, রেশমের কাজ, কাঁসার কাজ, কামারের ও কুমারের কাজ—মাদুর, শতরঞ্জি ও পাটি, খেলনা, ইত্যাদি। (খ) নূতন শিল্পের প্রবর্তন—যেমন, পুতুল গড়া, স্টোভ, সাইকেল, ব্যাটারী, বিদ্যুতের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস মেরামত করা।

৪। চাই নূতন আর্থিক ব্যবস্থা—(ক) ব্যাঙ্কিং ও পুঁজির ব্যবস্থা, (খ) মার্কেটিং ও ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা, (গ) চাই বিদ্যুতের জোগান, (ঘ) ট্রেনিংএর ব্যবস্থা, (ঙ) প্রদর্শনী ও পুরস্কার দ্বারা উৎসাহদান।

এই কথা যেন মনে না করি শুধু কুটিরশিল্প বলিয়াই কোনো জিনিস চিরদিন ঐরূপেই টিঁকিয়া থাকিবে। যখন তাহার আয়ু ফুরায় তখন শত চেষ্টা করিলেও তাহাকে জীয়াইয়া রাখা যায় না। রবার-টায়ার লইয়া গরুর গাড়ি চলিতেছে, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি যাইতে বসিয়াছে। সিল্ক, নাইলন আসিয়া আমাদের রেশমকে প্রায় কোণঠাসা করিতেছে। সমাজের প্রয়োজন বুঝিয়াই তাই কুটির শিল্পেরও যোজনা করিতে হয়।

উপসংহার

।। ভারতের আর্থিক উন্নতির ও পরিকল্পনার কথা ।।

সূচনা

"যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক শুধু মহুয়া ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে সেখানে আবার ধর্ম কি?"—কথাটা সামান্য মানুষের নয়, স্বামী বিবেকানন্দের। দেশের চারিদিকে যে দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী রূপ দেখিয়াছিলেন তাহাতে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণও তীব্র দাহে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তারপরে আরও পঞ্চাশ বৎসর গিয়াছে। সেই মৃত্যুর নিঃসীম শূন্যতা হইতে আমরা জীবনের পথে পদার্পণ করিয়াছি ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট। পণ্ডিত জহরলালের ভাষায় 'গোলামী' গিয়াছে, এখন 'গরিবীর' অভিশাপ দূর করিবার সংকল্প আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সেই আর্থিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই আমরা উন্নত আর্থিক জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছি। ১৯৫১ হইতে দুইটি পঞ্চবার্ষিকী আর্থিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে করিতে এখন (১৯৬১ সাল) আমরা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের ভাগ্য এই পরিকল্পনাসমূহের সফলতার ও বিফলতার সহিত জড়িত। প্রায় ৪০ কোটি লোকের জীবন মরণের প্রশ্ন।

পরিকল্পনার যুগ

আর্থিক পরিকল্পনার বিষয়টি তাই আমাদের বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। মানুষের বাস্তব জীবন, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যে অনেকাংশে আর্থিক জীবনের উপর নির্ভর করে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি হইতে আমরা তাহারই ঘোষণা পাই। আধুনিক কালের মানব-সভ্যতার ইতিহাসবেত্তারা অনেকেই মনে করেন, সংস্কৃতি সভ্যতা সর্বাংশে না হইলেও অনেকাংশেই আর্থিক উদ্যোগ-আয়োজনের ফল। কিন্তু এই আর্থিক জীবন, উদ্যোগ-আয়োজন সমাজের সকল মানুষের আদান-প্রদানে, পরিশ্রমে-কর্মে, ভাবনায় কামনায় মিলিয়া জটিল নিয়মে গড়িয়া উঠে। সেই নিয়ম বুঝাও অসাধ্য, তাহা পরিচালনা কোনো মানবীয় শক্তির পক্ষে সম্ভবই নয়—ইহাই ছিল সাধারণভাবে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা। মানুষ অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাহার আয়-ব্যয় ও বৈষয়িক ক্রিয়া-কর্মের পরিকল্পনা চিরদিনই করে; চিরদিনই আপন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও তাহা করিয়াছে। এমনকি, সমাজ পরিচালক হিসাবে বহু দেশের রাষ্ট্রশক্তি আর্থিক বিধিবিধান দ্বারা বিশেষ পণ্য-উৎপাদন নিয়মিত বা পণ্যের বিতরণ, কিংবা মুদ্রার বিনিময়ও নিয়ন্ত্রিত করিত। তথাপি কেন্দ্রীয় সমাজের সমগ্র আর্থিক জীবনকে প্রয়োজনানুরূপ পরিকল্পনা করিয়া পরিচালনা করিবে; এবং স্বাধীন যদৃচ্ছা ব্যবসায়িক

প্রতিযোগিতা থাকিবে না, ইহা এতদিন কেহই মনে করিত না। সোভিয়েত দেশ যখন ১৯২৮ এর পরে প্রথম 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার' সঙ্কল্প ঘোষণা করিল তখন তাই পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী ও ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ হইতে সোভিয়েত পরিকল্পনা-সমূহের সফলতাতে ইহাই বুঝা গেল যে, সমাজ-জীবন কোনো একটা রহস্য নয়, মানুষ তাহাকে সুচিন্তিত প্রণালীতে বিকশিত ও পরিচালিত করিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তাহাতেই জীবনের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভাবিত ও ত্বরান্বিত হয়। এমন কি, যে সব জাতির আর্থিক বিকাশ কোনো কারণে নিরুদ্ধ বা মন্দীভূত হইয়া আছে তাহাদের গতিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে এবং অগ্রগামী জাতিদের সহযাত্রী হইতে হইলে, পরিকল্পনা দ্বারা নিজেদের আর্থিক বিকাশকে সচল ও ত্বরান্বিত না করিলেই নয়। আসল কথা পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না—যদি জনসাধারণ উদ্যোগী হয় তাহা হইলে পরিকল্পনা সার্থক হয়। সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯২৯) হইতেই আরম্ভ হইল পরিকল্পনার যুগ। আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এইরূপ 'পরিকল্পনার' দ্বারা নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। অবশ্য একটা কথা আছে। সোভিয়েত পরিকল্পনাকারীরা বলিয়াছিলেন—সমাজতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে আর্থিক পরিকল্পনা সম্ভব নয়।

পরিকল্পনার দুই রূপ। মুনাফাতন্ত্র, ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিযোগিতা ও অরাজকতা বন্ধ না হইলে 'কেন্দ্রীয়' পরিকল্পনা কার্যত অচল হইতে বাধ্য। কিন্তু মুনাফাতন্ত্রী দেশেও এখন পরিকল্পনা পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহা আমরা জানি। অবশ্য সেই সব দেশের পরিকল্পনা সামগ্রিক পরিকল্পনা নয়। সেখানে উহার অর্থ মুনাফার রাজত্বকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিয়া টিকাইয়া রাখা, সমাজের পূর্ণশক্তির সদ্ব্যবহার নয়। উহার বেগ তাই প্রখর হয় না,—উহার সাফল্যও সীমাবদ্ধ।

চীন ও ভারতবর্ষের দুই দেশের পরিকল্পনার তুলনা করিলেও আমরা দুই রকমের পরিকল্পনার পরিচয় লাভ করি। মোটামুটি চীনের পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রী, পরিকল্পনা প্রায় সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ও সাধারণ-আয়ত্ত। ভারতের পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক 'কল্যাণ রাষ্ট্রের' পরিকল্পনা, 'মিশ্র পরিকল্পনা',—উহাতে ইস্পাত, খনিজ তৈল, রেল, বিমান ও সামরিক প্রয়োজনীয় শিল্পাদি মুখ্য (basic) ও গুরু (heavy) শিল্প হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত থাকিবে। সাধারণ ভোগ্য দ্রব্য, যেমন, বস্ত্র, চিনি এবং যন্ত্রপাতি, অন্যান্য খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি ব্যক্তিমালিকানায় (private sector) চলিবে। কিছু শিল্প প্রয়োজন মত দুই বিভাগেই চালনা করিবে। বলা বাহুল্য, দুই পরিকল্পনারই প্রধান শর্ত জনসাধারণের সমর্থন। জনগণ যদি তাহাতে উৎসাহিত ও উদ্যোগী না হয় তাহা হইলে কোনো পরিকল্পনাই সফল হইতে

মিশ্র পরিকল্পনা

পারে না। ভারতের প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইতে চলিয়াছে। অনেক ব্যর্থতা ও অনেক সার্থকতায় তাহা বিজড়িত। তাহার সম্পূর্ণ হিসাব এখনো বুঝিয়া উঠা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাহার উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের সাধারণ পরিচয় লইয়া আমরা এখানে বুঝিয়া দেখিতে পারিব—প্রধানতঃ কী প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কতটা ফল ফলিতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের জীবনমানের উন্নতি। অর্থাৎ দারিদ্র্যের অবসান নয়, তবে ক্রমাধোগতি রুদ্ধ করিয়া তাহার মোড় ফিরানো। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের পরিকল্পনার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া তখন পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শক্তিদের পরামর্শ মত স্থির করা হইয়াছিল—ভারতবর্ষে মুখ্য শিল্প-গঠনের চেষ্টা না করিয়া কৃষির উন্নতি ও কৃষি-জাত উৎপাদনের উন্নতির চেষ্টা করা প্রয়োজন। মুখ্য (basic) শিল্পের বা যন্ত্রগঠক গুরু (heavy) শিল্পের পত্তন তাই তখন পরিকল্পিত হয় নাই। সাধারণের ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষির প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থারই উপর তখন জোর দেওয়া হয়। মোট প্রায় ২,৩৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর উপত্যকা যোজনার মত অনেক বড় বড় সেচ পরিকল্পনা, সিন্ধ্রির সারের কারখানা ও যানবাহন প্রভৃতির নির্মাণের আয়োজন হয়। অথচ শিক্ষা ও জনকল্যাণের মত খাতেই টাকা অব্যয়িত থাকিয়া গেল। বেকার সমস্যারও উপশম হইল না। মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ টাকা হারে মোট হিসাবে বাড়িলেও সন্দেহ হয় যে, ধনীরাই আসলে অধিকতর ধনী হইয়াছে। দরিদ্ররা দরিদ্রই রহিয়াছে, বরং দরিদ্রেরা দুর্মূল্যতায় আরও পিষ্ট হইতেছে। আর একটা কথাও আছে—২.৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু কতটা ব্যয় ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা এখনো বুঝা সম্ভব নয়।

প্রথম পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু আংশিকভাবে রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্পবৃদ্ধির ও শিল্পোন্নয়নের আদর্শই গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য পরে তাহা অনেকাংশে খর্ব করিতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে ও প্রতিকূল বাণিজ্যের চাপে আরও তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদর্শ ছিল—প্রায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় বাড়াইয়া সাধারণ জীবনমান বৃদ্ধি করিতে হইবে; মুখ্য ও বৃহদাকার শিল্প পত্তন করিতে হইবে; পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও কর্ম সংস্থানের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে; এবং মানুষে মানুষে এদেশে আয় ও সম্পত্তির যে বিরাট বৈষম্য রহিয়াছে তাহা খাটো করিতে হইবে; ইত্যাদি। ভিলাই, রুরকেল্লা, দুর্গাপুর প্রভৃতির ইস্পাতের কারখানা, ভাক্রা নাঙ্গাল প্রভৃতির বাঁধ, বিরাট গবেষণাগার, নানা উদ্যোগ-আয়োজন—এই সব

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংকট

দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু যাহা বুঝা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়—একটা সংকটও এবার দেখা দিয়াছে। যতটা খাদ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া বলা হইয়াছিল ততটা উৎপন্ন হয় না। খাদ্যসংকট তাই এবার দেখা যাইতেছে। দুর্মূল্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; যতটুকু কর্মসংস্থান হইবার কথা তাহাও হইবে না। অপর দিকে জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া সমবায়-কৃষির পত্তনও বিশেষ হয় নাই। আরও ভয়ঙ্কর কথা—কি শিল্পে কি কৃষিতে, কোথাও জনশক্তি এইসব উদ্যোগে, আয়োজনে উৎসাহবোধ করিতেছেন না। জনসাধারণ মনে করেন না ইহা তাহার আপনার জিনিস। ইহাই ভয়ানক কথা—মনে হয় অকর্মণ্যতায়, অসাধুতায় ও অনভিজ্ঞতায় মিলিয়া অপব্যয় এমন হইতেছে যে, সাধারণভাবে যোজনা-সমূহ আশানুরূপ ফলদায়ক হইবে না।

তথাপি নিরাশ না হইয়া তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যে শ্রেয়ঃ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যাহাতে অপব্যয় বিদূরিত হয়, তাহা দেখিতেই হইবে। কিন্তু দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনা ব্যতীত বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। আমরা যেন মনে রাখি যত ভুলই হোক—যে চেষ্টা আমরা করিতেছি দুই শত বৎসর ইংরেজ রাজত্বে তাহার নামগন্ধও কেহ শুনিতে পায় নাই। তাই এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—আমরা নূতন জীবনের চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছি, উদ্যোগে ব্রতী হইয়াছি। এখন প্রয়োজন সাধুতার, কর্মকৌশলের, অকৃত্রিম দেশসেবার—আর সবার উপরে জনশক্তিকে এই উদ্যোগে ব্রতী করা।

॥ সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ॥

[প্রবন্ধ-সংকেত]

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় মনস্বীরা আমাদের বারে বারে মনে করাইয়া দিয়াছেন—ইউরোপ 'নেশন' গঠন করিয়াছে, রাষ্ট্রশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের জীবন। কিন্তু ভারতবর্ষ গড়িয়াছে সমাজ। আমাদের সমস্ত জীবনযাত্রা সমাজের মধ্যে বিধৃত ও বিকশিত। এই ভারতীয় সমাজের পাদপীঠ ছিল পল্লীসমাজ—আর স্বয়ং-সম্পূর্ণ সেই পল্লী-সমাজের মূলনীতি ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

সূচনা

যুগাবর্তনে আজ আমরাও রাষ্ট্র গঠন করিয়াছি, শিল্পোন্নত নূতন সমাজ গঠন করিতে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু ভারতের প্রাণকেন্দ্র যে তাহার

৬ লক্ষ গ্রামে অবস্থিত, এবং সেই প্রাণশক্তিকে যে আপনার ধারায় বিকশিত হইতে দিতে হইবে এই সত্য না মানিলে চলিবে কেন? এই জন্যই আধুনিক ভারতের আর্থিক পরিকল্পনার একটি প্রধান অংশ হইল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা। অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ১৯৫২ এর ২রা আগষ্ট, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে, ৫৫টি কেন্দ্রে উহার প্রথম উদ্বোধন হয়—তারপর এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ক্রমশঃ সর্বত্র সম্প্রসারিত ও নানা ধারায় বিকশিতহইয়া চলিয়াছে।

(১) বিন্যাস: পরিকল্পনার 'একক' (unit) আনুমানিক ১০০ পরিবার ও ৫০০ অধিবাসী যুক্ত এক একটি 'গ্রাম'। এইরূপ কৃষি-উৎপাদনে, পানীয় জলে, গোচারণে, কুটির-শিল্পে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায়

পরিকল্পনার রূপরেখা

স্বাস্থ্যে, চিকিৎসায়, এমনকি, গ্রাম-রক্ষায় পর্যন্ত প্রতি ব্যাপারে এইরূপ প্রত্যেকটি গ্রাম হইবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ—সেই প্রাচীন ভারতের অনুরূপ, কিন্তু আধুনিক জীবন-সম্পদে পরিপুষ্ট। এইরূপ স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামগুলি সংহত হইবে 'মণ্ডলে', প্রায় ১০০টি গ্রাম সংহত হইবে এক-একটি উন্নয়ন মণ্ডলে (বা Development Block)। আর ৩টি 'মণ্ডলে' প্রায় দেড়লক্ষ বা দুইলক্ষ অধিবাসী লইয়া গঠিত হইবে এক-একটি উন্নয়ন-কেন্দ্র। সেইখানে বুনিয়াদী শিক্ষা-শিক্ষণ কেন্দ্র, সালিশী আদালত, ট্রাকটর সরবরাহ-কেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতি আঞ্চলিক বৃহত্তর আয়োজন থাকিবে। (২) আর্থিক হিসাবে দুই ধারায় জীবন গঠিত হইবে: 'মৌলিক' বিভাগের কাজ কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি; ইহাতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে। 'মিশ্র' বিভাগের কাজ পল্লী-শিল্পের উন্নয়ন—ইহা ভারত-মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা চুক্তির দ্বারা অর্থপুষ্ট। (৩) পরিচালনা: কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতির হাতে। একজন পরিচালক (Administrator) ও একজন (মার্কিনী) নিয়ন্ত্রক (Director) উহার কর্তা; 'মণ্ডলীর' উপদেশমত তাঁহারা কাজ চালাইবেন। রাজ্যে রাজ্যেও এই ধরনের 'রাজ্য উন্নয়ন সমিতি' থাকিবে, উন্নয়ন কমিশনার থাকিবেন, আবার তাঁহাদের নিচে জেলা উন্নয়ন কর্মচারী, ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী প্রভৃতি থাকিবে। (৪) উন্নয়নের কাজের শিক্ষাকেন্দ্রাদিও থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গ এইরূপ ৮টি উন্নয়ন ব্লকে বা 'মণ্ডলে' বিভক্ত হইয়াছে।

সুদীর্ঘ প্রস্তাব ও ব্যয়বহুল প্রয়াস সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে,—পল্লীর জনসমাজ এখন পর্যন্ত এই উন্নয়ন প্রয়াসকে আপনার কাজ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পল্লীর প্রাণ-শক্তির সঙ্গেও এই কর্মচারী-চালিত

উপসংহার সমালোচনা:

সংগঠনের যোগ ঘনিষ্ঠ হইতেছে না। তাই প্রস্তাব হইয়াছে—জনগণের হাতে উহার অধিকতর পরিচালনা-ভার অর্পণ করার। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? সমস্ত উদ্যোগ যখন উপরতলা হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তখন জনসাধারণকে আজ ডাকিলেই কি হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইবে।—এইটাই সমস্যা—কি করিলে গ্রামের লোক আত্মোন্নয়নের দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইবে।

॥ মেট্রিক সিস্টেম ও শিক্ষার কথা ॥

আমাদের দেশে এখন দশমিক হিসাবের প্রবর্তন হয়েছে। এর প্রারম্ভ 'নয়া পয়সা' প্রচলনে। এক শত নয়া পয়সায় এক টাকা। গণ্ডার হিসাবে না করে দশের হিসাবে আমরা আজ নয়া পয়সার হিসাব করি। সকলেই এখন প্রায় বোঝেন—নয়া পয়সায় হিসাব অনেক সহজ। দশমিক পদ্ধতিতে আমরা এখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। মুদ্রা ছেড়ে তাই পরিমাপের ক্ষেত্রেও এখন এ পদ্ধতির প্রবর্তন দিন আরম্ভ হয়েছে।

পরিমাপের ব্যাপারে দশমিক পদ্ধতির রূপ হল 'মেট্রিক সিস্টেম'। পৃথিবীর প্রায় ৮৯টি রাষ্ট্রে তা প্রচলিত। কারণ দশমিক পদ্ধতি সর্বাধিক বিজ্ঞান-সম্মত হিসাবের পদ্ধতি, সব থেকে সরল, সব থেকে সুবিধা-জনক। আমাদের দেশেও তাই অনেক দিন ধরেই দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়েছিল। কারণ, ভারতবর্ষে সর্বত্র প্রচলিত কোনো পরিমাপ ছিল না। ভারতবর্ষে প্রায় ১০০ রকমের 'মণ' প্রচলিত আছে। আর 'ক্ষেত্রফল' আছে' ১৫০ রকমের। 'ঘনফল' বা জিনিসের ঘনত্বের মাপের ক্ষেত্রে তার অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক মান বর্তমানে চালু আছে। এর উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পাউণ্ড-শিলিং, পাউণ্ড-টন-হন্দর দিয়ে বেঁধে আমাদের ব্রিটিশ বাণিজ্য-সাম্রাজ্যের বশীভূত করে রেখে-ছিলেন, অথচ ব্রিটিশ পরিমাপ পদ্ধতি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। স্বাধীনতা লাভ করার পরে আমরা তাই দশমিক পদ্ধতি প্রচলন করবার সুযোগ পেলাম। এই পদ্ধতি শুধু আন্তর্জাতিক ও বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি নয়, মূলতঃ আমাদের জাতীয় পদ্ধতি বলেও গণ্য হবার যোগ্য। কারণ দশমিক রীতি ভারতবর্ষেরই উদ্ভাবনা। তবে আমরা পরিমাপের ব্যাপারে তার প্রয়োগ করি নি। তা হলেও তা প্রয়োগ করতে এখনো আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না—কেবল অভ্যাস একটু বদলাতে হবে।

পরিমাপের পরিবর্তন কেন

পরিমাপের বেলা 'মেট্রিক সিস্টেম' প্রথম গ্রহণ করে অগ্রসর হয় ফ্রান্স। 'মেট্রিক' কথাটির মূল হচ্ছে 'মিটার' নামে একটি শব্দ। 'মিটার' শব্দটি আমাদের 'মাত্রা' শব্দের কাছাকাছি। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দৈর্ঘ্যের নাম দেওয়া হয় 'মিটার'। দৈর্ঘ্য পরিমাপে 'মিটার' হল 'একক' বা 'ইউনিট'। পরিমাপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি ১ মিটার হচ্ছে আমাদের পরিচিত ১ দশমিক ১ গজের মত। দৈর্ঘ্যের একক যেমন 'মিটার', মেট্রিক সিস্টেমে, ওজনের 'একক'

মেট্রিক-ওজনের মাত্রা

তেমনি 'গ্রাম', আর ঘনফলের একক 'লিটার'। 'গ্রাম' খুব ক্ষুদ্র মাপ। আমাদের ১ সের প্রায় ১ হাজার গ্রামের কাছাকাছি; ১০০০ গ্রামে হয় ১ কিলোগ্রাম। ১ কিলোগ্রাম আমাদের ১ সের ১ ছটাকের একটু বেশি। তাই গ্রামের অপেক্ষাও আমাদের দেশে 'কিলোগ্রামকে' আমরা ওজনের মূল মাত্রা বলে ধরে নিতে পারি।

এই গ্রাম-কিলোগ্রামের রীতি পদ্ধতি বুঝলেই 'মেট্রিক সিষ্টেমের' ধারণা হয়ে যায়। আর সে মূল তত্ত্ব খুবই সহজ। ইউনিট বা 'এককের' উপরের দিকে মাপ বাড়ে দশগুণ-দশগুণ করে। নিচের দিকের মাপ কমে দশভাগ-দশভাগ হয়ে। যেমন—কিলোগ্রামকে যদি 'একক' ধরি—সে কিলোগ্রাম আমাদের ১ সেরের একটু বেশী—কিলোগ্রাম থেকে একেবারে নিচে গেলে পাব 'মিলিগ্রাম' একেবারে উপরে 'টন'। নিচে থেকে উপরে উঠব এরূপ :— ১০ মিলিগ্রামে ১ সেন্টিগ্রাম, ১০ সেন্টিগ্রামে ১ ডেসিগ্রাম, ১০ ডেসিগ্রামে ১ গ্রাম, ১০ গ্রামে ১ ডেকাগ্রাম, ১০ ডেকাগ্রামে ১ হেক্টোগ্রাম, ১০ হেক্টোগ্রামে ১ কিলোগ্রাম। আর কিলোগ্রামের থেকে উপরের দিকে যাব এরূপ :—১০ কিলোগ্রাম ১ মিরিয়াগ্রাম, ১০ মিরিয়াগ্রামে ১ কুইণ্টল, ১০ কুইণ্টলে ১ টন। বুঝতে অসুবিধা নেই, তবে মনে রাখতে হবে ধাপের নামগুলো—এর মধ্যেও অবশ্য 'গ্রাম' শব্দটাই মূল, তা মনে রাখা এমন কঠিন নয়।

কেউ কেউ ওজনের ছড়াও বেঁধে ফেলেছেন :

ওজনের আর্যা

দশের গুণে 'মিলি'যে পাবে 'শান্তি', 'দেশী', 'গ্রাম',
'গ্রামে'র শেষে 'ডেকো', 'হেঁকো',—মিলবে 'কিলোগ্রাম'।
'কেলোর' পরে দশের গুণে 'মিরি', 'কুন্তল', 'টনে'।
দশমিকের ওজন ধারা—শুভঙ্করে ভণে ॥

অবশ্য 'মেট্রিক পদ্ধতি' প্রবর্তনের পরে শুভঙ্কর ও ধারাপাতের নিয়ম ছাত্রদের পক্ষে আর প্রয়োজন হবে না। প্রথম অঙ্ক শেখার বেলা আমার মত অঙ্ক-সশঙ্ক ছাত্র কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া ও ভগ্নাংশের উৎপাতে কী বিভীষিকাতেই না ভুগেছে! 'মেট্রিক সিষ্টেম' চালু হলে ভাবী দিনের ছাত্রদের আর সেরূপ ভুগতে হবে না। শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই এ বিষয়ে এক মত। কেউ কেউ বলেন ছাত্রদের পুরনো ও নতুন সব হিসাব শিখতে হবে। একথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভুলে যান—প্রাথমিক শিক্ষায় গণিতের স্থান কী, ও প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত কি ভাবে শিক্ষণীয়।

শিক্ষার প্রশ্ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। ফ্রান্স হচ্ছে মেট্রিক সিস্টেমের পীঠস্থান। ৭ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ৮ বৎসর তাদের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাল। ফরাসী শিক্ষাবিদ্‌রা বয়স অনুযায়ী ছাত্রের বোধশক্তি ও শিক্ষার প্রয়োজন বুঝে পাঠক্রম প্রভৃতি স্থির করেছেন।

তাঁদের সিদ্ধান্ত ও অভিজ্ঞতা হয়ত অনেকাংশে আমাদেরও গ্রহণযোগ্য। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরাও ভাবছেন—মেট্রিক সিষ্টেমে কিভাবে গণিত শিক্ষণীয় হবে। বাংলা দেশেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন মেট্রিক সিষ্টে-মের প্রবক্তারা। বিশেষজ্ঞরা সব প্রায় একমত যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে একমাত্র মেট্রিক সিষ্টেমের আশ্রয়েই গণিত শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। পুরনো পদ্ধতির গণিত, সে শুভঙ্করীই হোক বা ইংরেজি আর্যাই হোক,—সে বয়সে, সে স্তরে ছাত্রদের ওপর চাপানো নিষ্প্রয়োজন। প্রাথমিকের পরের স্তরে সে সব শিক্ষণীয় হতে পারে। কিম্বা, যে মধ্যশিক্ষা পেল না, অথবা যার পুরনো হিসাব শিক্ষার প্রয়োজন, সে-ই সব মাপের অঙ্ক শিখে নেবে—এখনো যেমন তা নেয়।

দশমিকের গণিত

এজন্য কার্যতঃ প্রচলিত গণিতের প্রাথমিক পাঠক্রম পরিবর্তন দরকার, এবং প্রাথমিক গণিতের বই নতুন করে লেখাও দরকার। তা থেকে আনা-গণ্ডা কড়া-ক্রান্তি গজ-ফুট-সের-মণ প্রভৃতি অঙ্কের হিসাব ও দৃষ্টান্ত বাদ যাবে। ভগ্নাংশের ও মিশ্র অঙ্কের ও ল. সা. গু-গ. সা.গু-এর স্থান নেবে দশমিকের অঙ্ক।

সব শিক্ষাই শিশু বয়সে দিতে হয় হাতে-কলমে। প্রথম হল সংখ্যা শিক্ষা। সংখ্যা গণনা হয়ত হাতের আঙুল বা গুটি গুণেই শিশুরা শিখবে। তারপর, গুণতে গেলে দশের কোঠায় পৌঁছলেই যে বাম দিকে সংখ্যা বাড়বে, তা দশগুণ হয়ে উঠলেই শতের 'সংখ্যার বামে' আর একটি সংখ্যা বাড়বে,—এ বোঝানো দরকার এবং এখনো বোঝাতে হয়। কিন্তু এর পরেই বোঝানো দরকার হবে দশমিকের তত্ত্ব ও রূপ। 'নয়া পয়সার' প্রচলনে তো বোঝানো বোধ হয় সহজ হয়েছে। ১ 'নয়া পয়সা' যে ১ টাকার শতাংশ, আর তা লেখার পদ্ধতি দশমিক চিহ্নের পরে ডানদিকে শূন্য এক (০১), ডান দিকে সংখ্যা বসবে অংশ বোঝাতে, এ তথ্যে আমরা শিক্ষিত লোকেরা অভ্যস্ত হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে লেখার ব্যাপারে শূন্যের [০] প্রয়োগও রপ্ত হয়েছে। যেমন—১. ন. প. লিখতে হলে লিখি শূন্য এক [০'০১]। শিশুর হাতে 'নয়াপয়সা' দিয়ে এ তত্ত্বটা বোঝানো ও লেখার নিয়মটা শেখানো মোটেই এমন শক্ত নয়। ওজন ব্যাপারেও শিশু-শিক্ষার্থীর কাছে মেট্রিক সিষ্টেমের ওজনের ধারণা স্পষ্ট করতে হলে 'কিলোগ্রাম', 'গ্রাম', 'মিরিয়া', 'কুন্তল', 'টন' প্রভৃতি পরিমাপ-লেখা ওজনখণ্ড ও বাটখারা চাই। দৈর্ঘ্যের মাপ বুঝাবার জন্য তো নিশ্চয়ই চাই এক 'মিটার' মাপের কোনো দণ্ড বা স্কেল,—যাতে নিচের দিককার ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার মাপগুলির দাগ কাটা থাকবে, উপরের দিকে ১ হাজার মিটারে ১ কিলোমিটার, এও জানা থাকবে।

মেট্রিক শিক্ষার উপকরণ

আর তার থেকে বুঝা সহজ হবে ১ ইঞ্চি হচ্ছে প্রায় ২৫'৪ মিলিমিটার ; ১ গজ হচ্ছে প্রায় ০'৯১ মিটার ; অর্থাৎ ১ মিটার তা হলে ১ গজের থেকে একটু কম ; এবং ১ মাইল হচ্ছে প্রায় ১'৬ কিলোমিটার (অর্থাৎ ১৬ কিলোমিটার প্রায় ১০ মাইল)। এ সব কথা শিশু শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে। তেমনি 'লিটা-রের মাপের জন্যে ডেসিলিটার, সেন্টিলিটার, মিলিলিটারের দাগ-কাটা একটি মগও থাকা চাই স্কুলে। আর জমির পরিমাণ বোঝাবার জন্য স্কুলের প্রাঙ্গনে ১০ মিটার দৈর্ঘ, ১০ মিটার প্রস্থের একটি অংশ চিহ্নিত করে রাখারও প্রয়োজন। বালকবালিকাদের যে কোনো পরিমাপ পদ্ধতি বোঝাতে হলেই এ ধরনের হাতে কলমে শিক্ষার অয়োজন করতে হয়—'মেট্রিক সিষ্টেমের' জন্যই যে কেবল প্রয়োজন তা নয়। একটা কথা, নূতন পরিমাপ অভ্যাস করতে হলে প্রথম থেকেই দেখা দরকার পুরোনো অভ্যাস যেন নোতুন বংশধরদের আর কবলিত করে না বসে, মেট্রিক সিষ্টেমেই যেন অবাধে তাদের প্রথম অভ্যাসও সহজ অভ্যাস হয়ে ওঠে। তা হলে 'মেট্রিক সিষ্টেমই' দেশের অভ্যস্ত পদ্ধতি হয়ে যাবে।

[মন্তব্য : এটি একটি রেডিও কথিকা রূপে ১৯৫৯ সালের ২০শে জুলাই ৭-৩০ মি. কথিত হয়েছিল। ছাত্রদের উপযোগী বলে তা দেওয়া হল।]

॥ একটি শিল্পোদ্যোগের শহর ॥

(দুর্গাপুর)

সূচনা

দেশজুড়ে এখন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চল্‌ছে। দশ বৎসর প্রায় হতে চল্‌ল আমরা দেশ-গঠনে পরিকল্পনা-মূলক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছি। এই শেষের পাঁচ বৎসরে আবার বিশেষ করে আমাদের লক্ষ্য হয়েছে শিল্পোন্নয়নের বনিয়াদ রচনা করা। ভিলাই রাউরকেল্লা আর দুর্গাপুরের তিনটি বড় ইস্পাতের কারখানাই হবে তার মধ্যে প্রধান। তিনটি কারখানাতেই প্রায় এখন (ইং ১৯৬১ এর দিকে) কাজ শেষ হতে চলেছে—উৎপাদনের কাজ পূর্ণ বেগে চল্‌বে।

ভ্রমণের আয়োজন

এ সব কথা আমরা নিত্য শুনি, খবরের কাগজে পড়ি, এমন কি চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েও ছবিতে দেখি। বাঙলা দেশের মেয়ে হলেও আমার মনও তাতে নেচে ওঠে—'কিছু হচ্ছে' ; 'কিছু হচ্ছে।' অবশ্য তারপর আবার মন দমেও যায়—নানা কথাকানে আসে, চোখেও কিছু কিছু দেখি, নিজেও বুঝি—কোথায় যেন গলদ থেকে যাচ্ছে। তবু যখন আমারই জানাশোনার মধ্যে কেউ কেরানি হয়ে যান রাউরকেল্লায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ছোটেন ভিলাইতে, কেউ হিসাব-নবিশের অধীনে

কাজ পান দুর্গাপুরে—তখন বাঙলা দেশের মেয়ে বলেই নিজের জন্য একটু দুঃখবোধ না করে পারি না। আমার বয়সী যে ছেলেরা স্কুলে-কলেজে পড়ে তারা কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে বিজ্ঞান পড়বে, কারু-বিজ্ঞানের ছাত্র হবে, হাতে কলমে ধাতব-বিজ্ঞানের শিক্ষা নেবে—রাসায়নিক বা পদার্থ-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বিদ্যায় হবে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান্। আর আমি?—অঙ্কও জানি, ভুগোলে স্বাস্থ্যতত্ত্বেও কৌতূহল কম নয়, ইচ্ছা করে, শুনি মহাকাশের কথা বা ভূপদার্থ-বর্ষের রোমাঞ্চকর গবেষণার তথ্য। কিন্তু আমার স্বপ্ন মাটির তলে পাখা ঝাপটিয়েই বুঝি বা শেষ হবে, অঙ্কুরিত বীজের মত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার সৌভাগ্য তার কোথায়? আমি বাঙালা দেশের মেয়ে, মধ্যবিত্ত কেরানি পিতার পাঁচটি ছেলেমেয়ের একটি। স্নেহবঞ্চিতা নই, কিন্তু আমার কারু-বিজ্ঞান শিক্ষার স্বপ্ন হাস্যকর। এমন কি, উচ্চ শিক্ষার আশাটাও অর্থাভাবে অনেকাংশে দুরাশা। মনে তবু সাধ থাকে—একটা কিছু দেখি, বুঝি দেশে কী হচ্ছে। সেবার কাগজে দেখছিলাম রাষ্ট্রপতি এসে দুর্গাপুরের ইস্পাতের কারখানার উদ্বোধন করবেন। আমার প্রতিবেশিনী বীণার বাবা সেখানকার একজন মাঝারি ইঞ্জিনিয়ার। মা ও ছোট ভাইবোনেরা থাকেন সেখানে—কেবল বীণাই কলকাতায় মামাবাড়ি থেকে পড়ে। বীণাকে মন্ত্রণা দিলাম, তোমার বাবাকে ধরো, নতুন শিল্পোদ্যোগের শহর দুর্গাপুর একবার আমরাও দেখব। আশা পূর্ণ হল। অবশ্য 'উদ্বোধন উৎসব' দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—তখন 'ভি-আই-পি'-র ভিড়; বীণার বাবার তখন নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর থাকবে না। সপ্তাহ-খানেক পরে ১৯৬০ সালের শুরুতেই আমরা দুজনায় এক দিন চলে গেলাম শিল্পোদ্যোগের শহরে দেখতে দুর্গাপুরে।

দুর্গাপুরের রূপান্তর

কলিকাতা থেকে ১২০ মাইলও নয় দুর্গাপুর। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে ছিল একটি ছোট গ্রাম—শাল বনের মধ্যে, 'ডাঙার' লাল মাটিতে এবড়ো-খেবড়ো জনবিরল অঞ্চলে একটি ছোট গ্রাম। পশ্চিমে মাইল খানেক দূরে যে দামোদর তাও বোধ হয় চোখেই পড়ত না। এখনো চারদিকের বনকাটা জমি ও ডাঙা দেখলে তা কল্পনা করা যায় কী ছিল দুর্গাপুর—পশ্চিম রাঢ়ের রুক্ষধূসর গ্রাম। আর তার মধ্যে এখন ঝক্-ঝকে তক্-তকে শাদা শাদা ছোট বাড়ির সার, ফুলগাছে ভরা বাঙলোর বাহার, লাল মাটির বুকে কালো 'টারের' সড়ক, সাইকেল রিক্‌শর ছুটোছুটি, মোটর ও লরির ধূলি উড়ানো ধাবমানতা, সর্বোপরি কারখানার লম্বা বাড়ি, নানা আকারের উঁচু চোঙা, রহস্যজনক বিরাট দেহ,—এখানে-ওখানে কোথাও ডাঙার পিছনে লুকানো কোনো কারখানা, আবার ডাঙার উপর দিয়ে উঁচু মাথা কোনো মহাকায়

কারখানার দম্ভভরা দৃষ্টি—দেখতে দেখতে কল্পনা করতে পারি কী হচ্ছে দুর্গাপুর—ময়দানবের নতুন কারখানা!

ইস্পাতের কারখানা দিয়েই আমার কল্পনার আত্ম-বিস্তার। ইস্পাতের উপযোগী লোহার উপকরণ তো আমাদের প্রচুর। ইস্পাতও আমরা গড়েছি,

ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের অবস্থা

—সমুদ্রগুপ্তের সেই লৌহস্তম্ভ তো আজও পৃথিবীর বিস্ময়। কিন্তু সেই নতুন কালের মতো করে ইস্পাত না গড়তে পারলে নতুন কালে আর জাতি গঠনও করা যায় না—বাঁচতেও পারা যায় না। কিন্তু দেশ-গঠন করতে আমাদের দেয় কে? নিজবাসভূমেই আমরা এতদিন ছিলাম পরবাসী। তবু তার মধ্যে জামশেদজী টাটা বাঙালী ভূবৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বসুর পরামর্শ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন (১৯১২) টাটার কারখানা। মার্টিন বার্ণও বার্নপুরে ইস্পাত কারখানা গড়েন ১৯১৬তে। তারপরে মহীশূরের ভদ্রাবতীতে সরকারী ইস্পাত কারখানা গঠিত হয়েছিল ১৯৩৩এ। স্বাধীনতার পরেও এসব কারখানা বেশী বাড়ল না। এশিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ খনিজ লৌহ আছে ভারতবর্ষে, অথচ ইং ১৯৫৪ পর্যন্ত তবু ১৭ লক্ষ টন মাত্র ইস্পাত তৈরী হত এদেশে। হিসাব করে দেখা গেল ৪৫ লক্ষ টন পাকা ইস্পাত,—তা ৬০ লক্ষ টন কাঁচা লোহপিণ্ডের সমান,—আমাদের এখনই উৎপাদন না করলে নয়। পুরোনো কারখানা তিনটি তাই প্রসারিত হচ্ছে, আর সরকারী "হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেড" এর মালিকানায় স্থাপিত হচ্ছে আরও তিনটি নতুন ইস্পাত কারখানা। বিদেশীদের সাহায্য না নিয়ে তা গড়া অসম্ভব। রাউরকেল্লার (উড়িষ্যা) কারখানা গড়বার ভার নিয়েছে জার্মান-কর্তৃপক্ষ। ভিলাই'এর (মধ্যপ্রদেশ) ভার নিয়েছে সোভিয়েত দেশ। আর দুর্গাপুরের (পশ্চিমবঙ্গ) ইস্পাত কারখানা গড়বার ভার ১৩টি ইংরেজ কোম্পানি একযোগে, তাদের সংক্ষিপ্ত নাম—"ইস্কন"। এই প্রত্যেকটি নতুন কারখানা ১০ লক্ষ করে মোট ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত যোগাবেই ১৯৬২ সালে। রাউরকেল্লায় ১৯৫৯ এর ফেব্রুআরিতে বাত্যাতাড়িত চুল্লীর (blast furnace) প্রথম চুল্লীতে কাজ শুরু হয়; পর দিনই সে কাজ শুরু হয় ভিলাইতে; দুর্গাপুরে শুরু হয়েছে এখন ডিসেম্বরের শেষে।

'বাত্যাতাড়িত চুল্লী' (বা ব্লাষ্ট ফার্নেস) হল ইস্পাত কারখানার মূলভিত্তি। দূর থেকেও তার প্রথমটার উঁচু মাথা দেখা যায়—সামনে এলে মনে হয় এ যেন এক রাক্ষসের চুলা। কিন্তু ইস্পাতের কারখানা যে কি কাণ্ড—লোহা ও ইস্পাতের যে কত জাত, উপজাত ও নির্মানে কত বৈশিষ্ট্য আছে, আর ইস্পাত গড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক উপাদান দিয়ে আরও কত জিনিস যে গড়া যায়—তা কি না দেখলে বোঝা যায়? কিম্বা দেখলেই কি বোঝা যায়, বা মনে রাখা যায়? শখ করে তো ইস্পাতের কারখানা

দেখতে এসেছি কিন্তু এ যে অভাবনীয় কত বিভাগ! ৩টা ব্লাষ্ট ফার্নেস বললে, ৫টা রোলিং মিল বা ৭টা ষ্টীম মেলটিং শপ বললে, ব্লুমিং মিল, মার্চেণ্ট মিল, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা মিলের নাম বল্‌লে, কিম্বা রেলের চাকা, এক্‌সেল, স্লিপার হবে, বললেই [illegible] বুঝ্‌ব? কোথা থেকে আস্‌ছে সেই লোহা-কণা -ভরা মাটি? কোথা থেকে আস্‌ছে কয়লা, বিজলী, কিম্বা এই সব যন্ত্রপাতি, তা ভাবলেও চমক লাগে। তারপর কত রকমের বাছাই, চোলাই, ফুটানো, সাফ করানো,—তবে না কতকগুলো লোহার কণামাখা মাটি থেকে লাল টক্‌টকে ফুটন্ত তরল লোহা বেরোয়, তারপর একটা লোহার পিণ্ড (ইনগট)। তার সঙ্গে কত পরিমাণের কোন্ ধাতু মিশিয়ে কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার হয় ইস্পাত, তা কি আমি বলতে পারি?—আমি হচ্ছি শহরতলীর গরীব স্কুলের টেন্‌থ ক্লাশের সামান্য ছাত্রী। জীবনে কারুবিদ্যা বলতে জানি স্ূঁচের সেলাই আর পুতুল গড়া। দেখে দেখে শুধু আমার মাথাই ঘুরে যাচ্ছে। যাঁরা দেখাচ্ছিলেন তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ইঞ্জিনীয়ারিং পাস-করা বাঙালি ছেলে ছিল এ কাজে। বুঝলাম বুঝিয়ে কথা বল্‌তে সে জানে। কিন্তু তাই বলে আমাদের মত একেবারে আনাড়িরা কি বুঝবে? কি একটা গোলমালে দুদিন ধরে ফুটন্ত কাঁচা লোহার কড়াই লাইনে থেমে পড়ে আছে, কাজও তাই সে সময়ের মত বন্ধ। কাজের বুঝি কি? তবু শুনে দুঃখ হল। তাই দর্শয়িতা যুবকটিকে বললাম্, দেখলেই বা কি বুঝতাম। তিনি বললেন—"আমরাই বা কতটুকু বুঝি? কিছু জানি, কিছু দেখি, কিছু শুনি, কিছু মেনে নিই। আর যা জানি না তার কথাও কিছু বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে পারি। এই জটিল উৎপাদন পদ্ধতির সব কথা জানেন এমন বিশেষজ্ঞ কেউ নেই। প্রত্যেকেই তার কাজ জানে, আর সে সম্পর্কিত আরও কিছু জানে। তারপরে আসলে শিখতে হয় কাজ করতে করতে। এখানকার ইংরেজ কারিগররা অনেকে কলেজে পড়ে নি, তারা সাধারণ মিস্ত্রি কারিগর। ওদের ইংরেজি লেখা দেখলে আমরাও হাসি—কলম-ভোঁতা হয়ে যায় নিজের নাম লিখতে। কিন্তু কী মাথা, কী হাত। কত নোতুন জিনিস কাজের তাগিদে ওরা নিজেরাই মাথা খাটিয়ে ঠিক করে নেয়।"

আমি বললাম, "তা হলে আমারও আশা আছে, না?" "নিশ্চয়ই, যদি অন্যদেশের মেয়েরা পারে—আমেরিকায়, জার্মানিতে, রাশিয়ায়,—আমাদের দেশের মেয়েরাই বা পারবে না কেন?"

মনে মনে বল্‌লাম—আমাদের বেদ-পুরাণের দেশ বলে। মুখে বললাম, "আপনারা পারছেন তো?"

"সুযোগ পেলে পারি। —তবে সুযোগ পাওয়া বড় সহজ নয়।"

কী ব্যাপার? কিন্তু তা বুঝে নিতে হবে। চাকুরে মানুষ তা আর বললেন না। আমরাও তো চাকুরেরই ছেলে মেয়ে—এক আধটুকু তো আগেও শুনেছি। দুর্গাপুরের সমস্ত কারখানায় মোট প্রায় ৩০ হাজার লোক কাজ করছে। এর মধ্যে ৩৫০ জন ইংরেজ। অবশ্য তারাই ইস্পাত কারখানার প্রধান কর্তৃপক্ষ। দেশীয় ছোট বড় ইঞ্জিনীয়ারই বেশি, তাঁদের মধ্যেও বাঙালি অনেক। এখনো তবু বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনতে হচ্ছে। আরও ৮০ জন দেশী ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের জন্য বিলাতেও প্রেরিত হচ্ছেন। তবে কাজের ভার পুরোপুরি দেশীয় লোকেরা কবে নেবেন, তা বলা এখনো কঠিন। কিন্তু ভার না পেলে কি কাজ শেখা যায়?—এ কথাটা সত্য। এইটাই বোধ হয় দেশীয় যুবক কারুবিদ্‌দের কথা। শিক্ষার বনিয়াদ যার আছে তাকে কাজের ভার দেওয়াই প্রয়োজন, তা হলেই সে ফুটে উঠতে পারে, আমিও এইটুকুই বুঝি।

দেশীয় কারুবিদদের আশা?

ইস্পাত-পালা সাঙ্গ করে ছুটলাম দেখতে কোক্ ওভেন—কয়লা পোড়ানো চুল্লী। কয়েক মাস পূর্বে রাষ্ট্রপতি তার উদ্বোধন করে গিয়েছেন। তখনো খুব সমারোহ হয়েছিল। দুর্গাপুর শুধু ইস্পাতনগরী নয়, এটি হবে বহু নূতন শিল্পোদ্যোগের কেন্দ্র। 'রাঢ়' হবে 'রুঢ়'—আমাদের প্রচার কর্তাদের ভাষায় 'ভারতের রুঢ়।' এখানে আরও অনেক কারখানার আয়োজন হবে। কোক্ ওভেন সেরূপ একটা বড় ব্যাপার। কয়লা পুড়িয়ে একটা ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় না নিলে কয়লার কালো ধোঁয়ায় কাজই অসম্ভব। আমরাও নাকি ওরূপ পোড়া কয়লা দিয়েই রাঁধি। তবে আরও ভালো কয়লা না হলে বৃহদাকার উৎপাদনের কাজ চলে না। জামশেদপুর, বার্ণপুরের ইস্পাতের কারখানায় ওরূপ কোক্ ওভেনের ব্যবস্থা কোম্পানি নিজেরাই করেছে। এখানেও ইস্পাতের কারখানার নিকটেই তা করা হচ্ছে—প্রকাণ্ড কয়লা শিল্পের কারখানাটার ভিতরে চুল্লী এক একবার হাঁ করে তা থেকে পোড়া কয়লা উদ্‌গীরণ করে দিচ্ছে—ঘুরে ঘুরে তার নানা বিভাগ দেখলাম। কিন্তু আরও আনুষঙ্গিক অনেক উৎপাদন এখনো আরম্ভ হয় নি।—কয়লা থেকে বেনজিন, জাইলেন, ন্যাপথা, ন্যাপথালিন, পিচ (আলকাতরা), ক্রিয়োজোট প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ার হয়। এবং একমাত্র এইভাবেই কয়লার অপচয় বন্ধ হতে পারে। তাই দুর্গাপুরে ওসব তৈরী করবার কারখানা ও বিভাগ গড়ে উঠেছে। একটা সারের কারখানাও হবার কথা আছে, ভারত সরকার তাতে রাজী হলেই হয়। এ সবে কাজ আরম্ভ হলে সত্যই দুর্গাপুর একটা আশ্চর্য শিল্পশহর হয়ে উঠবে। প্রায় তিন ডজন রাক্ষুসে চুল্লী, বাঙালি ছেলেরাও তাতে আগুন দিচ্ছে, বিরাট বিরাট

কয়লা শিল্পের কারখানা

কয়লার চাক—তারাই চাঙরায় ভরছে, কী পরিশ্রমের কাজই না তারা করছে! দেখে গর্ব হল কে বলে বাঙালি পরিশ্রমে ভয় পায়? একটু কষ্টও হল, মাসীমার কাছে শুনেছি দুর্গাপুরে গ্রীষ্মে কী গরম পড়ে, আর মেসোমশায়ের অবস্থা হয় তখন কিরূপ—কাজ থেকে ফিরলে যেন আগুনে পোড়া মানুষ।

কথা আছে এখান থেকে কয়লার গ্যাস যাবে কলকাতায়, গ্যাস তৈরীর ব্যবস্থাও তাই হবে। কলকাতার মত বড় শহরে মানুষ কয়লা পুড়িয়ে রাঁধে—প্রত্যেকের চুলোর ধোঁয়ায় নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস বিষিয়ে তোলে, আর আকাশ বাতাসকে কালো করে। এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা অন্য দেশে কেন, বোম্বাইতেও লোকে ভাবতে পারে না। আর কয়লার এমন অপচয় তো অন্য দেশ শুনলে শিউরে উঠবে। গ্যাস যদি কলকাতায় আসে তা হলে বাঁচব সব থেকে বেশি আমরা মেয়েরা—যাঁরা কয়লায় পুড়ে পুড়ে রাঁধি।

গ্যাসের উৎপাদন

সেদিন কবে হবে জানি না, কিন্তু তখন দেখতে দেখতে দুপুর হয়েছে। খাবার খেতে ফিরলাম মেসোমশায়ের 'কোয়ার্টারে'। মাইল দুই পথ—জুনিয়ার সুপারভাইজারদের দু কুঠুরি বাসা; উঠতে বসতে জায়গা কম। সেখানে কিন্তু মাসীমা কয়লার চুলোয় এই দুর্মূল্যের দেশে যা পান তাই রেঁধে বসে আছেন—মাছও জোগাড় করেছেন।

অপরাহ্ণে বিশ্রামের পরে এলো গাড়ি—মেসোমশায় তা জোগাড় করেছিলেন। না হলে এ দিকের শহর দেখা হবে না। দুর্গাপুরে বাস এখনো কম, যাতায়াত এখনো কষ্টসাধ্য। গাড়ি না পেলে রেলের লাইনের ওপারের দামোদর উপত্যকার বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উদ্যোগ দেখা অসম্ভব হত। যাক্, উপরের একজন বড় কর্মচারীর সহায়তায় গাড়ি পাওয়া গিয়েছে।

শহরের চেহারা
বাসস্থান

এদিকে শহর দেখতে দেখতে চললাম—সকাল বেলাও দেখেছিলাম কতকটা। কারখানা ছাড়া, তার বড় বড় আফিস ছাড়াও দেখলাম বড় বড় কর্মচারীদের কী চমৎকার 'বাঙলো', বাগান, টেনিস খেলার মাঠ। এ সবে সাহেবই বেশি। তাদের জন্য ভিন্ন ক্লাব, ভিন্ন আমোদ-প্রমোদ, সুইমিং পুল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর-দুয়ার। এমনকি চমৎকার বিলাতী ধরনের স্বতন্ত্র স্কুল পর্যন্ত ইংরেজ ছেলে মেয়েদের জন্য। দু'দশ জন উচ্চ ভারতীয় দক্ষ কর্মচারী, কারুবিদ ও সাহেবদের সহযোগিরূপে এসব সুবিধা ও আরামের আস্বাদন লাভ করেন। চমৎকার ছবির মত তাঁদেরও বাড়িঘর, বাগান—তবে অত সুন্দর সাজিয়ে রাখা নয়। এ ছাড়া দেখলাম মাঝারিদের মাঝারি ব্যবস্থা, ছোটদের ছোট ব্যবস্থা। শ্রমিক আবাস আছে, ভোজনাগার আছে, বাজার

আছে তাদেরও ; তবে, ছোট'র মত' করে ছোট। রেল লাইন পেরিয়েও দামোদরের দিকে দামোদর বাঁধ ও খালের কর্মচারীদের বাড়িঘর দেখলাম। এ সব পূর্বেই নির্মিত—তেমনি সুন্দর। তবে চারদিক যেন• ধূ ধূ করছে, এখনো গাছপালা নেই।

মোটরের কল্যাণে ছুটে ছুটে দেখলাম—কাঠ ও আসবাব তৈরীর কারখানা, ইঁটের পাঁজা ও বাড়িঘরের ইঁট তৈরীর ব্যবস্থা। তারপর বিকালের দিকে এসে বসলাম দামোদরের তীরে। একদিকে খাল—যা নাকি গঙ্গায় নিয়ে যাবে এদিককার কয়লা ও মালপত্র ; আর অন্যদিকে নদীর আড়াআড়ি কপাটে বাঁধা দামোদরের স্রোত—উপরে সেতু। এখন শীতকাল। দেখে কে বল্‌বে এ নদ এমন নির্মম ডাকাত ? কিন্তু ওই ধূ ধূ মাঠের পরে জল দেখতে বড় ভালো লাগল। সবসুদ্ধ মনে হল—আমরা কিছু করতে চাই। ভুলচুক কমিয়ে দিতে হবে—একটা বড় গৌরবের কাল একাল।

দামোদরের বাঁধ, খাল,

বাড়ি ফিরে এসে দু কোঠার কোয়ার্টারে খেয়ে-দেয়ে বীণাদের পাশাপাশি যখন ঘুমিয়ে পড়ছি—তখন আমার মনে হল সুযোগ পেলে হয়ত আমিও কিছু করবার যোগ্য হতাম। সে সুযোগ কি এই শিল্পোদ্যোগের দিনেও বাঙালি মেয়ে পাবে না ?

[মন্তব্য : ইচ্ছা করেই ভ্রমণ-কাহিনীর কাঠামোতে এ রচনাটি লেখা হল। ভ্রমণ শুধু পুরনো শহরে হবে কেন, নূতন শিল্পোদ্যোগের শহর কি কম দর্শনীয় ? ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যেও এ রচনা গণ্য হতে পারে। আর সে জন্যই একটি বাঙালি ছাত্রীর ভ্রমণ-কাহিনী রূপেও রচনাটি লেখা হল। দেশে ছাত্রীও আছে। আসলে তাদের দেখা ভ্রমণের কথা বা শহরের বর্ণনা লিখতে পারলে চমৎকার হয়। স্থানাভাবে তার আভাস মাত্র দেওয়া হল। ইচ্ছা করলেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও অন্য অনুচ্ছেদের এক আধটুকু পরিসরে ভ্রমণ কাহিনীর কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা যায়। তখন রচনাটি শুধুই শিল্পোদ্যোগের শহর বিষয়ক রচনা হয়ে উঠ্‌বে।

কিন্তু এসব শহর, এমন কি একটি বড় কারখানার যথার্থ বর্ণনাও প্রায় অসম্ভব। লেখার সময় পরিমিত, স্থান সামান্য। তাই জানলেও কেউ তা লিখে উঠ্‌তে পারে না। আর 'জানা' অর্থ হচ্ছে সাধারণ ভাবে জানা। বিশেষজ্ঞরা যে ভাবে জানে সেভাবে আমরা কেউ জীবনেও এসব জটিল উৎপাদনের তথ্য জানতে পারব না ; তা বর্ণনা করা তো দূরের কথা। স্বভাবতই শুধু কতকগুলি বিভাগের বা কারখানার নাম করতে হয়, জোর এক-আধ লাইন তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। আর একটা উপায়ও আছে—পরিসংখ্যান উল্লেখ করা। কিন্তু কেউ কি তা মুখস্থ করে রাখতে পারে ? মোটের উপর, কী হতে যাচ্ছে তা বলতে পারলেই বুঝতে হবে যথেষ্ট হল। একটু বুদ্ধি ও চিন্তার স্পর্শ দিয়ে গুছিয়ে বল তে পারলেই এরূপ রচনা সার্থক।]

।। একটি নয়া পয়সার কথা ।।

বেশিদিন আমার জন্ম হয় নাই। এই পৃথিবীতে আমি প্রায় নবাগত। কিন্তু এই স্বল্প-জীবনের মধ্যে পৃথিবীর যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাকে সামান্য বলিতে পারি না।

সূচনা
স্বল্পদিন প্রবর্তিত

ধনীর বংশেই আমার জন্ম তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ধনী বংশের গরীব শাখার অবস্থা কি মর্মে মর্মে তাহা জানি বলিয়াই আর ঐ বংশের কথাটা তুলিতে চাহিনা। আমি পয়সার ঘরে জন্মিয়াছি—আনি নই, সিকি নই, আধুলি নই, টাকা নই, আর দশ টাকা, শত টাকার আনকোড়া কড়কড়ে বা বহু ব্যবহারে ছেঁড়া-ফাটা নোটও যে নই, তাহাতো বলাই বাহুল্য। এককালে পয়সারও হয়ত কিছু দাম ছিল বলিয়াই তখন মানও ছিল। কারণ, দামেই যাহাদের পরিচয় তাহাদের তো মান—রূপে নয়, গুণে নয়, কুলে নয়, একমাত্র বাজারের দামে। তাই আজ বাজারে যখন টাকারও প্রায় দাম নাই তখন আমি পয়সার ঘরের ছেলে মুখে বড় কথা বলিলে সকলেই হাসিবেন। এমনকি, কাণা ভিখিরিটা পর্যন্ত হাসিবে—'ওঃ হরি! ঢেউ-কাটা ডবল পয়সাও নয়, এমন কি একটা ফুটা পয়সাও নয়, একেবারে নয়া-পয়সা—তারও আবার গর্ব।' শুনিতেছি ছাপানো মুদ্রাতেই নাকি পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ নিরূপিত হইতেছে। তাই ক্রমে এক সময়ে আমাদের ধাতু জাতীয় মুদ্রাদের বংশ লোপ পাওয়া অসম্ভব নয়; থাকিবে কেবল বাজারের চেক্ কাগজের মূল্য-পত্র। যাক, একদিন ছিলাম না, একদিন আবার থাকিবনা, এই কথাটা জানিয়াও যেই কয়টা দিন আছি তাহাকে নিতান্ত মিথ্যা বলিতে পারিব না, মিথ্যা মানও করিবনা। তাই তাহার কথাই এক-আধ কথায় বলিতেছি।

বাজারের ভাও

সোনা, রূপার পরেই মানুষের কাছে তামারও একদিন আদর কম ছিল না। তাই সকলেরই কামনার জিনিস বলিয়া সকল জিনিসেরই দাম স্থির হইত সেদিন সোনার, রূপার বা তামার টুকরায়। তারপর এরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, রূপা বা তামার টুকরার উপর দরকার হইল একটা মূল্য নির্দেশক মুদ্রাঙ্ক। তখনি সেই ধাতুখণ্ড হইল ধাতুমুদ্রা। এসব আমার জন্মের বহু পূর্বের কথা তাহা ঠিক। কিন্তু এই ধারাতেই আমাদের তামার জাতির পয়সার ঘরে আমার জন্ম এই ভারতবর্ষে। ইংরেজ আমলে অবশ্য পয়সার দেহ ও মান দুইই নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেদিনে তাম্রমুদ্রার ডবল পয়সা এবং আধা

মুদ্রার জন্ম

পয়সা ও পাই পয়সাও ছিল। আর তাহাদের কিছু দামও ছিল। কিন্তু আজ সে কথা তুলিয়া লাভ নাই। তখনো পয়সা অত সস্তা হইয়া পড়ে নাই।

কিন্তু এলেম আমি কোথা থেকে? গণ্ডার গণনায় আনা আর ষোল আনায় এক টাকা এই ছিল হিসাব। চার টাকায় বা ষোল-গণ্ডা-টাকায় কোনো হিসাব করা যায় না, বরং হিসাবের গোলমাল বাড়ে। সংখ্যা জিনিসটা দশে দশে লাফাইয়া চলে—যেমন, শতে শতে সহস্র, দশ সহস্রে অযুত ইত্যাদি। এই দশমিকের গণনা পদ্ধতিও ভারতবর্ষের। কিন্তু গণ্ডায় মিলাইতে গিয়া এই সংখ্যার হিসাবে সব গুলাইয়া যায়। তাই অনেক দেশেই জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল—দশমিকের গণনায় সব হিসাবে একটা শৃঙ্খলা আনা প্রয়োজন। টাকা, পয়সা ওজন দৈর্ঘ সব এই দশমিকের ধারায় হইলে হিসাবপত্র অনেক সহজ ও সুশৃঙ্খল হইবে। এই ধারা প্রথম গ্রহণ করিল ফ্রান্স। পরে অনেক দেশেই মুদ্রার হিসাবে তাহা চলিতেছে—সেন্‌ট্‌ (শতক) তাহাদের নিম্নতম মুদ্রা, শত শতকে যে মুদ্রা তা ফ্রাঁ, ডলার, রুবল ইত্যাদি। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতরাষ্ট্রও এই সেণ্ট বা শতকের পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে। সেই সেণ্ট বা শতকের নাম করিল 'নয়া পয়সা'। চৌষট্টি পয়সা পূর্বে ১৲ টাকা হইত, কিন্তু এখন ১০০ নয়া পয়সায় হয় ১ টাকা, আর ৫০এ তাই ১ আধুলি, ২৫শে ১ সিকি। এই দশমিকের কামনা হইতেই আমার জন্ম। তবে জন্ম হইতে যে সমাদর পাইয়াছি তাহা নয়। একেতো পয়সারই এখন দাম নাই, তারপর আবার 'নয়া পয়সা' দেখিতেও সেদিনের পাই পয়সার অপেক্ষা ছোট, আর বাজার দরে আরও তুচ্ছ। অন্যদিকে বাজারে এখনো পয়সাও সেদিনের জ্যেঠামহাশয়ের মত বিরাজ করিতেছেন। তাই বিড়ম্বনা কাহারও কম নয়। আমার এই এক বৎসরের জীবনের মধ্যে তাহাও কম দেখি নাই—যিনি দুই আনা দামের জিনিস কিনিতে ১২ নয়া পয়সা দেন তিনিই দু' আনার জিনিসটির দাম আদায় করিতে চান ১৩ নয়া পয়সা।

নয়া পয়সার জন্ম কথা

আগুনে পুড়িয়া গলিয়া শেষ পর্যন্ত টাঁকশালের মোহর লইয়া যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন নয়া পয়সার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকদিন তবু প্রসূতিশালার অন্ধকারেই বহু বহু ভ্রাতা-ভগ্নীর সঙ্গে চোখ বুজিয়া ঘুমাইলাম চেতনাও ছিল না। নূতন কিছু না ঘটিলে মস্তিষ্কে চেতনা সচল হয় না। সেই নূতন কিছু ঘটিল বৎসরখানেক পূর্বে। হঠাৎ কে আসিয়া থলি বোঝাই করিয়া লইয়া চলিল আমাদের একগাদা নয়া পয়সাকে। মহাসম্মানে গাড়ি চড়িয়া যেখানে গিয়া আবার জমা হইলাম, শুনিলাম সেটি ব্যাঙ্ক। একশতের এক একটি মোড়ক। কিন্তু মজার কাণ্ড, কেহ আমাদের দিকে বিশেষ তাকাইয়াও দেখে না।

ব্যাংক হইতে যাত্রা

শতটাকা, দশটাকা এমন কি এক টাকার নোটগুলিও গণা হইয়া গেল। আমাদের তুলাদণ্ডে তুলিয়া ওজন করিয়া সরাইয়া রাখিল। ব্যাঙ্কে মুদ্রার টাকার ঝণৎকার কোথায়? তাহা বরং টাঁকশালেই শুনিয়াছি। এখানে দেখি ঝুনঝুনওয়ালারাও নোটের গাদা লইয়া ফর ফর করিয়া তাহা উল্টাইতেছে, খস্‌খস্ করিয়া তাহার হিসাব হইতেছে। আমরা কোথায়? এই পৃথিবীতে আমাদের স্থানটা গণসমাজে অর্থাৎ নগণ্যের দলে।

ব্যাঙ্কে তবু বুঝিলাম আমাদের খাতায় নাম আছে। আমাদের না হইলে চলে না। বরং পুরোনো পয়সার স্থলে আমাদের পাইয়া হিসাবনবিশদের সুবিধাই হইয়াছে। প্রতিদিনই ব্যাঙ্কে সন্ধ্যার পরে একটা গোলমাল বাধিয়া যাইত। পুরোনো পয়সা ও নয়া পয়সার হিসাব এক সঙ্গে চলাতে হিসাবের গরমিল ঘটিতে চাহে। পথে ঘাটে ইহা লইয়া কোঁদল বাধে, এই কথাটাও তখনি শুনিয়া ফেলিলাম।

তারপর একদিন সত্যই বাহির হইলাম ব্যাঙ্কের গহ্বর হইতে। সাধারণ ব্যবসায়ী একটা চেক ভাঙ্গাইতে আসিয়াছিল একতাড়া নোটের সঙ্গে তাহার প্রাপ্য হইলাম আমি। স্থান লাভ করিলাম দশ নয়া-পয়সা ও পাঁচ নয়া-পয়সার সঙ্গে একটি ছোট থলির মধ্যে। পথে

চলতি পথের যাত্রী

বাহির হইতেই রৌদ্রঝলমল আকাশ ও বিরাট অট্টালিকার অরণ্য ও দুর্বার জন-তরঙ্গ ও শকট-স্রোতের বজ্রভেদী গর্জন প্রাণে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিল তাহাতে যদি গলায় জোর থাকিত আমিও নবজাত শিশুর মতই এই পৃথিবীর চরণাঘাতে প্রাণপণে চেঁচাইয়া উঠিতাম। কিন্তু সে সাহস হইল না। বধির আর্তপ্রাণে আর-একবার উঠিলাম সেই কারবারীর ডেক্‌সে। তবে বেশিক্ষণ তাহাতে আবদ্ধ রহিতে হইল না। একটু পরেই আসিল তাহার এক ক্রেতা। ডেক্‌স হইতে তাহার পকেটের থলিতে এবার স্থান হইল। তারপর চাপিলাম মানুষের গাড়িতে—শুনিলাম ইহা রিকশ; বলদের বদলে মানুষেই গাড়ি টানে। তাহাতে সুবিধা—ডাল ভাত ও ঘাস বিচালি, এই ডবল খরচ লাগে না, একমাত্র ছাতু লঙ্কাতেই চলে। দিনান্তে দুই টাকা জমা দিয়াও অনেকখানি গায়ের রক্ত খরচ করিয়া রিকশওয়ালা আয় করে কখনো দুই, কখনো তিন টাকা। মানুষটার আয় কম কিন্তু কাজ একটাতো জোটে। বুঝিলাম এই সংসারে মানুষের আয়ুক্ষয় না করিলে আয় করা সহজ নয়। দোকানের কেনা ভেজাল ঘি'র কয়েকটি টিন গাড়িতে চাপাইয়া গ্রামের ব্যাপারী আমাকেসুদ্ধ চলিলেন রাস্তা বাহিয়া স্টেশনে। সেখানে আর এক দৃশ্য। মানুষতো নয়, মনে হইল এ যেন একটা পিপীলিকার জগৎ। তাহারা কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কারণ পিপীলিকার ব্যক্তিত্ব নাই, প্রত্যেকে পরের সঙ্গে পা মিলাইয়া চলে; কিন্তু মানুষ প্রত্যেকেই ব্যক্তিত্ববান—অর্থাৎ স্বাধীন। কে কাহাকে ধাক্কা দিয়া পিছনে

ফেলিয়া আগে যাইবে, তাহারই জন্য উদ্‌গ্রীব। 'আপনি বাঁচিলে বাপের নাম,—এ পৃথিবীতে বুঝিলাম ইহাই বাঁচিবার একটা মূল সূত্র।

কিন্তু কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই হঠাৎ পড়িলাম স্টেশনের কুলির হাতে, সে আমাকে ফিরাইয়া দিল অতি অবহেলায়—একটু বচসার শেষে সে আমাকে যখন ময়লা কাপড়ের ট্যাকে গুঁজিল তখন আমারও মুখ গুঁজিয়াই থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল—নিজের দাম তো বুঝিলাম আর ইহাদেরও তো মূল্য বুঝিলাম—প্রত্যেকেই মনে করে অপরে তাহাকে ঠকাইতেছে—সকলেই ফাঁকি দিতে চায় সকলকে।

ঘণ্টাখানেক পরে অবশ্য বিড়িওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম। আর, তখন চোখের সম্মুখেই সেই কুলিটিরও বিড়িটানা মুখে যে একটি নিরুদ্বিগ্ন হাসি ফুটিতে দেখিলাম তাহাতে অবাক না হইয়া পারিলাম না। এই মুখও তো কম সুন্দর নয়—খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাঁচাপাকা গোঁফ, ঘামে ভরা যে কালো দেহের সঙ্গে পরিচয়ে এতক্ষণ গ্লানিবোধ করিয়াছি তাহারও অস্থি-পেশী-দৃঢ় পরিশ্রম-কঠিন সুন্দর একটা রূপ এবার আমার চোখে পড়িল। ভাবিলাম, কেন তাহারা এইরূপ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া যায়? অমন তিক্ত কুৎসিত ভাষায় জুলুমবাজি চেহারায় সে মারমুখো হইয়া উঠে কেন? শুধু আমার জন্য? আমার জন্যই কি সে গ্রাম্য ব্যাপারীরও এমন কর্কশতা?

বিড়িওয়ালার দোকানেও বেশিক্ষণ কাটিলনা—ততক্ষণ অবশ্য আমি বিড়িওয়ালার শিস্ হইতে 'আওয়ারা'র গানের সুরটা শিখিয়া লইয়াছি—দ্রুত হাতে বিড়ি পাকাইতে পাকাইতে সে সুর ভাঁজিয়া চলিয়াছে। বাঃ, ইহাও তো চমৎকার! ছোট দোকানে বাহারি জিনিস, রাতদিনের খাটুনি। তাহারই মধ্যে এই চটকদার সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে কেমন সে কাজটাকে খেলা করিয়া ফেলিতে চায়। যাক্।

এক প্যাকেট বিড়ি কিনিয়া যিনি আমাকে এইখান হইতে আবার পাইলেন তিনি বোধহয় সওদাগরী অফিসের কেরানি। মাঝারি বয়স—ছাপোষা মানুষ। তাহার হাতে একটা থলে ঝুলিতেছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম স্টেশনে—রেলে চড়িলাম—থার্ড ক্লাসের কামরায় আলাপ শুনিতে শুনিতে চলিলাম। যাহা শুনিলাম—তাহা কদর্য নয়, কিন্তু কেবলই অভাবের কথা। ইহারও মধ্যে তবু কেহ হাসিতেছে, কেহ পরিহাস করিতেছে। বুঝিলাম—ইহারা অভাবের ধান্দায় অবসন্ন হইতে হইতেও বাঁচিতে চায়, হাসিতে চায়। কেহ হাসিতেছে, কেহ খাটুনিতে, চিন্তায় আর হাসিবার শক্তিও পাইতেছে না। এই সংসারে ইহাই বুঝি সত্য রূপ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের পথে গিয়া পৌঁছিলাম একটি ছোট্ট গৃহস্থ বাড়িতে। প্রদীপ লইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন একহারা একটি গৃহিণী।

কর্তা খুচরা পয়সা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে তিনি সযত্নে তাহা বাক্সে পুরিয়া রাখিলেন।—স্বামীর থলে হইতে এক-একটি করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস বাহির হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'খুকীর বই'? একটা ছবির বই বাহির হইল। "কত দাম"? রুশ দেশের বন্ধুদের সস্তা দামের বই, সস্তা বলিয়াই এদেশের ছেলে-মেয়েরা এমন বই পাইতেছে।

রাত্রির মত বিশ্রাম। কিন্তু রাত্রি না কাটিতেই গৃহিণী রন্ধনের দ্রুত উদ্যোগে প্রায় রুদ্ধশ্বাস। প্রভাতের পাখি না উঠিতেই খুকী বিছানা হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বই এনেছ?" তারপর সেই বই লইয়া খুকুর সেই সারা সকাল এবাড়ি-ওবাড়ি ছুটাছুটি। তবু আপিস যাইবার মুখে আবার বাবা ডাকিলেন—খুকু!

আমি খুকুর হাতে পড়িলাম। আর ছোট্ট একটি চুমু খুকুর গালে। এইটি পিতাপুত্রীর রোজকার দেনা-পাওনা। তারপর সেই ছোট্ট মুঠির মধ্যে আমি কত যে আনন্দের স্বপ্নের আস্বাদন পাইলাম—তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব।

কখন সেই ফিরিওয়ালা ডাক দিবে—'চাই গোলাপীদানা' খুকী তাহার জন্য অপেক্ষায় কাল গণিতেছিল। কিন্তু হাঁক শুনিয়া আরও অনেকে ছুটিয়া আসিল। কাহারও পয়সা আছে, কাহারও নাই। খুকীর হাত হইতে আমি এবার চলিলাম ফিরিওয়ালার খপ্পরে। কিন্তু যাইতে আমার মন সরিতেছিল না। কিন্তু চারটি গোলাপী রঙের দানা লইয়া খুকীর মুখ-চোখ তখন জ্বল জ্বল করিতেছে। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার খেলার সঙ্গী কানু। তাহার একটি নয়া পয়সাও নাই। লুব্ধ দৃষ্টিতে হাত বাড়াইয়া বলিল, "একটা আমায় দে-না ভাই।"

পৃথিবীর কোন রাজা তাহার রাজ্য অন্যকে ছাড়িয়া দেয় কি? খুকীই বা দিবে কেন? সে একটি দানা মুখে পুরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কানু আবার অনুনয় করিল—ফলোদয় হইবে কিনা বুঝিতে পারিল না। হয়তো নিজের পৌরুষ প্রয়োগের সহায়তা লইবে কিনা ভাবিতেছিল। এমন সময় খুকী হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল—"নে। তুই কিন্তু আমাকে পেয়ারার একটা কণাও দিলি না।"

কানু হাত বাড়াইয়া একটি দানা লইয়া মুখে পুরিল। বলিল "আজ দোব—পেলে।" 'সত্যি, সত্যি'—দুই জনে গলাগলি হইয়া বাড়ির দিকে চলিল।

ফিরিওয়ালার ডালা হইতে আমি দেখিতে দেখিতে অন্য পাড়ায় চলিলাম। —ভাবিলাম মানুষ তো এমন স্নেহে-সৌহার্দ্যেই জীবন আরম্ভ করে, তবে সব উল্টাইয়া যায় কেন?

তারপর কত হাত ঘুরিলাম। সাধারণ সংসার অনেক দেখিতে দেখিতে এখনো বুঝিতে পারি না—মানুষে মানুষে আত্মীয়তার যোগ আমরা এই মুদ্রারা গড়িতেছি না ভাঙ্গিতেছি।

[মন্তব্য : এ রচনাটির সূচনাংশ ছোট করা যায়। নয়া বলেই 'নয়া পয়সার জন্মকথাও' প্রয়োজনীয়, না হলে তা বাদ দেওয়া চলত। আর সময় থাকলে অবশ্য যত ইচ্ছা তত তার যাত্রার কাহিনী বাড়ানো চলে—সাধু-অসাধু পণ্ডিত-মূর্খ অজস্র মানুষের হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যত দীর্ঘ ইচ্ছা তত দীর্ঘ করা যায় এই পয়সার কথা। কিন্তু দেখতে হবে দীর্ঘ বা ছোট যাই বলি, কিছু যেন একটা নিষ্পত্তিতে গিয়ে পৌঁছি। সেই নিষ্পত্তি মনে রেখেই তাই যাত্রার কথা বাছাই করতে হবে। অন্য একটা নিষ্পত্তিতেও পৌঁছানো যেত—সমাজের কাজ-কারবার, লেন-দেন মুদ্রার সহায়তায় বেড়েছে, সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রার সামাজিক উপযোগিতার দিক দেখানো যায়। তা বোঝাতে হলে অন্যভাবে কথা পাড়তে হত।

॥ একটি নদীর কথা ॥

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিলে?' আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তো এই প্রশ্ন করিয়া নিজেই ভাবনা-প্রবাহে উজান বহিয়া গিয়াছেন। হরিদ্বারের প্রবাহ ধরিয়া গঙ্গোত্রী পার হইয়া তিনি গৌরীশঙ্করের শেষ চূড়া ছাড়াইয়া যেখানে উঠিয়া গেলেন এভারেষ্ট সাহেবের জরিপ-বিজ্ঞানও সেখানে পৌঁছায় নাই—তাহা প্রায় প্রজ্ঞানের আকাশ।

সূচনা

আমাকে সেখানে খোঁজ করিয়া লাভ নাই। আমি জাহ্নবী-ভাগীরথী নই, হিমালয়ের তুষার স্রোতেও আমার জন্ম নয়, মহাদেবের জটাজুটের মধ্য হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভগীরথের শঙ্খধ্বনিতে পরিচালিত হইয়া উত্তর ভারতের সমস্ত পাতক প্রক্ষালিত করিয়া বাঙ্গলাদেশকে শ্যামল করিয়া সমুদ্র সঙ্গমে গিয়া মিলি নাই। না, আমি গঙ্গা নই, যমুনা নই, সরস্বতীও নই। সিন্ধু-নর্মদা-গোদাবরী-ব্রহ্মপুত্র—কোনো পুণ্যতোয়া নদীই আমি নই ; তাঁহারা সকলে আমার নমস্য। কারণ, আমি বাঙ্গলা দেশের একটি সামান্য নদী। না, না, আমি দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষীও নই। আমি তোমাদের ইছামতী।

বাংলার নদী

গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র সকলকে আমার নমস্কার। তাঁহারা সকলেই আমার মাতৃস্থানীয়া—শ্বশ্রূ-স্থানীয়া। পর্বত-শীর্ষে তাঁহাদের উদ্ভব, মানুষের বহু তপস্যার তাঁহারা বরদাত্রী। মেঘ-বৃষ্টির অকাতর দান পর্বত-শীর্ষ হইতে তাঁহারা বহিয়া আনেন, পাথর ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নামিয়া আসেন সমতল ক্ষেত্রে ; সঙ্গে লইয়া আসেন পাহাড়-ধোয়া

নদীর উদ্ভব

মাটির ঐশ্বর্য—সেই পাহাড়ী মৃত্তিকায় নিজের স্নেহ-সিঞ্চনে তাঁহারা পৃথিবীকে সুজলা করেন, সুফলা করেন, শস্য-শ্যামলা করেন। তাঁহাদের আশিস গ্রহণের জন্য দুই তীরে গড়িয়া উঠে সুসভ্য জনপদ, সুরম্য পুর-নগর, পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্র, বাণিজ্য-ঐশ্বর্যময় হাট-গঞ্জ-বাজার। তাঁহাদের না হইলে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইত না, তাহার তপোবন থাকিত না, তাহার উপবন থাকিত না, তাহার শ্রী থাকিত না, তাহার সম্পদ থাকিতনা—আমিও সম্ভবত থাকিতাম না। এই জন্যই তো পুরাণে ইতিহাসে গঙ্গা-যমুনা-ভাগিরথীর···কত কাহিনী, কত গাথা, কত স্তব, কত স্তুতি। আমি কিন্তু তাহা নই। আমি বাঙ্গলাদেশের ঘরের মেয়ে—বাঙ্গলার গৃহপালিতা কন্যা, ইছামতী।

গঙ্গা-পদ্মার স্রোতধারা বাঙ্গলাদেশের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়া বাঙ্গলাকে সুজলা করিয়া তুলিয়াছে। আর এদিকে বঙ্গোপসাগরের সমস্ত তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাসকে জল-ভরা মেঘে পরিণত করিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিয়াছে এই বাঙ্গলাদেশকে আরও সুজলা, আরও শ্যামলা আরও ঘন-বন-পাদপে সমাচ্ছন্ন করিতে। মধ্যবঙ্গের বুক ভাসাইয়া বহু খাল-বিলের মধ্য দিয়া বর্ষার সেই জলধারা বহিয়া যায়—কখনো গঙ্গার দিকে, কখনো পদ্মার দিকে, কখনো সমুদ্রেরই সন্ধানে আবার নিম্নাভিমুখে। তাহাদের অনেকের আশ্রয় আমিও—মধ্যবঙ্গের সেই শত ক্ষীণধারাকে সংহত করিয়া আমি নিম্নবঙ্গের দিকে চলিয়াছি—সুন্দরবনের কোলে গিয়া অপার অজস্র শত শত বেণী বঙ্গভূমির একটি বেণী জলে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেছি—সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। সমুদ্র সোহাগিনী গঙ্গা নই, সিন্ধু নই, ব্রহ্মপুত্র নই—আমি তাহাদের কন্যাস্থানীয়া ইছামতী, শুধু নিজের ছোট ছোট অঞ্জলিটুকু ভরিয়া পিতৃপদের উদ্দেশ্যে আপনার প্রণাম নিবেদন করিবার অধিকারিণী। আমি দামোদর নই, ময়ূরাক্ষী নই, অজয় নই, পিতামহ হিমালয় তো সুদূরের স্বপ্ন—বিন্ধ্য-পর্বতের পথাশ্রয়ে আমি জন্মি নাই—তেমন সৌভাগ্য বা সম্পদও আমার নাই। সমতটে বাংলাদেশের শ্যামলী কন্যাকে সেই সু-উচ্চ, পর্বতচূড়া চিনিতে পারিবে না।

আমাকে চিনে আকাশ, আমাকে চিনে মাটি, আর আমাকে চিনে এই শ্যামলা মধ্য বাঙ্গলার লতা-পাতা বন-উপবন, তাহার দুই তীরের পশু-পাখি, আর সুখ-দুঃখ কল্যাণ-অকল্যাণ গাঁথা তার ছোট ছোট সংসারের অতি সাধারণ নরনারী। আমি তাহাদের পূজা কুড়াইতে আসি নাই—আমি দেবী নহি,—আমি তাহাদের সুখে-দুঃখে সঙ্গিনী নিতান্তই মানব-কন্যা। তাই হয়ত তাহাদের আনন্দ-বেদনার সহমর্মিণী—তাই তাহাদের মুখে আমার এই নামটিও ফুটিয়াছে 'ইছামতী'।

এই দুই পারের মধ্যে আমি যে কখনো এক-আধবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমার প্রতিবেশীদের এক-আধটুকু চমকিত না করিয়া তুলি এমন নয়। শান্ত হইলেও অত লক্ষ্মী মেয়ে আমি নই। বিশেষ করিয়া এমন ভাবেই আমার চারিদিকে আজ বাধা জমিয়া উঠিতেছে যে, আর ঠিকমত আপনার খাতে আপনি বহিয়া চলিব তেমন সাধ্যও সব সময় থাকে না। মজা খাতের খোলস ছাড়িয়া এক-আধবার তাই খাত বদলাইয়া নতুন খাতে পথ করিয়াও লই, কিন্তু তাহাতেও আকস্মিক কোন সর্বনাশ ঘটে না, এ যেন খেলাঘরের এক-আধটুকু খেলার ছলনা, তাহার পরে আবার চিরদিনের ইছামতী। শান্ত স্রোত, কাকচক্ষু নির্মল ধারা, ঢেউয়ের নাম নাই, যেন পাটি বিছানো কোন নির্মল জলশয্যা—যেখানে মেঘ-রৌদ্র জালি কাটে, সূর্য-চন্দ্র ঝিকিমিকি দিয়া মণি-মাণিক্য ছড়ায়, আর দক্ষিণ সমুদ্রের বাতাস এক-একবার লুটাইয়া পড়িয়া সারাদেহে শিহরণ তুলিয়া আবার ছুটিয়া পালায়।

সাধারণ রূপ

দুই পাড়ে কোথাও ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়, কোথাও ঘাসে ভরা মাঠ! গোরু চরিতেছে, রাখালছেলে ঘাসের উপর বুক দিয়া শুইয়া পড়িয়া দাঁতে ঘাস কাটিতেছে আর দুই চক্ষু দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে, কিম্বা এক একবার লাফাইয়া, দাঁড়াইয়া গাহিয়া উঠিতেছে 'ওরে সুদাম ছিদাম, এইখানে এই কদমতলায় বলো তারে বলো—রয়েছে তার কালো।' ইহা যমুনাতীর নয়, বৃন্দাবনও নয়, কদমতলাও নাই, কিন্তু তবু সেই যমুনা-বৃন্দাবনের ছায়াটি সে এই ইছামতীর তীরেই খুঁজিয়া যদি না পায় তাহা হইলে দূর দূরান্তরের ব্রজভূমিকে লইয়া তাহার কি হইবে? চলিতে চলিতে তুমি চিরদিন এমনি হইয়াছ, এমনি হইবে—বৃন্দাবন যমুনাতীরেই আবদ্ধ নয়—আমার মধ্যেও সেই যমুনা-পুলিনের ছায়া লুকাইয়া আছে, তাহাও সত্য। তাইতো হঠাৎ গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম—জল ভরিয়া লইতে গ্রামের বধূরা আসিতেছে। ঘাটে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, অতি পরিচিত সংসারের অতি পুরাতন সুখ-দুঃখের কথার বিনিময় হইতেছে। কাহারও গৃহে অভাব, কাহারো উহার মধ্যেই উৎসব। হয়ত কন্যা-জামাতা আসিয়াছে, কিম্বা বংশে আর একটি নূতন অতিথির আবির্ভাব সুসম্পন্ন। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে। কেহ পুত্র বা কন্যার স্নানসিক্ত দেহ মুছাইতে এক একবার ভাবিতেছে—আর একটু স্বাস্থ্য ও শ্রী কি ইহাদের দেহে লভ্য হইবে না? আর এক মুঠা নুন-ভাত, একটু সামান্য চিঁড়া-মুড়ি, কলা ও গুড়?…অদূরের ঘাটে দ্বি-প্রহরের শেষে গো-মহিষ সুদ্ধ নামিয়া পড়িবে যে ক্লান্ত কৃষক তাহার কথা মনে পড়িয়া যায়, আর ভাবনা চলিয়া যায় অন্য পথে। সেই—ধারের টাকার

দুই তীরের দৃশ্য

সুদ দিতে জমি চষিয়া বা ভাগচাষী হইয়া খাটিতে খাটিতে যে লোকটি পার পায় না, তাহারই কি এক পেট ভরিতে নূন-ভাত জুটিবে এবার? বাঙ্গলার কৃষক আমি দেখিয়াছি—যে কৃষককে বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, তাহাকেও আমি চিনি—কতকাল ধরিয়াই তাহাকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কত কেহ আসিল, কত কেহ গেল, তাহার ভাগ্য তেমনি রহিল অপরিবর্তিত।

দু'পারের ভদ্রলোকের গ্রাম তো দেখি। কেহ শহরে ছুটিয়াছে, সপ্তাহ শেষে গৃহে ফিরিবে। কেহ গ্রামে আছে অলস অকর্মণ্যতায়, বা অকর্মণ্য নিষ্ফলতায় হতশ্রী, হতমান। কেহ উহারই মধ্যে শূন্যগর্ভ আস্ফালনে গ্রামকে তিক্ত বিষাক্ত করিয়া গর্বিত—আপন দম্ভে আপনি ভারাক্রান্ত—আভিজাত্যের শেষ বাহনদেরও ইহাদের সাথে দেখি—রায়বাবু, রাজাবাবু, জমিদারবাবু, একদিন নীলকুঠীর হুজুরদের কাছে যাইয়া মাথা বিকাইয়া নিজেদের ভাগ্যার্জন করিয়াছিল আর আজ তাহারা তেমনি ধূলিতে মিলাইয়া যাইতেছে। নীলকুঠির পড়ো বাড়ি আর পড়ো গোলাবাড়ির মত তাহাদেরও দেখি। দেখি, আর ভাবি—কী লইয়া মানুষের এই আড়াআড়ি-কাড়াকাড়ি।

ছোট নৌকা চলিয়াছে—কোনটি ব্যবসায়ী নৌকা, কোনটি গোলাদারি মালের নৌকা, কোনটি পানের নৌকা, কোনটি জেলেদের ছিপ। একদিন যাহারা দুইশত বৎসর পূর্বে এখানে বোম্বেটে ও মোগলের সঙ্গে পাল্লা দিত তাহারা কোথায়? আজ মোগল নাই, তুর্ক নাই, তাহারাও নাই। এক গঞ্জ হইতে অন্য গঞ্জে মাল লইয়া, এক ঘাট হইতে আর এক ঘাটে যাত্রী লইয়া, এপার হইতে ওপারে দুই গ্রামের মানুষের যোগাযোগ সাধন করিয়া এই যে নৌকা আমার বুকে চলিয়াছে তাহার অপেক্ষা ইহারাইতো সত্য। মাঝি দাঁড় টানে, চাষী চাষ করে, কুমারের চাকে মাটির হাঁড়িও পাত্র হইয়া উঠে, কামার ক্ষুদ্র কারিগর, লোহা পিটাইয়া লাঙ্গলের ফাল বানায়, কাঁসারির হাতে গড়িয়া উঠে থালাবাটি—এই যে চিরন্তন জীবন-ধারার আয়োজন ইহার মত সত্য আর কি? রাজার রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়—কোথায় অযোধ্যা, কোথায় রাম, কোথায় বা দ্বারকা, কোথায় যদুপতি—কিন্তু আমিতো দেখিতেছি ইতিহাসের সমস্ত আড়ম্বর ম্লান হয় হউক, কিন্তু মানুষের সমস্ত সভ্যতাকে বহনকারী 'ওরা কাজ করে'—তাহারাই সৃষ্টি করে, তাহারাই ইতিহাসের বাহক। 'ওরা কাজ করে' আর আমি দেখিতে দেখিতে চলি ভবিষ্যতের সাগর-সীমায়—মানব মহাসমুদ্রের পথে এই সৃষ্টিতরঙ্গই সত্য।

[মন্তব্য : ইচ্ছে করেই একটি ছোট নদীকে আমরা বিষয়রূপে গ্রহণ করলাম, বলাবাহুল্য গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র নিয়ে লেখা অনেক সুবিধা—ওরূপ (ক) নদীর বাস্তব উপকারিতা ছাড়াও বলা যায় (খ) ভৌগোলিক দৃশ্যের কথা (গ) সামাজিক দানের কথা এবং

(ঘ) ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা। এ সব কথাই একটি ছোট নদীর সম্বন্ধেও বলা যায়—তবে তা হতে হবে ছোট ও সচল আকারে—কারণ তার তীরে তো কলিকাতা, এলাহাবাদ, হরিদ্বার নাই। অবশ্য দামোদর নদের মত নদের কথাও বলা যায়, ওসব কথা ছাড়াও তার প্লাবন, বাঁধ, শেষে বিদ্যুৎ ও শিল্পোদ্যোগে তার দানের কথা বরঞ্চ বেশি সুবিধাজনক, তাতে নতুন কথা—শিল্পাঞ্চলের বর্ণনা প্রভৃতিও দেওয়া যা

॥ পৌরধর্ম

(নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার)

[এ বিষয়টার মধ্যে দুটি বিষয় জড়িয়ে আছে কিনা তা আগে ঠিক করে নিতে হবে। একটা Civic life বা পৌর-জীবনযাত্রার কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা,—তাতে বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল দায়িত্বের ও অধিকারের কথা আলোচনা করা দরকার। আর একটা Citizenship, বা পৌরধর্ম,—তাতে মানুষের রাজনৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বের কথাই আলোচনা করা প্রয়োজন। অবশ্য দুটি বিষয় নিঃসম্পর্কিত নয়,—পৃথিবীর সব বিষয়ই একভাবে না একভাবে পরস্পর সম্পর্কিত, তা কে না জানে? এই ক্ষেত্রে তাই যথাসম্ভব দুটি বিষয়কে একসঙ্গে আলোচনা করতেই চেষ্টা করা যাক—অর্থাৎ একটি রচনার মধ্যে দুটি রচনার বস্তু যথাসম্ভব গেঁথে দেওয়া হল, ইচ্ছা করলে তা ভাগ করে নেওয়া যায়। ইচ্ছা করেই বেশী করে বলা হল ভারতীয় পৌরধর্ম, একদিন এ উদ্দেশ্য কেমন করে সিদ্ধি করতে চেয়েছে, তা।]

সভ্য মানুষের ইতিহাসে 'পুর' বা নগরের আবির্ভাব বহু পুরাতন। ইউরোপীয় জাতিরা গ্রীক-রোমক সমাজের চিন্তাভাবনা ও বিধিব্যবস্থা দ্বারা আপনাদের মনকে পরিপুষ্ট করিতে গিয়া তাই একদিকে গ্রীক পৌর রাষ্ট্র হইতে 'পোলিটিক্স' (Polis—পুর) বা রাজনীতি কথাটি গ্রহণ করে, অন্যদিকে রোমের পৌর-জীবন হইতে 'সিভিলিজেশন' (civitas-cite=শহর) বা সভ্যতা ও সিটিজেন বা রাষ্ট্রজন জাতীয় শব্দও গ্রহণ করে। সেই প্রাচীন পৌরজীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল তখনকার প্রাথমিক গণ-তন্ত্রের ও গণতন্ত্রী শাসনের বীজ। তাই এই শব্দ দুইটির দ্বারা এই জটিল বহু-বিকশিত, বহু ঐশ্বর্যবান সভ্যতার একটি মূলতত্ত্বই নির্দেশিত হয়। মানুষের সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত উপনিবেশ ছাড়াইয়া কিম্বা যাযাবর পশুচারীর পর্ব উত্তীর্ণ হইয়া যখন পুর বা নগরে কেন্দ্রিত হইল তখন হইতেই অবশ্য সভ্যতার ইতিহাসে একটা নূতন পর্বের সূচনা হইল। কারণ, তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল পূর্বেকার গোষ্ঠিবদ্ধ সমাজশাসনের পরিবর্তে বহু গোষ্ঠির ঐকত্রিক বসবাসের উপযোগী সমাজ-ব্যবস্থার এবং তদুপযোগী সামাজিক ধারণা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের। তাই সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ-চেতনা এই পৌর সভ্যতার যুগে আরও সমুন্নত হইল। আধুনিক

পৌরশাসন-বিধির বনিয়াদ

সিটিজেনশিপ বা সিভিক রাইটস্ এর বনিয়াদ সেই প্রাচীন সমাজ নয়, এমন কি গ্রীস-রোমও নয়। একালের সিটিজেনশিপ ও সিভিক রাইটসের বনিয়াদ গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রী সমাজ।

আমাদের দেশের সভ্যতা অবশ্য প্রধানতঃ পল্লী সমাজের সভ্যতা। আপন আপন পল্লীর মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রা লইয়া ভারতের কৃষি-প্রধান সমাজ সমস্ত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আপনার মোটা রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহা সত্য। তাই পৌর-জীবনযাত্রা ও পৌর-শাসনের বিশেষচিত্র আমাদের দেশে আমরা পাইনা; আমাদের ভাষায় তেমন সুপরিচিত শব্দ পর্যন্ত নাই। কিন্তু আমরা যেন ভুল না করি—গ্রীস ও রোমই শুধু পৌর সভ্যতার আবিষ্কারক নয়। তাহারও বহুপূর্বে 'এশিয়াটিক সমাজ' মিশরে, মেসোপোতেমিয়ায় পৌর-সভ্যতার স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। আর ভারতবর্ষে হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োতে তখনই বিরাট নগর পত্তন হইয়াছে। সেখানে ঘরদুয়ার, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার হইতে শ্রমিকবস্তি পর্যন্ত, না ছিল এমন বস্তুই নাই। সেই পুরসমূহ হয়ত ধ্বংস হইয়া যায় আর্যভাষী শত্রুদের আক্রমণে। কিন্তু তবু এই ভারতেও উজ্জয়িনী, কাশী, তক্ষশীলা, আর শেষে বিদিশা, বৈশালী, কৌশাম্বী, রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত বহু বহু নগরের ঐশ্বর্যের কথাইত আমরা শুনি। আর মৌর্যযুগে পাটলিপুত্রের যে শাসন-ব্যবস্থার কথা কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মেগাস্থিনিসের বিবরণের আমরা লাভ করি,—বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে নাগরিকদের যে বিলাস ও কামকলা-চর্চার কাহিনী পাঠ করি, মৃচ্ছকটিকে সাধারণ পৌর-জীবনের যে চিত্র আমরা পাই, কিংবা পরবর্তীকালে দিল্লী, মথুরা, আগ্রার, মুর্শিদাবাদের বা কাঞ্চীপুর, বিজয়নগরের যে বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ থাকেনা যে, পৌর জীবনযাত্রা এই দেশেও বিশেষ-ভাবেই বিকাশলাভ করিয়া থাকিবে।

ভারতের পৌর শাসন

তথাপি পৌরদায়িত্ব ও পৌরদায়িত্বের বিশেষ কোনো চেতনা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জন্মায় নাই, তাহা সত্য। তাহার কারণ 'ধর্ম' নামক একটা সর্ব-ব্যাপক জীবন-যাত্রার নীতির মধ্যে ভারতের রাজাপ্রজা, সকলকার সর্বাধিক দায়িত্ব ও অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের উপায় ভারতের শাসকসমাজ আবিষ্কার করিয়াছিল, এবং এই এতকাল যাবৎ প্রায় তাহা অক্ষুণ্ণও রাখিয়াছিল। তাহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ইংরেজ আমলে, জীবন-বিচারে আজ ঐহিক মানদণ্ড ও মানবীয় সম্পর্ককে 'ধর্মের' দোহাই দিয়া ঠেকাইয়া রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। কারণ, রাজারা রাজ-শক্তিকে নির্দেশ দিত 'রাজধর্ম' পালনের জন্য। সাধারণতঃ সে নির্দেশ

ধর্ম বনাম মানুষের অধিকার

না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু রাজশক্তির পক্ষে রাজধর্ম পালন না করিলেও কোনো পার্থিব দায়িত্ব নাই। ইহার অর্থ কার্যতঃ দাঁড়ায় এই : যত কর্তব্য তাহা প্রজাসাধারণের, আর যত অধিকার তাহা রাজশক্তির। এই ব্যবস্থাই মধ্যযুগের ইউরোপেও চলিতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর (১৭৮৯) আধুনিক গণতন্ত্র ও আধুনিক ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ সমাগত হইয়াছে ; এমনকি তাহারই নূতনতর বিকাশ চলিয়াছে সমাজতন্ত্রী দেশে। তাই, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একদিকে 'সিটিজেন' বা রাষ্ট্রজন হিসাবে আপনার রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হইয়াছে, অন্যদিকে আবার রাষ্ট্রের অধীনে পৌর-জন হিসাবে আপন আপন পৌর কর্তব্য ও পৌর অধিকার (Civic rights & duties) সম্বন্ধেও অবহিত হইয়াছে। এই দায়িত্ব ও অধিকারবোধ ভারতবর্ষের মানুষের মনেও তাই আধুনিককালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে জন্মিতে বাধ্য—আর পুরাতন ধর্মবোধ দিয়া তাহা ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

'রাষ্ট্রজন' বা সিটিজেনের অধিকার কি? গণতান্ত্রিক যুগে ইহা প্রায় সর্ববাদীস্বীকৃত কথা যে, রাষ্ট্রশক্তি সমাজশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, আর তাই সমাজের প্রত্যেকেরই কর্তব্য সেই রাজশক্তির নিকট আনুগত্য স্বীকার করা, কিন্তু রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণের কি ভার লইয়াছে তাহাও স্মরণ রাখা দরকার।

রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, অপরের অধিকার নষ্ট না করা পর্যন্ত —প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকার্য। ইহাই 'মানুষের অধিকার' (Rights of man)-এর মূলতত্ত্ব। উহার অর্থ এই যে, প্রত্যেকেরই আপন সম্পত্তিতে অধিকার আছে ; এই সম্পত্তি স্বোপার্জিত হউক বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হউক, তাহা পবিত্র জিনিস। রাষ্ট্র তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বলিয়াছে, রাষ্ট্রের চক্ষে, আইনের চক্ষে প্রত্যেক মানুষই সমান ও সমানাধিকারী। প্রত্যেকেরই মোটের উপর রাষ্ট্রশাসনে ভোটাধিকার আছে, প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রকর্মে নিয়োগের অধিকার ও বিচারালয়ে বিচারলাভের অধিকার প্রভৃতি অধিকারও আছে। সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাই ইহাও স্বীকার করে রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মমত ও রাজনৈতিক মত পোষণের ও প্রকাশের অধিকারী ; প্রত্যেকেরই সভা করিবার, সমিতি বা দলগঠন করিবার অধিকারও আছে ; আর বিনা বিচারে কাহাকেও অবরুদ্ধ করাও চলিবে না। মোটামুটি এই সব অধিকারকেই বলা হয় Civil rights. আমরা বাঙ্গলায় তাহাকে 'ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, বলিয়াই নাম দিই। আমাদের নূতন রাষ্ট্রবিধানে ইহাদের 'মূল অধিকারের' মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। সত্য বটে রাষ্ট্রের গুরুতর বিপদে এইসব অধিকার খর্ব করা

সাময়িকভাবে প্রয়োজন হইতে পারে ; কিন্তু মোটের উপর যদি এই সব অধিকার বরাবর বা বহুদিন যাবৎ কোনো রাষ্ট্রে খর্ব করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে সেই রাষ্ট্রে Civil rights নাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে সেই দেশের জনসাধারণ আর নিজেদের 'সিটিজেন' বা রাষ্ট্রজন বলিয়া দাবি করিতে পারে না—যদিও তাঁহারা হয়ত ভোটাধিকার হারান নাই, চাকরির অধিকার খোয়ান নাই, এমন কি বিচারালয়েও অনেক বিষয়ে সুবিচার লাভ করিতেছেন।

সাধারণভাবে রাষ্ট্রের আনুগত্যও আবার রাষ্ট্রজনের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তাহারা শুধু বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিতে বা নানাভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে স্বীকৃত থাকিবেন তাহা নয়। রাষ্ট্রের শাসন সাধারণভাবে পালন করিবেন ; রাষ্ট্রের যে মূল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে সেই মূলবিধানানুযায়ীই তাঁহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন, আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিরোধ, অশান্তি ও আক্রমণ হইতে রাজশক্তিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। অবশ্য উহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তাঁহারা রাজশক্তির সমালোচনা করিবেন না, অন্যায় আইনের বিরোধিতা করিবেন না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সে বিরোধকে বিধিসম্মত পথেই রূপদান করা চলে। তাই বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করা নিরর্থক ও অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি সেই গণতান্ত্রিক সুযোগ রাষ্ট্রে না থাকে, তাহা হইলে অন্যায়কারী ও স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারও (Right to rebel) গণতান্ত্রিক অধিকার—তাহাও 'রাষ্ট্র জনের' চরম অধিকার। এই কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

আসল কথাটা আবার মনে রাখা প্রয়োজন : আধুনিক যুগে সাধারণ মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ক্রমশঃই জাগিতেছে বলিয়াই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে সে আত্ম-শাসনের দাবি করিয়াছে এবং এই আত্ম-শাসনের ব্যবস্থাকেও দিনে দিনে নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সুষ্ঠু ও সুপরিণত করিয়া তুলিতেছে। মূলত তাই সিটিজেনশিপের ধারণা মানুষের আত্মচেতনার ফল। আর এই আত্মচেতনা শুধু রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনেই সীমাবদ্ধ নাই। আরও ব্যাপকতর দায়িত্ব ও ব্যাপকতর অধিকার ক্রমশ মানুষ বুঝিতে পারে। রাষ্ট্রের বাহিরেও অনুরূপ দেশসেবার ও সমাজসেবার বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রেও যেমন তাহার অধিকার আছে, তেমনি দায়িত্বও আছে। সে কি কোন পল্লীসমাজের অধিবাসী ? তাহা হইলে সেই পল্লী সমাজের দশজনার প্রতি তাহার কর্তব্য আছে। তাহাদের সুখ-দুঃখ মঙ্গলামঙ্গল, সকলের সমবেত স্বার্থে সকলের উন্নতির জন্য যতটুকু সম্ভব তাহাকে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে।

তাহা না হইলে যদি পল্লীসমাজ তাহাকে শাস্তি না দিতে পারে তাহা হইলেও সে যে কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ভুল নাই। আর সে কি কোন শহরের অধিবাসী? তাহা হইলে তো এই পুরবাসী বা পৌর হিসাবে তাহার কর্তব্য আরও গুরুতর। অবশ্য তেমনি তাহার অধিকারও প্রচুর। সেই পৌর অধিকার ও পৌর কর্তব্যের অর্থ সাধারণতঃ শহরের পুর-সভার বা মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাকে স্বীকার করা ও সাহায্য করা এবং তাহা পরিচালনায় আবার গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মতই (Civic Rights and Duties) অচ্ছেদ্য জানিয়া উহা পালন করা জনহিতকর প্রত্যেকটি পৌর-ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে স্বীকার করা। আর প্রয়োজন বুঝিলে জন-স্বার্থেই সেই পৌর-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। —ইহাও তাই পৌর-জনের কর্তব্য।

বলা বাহুল্য সমাজবদ্ধ মানুষ চিরকালই এই জাতীয় কর্তব্য প্রতিপালন করিয়াছে। ইহাই তাহার সমাজচেতনার প্রমাণ—প্রতিবেশীকে আপনার আত্মীয় জ্ঞান করিতেই হয়। কিন্তু এই সমাজ চেতনা পৌর-জীবনযাত্রায় আরও বিকশিত ও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। এই পৌর-জীবনের কর্তব্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিকে দেখিলে মনে হইবে আসলে উহা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের একটি শিক্ষা-ক্ষেত্র। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে কিছু না কিছু কর্তব্য প্রত্যেকেই আমরা পালন করিতে পারি। আর সেই হিসাবে আপনার সামাজিক চেতনার ও সমাজ-সেবার শক্তির পরিচয়ও লাভ করিতে পারি। যে কোন শহরেই বাস করি আমাদের কতকগুলি সামাজিক নিয়ম তাহাতে পালন করিতেই হয়। ইহার কতকগুলি একেবারে মৌলিক—যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধির সাধারণ নিয়ম পালন ও মানুষে মানুষে শিষ্টাচার ও শোভনতা। ইহার সাধারণ নিয়মগুলি পালন না করিলে আমরা নিজের ও অপরের জীবনযাত্রা দুর্বহ করিয়া তুলি। কিন্তু তথাপি হয়ত জানিনা—ইহারই সমতুল্য প্রয়োজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা দ্বারা-আমার নগর বাসীদের জীবনকে উন্নত ও আনন্দময় করিয়া তোলা। মনে করিতে পারি, —উহা আমার দায়িত্ব নয়। কিন্তু পাড়ায় বসন্ত, টাইফয়েড; যে শুধু বস্তিবাসীদেরই আক্রমণ করিবে—পরিচ্ছন্ন অট্টালিকাবাসী আমাকে আক্রমণ করিবে না—ইহা ভাবা চলে না; তেমনি আমার শহরে আমি একা শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান হইয়া ঘরে বসিয়া স্বাস্থ্যচর্চা করিলেই রক্ষা পাইব, আমার পুত্রকন্যারাও তাহাতেই শিক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সিটিজেন হইয়া যাইবে একথাও ভাবা চলে না। আমার নিরানন্দ প্রতিবেশীদের জীবনের তলায় যে বিক্ষোভ জন্মিবে তাহা আমার বিরুদ্ধে না ফাটিয়া পড়িলেও ফাটিয়া পড়িতে পারে দাঙ্গায় কলহে। অন্ততঃ তাহার ইতর রঙ্গ তামাসায়

—একালে উহার ব্যবসা করিবার লোকেরও অভাব নাই। তাই শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের দায়িত্ব আমাকে লইতে হয়। তাহা ছাড়াও সাধারণ কর্তব্য করিতে হয় বৈ কি? এই তো আজ সহস্র সহস্র শরণার্থী আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে। এই দুর্ভাগ্যদের মধ্যে কলেরাও দেখা দিতেছে। আমার ও আমার পরিবারের স্বার্থেই আমাকে তাই সেবাকর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার প্রত্যেকটি লোককে কলেরা মহামারীর প্রতিষেধক ঔষধাদি দিয়া যথাসম্ভব পৌরপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে দাঙ্গার বিরুদ্ধেও এমন কি আমাদের পাড়ার সংগঠন করিতে হয় এবং গঠন করিতে হয় পল্লীমঙ্গল সমিতি। এই রূপই কর্তব্য আবার জনমত গঠন করিয়া পৌর সংস্কার, অসাধুতা, অকর্মণ্যতা হইতে সমস্ত শহরকে রক্ষা করা—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিস্তারে পৌর প্রতিষ্ঠানকে অগ্রসর হইতে তাড়না দেওয়া।

কিন্তু পূর্বতন গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রজনের বা পুরবাসীর কাহারও আত্মশাসনেরই যে আর বিকাশ-পথ নাই এই কথাটিও এখন ভাবিলেই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। আমরা কলিকাতা শহরের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—কেমন করিযা এত বড় সুবৃহৎ পৌরপ্রতিষ্ঠান আজ দিনের পর দিন আপনার অসাধুতায় ও অকর্মণ্যতায় কলিকাতাকে নরককুণ্ডে পরিণত করিতেছে। কেন এমন হয়? জিজ্ঞাসা করিলে অনেক কারণই উল্লেখ করা যাইবে,—কোনটাই হয়ত মিথ্যা নয়; কিন্তু যাহা পরিষ্কার তাহা এই—পৌরনির্বাচন একটা গণতন্ত্রের প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কখনো কখনো সরকারী পরিচালনা সেই নির্বাচনকে নাকচ করিয়া আর একটা স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রহসন সেখানে জমাইতেছে। আইন সভার নির্বাচনে সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার আছে কিন্তু দলগত কারণে কলিকাতা শহরের শতকরা ২।৩টি মাত্র নর-নারী কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোটের অধিকার ভোগ করিতেছে। গোড়ার কারণ হয়ত সমাজের সাধারণ মানুষের আত্মশাসনের অধিকার শাসকশ্রেণী অপহরণ করিয়া লইয়াছে। সাধারণ মানুষ দায়িত্বহীন হইয়াছে, কারণ অধিকারের মূল্য নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও দেখিব—ধনবলে প্রবল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে কবলিত করিয়া বসিয়াছে। যদি আর্থিক গণতন্ত্রের উপর তাহার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সত্যকার গণতন্ত্র পৌরক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারিব কেন পৌর-অধিকার ও পৌর কর্তব্য বলিলে শুধু পূর্বেকার মত গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ব বুঝিলেই চলে না। এই অধিকার, ভোটাধিকার, চাকরির অধিকার, ব্যক্তিগত মতামতের অধিকার। এই সবের ভিত্তি-স্বরূপে দরকার সিটিজেনের সমানাধিকার।

সমতুল্য আর্থিক ভিত্তির উপর সেই সিটিজেন বা রাষ্ট্রজনের প্রতিষ্ঠান। সিটিজেনশিপ শুধু এখনকার মত শতকরা পাঁচজনের ক্রীড়াবস্তু থাকিবে না; উহা শতকরা বাকী পঁচানব্বই জনেরও ধর্ম হইয়া উঠিবে।

[মন্তব্য: এই রচনাটি বা রচনাদ্বয়কে আরও সংক্ষিপ্ত করা যায়। গোড়ার ঐতিহাসিক অংশ—গ্রীক, রোমক, ভারতীয় বিবিধ পৌর ধারণার কথা না বললেই—তা হবে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক পশ্চাদপটে বিষয়টি দেখলে অনেক ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়; শুধু এ রচনা নয়, এ জাতীয় বিবিধ রাজনৈতিক-সামাজিক রচনা লিখতেও তখন অসুবিধা হয় না। এ জন্যই রচনাটি এ ভাবে উত্থাপিত হ'ল]

আমার প্রিয় বই ॥

সত্য কথা বলিতে হইবে, যে-বই আমার সর্বাধিক প্রিয় তাহা ইতিহাস—পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস; তাহার মধ্যেও বিশেষ করিয়া আবার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। কিন্তু তাহাতো একখানা বই নয়। বহু গ্রন্থে বিবৃত একটি বিষয় হয়ত বা একটি বিদ্যা। অতএব, তাহাকে আমার প্রিয় বই বলিবার উপায় নাই, আমার প্রিয় বিষয় বলিতে পারি। যে একখানি বইকে আমার প্রিয় বই বলিতে পারি—তাহা মহাভারত।

সূচনা

কিন্তু কোন্ 'মহাভারত'? শৈশবে দিদিমাকে পড়িয়া শোনাইতে হইতো কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'। দিদিমার কাছে তাহাই ছিল রামায়ণ, তাহাই ছিল মহাভারত। দাদামশায় ইহা লইয়া কত পরিহাস করিতেন, কিন্তু দিদিমা তাহাতে কোনও কানও দিতেন না, কিন্তু আমি তাহা ভুলিতে পারিতাম না। সে দিন অবশ্য চলিয়া গিয়াছে, সংস্কৃতের সঙ্গে যতটুকু আমার পরিচয় তাহাতে এখনও বাল্মীকির 'রামায়ণ' বা ব্যাসদেবের 'মহাভারত' আমার পড়া সম্ভব নয়। তবে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কৃত এই দুই মহাগ্রন্থের সারানুবাদ বাবা কয়েক বৎসর পূর্বেই আমার জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। কাজেই মূল 'রামায়ণ' ও মূল 'মহাভারতের' সঠিক আভাস যে পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি। তাহা না পাইলে সত্যই আমার রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি প্রীতিকে একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখিতাম। কিন্তু বলিতে বাধ্য হইব—তাহা সত্ত্বেও আমি কৃত্তিবাসের ভক্ত; কাশীরাম দাসের মুগ্ধ পাঠক।

কৃত্তিবাসের বহু অংশই ছিল আমার মুখস্থ, দিদিমাও তাহাই বেশি পড়িতে বলিতেন,—রাম স্বয়ং নারায়ণ, সীতাই লক্ষ্মী, ইহা তাঁহার নিকট সত্য

ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তো নারায়ণ, ইহাও ছিল তেমনি ধ্রুব সত্য। কিন্তু তিনি চাহিতেন রামায়ণের মধ্যে আমাদের হিন্দু সংসারের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে—আদর্শ পুত্রের, আদর্শ পিতার, আদর্শ ভ্রাতার, আদর্শ পত্নীর এবং শেষে আদর্শ প্রভুর। আদর্শ রাজার ও আদর্শ ভক্তের যে মূর্তি তাহাতে আছে, তাহা যেন আমার অন্তরে ছাপ রাখিয়া যায়, সংসারকে আমি যেন এই আদর্শের প্রভাবে সুন্দর ও কল্যাণময় করিয়া তুলি। কিন্তু বাল্য হইতে কৈশোরে উপনীত হইতে হইতে আমার কাছে সংসারের রূপটা এমনই পরিবর্তিত হইয়া যাইতে লাগিল, আমি যেন কেবলই বুঝিতে চাহিলাম—যাহা আদর্শ তাহাতো নিতেছি কিন্তু বস্তুতঃ কী ছিল আমার ভারতীয় সংসার, ভারতীয় জীবনযাত্রা? সেই বাস্তব চিত্র কোথায়? বাবার সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের বিতর্ককালে একদিন শুনিলাম,—"ইতিহাস নাই বলিতেছেন কেন?" এই 'মহাভারত' কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলিবনা কেন?' এই ইতিহাস-অনুরাগের উন্মেষ হইতেই আমার মহাভারতের প্রতি অনুরাগ দৃঢ়তর ও গভীরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি প্রাচীন ভারতের একটা সত্যকার চিত্রপটের সন্ধান পাইলাম।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান কথা। সে যুদ্ধ সত্যই ঘটিয়া থাকিবে, এইরূপ মনে হয়। তাহা একালের যুদ্ধের তুলনায় নিশ্চয়ই ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। হয়ত ভারতীয় দুইটি রাজন্যগোষ্ঠীর কলহে আরও রাজা-রাজন্য ও নিকটতর ক্ষত্রিয় সমাজ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, বিধ্বস্তও হইয়াছিল। এদিনের তুলনায় তাহা সামান্য দুই সহস্রের মারামারি, কাটা-কাটি। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাহার তাৎপর্য না বুঝিলে থার্মোপলি-ই বা কি? ওয়াটালু ই বা কি? পানিপথই বা কি?—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে সেই দৃষ্টিতে দেখিলেই তাহার অর্থ বুঝিব।

কিন্তু মহাভারত শুধু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকথা নয়। ইলিয়দও যেমন শুধু ট্রয়ের যুদ্ধের কথা নয়। ইলিয়দের মতই মহাভারত বহু বহু প্রচলিত লোক-কাহিনীর একটি সুসজ্জিত ভাণ্ডার। বিরাট ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা কত জাতি কত উপজাতি লইয়া বহিয়া আসিতেছিল, মহাভারত তাহার কথা আমাদের জন্য ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহার মধ্যে তাই নানা সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে বহুশতাব্দী পূর্বের সমাজ বিন্যাসের কথা ও কাহিনী; কত আর্য ও আর্যেতর সমাজের আখ্যান ও আখ্যায়িকা, তাহাদের জীবনের তথ্য ও মনের কামনা, স্থূল সহজ নির্মমতা ও তেমনি সরল দৃঢ় মানবতা, সূক্ষ্ম বুদ্ধির তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সুস্থির জ্ঞানের ব্যবহারিক মীমাংসা। একটা প্রাচীন মহা জাতির সদসদ্, ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম ও সকল রূপেরই পরিচয় পাই মহাভারতে। 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'—একদিক হইতে দেখিলে মনে হইবে

ইহা মিথ্যা নয় আজও ভারতে তাহা নাই। আমরা সেই কুরুক্ষেত্রের পরে কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ইতিহাসের আরও কত পর্ব পার হইয়া আসিয়াছি, আরও কত পার হইব। কত নূতন জাতির সঙ্গে পরিচয় হইল, বিরোধ হইল, সম্মিলন হইল, মিলন ও পার্থক্যের সম্পর্কও রচিত হইল,—আরও কত হইবে তাহাও জানি। ইতিহাস থামিয়া নাই। নূতনের আর্বিভাব প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে—সেই পৌরাণিক যুগ বা হেরোইক এজের আবেষ্টনী ছাড়াইয়া কত দূরে আজ আমরা সাধারণ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে আসিয়া গিয়াছি ;—প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক, নরনারীর সম্পর্ক, মাতাপুত্রের সম্পর্কের কত ধারণা, ভাবনা উলটাইয়া যাইতেছে; সমাজ জীবন কত নূতন ভঙ্গিতে নবায়িত হইতেছে। তবু যখন ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত করিয়া সেই পৌরাণিক সমাজের ইতিহাসখানিকে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লইয়া দেখি তখন কি আবার বলিতে চাহিনা—যাহা নাই ভারতে তাহা নাই পৃথিবীতে? কারণ, মহাভারত ত শুধু আদর্শের কথা নয়, আদর্শ মানুষেরও কথা নয়, ইহা মানুষের কথা, সে মানুষেরও আদর্শ ছিল। আদর্শ ছাড়া মানুষ কোথায়? স্বপ্ন ছাড়া চেতনা কোথায়? কিন্তু সে মানুষই থাকিয়া গিয়াছে। এই মানুষের কথা বলিয়াই বলা সম্ভব—'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'। না হইলে বলিতে বাধ্য হইতাম—মানুষের সমানাধিকার (Equal rights of man)-যে অধিকার ও চেতনা আজ ভারতের ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে সমক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া সকলকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে মহাভারতে তাহার কতটুকু বাস্তব পরিচয় আছে? যতই তর্ক করি বিশ্বে কিছুই নূতন নয়, একথা যেমন সত্য, ইতিহাস যে নূতনেরই পরিচয়পত্র ও পরিচয় সূত্র তাহাও তেমনি সত্য। তাই ইতিহাসেরই নিয়মে ভারতেও অনেক কিছু নূতন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, কোন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-মহর্ষির পক্ষেও যাহার সন্ধান পাওয়া ছিল প্রাচীন কালে অসম্ভব।

তথাপি যে বলি 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে' তাহা কি অর্থে তবে বলি? বলি এই অর্থে যে, মহাভারত যেমন শুধু কুরু-পাণ্ডবের কথা নয়, বিচিত্র ভারত সভ্যতার একটা বহু-বিসর্পিত পরিচয়ও নয়, তেমনি মহাভারত শুধু ইতিহাসও নয়—ইহা মানুষের কথা। অর্থাৎ ইহা শুধু আখ্যান নয়, ব্যাখ্যান, শুধু সমাজ সভ্যতার কথাবস্তু নয়, ইহা মহাকাব্য। সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত আখ্যান, গীতার যোগোপদেশ ও অনুশাসনপর্বের সমস্ত হিতোপদেশ ছাড়াইয়াও মহাভারত যে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী তাহার কারণ মহাভারতের মানুষ। কাহাকেও অতিমানুষ বলিবার উপায় নাই। যুধিষ্ঠিরের কথাই ধরা যাউক। নিশ্চয়ই এমন ধর্মাত্মা, সহনশীল পুরুষ দুর্লভ। কিন্তু সেই যুধিষ্ঠির এমন দ্যুতক্রীড়াসক্ত যে আপনাকে, আপন ভ্রাতাদের,

এমন কি দ্রৌপদীর মত এমন তেজস্বিনী ভার্যাকে পর্যন্ত পণ করিয়া বসিতে তাহার দ্বিধা হইল না। স্বল্পোচ্চারিত মিথ্যার দ্বারা তিনি গুরুবধ, যুদ্ধজয়, রাজ্যলাভ, সব কিছুকে আয়ত্ত করিয়া নিজের বিবেককে ভুলাইতে চাহিলেন, ইহাই বা কে ক্ষমা করিবে? তথাপি তিনি যে ক্ষমার্হ, তাহার কারণ তিনি মানুষ—মানুষ এমনই আত্মবিস্মৃত হয়, এমনই আত্মপ্রতারণা করে, তাই বলিয়া তাহার সত্যনিষ্ঠা, তাহার পত্নীপ্রেম, তাহার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুই মিথ্যা নয়। সমস্ত মহাভারতে ভীষ্মকে দেখি অখণ্ড একটি মর্মর প্রস্তরের মত নির্বিচল নিষ্ঠায়, বীর্যে-মহিমায় পরম ভাস্বর। কিন্তু সেই ভীষ্ম কোন জ্ঞানে দুর্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না? সভাপর্বে দ্রৌপদীর অপমানও সহিলেন। কোন্ বীর্যবান পুরুষের পক্ষে ইহা সম্ভব? একটা ভ্রান্ত ঐতিহ্য মিথ্যা ধারণায় তিনিও নির্বোধ, নির্বীর্য পুরুষের মত আচরণ করিলেন—এমন মানুষের বুদ্ধির বৈপরীত্য। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, নারায়ণ—জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে সার্থক এমন মানব চরিত্র আর ইতিহাসে নাই ইহা মহাভারত প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যই এই বিচিত্র পুরুষের অপৌরুষের মাহাত্ম্য মানিয়াও কেমন করিয়া ভুলিব—তিনি এতবড় মানব-ধ্বংসী যুদ্ধটাকে অসম্ভব করিবার পরিবর্তে আপনার বুদ্ধি-কৌশলে তাহাই অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিলেন? শতপুত্রহারা গান্ধারীর অভিশাপ তাহার প্রতি যেন সেই দিক হইতে মানব-মাতৃ-হৃদয়ের সমুচিত বিচার। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন ইহাই হয়তো যুক্তি। তিনি বুদ্ধদেবের মত হিংসা-অহিংসার ভেদাভেদ শাশ্বত মানিয়া নির্বাণ-পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন নাই। কিন্তু কোন্ ধর্মরাজ্য মহাভারতে শেষ পর্যন্ত স্থাপিত হইল? ক্ষত্রিয় বংস ধ্বংশ হইল, পাণ্ডবগণ খিন্ন হৃদয়ে 'মহাপ্রস্থানের' দিকে চলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আপন বংশ দস্যুগণ বিধ্বস্ত করিয়া নির্মূল করিয়া দিল।

মহাভারতের এই শোকাবহ পরিণামের কথা মনে রাখিয়া কি কেহ বলিতে পারে—মহাভারতের শিক্ষা কি?—ভিক্ষোপজীবী বিদুর ও গান্ধারীর কণ্ঠে বারেবারে তাহা উচ্চারিত হইয়াছে 'যতোধর্মস্ততো জয়'। মহাভারতের যদি কিছু শিক্ষা থাকে তবে তাহা কি এই? কিন্তু সত্যই কি মহাভারত এই শিক্ষা দেয়? যে শোকাবহ পরিণামে মহাভারতের শেষ তাহাতে বরং এই শিক্ষাই দেয়—ধর্মের জয়েও সান্ত্বনা নাই। আসলে মহাভারত ইতিহাস বলিয়াই অমন কথাও বলিতে পারেনা—ধর্মেরই কেবল জয় হয়। বরং শুধু নীরবে ইঙ্গিত করে যুদ্ধে জয়ী ও বিজিত সবাই আসলে পরাজিত; কারণ, যুদ্ধ মানুষের মানবতারই পরাভব। আর মহাভারত মহাকাব্য-বলিয়াই শেষ পর্যন্ত বলিতে পারে না—কিসে ধর্ম, কিসে অধর্ম,—ধর্ম জানিয়াই বা কতটুকু

আত্মনিয়োগ সম্ভব, অধর্ম জানিয়াই বা কতটুকু আত্মশোধন সম্ভব? মানব স্বভাব আপনারই নিয়মে মানুষকে লইয়া খেলিতেছে—ইহাই মানব নিয়তি, ইহাই জীবন-লীলা—সকল কাব্যের চিরন্তন বিস্ময়।

মানুষের চিত্র, আর, এই [illegible]য় পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষের একটি বিশিষ্ট জীবনযাত্রার পরিচয়-পত্র রূপেই মহাভারতকে আমি সমাদর করিতেরি।

॥ আমার প্রিয় লেখক ॥

তখনো কৈশোরে পদার্পণ করি নাই, দেখিতাম দাদু পড়িতেছেন ইংরেজীতে শেক্‌স্‌পীয়র, বাবা পড়িতেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী; আর মাকে দেখিতাম দুপুরবেলা মাসিকপত্র ছাড়িয়া যদি কিছু পড়েন তাহা হইলে শরৎচন্দ্র। দাদুর সঙ্গেই আমার কথাবার্তা হইত বেশি, তথাপি শেক্‌স্‌পীয়র পড়িবার দুরাশা মনে পোষণ করিতাম না। ছবি ভরা বইটা খুলিয়া বসিয়া থাকিতাম, দাদু বলিতে বসিতেন উহার গল্প—ভেনিসের বণিক এণ্টোনিও ও শাইলকের, কিম্বা ঝড়ের রাজা প্রোস্‌পেরো ও মিরাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলাম শিশুবয়সেই—ছবি তাহাতেও ছিল, কিন্তু বেশি নয়। এদিকে যখন কৈশোরের নূতন কৌতূহলে গল্প-উপন্যাস পড়িবার জন্য অস্থির হইতেছিলাম তখন মায়ের বই-এর ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া প্রথম পড়িতে পাইয়াছিলাম ‘শ্রীকান্ত’। কে বুঝিবে সেই ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত নতুন দাদা আমাকে কী আকর্ষণে টানিয়া লইয়া বয়োধর্মের প্রত্যাশিত নিয়মেই অন্নদা দিদি, অভয়া ও পিয়ারী বাঈজীর জীবন-রহস্যের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল! কিন্তু বয়োধর্মের এই সহজ নিয়মটাই বোধ হয় মাকে ভাবাইল বেশি, বাবাকেও করিল কিছুটা চমকিত, আর দাদুকে? দাদুকে, চমৎকৃত। তিনি যেন মজা পাইলেন,—“আর বেশি দেরী নেই দাদু, তোমার সঙ্গেই এবার জমবে আমার আসর, কথাটা বুঝিলাম না, কিন্তু দাদু আমাকে আনিয়া দিলেন এক রাশ অবনীন্দ্রনাথের বই—শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, নালক, আগুনের ফুলকি। জানিনা আমার আঁকিবার ঝোঁকটা তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল কিনা, কিন্তু ছবি আঁকিবার তুলি কাগজ আনিতেও ভুল করিলেন না। যাহা পাইলাম তাহাতে তখনকার মত যেন রঙ্গে-রেখায় মনটা ছাপাইয়া উঠিল। আসলে আমি হয়তো বই এর অপেক্ষা

বেশি ভালবাসি। ছবির বই, আর ছবির সঙ্গে বই ; পাইলেতো কথাই নাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রিয় লেখক হইয়া উঠিলেন।

তারপর চারটি বৎসর গিয়াছে। আজ কেহ বলিতে পারিবে না বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমি অপরিচিত। আর ভয়ে ভয়ে বলিতে চাই দাদুর উৎসাহে ইংরেজির প্রাচীর ডিঙাইয়া গোপনে গোপনে শেক্স্‌পীয়রের নাট্যশালায়ও বসিয়া এক-আধটুকু হাসিতে কাঁদিতে পারি। তথাপি যদি বলি অবনীন্দ্রনাথের লেখার মোহে আমার এই চোখটি এখনো পৃথিবীকে রঙীন করিয়া দেখে, তাহা হইলে আশা করি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র কেহই ক্ষুব্ধ হইবেন না। আমার দাদুর মতই শেকসপীয়রের সঙ্গে তাঁহারা বসিয়া মৃদু হাসিবেন। আর আমি ঠিক জানি, পারিলে ওপার হইতে অবনীন্দ্রনাথ আমার জন্য দু' একটি 'কাটুম-কুটুম' তৈয়ারী করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু ওইখানেই তাঁহার ভুল। আমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী মনকুর হাতে তাহার পুতুলজোড়া তুলিয়া দিব। সে 'অবন পটুয়ার' নামে পাগল। আমি কিন্তু বলিতাম, "অবনীন্দ্রনাথ, আমি অবন পটুয়াকেই শুধু চিনি না, আমি বাক্য-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ভক্ত। রঙ্গে-রেখায় আমার মন মাতে। কিন্তু শব্দের মধ্য দিয়া, যদি সেই রঙ্গ ও রেখা আমার কানের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে কানের ভিতর দিয়া সে ছবি আমার মরমে পশে, আর তখন ? তখন আমি তোমাকে আর একবার আমার মুগ্ধ মনের প্রণামটিও জানাই।"

অবনীন্দ্রনাথের লেখা আমার প্রিয় কেন, তাহা জানি না। হয়ত আমি ছবি ভালবাসি বেশি ; তাই সাহিত্য যখন ছবির কাজ করে তখন তাহা আমার ভাল লাগে। অন্তত, আমার দাদুর বোধ হয় তাহাই মত। "খেতে পরতে পাবে না দাদু, না হলে বলতাম তুমি আর্টিস্ট হও। এখন বলব তুমি হও আরকিটেকুট বা ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান।" আমি ভাবি, "কেন লিখবই বা না কেন ? লেখা দিয়া যে কী আশ্চর্য ছবি আঁকা যায় তাহাতো অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি লেখায় দেখিতেছি।" দাদু বলিবেন, "তা হলে দাদু, ফিলমের সিনারিও লিখিও, খাওয়া পরার অভাব হবে না।" কথাটা তথাপি সত্য। অবনীন্দ্রনাথের লেখা আমি যাহা দেখি তাহাই ছবি। ছবির পরে ছবি— বৌদ্ধযুগের ছবি, হিন্দু-যুগের ছবি, রাজপুতনায় রাজা-রাজকন্যাদের ছবি, আমাদের পরিচিত সংসারের ছবি, আর পরিচয়ের অতীত যে অদ্ভুত পৃথিবী তাহারও ছবি, কত অপূর্ব পশুপাখি ভুত-পত্রী আর অসম্ভব জগতের অসম্ভব জীব, অসম্ভব কথা ও দৃশ্য। সম্প্রতি তাঁহার কথিত 'জোড়াসাকোর ধারে' ও 'ঘরোয়া' ও আমি দাদুর কাছ হইতে পড়িতে পাইয়াছি, আর দাদুর টেবিল হইতে চুরি করিয়া ব্রত ও আলপনার বইখানি দেখিয়াছি। চুরি করিয়া "বাগেশ্বরী বক্তৃতা মালার" শিল্পালোচনা ভয়ে-ভক্তিতে পড়িয়াছি। বুঝিয়াছি

তাহার পিছনে খাঁটি রকমের বাঙালি মন, লোক-জীবনের রসজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ ছিল। কিন্তু সত্যই আমি যখন পড়ি তখন প্রায়ই মনে হয় নতুন রকমের ছবি দেখিতেছি। মাষ্টার মহাশয় বলেন; "তাহলে ছবিই দেখো না কেন? লেখা-পড়া কেন? লেখার মধ্যে ছবি দেখা অর্থ তো ছবির সাধ মেটানো, দুধের সাধ মেটানো ঘোলে।" আমার বন্ধুরা শুনিয়া হাসেন। নীন্দ্রনাথ কেন আমার প্রিয় লেখক তাহা আমি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

অবশ্য 'নালক' পড়িয়া আমার মনে যে ছবি ভাসিয়া উঠে আর 'রাজ কাহিনী' পড়িয়া যে ভাব ভাসিয়া উঠে তাহা এক নয়। দুইই বর্ণনার ভাষা। একটার মধ্যে আমি বৌদ্ধ-যুগের আভাস পাই; আর একটার মধ্যে পাই মধ্যযুগের রাজপুতনার। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য লাগে 'ভুত পত্রীর দেশ'— এ যেন কোন্ দেশের আলোতে ছাওয়া একটা অপূর্ব দেশ—'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। কারণ তাহা আমি দেখি নাই, তথাপি চিনি, স্মৃতির মধ্যে সে কেমন করিয়া বাসা বাঁধিয়া আছে। এই জগৎ আমার কেন, আমাদের সকলকার স্বদেশ।

বাঙলা গদ্যের সাধারণ সরল রূপটা আমার ভালো লাগে। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই সরল রূপের সাধক হইয়াও অপূর্ব বিচিত্র গদ্য-সৌন্দর্যের স্রষ্টা। মুখের কথার কথা বলার ভঙ্গিতেও তিনি নিপুণ শিল্পী—'ঘরোয়া' ও 'জোড়া-সাকোর ধারে'তে মনে হয় যেন তিনি কথা বলিতেছেন। তাঁর জীবন্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। কখনো হাসিতেছেন, কখনো উৎসাহে টান হইয়া বসিতেছেন, কখনো আসর জমাইয়া বলিতেছেন গল্প। এই কথা বলিবার ভঙ্গি ও ভাষাই তাঁহার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। দেখিতে মনে হয় তাহা স্বচ্ছন্দ—কিন্তু আসলে ইহা সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য নয়, শিল্পি-প্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পি-চেতনার আপন নিয়মে আপনাকে প্রকাশ, আপনাকে শাসন ও আপনাকে উদ্‌ঘাটন। কেহ যদি মনে করে চলতি ভাষার যাদুই তিনি জানিতেন তাহা হইলে তাহাকে বলিব কোনারকে 'গমনাগমনের' কথা পড়িয়া দেখুন। এতো ভাষা নয়—ভাস্কর্য। মনে হয় কোনারকের পাথর কথা কহিয়া উঠিয়াছে।

এই সব কথা সম্পূর্ণ আমার নয়—আমার দাদুর মুখেই শোনা। তিনিই আমার মনের কথা বুঝিয়া বলেন, "দাদু। লেখায় তুমি ছবি দেখাতে চাও— তাই বলো।" তারপর ওই কোনারকের পাথরের কথা কওয়ার কথা বলিয়াই বলিলেন, "কিন্তু লেখায় যদি মূর্তিগড়া দেখতে চাও, দাদু, তা হলে কিন্তু বলব এগিয়ে যাও। ওই যে—" বলিয়া তিনি আবার দেখাইয়া দেন শেক্‌সপীয়র কিম্বা তাঁহার নূতন-কেনা মূল মহাভারত।

হয়তো তাঁহার কথাই একদিন সত্য বলিয়া মানিব। কিন্তু আমার কৈশোর ও প্রথম তারুণ্যের রঙ-রেখার জগৎকে যিনি ভাষার মধ্য দিয়া এমন আমার কাছে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিলেন, আজও তাঁহাকে আমার প্রিয় লেখক বলিয়া ঘোষণা করিব না কেন? হাঁ, [illegible]টে, ইতিমধ্যে আমি মায়ের মতো শরৎচন্দ্রের জগতেও অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছি। আর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অসামান্য রস-স্রোতস্বিনীতেও অবগাহন করিয়া আমার পিতার সতীর্থ হইতে পারিয়াছি। একদিন বয়সের নিয়মেই হয়তো দাদুর মতই আবার শেক্‌সপীয়রকেই "প্রিয়াৎ প্রিয়তরোঽসি" বলিয়া আলিঙ্গন করিব। ব্যাসদেবের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম নিবেদন করিব। একদিন সত্যই আমি নিজেও চিত্র আঁকিতে আঁকিতে সেই রূপলোকের মধ্য দিয়াই সাহিত্যের রস-লোকের মহৎ শিল্পীদের দান আরও বেশি করিয়া উপভোগ করিতে পারিব। কিন্তু যিনি স্ফুটনোন্মুখ কিশোর-চিত্তের সম্মুখে আলোর ফুলকি জ্বালিয়া দিয়া আমাকে প্রথম চিত্র-উপভোগের আনন্দে আত্মাবিষ্কার করিতে শিখাইলেন তাঁহাকেই আজ বলিব আমার প্রিয় লেখক।

[মন্তব্য : বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে অপ্রত্যাশিত রূপে নিয়েছি। অবনীন্দ্রনাথকে। কেন? সত্যই, অবনীন্দ্রনাথ গদ্যশিল্পী। কিছুটা নতুন করে ভাববার ও বলবার সুযোগ, তাতে আছে। এরকম ক্ষেত্রে—যেন এ লেখাকে একেবারে 'বাহাদুরি দেখানো' বলে কেউ মনে না করেন, সে-বিষয়ে সাবধান হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। নোতুন ভাবনা, নোতুন কথা থাকাই যথেষ্ট নয়। তাই সে সন্দেহ নিরসনের জন্যই অনেক কথা ভূমিকা ও উপসংহারে জুড়ে দিতে হয়েছে। তথাপি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখাই শ্রেয়ঃতর। তাহলে অবশ্য বেশি কথা লেখবার সময় না হলেও মূল কথা লিখতেই হবে। যেমন—বঙ্কিম সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—(ক) বঙ্কিম সব্যসাচী, (খ) তাঁর প্রতিভার গভীরতা ও ব্যাপকতা, (গ) উপন্যাসে তাঁর গভীর লক্ষ্য ও আশ্চর্য গল্প বলার ক্ষমতা—চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা, আর (ঘ) প্রবন্ধে তাঁর গভীর মনীষা, (ঙ) শেষ কথা তাঁর ভাষার অপূর্ব প্রাঞ্জলতা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা দরকার (ক) তাঁর মানবতা ও মানুষে বিশ্বাস (খ) সৌন্দর্য ও সুষমা বোধ, (গ) প্রতিভার সর্বমুখিতা—গল্পে, কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলা দরকার, (ক) তাঁর অনুভূতি-প্রবণতা, মানব-মমতা, (খ) বঙ্গীয় পল্লী ও মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্য, (গ) সরসতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা।

॥ সামাজিক কুসংস্কার ॥

সকল সমাজেই কিছু না কিছু কুসংস্কার থাকিয়া যায়। কারণ সমাজ আগাইয়া গেলেও সব দিকে সব সময়ে পুরাতন অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে পারে না। ইহার মধ্যে যেই সব সংস্কার শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, **আধুনিক জীবনযাত্রার পক্ষে বাধাস্বরূপ সেইগুলিকেই কুসংস্কার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে**—আমরা মুখের এঁটো যথেষ্ট মানি; স্নান ও বাসনপত্র প্রক্ষালনেও আমাদের যথেষ্ট কড়াকড়ি আছে। নানা কারণে এই সংস্কারগুলি এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। এইরূপ ভালো করিয়া না বুঝিয়াও অনেকটা প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি আমরা পালন করিয়া গিয়াছি। এই সংস্কারগুলি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে বর্তমান কালের জীবনযাত্রায় অনেকক্ষেত্রে বাধা হয়। আবার এদিনে রেষ্টুরেণ্ট হোটেলে প্রতিনিয়ত আমরা যক্ষ্মা ছড়াইতেছি অথচ সেই সব স্থানে না খাইয়া উপায় আছে কি?

সূচনা :
কুসংস্কারের স্বরূপ

তথাপি কুসংস্কার একটা ঐতিহ্যের অভিশাপ। যে জাতি যত প্রাচীন, আর ধারাবাহিকতা রক্ষণে যত সমর্থ, তাহাদেরই সাধারণতঃ অর্থহীন নানা প্রাচীন কুসংস্কারে তত মগ্ন হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। অবশ্য এই কথা জোর করিয়া বলা চলে না। আমাদের তুলনায় চীনাদের কুসংস্কার অনেক কম। জাতি হিসাবে তাহারা আমাদের অপেক্ষা কম প্রাচীন নয়। কিন্তু কুসংস্কার তাহারা ঝাড়িয়া ফেলিতে জানে দেখা যাইতেছে। এই কথা স্পষ্ট, যে জাতি আধুনিক শিল্পযুগের জীবনযাত্রায় পৌঁছাইয়াছে তাহারা প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের অনেক সংস্কারই বর্জন করিতে শিখিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব সেই সব জীর্ণ সামাজিক কুসংস্কার উড়াইয়া দেয়।

এই কথা মানিতেই হইবে ভারতীয় জীবনযাত্রা আজও প্রাচীন কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার নানা ধ্যানধারণা, প্রথা নিয়ম কোথায় কোন সূত্রে জন্মাইয়া যে একেবারে আমাদের উপরে চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। এরূপ অনেকগুলি সংস্কার নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্রের দ্বারাও অনুমোদিত। কতকগুলি আবার শাস্ত্র না হোক লোকাচার-সম্মত। অপর আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নিবদ্ধ, কখনো কখনো বা বিশেষ জাতির নিয়ম, কখনো বা বিশেষ পরিবারেরও প্রথা। কাজেই কুসংস্কারের অরণ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে

ঐতিহ্যের অভিশাপ

না। তথাপি এ কালের জীবন-যাত্রার তুলনায় যে-যে ধরনের কুসংস্কারগুলি আমাদের পঙ্গু করিয়া রাখিতেছে, সাধারণভাবে তাহা নির্দেশ করিতে পারি। যেমন : প্রথম ও প্রধান কুসংস্কার—জাতিভেদ সম্পর্কিত কুসংস্কার। প্রধানতঃ তিনটি অনুশাসন দ্বারা এক জাতির সহিত অন্য জাতির প্রভেদ নির্দিষ্ট হয়।

ভারতীয় কুসংস্কারের প্রধান প্রধান রূপ

এক, জাত্যন্তরে বিবাহের নিষেধ; দুই, ভিন্ন জাতির পক্ব বা স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজনের নিষেধ; তিন, বংশগত বৃত্তিগ্রহণের ব্যাপারে নানাবিধ বিধি-নিষেধ। ইহা ছাড়াও আচারে-বিচারে কতরূপ বিধি বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে আছে আচরণীয় ভেদ, 'অস্পৃশ্যতা' দোষ প্রভৃতি জাতিতে জাতিতে ভেদ-বিভেদ শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই এ জাতিকে বিভক্ত ও দুর্বল করে নাই; আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্ব-বোধের মানদণ্ড যে কোন কোন দিকে সত্যই তুচ্ছ, শত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিলেও তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় প্রধান কুসংস্কার স্ত্রীলোক ও স্ত্রী-জীবন সম্পর্কে। যতই শাস্ত্রের উক্তি তুলি—সতীদাহ বা বিধবার পুনর্বিবাহের বাধাই শুধু নয়, আমাদের সমাজে কার্যতঃ অনেক বিষয়ে কন্যাসন্তান মর্যাদা পায় নাই। লেখা-পড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হয়, ঘরের বাহির হইলেই সে বুঝি আত্মবিস্মৃত হইবে, অন্ততঃ পরপুরুষ তাহাকে দেখিবেনা, সে অসূর্যম্পশ্যা থাকিবে, এমনি কত সংস্কারই ছিল। ইহা ছাড়া আরও যে সব সংস্কার আছে তাহার উল্লেখ নিরর্থক। সে মৎস্য মাংস ও সেব্য পর্যায়ে গিয়াছিল। স্ত্রীলোকও যে মানুষ, —হোক সে মাতৃজাতি—তাহারও যে মানুষের মতই স্বাধীনতা ও আত্ম-বিকাশের দাবী আছে, এই কথা আজিকার দিনে স্বীকার না করিলেই বলা যায় উহা কুসংস্কার।

তৃতীয়, কতকগুলি কুসংস্কার আছে—জাতকর্ম, বিবাহ ও মৃতাশৌচের সঙ্গে তাহা জড়িত। উহার সবগুলি ক্ষতিকর নয়। তবে অধিকাংশ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন ও হাস্যকর। কিন্তু এই কুসংস্কারগুলির পিছনে সুদীর্ঘ-কালের অভ্যাস রহিয়াছে; তাহা ভাঙ্গিতে গেলে মানসিক [illegible]লের প্রয়োজন হয়।

চতুর্থ ধরনের কুসং[illegible]গুলি মারাত্মক, যেমন—স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা শা[illegible]স্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া শীতলা, ওলাইচণ্ডী কিংবা ভূতপ্রেতের দোহাই দেওয়া, ডাক্তার ছাড়িয়া ওঝার শরণ লওয়া।

পঞ্চম ধরনের সংস্কারগুলি পাঁজি ও "পদিপিসি"র এলাকাভুক্ত। হাঁচি-টিকটিকি, বারবেলা, মঘা, অশ্লেষা হইতে এবারে ইহা খাইতে নাই, ওবারে

উহা করিতে নাই, তাল গাছে কী আছে আর বেল গাছে কে থাকেন, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই সব অনেক কুসংস্কার সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। তাহাতে আমাদের সভ্যতা ও [illegible] সামাজিক বিকাশের নানা গোপন ও বিলুপ্ত সংবাদ আমরা পাইতে পারি। সমাজ-বিজ্ঞানের চক্ষেই তাহা ধাবনযোগ্য। অনেকগুলির হয়ত উদ্ভবের কারণও সহজবোধ্য। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো বিজ্ঞানের চক্ষেই তাহা রক্ষণীয় বা পালনীয় নয়। আর যখন এই সব অভ্যাস আধুনিক জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে বাধা, তখনতো তাহা অবশ্যই বর্জনীয়। তথাপি, নানা বিজ্ঞানের ও অপবিজ্ঞানের নাম করিয়া উহাদের সমর্থনের যে চেষ্টা হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। প্রসিদ্ধ ডাক্তার গঙ্গাজলের অমোঘ গুণ কীর্তন করিবে, সকল জিনিসে ইলেকট্রিসিটি ও ভিটামিনের প্রভাব দেখিবেন, ইহা সর্বনাশের একটা চোরা পথ।

উপায় : বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা

কারণ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-দীক্ষাই কুসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিবার একটা প্রধান উপায়। তাই বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ তো আত্মহত্যারই নামান্তর।

অবশ্য বিজ্ঞানকে যতক্ষণ আমরা জীবনে গ্রহণ না করি ততক্ষণ বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য দান করিতে পারে না, তাহাও স্মরণীয়। আর, বিজ্ঞান জীবনে আসে শিল্প-বিকাশের পথে, আর্থিক বিপ্লবের রূপে।

কুসংস্কার বর্জনের তাহা হইলে প্রধান উপায় কি? শিক্ষা-দীক্ষা নিশ্চয়ই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা জীবনের শিক্ষা। যদি আমরা আমাদের

জনগণের সামাজিক গতিবৃদ্ধি

জীবনযাত্রাকে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে সেই বিরাট প্রয়াসের মধ্য দিয়া অধিকাংশ কুসংস্কারও ঝরিয়া যাইবে —যেমন গিয়াছে অন্যদেশে। ইহাই মূল কথা। সমাজের কুসংস্কারও শুধু খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাছিয়া ফেলা সহজ নয়। জনগণের জাগরণের দ্বারাই তাহা ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলা সম্ভব।

[মন্তব্য: কুসংস্কার নিয়ে মহাভারত লেখা যায়; কারণ তার রূপ অনন্ত, বিশেষতঃ ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রাচীন জগতে। এখানে মূল কথাটাই বলতে চেষ্টা করেছি, যেমন, (১) কুসংস্কারের স্বরূপ, কোন সংস্কার কুসংস্কার কেনই বা তা কু। তারপর (২) আমাদের দেশে কুসংস্কারের কয়েকটি প্রধান রূপ নিদর্শন করেছি—ইচ্ছা করলে আরও অনেক রূপ নির্দেশ করা যায়। তারপর (৩) এসবের সমর্থনে যে অপবৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে একটু সাবধানও করা হয়েছে। কারণ, আসল উপায় হল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ও বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রার প্রসার। বলা কি দরকার যা বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অনাবশ্যক হলেও চিত্তের সৌন্দর্যবোধ ও সামাজিকতার জন্য প্রয়োজন,—অবশ্য জীবনযাত্রায় তা বাধা না হলে—তা কিন্তু কুসংস্কার নয়। মাল্যচন্দন, ধূপদীপ দিয়ে আমরা অতিথিকে বরণ করলে তাই তা কুসংস্কার হয় না।]

॥ বিজ্ঞান ও সাহিত্য ॥

[বিতর্ক বিষয়ক রচনা]

বিজ্ঞানের যুগের কবির কথা দিয়াই আলোচনাটা আরম্ভ করিতে পারি।

"মন নিয়ে এই জগৎটা কেবলই আমরা জানছি। সেই জানাটা দুই রকমের। জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকেন পিছনে। আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

"ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ-রূপে এই আপনার সঙ্গে মিলিত।

"বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন কি অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয়, তবে সাহিত্য তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে।"

'ব্যক্তিগত' ও নৈর্বক্তিক দৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। অথচ তিনি গান্ধীজীর মত বিজ্ঞানের প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন না, বরং ছিলেন আস্থাশীল। অসংখ্য লেখায় ও জীবনের কাজে-কর্মে তিনি তাঁহার সেই বিশ্বাস ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি অসংখ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ বারে বারে এই সত্যটি বলিয়া গিয়াছেন—সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলগত একটা পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান সন্ধান করে নৈর্ব্যক্তিক সত্য। বিজ্ঞানের সাধনায় বৈজ্ঞানিকের নিজের কিংবা অপর কাহারও ভাব বা আবেগের কোনো স্পর্শ ঘটিতে পারে না; ঘটিলে সেই সাধনায় দোষ ঘটে। কিন্তু সাহিত্যের, বিশেষতঃ রস-সাহিত্যের সাধনায় এই নৈর্ব্যক্তিকতা চলে না। যে কোনো সত্যকে সাহিত্যিক দেখেন কোনো-না কোনো রূপে ব্যক্তিগত ভাব, অনুভূতি ও উপলব্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া। অর্থাৎ সাহিত্যিকের সত্য ব্যক্তিগত উপলব্ধির সত্য।

কিন্তু এই কথা কাব্য, বা অন্ততঃ রস-সাহিত্যের সম্বন্ধেই সত্য। অন্য সাহিত্যে বিশেষতঃ, প্র[illegible] সাহিত্যে ভাবাবেগ বর্জনই প্রয়োজন। বুদ্ধি, যুক্তি, প্রাঞ্জলতা, চিন্তার সুসজ্জা প্রভৃতি গদ্য গুণগুলি রস-সাহিত্যেও প্রয়োজন; তবে সেখানে তাহা গৌণ। সেখানে কল্পনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই প্রধান শক্তি। সাহিত্য বলিতে রবীন্দ্রনাথ রস-সাহিত্যই বুঝিয়াছেন।

তথাপি যাহা নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধি তাহাও সাহিত্য নয়। তেমন একান্ত ব্যক্তিগত উন্মাদের সেই প্রলাপ। সাহিত্যের বিষয়বস্তু করিতে হইলে উন্মাদের সেই প্রলাপের মধ্যেও ভাবে ও ভাষায় একটা দশজনের বোধগম্য শৃঙ্খলা আনিয়া দিতে হয়। ওফেলিয়ার উন্মত্ততা, হেমলেটের উন্মাদনার ছলনা, লিয়রের প্রলাপ পাঠক ও দর্শকের নিকট এই কারণে গ্রাহ্য হয়। তাহা না হইলে ক্যামিংস কেন, এজরা পাউণ্ডের কবিতা, জেমস্ জয়েসের ফিনিগন্‌স্ ওয়েক‌ও সাহিত্য হিসাবে গণ্য নয়। রবীন্দ্রনাথেরই কথায় "সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই পুনশ্চ বিশেষ ভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" আর সাহিত্যিকের এই দানের মধ্য দিয়াই সাধারণ আপনার অর্ধ-জ্ঞাত অর্ধ-অজ্ঞাত সেই উপলব্ধিকে সত্য-সত্যই পূর্ণতর করিয়া লাভ করে এইজন্যই সাহিত্যিক সাধারণের মুখপাত্র।

কিন্তু মূলকথাটা এই যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মূলগত প্রভেদ এইখানে : বিজ্ঞান impersonal সত্যের সন্ধানী ; সাহিত্য সত্যের personal পরিচয়ের প্রকাশ। প্রভেদটাকে অন্য শব্দদ্বারাও নির্দেশ করা যাইতে পারে—বৈজ্ঞানিক সাধন-পদ্ধতি objective, বস্তুগত ; সাহিত্যের সাধন পদ্ধতি subjective, ভাবগত। কথাটা রবীন্দ্রনাথও সুন্দর করিয়া বহুবার বলিয়াছেন। আধুনিক ইংরেজ কবি যখন খুব বস্তুধর্মী হইয়া উঠিয়াছেন বর্ণনা করিতেছেন হয়তো লাল চটি জুতাজোড়া। তখন যথাসম্ভব নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত ভাব বা আবেগকে হয়ত তিনি সযত্নে তাহা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তখনো তিনি বর্ণনা করিতেছেন তাঁহার আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা লাল চটি জুতো জোড়া। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার ব্যক্তিসত্তা আপনাকে গোপন রাখিয়াও আপনাকে প্রকাশ না করিয়া পারে না। উহা শুধু objective বর্ণনা নয়, subjective-objective প্রকাশ। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেও বর্জন করিয়াই সত্য দেখিতে হয় ; তবেই সেই দৃষ্টি হয় বিজ্ঞান-সম্মত।

বাস্তবিক ও ভাবগত দৃষ্টি

কিন্তু ইহাও নূতন বৈজ্ঞানিকেরা আজ স্মরণ করাইয়া দেন, শত সত্ত্বেও বস্তুর সহিত বিজ্ঞানীরও মনের একটা সংযোগ ঘটিতেছে, আর তাহার ফলে বৈজ্ঞানিকের মন ও অধীতব্য বস্তু দুইই পরিষ্কার প্রভাবিত হইতেছে। আর এই সম্পর্ক আবার প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কিছুই তাই নিছক objective হইতে পারে না—আপেক্ষিক ভাবে নৈর্ব্যক্তিক মাত্র।

তেমনি বৈজ্ঞানিক কেন, সাহিত্যিকরা মানেন, কোনো সৃষ্টিই নিছক subjective ও হইতে পারে না—বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির আজন্ম সক্রিয় সংযোগ ঘটিতেছে। তাহাতেই কল্পনাও অনুরঞ্জিত। অতএব, সাহিত্যিকের subjective ও আপেক্ষিক মাত্র। মন ও বস্তুর, প্রতি জিনিসের সহিত প্রতি জিনিস অনুপ্রবিষ্ট। সেই সক্রিয় সম্পর্ক সতত পরিবর্তনশীল। এই মূলের কথাটা মনে রাখিয়াই তবু পার্থক্য করা চলে বিজ্ঞান অপার্থিবভাবে, impersonal ও objective; সাহিত্য, personal ও subjective-objective।

এই প্রকৃতিগত প্রভেদ হইতেই পদ্ধতিগত প্রভেদেরও কথা আমরা বুঝিতে পারি। বিজ্ঞান মোটের উপর বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া বস্তুর সত্যকে বুঝিতে চায়। বস্তুপ্রবাহের মধ্য হইতে বস্তুকে, তথ্যকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া না লইলে বিজ্ঞানের চলে না। সাহিত্য, বিশেষ করিয়া রস-সাহিত্য, সৃষ্টি-মূলক বস্তুকে ভাবরসে নিষিক্ত করিয়া লয়। তাহা শুধু বস্তু থাকে না, বাস্তবের সঙ্গে আধ্যাত্মবোধের সংযোগ স্থাপন করে; একটা অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গির যোগে সে খণ্ডবস্তুর মধ্যেও একটা অখণ্ডতা স্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিমূলক বলিয়াই সংশ্লেষণাত্মক (synthetic)। সাধারণভাবে বলা যায়—সাহিত্যের পথ ভাবনা-কল্পনার পথ, রস-অনুভূতির সেখানে প্রাধান্য। কিন্তু বিজ্ঞানের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধির সেখানে প্রাধান্য। এই জন্যই বলা হয় Science means 'to know', art means 'to do'। অবশ্য এই সংজ্ঞা খুব স্থূল।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ

কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার—উভয়ই যেই সত্যের দুই মুখ দেখিতেছি সেই সত্য বিভিন্ন নয়, এক। আর এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিরও পশ্চাতে থাকে দর্শক হিসাবে একই মানব-চেতনা। কখনো সে সত্যকে চায় নির্বিকল্প জ্ঞানের দৃষ্টিতে, কখনো সে সত্যকে গ্রহণ করে কল্পনা দৃষ্টিতে, কিন্তু উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই চেতনার পূর্ণতা। যে রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেই পূর্বাপর উন্মুখ, তিনিও 'বিশ্ব পরিচয়' এবং বহু বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের লেখক। এমন বৈজ্ঞানিকের তো অভাব নাই যিনি সাহিত্য, সঙ্গীতে মাতিয়া উঠেন। আমাদেরই চোখের সম্মুখে আমরা জানিলাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জীবনের শেষ দিনগুলি শেক্‌স্‌পীয়র পাঠে ভরিয়া তুলিলেন। সত্য বটে, এমন মানুষও যথেষ্টই আছে যাঁহারা একদর্শী চর্চায় অন্য দিকটি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া যান। কিন্তু মোটের উপর মানুষ অল্পাধিক বুদ্ধি-পথ ও কল্পনা-পথ দুই পথেই কতকাংশে চলিতে পারে, চলিতে চাহেও।

মানব চেতনার অখণ্ডতা

এবং সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষেরই যেমন সত্যের জন্য স্পৃহা আছে, তেমনি তাহাদের প্রাণে রসবোধও আছে। কিন্তু মনের এই উভয় ক্ষেত্রই আবার শিক্ষা এবং পরিবেশের অভাবে "পতিত" থাকিয়া যাইতে পারে। অথচ, মানুষের জীবনে এই দুই প্রকার দানেরই প্রয়োজন আছে; শুধু একটি দিকে যিনি আবদ্ধ তিনি জীবনের অর্ধাংশ হইতে বঞ্চিত। এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁহারা শেলির মতই অতিরিক্ত ভাবমার্গের সাধক—কল্পনার শূন্য আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে যাঁহারা এই গন্ধময় কঠিন পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত ডানা ভাঙিয়া পড়েন। কিন্তু শেলি দুইজন হয় না—শেলির ট্র্যাজিডি যতবারই অভিনীত হউক পৃথিবীতে। তেমনি এমন বৈজ্ঞানিকও আছেন যাঁহারা বিজ্ঞানের শুষ্ক চর্চাই জীবনের সার করিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধময় এই জগতে মানুষের মহাপ্রাণ, ভাব-অনুভূতিও একটা অপূর্ব সত্য। সেই সৃষ্টিময় সত্য সাধনাকে অস্বীকার করিয়া তিনি শুধু আপনার জীবনকেই খণ্ডিত করিয়া রাখেন নাই, আপনার সাধনারও তিনি সত্যকার স্বরূপটি বিকৃত করিয়াছেন, বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার গণ্ডীতে আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। আসলে তিনি বিজ্ঞানের সাধনায়ও পতিত।

পরস্পরের যোগাযোগ

কল্পনার অবকাশ

মানুষ যতই পরিহাস করুক বা কপালে করাঘাত করুক, ইহাতে সন্দেহ নাই, ইন্দ্রধনুর রং বা ফুলের রূপ বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান কাব্যের মোটেই জাত মারে নাই; বরং বিশ্বলোকের জানা ও অজানা বিস্ময়কে আরও অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে—সাহিত্যিকের কল্পনাকে আরও গভীর, আরও ব্যাপক, আরও তীব্র হইবার অবকাশ দিয়াছে। সাহিত্যের পক্ষে বিজ্ঞান এক পরমাশ্চর্য জগৎ; সৃষ্টির উৎস তাহা ছাড়া, বিজ্ঞানের পদ্ধতিও মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। বিজ্ঞান তথ্য সন্ধান করে, তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্য বিভাগ করে। তারপর সমস্ত তথ্যের মধ্যে নিয়মসূত্র পরিকল্পনা (hypothesis) করে। অর্থাৎ জানা হইতে অজানার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বিশ্লেষণ হইতে একবারের মত আগাইয়া যায় সৃষ্টির দিকে। অবশ্য, সেই পরিকল্পিত নিয়মকে আবার তথ্যের পরীক্ষায় (experiment) যাচাই করে। প্রয়োজন মত আবার নিয়মকে সংশোধন করে, ক্রমাগত নব নব তথ্যের ও তত্ত্বের আলোকে বিজ্ঞান আপনার জ্ঞানকে ভাঙিয়া গড়িয়া পূর্ণতর করিয়া তোলে। এই যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি (scientific attitude) ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific method) ইহার প্রচলন আজ শুধু প্রকৃতি-জ্ঞানেই আবদ্ধ নাই। এই পথেই আজ

বিজ্ঞানের বিচারকুশলতা

আমরা সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের মন ও মানসিক সৃষ্টিকেও আপনাদের অধীতব্য বিষয় করিয়া তুলিয়াছি। উহাদের স্বরূপ নির্ণয়েও এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই তাই মানুষের প্রধান পথ। আমরা জানিয়াছি বস্তু নিতান্ত জড় পদার্থ নয়। মন নিতান্ত অপার্থিব সম্পদ [illegible] জানিয়াছি জীবন বস্তু ও মনের প্রতি মুহূর্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সতত গতিশীল, নবায়মান।

জগৎ ও জীবনের এই বাস্তবলীলা বুঝিবার পরে আজ আমাদের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে তাই আসিতেছে বিজ্ঞানের চেতনা; আর আমাদের সাহিত্য-বিচারে আমরা গ্রহণ করিতেছি বিজ্ঞানের সেই বিচার পদ্ধতি—রসকে কল্পনাকে স্বীকার করিয়া জ্ঞানদৃষ্টি পূর্ণ হইতে চলিতেছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দুই দৃষ্টির সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টিশক্তি সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিলন

।। গণতন্ত্র না একনায়কত্ব ? ।।

এ প্রশ্ন যে আমাদের মনে উঠে তাহা আমরা জানি। রাজনৈতিক দল-উপদলের ব্যর্থতায়, প্রতারণায় হতাশ ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে আমরাও ভারতবর্ষে সময়ে-অসময়ে আজ বলিয়া বসি যে, চাই 'একজন ডিক্‌টেটর —যিনি লৌহ-কঠিন দৃঢ়হস্তে আমাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই হতভাগ্য জাতিকে আপনার বহু শতাব্দীর সঞ্চিত গ্লানি ও ক্লেদভার ঝাড়িয়া ফেলিতে শিখাইবেন।' ইহার কারণ, গণতন্ত্রের যে সাধারণ-পরিচয় আমরা ইংরেজ, মার্কিন বা ফরাসী প্রভৃতি আধুনিক গণতন্ত্র-গুরুদের নিকট লাভ করিয়াছি তাহাতে মোটেই আমরা স্থির দ্রুতগতিতে আত্মগঠনের শিক্ষা পাই নাই। অধিকন্তু তাহাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিতে যে শিক্ষালাভ করিতেছি তাহাতে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের ভক্তি বাড়িবার কোনও কারণ নাই। অন্যদিকে ইহাই আমরা বুঝিয়াছি কোনো জাতিকে উঠিতে হইলে, বিশেষত কোনো পশ্চাৎপদ জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে, হিটলার মুসোলিনীর মত কোনো শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কের হাতেই আপন ভাগ্য সঁপিয়া দিতে হয়—না হইলে তাহার অভ্যুদয় কিছুতেই দ্রুত বা অব্যাহত হয় না। এইরূপ সময়ে আমরা অবশ্য ভুলিয়া যাই ফ্যাসিজমের অনিবার্য নিয়মেই হিটলার-মুসোলিনী আপন-আপন জাতিকে ধ্বংসের

আধুনিক সংশয়

কোনো গভীরতম গহ্বরেও টানিয়া নামাইয়াছিলেন। তেমনি আমরা আবার ভুলিয়া যাই পৃথিবীতে গণতন্ত্রের মুখপাত্র আজ আর ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী প্রভৃতি "সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রীরা" নয়। গণতন্ত্রেরও নূতন বিকাশ ঘটিতেছে সোভিয়েতে [illegible] পূর্ব ইউরোপে, আর বিরাট সুপ্রাচীন দেশ মহাচীনে। তাহাদের অপেক্ষা স্থির দ্রুত দুর্বার গতিতে আত্মগঠনের পদ্ধতি কোন 'ফ্যুরহার' বা কোন্ 'ডচে' কবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে ?

আসল কথা এই যে, গণতন্ত্রের ও একনায়কত্বের স্বরূপ আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝি না। তাই একই কালে আমরা গণতন্ত্রের নামে শপথ করি, আবার কোনো একজন হিটলার মুসোলিনীর মত একনায়কের জন্যও পথ চাহিয়া থাকি। এমনকি, এই দুই নীতির ভেদাভেদও তলাইয়া বুঝিতে চাহিনা। মামুলিভাবে তাহা মানিয়া লই।

গণতন্ত্রের মূল তত্ত্ব কি, তাহা সর্বাগ্রে স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই দেখিব সমাজ-বিকাশের নিয়মে গণতন্ত্রও ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়াছে। দেশ-কাল অনুযায়ী গণতন্ত্রেরও রূপভেদ ঘটিয়াছে। গ্রীস বা রোমের গণতন্ত্র আর ব্রিটিশ বা মার্কিন গণতন্ত্র একরূপ নয়। গ্রীসে রোমে ছিল স্বাধীন পৌরবর্গের গণতন্ত্র। আর ধনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র হইল ব্রিটিশ ও মার্কিন গণতন্ত্র।

কিন্তু ব্রিটিশ ও মার্কিন গণতন্ত্র দুই-ই এক জাতীয় হইলেও তাহাদেরও প্রকারভেদ আছে। এই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সহিত আবার 'সোভিয়েত গণতন্ত্রের' বা পূর্ব ইউরোপের বা চীনের লোকায়ত্ত গণতন্ত্রের পার্থক্য মৌলিক। সোভিয়েতে শ্রমিক কৃষকের গণতন্ত্র আর চীনে জনতার গণতন্ত্র। কিন্তু এই নানাজাতীয় গণতন্ত্রের মূল কী ? গণতন্ত্রের অর্থ লোকায়ত্ত সরকার, লোকস্বার্থে শাসন পরিচালনা। লোকায়ত্ত সরকার যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিচালিত সরকার (Representative Government) হয়, সাধারণের নিকট দায়ী সরকার (Responsible Government) হয়, ইহা সাধারণ কথা। কিন্তু গণতন্ত্রের আসল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট লিন্‌কন। যথা,—'Government of the people, by the people, for the people" । জনশক্তিতে বিশ্বাস, ইহাই গণতন্ত্রের মূলতত্ত্ব, এটা তাহার প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সম্বন্ধে চেতনা যতই পরিস্ফুট হইতেছে ততই গণতন্ত্রের আকৃতিও পরিব[illegible] হইতেছে। সেই আকৃতির শেষ সোভিয়েত ডেমোক্রেসিতে। নিম্ন হইতে নির্বাচন-ধারায় উহার শক্তি-কেন্দ্র গঠিত হয়, সেই কেন্দ্রীয় শক্তিই সর্বময় আধিপত্য। (democratic centralism)।

গণতন্ত্রের স্বরূপ

কিন্তু একনায়কত্বেরই বা প্রকৃতি কি ? ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখিব, একনায়কত্ব আসলে একেবারে অপরিবর্তিত নয়। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি

(Patriarch) ও উপজাতির নায়ক (Chief) ও স্বেচ্ছাতন্ত্রী সম্রাট কিংবা কন্‌সাল বা সীজার—ইহারা সকলে একজাতীয় একনায়কতন্ত্রী নয়। ক্রমোয়েলের মত ডিক্‌টেটার ও নেপোলিয়নের মত ডিক্‌টেটারেরও তফাৎ আছে—যদিও তাঁহারা উভয়েই গণতন্ত্র-প্রতি[illegible] অবধ সেই রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিতও হিটলার-মুসোলিনী ফ্রাঙ্কো-মুগল আইয়ুব খাঁ, চিয়াংকাইশেকদেরও পার্থক্য মৌলিক। কারণ হিটলার মুসোলিনী গণতন্ত্র উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা লইয়াই রাষ্ট্রের সার্বিক অধিকার কবলস্থ করিয়াছিল। এই নানা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রীদের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিব তাহারা কেহবা ক্রমোয়েল-হিট্‌লারের মত নির্বাচিত প্রতিনিধি, কেহবা তাহা নয়। কিন্তু একনায়কত্ববাদের মূল তত্ত্বটি এই যে, জনগণের প্রতি একনায়কত্ববাদীদের কোনো বিশ্বাস নাই। তাই তাহারা রাষ্ট্রশাসনে জনগণের নিকট নিজেদের দায়ী বলিয়াই স্বীকার করেনা। এক-নায়ক কখনো দায়ী দেবতার নিকট, কখনো ধর্মের নিকট, কখনো বা হিটলারের মতো, মুসোলিনীর মতো নিজের নিকট। কিন্তু কার্যত সবাই দায়ী থাকে নিজ শ্রেণীর নিকট। কেহ পুরোহিত-তন্ত্রের নিকট, কেহ সামন্ততন্ত্রের নিকট, কেহ ধনিক শ্রেণীর নিকট। অতএব, রাষ্ট্রে যখন যে শ্রেণী ক্ষমতা বিস্তার করে একনায়কত্ব আসলে তখন সেই শ্রেণীরই মুখপাত্ররূপে তাহাদেরই স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করিবে।

তাই গণতন্ত্রও আসলে শাসক-শ্রেণীরই ঐরূপ একটা কৌশল। সত্য কথা যখন যে শ্রেণী শাসক তখনকার 'গণতন্ত্র' সেই শ্রেণীরই স্বার্থ-সাধনে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করে। গ্রীসের গণতন্ত্র তাহার 'স্বাধীন পৌরবর্গের' একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিত। ব্রিটিশ-মার্কিন গণতন্ত্রেও কার্যত ব্রিটিশ বা মার্কিন 'ধনিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব' (dictatorship of the capitalist class) ছাড়া আর কিছু নয়। আর সোভিয়েত গণতন্ত্র 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (dictatorship of the proletariat) বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পূর্বাপর গর্বিত। যাহারা রাষ্ট্রের জন্ম-ইতিহাস অবগত আছেন এবং প্রকৃত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন রাষ্ট্র শাসনের একটা যন্ত্রমাত্র। তাই গণতন্ত্রই বলি বা [illegible]ায়কত্বই বলি, উভয়ই এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার এক-একটা কৌশল মাত্র। শাসকশ্রেণী আপনার স্বার্থের তাগিদে যখন যেই কৌশল কার্যকর হয়, তাহা গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের স্বরূপ

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—গণতন্ত্রে ও একনায়কতন্ত্রে তবে প্রভেদ কি কিছুই নাই? ইহার মূল উত্তর আমরা জানি। প্রভেদ আছে। গণতন্ত্র জনশক্তিতে বিশ্বাসী, লোকায়ত্ত শাসনে তাহা রূপায়িত হইতে চায়।

একনায়কত্ব জনশক্তিতে আস্থাহীন, গুরুবাদের অনুরূপ কর্তৃত্ববাদে (Fuehrer Prinzep) তাহার বিশ্বাস—এই নীতি অনুসারে ফ্যুহ্রার বা সর্বনায়কই রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থাপনার ও সকল ক্ষমতার আকর। ক্ষমতা উচ্চ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হয়। ইহাই [illegible]তত্ত্ব। উহা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বা democratic centralism এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র যেন 'ঊর্ধ্ব মূল অবাকৃশাখ' পাদপ। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিকড় থাকে জন-জীবনে, তাহার সমস্ত শক্তির মূল উৎস জনতা, আর নির্বাচিত নায়কমণ্ডলী তাহাদের প্রদত্ত শক্তিতেই শক্তিশালী।

এই দুই ভিন্ন ধরনের নীতি ও ভিন্ন ধারার সংগঠনের জন্যই গণতন্ত্রের দোষগুণ ও একনায়কত্বের দোষগুণ ভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণত গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র বলিতে সেই সুপরিচিত যুক্তিতর্কের কথাই আমাদের মনে পড়ে।

গণতন্ত্রের গলদ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র একটি সুপরিচিত পরিহাস আছে: "যাহারা একটি মানুষকে শাসক রূপে গড়িয়া তুলিতে পারে না, তাহারাই কিনা চায় সকল মানুষকে সুশাসক করিয়া তুলিতে।" কথাটি একেবারে মিথ্যা নয়। রাষ্ট্র-শাসন একটা জটিল কর্ম; শিক্ষা, বুদ্ধি ও চরিত্রবল সবই ইহাতে প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষের এই যোগ্যতা নাই, অতটা ভাবিবার ইচ্ছাও তাহাদের নাই। সাধারণত তাহারা নানা রাজনৈতিক প্রচার ও অপপ্রচারের বশবর্তী হইয়া চলে। ইহার উপর আবার ধনী ও প্রতিপত্তিশালী দল ও নেতারা নানারূপ জাল ফেলিয়া সর্বদাই দলবৃদ্ধি করিতে চাহে। কাজেই গণতন্ত্রে সত্যকারের যোগ্য লোকের সমাদর প্রায় হয় না। উহাতে যত মূর্খ, অকর্মণ্য, বিবেক-বুদ্ধিহীন, অপকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ দল করিয়া রাষ্ট্র-শাসন আয়ত্ত করিয়া বসে। ইহাতে কাহার মঙ্গল সাধিত হইবে? দ্বিতীয়তঃ, এই ক্যাবিনেটে-পার্লামেণ্টে বসিয়া আসর জমাইয়া যাহারা তর্ক-বিতর্ক করে, তাহারা নিজেরা কর্মতৎপর রাজপুরুষ হইতে পারে না। বরং তাহাদের দলপুষ্টি, আত্মীয় পোষণ, সমর্থকদের তোষণের জ্বালায় শাসন-বিভাগে দুর্বলতা, শিথিলতা, অলসতা, বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হইয়া উঠে। এই জন্যই দেখা যায়—গণতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রায়ই কোনো সিদ্ধান্ত যথাসময়ে গ্রহণ করিতে পারে না; অযথা কালক্ষয় করিয়া রাষ্ট্রশক্তির অপচয় করে। যুদ্ধ বা কোনো একটা গভীর সংকটের মুখে পড়িলে তাই গণতন্ত্র আর জাতিকে বাঁচাইবার পথ পায়না। তখন গণতন্ত্র আপনাকে গুটাইয়া লয়, ক্ষমতা মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনায়কের হাতেই কেন্দ্রিত করে এবং প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়াই তখন গণতন্ত্রী-রাষ্ট্র আত্মরক্ষা করে। দুইটি মহাযুদ্ধে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। আসলে এই সব কারণেই কোনো দেশে গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের গলদ

স্থায়ী হয় নাই। গ্রীসে ও রোমে গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের ও একাধিপত্যের নিকট উহা আত্মসমর্পণ করে। ক্রমোয়েল নেপোলিয়নদের কথা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন, এই বিংশ শতকে কাইজার হাপসবুর্গ ও তুর্ক সম্রাটদের বিতাড়িত করিবার পরও গণতন্ত্র ইউরোপে স্থায়ী আসন গড়িতে পারিল না। দেখিতে না দেখিতে আবার একনায়কত্বই ফিরিয়া গেল। মধ্যপ্রাচ্য পাকিস্তানের কথা নাইবা তুলিলাম।

এই সব যুক্তি যেমন সত্য, তেমনি মিথ্যাও। কারণ, ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখিব—মোটের উপর শত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই আপেক্ষিক উৎকর্ষের আমরা প্রমাণ পাই। দিনের পর দিন সভ্যজগতে আমরা গণতান্ত্রিক নীতিরই ক্রম-প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারি। একনায়কত্বই বরং সাময়িক একটা ব্যতিক্রমরূপে বারবার ফুটিয়া উঠে; আপনার বিষবাষ্প বাতাসে ছড়াইয়া দুই দিনের মধ্যেই আবার সরিয়া পড়ে। একনায়কত্বের অতি-প্রচারিত কর্মক্ষমতা, বিচারশক্তি, সংগঠনশক্তি—শৃঙ্খলা, সাধনা, চরিত্রবল,—সবকিছুরই তো চরম পরিচয় আমরা দেখিয়াছি হিটলার মুসোলিনীর শাসনে। কিন্তু কোথায় গেল সেই হিটলার মুসোলিনি? পৃথিবীর ইতিহাসে এমন করিয়া কেহ আজ নিজ দেশ, নিজ জাতিকে কি ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে? না, মানুষের ইতিহাসে সে দানবীয় দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাই আর কেহ এমন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? এই কথা স্বতঃসিদ্ধ, একজন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া বসিলে সেই দেশের দুর্ভাগ্য অবশ্যম্ভাবী। কারণ, মানুষ মাত্রেরই আর কিছু না হউক ভুল ঘটিবে। আর একনায়কত্বের শাসনে সেই ভুল সংশোধনেরও উপায় নাই। তাহা ছাড়া কে অস্বীকার করিবে লর্ড এ্যাকটনের এই মন্তব্য? "Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely."

একনায়কত্বের ত্রুটি

বরং গণতন্ত্র কোনোদিনও এই গর্ব করে না যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই ইতিহাসের এক perfect বা মোক্ষম্ বিকাশ। গণতন্ত্রের দাবি মাত্র এইটুকু যে, ভালমন্দ সমস্ত সুদ্ধ মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় জনশক্তিকে চিরদিন প্রতারণা করা যায় না—'One can deceive some people for all time and all people for some time. But one cannot deceive all people for all time'। একনায়কতন্ত্রের মতো গণতন্ত্র তত তৎপরতা ও তত চমকপ্রদ অগ্রগতির প্রমাণ দিতে পারে না তাহা ঠিক। কিন্তু একনায়কত্বের মতো গণতন্ত্র তত ক্ষতি, তত অনিষ্ট, তত জাতীয় দুর্ভাগ্যের কারণও হয়না। বরং ধীরে ধীরে,—অতি ধীরে—অনেক ছোট বড় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া গণতন্ত্র আপনার প্রণালীতে জনগণের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-

চেতনাকে ক্রমশঃই [illegible] তোলে, প্রতি মানুষকে আপনার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করে [illegible] সৃষ্টিশক্তিতেও মানুষকে করিয়া তোলে আস্থাবান। জনশক্তি[illegible]স যেমন গণতন্ত্রের মূল কথা, মানবাত্মার উদ্বোধনও তেমনি গণতন্ত্রের প্রধা[illegible]। এইরূপে গণতান্ত্রিক রীতি মানুষের মনুষ্যত্বের পথ খুলিয়া দেয়।

সত্য বটে, ধনিকের গণতন্ত্র আসলে একটা প্রতারণা। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে শতকরা পঁচানব্বুই জনকে তাহা কার্যত ব্যক্তির সমস্ত মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। তথাপি সেই শতকরা পাঁচজনের গণতান্ত্রিক শাসনও আপনারই নিয়মে বাকী পঁচানব্বুই জনের আত্মপ্রকাশের ও আত্মাধিকারের প্রয়াসকে একটু একটু করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। তাইতো তখন গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া শাসকগোষ্ঠী ফ্যাশিস্ত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পঁচানব্বুইজনের মুক্তি-প্রয়াসকে টুটি চাপিয়া বন্ধ করিবার তাহা ছাড়া আর উপাই নাই।

এই সহজ সত্যটা বুঝিয়া লইলে আমাদের আর মূল প্রশ্নটির উত্তর দিতে দ্বিধা থাকে না—'গণতন্ত্র, না একনায়কতন্ত্র?'—নিশ্চয়ই গণতন্ত্র।

কিন্তু শুধু তাহাও নয়। আমরা তো দেখিয়াছি গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র উভয়েরই কতকগুলি গুণ আছে। এমন গণতন্ত্র গঠন সম্ভব নয় কি যাহাতে এই দুই তন্ত্রের গুণগ্রামের সমন্বয় ঘটে? এইরূপ নেতৃত্বে 'রাষ্ট্র লোকায়ত্ত হইবে, লোক-স্বার্থে পরিচালিত হইবে, লোকমতের নিকট দায়ী থাকিবে। অথচ তাহার কর্মোদ্যোগ ও কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহার নির্দেশ হইবে অপর লোকসাধারণের সর্বমান্য। এইরূপ 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্বেরই' নাম 'জনতার গণতন্ত্র'। এইরূপ গণতন্ত্রেরই নিদর্শন বলা হয় সোভিয়েত গণতন্ত্র—যাহার অন্য নাম 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব'। গণতন্ত্র না একনায়কত্ব—এই প্রশ্নের উত্তর তাই স্পষ্ট—লোকায়ত্ত গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

[মন্তব্য: রচনাটি রাজনীতি-বিষয়ক, তাই সাবধানে তা লেখা প্রয়োজন। এখানে আমরা ইচ্ছা করেই কয়েকটি মৌলিক রাজনৈতিক কথাব অবতারণা করেছি—গণতন্ত্রের স্বরূপ, রাষ্ট্রের স্বরূপ প্রভৃতি। শুধু 'গণতন্ত্র না একতন্ত্র—' বিষয়ে বিতর্ক বা রচনায় তা অনাবশ্যক। কিন্তু এসব বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার থাকলে বক্তার বা লেখকের ভ্রান্তির কারণ থাকে না। রাজনৈতিক অন্য বিষয় আলোচনাও সহজসাধ্য।]

॥ সমাজ-সেবা ॥

মানুষ যে সামাজিক জীব, এই সত্য আজ আর মানুষকে বলিতে হয় না। সকলেই আজ মানে কোনো সময়েই কোনো একটি স্বর্গোদ্যানে 'আদম' ও তাহার পঞ্জরাস্থি নির্মিতা 'হবা' আবির্ভূত হয় নাই। ভবিষ্যতেও কোনো দিন আবার অতি-আধ্যাত্মিক মানব সন্তানেরা রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত স্ব স্ব একান্ত জীবনযাত্রাও গ্রাহ্য করিয়া লইবে না। সম্ভবত আমরা যে প্রাগুনর পূর্ব-পুরুষের বংশধর, যাঁহারা শেক্‌স্‌পীয়ার ও আইনস্টাইনের স্বজাতি, তাঁহারাও দল বাধিয়া জীবন যাপন করিতেই অভ্যস্ত ছিলাম। আর, সম্ভবত এই অতি আত্মঘাত-প্রিয় বর্তমান সভ্যতার মানুষ আমরা, আমাদের সন্তান-সন্ততিও সুমেরু কুমেরু, বা পৃথিবী হইতে শুক্রগ্রহ যেখানেই অবাধ গতায়াত করুক, তাহারা মোটেই একা থাকিতে পারিবে না। সমাজ পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে—না হইলে মানুষই মানুষ হইত না।

সূচনা: সামাজিক জীব

দার্শনিক রুশো কিংবা মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড যাহাই বলুন, মোটের উপর মানুষের সামাজিক বোধও বড়ই সুদৃঢ়। উহাও একটা মৌলিক চেতনা। অবশ্য তাহা স্বত্বেও আবার প্রত্যেক মানুষেরই আত্মরক্ষার বাসনা, ব্যক্তিগত কামনা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখবোধ কম প্রবল নয়। নিজ নিজ পরিবারের প্রয়োজনে নিজের সুখ সুবিধাও আমরা কতকটা বিসর্জন করিতে পারি, কিন্তু সমাজের প্রয়োজনে এখনো ততটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারি না। আবার যদিবা দেশের স্বার্থে কতকটা আত্মদান করিতে রাজি হই, সমস্ত মানব-সমাজের বৃহৎ স্বার্থে আমরা

সামাজিক বৈষম্য ও সমাজ সেবা

[মন্তব্য: এ রচনা লিখতে বসে সকলেই বলবে মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ-সেবা তাই মানুষের একটা বড় প্রয়োজন। পূর্বকালে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করত অনেকাংশে ধর্ম। এখনো আমাদের 'সেবাধর্মের' আদর্শ সুপ্রচলিত আছে। আর, তা পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক জনসেবা বা 'সোশ্যাল সার্ভিসে'র মত সুসংগঠিত না হলেও আদর্শ হিসাবে তার চেয়ে উচ্চতর।—এসব কথায় মিথ্যা নয়। কিন্তু মূলের কথাটাও মিথ্যা নয়। তাই মূলের কথাটা মনে করা দরকার—সমাজে এ জাতীয় সেবাধর্মের প্রয়োজন হয় কেন? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের সেবার প্রয়োজন; কিন্তু তা আসলে সমাজসেবা নয়, জন-সেবা। সমাজ-সেবার সামাজিক কারণ মূলতঃ গুপ্ত বা পরিচিত দুর্ব্যবস্থা। সমাজ সেবার বা সোশ্যাল সার্ভিসের তলাকার এই গুপ্ত কারণটি দেখিয়ে দিয়ে বুঝানো দরকার—আসল সমাজ-সেবা ও জনসেবার মূলকথা সামাজিক চেতনা; তার উদ্দেশ্য হবে সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস। খুব গোঁড়ামি না করে ও তিক্ততার সৃষ্টি না করেও এ কথাটি কি রচনায় বুঝিয়ে বলা যায় না?]

কতটুকু উদ্বুদ্ধ হই[illegible]জিক চেতনা এখনো যথেষ্ট বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। মানু[illegible]র্থবোধ, পারিবারিক স্বার্থবোধ বা জাতীয় স্বার্থবোধ নানা ছলে [illegible] সেই সামাজিক আত্মীয়তাবোধকে গুলাইয়া দেয়। তাহার কারণ, [illegible] আসল বনিয়াদ এই ব্যক্তি-স্বার্থের উপরই প্রোথিত রহিয়াছে। এখনো সামাজিক সেবা নয়, বরং স্বার্থের যোগিতায় প্রত্যেকের আপন আপন স্বার্থ-সন্ধানই সমাজ-জীবনের প্রধান লক্ষণ—এমন কি, প্রধান আদর্শ বলিয়াও কথিত হয়। বর্তমান সমাজের পণ্য-সৃষ্টি সামাজিক সেবার (service) উদ্দেশ্যে হয় না, হয় ব্যক্তি-গত মুনাফার (profit) তাগিদে। আজ যাহাকে আমরা 'সমাজ-সেবা', 'জনসেবা' 'লোকহিত' বলি তাহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই মূল ত্রুটিকে সংশোধনেরই একটা প্রয়াস। কারণ, ব্যক্তিস্বার্থমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা যতক্ষণ প্রচলিত রহিয়াছে ততক্ষণ সমাজে সেবামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই। অথচ এই ব্যক্তি স্বার্থের ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যখানে জমিয়া উঠিতেছে মুনাফা-ভোগী মুষ্টিমেয় শাসকমানুষের সঙ্গে মুনাফা-সৃষ্টিকারী বহুতর শ্রমজীবী-মানুষের দুস্তর বৈষম্য ও বিরোধ। আমাদের সমাজ-সেবা (social service) বা 'জনসেবা' বা 'লোকহিত' মূলগত সামাজিক বৈষম্য সংশোধনের প্রয়াস। এই সব প্রযাস সে বৈষম্যকে কোনোরূপে সহনীয় করিবার আয়োজন, মূলোৎপাটনের চেষ্টা নয়। যদি সমাজে হ্যাভস্ ও হ্যাভ্ নট্সের পার্থক্য এত ভয়ঙ্কর না হইত, আর সে সম্বন্ধে দুই শ্রেণীরই মনে এত তীব্র চেতনা না জাগিত, তাহা হইলে সমাজ-সেবার প্রয়োজনও এত অধিক হইত না।

সমাজ-সেবা ও ধর্মের-আদর্শ

সমাজ-সেবার আদর্শ ও প্রয়োগ প্রাচীন। কারণ, সমাজ-বৈষম্য ও সমাজে দৈন্য-উৎপীড়নও বহু প্রাচীন। কবে একদিন আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সম-জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, সুখদুঃখের সমভাগী হইত, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সভ্য মানুষের সমাজে শাসক ও শাসিত, উচ্চবর্গের মানুষ ও নিম্ন বর্গের মানুষ, এইরূপ পার্থক্য বহুদিন পূর্বেই ঘটিয়াছে। সেই প্রভু-দাসের যুগেও তাই মানুষের এই সেবা-বোধ একেবারে না জাগিয়াছে তাহা নয়। দাসদাসী ছিল মূল্যবান সম্পদ, তাই সাবধানে তাহাদের প্রতিপালনও করা প্রয়োজন। দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহা[illegible]কত নির্দেশই সেদিনের শাস্ত্রে আছে, আইনেও কিছু মিলিবে। হামুরাবাই বা অশোকের অনুশাসনের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা উচ্চতর সমাজবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া-ছিলেন। সেদিনের সমাজ-ধর্মই সেদিনের সামাজিক চেতনার প্রমাণ। সেই প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যেই মানুষের প্রতি দয়া-মায়া-মমতার, এমন কি ভ্রাতৃত্ব-প্রকাশের জন্য, কিছু-না-কিছু নির্দেশও রহিয়াছে। অবশ্য সেই নিষ্ঠুর

ভয়ঙ্কর দিনে ধর্ম সমাজ-বৈষম্যকে বিদূরিত ক[illegible] ও [illegible]রে নাই। এবং হিন্দু ধর্মের মতো অধিকাংশ ধর্মই নিপীড়িত [illegible]নদের [illegible]পন ঐহিক দুর্ভাগ্য মানিয়া লইয়া, পুণ্য বলে পারলৌকিক [illegible]াপসবুর্গ [illegible]াভের জন্য উপদেশ দিয়াছে। তথাপি ভুলিলে চলি[illegible]ষের সামাজিক চেতনা এই ধর্মের সহায়তায় দুর্ভাগা [illegible]ত নিপীড়িত মানুষের দুর্দশা লাঘব করিতেও যতটুকু সম্ভব তাহা চাহিয়াছে। অশোকের অনুশাসন এইদিকে হামুরাবাই'র আইনের মতো, একজন বিরাট সম্রাটের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ও শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত উচ্চতর সামাজিক (social) ও নৈতিক (moral) বোধের যে উহা প্রমাণ, তাহাতেও বিন্দু-মাত্র সন্দেহ সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ ভগবদাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল না, ছিল নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, সামাজিক চেতনা দ্বারাও কতকাংশে প্রভাবিত। তাই, আশোকের 'ধর্মবিজয়ের' মত মহত্তর সমাজ-সেবার আদর্শ আমরা প্রাচীন জগতে বিশেষ পাইনা। তথাপি ইহা আমরা জানি, কি হিন্দু ধর্মে কি খ্রীষ্টধর্মে, প্রত্যেক ধর্মেই সমাজ-সেবার মহৎ আদর্শ নানাভাবে লোক সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। দান, শুশ্রূষা, দয়ামায়া প্রভৃতি সামাজিক ধর্মের মাহাত্ম্য যে কতভাবে, কতরূপে প্রত্যেক শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে তাহার শেষ নাই। আজও বহু বহু ধর্ম-সংঘ, খ্রীষ্টান মিশনারি, ইসলাম প্রচারক ও হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সেই সেবাধর্মের ব্রত নানা দেশে নানাভাবে উদ্‌যাপন করিতেছেন। শুধু ধর্ম নয়, সমাজ-সেবারও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের তাঁহারা বাহক। পুণ্যলোভী বহু সাধারণ নর-নারী ও আজও ঐতিহ্য-অনুযায়ী সেই সমাজ-সেবার ব্রত সশ্রদ্ধচিত্তে পালন করিতেছে।

ধর্মের এই সব অনুশাসন ছিল বলিয়া সেদিনের মানুষ কতকটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু মানুষ যখন আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনে আধুনিক যুগে সমুত্তীর্ণ হয় তখন মানুষের ধর্মবোধও মধ্যযুগের অনেক ভালো-মন্দ সংস্কার ছাড়াইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালে মানুষের মানবতাবোধ (হিউম্যানিজম্) অনেকটা পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত হয়—মানব-হিত একটা বিশিষ্ট আদর্শ হয়। এখন সমাজ-সেবা আর পুণ্য লোভে বা ধর্ম[illegible]ত কারণে গ্রহণ না করিয়া মানুষ তাহা গ্রহণ করে মানবীয় মমতার বশে, মানব-প্রেমে, মানব-দুঃখ লাঘব করিবার [illegible]য় এবং সমাজবৈষম্যের বিষময় ফল হইতে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য, কতকটা শুভবুদ্ধি ও কতকটা শ্রেণীগত স্বার্থ-বুদ্ধির বশে। আধুনিক যুগে আর্থিক ও সামাজিক নানা কারণে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বাস্তব সাংগঠনিক শক্তিও অসাধারণরূপে স্ফূর্তিলাভ করে। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়ে সমাজসেবাও নানা আয়োজনে প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়। পাশ্চাত্য জাতিদের সমাজসেবায় একটা কৃপা বিতরণের মনোভাব দেখা দেয় বটে, কিন্তু

তাহাদের সমাজ-দের অক্লান্ত কর্মশক্তির সুস্থ মানবতার ও সংগঠনশক্তিরও প য়ে। তাই দেখি তাঁহারা দিনের পর দিন কর্মনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা লইয়া কার্ণেগী-ইন্‌ষ্টিটিউট, রেডক্রুশ সোসাইটি বা নানা হাসপাতাল সেবাসদন, প্রভৃ চালনা করেন। কিংবা শ্রমিক বস্তিতে অনগ্রসর জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নানা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান অক্লান্ত নিষ্ঠায় চালাইয়া যান। এইসবের সহিত আমাদের সাধারণ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের তুলনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের কাজকর্মে কত শিথিলতা, কত বিশৃঙ্খলা, কত অক্ষমতা প্রশ্রয় লাভ করে। অথচ সত্যই হয়ত আমরা সমাজ-সেবার কাজ এখনো 'ধর্ম' হিসাবে গ্রহণ করি। অনেকে হয়ত সত্যই মনে করি "নর-নারায়ণের" সেবার মধ্য দিয়াই আমি ধন্য হইলাম। অন্ততঃ, মনে করি 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবা আমারও একটা আধ্যাত্মিক বিকাশের সোপান। ইউরোপীয় মিশনারি বা ধর্মশীল সমাজ-হিতৈষীরাও এইরূপ ধর্ম-কর্ম হিসাবে সমাজ-সেবা এখনো করেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য নিয়মনিষ্ঠা ও কর্মনিপুণতারও অধিকারী। তাই তাঁহাদের সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান অনেক সুসংগঠিত ও অনেক সুসম্পূর্ণ। আমাদের প্রয়াসে যত আন্তরিকতা থাকুক, লোকহিতের দিক হইতে, সমাজের দিক হইতে কার্যতঃ সেই আন্তরিকতার মূল্য কি? তাহাতে সেবাকারী ব্যক্তি-বিশেষের তৃপ্তি থাকিতে পারে—তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছেন; কিন্তু বন্যা বা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দুর্গত নর-নারীর, চিকিৎসা-প্রার্থী পীড়িত রোগীর, বস্তির নরকবাসী হরিজনের প্রথম প্রয়োজন তাহাদের অভাব মোচন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন তাহাদের মানব-শক্তি ও মানব-চেতনা যাহাতে প্রবুদ্ধ হয় এমন আচরণ-লাভ।

মানবতার আদর্শ

কাজেই সমাজ-সেবার পরিচিত মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলেও বলিতে হইবে যে, শুধু ধর্মবোধ বা মানবপ্রেমও যথেষ্ট নয়। প্রথমতঃ, সেবা সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পদ্ধতি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সেবার মধ্য দিয়া দুর্গতের বা সেবিতের মানব-মর্যাদা যদি জাগ্রত না হয়, মানব-চেতনা যদি বিস্তার লাভ না করে, তাহা হইলেও সেবা ব্যর্থক।

চাই বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও চেতনা সৃষ্টি

এইখানেই আবার আমরা সমাজ-সেবার মৌলিক অর্থ স্মরণ করিতে বাধ্য হই। আমরা দেখিয়াছি 'লোকহিত' বা 'সমাজ-সেবা' আসলে সামাজিক বৈষম্যের ও সমাজের অন্তর্নিহিত এক গভীর ক্ষতের উপর একটু প্রলেপ মাত্র। সেই প্রলেপে ক্ষত নিরাময় হয় না। জ্বালার একটু উপশম হয়। তাই হয়ত

অনেক মহানুভব সমাজ-সেবক বুঝেনও না, সমাজের [illegible] ও ব্যাধির মূলোচ্ছেদ না করিয়া তাহাকে সহনীয় করিয়া তুলিবার পো[illegible]নদের [illegible]াত বা অজ্ঞাত-রূপে এইরূপে সমাজ-সেবার পিছনে প্রায়ই [illegible]াপসবুর্গ [illegible]রিয়া থাকে। "লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন র[illegible]ানদের আয়ুর বিনিময়ে ঐশ্বর্যলাভ করিয়া, যে জমিদারপুত্র [illegible]কপুত্র হঠাৎ কোনো একটা মন্দির, ধর্মশালা বা পিঞ্জরাপোলে দুই-এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, কিম্বা কোনো শিক্ষালয়ে, চিকিৎসালয়ে, বা বস্তি উন্নয়নে ও হরিজন-সেবায় কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া নিজের বা পিতৃপুরুষের নাম অক্ষয় করিয়া গেলেন, তাঁহার এই মহৎ কর্মটা আসলে 'গোরু মারিয়া জুতাদানের' বেশি কিছু নয়। বরং উহার উদ্দেশ্য ও ফল কুটিলতর হইতে পারে। এই সূত্রে সেই রক্তশোষা শোষণবাদ ও মানব-প্রেমিক সাজিবার সুযোগ লাভ করে। সেই শোষিত নিপীড়িত মানবের চেতনা ও তাহার কর্মবুদ্ধি শোষকের ওই চালে মোহাচ্ছন্ন হয়। তাহার নিকট এই শোষণও সহনীয় হইতে থাকে। 'দরিদ্র নারায়ণের সেবার' আদর্শ তুচ্ছ নয়, কিন্তু সমাজে দারিদ্র্যই সর্বাধিক অসহনীয় অন্যায়, দারিদ্র্যের মূলোচ্ছেদ হওয়াই উচিত আদর্শ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

সামজ-সেবা বা লোক-সেবার মহৎ আদর্শকে কিছুমাত্র তুচ্ছ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বুঝা প্রয়োজন যে, একদিন যাহাই হউক আজ মানুষের উৎপাদন-শক্তি প্রসার লাভ করিয়াছে; আজ সমাজের এই প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্যের অস্তিত্বই একটা অন্যায়। এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে কেন মানুষ সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা, বাস-ভবন, সুচিকিৎসার অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিবে? বন্যা, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ত পৃথিবীতে ঘটিবে'—তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের শক্তি যথানিয়মে নিযোগ করিতে হইবে। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট যে মানুষের দৈন্য—তাহা কেন থাকিবে?

সমাজ-সেবার আদর্শ যখন এই বৈজ্ঞানিক সমাজ-চেতনার সহিত একত্রিত হইয়া যাইবে তখন দেখিতে পাইব—সমাজ-সেবার আদর্শেরই উপর সমাজের আর্থিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে: সেদিন দেখিব মানুষ মুনাফার শিকারে উৎপাদন করিতেছে না, উৎপাদন করিতেছে সামাজিক উপযোগিতা বুঝিয়া। সেদিন সমাজ-সেবার আদর্শ সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে বুঝিব। স্বার্থ ও স্বার্থ-শিকারীর তখন আর সামাজিক আদর্শ নাই। মানুষ মোটের উপর বুঝিয়াছে—সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

আদর্শ মানুষ ॥

শৈশবের কথা মনে ...ৎ—ৎ থিবীকে চিনিয়া উঠি নাই। সেই সময়ে আমার চক্ষে আমার আদর্শ ...ৎষ ছিলেন আমার পিতা। কত বড় তিনি দেখিতে, কত শক্তিমান তাঁহার দেহ, কত আশ্চর্য তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কত মহৎ তাঁহার হৃদয়। একবার তাঁহার আশ্রয় পাইলে আমার আর কোনো ভয় থাকিত না। আমার শিশুমন তাঁহার অপেক্ষা বড় করিয়া কাহাকেও ভাবিতে পারিত না। আমার প্রথম প্রস্ফুটিত চক্ষুর সম্মুখে তিনিই ছিলেন আদর্শ মানুষ।

তারপর শৈশব ছাড়িয়া বাল্যে প্রবেশ করিতেছি, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেছি। আমার চক্ষে তখন আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিলেন আমার দাদা। আমার অপেক্ষা বয়সে তিনি বেশি বড় নহেন, এক ক্লাস উপরে পড়েন। একসঙ্গে আমরা খেলিতাম, স্কুলে যাইতাম, বাড়ি ফিরিতাম। কিন্তু এই সব কথা প্রতি মুহূর্তে বুঝিতে পারিতাম যে, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ-স্থানীয়। সত্যসত্যই খেলায় তাহার জুড়ি ছিল না, পড়ায়ও তিনি ছিলেন বেশ ভালো। তাঁহার খেলার নিপুণতায় ও বুদ্ধি-কৌশলে অনেকের মত আমিও চমৎকৃত হইতাম। অনেকের মতই আমি তাঁহাকে মনে করিতাম আমার আদর্শস্থানীয়—ক্রীড়া-কৌশলের জন্য ও বুদ্ধি-উৎকর্ষের জন্য।

তারপরে সে দিন গেল। তাঁহার ও আমার কৈশোর নূতন চেতনায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। আমাদের সেদিনের চক্ষের সম্মুখে প্রাণবান্ অগ্নিশিখার মত প্রকাশিত হইলেন বিবেকানন্দ। তাঁহার সাধনার বাহক হিসাবে তখন বেলুড় মঠ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 'দরিদ্র নারায়ণের সেবায়' দেশের প্রত্যেকটি কোণে অগ্রসর হইতেছে। উহা যেন কর্মযোগের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। সেই কর্মযোগের সুমহৎ প্রেরণার উৎস স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ —যিনি বিদেশে আমাদের ধর্ম ও সভ্যতার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি স্বদেশে আপ 'র দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন এ-যুগের এই 'দরিদ্র নারায়ণের সেবার মন্ত্র।' যিনি পৃথিবীর ধর্মসভায় আমেরিকার নর-নারীকে অকুতোভয়ে সম্ভাষণ করিতে পারেন 'My sisters an.. .rothers of America' বলিয়া। আবার স্বদেশের মানুষকে জলন্ত ভাষায় প্রবুদ্ধ করিতে পারেন, এই আহ্বানে "ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি-মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী,

দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভা[illegible] ও [illegible]সী—আমার ভাই। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভার[illegible] [illegible]আমার কল্যাণ।'

খুব বেশি কিছু বুঝি নাই তাহা সত্য, [illegible]নন্দকে আদর্শ মানুষ মনে করিয়াছিলাম সন্ন্যাসীর প্রতি স্বাভাবিক [illegible]শে নয়। হয়ত তাহা ছিল, কিন্তু আমরা দেখিয়াছিলা[illegible] অ[illegible]স্পৃশ্য[illegible] বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। দেখিয়াছিলাম তাঁহার ভারতীয় নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ; সর্ব মানবের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ। আর দেখিয়াছিলাম তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগ ও ভারতীয় সাধনার প্রতি আন্তরিক মমতা। কিন্তু সর্বোপরি বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা পাইয়াছিলাম দুইটি যুগ-সত্য : সেবাধর্মের আদর্শ এবং বীরমন্ত্র—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" মিসেস বেণ্টের ভাষায় বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলাম সন্ন্যাসী নয়, যোদ্ধরূপে। ভারত-উদ্ধারের বিপ্লবী সাধনায় সেদিন বিবেকানন্দ আমাদের মন্ত্রগুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন—এই সব কারণে।

অনেক দিনেও এই আদর্শ মানুষের মূর্তি আমাদের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল না। কারণ, জাতির জীবনসংগ্রাম হইতে দূরে বসিয়া যাঁহারা ধ্যান বা সাধনা করেন তাঁহাদের মূর্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। কালধর্মের নিয়মে কিন্তু ভারতের জীবনাকাশে ক্রমে প্রস্ফুট হইলেন আর এক কর্মযোগী,—গান্ধীজী। তাঁহার অহিংসার মন্ত্র ও তাঁহার সত্যাগ্রহের মর্যাদাময় কর্ম-পন্থা এক অদ্ভুত সাধনা। গান্ধীজীকে দেখিয়াছি। তাঁহার দৃঢ়পণ ও প্রতিজ্ঞাও দেখিয়াছি শেষ বয়সে নোয়াখালিতে, উহার তুলনা নাই। আর তাঁহার চরম বিজয়গৌরব দেখিয়াছি তাঁহার অমর জীবনাবসানে। কিন্তু তাঁহার জীবন-কালেই দেখিয়াছি তাঁহার চারিদিকে আদর্শহীন ও আদর্শভ্রষ্ট নর-নারী তাঁহারই নাম ও তাঁহারই মন্ত্রের আড়ালে কত প্রশ্রয় পাইয়াছে। অহিংসা ও ত্যাগমন্ত্র কেমন করিয়া শেঠ ও বণিকদের লুণ্ঠনকেই স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমরা গান্ধীজীর নিকটে আপনাকে উজাড় করিয়া দিতে পারি নাই। হয়ত এই কারণেই সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যতটা পারিয়াছিলেন পণ্ডিত জহরলাল বা অন্যান্যরা।

হয়ত এই কারণেই আবার সুভাষচন্দ্রকেও আমরা তখন এতটা আমাদের আদর্শস্থল করিতে চাহিয়াছি। সুভাষচন্দ্রই বিবেকানন্দের উত্তর সাধক ; আর সেই হিসাবে তিনিই আমাদের আদর্শ স্থানীয়ও। এই যুগের ভারতবর্ষে বহু নেতার বহু সদ্গুণের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু অন্ততঃ তিনটি জিনিসের জন্য তাঁহাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অতুলনীয়—এমন জলন্ত দেশপ্রেম, এমন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বুকভরা বিক্ষোভ, আর এমন সত্যকারের দৃঢ়-ব্রত পুরুষ এই কালের ভারতবর্ষে আর কয়জন আছেন, জানি না। যিনিই থাকুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় অন্য কেহ এমন অগ্নিশুদ্ধ হইয়া সমুত্তীর্ণ

হইতে সাহসী হ… ভারতের কোনো মানুষকে যদি আদর্শ মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে … লে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেই সেই পদে বরণ করিতাম, তাহা…

কিন্তু রাজনৈতি… …র পক্ষে একটি প্রধান গুণ হইল অভ্রান্ত রাজনৈতিক চেতন… সেই কা… ইতি… …মাদের অন্তরে উদিত হইয়া সমাসীন হইয়াছিলেন আর একজন মহামানব …তিনি লেলিন।

বুদ্ধ নয়, খ্রীষ্ট নয়, শ্রীচৈতন্য বা গান্ধীজীও নয়,—আমার চক্ষে আদর্শ মানুষ :হইলেন লেলিন! কেন? কারণ, মানুষের মনে তিনি চিরসংগ্রাম ও চিরজয়ের আশা জ্বালিয়া দিয়াছেন। মানুষ আর কিছুতেই ছোট হইয়া থাকিবে না, পরাজয় মানিয়া লইবে না। আত্মশক্তির এমন সন্ধান তিনি ক্ষুদ্রতম মানুষের মধ্যেও আনিয়া দিয়াছেন যে, তাহারই তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া বাঙলা দেশের কবি কিশোরও সগৌরবে জানে—'আমিই লেলিন।' ইহাই লেনিনের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সত্য। অথচ চাল চলনে লেনিন ছিলেন সাধারণ মানুষ—অসাধারণ মানুষও যে সাধারণেরই মতো, এই সত্যের যেন তিনি প্রমাণ।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসাধারণত্বের বীজ এবং অসাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণত্বের চিহ্ন—ইহাই বুঝিতে বুঝিতে, আবিষ্কার করিতে করিতে যখন আজ জীবনের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তখন নিজের অন্তরের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—সেখানে কখন আমার মনেরও অগোচরে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন আবার আমার জীবনের সেই প্রথম আদর্শ—আমার পরলোকগত পিতৃদেব। অসাধারণ বলিয়া কেহই তাহাকে জানিত না; কিন্তু 'সাধারণ' বলিলেই কি তাঁহার কথা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি? শিক্ষিত বাঙালি তিনি; ভদ্রপরিবারে জন্মাইয়াছিলেন, দশজন মধ্যবিত্তের মত বিদ্যার্জন করেন, তারপর সংসারে প্রবেশ করেন। আপনার পরিশ্রমে কর্মক্ষেত্রে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠাও কিছুটা অর্জন করিয়াছিলেন। দশজনকে খাওয়াইযাছেন, মানুষ করিয়াছেন। দশটা সৎকার্যে সাধ্যমত সাহায্যও করিয়াছেন;—কিন্তু বিরাট কিছু করেন নাই। ভ… তা, শোভনতা, সম্ভ্রমবোধ, সবসুদ্ধ একটা সংযত সুন্দর জীবন ছিল তাঁহার। আজ মনে হয় জীবনের সকল দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ভালোমন্দ সুদ্ধ এই জীবনকে এমন সরস ক্ষমাস্নিগ্ধ … যিনি দেখিয়া গিয়াছেন—সেই সাধারণ মানুষই আমার আদর্শ মানুষ।

আসলে কথাটা বুঝিতেছি—জীবনের কর্মক্ষেত্রে যে আপন কর্তব্যটুকু স্বচ্ছন্দ আনন্দে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছে সেই সাধারণ মানুষই ত আদর্শ মানুষ—সমাজ-সভ্যতার তাহারাই তো প্রাণ।

[মন্তব্য ; 'আমার আদর্শ মানুষ' কিরূপ ? এ প্রশ্নের এরূপ উ[illegible] দিলাম। শিক্ষার্থী এরূপ উত্তর লিখলে কতটা ফললাভ করবে, সে কথা বলা অ[illegible] ও [illegible] আদর্শ মানুষ বলতে মামুলী ভাবে মামুলী 'আদর্শ মানুষকে' গ্রহণ করো [illegible]নদের [illegible]টি নন তো ; যেমন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, কিংবা বিবেকানন্দ। [illegible]হাপসবুর্গ [illegible]তাঁরা প্রণম্য তার ইঙ্গিত রচনায় রয়েছে—ভাব-সম্প্রসারণ করো।

কিন্তু, মানুষ কি কেবল 'আদর্শ পুরু[illegible] জন্মেছে [illegible] শত-সত্ত্বেও এটা সত্য—মেয়ে হয়ে পুরুষের অনুরূপ জীবন-গঠন করা যা[illegible]। কোনো আদর্শ নারীর কথা না লিখলে অন্তত মেয়েরা তৃপ্তি পাবে না। তেমন নারী কি নেই ? বড় জটিল প্রশ্ন। নারীর আদর্শই একালে আমূল পরিবর্তিত হচ্ছে। তা ছাড়া, সীতা-সাবিত্রীরা ত ঐতিহাসিক চরিত্র নন। গ্রহণ যদি করো গ্রহণ করতে হয় ঝান্সীর রানী লক্ষ্মী বাঈকে, অহল্যা বাঈকে কিংবা রানী ভবানীকে।]

॥ রানী ভবানী ॥

[আমার আদর্শ মানুষ]

আমি মেয়ে—বাঙলা দেশের শিক্ষিত পরিবারের সাধারণ বুদ্ধির মেয়ে। যদি আমি কোন কীর্তিমান পুরুষকে 'আমার আদর্শ মানুষ' বলিয়া গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। জানি মহাপুরুষদের অধিকাংশ গুণাবলীই নর-নারী সকলের সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তবু তাঁহাদের সব গুণ সর্বাংশে কোনো মেয়ে গ্রহণ করিতে পারে না আর তাহা করিলেও যে সে সম্পূর্ণ হইবে, তাহাও বলা যায় না। অতএব, কোনো সত্যকারের মহীয়সী নারীকেই আমি আদর্শ করিতে পারি।

কিন্তু সমস্যাটা তথাপি শেষ হইল না। কাল পরিবর্তিত হইতেছে। নারীর জীবন-যাত্রা এবং নারীর আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে। না হইলে আমি বাংলা দেশের মেয়ে, হিন্দু ঘরের মেয়ে, কলেজে পড়িতে আসি ? এ কালের এই জটিলতা ভরা জীবনের মধ্যেই আমাকে আমার স্থান লইতে হইবে, স্থান লইতে হইবে সংসারে, প্রয়োজন তো সংসারের বাহিরে। এমন কি, সমাজের সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন হইলে চলিবে না। সেখানেও আমার কর্তব্য আছে, যতটুকু পারি এই মানব-মহাতীর্থে আমিও 'সবার পরশে পবিত্র করা' তীর্থনীরে আমার ক্ষুদ্র জীবন-ঘট ভরিয়া লইব, তাহার জলেও অভিষেক করিব সেই মানব-মহাদেবতার।

তাই সম্ভবত আমার আদর্শ-নারী হইতে পারিতেন এ কালের কোনো কর্মময়ী, গতিময়ী, কল্যাণময়ী মহতী নারী। কে সে, তাহা জানি না।

এ কালের রাজনৈ বা সামাজিক নেত্রীদের কাহাকেও আমি তেমন চিনি না। যাঁহাকে যুগের নহেন—গতযুগের।

আমি নাটো য়া রাণী ভবানীর কথা বলিতেছি।

বলিয়াছি রানী কালের মেয়ে নন; তাহা ছাড়া তিনি রাজরানী, আমাদের মত মধ্যবিত্ত ও নহেন। কাল ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অল্পাধিক ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁহার আমার মত বাঙালি মেয়েও এ যুগের কঠোর জীবনযুদ্ধে প্রেরণা লাভ করিতে পারে।

জীবনের কঠোর পরীক্ষায় রানী ভবানীকেও উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে ; না হইলে জীবন তাঁহাকেও নিষ্কৃতি দিত না। আর সেই জন্যই তাঁহার জীবনের উপযোগিতা একালের আমাদের পক্ষে।

তখন অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্যাহ্নের দিকে। নবাব আলীবর্দী খাঁর পরে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার মস্‌নদে বসিবেন ; আর দেখিতে না-দেখিতে ভাগ্যের চক্রান্তে ও সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় আপনার রাজ্য হারাইবেন। সে যুগটা বড় অন্ধকারময় যুগ, জাতীয় কলঙ্কের যুগ। সেই অধঃপতনের দিনে রানী ভবানী একটি পবিত্র শান্ত হোমশিখার মত আপনার মহত্ত্বে আপনি আলোক বিকীরণ করিয়া গেলেন। দীপান্বিতার রাত্রিও নয়, বাঙলার গাঢ় তমিস্রাময় রাত্রির একমাত্র প্রদীপ তিনি।

রানী ভবানীও জন্মিযাছিলেন সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে, বরং তিনি সেদিনের সামন্তবর্গের প্রধানা। বরেন্দ্র ও উত্তরবঙ্গ জুড়িয়া তখন নাটোর রাজ্য। বলিতে গেলে তিনি ছিলেন প্রায় সেই অর্ধবঙ্গের অধিশ্বরী। অবশ্য স্বাধীন ছিলেন না। কিন্তু নবাব সরকারে রাজস্ব যোগাইবার পর সামন্তরাজারা তাঁহাদের আপন রাজ্যে অনেকেই ছিলেন প্রায় সর্বময় কর্তা। রানী ভবানীও ছিলেন সেদিনের নাটোর-অধিশ্বরী—বার্ষিক প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে তিনি রাজস্ব দিতেন।

নাটোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় মুর্শিদ কুলিখাঁর সময়ে। তখন সপ্তাদশ শতাব্দী শেষ হইয়াছে। মহারাজ রামজীবন মৈত্রের ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন নবাবের প্রীতিভাজন হইয়া এই বিপুল সম্পত্তি প্রথম অর্জন করেন। রানী ভবানী রা জীবনের দত্তকপুত্র রামকান্তের পত্নী হিসাবে এই সম্পত্তির অধিকারিণী হন।

ভবানী জন্মিয়াছিলেন ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে, রাজ ীর ছাতিম গ্রামে। তাঁহার পিতা আত্মারাম চৌধুরীও প্রতিষ্ঠাবান্ ভূম্যধিকারী। আট বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয় নাটোরের রাজদত্তকপুত্র রামকান্তের সহিত। সেদিনের অভিজাত-গৃহের কন্যারা ও বধূরা লেখাপড়া শিখিতেন, রানী ভবানীও তাহা শিখিয়াছিলেন।

ভবানীর জীবনে প্রথম পরীক্ষা আসিল ১৭৪০ খ্রীষ্[illegible] ও [illegible] পরে যখন নবাব প্রথমে রামকান্তকে দত্তক বলিয়া স্বীকার করি[illegible]পা[illegible]নদের [illegible]ী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। এই পরীক্ষায় অবশ্য তাঁহা[illegible] [illegible]াপসব[illegible] [illegible]ওয়ান দয়ারামকে স্বপক্ষে পাইলেন। ফলে রামকান্তের রাজ্যোদ্ধার [illegible] হল। তিনি ও ভবানী সগৌরবে নাটোরে ফিরিলেন [illegible] অ[illegible] কুটি [illegible]ান্তের মধ্যে আপনার সংসার ও পরিবারের অধিকার রক্ষা [illegible] সহজসাধ্য ছিল না। রানী ভবানী একা তাহা করেন নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্বামী ও দয়ারামের সহযোগিনী হইবার মত বুদ্ধি ও দৃঢ়তার পরিচয় তিনি দেন। আর আজিকার দিনের জীবনযুদ্ধেও তাঁহার এই স্থির বুদ্ধি ও অধিকার রক্ষার মনোভাব আমাদের অনুকরণীয়।

কিন্তু ইহার পরেই প্রধান পরীক্ষা। তখন বর্গীর অত্যাচারে বাঙলা দেশ বিধ্বস্ত হইতেছে। এমন সময়ে মহারাজ রামকান্ত অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলেন। রানীর বয়স তখন চব্বিশ বৎসর, একমাত্র কন্যা তারা শুধু তাঁহার সম্বল, একটি শিশুপুত্র জন্মের অল্পকাল পরেই মারা গিয়াছে। কিন্তু অনাথা বিধবার মত রানী ভবানী অসহায়া রহিলেন না। বৈধব্যব্রতের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন রাজ্যরক্ষার ও প্রজাপালনের দুঃসাধ্য ব্রতও। সেকালের দুর্ধর্ষ পশ্চিমা সিপাহীদের লইয়া তিনি আপনার ফৌজ গড়িলেন। নাটোর এতটা নিরাপদ হইল যে, নবাব পরিবারও পদ্মার এপারে রামপুরবোয়ালিযায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্মিষ্ঠা মহিলার নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল এইরূপে।

ইহার পরে চলিল প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা। শাসনকার্যে কোথাও কিছুমাত্র শিথিলতা রানী ভবানী সহ্য করিতেন না। এতবড় গোলযোগের মধ্যে কখনো সরকারে খাজনা বাকী পড়ে নাই, অথচ প্রজাদের উপরও কোনো নিপীড়ন হয় নাই। মাতার মত প্রাণ লইয়া তিনি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন স্নেহ দিয়া, স্থির ধীর ভাবে, সদা জাগ্রত দৃষ্টি লইয়া। পঞ্চাশ বৎসর এমনি করিয়া তিনি শাসন করেন নাটোর।

কিন্তু সেই অশান্তির যুগে কিছুই সহজসাধ্য ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা তারাদেবী অকালে বিধবা হন। রানী তাঁহাকে লইয়া বাস করিতে যান মুর্শিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরের এক প্রাসাদে। সেখানে তারাদেবীর রূপরাশি দেখিয়া প্রবল প্রলুব্ধ হইয়া উঠে নবাবের কোন পারিষদ। তাঁহার প্রাসাদ আক্রান্ত হয়। [illegible] রানী ভবানী তৎপরতার সহিত কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন, আর এক সাধুর সহায়তায় আবার নাটোরে গিয়া উত্তীর্ণ হন।

অথচ ইহার পরেই দেখিতে পাই তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ও ক্ষমাশীল উদার হৃদয়ের পরিচয়। মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের গৃহে তখন

সিরাজউদ্দৌলার স্তবর্গ ষড়যন্ত্রে বসিয়াছে—মীরজাফরকে নবাব করিয়া ক্লাইভের নার ভাগ্য সমর্পণ করিতেছে। সামন্তবর্গ সকলে প্রায় একম হলেন সেদিনের সিদ্ধান্তে—সিরাজকে রাজচ্যুত করিতে হইবে। কি একমাত্র রানী ভবানী। বিদেশীর সাহায্যে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ক তিনি আপত্তি করিলেন। প্রয়োজন হয় তাঁহারা নিজেরাই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করুন্। ইহা মনে রাখিবার মত কথা। সেদিনকার মন্ত্রগুপ্তির নীতি অনুসারে রানী ভবানী আপন বর্গীয় সামন্তদের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবত সিরাজকে জ্ঞাপন করেন নাই। তাহা করিলে সেদিনের সামন্ত নীতি-অনুসারে তাহাই হইত অধম বিশ্বাসঘাতকতা। তাহা সত্ত্বেও, সেই সেকালের দুর্নীতির মধ্যে, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার এমন কলুষিত মুহূর্তেও দেখি—একটি বাঙালি নারী সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিরাগবশেও আত্মবিস্মৃত হন নাই; আপনার রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি ও চেতনার দ্বারা জাতির কঠিন দুর্ভাগ্যও নিবারিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। হউক সেই চেষ্টা ব্যর্থ, কিন্তু সমস্ত বাঙালির তাহা স্মরণীয়। আর সমস্ত বাঙালি মেয়ের নিকট সেই চেষ্টা পরম গৌরবের—আমরা বাঙালি মেয়েরা এ দেশকে বিদেশীর নিকট বিকাইয়া দিই নাই; রানীভবানী আমাদের দেশপ্রীতিকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

আমার নিকট রানী ভবানীর এই রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি, এই বাস্তববোধ ও উদার স্বদেশপ্রীতিই তাঁহার মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

ইহার পরেকার অধ্যায়ে অবশ্য রানী ভবানীর আর তেমন রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিবার অবসর রহিল না। দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল প্রজাদের, জমিদারদেরও। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আসিল; গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হইতে লাগিল। অবশ্য পুণ্যবতী বিধবা রানী আপনার অন্তরের মমতা ও কর্মদক্ষতা লইয়া আপন প্রজাদের খাজনা মকুব করিলেন, যাহা সম্ভব আর্তরক্ষার কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখিলেন না।

ইহার পরেই আরম্ভ হইল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল। নাটোরের জমিদারীর ইটি প্রকাণ্ড মহাল নাটোর অধিকারিণী অকারণে হারাইলেন। তাঁহার সম্ভ্রম বাধে আঘাত লাগিল। রানী ভবানী নিজের দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয় শীবাসিনী হইলেন। সেইখানে রানীর পুণ্যব্রতের জীবন শতধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িল।

কাশীতে পদার্পণ করিলে এখনো তাই দুইজন পুণ্যব্রতা নারীর নামে আমাদের মাথা নত হয়—একজন অহল্যা বাঈ, অন্যজন রানী ভবানী। দুইজনাই সমকালীন, দুইজনাই কঠোরব্রতিনী বিধবা, অনেকাংশে একইরূপ কর্মে ব্রতী।

একে একে কাশীতে তাঁহার পবিত্র কী[illegible] উঠিতে লাগিল— দুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড, গোপাল মন্দির, [illegible]ণদের [illegible] দণ্ডি-ভোজ-ছত্র, মথুরাছত্র—সবই তাঁহার কীর্তি। কাশীর পঞ্চ[illegible]র সমস্ত পথ তাঁহার নির্মিত। বহু দেবালয়, বহু ঘা[illegible] অশোকের ধর্ম-বিজয়ের কথা আমরা জানি। ইতিহাসে তা[illegible] তুলনা নাই। কিন্তু রানী ভবানীর ধর্মবিজয় পবিত্র কাশীধামে বাঙালিকে চিরদিনের জন্য আত্মীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহা আজও আমরা সগৌরবে স্মরণ করিতে পারি।

রানীর জীবনকালেই তাঁহার দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ জমিদারীও প্রায় বিলাইয়া দিতে থাকেন। তিনি ছিলেন সাধক প্রকৃতির। রানী তাহাতেও ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সত্যকারের ভক্তের মত বরং বলিলেন—"তুমি সূর্যবংশের রাজাদের মত হও, আর কিছু চাহি না।"

অবশেষে ৭৯ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী নারীর জীবন দীপ নিবিয়া গেল। তখনো দেশের অন্ধকারের যুগ। কিন্তু প্রদীপের সামান্য শিখাটির মতই নাকি এই পৃথিবীতে মানুষের শুভ সাধনাও বহুদূর পর্যন্ত আপনার আলো বিকিরণ করে। না হইলে একালে—এই গর্জমান, পরিবর্তমান জটিল কালের পারে—আমার মত সাধারণ মেয়ের চক্ষেও সমকালীন বহু বহু কর্মিষ্ঠা নারীর খ্যাতি ও সৌভাগ্য ছটার অপেক্ষা সেই ধর্মপ্রাণা নারীর জীবনের শান্ত জ্যোতির্লেখাটি এমন আনন্দ ও শ্রদ্ধা সঞ্চার করিল কি করিয়া?

[মন্তব্য : এ রচনাটিতেও একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের দিক থেকেই রানী ভবানীকে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু লেখা যায় না এ কালের শিক্ষিতা মেয়ের আদর্শ স্থানীয়া কোনো মেয়েব কথা?—যাঁরা পরিশ্রম পূর্বক জীবিকার্জন করেন, অথচ সেবায় শিক্ষায় অক্লান্তমনা; আর সাহসে কর্মশক্তিতে আগামী দিনের নারীশক্তির স্বাক্ষর? কে এমন মেয়ে? তেমন মেয়ে আছে তাঁদের শিক্ষাদাত্রীদের মধ্যে, আছে ছাত্রীদের নিজের ঘরে বা তাদের চারপাশে। খাটছেন, সংসার পালন করছেন, হয়ত ভাইবোনকে পড়াচ্ছেন। একি কম বড় আদর্শ? অবশ্য তা লেখা সহজ নয়।]

ভাব-সম্প্র. ...াংশ-লিখন ও বস্তু-সংক্ষেপ

[Ampl... : Substance & Precis]

...না।

জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একদিকে অবসর বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্য দিকে তেমনি প্রয়োজনের তাড়না বেড়েছে। অর্থাৎ সময় কমেছে। ফলে একদিকে কথাকে বিস্তারিত করে, সরস করে ও সুশ্রাব্য করে বলার মতো অবকাশ বেশি জুটেছে; অন্য দিকে বিস্তারিত উক্তিকে সংক্ষেপিত করার তাগিদ বেশি দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে সার বক্তব্য শুনে নেবার, মূল কথাটা জেনে নেবার। বেশি সময় নেই—সবাই কাজের মানুষ। ইংরেজি ভাষীদের সমাজে এজন্য বিস্তৃত প্রকাশ ও কথা-সংক্ষেপ, এই দুই প্রধান ধারার নানা ধরন উদ্ভূত হয়েছে। বিষয়-কর্ম, উদ্যোগ-আয়োজন যতই বৃদ্ধি পাবে বাঙালি সমাজেও ততই তার প্রয়োজন হবে। অবশ্য, এখন পর্যন্ত বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য শতকরা আশী ভাগ চলে ইংরেজির মারফত। সে ভাষার তৈরী সড়কে চলাও ইংরেজি-নবিশদের পক্ষে সহজ। পুরনো ধরণের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের বাঙলার ব্যবহার আছে। তাতে তাদের কাজ চলে। কিন্তু আধুনিক কালের যাবতীয় বিষয়-কর্ম চালাতে হলে বাঙলাকে ইংরেজির অনুরূপ নতুন বিস্তৃত-প্রকাশ ও কথা-সংক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এজন্য কিছু বাঙলা পারিভাষিক গৃহীত হচ্ছে, কিন্তু, সে সব শব্দের অর্থ এখনো সুস্থির হয়ে ওঠেনি। ইংরেজি প্রতিশব্দ পাশাপাশি লিখেই সে সব শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করা এখন পর্যন্ত প্রয়োজন। যথা:

(১) ইংরেজি Amplification of Idea, Expansion of Idea প্রভৃতি শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ 'ভাব-সম্প্রসারণ'। ও রূপ অর্থে আরও বাঙলা শব্দও প্রযুক্ত হতে পারে।

(২) ই.রেজি Substance শব্দটির বাঙলা প্রতিশব্দ 'সারাংশ'। 'মূল-কথা' 'মর্মক.' 'মর্মসত্য' প্রভৃতি নানা শব্দও এ অর্থে চলে।

(৩) ইংরেজি Precis সাধারণতঃ বৈষ... ব্যাপারে রিপোর্ট, মিনিট, প্রভৃতির বিষয়েই প্রযুক্ত হয়; কিন্তু সাহিত্য বা ঐরূপ ক্ষেত্রে তা বিশেষ প্রযুক্ত হয় না। Preciscে বিষয়-সংক্ষেপ বা বস্তু-সংক্ষেপ বলাও চলে। কিন্তু Precis-কে কেউ কেউ সমানুবৃত্তি ও বিষয়-সংক্ষেপ বলছেন। Precis হচ্ছে Summary, Abstract প্রভৃতির সমগোত্রের জিনিস। তাই বস্তু-সংক্ষেপ বলতেও ওসব বোঝাতে পারে।

(৪) ইংরেজি Gist শব্দটির প্রতিশব্দ 'গূ[illegible]ারে, কিন্তু 'মর্ম সংক্ষেপ', 'মূলকথা' বা এই ধরনের অন্য কথাই [illegible]নদের [illegible]ন ?

(৫) Central ideaর প্রতিশব্দ 'কেন্দ্রীয় [illegible]বাদ মাত্র। কিন্তু তার সঙ্গে 'গূঢ় মর্মের' পার্থক্য কি [illegible]

(৬) Expansion of idea [illegible] 'ভাব-বিবৃতি' প্রযোজ্য।

(৭) Explanation অবশ্য 'পরিষ্কার ব্যাখ্যা'।

গোলযোগটা ঘটে কয়েকটি কথা নিয়ে, যেমন—মর্মানুবৃত্তি, মর্মকথা, সারাংশ ইত্যাদি। বিশেষ লক্ষ্য করলে হয়ত এসব কথার পৃথক পৃথক অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তা পরিষ্কার নয়। ইংরেজি Gist, Substance প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্যই কি খুব স্পষ্ট—অন্তত আমাদের কাছে? Precis বৈষয়িক ব্যাপারে প্রযোজ্য বলে কথাটার একটা পৃথক প্রয়োগ গড়ে উঠেছে। বাঙলা কথাগুলোর সেরূপ পারিভাষিক অর্থ এখনো সুস্থির ও সর্বগ্রাহ্য হয়নি। তাই বাঙলা-ইংরেজি দুই অর্থ মিলিয়ে প্রত্যেক শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করা ছাড়া এখনো গত্যন্তর নেই। এই কথা মনে রেখে এখানে সাধারণ ভাবে কয়েকটি শব্দ ও তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হ'ল।]

(১) 'ভাব-সম্প্রসারণ' (Amplification or Expansion of ideas) নিয়ে কথা বাড়ানো নিরর্থক, কারণ এ কথার অর্থ পরিষ্কার। বিস্তারিত বা প্রসারিত করে ভাব বা মর্ম যাই লিখতে বলা হোক, তা এ পর্যায়ের মধ্যে পড়বে। কি করে তা লিখতে হয়, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র ভাবে আলোচ্য।

(২) 'ভাবার্থ' 'মর্মার্থ' প্রভৃতি শব্দে সাধারণতঃ বোঝানো হয়—রচনাটির মধ্যে যে 'ভাবটি' প্রচ্ছন্ন বা আভাসিত রয়েছে তার 'অর্থ' পরিস্ফুট করে লেখা। এরূপ লেখা আকারে ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে; মাঝারি হতে পারে; তা নির্ভর করে প্রথমতঃ ভাবের উপর; আর অনেক সময়ে কর্তৃপক্ষের কি চাহিদা তার উপর। যে ভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা জটিল বা গুরুতর হলে তার অর্থ পরিষ্কার করে লিখতে নিশ্চয়ই কথা ও সময় দুই-ই বেশি লাগবে।

(৩) 'বস্তু-সংক্ষেপের' সঙ্গে 'সার-সংক্ষেপের' বা 'ভাব-সংক্ষেপের' তফাত করা যেতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই চাই আকারে সংক্ষেপ লেখা। 'বস্তু-সংক্ষেপ' 'সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রভৃতি কথা ইংরেজি Summaryর অনুরূপ। সার-সংক্ষেপকে Abstract বলা হয়। বস্তু-সংক্ষেপে দরকারি সকল ভাব ও বক্তব্যকে সংক্ষেপ করে লেখা—বিশেষণ, অলঙ্কার প্রভৃতি ভাবের বা ভাষার পল্লবিত অংশ বর্জন করা। সার-সংক্ষেপে প্রথম বোঝা দরকার বস্তুমাত্রই 'সার' নয়; বস্তুর অনেকটা অ-সার। যতটুকু সার, সেই ভাবটিকেই নিয়ে সংক্ষেপে বলা। অবশ্য শব্দটা পরিষ্কার অর্থ জ্ঞাপন করেনা; তার চেয়ে 'সারাংশ' 'মর্মাংশ' উদ্দিষ্ট অর্থ বেশি জ্ঞাপন করে।

অনুশীলন ও নিদর্শন

[নিম্নলিখিত গদ্য ... নের জন্য এখানে উদ্ধৃত হল। নিদর্শন স্বরূপ উত্তর পরে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ... লিখতে চেষ্টা করবে।]

১। কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব ... মহারাজ শেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, "বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সত্য ও উন্নত হইতে চাও তবে কাড়িয়া খাইবে। 'গো' শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ ইহা তস্করভোগ্যা। সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে কি Right of Theft, কি একটা right নয়? অতএব হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে, তুমি আইন মতে কার্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্তী হও। চোরকে গরু ছাড়িয়া দাও!" এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

২। আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙ্‌লার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবী গান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিংকিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লী গেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—করে আশীর্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিতমনে
সবছেড়ে যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

৩। স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্যোগ আঁধারে।

একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থা[illegible]
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট [illegible]নদের
স্বার্থ যত পূর্ণ হয়। লো[illegible]পসবুগ
তত তার বেড়ে ওঠে; [illegible]
আপনার খাদ্য [illegible] করি [illegible],
জঠরে পুরিতে চায়। [illegible] বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ।
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।

ভাবসত্য-প্রকাশ

১। মানুষ অতি দুর্বল জীব; সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে; সেই দলের নাম 'সমাজ'। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে, স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙ্গিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থে মানুষ সেই পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক তাহার নাম 'ধর্মবুদ্ধি'; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল—ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত' দুই টানাটানির ব্যাপারে, উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যতঃ সমাজ রক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল মাত্র, তাহা মানুষকে অন্য দিকে প্রেরণ করে, সামাজিক মানুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্য স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের 'নৈতিক জীবন'। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তি[illegible]র্গে চালাইতে চেষ্টা করে, এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাভারতের কুরুক্ষেত্র;—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে।

২। আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছে, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!—"

আমাদের কালো চ[illegible] ঘৃণা করিও না ! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধি[illegible]নিয়া [illegible]ইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ [illegible]এও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দণ্ড আছে, [illegible]র [illegible]কেন ? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই [illegible] তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী ; কেন [illegible] আফিং খোর, তুমিও কি দেখিতে পাওনা যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয় ? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজন পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন ? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই। (কমলাকান্ত)

৩। প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সৎকর্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি, ইহা হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল না ; সেই যুগে সমস্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য যৌথ-পরিবার প্রথা উৎকৃষ্টরূপে মনুষ্য সমাজের উপযোগী ছিল।

সেইরূপ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা প্রকৃতই সমাজের কোনকালে হইয়াছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজ যে, এইরূপ এক মহিমায়-মণ্ডিত শান্তিময় নিকেতনে পৌঁছিতে পারে, রামায়ণ কাব্যে সেই সম্ভাবনা যথার্থে পরিণত হইয়া অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়া আছে। মানুষের সৎপ্রবৃত্তি-নিচয়ের বিকাশ করিবার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আবশ্যক,—বর্তমান য়ুরোপীয়সমাজ সেই বিদ্যালয়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই বিদ্যালয় স্বভাবের ছন্দে, উদার ধর্মনীতির ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে,—স্বর্গীয় পবিত্র আলোক এবং প্রাণসঞ্চারী বায়ুপথ নিরোধ করিয়া প্রাচীর তুলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্যালয়।

(রামায়ণী কথা)

৪। দেখ, [illegible]মি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি ? খাইতে পাইলে [illegible] চোর হয় ? দেখ, [illegible]হারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষ[illegible] অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে—চোর যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন ?

নমি আমি প্রতিজনে,—আ[illegible]নদের
    প্রভু ক্রীতদাস! [illegible]সবুর্গ[illegible]
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে[illegible]
    সমগ্রে [illegible]
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি তক্ষণ
    কর্ম-চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
    বহ অদ্রিভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
    হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরণ্যে তুমি, শরণ্য এককে,—
    আত্মার আত্মীয়?

মর্মলেখা

১। মনুষ্যের কতকগুলি এমন বিপদ আছে, যাহা হইতে সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না—মৃত্যু, শোক, নানাপ্রকার নৈরাশ্য ও ব্যাধি চিরদিনই তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে। এই সমস্ত স্বাভাবিক দুঃখ ও বিপদ মনুষ্যজীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমাদের আধুনিক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা এরূপ যে, তাহাতে আমাদিগকে বিপদে বিমুখ করিতে সর্বদাই অভ্যস্ত করিতেছে। কল্য যাহার একটি পদ ডাক্তার ছেদন করিয়া দিবে, তাহাকে কুশকণ্টকের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিয়া বহুদর্শী বলিয়া যিনি পরিচিত হইতে চান, তাঁহার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে। এ-দেশে সাবধানতার প্রতি দৃষ্টির মাত্রা বড় বৃদ্ধি পাইতেছে। হয় ত কোন নিগূঢ় শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বের মহাভিষকরাজ আমাদের স্বর্ণপাত্রকে মৃৎপাত্রে পরিণত করিবেন, ময়ূরের পক্ষ হইতে হয়ত একটি একটি করিয়া পালক তুলিয়া লইবেন, যাহা একান্ত যত্নে রক্ষা করিতেছি, তাহাকেই হয়ত নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হরণ করিবেন, সুতরাং এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যাহা কর্তব্য, যাহা শ্রেয়ঃ কেবল তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুঃখকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। এইরূপে স্বেচ্ছাকৃত দুঃখেই মনুষ্যের মহত্ত্ব।

২। নভেলের স্বত্ব মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছে[illegible]নিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। ঐ [illegible]ক্ষ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না বলিয়া আস্ফালন কা[illegible] [illegible]শী জিনিসকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোনকালে আপত্তি ছি[illegible], আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারতবাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাত কুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিনকালে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোনকালেই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না ; কিন্তু কোন কোনটা বেশ ধরিয়া যায়। কোন কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নভেলের বীজ মাসিক পত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই আসিয়াছিল ;—যাঁহারা উহার আমদানী করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেইদিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল ; এখন উহার শস্যসম্পত্তিতে সুজলাসুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম এবং তামাক—এ দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নভেলের এবং মাসিক পত্রিকার শস্যসম্পদ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না। (চরিত কথা)

৩। ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশিরে
মূক সবে—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
[illegible]হি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
[illegible]রপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
না[illegible]হি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে [illegible]তারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে ;
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দী[illegible]দর।
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।

সারাংশ-লেখা

১। কমলাকান্ত লল. "পূর্বকালে মহারাজ শেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন,······চোরকে গরু ছ ও।"

ব্যঙ্গের ছলে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার এই: প্রবলের বিরুদ্ধে প্রাচীন স্মৃতিও কোনো কথা বলিত না, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও বিজয়ীকে স্বীকার করিয়া লয়। আসলে উহাতো দস্যুতা, এবং উহাও অপহরণ—চোরের কাজ মাত্র।

২। 'আমি ভালবাসি, এই বাঙলার' (সনেট)

··· এই পৃথিবী ও এই জীবন আমার প্রিয়। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান আসিলে এই সমস্তই বিসর্জন দিবার জন্যও আমি প্রস্তুত থাকিতে চাই।

৩। 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' (সনেট)

স্বার্থ নিজেই একদিন নিজের অপঘাত ঘটায়। লোভ ক্রমেই স্ফীত ও বীভৎস হইয়া উঠে, কিন্তু বিধাতার নিয়মে বীভৎসতার স্থান নাই, তাই উহা চূর্ণ হয়। এই জন্যই জাতি ও দেশের নামে আজ যে সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য জাতিকে বঞ্চিত ও শোষিত করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরও ধ্বংস অনিবার্য।

২। 'ভাবসত্য'-প্রকাশ

১। "মানুষ অতি দুর্বল জীব······ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে।"

জীব হিসাবে মানুষের জীবন একটা সংগ্রাম—আত্মরক্ষায় ও বংশরক্ষায় সে সর্বদা যুঝিতেছে। জীবন-সংগ্রামে সুবিধা লাভের জন্য মানুষ সমাজ বাঁধিয়াছে, এবং সেই সমাজের সার্বজনীন প্রয়োজনেই আপনার পশু-প্রবৃত্তিকেও তাহার সংযত করিতে হইয়াছে। ইহারই নাম ধর্মবুদ্ধি। একদিকে এই বৃহৎ ল্যাণবোধ—সমাজের মঙ্গল, অন্যদিকে সেই জৈব তাড়না—আত্মরক্ষা, ব রক্ষা—এই দুইয়ের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে সামঞ্জস্য করিতে হয়। ইহারই নাম নৈতিক জীবন—যেখানে বৃত্তির ও নিবৃত্তির একটা চিরন্তন টানাটানি লাগিয়াই আছে। এই নৈতিক জীবন যেন কুরুক্ষেত্র—ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম সেখানে চলিতেছে।

২। "আর আমাদের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ· ·অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।"

[বিড়ালের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র যেই কথাটি বলিতে চাহিয়াছেন তাহার অন্তর্নিহিত ভাব এই]—

সংসারে কেহ অপর্যাপ্ত ভোগৈশ্বর্য আঁকড়াইয়া ব[illegible] আছে, আর কেহ অন্নাভাবে মরিতেছে। এইরূপ বৈষম্য [illegible] ও অন্যায়; ছোট-বড় কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, সকল মানুষেরই [illegible] ও জীবনযাত্রায় জন্মগত অধিকার আছে। সে অধিকার হইতে যে বঞ্চিত হয়, সে এই বৈষম্য না মানিয়া ছলে বলে কৌশলে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহা অন্যায়ও নহে।

৩। "প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম। সৎকর্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি·········রামায়ণ চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্যালয়।"

মানুষের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার মূল উদ্দেশ্য সৎ প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ। প্রাচীন ভারতীয় যৌথ-পরিবার সেইরূপ গুণগ্রাম বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করিত। যৌথ-পরিবার পিতা-মাতা-ভ্রাতা-আত্ম-পরিজন সকলের সঙ্গে সকলের স্বাভাবিক ভাবেই প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। রামায়ণে আমরা ইহার প্রমাণ দেখি—পিতা-মাতা ও সন্তানে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে শ্বশ্রূ-পুত্রবধূতে, এমনকি স্বপত্নীদের মধ্যেও আদর্শ প্রীতির সম্পর্ক। রামায়ণও যেন আদর্শের এক মহাবিদ্যালয়।

৪। "দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু·····তা কৃপণ, তাহার দণ্ড হয়না কেন?"

অভাববশতঃ অনেকে বাধ্য হইয়া চুরি করে। অভাব নাই বলিয়াই অনেকে 'সাধু'। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন আত্মসাৎ করিয়া রাখিলে অভাব সৃষ্টি হয়। উহাও অপহরণ। তাই যাহারা এইরূপ ধনের মালিক তাহারাও মূলতঃ চোরই।

৫। "নমি আমি প্রতিজনে·····আদ্বিজ চণ্ডাল।"

এক বিশ্বাত্মাই তাবৎ চরাচরে প্রকাশমান। এই সত্য উপলব্ধি করিলে জড়, জীব সবই মনে হয় সমার্থক—বিন্দুই বা কি, সিন্ধুই বা কি? ব্রাহ্মণই বা কি, চণ্ডালই বা কি? সকলেই সেই বিশ্বাত্মায় বিধৃত, সেই অর্থেই অর্থযুক্ত। তাই সকলের মধ্য দিয়াই তিনিও প্রণম্য, তিনিও প্রিয়, আমার আত্মীয়।

৩। মর্ম (Precis) লেখা

১। "মানুষের কতকগুলি এমন বিপদ আছে যাহা হইতে সমাজ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।·····এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত দুঃখেই মানুষের মহত্ত্ব।"

মানুষ কেবলই সুখের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু শত চেষ্টা করিলেও জরা-মরণ-ব্যাধির [illegible]ন মানুষ দুঃখ এড়াইতে পারে না। অনেক দুঃখ হয়ত মঙ্গলময়েরই বিধান, তাই সুখ দুঃখ গণনা না করিয়া যাহা কর্তব্য, যাহা শ্রেয়ঃ তাহা সাধন করিতে [illegible] ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

[মন্তব্য : অনুচ্ছেদটি ভাবে ও ভাষায় [illegible]টু জটিল। উহার মূল বক্তব্য শেষ বাক্যটিতে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সমগ্র অনুচ্ছেদে আছে দুটি কথা—যথা দুঃখ এড়ানো যায় না, তা উত্তীর্ণ হতে হয়। কর্তব্য উদযাপনে সুখ দুঃখ যা আসুক, তা মাথা পেতে নিতে হবে—ঐ বাক্য দুইটি তাহলে 'Precis' 'সার' 'চুম্বক' ?]

২। "নভেলের মত এই মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এ দেশে আমদানি। ·········নভেল এবং মাসিক পত্রিকার শস্যসম্পদ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।"

নভেল ও মাসিক পত্র বিদেশ হইতে আমদানি। অতএব উহা আমাদের দেশীয় জিনিস নয়, দেশীয় হইতে পারে না—এই যুক্তি অত্যন্ত অসার। কোনো কালে ভারতবর্ষ বিদেশীয় সম্পদকে আপনার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই—এমনকি বিদেশীয় পেঁপে, আলুর বীজ পর্যন্ত আমরা এদেশে ফলাই। বঙ্কিমচন্দ্র নভেল ও মাসিকপত্রের সেই বীজকে স্বদেশের জমিতে ফলাইয়াছেন,—দেশের মাটি সেজন্য তৈয়ারী করিয়া লইবার পথও দেখাইয়া গিয়াছেন। উহারা আমাদের দেশীয় হইয়া গিয়াছে।

৩। "ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির······হীনতা আপনার মনে।"

শত শতাব্দীর শোষিত জনসমাজ যুগ যুগান্তরের অত্যাচার, সকল অন্যায় উৎপীড়নকেই ভগবানের বিধান বলিয়া মানিয়া লয়। ইহাদিগকেই জাগাইতে হইবে। বুঝাইতে হইবে অপরাজেয় শক্তির ইহারা অধিকারী; অন্যায়কারী তো কত তুচ্ছ, ভীরু, হীনাতিহীন। শুধু প্রয়োজন এই মূক জনসাধারণের একবার একত্র হইয়া দাঁড়ানো।

[দ্রষ্টব্য : 'মর্মানুবৃত্তিকে' Precis বলা অপেক্ষা বোধ হয় Precis অর্থে 'বস্তু-সংক্ষেপ' বলা শ্রেয়ঃ। Summary অর্থে মর্মানুবৃত্তি শব্দটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রেখে বিষয়-সংক্ষেপ-শব্দটিকে শুধু Precis অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।]

সারাংশ-লিখন ও সারসংক্ষেপ

[নিদর্শন]

[এই পদ্যাংশ বা কাব্যাংশ সমূহ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো না। অংশগুলি সবই Higher Secondary Test Papers I (1960) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা পাশেই উল্লেখ করা হলো।]

'ভাবসত্য' প্রকাশ করার অর্থ—যে ভাবটি মূল গদ্যাংশ বা পদ্যাংশে 'সত্য' তা প্রকাশ করা। প্রকাশ ছোট, বড় বা মাঝারি আবশ্যক মত সবই হতে পারে।

১। সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন ?···কাংস্য ও রজতের ন্যায় মধুরনাদী। (কমলাকান্ত) (শৈলেন্দ্র সরকার স্কুল। পৃঃ ৯১-৯২)

যৌবনে আশার ডাকে মানুষ জীবন সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে—তখন সবই মনে হয় উজ্জ্বল, কমনীয়, স্পৃহনীয়। ক্রমেই আশা ফুরাইতে থাকে—তখন যতই সুখ সম্পদ আয়ত্ত হউক মানুষ বুঝিতে পারে যে উহার শেষ নাই; সংসার- চক্রে সে শুধু পাক খাইয়াই চলিতেছে। অভিজ্ঞতায় তাহার সঞ্চয় বাড়ে কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাতেই তাহার আশা ক্ষয় হয়। জীবনের মোহমুক্ত বাস্তব রূপ তাহার নিকট প্রতিভাত হয়।

২। **সারসংক্ষেপ** কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'abstract' হলেও সব সময়ই সংক্ষেপ করা যায় না। বিশেষতঃ মূলে যদি বক্তব্য এবং তুলনা ওতপ্রোত হয়ে থাকে।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই·········সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানোই ভাল। কমলাকান্ত।

(হাওড়া জেলা স্কুল। পৃষ্ঠা—১০৩)

কমলাকান্ত পরিহাসের ছলে বলিতেছেন—মনুষ্যমাত্রই ফল। বড় মানুষ-দিগকে তিনি বলিতে চান ফলের মধ্যে কাঁঠাল ফল—কেহ গুণহীন, কেহ রসাল। আবার কেহ শৈশবেই ঝরিয়া পড়ে, কেহ ইঁচড়ে পাকিয়া নষ্ট হয়। মাকাল হইলেও কেহ কেহ কুচক্রীদের কবলে পড়ে, কাহাকেও শিয়ালের মত চাটুকারেরা পাইয়া বসে, কাহারও চারিদিকে ভালমন্দ অনুগ্রহ প্রার্থীরা মাছির মত ভন্ ভন্ করে—দাও, দাও। ধনের সার্থকতা একমাত্র সজ্জনের পরিপোষণে।

৩। এরূপ মূল রচনাংশের paraphrase করা কিম্বা ব্যাখ্যা করাই প্রয়োজন। যথা :—কমলাকান্ত রসিকতা করিয়া বলিতেছেন, মানুষ মাত্রই ফল, আর বড় মানুষ যেন কাঁঠাল ফল। কাঁঠালের নানা জাত, নানা অবস্থা—বড় মানুষদেরও তাহাই। যাহারা কেহ কেহ সংসারের তৃপ্তিসাধন করে—অনেকেরই সেই গুণ বা শক্তি নাই। আবার ধনী সন্তানেরা অনেকেই ইঁচড়ে পাকিয়া নষ্ট হয়। অনেককেই যৌবনারম্ভেই কুচক্রীর কবলে পড়িতে হয়। যাহারা মানুষ হইয়া উঠে শিয়ালের মত অমাত্য পরিষদ দেওয়ান গোমস্তা মিলিয়া তাহাদেরও উৎসন্ন দিতে চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া বড় লোকের চারিদিকে অনুগ্রহ প্রার্থী আত্মীয় পরিজন, গুরু পুরোহিত অর্থের লোভে মাছির মত আসিয়া ভন্ ভন্ করিতে থাকে। অবশ্য যে বড়লোক পরোপকারে বিমুখ তাহার ধনও ব্যর্থ, পূতিগন্ধময়। তাই কমলাকান্ত পরিহাস ছলে বলিতেছেন ধনীদের কর্তব্য যথোপচারে সৎমানুষের পরিপোষণ।

৪। **সংক্ষিপ্তসার**—[অনেকটা ইংরেজী substance]

ইহার চেয়ে হতেম যদি············সিন্ধু মাঝে লুটে। রবীন্দ্রনাথ।

(শিলিগুড়ি বয়েস্ হাইস্কুল। পৃষ্ঠা ১৫৬)

তথাকথিত শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মত মাথা নীচু করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে আমি চাহিনা। বরং আরবের বেদুইনের মুক্ত, দুর্দান্ত জীবন অনেক মহনীয় কঠিন, দুঃসাহসিক সাধনায়, মরুতে, প্রান্তরে, আকাশে, সমুদ্রে প্রাণোল্লাসে, ছুটিয়া বেড়াইয়াই আমি সার্থক হইব।

[আরও সংক্ষেপে সারটুকু দেওয়া যায়। যথা :—আরামের অনায়াস জীবন তুচ্ছ জিনিস। প্রাণস্ফূর্তিতে দুঃসাহসিক সাধনাতেই জীবনের সার্থকতা।]

৫। 'বক্তব্য সহজ ও কম কথা লেখা।' যেখানে তুলনার সাহায্যে বক্তব্য বলা যায়, সেখানে তুলনাধারা কমাতে গেলেও একেবারে বিলুপ্ত করা যায় না।

তারপর যশের ময়রাপটি······শুধু সেলামে দেড়মণ লইয়া যাইতেছে।

কমলাকান্তের দপ্তর। (কেশব একাডেমী। পৃষ্ঠা ৯৮)

পরিহাসছলে কমলাকান্ত বলিতেছেন যে যশ, সুনাম প্রভৃতি যেন মেঠাই। চারিদিকে উহার কেনাবেচা চলিতেছে। খবরের কাগজের সুনাম, [illegible] যেন গুড়ের সন্দেশ—ছানা বা সত্যের সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। [illegible] মানুষ কাগজের নামের লোভে পাগল—সংবাদপত্র লেখকেরাও উহা বেচিয়া, [illegible]নে যেমন পারে স্বার্থসিদ্ধি করে। রাজপুরুষেরা বিক্রয় করে রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব—কেহ তোষামোদ করিয়াই তাহা পায়, আবার কেহ তাহার জন্য দেউলিয়া হইতেছে।

৬। ভাবার্থ

সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুশী...
............পেলাম না আর খুঁজে
(বাঁকুড়া জিলা স্কুল। পৃষ্ঠা ২৫১-২৫২)

শিশুকন্যাকে হারাইয়া পিতা আপন চারিদিক শূন্য দেখিতেছেন। অতি ছোট খেলনায়, সামান্য আদরে সে শিশু খুশী হইত। ছোট হইলেও সেকথায়, খেলায় ঘর ভরিয়া রাখিত—সহজেই সে অন্ধকারকে ভয় পাইত তবু সে চলিয়া গেল অজানা, অন্ধকার দেশে। তাহার অভাবে ঘরতুয়ার সব যেন খালি, সব অন্ধকার।

৭। সারমর্ম

পঞ্চবটী বনে মোরা............
.........বলে বরিতাম তারে।
(খড়্গাপুর সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে হাই স্কুল। পৃষ্ঠা ২৮০-৮১)

সরমার নিকট সীতা তাঁহার পঞ্চবটী বনে বাসকালীন জীবনযাত্রা বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চবটী বনে সীতা ও রামচন্দ্র পরমসুখে ছিলেন। সরোবরে, পদ্মবনে, বনমর্মরে অপূর্ব সেই বনশ্রী! কখন ঋষিপত্নীদের আগমনে তাঁহাদের কুটির পবিত্র হইত, কখন সীতা ছায়ার সঙ্গে কথা বলিতেন, হরিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেন, তরু ও লতায় বিবাহ দিতেন। নবমঞ্জরী ও ভ্রমরকে বলিতেন তাঁহার নাতিনী, নাতজামাই। সকলেই যেন প্রাণবান, তাঁহার আত্মীয়।

৮। সারমর্ম : "কে বলে হত্যা পাপ......উপলক্ষ হইলাম।"

[বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মডেল স্কুল পৃঃ ৩১০]

হত্যা পাপ এই সত্য নক্ষত্র রায় বুঝেন। কিন্তু রাজ্যলোভে তিনি হত্যার সমর্থনে যুক্তি খুঁজিয়া এইরূপে তিনি আত্মপ্রতারণা করিতে চাহেন:—পৃথিবীর চারিদিকেই মৃত্যু, সংসারত হত্যাশালা। কত কীট প্রতিমুহূর্তে আমরা গ্রাস করিতেছি, পদতলে দলন করিতেছি। ইহাই মহামায়ার নিয়ম—সেই নিয়মেই কোটি কোটি জীব বলি হয়। আমি যদি হত্যা করি সেই নিয়মেরই আমি উপলক্ষ মাত্র হইব। আমার পাপ কোথায়?

৯। ভাবার্থ : বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটা জায়গায় মিল

..একজন যেখানে সত্যের অন্যজন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করে।

[বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মডেল স্কুল পৃঃ ৩১১]

সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক তাহা ব্যতীত

আরো কিছু দেখেন। বৈজ্ঞানিক বস্তুটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন—উহার মধ্যে কি সত্য, কি নিয়ম নিহিত আছে, তাহাতে কী অসাধ্যসাধন সম্ভব। সাহিত্যিক দেখান উহার সৌন্দর্য—সেই সৌন্দর্যে আমাদের মন প্রাণ কত উন্নত হয়। দুইজনেই সেই অসাধারণ দৃষ্টির [illegible]া সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ বলিয়া জানেন।

১০। **সংক্ষিপ্ত সার:** "অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ…………মনুষ্য মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।"

[বেথুন কলেজিয়েট স্কুল পৃঃ ৩২৭]

স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হেলম্ হোলৎজ্ এর অদ্বিতীয় মণীষার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—মূলতঃ বিজ্ঞান ত্রিবিধ। যেমন বাহিরের জগতের নানা বস্তু পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু সেই সব বস্তুকে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান গোচর করে। জীব বিজ্ঞান ও শারীর বিদ্যার বিষয় জীবের দৈহিক ও স্নায়বিক প্রক্রিয়া। কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহ যে বাহিরের তথ্য মস্তিষ্কে বহন করিয়া আনে, মন বা অন্তঃকরণ তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া লয় বলিয়াই আমরা জগৎ বস্তুকে জানিতে বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে পারি। মনোবিজ্ঞানের বিষয় মনের এই জ্ঞানের ও অনুভূতির প্রক্রিয়া। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জন্য এই তিন বিজ্ঞানই অপরিহার্য। হেলমহোলৎজ এর মতো একই কালে এই তিন বিজ্ঞানের সাধনা কেহই করেন নাই।

১১। **মর্ম** অর্থে (precis): মনুষ্যের কতকগুলি এমন বিপদ আছে…… ……এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত দুঃখই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। [হিন্দুস্থান স্কুল পৃঃ ৩৮২]

মৃত্যু শোক-দুঃখ প্রভৃতি কোন কোন বিপদকে মানুষ এড়াইতে চাহিলেও তাহা সংসারের অমোঘ বিধান। অতএব তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াই কর্তব্য পালন করিতে হয়—ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

[আরও সংক্ষেপেও precis হয়—যদি প্রশ্নের নম্বর দেখে মনে হয় তা'ই প্রার্থিত। যথা—শোক দুঃখ সংসারের অনিবার্য বিধান, তৎসত্ত্বেও কর্তব্য-পালনই মানুষের মনুষ্যত্ব]

১২। **'সংক্ষেপে' লেখা** অর্থ Summary। ঘটনাব[illegible] সংক্ষেপ করা কঠিন নয়—যথা, 'সীতার বনবাসের' সীতার দেহত্যাগ বর্ণনা [illegible]

সীতা বাল্মীকির দক্ষিণপার্শ্বে…………মানবলীলা সংবরণ করিয়[illegible]

[বীরভূম জিলা স্কুল। পৃঃ ৩[illegible]]

সরলা সীতা রাজসভায় (আবার অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব শুনিয়া) হ[illegible] হইয়া পড়িয়া গেলেন। লব কুশ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। [illegible]

এতক্ষণ রাজোচিত ধৈর্যে বসিয়া থাকিলেও এবার মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৌশল্যারও সেই অবস্থা। উর্মিলা প্রভৃতি ক্রন্দনে আকুল, রাজসভার সকলে হতবুদ্ধি। লক্ষ্মণ ভরত প্রভৃতি রামের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। বাল্মীকি সীতার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া বুঝিলেন সীতা আর নাই।

[আরও সংক্ষেপে সারকথা লেখা যায়। কিন্তু, তাহাতে অংশটির প্রাণ-বস্তু বর্জন করিতে হয়, উহাতে ভাবসত্য থাকে না। যথা,—সীতা শুনিবামাত্র অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র মূর্ছিত হইলেন, রাজসভার সকলেই হতবুদ্ধি। ক্রমে রামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করিলেন, কিন্তু দেখা গেল সীতার দেহ প্রাণহীন।]

১৩। **'ভাব বিশ্লেষণ'** অর্থে কি বোঝায়? মূলভাবের বিশ্লেষণ না নির্দেশ সংক্ষেপ না প্রসার?

'বিশ্লেষণ' ইংরেজী analysis এর সমার্থক শব্দ। কিন্তু বাংলায় ভাব-বিশ্লেষণ সহজবোধ্য কথা নয়।

প্রধান সমাজপদে আজি প্রৌঢ় আমি

....

বুঝিছ স্পর্শনে।

[বীরভূম জিলা স্কুল। পৃষ্ঠা—৩৪১]

মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে এই বিশ্বে অণু পরমাণু হইতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্ভব, বিলয় ঘটিতেছে—সর্বব্যাপী অস্থির, দুর্বার, গতিময় সেই বিবর্ত-শক্তি চিন্তা করিলে তাঁহার উদ্দেশ্যে মাথা নত করিতে হয়।

['বিশ্লেষণ' অপেক্ষা এইরূপ কবিতার ব্যাখ্যাই বেশি প্রয়োজন।]

১৪। **'সংক্ষিপ্ত সার'** (Precis অর্থে): নিহিতার্থ বিষয়ের সারকে সংক্ষেপ করতে হলে বেশ যত্ন নিতে হয়।

দেখ, শয্যাশায়ী মানুষ............

............তাহার দণ্ড হয় না কেন?

[শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৩৫৩-৫৪]

...লের দুগ্ধচুরি সমর্থনচ্ছলে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সামাজিক সত্যের ইঙ্গিত ...েন। চুরি করিতে যাইয়া যদি কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করে তবে সে ... করেনা, কারণ সে প্রাণের দায়ে চুরি করিয়াছে, সাধ করিয়া করে ... বরং যাহারা প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও অভাবগ্রস্তকে বাঁচায় না, ...রাই সমাজকে বঞ্চিত করে, তাহারাই চোর।

১৫। **'ভাবার্থ'** লিখলে অর্থ পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

এই লোক হিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া........অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রাণোদ...।

[...কৃষ্ণ মিশন বয়েজ স্কুল। পৃষ্ঠা ৩৬৮]

পাশ্চাত্য দেশে লোকহিতৈষণা; মানবপ্রীতিরূপে পরোপকার বৃত্তির এক বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। সেখানে প্রত্যেকেই সাধারণতঃ নিজ নিজ ব্যক্তি জীবনের বিকাশ চেষ্টা করে। কিন্তু জীবনের এক বিরাট স্ফূর্তি তাহাদিগকে যেন ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেয় না। মহৎ কর্মে, মহৎ সাধনায় বিশ্বমানবের সেবায় আপনাকে ছড়াইয়া দিতে পারিলেই যেন তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সার্থক। মানবহিতৈষণাও যেন তাহাদের ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশের এক রূপ।

১৬। 'মূল ভাব' বা 'মর্ম' বা 'সার-সংক্ষেপ' করা সব সময় সহজবোধ্য হয় না। যেমন ১৫নং উদ্ধৃত গদ্যাংশের 'মর্ম' বা 'ভাবসংক্ষেপ' কিরূপ হবে?

পাশ্চাত্য দেশের মানুষ যেন প্রাণাবেগে কেবলই আত্মপ্রকাশ করিয়া চলে। তাই মহৎ প্রচেষ্টায়, বিশ্বহিতৈষণায় ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন ও তাহাদের ব্যক্তিত্বের ধর্ম হইয়া উঠিয়াছে।

১৭। **ভাবার্থ ঃ**

প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
....
বিভু, কি দশা হবে আমার?

[রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম্। পৃষ্ঠা ৩৬৭-৬৮]

কবি নিজে অন্ধ হইয়া পড়িয়া খেদ করিতেছেন, সূর্য, চন্দ্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্য আর দেখিতে পাইব না, জীবজগতের প্রাণীদেরও আর দেখিব না, আপনার পুত্রকন্যার মুখ দেখিতে সকলেরই আনন্দ, আমার পক্ষে এখন সেই সব সুখও কল্পনার বিষয়, সবই যখন যাইতেছে তখন আমাকে ভগবান গ্রহণ না করিলে আর উপায় কি?

ভাব-সম্প্রসারণ (Amplification)

বলা বাহুল্য প্রথম বার কয়েক পড়ে বুঝে নিতে হয় লেখায় কোন বা ভাবসমূহ রয়েছে। সেই ভাব বা ভাবসমূহ বিস্তৃত বা প্রসারিত করাই উদ্দেশ্য; ভাবকে যুক্তি দিয়ে, আনুষঙ্গিক ভাবনা দিয়ে পরিমাণ মতো অল... জুগিয়ে বাড়িয়ে লেখাই হল কাজ। অবান্তর ভাব ও অপ্রাসঙ্গিক কথার...

সম্প্রসারণেও নেই। বিষয়টি যদি গুরুতর হয় তা হলে দীর্ঘ রচনাও সম্ভব, না হলে সম্প্রসারিত করার অর্থ বিস্তৃত আকারে প্রকাশ। কিন্তু আকার অপরিমিত বড় হতে পারে না।

নিদর্শন

। ১ ।

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

ধ্বনি উঠিলেই তাহার পিছনে পিছনে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন কেহ ব্যঙ্গ করিল। অথচ প্রতিধ্বনির নিজের কোন জীবন নাই। ধ্বনি হইতেই তাহার জন্ম, ধ্বনির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও বিলুপ্তি। যেইটুকু তাহার জীবন, শক্তি ও সামর্থ্য সবই মূল ধ্বনিটির জন্য—তাহাকে বিকৃত করাই প্রতিধ্বনির স্বভাব।

ইহা যেন সংসারেরও একটা গ্লানিকর নিয়ম। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইল তাঁহাকেই যেন নিন্দা না করিয়া, আঘাত না করিয়া সে পারে না। অর্থ বা বৈষয়িক সহায়তার কথা ছাড়িয়া দিই, যিনি দান করেন ও যিনি গ্রহণ করেন, প্রায়ই দেখা যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক আর বর্তমান থাকে না। যিনি সাহায্য করিয়াছেন তিনি যদি বা তাহা ভুলিতে পারেন, যিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তিনি এই কথাটাই স্মরণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন যে, তিনি কোনো দিন তাহার পরিপোষকের তুলনায় ছিলেন নিম্নতর অবস্থার পুরুষ, ধনশক্তিতে খর্বিত। কোথায় তাঁহার মর্যাদাবোধ এমনি ঘা খাইয়া থাকে যে পৃথিবীর কাছে ও নিজের কাছে উপকারীকেও টানিয়া কিছুটা নামাইয়া ফেলিতে পারিলেই একটু স্বস্তি বোধ করেন না, উহার স্থান উপরে নয়, কেহই তাহার অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদার দাবি করিতে পারে না। ইহার উপরে যদি আবার দুইজনার কাহারও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে তাহাদের সম্পর্ক আরও জটিল হইয়া উঠে। উপকারী ত তখন ভুলি[illegible]তে পারেন না [illegible]ছিলেন উত্তমর্ণ আর অপরে অধমর্ণ; উপকৃত কিছুতেই মানিয়া লইতে [illegible] যে, একদিন কেহ তাহাকে উপকার করিয়াছিল বলিয়াই তিনি [illegible]দনকার মত অধমর্ণ হইয়া রহিবেন।

অর্থ বা অর্থকরী সাহায্যই যে এই অর্থ-সর্বস্ব যুগে মানুষে মানুষে সম্পর্কের [illegible]টি সৃষ্টি করে শুধু তাহা নয়। অন্য ধরনের সাহায্যের পরিণতিও যে রূপ ঘটে তাহা আমরা জানি। বিদ্যাদানের কথাই ধরা যাউক। কিম্বা এরূপ শিল্প-সংহতিমূলক অনুরূপ সহায়তার কথাই ধরা যাইতে পারে।

পূর্বগামীর বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়াই পরবর্তী প্রত্যেকের দাঁড়াইতে হয়। আজ যদি কেহ দুই পদ সম্মুখে বাড়াইয়া থাকেন, তাহার কারণ অন্য অনেকে তাহাকে দীর্ঘপথ বহন করিয়া আনিয়া নিজেদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়জন নিজের কৃতিত্বের মুহূর্তে আজ সেই পূর্বগামীদের দান স্বীকার করিতে পারেন? বরং তাহাদের [illegible]পূর্ণতার ব্যাখ্যাতেই অনুবর্তীদের যত উৎসাহ। অথচ কি বিদ্যার ব্যাপারে, কি অর্থের ব্যাপারে কাহাকেও না কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা বাঁচি। সেই সত্য স্বীকার করিতে অমর্যাদা কোথায়? বরং তাহা স্বীকার করিবার মধ্যেই একটা গভীরতর মর্যাদা আছে, মহৎ দৃষ্টির ও সততার পরিচয় থাকে। কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যেই ইহার বিরোধী একটি বিকৃতির বীজ রহিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতিধ্বনি কিছুতেই ধ্বনির কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করিতে চাহে না। ইহা যে বিকৃতি তা বুঝিয়া সত্যকে স্বীকার করিলেই বরং মানব-প্রকৃতির যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয়।

[২]

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোটফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ বলে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে 'ভাল আছ, ভাই।'

পুষ্পোদ্যানে অজস্র পুষ্পভার। বাগান আলো করিয়া আছে অভিজাত ফুলের দল। বর্ণে-গন্ধে-রূপে ঐশ্বর্যে কে কাহাকে ছাড়াইয়াযাইতেছে তাহাই বুঝা যায় না। ইহারই পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী নামগোত্রহীন ফুলও ফুটিয়াছেতাহা কে দেখে? সেই পরিচয়হীন ফুলকে দেখিলে লজ্জায় ধিক্কারধ্বনি উঠিবে 'ইহাও যদি ফুল হয়, তবে ফুলের বংশে আর মহিমা কি রহিল? এই তুচ্ছ, অখ্যাত অজ্ঞাত পরিচয় স্বজাতীয়ের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা স্বীকার করিতে গেলে যে নিজেদের মর্যাদা আর কিছু থাকিবেনা। ফুলের দল যখন আভিজাত্যের দর্প, শঙ্কা ও বিরূপতায় আপন আত্মীয়কে অস্বীকার করিতেছে সেই সময়

[মন্তব্য: বিষয়টি জটিল। মূল ভাবটি বোধ হয় বিদ্যাসাগব মহাশয়ের সেই স্মরণীয় কথাটিতে পাওয়া যায়। কে তাঁর নিন্দা করছে শুনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন "কৈ? [illegible] তার উপকার করিনি। তবে সে আমার নিন্দা করছে কেন?" বিদ্যাসাগরে [illegible] প্রাণ পুরুষ জীবনের শেষে এরূপই প্রায় সিদ্ধান্তে এসে পেঁ ছেছিলেন।

কিন্তু কথাটা মনস্তত্ত্বের প্রশ্ন বলেই জটিল। আমরা মনে করি কৃতজ্ঞতা বোধই [illegible] পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই আর একটা দিকও আছে। [illegible] দিকটিও ভাব-সম্প্রসারণে না হোক্ প্রবন্ধ-রচনায় উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে [illegible] তার আভাস রাখলাম।]

আকাশ আলো করিয়া চরাচর উজ্জ্বল করিয়া উঠিলেন সূর্যদেব। তাহার প্রথম কিরণ-রেখা আসিয়া স্পর্শ করিল প্রাচীর গাত্রের সেই ক্ষুদ্র ফুলটিকে —তাহাকেই যেন করিলেন আলোকের দেবতা, প্রাণের দেবতা, মহামহীয়ান সর্বজীবনের দেবতা—প্রথম সেই সম্ভাষণ "কেমন ভাই, ভাল আছ ত?"

ইহাইতো মহতের প্রকৃতি, উদার-চরিতের নিকট বসুধাই কুটুম্ব।

যে অল্পপ্রাণ সর্বদাই সে সেই অল্পকে আঁকড়াইয়া থাকে। প্রতিনিয়তই ভয়ে দুর্ভাবনায় সে মরিতে থাকে—গেল, গেল, সব বুঝি গেল! যাহা হারাইবে তাহা পুনরুদ্ধার করিবার মত শক্তি, বীর্য, আত্ম-প্রত্যয় কিছুইতো তাহার নাই। তাই তাহার আশঙ্কা প্রতিপদে। বিশেষ করিয়া তাহার বিরূপতা দেখা যায় দুর্বলের প্রতি, দুর্ভাগ্যগ্রস্তের প্রতি, অসহায়ের প্রতি। কারণ, মনে মনে সে জানে—সেও দুর্বল। ভাগ্যবান বা বিদ্বান হইলেও ক্ষুদ্রচেতা মানুষ সাধারণ মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়। কারণ, এই ভাগ্য তাহার অর্জিত নয়। যিনি আপন মহিমার সন্ধান লাভ করিয়াছেন তাঁহার মনে কিন্তু কোনো ক্ষুদ্রতার ছাপ নাই। সূর্যের দীপ্তির মতোই তাঁহার মর্যাদাও স্বপ্রকাশ—সকলকে সমভাবে আত্মীয় সম্ভাষণে গ্রহণ করিতে পারে, ভালবাসে, এবং ভালবাসা লাভও করে। আর সেই সূত্রেই আবার মহত্তর মহিমার অধিকারী হয়। তাঁহার নিকট মাথা অবনত করিয়া অন্যেরাও গৌরবান্বিত হয়।

[৩]

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

দেশই বলি, সমাজই বলি, তাহার প্রতিটি অঙ্গ অপর অঙ্গের সহিত এক-ভাবে সংযুক্ত। একটিকে খর্বিত করিলে শুধু সেই অঙ্গই খর্বিত হয় না, সামগ্রিক ভাবে দেহ খর্বিত হয়, শ্রী বিনষ্ট হয়, স্বচ্ছন্দতা বিঘ্নিত ও কর্মশক্তি ব্যাহত হয়। সকলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সূত্রেই দেশের ও জাতির সামগ্রিক বিকাশ তাহার সম্পূর্ণতা। তাই, যেখানেই জাতির কোন একটি অংশকে ছলে বলে কিংবা অবজ্ঞায় অশ্রদ্ধায় আমরা হীন করি, সেখানেই জা[তিকে]ও হীন [করিয়া রা]খি, তাহার সম্ভাবনাকে খর্বিত করিয়া দিই। যে পশ্চাতে পড়িয়া [রহিল সে]টা বিলুপ্ত হইয়া গেল না; বরং পশ্চাতের সঙ্গে জাতিকে অনড় [করিয়া বাঁ]ধিয়া রাখিল, সমাজের অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করিল।

[এই] কথা ভারতবর্ষের সমাজকে দেখিয়া মনেপ্রাণে গভীর মর্মবেদনার [সহিত] অনুভব করিতে হয়। আমাদের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মস্তিষ্ক [ছিল] বিস্ময়াবহ, সাহস-বীর্যেরও অভাব বোধ হয় ক্ষত্র সমাজের ছিল না।

বৈশ্য ও শিল্পিশ্রেণীর শিল্প-কৌশল আজও পৃথিবীকে চমৎকৃত করে। কিন্তু সমাজ-বন্ধনের প্রয়োজনে এমন করিয়াই আমরা অনমনীয় পদ্ধতিতে গুণ-কর্ম বিভাগের নামে বর্ণভেদ জাতিভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলাম যে, সমাজের জীবন-স্রোত স্বচ্ছন্দ প্রবাহে এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে সঞ্চালিত হইতে পারিল না। প্রতিটী বৃত্তিজীবীকেই তাহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অপরিবর্তনীয় জীবিকা-বৃত্তির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে চলৎশক্তি-হীন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। সর্বোপরি দেশের বিশাল জনশক্তি অস্পৃশ্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আবহমান কাল মানব-মর্যাদা, জীবন-ঐশ্বর্য, আত্ম-বিকাশের সর্বঅধিকার হইতে বঞ্চিত রহিল। ইঁহারাই দেশের মূল শ্রমশক্তি আর শ্রমই সৃষ্টির, ঐশ্বর্যের, জীবনের প্রধান আশ্রয়। সেই শ্রমশক্তিকে প্রাণহীন, চক্ষুহীন, অধিকারহীন করিয়া রাখিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ আপনার ধ্বংসকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। অধিকন্তু বীভৎস বৈষম্যে ঘৃণায় সে এমন করিয়াই সমাজের সর্বাধিক সবল অংশকে নিপীড়িত করিল যে, তাহারাও আর কোনো কারণে মাথা তুলিতে শিখিল না। উৎস খুঁজিয়া পাইলনা। বারে বারে বিদেশীয়, বিজাতীয় আক্রমণকারীদের সম্মুখে লুটাইয়া পড়া ছাড়া এই জাতির আর কোনো পথ রহিলনা। এই শিক্ষাই ভারতীয় সমাজ নিজের জন্য ও পৃথিবীর জন্য তুলিয়া দিয়াছে—সকলের অগ্রগতিতেই সমাজের অগ্রগতি, সকলের বিকাশেই সমাজের বিকাশ।

[৪]

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

মানুষের যেমন মানুষ হিসাবে কতকগুলি অধিকার আছে তেমনি মানুষ হিসাবেই কতকগুলি দায়িত্বও আছে। প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়াই অধিকারও অর্জিত হয়—দুই-ই মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অঙ্গ।

অন্যায় না করা ও অন্যায় না সহা দুইই মনুষ্যত্বের দায়িত্ব। আমার অধিকার ততক্ষণ যতক্ষণ অন্যেরও ঠিক সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি। করিলে তাহা অন্যায় হইবে। সংসারে প্রতিদিনই আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। প্রতিক্ষেত্রেই দেখি প্রবল সে আপন অধিকার অতিক্রম করিয়া অধিকার কাড়িয়া লয়। ইহা সমাজের মধ্যে মানুষে-মানুষে ব্যা ব্যবহারে ঘটিতেছে, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর ব্যবহারেও ঘটিতেছে। এমনকি জাতির সহিত জাতির ব্যবহারেও ঘটিতেছে। পৃথিবীব্যাপী এই অন্যায়ের রূপ দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহার সম্বন্ধে মুখ খুলিবার সাহস পাইনা। অনেক সময়ে আবার হতাশ বোধ করিয়া উদাসীন হইয়া থাকি

দ্বিধাগ্রস্ত হই। ছোট বড় অন্যায় সম্বন্ধে আবার কখনো কখনো মনেকরি—ক্ষমা করাই কর্তব্য। এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মনুষ্যত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করি—নিজে অন্যায়কারী না হইলেও ন্যায়[illegible] হইতে বিচ্যুত হই। কারণ, দুষ্কৃতকারীকে ক্ষমা করিবার [illegible] তখনি জন্মায় যখন দুষ্কৃতি দূর করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি। আমি ভীতি [illegible] বিভ্রান্তির বশে অন্যায়ের প্রতি উদাসীন হইলে তো পরোক্ষে অন্যায়েরই সম[illegible] করি। আপন দায়িত্বে এড়াইয়া যাই।

যিনি মানুষের দেবতা, তিনি ক্ষমাশীল হইতে পারেন, কিন্তু অন্যায়ের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল নন ও উদাসীন নন। তিনি সক্রিয় অন্যায়কারী ও অন্যায়ের সহনশীল নিষ্ক্রিয় সহকারী কাহাকেও ক্ষমা করেন না। আমাদেরও তাই সেই অধিকার নাই।

। ৫ ।

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

দীঘির জলই শৈবালের আশ্রয়, উহাতেই তাহার জন্ম এবং বৃদ্ধি। কিন্তু তাহার নিকট উহা এতই সহজ-লভ্য আশ্রয় যে, উহা ভুলিতে তাহার কোনো বাধাই জন্মে না। বরং এই অতি-পরিষ্কার সত্য স্বীকার না করিবার জন্যই তাহার সমস্ত মনের সমস্ত সচেতন প্রয়াস। রাত্রির শিশির আকাশ হইতে সর্বত্রই পতিত হয়, জলে ও মাটিতে কোনো ব্যতিক্রম নাই। তেমনি একটি শিশিরবিন্দু দীঘির বুকে না পড়িয়া শৈবালের মাথায় জমিয়াছে; সেখান হইতে সে গড়াইয়া পড়িল দীঘির বুকে। শৈবাল অমনি সদম্ভে দীঘির জলকে জানাইয়া দিল—কত বিরাট তাহার দান।

বাস্তব সংসারে এইরূপ অকৃতজ্ঞতা ও অন্তঃসারহীন দম্ভের পরিচয় আমরা কম পাই না। প্রতিনিয়তই দেখি আপনার সামান্য উপকারটুকুর কথাও বাড়াইয়া, ফলাইয়া বলিবার জন্য মানুষের কী কুণ্ঠাহীন নি[illegible]র্লজ্জ প্রয়াস। যে [illegible]জে আমরা জন্মিয়াছি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের জীবন, তাহার [illegible]হজ অবারিত ঔদার্য মনে রাখিলে কোন্ মানুষ—আমরা যত বড়ই [illegible] রাজা বা বাণিজ্যপতি হই,—মনে করিতে পারি, 'আমি দাতা, সমাজ [illegible]র নিকট কৃতজ্ঞ থাকুক।' বিরাট সেই জলাশয় হইতেই আমি যাহা লাভ [illegible]য়াছি, তাহার কতটুকু তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছি? এই চিন্তাই বরং [illegible]বুদ্ধি নিরভিমান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারে এই বোধ [illegible]র্লভ। বরং দেখি যে যত ক্ষুদ্রমনা, সেই তাহার উদারতার বড়াই করিতে ততই সমুদ্যত। ততই বৃহৎ মূল্য আদায় করিবার জন্য তাহার উদ্ধত দাবি।

প্রসারিত জীবনে তাহার দান হয়ত শিশিরকণা মাত্র, কিন্তু তাহাকেই অক্ষয় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাহার হাস্যকর স্পর্ধা। অথচ, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, সেই শিশিরবিন্দুটিও হয়ত তাহার স্বোপার্জিত নয়—উদার আকাশের দান, প্রকৃতির আশীর্বাদ। মানুষের একটা ভ্রান্ত অহঙ্কার দান কথাটাকে আশ্রয় করিয়া জমিয়া থাকে। মহাপ্রাণ ব্যক্তি অবশ্য আপনার কাজকে দান বলিয়া হিসাব করিয়া রাখিবার কথা ভাবেন না। আর সুস্থ আত্মচেতনা থাকিলে তিনি বোঝেন উহা তাহার দান নয়—সমাজের নিকট তাহার প্রাপ্য প্রত্যর্পণ।—বরং ইহার মধ্য দিয়াই আপনাকে সার্থক করিবার সে সুযোগ পাইল।

। ৬ ।

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভুল ভ্রান্তি ভরা এই সংসার। মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বও চলিতেছে। প্রতি মানুষের হৃদয়ে আছে সেই দেব-দানবের চিরন্তন সমুদ্র-মন্থন। সে মন্থনে অমৃতও উঠে—গরলও উঠে। অমৃতের সন্তান হইলেও মানুষের অস্বীকার করিবার উপায় নাই হলাহলের তৃষ্ণায়ও বারে বারে সে আপনার সেই জন্মাধিকারেরও অমর্যাদা করে। এই তৃষ্ণাকে সে রোধ করিতে পারে নাই, তাহার মানবপ্রকৃতি আপনার অন্তরের পশুপ্রকৃতিকেও সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। তাই মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের দাবিতেই তাহাকে আত্ম-সংযম করিতে হয়। সমাজে, রাষ্ট্রেও সেই পশু-প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে হয়, দণ্ডদান করিতে হয়—না হইলে সমাজ-বিন্যাস বিপর্যস্ত হইবে, মানুষের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাও ক্ষুণ্ণ হইবে।

কিন্তু বুঝিবার মত কথা এই যে, এই দণ্ডদান, এই শাসন, ইহা প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা নয়। দুষ্কৃতি-নিয়মন হইলেও দুষ্কৃতকারীর নির্যাতন নয়। এ কি 'পাপ বিদায় হইল' এই মনোভাব লইয়াও পাপীকে বিদায় করিবার কোনো দাম্ভিক বা শ্রদ্ধাহীন প্রয়াসও ইহা হইতে পারে না। বরং দণ্ডের উদ্দেশ্য হইবে দুষ্কৃতকারীরই আত্মোন্নয়ন, তাহার সুস্থ নীতিবোধের, প্রকৃতির পুনর্জাগরণের ও শুভ বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশেরই সুপা[illegible] মমতাময় আয়োজন। না হইলে দুই হিসাবেই ইহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য-[illegible]কারী হৃদয়হীন দণ্ডভোগের ফলে আরও সমাজশক্তির উপর ও শ্রদ্ধা হার[illegible] নিজের শুভ-শক্তির উপরও শ্রদ্ধা হারাইবে। আর সমাজই কি [illegible] করিল? সে বিভ্রান্ত মনুষ্যত্বকে আরও ক্ষুব্ধ করিল, তাহার অন্তরের

পড়া সমাজবুদ্ধি, কল্যাণবোধকে বিকশিত হইতে দিল না। অপরাধীর মানবচেতনা জাগ্রত হইবে, আপনার কল্যাণশক্তিকে সে আবিষ্কার করিবে, মানববিচারের ইহাইত মূল উদ্দেশ্য। দণ্ডের সহিত তাই প্রয়োজন মমতা, দণ্ডিতের প্রতি সহমর্মিতা, তাহার [illegible] আত্মীয়তাবোধ। তাহাতেই বিচারের সার্থকতা।

। ৭ ।

অদৃষ্টেরে শুধালেম, 'চির দিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?'
সে কহিল 'ফিরে দেখো', দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি ॥

বর্তমান পৃথিবীতে কাহারও দাঁড়াইবার স্থান নাই। সব যেন ধাক্কায় ধাক্কায় এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত বিচ্ছুরিত। আমার লক্ষ্য হইতে আমাকে ঘটনাস্রোত এমনি করিয়া অমোঘ বলে টানিয়া ছিনাইয়া লইতেছে যে আমি আর সেই লক্ষ্যকে মনের চোখেও আর লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই না। যদিই বা কখনো সেই লক্ষ্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে যাই, দেখি নিয়তির এ কী পরিহাস! আমি যাহার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি স্রোতের দুর্বার তাড়নায় তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই পারিলাম না, অথবা অগ্রসর হইতে হইতেও স্রোতের টানে অন্য ঘাটের দিকে বহিয়া গেলাম। হয়ত আবর্তে পাক খাইয়া খাইয়া কোনো ঘাটেরই নাগাল পাইলাম না। কোথায় ইহার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা, কোথায় ইহার মধ্যে মানুষের সদিচ্ছা ও সৎ প্রচেষ্টার মর্যাদা? কীইবা ইহার অর্থ—এই অর্থহীন প্রচেষ্টার।

একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে আসলে মানব-চেষ্টার এই বিপর্যয়ও অর্থহীন নয়—বিশৃঙ্খল, নিয়ম-বর্জিত কোনো নীতি-নিয়ম-হীনা নিয়তির ছিনি-[illegible]নি খেলা নয়। সকলই নিয়মের অধীন। কার্য-কারণ সূত্রে সকলেই [illegible]ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির বা সমাজের ভাগ্যও তাহা ছাড়াইয়া আপন নিয়মে [illegible]তে পারে না। পারে না বলিয়াই আমার আত্মতান্ত্রিক নিয়মের অপঘাত [illegible] আমি মনে মনে বিশ্ব-নিয়মকে অস্বীকার করি[illegible]। আমার ব্যক্তি-[illegible]ার কথাই ধরা যাউক। হয়ত ধরিয়া লইলাম দুইই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, [illegible]কার্যক্ষেত্রে দেখিলাম তাহা সার্থক হইল না। ইহার অর্থ কি? [illegible]ণ করিলে দেখিব আমার আয়োজন যদি ষোল আনা নির্ভুলও হয়, তবু [illegible] হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছে এমন নয়। আমার পূর্বে অনেকেই [illegible] [illegible]তে নানা দান যোগাইয়াছেন। আমার পার্শ্বে থাকিয়া আমারই অজ্ঞাতে [illegible]নুষ, বহুক্ষেত্রে যে সতত কর্মে নিয়োজিত, তাহাদের দানও মিথ্যা নয়।

হয়ত সমগ্রের মধ্যে আমার দান মিলিয়া মিশিয়া আপন শক্তি উজার করিয়া দিয়াই সার্থক হইয়াছে। সমগ্র শুধু একার দানে সমগ্র হইয়া উঠে না; আর একাও শুধু একা নয়; তাহার মধ্যে পূর্বদের ও সহযাত্রীদের স্বাক্ষর বিজড়িত; সংহত বা অসংবদ্ধ। তাইতো তাহাদের সাধনা, আমার সাধনার মধ্যে মিশিয়া আমাকেও বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। সামাজিক বা যূথবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষেত্রে এই সত্য আরও স্পষ্ট। কত অতীত যুগের সঙ্গে কত সূক্ষ্ম-স্থূল বাঁধনে আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস বাঁধা, কে তাহাকে খুঁজিয়া দেখে? আবার, আমাদের এই বিচিত্র জটিল বর্তমানও বিচিত্রতর রূপে ও কত দুর্নিরীক্ষ্য পথে আগামী কালের মধ্যে রূপায়িত হইয়া চলিয়াছে, তাহাই বা কে বুঝিতে পারে? আমার স্বকীয় সাধনা যেমন আমা হইতেই প্রারব্ধ হয় নাই; তেমনি আমাতেই তা শেষও হইবে না। আমার মধ্য দিয়া, আমাকে লইয়া সে ভাবী কালের মধ্যেই আমাকেও আমার সাধনাকে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহারই নাম কালস্রোত, যাহা দুর্বোধ্য হইলেও নিয়মহীন কোনো খেয়াল-খুশির দেবতার লীলা নয়, ইতিহাসের মধ্যেই অনন্ত যাত্রা।

['হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।'
এই কবি-উক্তিও কতকাংশে উপরোক্ত ভাবের দ্যোতক।]

। ৮ ।

যথাসাধ্য ভালো বলে: "ওগো আরো ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো?"
আরো ভালো কেঁদে কহে: "আমি থাকি, হায়;
অকর্মণ্য দাম্ভিকের—অক্ষম ঈর্ষায়।"

ভালো-মন্দে ভরা এই পৃথিবীতে নির্বিশেষ ভালো কিছু আছে কিনা, সন্দেহ। কিন্তু যাহা ভালো তাহা হইতে 'আরো ভালো'ও যে কিছু থাকিতে পারে, তাহা সকলেই মানিবে। কারণ, অপূর্ণ মানুষ চিরদিনই পূর্ণতা Perfection-এর স্বপ্ন ছাড়িতে পারে না, সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। মানুষের সাধ্য পরিমিত, পূর্ণতাও তাই চিরদিনই অনায়ত্ত। তাই প্রতি মানুষ যথাসাধ্য এই শ্রেয়ঃকে জীবনে পরিস্ফুট করিতে ... বেশি তাহার নিকট কি প্রত্যাশা করা যায়?

কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন লোকের অভাব, যে অপরের এই সাধ্যমত ভালো করিবার প্রচেষ্টাকে স্বচ্ছন্দ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিতে পারে। প্রায়ই তাহারা অক্ষম ও অকর্মণ্য, এমন কি, অলস ও নিষ্ক্রিয়। ইহাদের বলিতে শোনা যায়—'আরো ভালোও হইতে পারে।' হয়ত তাহা

বারে মিথ্যা নয়। কিন্তু আদর্শের প্রেরণায় যে ইহারা এইরূপ মন্তব্য করে তাহা নয়। আসলে উহা বক্রোক্তি, যে কোনো রূপে কোনো প্রয়াসকে লোক-চক্ষে তুচ্ছ করা। এবং সেই সূত্রে পরোক্ষ এই ইঙ্গিতও করা যে, 'এই আরো ভালো' একমাত্র সমালোচকরাই ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। মহৎ আদর্শ নয়, পূর্ণতার প্রেরণা নয়, কোন উদার পরিকল্পনা নয়—ইহার মূল তুচ্ছ অসূয়া, ততোধিক তুচ্ছ দাম্ভিকতা এবং মূলতঃ নিজের অকর্মণ্যতা। না হইলে যিনি কর্মপ্রাণ, শক্তিমান কিম্বা বুদ্ধিমান ও সুস্থচিত্ত তিনি বৃহত্তর সার্থকতার অধি-কারী হইলেও বুঝেন প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রয়াসও কত মূল্যবান। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করেন—অপূর্ণ মানুষের সার্থকতাতো এইখানেই যে, তাহার ক্ষমতা যত সীমিতই হউক আপনার সাধ্যানুযায়ী ভালো করিতে সে অবহেলা করে নাই। ভালোর উদ্দেশ্যে আপন শক্তিকে নিয়োগ করিয়া উহা সার্থক করিয়াছে।

(ইহার অনুরূপ ভাবের গদ্যোক্তি :

"অক্ষমতাই মহত্ত্বের উপর বিদ্বেষের প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সর্বদাই খাটিয়া যাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া দেয়।")

। ৯ ।

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম।
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম॥
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি।
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী॥

জগন্নাথের রথ চলিয়াছে। ভক্তির আবেগের আতিশয্যে মানুষ সেই রথ, সেই পথ, সেই বিগ্রহ প্রতিটি বস্তুরই সম্মুখে আপনার উদ্বেল অর্ঘ নিবেদন করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতে চাহিতেছে না। এই ভক্তির লক্ষ্য অবশ্য ভগবানই —তিনি অন্তর্যামী। রথ-পথ, এমন কি বিগ্রহও তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র। সেই উপলক্ষ্য প্রায়ই লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ভক্তের হৃদয়াবেগ ভক্তির আকারে যে দিশাহারা হইয়া আপনারও বিস্মৃতি ঘটায়, তাহাও । পূজা বলি, অর্চনা বলি, মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-আচরণ, পুরোহিত-অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান—এই সবই ভগবৎ-চেতনার বহিরঙ্গ মাত্র। এমন কি তাহা ধর্মের অঙ্গও নয়; কখনো সরল ভক্ত-হৃদয়ের সহজ কামনার রণ, কখনো বা নিতান্তই আবেগবিলাসী হৃদয়ের বাহুল্য। পথের গর্বে গর্বে, বিগ্রহের গর্বেও তাই অন্তর্যামী অন্তরালে বসিয়া কৌতুকে হাসিতে ন। এই ভক্তির যতটুকু সত্য—তাহাও যেমন তিনি জানেন, তেমনি

জানেন এই অনাবশ্যক ... ল্য, এই ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, কতখানি নিরর্থক, কতখানি ভক্তির অপচয়, কতখানি মানুষের শুভবুদ্ধির ও জীবন-ধর্মের অপঘাত। সেইখানে তাহার হাসির সহিত ব্যথা যোগ হয়। মানুষ কেন তাহার মহৎ গৌরবকে এমন করিয়া বিস্মৃত হয়? আর ইহাই তো শুধু ভগবৎ সাধনার বেলাই ঘটেনা—জীবনের বহুক্ষেত্রেই তো মূল আদর্শ অপেক্ষা উহার উপচারকেই আমরা অ...রি নামে বড় করিয়া তুলিতেছি—লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য বড় হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম অপেক্ষা আচার বেশি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আদর্শ অপেক্ষা দলের পূজা পুরোহিত-পাণ্ডার দৌরাত্ম্য এত প্রবল। আদর্শকে ভুলিয়া এই তুচ্ছতাকে লইয়াই মাতামাতিতে আমরা মত্ত। তাই বলিয়া আদর্শ, জীবনের দেবতা। ...ব না। তিনি সত্য আছেন, সত্যই রহিবেন

১০

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসু... ার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি ... াস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

সুখ সুখ করিয়া মানুষ নিয়ত ছুটিয়াছে। কিন্তু সুখ কোথায়? বিপুল কর্মস্রোতের এ পারে কি? এপারের মানুষ বলিবে, 'না না, এপার তো দেখা হইল, সুখ এখানে নাই। বুঝিলাম সুখ ওপারেই রহিয়াছে।' ওপারের মানুষও ঠিক তখনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াই বলিতেছে, 'কোথায় সুখ? এখানে তো তাহার লেশও নাই। যাহা কিছু সুখ সকলই ওপারে।' কেহই জানে না সুখ কোথায়? কিন্তু সুখের আশাতেই সকলে ছুটিতেছে। এপারের ইঙ্গিতে বা ওপারের আভাসে কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, ডুবিতেছে ভাসিতেছে। পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনিবার্য অন্ধকারে তলাইয়া যাইতেছে। আবার তলাইয়া যাইতে যাইতে অনেকে হয়ত ভাসিয়া উঠি... পারের ...না পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল। কিন্তু চোখ... তখন দেখিল সে আশার ছলনা। কোথায় সেই সুখের স্বপন? বিচ্ছুরিত বালুক... তটরেখা শুধুই তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে... এখানে নাই।

মানুষের মন যে স্বপ্ন বুনিয়া চলে তাহা স্বপ্নাঞ্জনে সম্পূর্ণ। বা... কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বাস্তবের কঠিন সীমারেখ... তাহার অন্তরের বিপুল কামনা পক্ষ বিস্তার করিয়া লোক হইতে ... তাহাকে বহন করিয়া চলে। এই সুদূর বিপুল সুদূরের 'বাঁশরী'

কানে একভাবে না একভাবে ধ্বনিত হইতেছে. জানিয়াও জানে না-'মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাশার'। কিন্তু ডানা গুটাইয়া যদি কোনো দিন স্বপ্নকে পৃথিবীর মাটিতে রূপায়িত রিতেও পারি, তাহা হইলেও দেখিব সেই স্বপ্ন আর নাই। স্তবের অলঙ্ঘিত নিয়মে অজস্র হাতের গড়াপেটায় সে সেই ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া িল। আশানুরূপই হয়ত ধন আয়ত্ত করিলাম, কিন্তু কোথায় সেই আশার ? সুখ, ঐশ্বর্যের যাহা কামনা করিয়াছিলাম, হয়ত বিপ্লবের জন্যই ব্যক্তিগত সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, বিপ্লবও আসিল ; কিন্তু কোথায় সেই সমাজ-বিপ্লবের মহিমা যাহা জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম ? সকলই যেন এই বেদনাময় স্বীকৃতি 'যাহা চাই তাহা ভুল করে া পাই তাহা চাই না।'

মানুষের এই জীবনভরা সকল প্রযাসকে একেবারে ছলনা, বা একেবারে মিথ্যা বলিয়া সস্তায় উড়াইয়া দেওয়াও একটা মিথ্যা। ইহার মধ্য দিয়াই তাহার মানব চেতনা আনন্দে বেদনায় সার্থক হয়। ইহাই জীবনের প্রধান কথা। আসল কথা এই জীব া প্রয়াস। সাধনাতেই তাহার সিদ্ধি। এই প্রযাসেই তাহার পুরস্কার। ীবনের রূপায়ন প্রয়াসেই সুখ অজ্ঞাতে আয়ত্ত হইয়া যায়।

[মন্তব্য : বিষয়টি সহজ। বাস্তবজীবন ও আশাব মধ্যে বিবোধিতা রয়েছে। তা নিয়ে বাক্য-বিস্তাব কবাও কবিদেব স্বভাব। কিন্তু কবিরা জীবনবসিক ও মানব-ইতিহাসের চেতনা-সম্পন্ন হইলে বুঝিবেন,—এই যাত্রাতেই আনন্দ। সুখ উহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র কিছু হইলে সে তুলনায় সামান্য। শেষের অনুচ্ছেদটিতে এই ইঙ্গিত করা হল—তা না করলেও সাধারণ দৃষ্টিতে ক্ষতি হত না।]

। ১১ ।

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

ত্তম ও অধম এই দুই প্রান্তের মাঝখানে মধ্যম যেন চিরদিনই অনিশ্চিত । ত্রিশঙ্কুর মত তাহার অবস্থা। সর্বদাই সশঙ্ক-চিত্ত বুঝি এই পরের পদাঘাতে ও নিচেকার আকর্ষণে আ ্যুত হইয়া সে চে অধমের পর্যা গিয়া ঠেকিবে। প্রাণপ াই অধমের সকল াইয়া তাহার না চলিলে উপায় নাই। উপরতলার ভাগ্যবান ও লায় অভাগারা দুইই তাহাকে অধম বলিয়া ভুল করিবে। অবশ্য ছোঁয়াচ বাঁচাইতে চাহিলেও উপরের ছোঁয়াচে তাহার আপত্তি কথা নয়। কোনো সুযোগে যদি একবার উপরের দলে ভিড়িয়া পারে তাহা হইলে সে একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু সেইখানেও

উপায় নাই। প্রথমতঃ উ রতলার ভাগ্যবানেরা মধ্যমের এই উচ্চাশাকে বরদাস্ত করে না। অধম এই প্রয়াস করিলে তাহারা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে কিম্বা উগ্রভাবে তাহা শাসন করিতে পারে। মধ্যম তত অসহায় নয়। তাই মধ্যমের উপরে উঠিবার চেষ্টাকে তাহারা ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষে দেখিয়া বেয়াদবি ম করিবে। না হয় তাহার 'জাতে উঠিবার' চেষ্টাকে বিদ্রূপে অশ্রদ্ধায় এমনভাবে বাধা দিবে যে তাহাতে উপরে উঠা তো মধ্যমের দ্বারা সম্ভব হইবেই না, অধিকন্তু অপমানই লাভ হইবে। মধ্যমও নিজের অনিশ্চিত অবস্থানের জন্য উত্তমের অব সম্পর্কে এতই অস্বাভাবিক রূপে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত উপরতলার সাধারণ স সে মনে করে বক্র-কৃপা, অপমানেরই আরও শাণিত রূপ আর স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে মনে করে—ঔদাসীন্য—অজ্ঞতারই নামান্তর। কাজেই, মধ্যমের পক্ষে লোভ থাকিলেও উত্তমের সঙ্গে সযত্ন ব্যবধান রক্ষা করাই রীতি হইয়া দাঁড়ায়—মধ্যমের স্থানটাই এইরূপ অস্বাভাবিক ও অর্স্বা

মজার বিষয় এই, উত্তম ও অধমে য পার্থক্য এতই অলঙ্ঘনীয় যে কেহই কাহারও সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না। অধম জানে, উত্তম অনেক ঊর্ধ্বে। সেখানে তাহার স্থানলাভ অসম্ভব। আপনা হইতেই সে আনু-গত্যের সম্পর্ক মানিয়া লয়। ঠিক অনুরূপ কারণেই উত্তমের যাহা স্বাভাবিক সদ্‌গুণ তাহাও অধমের সহিত আচরণে ব্যাহত হয় না। তাহার নেতৃস্বভাব এক উদার আভিজাত্যে এই ভূমিজদের সেবায় ও কল্যাণসাধনায় বিকশিত হয়। এমনকি মানব-প্রকৃতির সরলশ্রীও এই ছোটলোকদের মধ্যে সহজেই উত্তম আবিষ্কার করিতে পারে। কারণ, যেখানে মানবতার স্বভাব চাপা পড়িবার কথা সেখানে তাহার সামান্য প্রকাশও বিস্ময়কর। তাই প্রকাশকেও উত্তম সাগ্রহে স্বীকার করিয়া লয়। এইরূপে উত্তম- মধ্যে সদাশয়তা ও আনুগত্যের সূত্রে মানবীয় সহজ সেতুও গড়িয়া পারে।

অবশ্য একটি কথা—সত্য সত্যই যদি এমন দিন আসিয়া পড়ে। বোঝে যথার্থই সে মানবাধিকারে কাহারও অপেক্ষা তুচ্ছ নয়? তাহ জনতার সেই স্পর্ধা কি মধ্যমের অপেক্ষা উত্তমকে কম বিচলিত ক আসল কথা কি ইহাই নয় যে' শ্রেণীর বৈষম্য থাকিলে প্রত্যেকেই প্র সম্বন্ধে সংশয়াকুল থাকে?

। ১২ ।

"দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম। এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়।"

(কমলাকান্ত)

পলিটিক্স বা রাজনীতির সাধারণরূপ আমরা যাহা দেখিতে পাই বঙ্কিম পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন তাহা দুই রূপ। একটি কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। কুকুরের পলিটিক্স প্রভুর পদলেহন, তাঁকে তৃপ্ত করিয়া দুই এক মুষ্টি খাদ্যলাভ। এই পলিটিক্স পরাধীন দেশে তো সর্বত্রই দেখা যায়—ইহাই দাসসুলভ রাজনীতি। এই জাতীয় কৌশলেই কেহ কেহ ক্ষমতাবান বা ঊর্ধ্বস্থদের প্রসাদ লাভ করিয়া জীবনে ভাগ্যবান হন। কিন্তু ইহাতে মনুষ্যত্বের পরিচয় নাই, মর্যাদা নাই, এমনকি অধিকার অর্জনেরও সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় জাতীয় পলিটিক্স বৃষের। সে শক্তিমান। আপন প্রাপ্য পাইয়াছে, এবং যাহা পাইয়াছে তাহাতে কাহাকেও ভাগ দিবে না। সামান্য কিছু চাহিলেই শিং বাগাইয়া তাড়াইবে। ইহা পরস্বাপহারী প্রভুপামর রাজনীতি হইতে পারে, আবার আত্মা[illegible] রাজনীতিও হইতে পারে। যাহা পাইয়াছি তাহাতে অন্যকে হাত [illegible]ব না।

"এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী, অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভেনিহিতা।" (কমলাকান্তের দুর্গোৎসব)

বঙ্কিম কমলাকান্তের চক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাতৃভূমির মূর্তি কল্পনা করিতেছেন। বাংলার অতীত গৌরবময়, বর্তমান দৈন্যলাঞ্ছনাপীড়িত, কিন্তু ভবিষ্যৎ মহিমায় আবার উজ্জ্বল হইবে। কবে, তাহা কে বলিবে? কিন্তু তাহার রূপ কি তাহা বঙ্কিমধ্যান করিতেছেন। এই মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার মতই সেই মৃন্ময়ী বঙ্গভূমি কালগর্ভ হইতে সমুত্থিতা হইবেন। অনন্তরত্নভূষিতা জ্ঞানে, বীর্যে, কল্যাণে মহৈশ্বর্যময়ী দেবীমূর্তির মত তিনি প্রকাশিতা হইবেন। সর্বৈশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী ও সর্বজ্ঞানময়ী সরস্বতী তাঁহার পার্শ্বে শোভা পাইবেন। [illegible]ব সেনাপতি কার্তিকেয় ও মঙ্গলদায়ক গণপতি হইবেন তাঁহার সন্তানের মত [illegible]। আর স্বয়ং তিনি সর্ব আভরণময়ী, সর্ব প্রহরণধারিণী, শত্রুবিনাশে বরদানে অকৃপণা : একইকালে তিনি জগন্মাতার মত স্নে[illegible]ত্রী জননী, [illegible]গৌরীর মত আনন্দদায়িনী কন্যা। বাঙ্গালী সচ্ছল হইবে, ভাগ্যবান [illegible]নী হইবে, গুণী হইবে, শক্তির অধিকারী হই[illegible]বার স্নেহকরুণায় [illegible]লন করিবে ইহাই ছিল বঙ্কিমের স্বপ্ন।

[illegible]কস্থিতি ধর্মের আশ্রয়—সাহিত্য লোকস্থিতির সহায়। অতএব [illegible]কে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।"

[illegible]কালে সাহিত্য ছিল 'রিলিজিয়নের' অনুচর। দেববিশেষের মহিমা- কিংবা বিশেষ ধর্মসংস্কারের শিক্ষা দান ছিল উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্রমে

সাহিত্য বিকশিত হইয়া ... র্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলা এখন সাহিত্যের ধর্ম ...। সাহিত্যের এই স্বরাজের কথা যাঁহারা বলেন বঙ্কিম তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে মৌলিক বিরোধ নাই, বরং মৌলিক মিলই আছে—কারণ ধর্মের মূল আশ্রয় লোকস্থিতি, জনসমাজের জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও মঙ্গলময় করিয়া তোলা, বিশেষ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা বা সম্প্রদায়িক বিরোধ নয়। সাহিত্যেরও মূল উদ্দেশ্য তাহাই। উহা আনন্দ দান করে ও সৌন্দর্যবোধের দ্বারা জীবনকে সুস্থ সুনির্মল করিয়া তুলে। শুধু উল্লাস, উত্তেজনা উহার মূল লক্ষ্য নয়। অতএব যাহাকে সাহিত্য ধর্ম বলা হয় তাহাকেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করাই শ্রেয়, পৃথক বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়। [বঙ্কিম এইরূপে ধর্ম ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছেন।]

অন্য

ভাব-সম্প্রসারণ

১। মুকুট পরা শক্ত, মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন। (রাজর্ষি)

২। পুষ্প আপনার জন্য ফুটেনা। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও। (কমলাকান্তের দপ্তর)

৩। এই আমার জন্মভূমি : এই মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্ত রত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। (কমলাকান্তের দপ্তর)

৪। মহতের আসন ভূমি তীর্থ স্বরূপ। (চরিত কথা)

৫। বহিঃ প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য স্থাপনের নামই জীবন। (চরিত-কথা)

৬। মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটা বহ্নি আছে—সকা সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে মরিতে তা ...র অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ বাঁচে, কেহ কাচে ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধ্যান-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপবহ্নি, সংসার ... আবার কাচময় ... আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হই ... ঝাঁপ দিতে যাই—এই, তাহা তো পাই না, আবার ফিরিয়া ... চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে ... এতদিন পুড়িয়া যাইত।

৭। হনুমান দাস্যভক্তির অবতার। (রামায়ণ)

৮। বোধ হয় বিধাতা মানব জাতির পতিব্রতা-ধর্ম উপদেশ নিমিত্ত সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (রামায়ণ)

৯। পৃথিবীতে দুঃখ হরণ যে করে সেই রা । (রাজর্ষি)

১০। চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড ই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?

১১। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। (নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ)

১২। সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি!
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।

মর্মকথা ও ভাব সংক্ষেপ

"চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেননা, আফিংখোর। তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? রিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জার পণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারী সোসিয়ালিষ্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর । ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

মি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমা র উন্নতি ড়াল রাগ করিয়া বলিল, "তুমি যদি খাইতে পাইলাম, তবে ন্নতি লইয়া কি করিব?"

।২।

ঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি ই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূরদেশের বৃষ্টির য়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী

নদীর উভয় পারের অরণ্যে ত ার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনে ্রর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথা সময়ে হাসি তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপ্রস্তর ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা এক প্রকার সঙ্কোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ, বাবা?"

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ, মা।"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন?"

এমন এক প্রকার কাতর স্বরে মেয়ে ... করিল, 'এত রক্ত কেন?' যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'। তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

বহুদিন ধরিয়া প্রতিবৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোট্টো মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার ত হইতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'! তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলে. অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন।

। ৩ ।

মানুষ মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান বহ্নি, ধন-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে চাই—কই তাহা তো পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দি পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্যা দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ- ঠেকিয়া রক্ষা পায়; স, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ- ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে, নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—অ স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বা ম ভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন; তে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি "সেন্ট পল"। ভোগ-বহ্নির প

"আণ্টনি ক্লিওপেত্রা"; রূপ-বহ্নির "রোমি ও জুলিয়েত", ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহে রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্মপুস্তক হারি মানে কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপা[illegible]াত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না তো কি?

। ৪ ।

আত্মরক্ষার ও বংশর[illegible] যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মানুষকে একপথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল, গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূল মাত্র, তাহা মানুষকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কেবলই [illegible] করিতে হয়। এই সামঞ্জস্য সাধনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতি[illegible]। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে তার ধর্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই টানানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র।

। ৫ ।

পাপ পুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে। হত্যা যদি পাপ হয় ত সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ। হত্যা ত প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো। এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন [illegible] খেলা বই [illegible]য়, মহাশক্তির মায়া বই তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতি-দিন এমন কত লক্ষ কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে, জগতের চতুর্দিক হইতে [illegible]শোণিতের স্রোত তাহার মহাখর্পর আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—আমিই না হয় সেই স্রোতে আর একটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি [illegible]নই এককালে গ্রহণ করিতেন, আমি না হয় মাঝখানে থাকিয়া উপল[illegible] [illegible]লাম।

। ৬ ।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম, সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ;
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ-'পরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

। ৭ ।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি—
ধরিতে দরিদ্রবেশ। শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্তচিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার ;
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে ;
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল ;
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল ;
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

। ৮ ।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু[illegible]
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আন[illegible] নেতা—
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত ক[illegible] পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জ[illegible]রিত।

। ৯ ।

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ[illegible] দেহো মোর চিতে!
যে [illegible]মার ভুবন
এই তৃণভূমি হতে [illegible] গগন—
যে আলোকে [illegible] সঙ্গীতে যে সৌন্দর্য ধনে,
তার মূল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে
স্বাধীন সবল [illegible] সবল সন্তোষ।
অদৃষ্টের ক[illegible] দিই দোষ
কোনো দুঃখ[illegible]না ক্ষতি অভাবের তরে
বিষাদ না জন্মে যেন বিশ্ব চরাচরে
ক্ষুদ্র খণ্ড হারাইয়া ধনীর সমাজে
স্থান যদি নাহি হয় জগতের মাঝে
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাঁই
হে দেব, একান্ত চিত্তে এই বর চাই।

। ১০ ।

করো না করো না লজ্জা হে ভারতবাসী
শক্তি মদদত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সোম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, [illegible]াক তাহা ঘ[illegible]
থাক্ তাহা সুসম্পন্ন ললাটের প[illegible]
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়ো
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।

পত্র-রচনা

পত্র-রচনা নতুন কিছুই ন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বুঝতে পারি উচ্চ বর্গের মধ্যে তা একটা প্রয়োজনীয় বৈদগ্ধ্য বলে গণ্য হত। এ যুগের পত্র রচনা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রসার ঘটেছে। পত্রলেখা সমাজ-জীবনের এমন একটা সাধারণ ও অপরিহার্য অঙ্গ। প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনেও তা না কম নয়। কারণ বৈষয়িক প্রয়োজনই একমাত্র প্রয়োজন ন যে সম্পর্ক সমাজের প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার, আর াগে সেই প্রয়োজনীয় সম্পর্ক আর একটা নতুন স্তরে উন্নীত হয়। অনেক সময় দেখা-সাক্ষাতের অপেক্ষা পত্রের সূত্রেই আমরা পরস্পরকে আরও ঘনি পে বুঝতে পারি। যেখানে পত্রলিখন একটা বিশেষ কলা, সেরূপ পত্র একধরনের সাহিত্য। তাতে লেখীর যাবতীয় কথা থাক বা না থা া অজ্ঞাতেই তার শিল্পকর্মের পরিচয় ফুটে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিত্ব শ্চর্য বস্তু। পত্র সে ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত করে। নিয়ম পালিত হোক বা না হোক, essay বা অবাধ রচনার মতো পত্রে হাসিতে খুশীতে, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার সুযোগ আরও বেশি। যেমন 'ছিন্নপত্র' সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব। কিন্তু যেখানে মানুষ নিজের পরিচয় সম্পর্কে সতর্ক সেখানে তার বহুগুণের পরিচয় পাই। কিন্তু মানুষটির স্বচ্ছন্দ বিচরণ হয়ত তেমন দেখি না। প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথেরই 'জাপান যাত্রীর পত্র'। যাকে লেখা সে যেন উপলক্ষ্য। যিনি লিখেছেন তিনিও যেন বেশি সচেতন। 'পত্র' নাম না দিয়ে জাপান যাত্রীর লেখাও বলা যেতে পারত। ব্যক্তিগত পত্রের আসল প্রাণ হল এই স্বচ্ছন্দ বিচরণশীলতা।

পত্রলিখনও শিক্ষা সাপেক্ষ। উদ্দেশ্য ও সম্পর্কানুযায়ী পত্র লেখার কলা-কৌশল স্থির করতে হয়। সাধারণতঃ পত্রের বিভাগ এইরূপ : (১) বৈষয়িক পত্র—যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্র বা সরকারী আবেদন পত্রাদি (২) আনুষ্ঠানিক পত্র যেমন পূজার নিমন্ত্রণপত্র, বিবাহের নিমন্ত্রণ। পারিবারিক পত্র—পি ত্র, ভ্রাতায় ভগ্নীতে এ , স্বামীস্ত্রীতে তা লিখি হতে পারে। (৪) ব্যক্তিগত পত্র—স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত, বন্ধুতে বন্ধুতে এ পত্রের ব্যবহারই চলে। অবশ্য এ সব হচ্ছে মামুলী কথা। কারণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পত্রেও বৈষয়িক আলোচনা থাকে। কিন্তু তার রচনা পদ্ধতি ও ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বলেই তা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বলে গণ্য।

ইংরেজি পত্রের পাঠ প্রধানতঃ মাত্র দু'রকম—এক বৈষয়িক 'স্যর' দিয়ে আরম্ভ ও 'ইওর মোস্ট অবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট' দিয়ে শেষ। কিম্বা ব্যক্তিগত পরিচয়ের পত্রে 'ডিয়ার' বা 'মাই ডিয়ার' দিয়ে আরম্ভ এবং 'ইওরস ট্রুলি', 'এ্যাফেকশনেটলি' বা 'সিনসিয়ারলি' দিয়ে শেষ। ওদেশে মানুষে মানুষে পর্যায় ভেদ বা স্তর ভেদ কমে সব মানুষ মানুষ হিসাবে এসেছে এক সাধারণ পর্যায়ে। ডিমোক্রেটিক সমাজের সম্পর্ক সরল ও সমধর্মীয় হয়ে আসছে। আমাদের এখানে তার বিপরীত—জাতি, বয়স, মর্যাদা ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে প্রত্যেকের পত্র-রচনার পদ্ধতি প্রায় পৃথক। আর বৈষয়িক পত্রে একটা নিয়ম থাকলেও আনুষ্ঠানিক পত্রে নিরর্থক রূপে সমস্ত নিয়ম ভাঙাই নিয়ম হয়ে ... তীপূজার নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র দেখলে তা বোঝা বুঝি। অথচ আনুষ্ঠানিক পত্রের ভাষা আনুষ্ঠানিক বা ঐতিহ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পূর্বে পত্র-লিখনের যে অতি পল্লবিত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল (বা হয়েছিল) তা সরলীকৃত হচ্ছে, আর এটি যুগসম্মত বলেই সুসঙ্গত। পিতা বা মাতার পাদপ... 'শতকোটি 'প্রণামান্তে' ইত্যাদি এখন বর্জন করলে দোষাবহ হয় না। 'সবিনয় নিবেদন' কে ... অংশে 'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসরঃ নিবেদনমেতৎ' অপেক্ষা কম সৌজন্য সূচক নয়। এসব কারণেই পত্রের উপরস্থ 'শ্রীশ্রীকালীশরণং' প্রভৃতি এখন লেখা তেমন অত্যাবশ্যক নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে 'ওঁ' এখন প্রবল। হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ দেবতার শরণও কিন্তু আবশ্যক। আনুষ্ঠানিক পত্রে যেমন বিবাহ পত্রে শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ', সরস্বতী পূজার পত্রে 'শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি। যাই হোক, পত্র-লিখনের বেলায় প্রথম প্রধান কথা—বৈষয়িক ও আনুষ্ঠানিক পত্র যেমন যথাসম্ভব ঐতিহ্যানুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পত্র তেমনি ভাবে ভাষায় সরল ও স্বচ্ছন্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রের অবশ্য কয়েকটি অত্যাজ্য অংশ আছে—প্রথম তারিখ ও লেখকের ঠিকানা (যা বাদ দেওয়া অন্যায়); দ্বিতীয়, পত্রের পাঠ; তৃতীয়তঃ, বিষয়; চতুর্থতঃ, পত্র-লেখকের পরিচয় ও স্বাক্ষর; আর সর্বশেষ, ঠিকানা ও শিরোনাম। এর মধ্যে পাঠ-ভেদ ও পরিচয় নিয়ে অনেক বিপদ। প্রধান প্রধান কয়েকটি পাঠ-ভেদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন, (১) বৈষয়িক পত্র, 'সবিনয় নিবেদন' ... প সরল পাঠই যথেষ্ট এবং লেখকের পরিচয় 'নিবেদক' বা বশংবদ' ও পূর্ণনাম। (২) আনুষ্ঠানিক পত্রে, 'মাননীয়েষু' 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' কিম্বা সম্পর্কভেদে 'সুহৃদবরেষু', 'স্নেহাস্পদেষু', প্রভৃতি পাঠ আর লেখকের পরিচয় 'বিনীত' বা 'শুভার্থী' (৩) পারিবারিক পত্রে, গুরুজনদের উদ্দেশ্যে পাঠ—'শ্রীচরণকমলেষু' বা 'শ্রীচরণেষু' আর লেখকের পরিচয়, 'আশীর্বাদক' বা 'শুভার্থী' ইত্যাদি।

একটি কথা অবশ্য স্ম...রচিত—পাঠ ও পরিচয়ে লিঙ্গভেদে যথাসম্ভব হবে নিবেদিকা, মাননীয়াসু, শ্রদ্ধেয়াসু, সেবিকা, স্নেহাধীনা, কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, আশীর্বাদিকা, শুভার্থিনী ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গসূচক পাঠ ও পরিচয় তাই ব্যবহার্য।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পাঠ—পুরুষবন্ধুকে লেখক লিখিবেন—'প্রীতিভাজনেষু,' 'প্রিয়বরেষু'; কিম্বা 'ভাই'—এবং তৎসহ শুধু নামটি তারপর 'তোমার প্রীতিবদ্ধ', 'শুভার্থী' অথবা ... 'তোমার'। আর বান্ধবীর উদ্দেশে হলে 'সুহৃদয়াসু' চলতে পারে, কিম্বা একেবারে নাম ধরে... তারপর সম্পর্কানুযায়ী 'ভবদীয়', 'প্রীতিবদ্ধ' বা 'তোমার' ইত্যাদি ... লেখিকা হলে স্ব-পরিচয় দিতে হবে, 'প্রীতিবদ্ধা', 'স্নেহমুগ্ধা', 'শুভার্থিনী' ইত্যাদি বলে।

শিরোনামার বেলা প্রায় পত্রে পত্রে ... যে পাঠ ছিল তার অনুরূপ পাঠ ...তে হয়। কিন্তু সেই পাঠ পুনঃ-প্রয়োগ করলে ভালো শোনায় না। পত্র মধ্যে 'শ্রীচরণেষু' থাকলে ... 'ভক্তিভাজন', 'শ্রীযুক্ত', 'পূজনীয়' ... শেষ করা যেতে পারে। এবং উদ্দিষ্টা স্ত্রীলোক হলে সম্পর্কানুয ... বার 'পূজনীয়া'...'শ্রীচরণেষু'...'কল্যাণীয়া'।

...কথা, বাগাড়ম্বর যেমন বর্জনীয়, তেমনি অশোভন লঘুতাও অসঙ্গত। তবে ব্যক্তিগত পত্রের প্রধান রস হচ্ছে অন্তরঙ্গতার রস, আর তার প্রধান একটি বাহন হচ্ছে সরসতা, কৌতুক। পত্রের ভাষা সম্বন্ধেও কথা এই: (১) বৈষয়িক বা আনুষ্ঠানিক পত্র ঐতিহ্যসম্মত, ...ায়, কিন্তু বাকচাতুর্য বা বাগাড়ম্বরপূর্ণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (২) ...বারিক চিঠিতে বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে ... সাধুভাষা ও শোভনতা প্রশস্ত; কিন্তু নিকট বা প্রায়-সমবয়স্ক আত্মীয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ আলাপের ও সরসতা ... থাকাই আশ্চর্য। আর বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে চিঠিতে নিয়মো... একমাত্র রুচিহীনতাই অসঙ্গত

যে কয়টি পত্র দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল তা নিতান্তই নমুনা—অ... পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পত্রের বৈচিত্র্য ততটাই থাকা সম্ভব যত বৈচিত্র্য দেখা যায় মানুষে মানুষে। কারণ, সেখানে লিপি হচ্ছে মানুষের স্বচ্ছন্দ মনের প্রতিলিপি

পত্র রচনার নি[illegible]র্শন

[১]

বীরগঞ্জ কল্যাণ বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক মহোদয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়, আগামী ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৬ সাল (১৯শে জুলাই, ১৯৫৯ ইং) আমার ভগ্নীর বিবাহ। তাই আমাদের পরিবারে জ্ঞাতি-কুটুম্বের [illegible] আগমনে সমস্ত সপ্তাহই উৎসব থাকিবে। ক্রিয়াকর্মে আমাকেও ব্যস্ত থাকিতে হইবে। অতএব সবিনয় প্রার্থনা আপনি অনুগ্র[illegible] আমাকে ১লা শ্রাবণ হইতে ৭ই শ্রাবণ পর্যন্ত ৭ দি[illegible] দিয়া বা[illegible]র্তি করিবেন। নমস্কারান্তে।

বিনীত

বীরগঞ্জ, [illegible] বীরেশ্বর গুপ্ত

১৪ই জুলাই, ১৯৫৯ ১০ম শ্রেণীর ছাত্র

শিরোনাম

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বীরগ[illegible]লয়ের

প্রধ[illegible]ক্ষক মহোদয় সমীপেষু—

বীরগঞ্জ

নদীয়া

[২]

বৈষয়িক পত্র

তেলেনীপাড়া,

বাঁড়ুজ্জে বাড়ি

২১শে মে, ১৯৫৯

নবারুণ প্রকাশনী

কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানি সত্বর ভি-পি যো[illegible] উপরোক্ত [illegible]নায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তৎসহ নিম্নলিখি[illegible]য়টি সম্বন্ধে [illegible]কে যথাসম্ভব শীঘ্র সংবাদাদি দান করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি

নিবেদক—[illegible]মান বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]তব্য পুস্তকের নাম—

১। সংকলন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম খণ্ড (প্রকাশক, বিশ্বভারতী)

২। পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড (ঐ, সাহিত্য পরিষদ)

৩। হরপ্রসাদ রচনাবলী, (ঐ, ঈষ্টার্ণ ট্রেডিং)

৪। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (ঐ, কঃ বিশ্ববি[illegible]লয়)

জ্ঞাতব্য বিষয় :

ইংরেজি সাহিত্যে ...ের নিদর্শন রূপ সংকলিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তকের অভাব নাই। বাংলা গদ্যের বিকাশধারা অনুযায়ী সেইরূপ কোনো সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে কে সংকলন করিয়াছেন, কোথায়, কত মূল্যে তাহা প্রাপ্তব্য?

শিরোনাম

নবারুণ প্রকাশনী

...৫১ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট

[...৩]

বিবাহের ... -পত্র

॥ শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ ॥

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবে...

...য়, আগামী বুধবার, ১৯শে শ্রা... ১৩৬৫ সাল (৫ই আগষ্ট, ১৯৫৯ ইং) স... ঘটিকায় আমার দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বন্দনার সহিত ঢাকা বি... নিবাসী, অধুনা কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুকুমারের শুভ-পরিণয় আমার কলিকাতাস্থ বাসভবনে (৫৯নং বালিগঞ্জ প্লেস) সম্পন্ন হইবে স্থির হইয়াছে।

অতএব বিনীত প্রার্থনা, মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক উক্ত দিবসে সপরিবারে মঙ্গলালয়ে উপস্থিত হইয়া শুভকর্মে যোগদান করিয়া ও উহা সুসম্পন্ন করাইয়া আ... বাধিত করিবেন।

ই... । নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করি... ...—৪ঠা শ্রাবণ, '৬৫ সাল

৫৯, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা—১৯
১৯শে জুলাই, ১৯৫৯ ইং

বিনীত—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

করকমলেষু—

৪৭, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—২

॥ শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ ॥

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আগামী মঙ্গলবার ২৭শে মাঘ, ১৩৬৫ [illegible] শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আমরা স্থানীয় বঙ্গবালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগ্‌দেবীর অর্চনা করিতে চাই।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ দিবস দেবীর পূজায় বেলা দশটায় আমাদের সহিত যোগদান করিয়া অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিবেন; এবং পরদিবস সন্ধ্যায় আ[illegible]র 'সারস্বত বাসরে' (সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা) উপস্থি[illegible] থাকিয়া আ[illegible]দের কৃতার্থ করিবেন। ইতি—২০শে মাঘ, ১৩৬৫

বঙ্গ-বালিকা বিদ্যালয়
আসানসোল
বর্ধমান

বিনীত :—
বঙ্গ-বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ

[৫]

[পিতার নিকট পুত্রের পত্র]

স্টুডেন্টস হোম,
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১লা জুলাই, ১৯৫৯

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আপনার আশীর্বাদ পত্র পাইয়াছি মাযের নিকট লিখি[illegible] [illegible]নিয়াছেন—এই সপ্তাহ[illegible] আমাদের রীতিমত কলেজ আ[illegible] [illegible]নুযায়ী আজ দেখিলাম ক্লাশের সংখ্যা কম নয়। পুস্তক-তালিকা [illegible] বুঝিতেছি—পাঠ্য বইও প্রচুর। প্রতিদিনই প্রত্যেকটি মূল [illegible]য়ের দুই [illegible]টা ক্লাশ আছে। তথাপি সব পাঠ্য বিষয়ের পড়া হইবে না, [illegible]নিয়াছি। মাঝে মাঝে কলেজ ছুটি থাকিতে [illegible]রণে অকারণে ছুটির সংখ্যা বাড়িয়াই চলে, আমাদের পূর্বগামী ছাত্রেরা এইরূপ বলিলেন। যে সব বই প্রয়োজন শুনিতেছি তাহাও দুর্মূল্য। অন্ততঃ একশত টাকা প্রয়োজন।

আর একটি বিষয়ও আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। কোনো [illegible] দিন দুই ক্লাশের মধ্যে এক আধ ঘণ্টার অবকাশ থাকে। যে সব বি[illegible]

তখন অধ্যাপনা হয় আমি তাহার ছাত্র নই। দুইদিন আমার দুই ক্লাশের মধ্যে এইরূপ প্রায় তিন ঘণ্টার ব্যবধান পড়িয়াছে—আমার প্রথম ক্লাশ সেই দুই দিন সাড়ে দশটায়, আর শেষ ক্লাশ প্রায় পাঁচটায়। মধ্যে অবকাশের দুই-তিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে পড়িবার চেষ্টা করিতে পারিব। ছাত্রদের কমন-রুমে ছোটো খাটো খেলাধুলারও বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু কোথাও সমস্ত ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য যদি লাইব্রেরিতে পড়িবার সুযোগ পাই তাহা হইলে এই সময়টা সার্থক হইবে এবং সকল পুস্তকও আমার না কিনিলে চলিবে। কিরূপ সুযোগ সুবিধা লাভ করি, আপনাকে পরে জানাইব। তবে কয়খানা পুস্তক এখন ক্রয় করিতে পারিলে ভাল হয়।

আপনি কলেজ ও পড়াশুনার [illegible] জানিতে চাহিয়াছেন। এখনো সেই সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত গঠন করা সম্ভব নয়। শিক্ষাধারারও অনেক জিনিস নূতন। শহর অপরিচিত নয়, কিন্তু কলেজ-জীবন নূতন। অধ্যাপক [illegible] বিদ্বান ও [illegible] অভিজ্ঞ. কিন্তু প্রায় কেহই আমাদের পরিচিত নহেন [illegible] কমাত্র 'লজিকের' [illegible] মাতুলালয়ের পরিচয়ে আমাকে চিনে [illegible] স্নেহ ব্যবহারও করিলেন। [illegible] আশ্বাস দিয়াছেন অন্য সকলের সহিত [illegible] মার পরিচয় করাইয়া দিবেন। কিন্তু এক একটি ক্লাশে সোয়া-শত [illegible] ঘর বড় হইলেও স্থান যথেষ্ট নয়। নাম ডাকার পর অধ্যাপক মহাশয় পড়া আরম্ভ করিয়া দেন। নিকটস্থ স্থানে বসিতে না পাইলে দুই এক জনার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এখনও অনেকেই নূতন পুস্তক কিনিতে পারে নাই। অধ্যাপক মহাশয়রা হয়ত সকলেই যথাশক্তি চীৎকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর তত প্রবল নয়। নূতন কলেজে আসিয়া প্রথম প্রথম কোনো কোনো বিষয়ে এই ধরনের বক্তৃতা [illegible] অধিগত করিতে অসুবিধা হইবে তাহা পূর্বেই জানিতাম তাই [illegible] প্রথম সারিতে বসিতে চেষ্টা করি। তাহা না হইলে অসুবিধায় পড়ি। কারণ ক্লাশের পরে অধ্যাপক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিবার মত আর সুযোগ পাই নাই। তিনিও অন্য ক্লাশে অধ্যাপনার জন্য ছুটিতে থাকেন।

আমার প্রথম [illegible] হর অভিজ্ঞতা এইরূপ। তবে নিশ্চয়ই ক্রমে আমি এইরূপ নূতন পদ্ধতির পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিব।

মাকে আসিয়াই পত্র দিয়াছি। আবার আগামীবার পত্র লিখিব। তাঁহার দেওয়া আচার এখনো বোতল খুলিয়া খাবার ঘরে সকলের সম্মুখে খাইতে পারিনা—ঘরে আসিয়া একা একা খাই। বাড়ির কথা অ[illegible] মনে পড়িয়া যায়।

আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। বুলু ও টুটুকে একআধ ছত্র চিঠি লিখিতে বলিবেন। ইতি—

প্রণত:
অশোক

[illegible]রানাম

। ৬ ।

[পিতার পত্র]

মেমারি
১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু—

বাবা অশোক, তোমার [illegible] পাইয়া তোমার সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আগামী কল্য তোমার [illegible] বদ ৭৫৲ টাকা পাঠাইব। নিশ্চয়ই নূতন পুস্তকাদি কিছু [illegible]। বোধ[illegible] সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইবে না। [illegible] আরও টাকা প্রে[illegible]রিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা এখন সংগ্রহ করিতে পারিব কি[illegible]। তুমিও সমস্ত গ্রন্থাদি ক্রয় করিতে পারিবে কিনা জানিনা। [illegible] যাহা আশু প্রয়োজন এবং নিজে ক্রয় করা একান্ত প্রয়োজন তাহাই [illegible] এখন কিনিতে পারিবে। অন্য গ্রন্থাদি লাইব্রেরি হইতে আপাততঃ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিও। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহাতে অনুমান করিতে পারি—হয়ত [illegible] সুযোগলাভ সুসম্ভব হইবে না। কিন্তু এক্ষণে সব বই কিনিয়া উঠা আরও অসম্ভব। সেইরূপ অর্থ সংগ্রহ হইলে নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিব।

কলেজে পড়া বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কর্তৃপক্ষের মতে [illegible] আমাদের মতো বিত্ত[illegible]বিত্ত পরিবারের পক্ষে তাহা এ[illegible] ও [illegible] [illegible] কি করিব? পুরুষানুক্রমে আমরা শিক্ষাদীক্ষাকে জীবনের [illegible] কাম্য [illegible]য়া জ্ঞান করিয়াছি। উহার সহায়েই আমরা বিত্তহীনরা অ[illegible]র্জনকরিয়া [illegible]তেছি। আজ দেখিতেছি যোগ্যতা থাকিলেও তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং বা [illegible] ব্যয়সাধ্য বিষয়ে অর্থাভাবে শিক্ষালাভ করি[illegible]রিবে না। কিন্তু তোমার সাধারণ বি-এ, বি এস-সি পড়িবার ব্যয়ও বহন করিতে পারিবনা, এই কথা এখনো স্বীকার করিতে ক্লেশ বোধ করি। এই শিক্ষায়ও কোনো কোন দিকে ছাত্রদিগকে কলেজের কর্তৃপক্ষ কতটা সহায়তা দান করে তাহাও বুঝা অসম্ভব। শত শত ছাত্রের ভীড়ে তাঁহাদেরও হয়ত নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। এই অবস্থায় যতটুকু বুঝিতেছি—তোমার [illegible]

প্রায় সম্পূর্ণই এখন তোমার নিজের চেষ্টা, নিজের মেধা ও নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিবে। এই সহজ সত্য উপলব্ধি করিয়া তুমি দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হও—যেমন করিয়াই হউক বিদ্যা অর্জন করিবে—কেহ সহায়তা না করিলেও নিজেকে অসহায় [illegible] করিবে।

তোমার মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই। গৃহকর্মে সারাদিন তিনিব্যস্ত। কিছু বিশ্রাম তাঁহার প্রয়োজন ছিল। [illegible] তাহা দুর্লভ। আমার শরীর মোটের উপর সুস্থ। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকিলে তোমাকে পত্র লেখা সম্ভব হয় না—তোমার মা-ই তাহা করেন। তোমার পত্রের জন্য সর্বদাই তিনি ব্যস্ত হইয়া থাকেন, খুকু [illegible]ও অপেক্ষা করে।

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ

আশীর্বাদক

তোমার বাবা

সুদর্শন চৌধুরী

শিরোনাম

শিলিগুড়ি

২রা মে, ১৯৫৯ ইং

[illegible], তোমাকে চিঠি লিখছি দেখে হঠাৎ অবাক হয়োনা। সেবার তোমাকে আমার জন্য কিছু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থিনী মেয়েদের স্কুলের প্রশ্নপত্র জোগাড় করতে লিখেছিলাম। তাই তুমি আমাকে বলবার সুযোগ পেয়েছিলে 'কাজ পড়লে সকলকেই লিখতে হয়, আর কাজ ফুরুলে কে [illegible] কাকে মনে রাখে?' কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা, দাদা। তাই আপত্তি [illegible]। তুমি বলবে, তোমাকে কি কম ঘুরতে হয়েছিল দোকানে দো[illegible] মার সেই প্রশ্নপত্রের খোঁ[illegible] [illegible]য়ে-স্কুলের প্রশ্নপত্রে আর পুরুষ-স্কুলের প্রশ্নপত্রে তফাৎ কোথায়, তাও কাউকে বুঝিয়ে বলতে প[illegible] আর দো[illegible]রাও আমাকে তাই বই দিতে পারে না।' তারপরে আমাকে বল্‌লে ঠাট্টা করে "শাড়ী ও গয়নার দোকানে গিয়ে খোঁজ [illegible] তারা তখুনি বুঝ[illegible]র করে দিলে তাদের শাড়ীর আর গয়নার ক্যাটালগ। এ প্রশ্ন দিয়ে পড়াশুনা করলে নিশ্চয়ই তুমি পাশ করবে। কিন্তু, তা কাজে লাগবে স্কুল ফাইন্যালে নয়—বিয়ের বেলায়।" যাক্ তোমার অত খাটুনির পরে কিন্তু কেমন করে জানিনা ডাকে এসে গেল কার নির্দেশমত মোটা এক প্র[illegible]র রাশি। বাবা বললেন, তুমি পাঠিয়েছ। আমি বললাম, না! [illegible] তো বই-এর দোকান চেনোনা, গয়নার দোকানে খোঁজ করেছ। না হলে

কি চিঠি দিয়ে একবার বলতে না 'বই পাঠিয়েছি'। আমি তাই তোমাকে চিঠি দিইনি। অথচ মাস দেড়েক পরে বাড়ি এসে বললে—'কাজ ফুরুলে কে কাকে চিঠি দেয়।' তুমিই কি চিঠি দিয়েছিলে তখন? চিঠিতো দিয়েছিলেন বউদি। আর তাকেই তাই উত্তর দিয়েছি।

যাই হোক্, এবার কিন্তু তোমাকে চিঠি লিখছি কাজে নয়, অকাজে; আর বই-এর জন্য নয়। যে বিষয়ে [illegible] বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়ে—মানে গয়না। এবং 'বিয়ের বেলার' [illegible] ারেই। কাজেই এবার তোমার মোটেই ঘুরতে হবে না। আর ঘুরলেই বা? বিয়েওতো অন্য কারোর নয়—একেবারে তোমার শালীর। অর্থাৎ বউদিদির পিস্তুতো বোনের খুড়তুত [illegible] পার। তুমি অবশ্য তাকে জানো। তবে সে যে [illegible] বন্ধু, একসঙ্গেই পড়েছে এ কথা হয়ত তোমার মনে নেই। কিন্তু [illegible] দওয়া যায় বলোতো? যদি বলি একসেট রবীন্দ্র-রচনাবলী? তুমি লি[illegible] শাড়ীর দোকানে পাওয়া গেল না। যদি বলি কানের টপ—লাল [illegible] বসা [illegible]—টাকা ত্রিশ-চল্লিশের মধ্যে; তা হলে কি বলবে? অত সস্তা দামের জি[illegible] আমার বালিগঞ্জের 'ভূষণম'-এ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ [illegible] অত স[illegible] জিনিস কিনতে। ছাখো দাদা, তা হ[illegible]। তিনি দোকা[illegible] গেলে তিনগুণ দামের জিনিস কিনবেন, তোমার প্রেষ্টিজ বাঁচবে, কিন্তু [illegible] হবে তোমার পকেট থেকে। আমি পাবো কোথায়? যা এখন ভালো [illegible], করো। কিন্তু বলতে পারবে না আমি আমার বান্ধবীর জন্য চিঠি [illegible]—তোমার শালীর বিয়ে—তাতেইতো লিখতে হলো।

আচ্ছা, যত কাজ বউদির পিসতুত বোনের খুড়তুত বোনের জন্য করবে? একটি কাজ নিজের সহোদর বোনের জন্যও করো না? একটি কবিতা আমার হয়ে লিখবে সুরূপার উদ্দেশ্যে। দেখবে আমি রেশমি সুতায় বসে বসে গাঁথব। রবীন্দ্রনাথের কোনো বোনও তাঁর কবিতা রেশমি সুতোয় [illegible] নিশ্চয়। দেখো, তোমা[illegible] আমি কত কাজ করব—তোমার [illegible] ও [illegible] ক[illegible] [illegible]ভাগ্য। অতএব আর দেরী করো না। পত্রপাঠ, এ চিঠিটার [illegible] করো।

আশা করি, এমন-কাজ ছাড়া চিঠি পেয়ে এবার তুমি খুশী হ[illegible]ং আমার [illegible]ম নিতে নিতে বুঝবে—আমার পরীক্ষার ফলটা জানতে দেরী করাও ঠিক না। বাবার শরীর ভালো। মায়ের শরীরও মন্দ নেই। [illegible] আমার? দাদা, একবার যদি এ বছর স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে তা হলে তুমি নিজেই বুঝতে—যতই ফল বেরুবার দিন এগিয়ে আসছে ততই আমার শরীর কেমন করছে। তোমার মনে আছে কি আমি পরীক্ষা দিয়েছি? মনে পড়ে কি বউদির ক রোল নাম্বারটা আছে? শিলি এফ ১৫? বাবা বলেন, নিশ্চয় তোমার মা নেই আমি পরীক্ষা দিয়েছি। মা বলেন, সে ঠিক নয়—তবে মন্থর সময় [illegible]

আমি জানি দুইই ঠিক। তোমার মনেও নেই, আড্ডা দিয়ে সময়ও নেই। কিন্তু আমার ভরসা বউদিদি তো আছেন—কাজেই তাঁকেও লিখছি তোমার মনেও হবে, সময়ও করতে হবে। আর [illegible]ন্যই দুইজোড়া চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করে আসি[illegible]ছি—দুজনা মনে রেখো—আমি কিন্তু খবর না পেলে চিঠি লিখে জ্বালাতন করব।

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব,

আজ আপনার বিদায়ের দিনে আমরা আপনাকে আমাদের অন্তর[illegible] কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আপনি তাহা [illegible]স্বন।

[illegible] ক্ষুদ্র শিক্ষাকালের পরিধি[illegible]রা আপনাকে অসামান্য সৌভা[illegible] লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার দান সেই কালটুকুর মধ্যে[illegible] সীমাব[illegible]। এই স্কুল, এই অঞ্চলের ছাত্রমণ্ডলী-পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ বিশ[illegible] কাল আপনার দানে ঐশ্বর্যান্বিত হইয়াছে; বৎসরের পর বৎসর এই [illegible] বিদ্যালয়ের শা[illegible]বেশ আপনার সৌম্যদর্শন সহাস্যশ্রীতে সমুজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। এক পর্যায়ের পর অন্য পর্যায়ের নব নব শিক্ষার্থীরা আপনার চরণতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে; আপনার শিক্ষক জীবনের উৎস-ধারা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া গিয়াছে আপনার স্নেহ সরস পবিত্র আশীর্বাণী। জীব[illegible]পথে আজ যখন আপনি তাহাদের পার্শ্বে নাই, তখনো তাহা তাহাদের নব কর্মোদ্যোগে জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে আপনারই শিক্ষাধারা প্রবাহিত ও

প্রতিফলিত। আজ তাঁহাদের অনুজরূপে, আপনার পদাশ্রিত বর্তমান মুহূর্তের শিক্ষার্থী রূপে সেই পূর্বজদের সামান্য মুখপাত্ররূপেও আমরা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি,—নূতন ও [illegible]তন আপনার বিরাট [illegible]মণ্ডলীর সমবেত শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। আপনি তা[illegible] গ্রহণ [illegible]

নিজেদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় [illegible] আমরা সব দিকে আপনার অবদানের কথা বলিবার অ[illegible]ী নহি। কিন্তু ইহা বুঝিয়াছি জীবনযাত্রার পুরোভাগে আপনার শিক্ষা ও সাহচর্যের সুযোগ লাভ আমাদের কত বড় এক সৌভাগ্য। আমাদের নবোদ্ভিন্ন জিজ্ঞাসা আপনি সস্নেহে [illegible] করিয়া দিয়াছেন; অর্ধস্ফুট চেতনাকে অবিচলিত ধৈর্যে পরিস্ফুট [illegible] তোলাই ছিল আপনার সাধনা; অবোধ কৌতূহল[illegible] [illegible] চালিত করিয়া জ্ঞা[illegible] [illegible]য় রূপান্তরিত করিয়াছেন। জটিল প্রশ্ন[illegible]বু[illegible]দের [illegible]মিত বুদ্ধির নিকট সরল করিয়া তুলিতে আপনার ক্লান্তি দেখি ন[illegible] [illegible]ত বিদ্যার পরিধি ছাড়াইয়া জগৎ ও জীবনের অজস্র ঐশ্বর্য [illegible] মুখামুখি করাইয়া দেওয়া ছিল আপনার লক্ষ্য।

আপনি আমাদের দৃষ্টিদাতা—[illegible] আমরা শতচক্ষু [illegible] ও চিরান্ধ হইয়া থাকিতাম। আপ[illegible] [illegible]কট [illegible] কি করিয়া আমা[illegible] [illegible]ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব? [illegible]নেই

দেব! বিদ্যাদানই আপনার ব্রত। কিন্তু পুঁথির শুষ্ক পত্রের ম[illegible]বশ্য[illegible] যে নিষ্প্রাণ বিদ্যাকে আমাদের ছাত্রদের বহন করিতে হয়, আপ[illegible] সেই বিদ্যাকে প্রাণ দান করিয়া আমাদের নিকট জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু সেইখানেই আমাদের ছাড়িয়া দিয়া আপনার দায়িত্ব শেষ হইতে দেন নাই, আপনার প্রাণস্পর্শে আমাদের প্রতিটি চিত্তকে সরস ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। পিতার হিতৈষণায়, মাতার স্নেহে, অগ্রজের সৌহা[illegible] আপনি আমাদের যাহা দান করিয়াছেন, তাহা অধীত বিদ্যা নয় [illegible] জীবন-জিজ্ঞাসা। আপ[illegible]সম্পদে আপনি শুধু বিদ্যাকে ন[illegible] ও [illegible]োর এই বিদ্যার্থিমণ্ডলীকে প্রাণবান করিয়াছেন। আমাদের এই [illegible] [illegible]বোধ আপনার নিকট কি করিয়া ব্যক্ত করিব?

মহাত্মন্! জ্ঞান ও আনন্দের পথ আমাদের পক্ষে সযত্নে সুগম করিয়া তুলিতে তুলি[illegible] আপন কর্মক্ষেত্রে যে জীবনচর্যার স্বা[illegible] আপনি অলক্ষ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, সেখানে উপদেশের আড়ম্বর আপনার প্রয়োজন হয় নাই, নীতিকথার বচন আবৃত্তি করিতে হয় নাই, এমনকি শাসনশাণিত কঠিন বাগ্মিতাও ছিল অনাবশ্যক। আপনার প্রতিদিনকার স্বচ্ছন্দ আচরণ, শুভ্রস্মিত হাস্যালোচনা, জীবনাদর্শের সহজ অভিব্যক্তি—পাঠ-গৃহে, আলোচনা-সভায়, ক্রীড়াঙ্গনে—প্রতিদিনকার সাধারণ জীবন যাত্রায় আমাদের নিকট জী[illegible] সহজ শ্রীকেই প্রকাশিত করিয়া ধরিয়াছে। উপদেশ-নির্দেশের সমস্ত কৃত্রিম[illegible]

হইতে মুক্ত আপনার এই জীবন-চর্চা আমাদের অন্তরে অলক্ষিতে অঙ্কিত একটি শুভ্র জীবন-বাণী। আমরা কি করিয়া আজ প্রকাশ করিব ?

দেব! আমাদের বুদ্ধি অপরিণত চরিত্র অপরিস্ফুট। প্রাণশক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বারে বারে [illegible] আম[illegible] ছাত্র-জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি; আপনাকে তাহা বিরক্ত করে নাই, কিন্তু উদ্বিগ্ন করিয়াছে। নিজেদের ত্রুটি ও বিচ্যুতি দ্বারা নিজেদের [illegible] ও [illegible]হত করিয়াছি। আর আপনি ক্ষমা-সুন্দর স্নেহে আমাদের স্বক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আজ আপনার বিদায়[illegible] প্রাক্কালে আমরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার ও চপলতার কথা স্মরণ করিয়া [illegible] কে আমাদিগকে এমন ক্ষমা করিবে? এমন পরিচ[illegible] করিবে?

[illegible]দেব! আপনি আজ [illegible] [illegible]লয় হইতে বিদায় লইয়া নূতন জীবনের আর এক স্তরে [illegible] [illegible]ন। আপনার শক্তি, স্বাস্থ্য, শুভবুদ্ধি সেখানেও আপনাকে সার্থক [illegible] আপনার পদচিহ্ন পড়ুক আর [illegible] আমরা জানি [illegible] এই ভূমিতল, এই অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল, ইহার কল্যা[illegible] ঐতিহ্যে আপ[illegible] [illegible]জীব থাকিবে। আর আপনার পদচি[illegible] [illegible]মাদের পূর্বজগণের আ[illegible] শিষ্যমণ্ডলের কর্ম ও চিন্তার মধ্য দি[illegible] করি[illegible]ণ রেখায় তখনো অঙ্কিত হইয়া চলিবে। সুস্থ জীবন, দীর্ঘ আয়ু ও অ[illegible]সাধনা লইয়া আপনি যেখানেই অগ্রসর হউন, আমাদের প্রণাম আপ[illegible]দপ্রান্তে এমনি করিয়াই আমরাও নিবেদন করিব। জানি আপনি তাহা এমনি স্নেহেই গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ভক্তিপ্রণত
বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী।

[৯]

স্বাগত পত্র

[বৈ[illegible] রাজপুরুষের বা উদ্যোগী শিল্পপতির আগমনোপলক্ষে]

মহাত্মন্,

আপনার শুভপদার্পণে আজ আমাদের ক্ষুদ্র বামুনদ[illegible] গ্রাম পবিত্র হইল। আমাদের এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সকল অধিবাসীর পক্ষ হইতে আমরা আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। স্বাগতঃ হে সুধি! স্বাগতঃ।

কর্মিশ্রেষ্ঠ! ক্ষুদ্র গ্রাম এই বামুনদীঘি; ইহার চারিপার্শ্বে আর যে দশটি [illegible]ম আছে তাহা আরও ক্ষুদ্রতর—ইহা আপনি স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। [illegible] বলা প্রয়োজন, আমাদেরও ঐতিহ্য সামান্য ছিলনা। কোনো

একদিন এই গ্রামে সমাজশিখর ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল—বিত্তে না হোক, বিদ্যায় তাঁহাদের অনুরাগ ছিল, আর ঐশ্বর্যে না হোক, দায়িত্ব পালনেও তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। চারিদিকের আর গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে ... অগ্রসর হন গ্রামের নামে আজও তাহার পরিচয় সুরক্ষিত। এই ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের দিনে যদি আপনি আজও এই গ্রামে ... কোনো গ্রামে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন কেন এই দীঘিকেই সেদিনের মানুষ পল্লী-জীবনের প্রধান পরিচয়রূপে স্বীকার করিত। এই অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের প্রাণধারার উৎস ছিল সেই জল ... মজিয়া মজিয়া আজ যখন তাহা শেষ হইতে চলিয়াছে, তখন ... বেশি করিয়াই ... মনে করাইয়া দিতেছে। এই সা... পালনের মধ্য দিয়া প... নের আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকার জীবনে ... বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনাদের আয়াসকে যুক্ত করিয়া ... একদিন এই অঞ্চলকে প্রাণময় শান্তশ্রীতে সৌভাগ্যশালী ক... ছিলেন, আজও তাহার স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমাদের ... চেষ্টায় এই গ্রামের নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি আজ ... চলিয়াছে, তাহার প্রাঙ্গণে আজ আমরা আপনাকে তাই স্বাগত সম্ভাষণের সুযোগ-লাভ করিলাম। কর্মময় জীবনের বহু অভিজ্ঞতায় আপনি জ্ঞানী। দেশের ও দশের ... সেবায় আপনি স্থিরব্রত। আর বিদ্যা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে, অন্তরের ... ও চিন্তার গভীরতায় আপনি দেশের আক্ষুদ্র সকলের সম্মানিত। দেশের ... এমন বরণীয় সন্তানকে আমাদের মধ্যে লাভ করিয়া আমরা স্বভাবতই আপনার নিকট আমাদের প্রার্থনা লইয়া দাঁড়াইয়াছি।

এই অঞ্চলের এই হাজার-বারশত অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দশ জনও নয়। ইহার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। অন্য জীবিকা ... বলিয়া কৃষিই প্রধান জীবিকা, প্রায় একমাত্র গ্রাম্য-জীবিকা। ... অভাবে চাষ এখন ... । পানীয় জলের অভাবে ... মাস গ্রামের সর্বসাধারণের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়। ... টিউবওয়েল ভগ্ন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রামের চৌমাথার একটিমাত্র টিউবওয়েল ... ঘিরিয়া অসহায় ভাবে এই বৈশাখে শত শত নর-নারী বালক-বৃদ্ধ খালি কলসী লইয়া বসিয়া থাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দৈন্যগ্রস্ত পরিবেশে যে গুটিত্রিশেক তন্তুবায় পরিবার বস্ত্রশিল্প আঁকড়াইয়া ছিল, তাহারাও আর পথ দেখিতেছে না—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ফিরিতেছে। কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি বৃত্তি-জীবীরা আরও নিরুপায়। চারিদিকেই দৈন্যের ছবি। একটা ক্রম-জীর্ণ মন্থর ক্ষয় যেন এ-অঞ্চলকে ঘিরিয়া আসিতেছে।

ইহারই মধ্যে অকস্মাৎ নূতন জীবনের আহ্বান লইয়া যেন এই নূতন সড়ক আমাদের গ্রামকে নূতন জীবনের দিকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

সেই সঙ্গে আসিয়াছে গ্রামোন্নয়নের নূতন আমন্ত্রণ, স্কুলটির পুনঃ সংস্কার ও উন্নয়নের ব্যবস্থা, দীঘির পঙ্কোদ্ধার করিবার নূতন আয়োজন। প্রতি গ্রামে অন্ততঃ ৫০টি পরিবার পিছু একটি নলকূপ স্থাপনের প্রয়োজন। বহুদিনের পুঞ্জীকৃত অবজ্ঞার [illegible] পতন হইতে হঠাৎ [illegible]ন আজ আমরা বামুনদীঘির মানুষেরা উপরের আকা[illegible] [illegible]লিবার ডাক শুনিতেছি, তখনি একই সঙ্গে আমরা চাহিতে[illegible] —চাহিতেছি শিক্ষার আলো, চাহিতেছি স্বাস্থ্যের সম্পদ, চাহিতেছি [illegible] [illegible]নের উপযোগী উদ্যোগ— কৃষিকেন্দ্র, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, বস্ত্র শিল্পের পুনর্বাসন, নূত[illegible] [illegible]র-শিল্পের পত্তন।

আ[illegible]রা, 'বামুনদী[illegible]ঘর' [illegible] গ্রামবাসীরা, একই কালে আমাদের এই দৈন্যে[illegible] ও আশার [illegible] [illegible] করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া[illegible] আপনার শুভ [illegible] [illegible]দের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। স্বাগতঃ! আ[illegible] [illegible]তঃ!

সুধীবর! আমরা চা[illegible] [illegible]শী মনের বিচক্ষণ পরামর্শ, [illegible] [illegible]ঠনকামী সাহসী [illegible] [illegible]এব সহায়তা, আর সর্বোপরি আমরা চাই আমা[illegible] এই অবজ্ঞা[illegible] [illegible]জীবন-সঙ্কল্পের প্রতি আপনার সজীব সহানু[illegible] আপনার আগম[illegible] [illegible]তাই বিশেষ আগ্রহে প্রতীক্ষা করি[illegible] কারণ, আপনি স্বচক্ষে দেখিবেন আমাদের প্রয়োজন ও আয়োজন অভ[illegible] [illegible]স্কল্প—সব কিছুরই পরিচয় পাইবেন। যথার্থ কর্মের পরিমাপ গ্রহণ করি[illegible] [illegible]রিবেন, এবং আমাদের উদ্যোগ-আয়োজন আপনার উপদেশ-নির্দেশে [illegible]র ও [illegible]দায়ক হইয়া উঠিতে পারিবে।

মহাত্মন্! নিশ্চয়ই আপনাদের রাজভাণ্ডার হইতে আমরা আমাদের এই অঞ্চলের উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য সাহায্যপ্রার্থী। কারণ, আমরা পশ্চাতে [illegible] থাকিলে সমস্ত দেশকেও পশ্চাতেই টানিতে থাকিব, জাতির সামগ্রি[illegible] অগ[illegible] [illegible]র পথে বাধাই হইয়া উঠিব। সেই অগ্রগতির পথে আমরা সহযাত্রী হতে[illegible] [illegible]লিয়াই আপন[illegible] সহায়তার প্রার্থী। সেইখানে আমরাও [illegible]নদে[illegible] [illegible]গই যথাসম্ভব আপনা[illegible] [illegible] হইবার আশা রাখি। আমাদের [illegible] অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির উদ্বোধন কামনাতেই আপনাদের নিকট হই[illegible] প্রথম চাই উৎসাহ, দ্বিতীয়তঃ চাই উদ্যোগ, তৃতীয়তঃ, চাই সর্বাঙ্গীণ সহকারি[illegible]। আপনার উপস্থিতি ও পর্যবেক্ষণে [illegible]পনিও ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমাদের আজিকার সামান্য উদ্যোগ হইতেই বুঝিতেছেন আমাদের অভাব কত নিদারুণ। এই ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আপনাকে সমুচিত ভাবে সমাদর করিব, এমন সাধ্যও আমাদের নাই। আমরা শ্রদ্ধা [illegible] বিশ্বাসের ভরেই এই স্বাগত-সম্ভাষণে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি।

শ্রদ্ধা আপনার মহৎ সঙ্কল্পে, বিশ্বাস আপনার কর্মশক্তিতে। দিনে দিনে তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠুক—দেশ সমৃদ্ধ হউক—জাতি গৌরবান্বিত হউক। ইতি—

বিনীত
[illegible]
এই ফা[illegible]র অধিবাসীবৃন্দ

[১০]

বৈষয়িক পত্র [illegible]

[বৈষয়িক পত্র রচনায় সাধারণ[illegible] বলিয়া সম্বোধন [illegible] এবং 'নিবেদক' বলিয়া স্বাক্ষর করাই নি[illegible] পরিচয় স্থলে 'মাননীয় অমুক বাবু' কিম্বা 'প্রিয় অমুক বাবু' লেখা[illegible]বে সর্বক্ষেত্রেই পত্রের নম্বর, তারিখ প্রভৃতি উল্লেখ ক[illegible] বিষয় সতর্কভাবে লেখা উচিত। বৈষয়িক ব্যাপারে কেহ কাহা[illegible] করে না, ইহা [illegible]

বৈষয়িক পত্ররচনা বিশেষ [illegible] কতকাংশে [illegible] অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। নিম্নে সাধারণভাবে দুইখানি পত্রের নমুনা দেওয়া হ[illegible]।]

[ক]

পত্রসংখ্যা ১০৩।৫৯

শ্রীযুক্ত 'শিক্ষা-প্রকাশনী'র কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু
১০।৩ নং কলেজ স্ট্রিট
কলিকাতা

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনাদের বিজ্ঞাপনাদি হইতে জ্ঞাত [illegible]—স্কুল ও কলেজের শিক্ষা-বিষয়ের পরিবর্তনানুযায়ী আপনারা নূতন[illegible] সর্ব-বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক [illegible]না করাইতেছেন এবং [illegible]ই উদ্দেশ্যে বহু সুযোগ্য লেখক, শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সহায়তালাভ করিতেছেন। ইহা নিশ্চয়ই সময়োচিত সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ আজ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়াছেন। যদি সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ লেখকগণ যথার্থ পরিশ্রম করিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনায় যত্নপর হন, একমাত্র তাহা হইলেই নূতন শিক্ষা-বিষয়সমূহ পঠন-পাঠনে [illegible]াংশে

সহায়তা হইতে পারে। আপনারা এইরূপ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিলে ছাত্রদের অভা[illegible]ণ করিতে পারিবেন এবং ব্যবসায়েও লাভবান হইবেন। এই কার্যে আমরা আপনাদের সহকা[illegible]তা করিতে চাহি।

ব্যক্তিগতভাবে [illegible] সায়-প্রতিষ্ঠান 'পুস্তক ভাণ্ডারের' [illegible]ধিকারী ও তাহার কম[illegible] [illegible]লায় একজন শিক্ষক রূপেই আমি কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই [illegible] স্থাপনেও উদ্যোগী হই। আমার ভূতপূর্ব সহযোগী শিক্ষক সম্প্রদায়ের ও ছাত্রসা[illegible]ণের কুণ্ঠিত সহযোগিতায় ও প্র[illegible]নের ব্যবসায়িক সুনামের ফলে উহাই আমার জীবিকার অবলম্বন হ[illegible]য়াছে। এই জিলার বিশিষ্ট পুস্তক-ব্যবসায়ী ব[illegible]জ আমরা পরিগণিত [illegible] কারণ আজও আমি বিস্মৃত হই নাই, —আমি শিক্ষক ছিলাম, [illegible] যথার্থ উন্নতিই আমার কাম্য।

এই কারণে, এই [illegible]ন্ডারের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের প্রকাশালয়ের প্রকাশিত [illegible] পুস্তকসমূহের এই বীরভূম জিলার [illegible] এজেন্টরূপে [illegible] চাই। আমার সহিত আপনাদের কোনো প্রা[illegible]গী প্রতিষ্ঠানের [illegible]। অবশ্য সাধারণভাবে ব্যবসায়িক ক[illegible]হু পুস্তকব্যবসায়ীর সঙ্গেই আমরা ব্যবসা করি, তাহা বলাই [illegible]

[illegible] এজেন্টরূপে কাজ করিতে হইলে আপনারা কি ব্যবসায়িক শর্তে আম[illegible] সেই ভার [illegible] করিতে পারেন, অনুগ্রহ পূর্বক তাহা জানাইবেন। গ্রন্থাদি [illegible] ও বাকী [illegible], কমিশন-হার, ডাক ও রেল পার্শ্বেলের খরচ, অবিক্রীত ব[illegible] সম্বন্ধে ব্যবস্থা, প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কথাই উল্লেখ করিবেন।

[illegible] সততা ও সু[illegible] সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি সংবাদাদি সংগ্রহ [illegible] তথাপি সাধার[illegible] পরিচয় উপরে উল্লিখিত হইল। আশা করি তা[illegible] আপনারা আশ্বস্ত [illegible] করিবেন[illegible]

[illegible] বাধিত ক[illegible]বেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীদিবাকর চট্টো[illegible]ায়
স্বত্বাধিকারী ও প্রধান পরিচালক, 'পুস্তক ভাণ্ডার'
স্কুল-[illegible]ঙ্গা, বীরভূম

[বলা বাহুল্য এই পত্রে বৈষয়িক পরিচয় প্রদানই বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবসায়ের শর্তাদির সবিশেষ আলোচনা এখানে নেই। অনেক বৈষয়িক [illegible] তার প্রয়োজন হয়।]

[খ]

পত্র সংখ্যা—১৩৫/... ১৯।২ ...সি বাগান লেন
শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়, বি-এ. ... এল-বি, কলিকাতা—১১
উকিল, স্মল কজেজ কোর্ট ১৭।৮।৫৯ ইং

গ্রেট ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ...
... সনস্‌ ... শিলিগুড়ি, মহাশয়দের সমীপেষু,

বিষয়ঃ পাওনা আদায়ের আইন ... নোটিশ

মহাশয়,

এতদ্বারা আমার মক্কেল ৪৫... ভাবাজার স্ট্রীট কলি... ২এ অধিষ্ঠিত দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ... প্রাইভেট ... এর পক্ষ হইতে আমি আপনাদের জানাইতেছি :

(ক) যেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহি... সূত্রে আপনারা দাস ...গুপ্ত সনস্, বড়বাজার, শিলিগুড়ি (জিলা দার্জি... ... তিন হা... ...শত তের) টাকা পরিমাণ বাকীতে দ্রব্যাদির জন্য দায়িক ;

(খ) যেহেতু আপনারা আমার মক্কেল উক্ত দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান ...ল ষ্টোরস প্রাইভেট লিঃ-এর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উক্ত বাকী ...ধ করিতেছেন না এবং গত এক বৎসর কালের মধ্যে ৪।৫।৫৭ ...খের প্রতিশ্রুতি মত কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধের ব... করিতে ...

(গ) যেহেতু আপনারা গত তিনমাস ... পত্রাদি ... উত্তরদানে ... করিতেছেন ;

(ঘ) এমনকি, যেহেতু আমরা অবগত ...ইলাম, কলি... ...ন্য ব্যবসায়ীদের নিকট ... নগদ বা বা... যে দ্রব্যাদি ক্র... ...ছে অথচ আমার মক্কেলের সহিত ... সম্পর্ক ...খিতে সচেষ্ট

অতএব, উক্ত কারণ বা কারণসমূহে আমি আমার মক্কে... ...ক্ষ হইতে বাধ্য হইয়া জানাইতেছি যে, এই পত্র-প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে আপনারা আমার মক্কে...র সমস্ত প্রাপ্য (৩,৭১৩...) ৬।০ টাকা সুদ ...হ পরিশোধ করিয়া বাধিত করিবেন। অন্যথা তাঁহাদের আইনের শরণ লইতে হইবে। ইতি

নিবেদক

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়